শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টারীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১৮শ বর্ষ, ১৮শ খণ্ড, ১ম সংখ্যা। | বৈশাখ। | ১৩১৮ সাল, ১৮৩৩ শকাব্দা।

মঙ্গলাচরণ।

ওঁ একঃ পুরস্তাৎ য ইদং বভূব
যতো বভূব ভুবনস্য গোপ্তা।
যমপ্যেতি ভুবনং সাম্পরায়ে
নমামি তমহং সর্ব্বতোমুখম্।

বিশ্ববিকাশের পূর্ব্বে যিনি এক নিরঞ্জনরূপে আপনপ্রভায় আপনি দীপ্তি পাইয়া থাকেন, যাঁহা হইতে এই চরাচরাত্মক বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড ব্যক্তরূপে আবির্ভূত হয়, যিনি নানাভাবে নানাশক্তিতে প্রকাশ পাইয়া এই সংসারের রক্ষণ ও পালন-কার্য্য সম্পাদন করেন, প্রলয়সময়ে এই নিখিল বিশ্ব যাঁহাতে বিলীন হইয়া থাকে, সেই সৃষ্টিস্থিতিলয়ের একমাত্র কারণস্বরূপ সর্ব্বতোমুখ পরমাত্মা পরমেশ্বরকে নমস্কার করি।

নববর্ষের প্রার্থনা—

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ—
ব্যশেম লোকহিতং যদায়ুঃ।

আমরা যেন দীপ্তিশালী ও যজনশীল হইয়া কর্ণের দ্বারা আজীবন কল্যাণকথা শুনি; চক্ষুর দ্বারা আজীবন মঙ্গলদৃশ্য দর্শন করি, দৃঢ় অঙ্গসকল ও সুস্থদেহ লইয়া আজীবন মঙ্গলময় ভগবৎস্তুতি পরম্পরায় কালাতিপাত করি এবং আমরণ লোকহিত সাধন করিয়া রোগশোকাদিশূন্য কল্যাণময় জীবন বহন করিতে পারি।

আবার একটী বর্ষ মহাকালের বিশাল-কোলে ঢলিয়া পড়িল! পুরাতন অদৃশ্য হইল, নূতন হাসিতে হাসিতে তাহার স্থান অধিকার করিল! এখন অতীতের যাতনা-বেদনা ও বর্ত্তমানের আশা-আহ্লাদের অপূর্ব্ব সম্মিলনে হৃদয় এক অপূর্ব্বভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পড়িল।

গতবর্ষে আমরা অনেক আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপ সহ্য করিয়াছি, বৎসরশেষের সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ-কৃপায় সে সকলের কৃষ্ণলাঞ্ছন হৃদয় হইতে মুছিয়া গিয়াছে। নববর্ষোৎসবের পুলকে

প্রাণ প্রীত হইয়াছে! ভগবান্ করুন, আমাদের এই পুলক—এই প্রীতি যেন অমর হইয়া থাকে! গত বৎসরে আমাদের কর্ণ পাপের কথা শুনিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; নববর্ষের শুভ বোধন মুহূর্ত্তে আমরা ভগবৎপদে প্রার্থনা করি—যেন আমরা আর এ জীবনে পাপ-কাহিনী শ্রবণ না করি, যেন মঙ্গলবাণী শুনিয়াই জীবন ধন্য করিতে পারি। গত বৎসর আমাদিগকে বহু অমঙ্গল দৃশ্য দেখাইয়াছে, ভগবান্ করুন, আর যেন আমরা জীবনে সেরূপ বীভৎসদৃশ্যের সন্নিহিত না হই। জীবন ভরিয়া মঙ্গলবীক্ষণেই যেন নিযুক্ত থাকি। গত বৎসরে আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও শরীর রোগজ্বালা বেদনা-যাতনায় বিপন্ন ও বিড়ম্বিত হইয়া পড়িয়াছে, আমরা ক্লান্তিহীন ও শান্তিহীন হইয়াছি; এবার যেন করুণাময়ের অপার করুণাসঞ্জীবনরসে আমাদের জ্বালা নিবিয়া যায়, মঙ্গল হস্তস্পর্শে বেদনাযাতনার অবসান হয়, কৃপাশীর্ব্বাদ লাভে আমাদের দীপ্তি ও শান্তি বর্দ্ধিত হয়। অতঃপর যেন জগন্মঙ্গলের সাধনায় আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়।

যাঁহার কল্যাণকর অঙ্গুলীহেলনে সমস্ত সংসার নিয়মিত হইতেছে, তাঁহারই কৃপা-প্রাচুর্য্যে শাস্ত্র সমাজ সেবিকা হিন্দুপত্রিকা আজ অষ্টাদশবর্ষে পদার্পণ করিল। এ যাবৎ যাঁহার অনুগ্রহে হিন্দুপত্রিকা জীবন ধারণ করিয়াছে, এখনও সেই অনন্তশক্তিশালীর শ্রীভগবানের উপরই ইহার জীবনভার সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত রহিল। যেমন সমষ্টিদৃষ্টিতে ঐশীসত্তা—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি নানারূপে জগৎপালন করিতেছেন, আবার ব্যষ্টিদৃষ্টিতে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ সকলেই সেই মহাশক্তিদ্বারা পরিচালিত হইয়া জগৎ রক্ষা করিতেছেন, সেইরূপ সমষ্টিদর্শনে একই পরমেশ্বর গ্রাহক, অনুগ্রাহক, প্রবন্ধলেখক, পৃষ্ঠপোষক প্রভৃতি নানারূপে হিন্দুপত্রিকার মঙ্গল করিতেছেন, আবার ব্যষ্টিদর্শনে গ্রাহক, অনুগ্রাহক, প্রবন্ধলেখক পৃষ্ঠপোষক প্রভৃতি মহোদয়গণ সেই মহাশক্তিপ্রণোদিত হইয়াই হিন্দু-পত্রিকার মঙ্গল করিতেছেন। নববর্ষারম্ভে আমরা সর্ব্বাগ্রে সমষ্টিরূপী পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া, ব্যষ্টিরূপি-গ্রাহক, অনুগ্রাহক, প্রবন্ধলেখক, পৃষ্ঠপোষক প্রভৃতি মহাশয়গণকে যথাসম্ভব অভিবাদন সম্ভাষণ, নমস্কার প্রভৃতি জ্ঞাপন করিতেছি।

নববর্ষে নবোদ্যমে আমরা আবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। এবারও যেন পূর্ব্ববৎ সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে ভগবৎকৃপা আমাদের সহায় হয়। হিন্দুশাস্ত্র প্রচার ও হিন্দুসমাজসেবা হিন্দুপত্রিকার প্রধান লক্ষ্য; ঐ লক্ষ্যসাধনে শ্রীভগবান্ আমাদের একমাত্র সহায়। আমরা যথাসাধ্য পুরুষকারের সেবা করিতে পারি বটে, কিন্তু মূলতঃ দৈববলই সার সম্বল; সেই দৈববলের উপসনাই আমাদের প্রধান পুরুষকাররূপে গণ্য হউক। আমরা যেন ভবিষ্যতে এই মহাসত্য বিস্মৃত না হই, আর যেন এই মহাব্রত অকপটে উদ্‌যাপন করিয়া কৃতার্থ হই এবং হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুসমাজের সেবায় যেন আমাদের স্বল্পশক্তি, অল্প আয়োজন ও অকিঞ্চিৎকর কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রেমের শেষবিন্দু পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া ধন্য হই, ইহাই ভগবৎপদে প্রার্থনা। ওঁ শান্তিঃ।

দেবস্তুতি।

নতাঃ স্ম তে নাথ পদারবিন্দং
বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণমনোবচোভিঃ।
যচ্চিন্ত্যতেঽন্তর্হৃদি ভাবযুক্তৈ-
র্মুমুক্ষুভিঃ কর্ম্মময়োরুপাশাৎ ॥ ১

অন্বয়ঃ—হে নাথ! কর্ম্মময়োরুপাশাৎ মুমুক্ষুভিঃ ভাবযুক্তৈঃ অন্তর্হৃদি যৎ চিন্ত্যতে তৎ তে পদারবিন্দং বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণমনোবচোভিঃ বয়ং নতাঃ স্ম।

বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণমনোবচোভিঃ—বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিভির্দর্শনাদিনা প্রাণেন চ বলক্তেতুনা দণ্ডবৎ-প্রণিপাতেন; বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বচন দ্বারা যথাহুঃ—

'দোর্ভ্যাং পদাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ।

বাহু, পদ, জানু, বক্ষ, মস্তক, চক্ষু, মন ও বাক্য এই কয় ইন্দ্রিয়-সমাশ্রয়ে প্রণামকে অষ্টাঙ্গ-প্রণাম বলে।

বয়ং নতাঃ—আমরা নমস্কার করিতেছি।

স্ম——বিস্ময়ে।

উরুপাশাৎ——দৃঢ় বন্ধন হইতে;

বঙ্গানুবাদ—দেবগণ কহিলেন, নাথ! কর্ম্মময় দৃঢ়পাশ হইতে মুক্তি ইচ্ছা করিয়া ঋষিগণ হৃদয়মধ্যে যাহা চিন্তা করেন, আমরা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বচন দ্বারা আপনার সেই চরণকমলে প্রণাম করি।

তাৎপর্য্যার্থ—দ্বারকায় ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, দেবাদিদেব শ্রীকৃষ্ণ অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সুখ, সমৃদ্ধি ও অদ্ভুত লীলা সহকারে দ্বারাবতীতে রাজত্ব করিতেছেন, তিনি মনোরম দেহধারণ করিয়া লোকমধ্যে সর্ব্বপাপনাশক যশোবিস্তার করিয়াছেন। কোন সময়ে ব্রহ্মা, তাঁহার পুত্রগণ, দেবগণ ও ভূতগণে পরিবেষ্টিত সর্ব্বমঙ্গলময় শঙ্কর, মরুদ্গণের সহিত ইন্দ্র, আদিত্যগণ, বসুগণ, অশ্বিযুগল, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাগণ, নাগগণ, সিদ্ধচারণ ও গুহ্যকগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, বিদ্যাধর ও কিন্নরগণ সকলে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য দ্বারকায় আগমন করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে মনোরম তনু লইয়া অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন ও সর্ব্বলোকের পাপনাশক যশোবিস্তার করিয়াছিলেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ তাহাই দর্শন করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বহুবিভূতিশালী সেই দ্বারাবতী নগরীতে অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণকে অতৃপ্তনয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন এবং স্বর্গোদ্যানস্থিত মাল্যদানে যদুবরের অদ্ভুত তনু আবৃত ও পরিশোভিত করিয়া সুসঙ্গত ও অর্থসম্পন্ন বাক্যে জগদীশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন।

ত্বং মায়য়া ত্রিগুণয়াত্মনি দুর্বিভাব্যং
ব্যক্তং সৃজস্যবসি লুম্পসি তদ্গুণস্থঃ।
নৈতৈর্ভবানজিত কর্ম্মভিরজ্যতে বৈ
যৎ স্বে সুখেঽব্যবহিতেঽভিরতোঽনবদ্যঃ ॥২

অন্বয়ঃ—হে অজিত! ত্বং ত্রিগুণয়া মায়য়া তদ্গুণস্থঃ সন্ আত্মনি (ত্বয়ি) দুর্বিভাব্যং ব্যক্তং সৃজসি অবসি লুম্পসি, তু এতৈঃ কর্ম্মভিঃ অপি ভবান্ ন অজ্যতে, যৎ ভবান্ অনবদ্যঃ, স্বে অব্যবহিতে সুখে অভিরতঃ।

তদ্‌গুণস্থঃ—তস্যাঃ মায়ায়া গুণেষু নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতঃ।

ব্যক্তং—মহদাদি প্রপঞ্চং ;

অবসি—পালয়সি,

লুম্পসি—সংহরসি

অজ্যতে—লিপ্যতে,

দুর্বিভাব্যং—মনসাপি অবিতর্ক্যম্,

স্বে—আত্মরূপে,

অব্যবহিতে—অনাবৃতে,

অনবদ্যঃ—রাগাদিরহিতঃ

বঙ্গার্থ—হে অজিত! আপনি মায়াগুণে অবস্থিতি করিয়া ত্রিগুণা মায়া দ্বারা আপনাতেই এই অবিচিন্তনীয় জগৎ-প্রপঞ্চ-সৃষ্টি পালন ও সংহার করিয়া থাকেন; অথচ এই সকল কর্ম্মের সহিত আপনার কিছুমাত্র সংলেপ নাই, কারণ আপনি রাগাদিদোষশূন্য, আপনি নিরাবরণ ও সতত আত্মসুখে অভিরত।

শুদ্ধি র্নৃণাং ন তু তথেড্য দুরাশয়ানাং
বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়ন-দান তপঃ-ক্রিয়াভিঃ
সত্ত্বাত্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধ-
সচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রবণসংভৃতয়া যথা স্যাৎ ॥ ৩

অন্বয়ঃ—হে ইড্য হে ঋষভ! সত্ত্বাত্মনাম্ তে যশসি শ্রবণসংভৃতয়া সচ্ছ্রদ্ধয়া যথা শুদ্ধিঃ স্যাৎ, দুরাশয়ানাং নৃণাং বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদান-তপঃ ক্রিয়াভিঃ শুদ্ধিঃ তথা ন স্যাৎ।

দুরাশয়ানাং—রাগিনাম্ ;

বিদ্যা—উপাসনা ;

সত্ত্বাত্মনাং—সতাং ;

শ্রবণসংভৃতয়া—শ্রবণেন পরিপুষ্টয়া ;

প্রবৃদ্ধসচ্ছ্রদ্ধয়া—অভিবৃদ্ধয়া সচ্ছ্রদ্ধয়া ;

বঙ্গার্থঃ—হে পূজ্য ;, হে শ্রেষ্ঠ! আপনার যশঃশ্রবণে পরিপুষ্টা ও পরিবর্দ্ধিতা উত্তমা শ্রদ্ধা দ্বারা সাধুগণ যে প্রকার (চিত্ত-) শুদ্ধি লাভ করেন, বিদ্যা, শ্রুত, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা ও কর্ম্মেতে আসক্ত পুরুষগণ সে প্রকার শুদ্ধিলাভে সমর্থ হন না।

স্যান্নস্তবাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়-ধূমকেতুঃ
ক্ষেমায় যো মুনিভিরার্দ্রহৃদোহ্যমানঃ।
যঃ সাত্বতৈঃ সমবিভূতয় আত্মবদ্ভি
র্ব্যূহে২র্চ্চিতঃ সবনশঃ স্বরতিক্রমায় ॥ ৪

অন্বয়ঃ—তব অঙ্ঘ্রিঃ নঃ অশুভাশয়-ধূমকেতুঃ স্যাৎ ; যঃ (অঙ্ঘ্রিঃ) ক্ষেমায় মুনিভিঃ আর্দ্রহৃদা উহ্যমান, যঃ সাত্বতৈ সমবিভূতয়ে সবনশঃ অর্চ্চিতঃ।

নঃ—অস্মাকম্।

অশুভাশয়ধূমকেতুঃ—অশুভাশয়ানাং বিষয়-বাসনানাং ধূমকেতুঃ তদ্দাহকঃ;

ক্ষেমায়—মোক্ষায় ;

মুনিভিঃ—মুমুক্ষুভিঃ ;

আর্দ্রহৃদা—প্রেমার্দ্রহৃদা ;

উহ্যমানঃ—চিন্ত্যমানঃ ;

সাত্বতৈঃ—ভক্তৈঃ ;

সমবিভূতয়ে—সমানৈশ্বর্য্যায় ;

ব্যূহে—বাসুদেবাদিব্যূহে ;

আত্মবদ্ভিঃ—ধীরৈঃ ;

স্বরতিক্রমায়—স্বর্গমতিক্রম্য বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তয়ে ;

সবনশঃ—ত্রিকালম্ ;

হে ঈশ্বর! মুনিগণ প্রেমার্দ্রহৃদয়ে আপনার যে চরণযুগল বহন করিয়া থাকেন, ভক্তেরা সদৃশ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া যে চরণ বাসুদেবাদি-ব্যূহে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন এবং ধীরব্যক্তিগণ স্বর্গলোভ পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির জন্য যে চরণযুগল

ত্রিকাল অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই চরণ-যুগল আমাদের বিষয়বাসনা দগ্ধ করুক।

যশ্চিন্ত্যতে প্রযতপাণিভিরধ্বরাগ্নৌ
ত্রয্যা নিরুক্তবিধিনেশ হবির্গৃহীত্বা।
অধ্যাত্মযোগ উত যোগিভিরাত্মমায়াং
জিজ্ঞাসুভিঃ পরমভাগবতৈঃ পরীষ্টঃ॥ ৫

অন্বয়ঃ—প্রযতপাণিভিঃ অধ্বরাগ্নৌ হবিঃ গৃহীত্বা ত্রয্যা নিরুক্তবিধিনা যঃ ঈশঃ চিন্ত্যতে উত অধ্যাত্মযোগে যোগিভিঃ যঃ চিন্ত্যতে, আত্মমায়াং জিজ্ঞাসুভিঃ পরমভাগবতৈঃ যঃ পরীষ্টঃ (স তব অঙ্ঘ্রিঃ নঃ অশুভাশয়-ধূমকেতুঃ স্যাৎ)

হবিঃ গৃহীত্বা—হবিঃগ্রহণপূর্ব্বক;
অধ্বরাগ্নৌ—আহবনীয় প্রভৃতি যজ্ঞাগ্নিতে।
ত্রয্যা নিরুক্তেন বিধিনা—বেদ বেদাঙ্গ-কথিত বিধিসম্মতরূপে;
অধ্যাত্মযোগে—আত্মাধিকারযোগে;
যোগিভিঃ—যোগীগণকর্তৃক;
আত্মমায়াং জিজ্ঞাসুভিঃ পরমভাগবতৈঃ—অণিমাদিকামী মুক্তপুরুষগণ কর্তৃক
যঃ ঈশঃ—যে মহাপুরুষ;
পরীষ্টঃ—সর্ব্বতোভাবে পূজিত হন।

সংযতহস্ত যাজ্ঞিকগণ হবিঃগ্রহণ পূর্ব্বক বেদোক্তবিধি অনুসারে যাঁহাকে চিন্তা করিয়া থাকেন; আত্মাধিকারযোগে যোগীগণ যাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন, ও অণিমাদিপ্রার্থী মুক্তপুরুষগণ যাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে পূজা করিয়া থাকেন, সেই মহাপুরুষের চরণকমল আমাদের বিষয়বাসনা সমূহ বিনাশ করুক।

শঙ্করসেবক
ভারতী শতানন্দ।

ঋষি-সভার বিবরণ।

শিবনিকেতন কৈলাস আজ অশিব-শঙ্কায় শঙ্কিত! শান্তিময় নীরবতা-সমুদ্রে আজ অশান্তির কল্লোল-কোলময় দুই চারিটী তরঙ্গ অঙ্গপ্রকাশ করিতেছে। শিশির-স্নাত নবপল্লবকুঞ্জে আ'জ স্ফুলিঙ্গকণার আবির্ভাব! বুঝিলাম না "কেন?"

অনুগ্রহ, কৃপা, প্রেম, পরার্থপরতা মহা-প্রাণতা জলদরবে প্রত্যুত্তর দিল—"আমরাই ইহার কারণ, আমরাই বলিব "কেন?" কেবল যে আজ এখানেই আমরা এ 'কেন?'র উত্তর দিতেছি এমন নয়, অনাদিকাল হইতেই আমরা এমন কোটী 'কেন'র প্রত্যুত্তর দিয়া মানব-জ্ঞানগ্রন্থের কোটী অধ্যায় প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। আমরাই অন্ধকারময় অরণ্যপথে মানব চক্ষুর সমক্ষে উজ্জ্বল আলোকবর্ত্তিকা উপস্থিত করিয়া থাকি; আমরাই সাগরবক্ষে ভাসমান মানবের সম্মুখে ভেলা স্থাপন করি; আমরাই আর্ত্ত মুমূর্ষু'র শয্যাপার্শ্বে সঞ্জীবন ঔষধ লইয়া বসিয়া থাকি। ইহা আমাদের অভ্যাস, ইহাতেই আমাদের সফলতা, ইহার জন্যই আমরা। আমরা যতক্ষণ না উপস্থিত হই, ততবেলা লোক 'কেন?' লইয়া বাস করে, আমরা যেই যাই, সেই 'কেন' আপনি চলিয়া যায়; কারণ এ সংসারের অধিকাংশ 'কেন'র উত্তর—আমরা। আজও আমরা এক অসাধ্য-সাধনের আয়োজন করিতেছি।"

এ উত্তর শুনিয়া আর 'কেন'র প্রতি

মমতা থাকিল না। 'কেন' গেল, 'কি' ও "কেমন" আসিয়া দাঁড়াইল। 'কি' বলিল, "অসুমৎ প্রভৃতির মূর্ত্তিস্বরূপ মহর্ষিগণ আজ জীব-দুঃখ-মোচনের উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত। ভগবান্ পুনর্ব্বসুর পদতলে সমবেত হইয়া তাঁহারা জীবের রোগ ভোগের কারণ নির্ব্বাচন করিতেছেন। অচেনা-অজানা জিনিষেই আমার বাহাদুরী; সে সুবিদিত বিষয়ের চর্চায় আমার স্থান নাই, কাজেই আমি বিদায় লইলাম।" 'কি' চলিয়া গেল।

'কেমন' আরম্ভ করিল—"সে এক বিরাট্ ব্যাপার। ঋষিগণের মহতী সভা। কাশীরাজ তথায় উপস্থিত হইয়া বিহিত শিষ্টাচার-সহকারে বলিলেন—"পুরুষ যাহা হইতে উৎপন্ন, পুরুষের রোগও কি তাহা হইতেই জন্মে?" কাশীরাজের প্রশ্ন শুনিয়া ভগবান পুনর্ব্বসু ঋষিবর্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন—আপনারা সকলেই তপস্যা-প্রভাবে নিঃসংশয় এবং অমিতজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, কাশীরাজের সংশয়-নিরাস আপনারাই করিবেন।

ঋষিপ্রবর মৌদ্‌গল্য বলিলেন—আত্মা হইতেই পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছে, আত্মাই রোগের কারণ। আত্মা কর্ম্ম সঞ্চয় ও কর্ম্মফল ভোগ করেন। আত্মা চৈতন্যময়, চৈতন্য ব্যতীত সুখদুঃখের অনুভব বা আগম সম্ভবেনা। দুঃখরূপ রোগ সুতরাং আত্মা হইতেই জন্মে।

ঋষিরাজ শরলোমা কহিলেন—মৌদ্‌গল্য ঋষির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি না। আত্মা স্বভাবতই দুঃখদ্বেষী, আত্মা কখনই প্রতিকূল-সম্বেদন দুঃখ আনিয়া নিজেকে ক্লেশাতুর করিতে চাহেন না। মনই রোগের প্রকৃত কারণ, মন রজস্তমঃ-পরবশ হইয়া শরীর ও রোগ উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে। মনই এই অশুভফলের নিদান।

বার্য্যোবিদ বলিলেন—শরলোমার উক্তিতে সারবত্তা নাই; কারণ মন একাকী কারণ হইতে পারে না, শরীর ব্যতীত মনের স্থিতিই অসম্ভব। শরীর মনের আশ্রয়স্থান। শরীরাশ্রয়েই রোগসমূহ বিকাশ পায়। আমার বিবেচনায় রস হইতে ভূতবর্গ ও ব্যাধি প্রভৃতি উপসর্গ আবির্ভূত হয়। ঐ রস জলে বিরাজিত, সুতরাং জলই রোগের নিদান।

হিরণ্যাক্ষ বলিলেন—আত্মা কখনও রস হইতে উৎপন্ন হন না। অতীন্দ্রিয় মন ও রস হইতে জন্মে না। পক্ষান্তরে শব্দাদি হইতে রোগের আবির্ভাব অনুভূত হয়। শব্দাদি পঞ্চগুণের সমবায়-স্বরূপ আকাশাদি পঞ্চভূত এবং আত্মা এই ষড়্‌ধাতু হইতেই রোগসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রাচীন তত্ত্বদর্শিগণ 'পুরুষ'কে ষড়্‌ধাতুজ বলিয়াছেন। পুরুষের উৎপত্তি-কারণ ও রোগের উৎপত্তি-কারণ একই, এ সিদ্ধান্ত কখনও ভ্রান্তির ছায়া স্পর্শ করে না।

অতঃপর শৌনক কহিলেন—হিরণ্যাক্ষের মত সত্য নহে। পিতৃশক্তি-মাতৃশক্তিই রোগের কারণ, উহা ইন্দ্রিয় দেহাত্মমনঃ-সমষ্টিরূপ পুরুষেরও উৎপত্তির নিদান। পিতৃমাতৃশক্তির কারণতা কেবল কল্পনার কথা নয়, প্রত্যক্ষ-পরিদৃষ্ট পরীক্ষাপূত তত্ত্ব। পিতা মাতা ছাড়িয়া কেবল ষড়্‌ধাতু হইতে পুরুষের জন্ম হইতেই পারে না। দেখা

যায়—মানবমানবী হইতে মানবমানবী জন্মে। ঘোটকঘোটকী হইতে ঘোটক বা ঘোটকী জন্মিয়া থাকে। পিতামাতার আকারপ্রকার বুদ্ধি-শুদ্ধি, ভাব-ভক্তি রোগ পর্য্যন্তও সন্তানসন্ততিতে প্রকাশ পায়। সুতরাং বলা যায়—পিতামাতা রোগের কারণ এবং শরীরেরও মূল।

ভদ্রকাপ্য বলিলেন—শৌনক সত্যের সম্মুখীন হইয়াছেন, কিন্তু সত্য প্রাপ্ত হন নাই। পিতামাতাই যদি শরীর ও রোগের কারণ হন, তবে অন্ধ-পিতামাতার সন্তান অন্ধ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা হয় না। কর্ম্মই সকলের মূলাধার। পিতামাতার অন্ধতা সন্তানে আসিল না, কর্ম্মফলজন্য দৃষ্টিশক্তিরই বিকাশ হইল। কর্ম্মই রোগের নিদান, কর্ম্মই শরীর সৃষ্টি করে। কর্ম্মশক্তির প্রত্যক্ষ ফল উপলব্ধি করিয়া কি রূপে এমতে অনাদর প্রদর্শন করা যায়?

অনন্তর কুমারশিরা ভরদ্বাজ কহিলেন—কর্ম্মকে মূল-কারণ বলা যায় না, কারণ কর্ম্মের স্বতন্ত্রতা নাই। কর্ম্ম স্বয়ং আবির্ভূত হয় না। কর্ত্তার ব্যাপার হইতেই কর্ম্মের স্বরূপলাভ ঘটে। এক দৃশ কর্ম্ম কুত্রাপি দেখা যায় না, যাহা হইতে পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিতে পারে; বরঞ্চ ইহার বিপরীত প্রতীতিরই প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরুষ হইতে কর্ম্ম আবির্ভূত হয়, সুতরাং কর্ম্ম পুরুষের কারণ নয়, পুরুষই কর্ম্মের কারণ। আমার মতে রোগের কারণ 'স্বভাব'। দ্রব্য সমূহের জন্মকারণও স্বভাব। ক্ষিতি, জল, বায়ু প্রভৃতি ভূতের খরদ্রবত্ব-প্রভৃতি গুণ স্বভাববশতই প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই রূপ পুরুষেও স্বভাববশে রোগ-সমূহ আবির্ভূত হয়।

ঋষি প্রবর কাঙ্কায়ণ বলিলেন—পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন-যোগ্য নহে; কারণ, আরম্ভ কখনই ফল হইতে পারে না। কর্ম্মফল কখনই কর্ম্ম হইতে পারে না। শুভাশুভ কর্ম্ম জন্মস্বরূপ কর্ম্মের ফল হইতে পারে না। স্বভাব প্রকৃত-প্রস্তাবে কিছুরই কারণ হইতে পারে না। স্বভাবে বৈচিত্র্য থাকা সঙ্গত নয়। স্বভাবতঃ পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে, আবার নাও পারে। স্বভাবের নিরূপণ দুঃসাধ্য। স্রষ্টা প্রজাপতিই চেতনাচেতন জগৎ এবং সুখদুঃখের একমাত্র কারণ। শরীরও তাঁহারই সৃষ্ট, দুঃখও তাঁহারই সৃষ্ট, দুঃখময় রোগ শোকও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভিক্ষু আত্রেয় বলিলেন—কাঙ্কায়নের মত অসত্য। ইহাতে প্রজাপতির অভিসন্ধিতে দোষারোপ করিতে হয়। প্রজাপতি যদি জীবজাল সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের জন্য দুঃখের--রোগের--অশান্তির ব্যবস্থাই করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে কুটিল শঠ ও প্রবঞ্চক বলিতে হয়, প্রজাহিতৈষী—শান্তিদাতা—জগৎপাতা বলা চলে না; বস্তুতঃ ইহা একেবারেই অসম্ভব। স্বহস্তে যদি কেহ বিষবৃক্ষও রোপণ করে, তবে সে যতই নির্দ্দয় হউক না কেন, কদাচিৎ স্বহস্তে তাহা ছেদন করিতে পারে না। বিশ্বপালক প্রজাপতির এত সাধের জীবজগৎ দুঃখের তাড়নায় অনবরতঃ অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে, রোগযাতনায় অবিশ্রান্ত রোদন করিবে, আত্মনাশের আয়োজন করিবে, সম্বন্ধিস্বজন

বন্ধুবান্ধব 'হায়! হায়!' করিয়া প্রতি পলে সহস্র বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালা অনুভব করিবে;—এই বিষাদময় চিত্র কি স্রষ্টা স্বহস্তে আঁকিতে পারেন? কখনই নয়। আমার বিবেচনায় কালই সকলের মূল, জন্তুগণের জনক ও জগতের আশ্রয়স্থল। কালে জীব জন্মে, কালে বর্দ্ধিত হয়, আবার কালের কবলে বিলীন হয়, কালধর্ম্মেই রোগ আবির্ভূত হয়, কালেই তাহার পারদর্শন ঘটিয়া থাকে।

ঋষিগণের এতাদৃশ বিসম্বাদ-বহুল বিচার-প্রপঞ্চ শ্রবণ করিয়া দয়াপর ভগবান্ পুনর্ব্বসু বলিলেন—এরূপ বিচারচর্চায় অনন্ত-কালেও প্রকৃত সত্যের সন্দর্শনলাভ ঘটিবে না; তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। প্রত্যক্ষানুভব ব্যতীত কোনও সত্যই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। অন্ধকারে যাহারা নিপুণভাবে বিচরণ করে, তাহারা যতই বুদ্ধিমান্ হউক্ না কেন, কিছুতেই যথার্থ সত্য অবধারণ করিতে পারে না। সত্য আংশিকরূপেই তাহাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করে। পূর্ব্বোক্ত মতসকলে কিছু কিছু সত্য আছে, কিন্তু উহার একটীও পূর্ণ সত্য নহে।

কর্ম্ম অচেতন, স্বভাবও জড়, আত্মা চেতন, কিন্তু অমূর্ত্তসত্তা; রসাদি ত সম্পূর্ণই অচেতন; কালও অমূর্ত্ত; ইহারা কেহই যথার্থ কারণ নয়। জড়ের কর্ত্তৃত্ব নাই; চেতনও নিজেকে দুঃখযুক্ত করিতে চাহে না।

সুখদুঃখের নিয়ন্তা ভগবান্, কিন্তু সুখদুঃখ—বস্তুর ব্যবহার-ভেদেই ঘটিয়া থাকে। কোনও বস্তু স্বভাবতঃ সুখকর বা দুঃখদায়ক নহে। ব্যবহার-ভেদেই ফলভেদ হয়। যে বিষ মুহূর্ত্তমধ্যে মরণ আনয়ন করে, তাহাও ব্যবহার-ভেদে মুমূর্ষু রোগীর জীবনদানে সহায়তা করে। যে মধুর রস স্বভাবতঃ রসনার পরম প্রেমপাত্র, বলকর, বীর্য্যবর্দ্ধক ও বহুগুণান্বিত, তাহাও অতিমাত্রায় উপভোগে বিষক্রিয়া করে; অতীসারাদি রোগ আনয়ন করে। যে ঔষধ আসন্নমৃত্যু রোগীর সহায়-স্বরূপে মহিষবাহনের সহিত সম্মুখ সংগ্রাম করিয়া থাকে, তাহাও নীরোগ শরীরে প্রয়োগ করিলে অস্বাস্থ্য আনয়ন করে—অবস্থা-বিশেষ মরণের সেনাপতিত্ব করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। যে সকল দ্রব্য যে ভাবে ব্যবহার করিলে হিতকর হয়, তাহারাই বিসদৃশ-ব্যবহারের ফলে রোগের কারণ হইয়া থাকে। এক কথায়—হিতকর-ব্যব-হারবর্জ্জন ও অহিতকর-ব্যবহার-প্রবর্ত্তনই রোগের কারণ। প্রকৃতির রক্ষিণী শক্তি ক্ষুব্ধা হইলেই রোগ জন্মে। রক্ষিণী শক্তির সংক্ষোভের একমাত্র হেতু বিষম-ব্যবহার।

ভগবান্ পুনর্ব্বসুর যুক্তিযুক্ত বাক্যাবলী শ্রবণে পরম পুলকিত হইয়া কাশীরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুখজাত পুরুষের বিপজ্জাত রোগ যে কারণে উৎপন্ন হয়, তাহা সূক্ষ্ম ভাবে নির্ব্বাচন করিলে কৃতার্থ হই।"

ভগবান্ আত্রেয় পুনর্ব্বসু প্রত্যুত্তর দিলেন—'কে সুখী', ইহা সূক্ষ্মভাবে স্থির করিলে যেমন 'কে অসুখী'? এ প্রশ্নের উত্তর স্বতই প্রদত্ত হয়, তদ্রূপ 'কীদৃশ ব্যক্তি নীরোগ'? ইহা যথার্থরূপে নির্ণয় করিলেই, 'কীদৃশ ব্যক্তি রোগী' ইহা বলা হইয়া যায়।

সেহ. কৌশলেই বলিতে পারি—হিতভুক্ ও মিতভুক্ ব্যক্তিই নীরোগ। আর অহিতভুক্ ও অমিতভুক্ ব্যক্তি যে রোগী, ইহা এতদ্দ্বারা স্পষ্টরূপেই নির্দ্দেশ করা হইল।

ভগবান্ আত্রেয়ের বাক্য শ্রবণকরিয়া অগ্নিবেশ বলিলেন—হিতকর বা অহিতকর আহার কিরূপে সুস্পষ্টরূপে স্থিরকরা যায়? মাত্রা, দেশ, কাল, দেহ, ক্রিয়া, দোষ ও পুরুষের অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অহিতকারিত্ব বা হিতকারিত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে; বিশেষ ব্যাখ্যা ব্যতীত তাহা অবগত হইবার উপায় কি?

ভগবান্ পুনর্ব্বসু প্রচার করিলেন—যে সমস্ত আহার সমতাপন্ন শারীরধাতুসকলকে প্রকৃতিস্থ করে, আর বিষমদশাপ্রাপ্ত শারীরধাতু-সমূহকে সমতাপন্ন করে, তাহাই পুরুষের পক্ষে হিতকর আহার; আর যদ্দ্বারা ইহার বৈপরীত্য ঘটে অর্থাৎ সমতাপন্ন শারীরধাতু যাহাদ্বারায় বৈষম্যপ্রাপ্ত হয়, এবং বৈষম্যপ্রাপ্ত ধাতুর বৈষম্য রক্ষিত বা সংবর্দ্ধিত হয়, নিবারিত হয় না, তাহাই অহিতকর আহার। এরূপে সংক্ষেপে নির্ণয় করা যাইতে পারে।

অতঃপর "কেমন" একটু "কেমন কেমন"! হইয়া বলিল—মহাশয়! আমি এই পর্য্যন্ত ধৈর্য্যধারণ করিয়াছিলাম। ইহারপর আর শুনিতে পারিলাম না। ভগবান্ পুনর্ব্বসু—অতঃপর কোন্ দ্রব্য হিতকর, কোন্ দ্রব্য অহিতকর—ইহার বিস্তৃত তালিকা পাঠ করিতে লাগিলেন। সেটা আমার রুচিকর হইল না, তাই চলিয়া আসিলাম। এখন বিদায় হই।"

'কেমন' অদৃশ্য হইল! আমি শ্রীভারতীয় জীব এক মহাসমস্যায় পড়িলাম। জগতের রোগশোক—তবে কেবল ব্যবহারবৈপরীত্যের কুফল! হিতাহারই তবে স্বাস্থ্যসুখের নিদান! হায়! একথা ত আমিও এককালে বুঝিনাই। কেবল আমি কি? এরূপ 'অনেক আমি' একথা একেবারেই বুঝেনা বা ভাবেনা! যদিও কেহ কদাচিৎ বুঝে, তার পরক্ষণেই লোভ-মহাশয় সদলবলে আসিয়া সে 'বালির বাঁধ' ভাসিয়া দিয়া যান। আবার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় হিতাহিত বিচার ছাড়িয়া, যাহা রুচিকর বোধহয় তাহাই গ্রহণ করে। লোভ এড়াইতে না পারিলে, হিতকর আহারের কথা শুনিয়া আদৌ লাভ নাই। যাহা হউক্ একথাটা যদি অন্ততঃ মাঝে মাঝে মনেও উদিত হয়, তবে হয়ত লোকের আত্মরক্ষার একটু সুযোগ হইতেও পারে। সংসারে একথার প্রচার হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু এই রোগশোক-জরামৃত্যুময় সংসারের জীব আমি কিরূপে তাহা করিব! সহজ ব্যাপার নয়, অথচ না হইলেও ত নয়! জগতের এত রোগ—এত অশান্তির মূল ঐ "পোঁড়া পেটে"র মধ্যে, একথাটা না বলিয়াই বা পারা যায় কৈ? নিজে কতবার কতরোগে ভুগিয়াছি, সে সব দুঃখকাহিনী আজ স্মৃতির বলে প্রাণে জাগিয়া উঠিল। ভাবিলাম—আর নয়! সংসারে এই কথাটা বলিতে হইবে। যে রোগের স্মৃতির দংশন এত, তাহাদের আক্রমণ প্রকৃতপক্ষে কত ক্লেশকর!

যখন পুনর্ব্বসুঘোষিত মহাসত্য প্রচারের আয়োজন করিতেছি, তখন সহসা দেখিলাম ঋষিগণ পূর্ব্বেই সে কার্য্য সমাপন করিয়াছেন। তাঁহারা ভারতের জন্য এই মহাসত্য লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। বুঝিলাম, অনুগ্রহের অবতারস্বরূপ ঋষিগণই ইহার যথার্থ উপদেষ্টা, আমার ন্যায় স্বল্পজ্ঞ জীব নয়। অগত্যা নিরস্ত হইলাম। শেষে সিদ্ধান্ত করিলাম, ঋষিকুলের দ্বারা লিপিবদ্ধ সেই মহাসত্য বিশদরূপে তাঁহাদেরই ভাবে ব্যাখ্যা করিব, কিন্তু অবসরে।

শ্রীঃ—

চিন্তা-রহস্য।

বিশ্বাসক্ষেত্রে মানবজাতি যেভাবে ধর্ম্মবিজ্ঞান স্থাপন করিয়াছে, তাহার মূলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন না কোন এক ধর্ম্মপুস্তক বা ধর্ম্মমন্দির অবশ্যই বর্ত্তমান আছে এবং কালে তাহা হইতে কত অবান্তর উপনিষদ্, গস্পেল্, হদিস্ প্রভৃতি শাখা-প্রশাখা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। এই শাখাপ্রশাখাই বিস্তৃতভাবে মত-বিভিন্নতার কারণ হইয়াছে; আবার সেই কারণসকলের, অভ্রান্ততা প্রতিপাদন করিতে গিয়া তাহার প্রবক্তা বা ব্যাখ্যাতৃগণ যে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহার সারাবত্তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। ইহার মধ্যে আবার সাম্যবাদিরা এই মত সকলের পর যে সকল বিচিত্রভাব বিকাশ করিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই যত উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে; তাই দেখিতে পাই, প্রত্যেক পন্থায় ঐসকল বিশ্বাসক্ষেত্র একছত্রী হইয়া রাজত্ব করিতেছে। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি সহযোগে তুমি যতদুর কেন যাওনা—খুঁজিয়া পাতিয়া তোমার দৌড় ঐস্থানেই ধরা পড়িবে। কিন্তু, বিশ্বরাজ্যের নিয়ামক বিধাতার বিচিত্র প্রাকৃতিক নিয়ম কদাচ সেরূপ নহে। তাহা এক অনির্ব্বচনীয় প্রাকৃতি-শক্তির মধ্যদিয়া কোন এক মহীয়ান্ রাজ্যে উপনীত হইয়া কোন এক মহাশক্তির সন্ধান করে। তাহা কোন এক ধর্ম্মপুস্তকে আবদ্ধ থাকিলে, ভাবনার বিষয় আর কি ছিল?

ধর্ম্মপুস্তক-সকল যুগযুগান্তরের আকাঙ্খার মানচিত্রমাত্র; তাহাতে দৃষ্টিপাত করিলে যে অভিজ্ঞান লাভ করা যায়, বিশ্বাসীর হৃদয়ে কিন্তু তাহার ভাব সেরূপে প্রতিফলিত হয় না! সে সেই খানিত জলাশয়ের নির্ম্মল জল পান করিয়া তাহাতেই তৃপ্ত আছে এবং তাহা সহজলভ্য জ্ঞান করিয়া, নিজের সকল উদ্যম, উৎসাহ হারাইয়া শান্তিসুখ লাভ করিতেছে ভাবিয়া, ভ্রান্তিকূপে পতিত হইয়া রহিয়াছে। যিনি ভ্রান্তিকূপে পতিত তাহার সম্বন্ধেও যে কথা, আবার যিনি মানস-সরোবরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমোহিত তাঁহার সম্বন্ধেও তাই! মানস-সরোবরেরই শোভাময়ী শাখা-প্রশাখা—সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, শতদ্রু এবং গঙ্গা নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ আগুলীয়া ধরিয়া আজি ত্রিশকোটী মনুষ্যকে স্নান-পানে তৃপ্ত করিতেছে। সেই মানসসরোবরের পরিধি শতবর্গমাইল মাত্র;

উহা অগাধজলে পূর্ণ হইয়া না জানি কতকাল হইতে ভারতের সুখ-সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি করিতেছে! তাহার নিম্নতলে উপরোক্ত চারিটী মহানদী, আবার তাহাদের শত শত—সহস্র সহস্র শাখায় বিস্তারিত হইয়া জনসমাজের জীবন রক্ষা করিতেছে। আর্য্য-ঋষিগণ এই নদী-সকলের তীরভূমিতে অবস্থিতি করিয়া, তাহাদিগকে "দেবনদী" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাঁহারা এই নদীসকলের ধার ধরিয়া হিমাচলে উপনীত হইয়া প্রকাণ্ড হ্রদ মানসসরোবরের দর্শন পাইয়াছিলেন। সেই হ্রদের প্রসৃতি কতকগুলি উষ্ণপ্রস্রবণ। সেই উষ্ণপ্রস্রবণ সকল কিরূপে উদ্গত হইতেছে, তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিলে, তাঁহারা কৈলাশশিখরে উঠিতে গেলেন! তথা হইতে (সেই হ্রদ হইতে) তিনশত ফুট্ উঠিতে না উঠিতে তদুপরি আর একটী অপূর্ব্বহ্রদ নিরীক্ষণ করিলেন; তাহার নাম"রাক্ষসতাল"। রাক্ষস শব্দের অর্থ—রক্ষঃসম্বন্ধীয়; নিম্নস্তরের উষ্ণপ্রস্রবণ-সকল ইহার দ্বারাই রক্ষিত হইতেছে। এই রাক্ষস-তালের উপকূলে বিচিত্র বিহার সকল সন্নিবেশিত, যতিগণ তথায় বসিয়া মানস-সরোবরের সম্বন্ধে নিম্নস্থদিগের বিশ্বাস দেখিয়া হাস্য করিতেছেন! পাঠক! এতদূর আসিয়া তুমিও কি তাঁহাদের পদপ্রান্তে বসিয়া হাস্য করিতে পারিবে না? না, কখনই না! বিশ্বাসভূমি যেভাবে তোমার হৃদয়পটে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা মুছিয়াফেলা তোমার সাধ্য নহে। এই বিশ্বাস কি এক দিনের? না এক পুরুষের? ইহা যুগযুগান্তর হইতে গঙ্গা-সলিলের ন্যায় বংশ-পরাম্পরায় শোণিত-শুক্র ধরিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। তাহার পর জন্ম—জরা-মৃত্যু কতকাল তাহা পোষণ করিয়া প্রাণাপেক্ষা তাহাকে প্রিয়তর করিয়া রাখিয়াছে! তুমি তাহা ছাড়িতে পারিবে? কখনই না।

আরো এক কথা, ঐসকল বিসম্বাদি-বিশ্বাসের মূলে আরো কত বিচিত্রতা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে বীত-শ্রদ্ধ হইলেও, তাহার তুলনা অসীম! এমন রমণীয়তায় বিস্ময়কর, গৌরবে আকাশের ন্যায় উচ্চতর, চরিত্রে দেবোপম পবিত্র, মহিমান্বিত বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিতে কাহার সাহস হয়?

তাই বুঝিতেছি এই বিশ্বাসের মূল এতদূর পোষিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, তাহা উৎপাটন করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। দুইটী উপায়ে তাহার সাধ্য ও শক্তি অনুমিত হয়। প্রথম তাহার শক্তি—যাহাদ্বারা সমর্থিত হইয়া এই বিশ্বাসমহীরুহের প্রকাণ্ড-কাণ্ড গগনভেদী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বর্দ্ধিত হইয়া যাইতেছে কোথায়? দ্বিতীয়তঃ—তাহা কোন্ সময়ের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া কোন্ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এই অবাধ-ব্যবসায় চালাইতেছে? এই দুইটী প্রশ্নের সমাধান করিতে না পারিলেও দেখিব, কত-দূর অগ্রসর হইয়া চিন্তাশীলদিগের সহায়তা করিতে পারি।

পৃথিবীতে "মনুষ্যসমাজ" প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রথমে গ্রাম—নগরের পত্তন হয়। সেই গ্রামনগর হইতে অন্য গ্রামনগরের সহিত গতায়াতের সুবিধার জন্য যে, সাধারণ পথ নির্ম্মাণের প্রয়োজন হয়, তাহার আয়োজন লইয়া, এক কালে কত বিবাদই না

উত্থাপিত হইয়াছে! কেহই তাহার জন্য স্থান দিতে সম্মত নহে, সেজন্য কাহারও ওজর-আপত্তি কম নহে, কারণ সকলেরই তাহার জন্য কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার করিয়া নিজের নিজের ক্ষেত্রাংশ কাটিয়া দিতে হইতেছে; কিন্তু যখন পরস্পরের মধ্যে মেলামেশার প্রয়োজন, তখন তাহার জন্য পথ ছাড়িয়া না দিলে চলিবে কেন? পল্লীগ্রামবাসী লোকমাত্রেই দেখিয়াছেন যে, গ্রামে গ্রামে এই বিবাদ মীমাংসিত না হওয়ায়, লোকে ক্ষেত্রের আলে আলে শত ঘূর্ণী ঘুরিয়া গন্তব্য পথে গমন করিয়া থাকে। তথাপি দুই-চারি হস্ত ভূমি কেহ সাধারণের জন্য ছাড়িয়া দিতে চাহে না। ইহার কারণ কি? স্বার্থের সহিত পরার্থের অমিলন। এই স্বার্থ-পরার্থ লইয়া জনসমাজে যে কত অনর্থ ঘটিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। বহুকষ্টে এই সঙ্কীর্ণতা দূর করিবার জন্য, বাটী-ঘরের ভিত্তি স্বতন্ত্র করিতে হয়; এই দুই ভিত্তির ব্যবধানস্থলে যে স্থানটুকু পড়িয়া থাকে, তাহাকেই গ্রাম্যপথ বলে। এই গ্রাম্যপথ প্রথমে কেহ কাহাকে ছাড়িয়া দেয় নাই। তাহা কেবল উভয়পক্ষের পয়ঃপ্রণালী হইয়া বৃষ্টিধারা বহন করিত। প্রথমে তাহাই প্রয়োজন নিধায় যাতায়াতের পথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এক কালে গ্রামের লোক এই অলি-গলির পথে গমনাগমন করিয়া কত কষ্টই না ভোগ করিয়াছে! তাহার পর লোকানুরাগিতা, পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান বা ব্যবসায়ান্তর বা পরহিত-কামনা চরিতার্থ করিবার মানস যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, তত গৃহবাটিকার ভিত্তি-সংস্থাপনের শৃঙ্খলা বর্দ্ধিত হইতে থাকে; তত অলি-গলি প্রশস্ত হইতে থাকে; তত পয়ঃপ্রণালী পৃথক্ হইয়া পথ-ঘাট স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে, খামারে যাইবার জন্য পৃথক্ পথ নির্দ্দিষ্ট হয়; সাধারণের জন্য ক্ষেত্রাংশের যত অংশ প্রয়োজন হয়, রাজপথের জন্য যত স্থানের প্রয়োজন হয়, তাহা আহ্লাদের সহিত ছাড়িয়া দেয়। তখনই গ্রাম-নগরের সৌভাগ্য-রবির উদয় হইতে আরম্ভ হয়। এই উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন ভার-বহনের প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল, তখন অশ্ব, রথ, গজ, উষ্ট্র, বলীবর্দ্দ প্রভৃতি—এই যুগের বাহন-রূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল। দরিদ্র গৃহস্থ হইতে প্রাসাদবাসী নরপতিগণের যানবাহনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। সুপ্রশস্ত পথ ঘাট-রথ্যা, জলাশয়, পান্থনিবাস এই সমস্তের ঐশ্বর্য্য। কতকাল মানব এইরূপে অতিবাহিত করিয়া শুনিল—ওয়াট্ এবং ষ্টিফিনসন (Watt & Stiphinson) নামক দুই সামান্য ব্যক্তি জল উষ্ণ করিয়া এক প্রকার যন্ত্র চালাইতে শিখিয়াছে, তাহাতে জলপথে কি স্থলপথে বহুভার সঙ্গে লইয়া মনুষ্যেরা দূরপথে গমনাগমন করিতে পারিবে। যাহারা এত করিয়া বৃষ্টিধারা-প্রবাহিত অলি-গলী প্রশস্ত করিয়া পথ করিয়াছে, খামারে যাইবার পথ, রাজপথ করিয়া তুলিয়াছে, জঙ্গলের পশু ধরিয়া বশ করিয়া যানবাহনের সুবিধা করিয়াছে, তাহাদের চিন্তায় এরূপ আবিষ্কারের কথা স্থান পাইল না! সূর্য্যের রথে শত অশ্ব যোজিত, দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত হস্তী, আদিদেব শিবের বাহন বৃষ, বিষ্ণুর বাহন গরুড়, ব্রহ্মার বাহন রাজহংস, কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর, সিদ্ধিদাতা গণেশের বাহন মূষিক,

যমরাজের বাহন কুক্কুর, খ্রীষ্টের বাহন গর্দ্দভ, মোহম্মদের বাহন পক্ষযুক্ত-বোরাক—এইত জানি, এরা আবার এ কি বলিতেছে ? কোন শাস্ত্রে এরূপ যানবাহনের উল্লেখ আছে ? চিন্তা করিয়াও ইহাদের যুক্তি-সুযুক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে না, এখন ইহা প্রলাপবাক্য বৈ আর কি হইতে পারে ? কোন বিষয় সংস্কারমূলক হইয়া অভ্যস্ত হইলে; তাহার বিপরীত কথা আদৌ মনমধ্যে স্থান পাইতে পারে না; সুতরাং নূতন আবিষ্কৃত বিষয় বহুদূরে পড়িয়া নিষ্ফল হইয়া যায়, কিন্তু অধ্যবসায়ী মানুষের নিকট কোন কিছুই বাধাদিতে পারে না, বরং তাঁহাদিগের বলবত্তা বন্যার জলের ন্যায় অধিকতর বল প্রকাশ করিয়া চিন্তার বিলাস কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখায় । ষ্টীম্ এন্জিন্ (Steam Engine) চলিয়া গেল ! অশ্বরথ গজ উষ্ট্রের সহিত রথ্যাসকল কোথায় পড়িয়া রহিল ! সুতরাং পূর্ব্ব সংস্কারের সহিত সেই বহুকালের বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িল আবার এখন শুনা যাইতেছে, এতকাল যে বাষ্পযন্ত্র জলে স্থলে চলিতেছিল, এখন তাহা শূন্যপথে পরিচালিত হইতেছে। রাজপথ—রেলপথ নির্ম্মাণ করিবার জন্য, নদীনালা পার হইবার জন্য কত সেতু নির্ম্মাণ করিতে হয়, আবার বর্ষা-বৃষ্টিতে সেই সকল পথ নষ্ট হইয়া যায় ! তাহার সংস্কারে বিপুল অর্থ ব্যয় ও সময় নষ্ট করিতে হয়, আরোহিদিগকে তাহার জন্য বহু বিলম্ব সহ্য করিতে হয়। আকাশপথে এরূপ বিপদের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং যানবাহন সম্বন্ধে এ আবার তৃতীয় যুগ উপস্থিত। এখন ইহা মান আর না মান, উদয়োন্মুখ বিজ্ঞান তাহা কার্য্যে দেখাইয়া তবে ছাড়িবে কিন্তু, তাহা হইলেই কি মানুষের সুখসৌভাগ্যের শেষসীমা উপস্থিত হইল ? তাহা কদাচ নহে। বাষ্পযন্ত্র এতদিন লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ ভোজন করিয়া, পাহাড় জঙ্গল বৃক্ষশূন্য করিয়া ফেলিতেছে ; তাহা দেখিয়া পর্জ্জন্যদেব রুষ্ট হইয়া বৃষ্টিপাত বন্ধ করিয়া দিতেছেন, সেই কোপের প্রশমন—ইহা হইতে কিঞ্চিৎ হইবে বটে, কিন্তু শূন্যপথে চালিত বাষ্পযন্ত্রও অগ্নিভুক্, তাহার প্রণয়নে মঙ্গলরক্ষা হইল কৈ ? কাজে কাজেই আবার বিজ্ঞান-জগতে হুলস্থুল পড়িয়া গেল এবং চিন্তা প্রসারিত করিয়া, বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কার করিল। এই বৈদ্যুতিক শক্তি যে শক্তির সঞ্চার করিবে, তাহাতে বর্ত্তমান তৈল প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। জলে স্থলে আকাশে বিদ্যুৎপ্রবাহ বিস্তারিত হইয়া আলোকের পাশ স্বরূপ হইয়া অমানিশার অন্ধকার নষ্ট করিয়া গতিশক্তিপূর্ণ যানবাহনের কার্য্য করিয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে (work shops) বিবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু সৃজন করিবে। ট্রাম-বাইসিকিল মটর—যান পথে পথে চলিয়া বিজ্ঞানের বিচিত্র-লীলা চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত করিবে, অগ্নির শক্তি ক্রমে বিদ্যুতের ক্রীতদাস হইয়া রহিবে। তখন জগৎ শান্ত হইয়া আবার সৃষ্টিনিকেতনে নূতনভাবের সুখ সৌভাগ্য আনয়ন করিবে ; পূর্ব্বের সংস্কার-সকল বিজ্ঞান জলে বিধৌত হইয়া যাইবে। এখন কথা হইতেছে, অগ্নি ত সকল বস্তুতেই বর্ত্তমান, কিন্তু সেই অব্যক্ত অগ্নি সর্ব্বত্র ব্যক্ত হইয়া পড়িলে দিগ্দাহ হইতে থাকে, তাহাকেই লোকে

দাবানল কহে। ঐ অনল প্রকাশিত হইলেই মহদনিষ্ট উপস্থিত হয়। এতকাল এই বৈদ্যুতিক শক্তি অব্যক্ত থাকিয়া মেঘ, হইতে জল বাহির করিতেছিল, তাপ প্রবাহ বিক্ষিপ্ত করিয়া সকলবস্তু তরল রাখিতেছিল, শরীরযন্ত্রে চলায়মান থাকিয়া জীবনীশক্তিকে রক্ষা করিতেছিল, বায়ু-প্রবাহে বর্ত্তমান থাকিয়া শীতপ্রধান দেশে বরফ জন্মাইতেছিল, এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতসঞ্চার করিয়া কত জীবের প্রাণ-রক্ষা করিতেছিল, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? এখন এই অব্যক্ত বিদ্যুতাগ্নি ব্যক্তভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে জল বায়ু তাপ-রস রক্ত কি নিরাপদে থাকিবে? বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতরা একবার তাহা কি ভাবিতেছেন? শুনিয়াছি Xrays যে মহৎকার্য্য সাধন করিবার জন্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রকোপে পড়িয়া কত ডাক্তার প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে। এরূপে আগুনের খেলা খেলিতে গিয়া যে মহদনিষ্ট সম্মুখে উপস্থিত হইবে, ভাবিতে গেলে আতঙ্কিত হইয়া উঠিতে হয়।

পঞ্চাশদ্বর্ষ পূর্ব্বে হিমালয় প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া আমরা আটমাস অতি শীত ভোগ করিয়াছি, এখন সে ধারা কমিয়া আসিয়া প্রায় ছয়মাসে পরিণত হইয়াছে, সুতরাং গ্রীষ্মের ভাগ দিন দিন বাড়িতেছে; ইহার কারণ কি? কারণ সহজেই অনুমিত হইবে—যথা—

পর্ব্বতগাত্র দিন দিন জলস্থলীতে পূর্ণ হওয়ায় জঙ্গল সকল আবাদ হইয়া যাইতেছে। বড় বড় বৃক্ষ সকল কাটিয়া গৃহকার্য্য নিযুক্ত করা হইতেছে; তাহার এক একটী বৃক্ষ এক একটী ফুয়ারা (Fountain) স্বরূপ; তাহারা নিম্নস্তর হইতে মূলদ্বারা জল শোষণ করিয়া যে সকল প্রস্রবণ উৎপন্ন করে, তাহা উন্মূলিত হইলে কে তাঁহাদের সে কার্য্য সাধন করিবে? অগত্যা শিখরাগ্রে জলস্থলী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, মহীরুহসকল নির্ম্মূল হইয়া যাইবে, সুতরাং উৎসারিত প্রস্রবণসকল শুষ্ক হইয়া যাইবে। বৃক্ষসকল মূল হইতে যেমন নিম্নস্তরের জলপ্রবাহ আকর্ষণ করিয়া উপরে উঠায়, উর্দ্ধের কাণ্ড শাখা-প্রশাখা সকল তেমনি আকাশপথের মেঘমালা আকর্ষণ করিয়া বৃষ্টিপাত করায়, তাহাতেই পার্ব্বতীয় হ্রদসকল পূর্ণ হইয়া নদ, নদী, খাল, বিল, সকল পূর্ণ করিয়া নিম্নপথ প্লাবিত রাখিয়া, ক্ষেত্রকার্য্যে সুফলতা দান করে—পানে, স্নানে অবগাহনে ব্যবহারে আইসে। এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে পাহাড়ের জলের আড়া কম হইয়া আসিতেছে; নিম্ন প্রদেশের খাল বিল-নদী-নালা শুষ্ক হইয়া আসিতেছে, ইহার প্রকৃত কারণ সর্ব্বস্থানে শৈত্যগুণের অভাব। যে পাহাড়ে বিশআড়া জল হইবার কথা, সে পাহাড়ে এখন দশ আড়াও হয় না। দারজিলিং হইতে হাজরা—হিমালয়ের সর্ব্বত্র অনাবৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আদিম পাহাড়ীরা সর্ব্বতগাত্রে ও প্রস্রবণকূলে বসতি করিয়া থাকে, বনরাজীর কোন অনিষ্ট করে না। চিরকাল তাহারা শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা দেখিত; জঙ্গলের শিকার এবং মধু তাহাদের তৃপ্তিসাধন করিত; ঝড়ে পতিত বা কালে মৃত বৃক্ষসকল আহরণ করিয়া,

বাটীঘর নির্ম্মাণ এবং রন্ধনকার্য্য তথা অগ্নি-সেবনে ব্যবহার করিত। তাহাতেই প্রকৃতি-দেবী তাহাদের উপর প্রসন্না থাকিয়া তাহা-দিগকে দীর্ঘজীবন দান করিতেন। এখন বিজ্ঞান তাহার প্রতিকুলে দণ্ডায়মান হইয়া সমস্তদেশ ছারখার করিয়া ফেলিতেছে।

আজি কালি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রায় ত্রিশহাজার মাইল রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহার পাড়নীর (Slipper) জন্য কোটী কোটী বৃক্ষ কাটিতে হইতেছে; আবার তাহার জন্য লক্ষ লক্ষ গাড়ী-বাড়ী-পুল-পলোয়ার নির্ম্মাণ করিতে হইতেছে। তাহার পর শত শত সহস্র সহস্র অগ্নিমুখ এঞ্জিনের (Engine) সেবার জন্য প্রতি-দিন লক্ষ লক্ষ ইন্ধন সঞ্চয় করিতে হইতেছে। তাহারপর সমস্ত ভারতে কল-কারখানার সীমা নাই। ষ্টীম্‌বোট্‌ (Steam Boat) ও জাহাজের সংখ্যা কে করিবে? যদিও এই সকলের জন্য দেশবিদেশ হইতে অনেক পাথুরিয়া কয়লার আমদানি হইতেছে, কিন্তু কোথাও তাহাতে সংকুলান হইতেছে না। (পাথুরীয়া কয়লা উৎখাত করায় আরো এক বিপদ উপস্থিত হইতেছে! ইহাতে ভূগর্ভ শূন্য হইয়া পড়ায়, তাহার গায় পড়িয়া প্রতিদিন কত প্রাণীহত্যা হই-তেছে,—আবার এই শূন্যগর্ভ ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইলে কত জনস্থলী জীবশূন্য হইয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষে যেসকল স্থানে পাথু-রীয়া কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার খনন-ক্রিয়ায় ভূগর্ভ শূন্য হইয়া পড়িতেছে; একদিন ভূমিকম্পে সে-সকল স্থান রসাতলে চলিয়া যাইবে!)। কাজে কাজেই তাহার জন্য কাষ্ঠের উপর অধিকতর নির্ভর করিতে হইতেছে। ইহা ব্যতীত শৈল-বাসের জন্য প্রতিবর্ষে সহস্র সহস্র ব্যারিক্‌ (সৈন্যনিবাস) বাংলা নির্ম্মাণ করিতে হইতেছে; তাহার জন্য কতরূপ কত কাঠের প্রয়োজন, কাহারও তাহা চিন্তায় আসিতেছে কি? এইজন্য লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ প্রতিদিন ছেদন করিতে হইতেছে; তাহাতে গিরিশৃঙ্গ সকল উলঙ্গ হইয়া পড়িতেছে; কাষ্ঠের গুদাম সকল (Timber Agency) শত শত মাইল দূরে যাইয়া পড়িতেছে। এই কারণ বৃষ্টিপাত প্রচুর পরিমাণে আর হইতে পারি-তেছে না। স্থানীয় বর্ষা Local mondoon) প্রায় স্থগিত হইয়া আসিতেছে সামুদ্রিক বর্ষা (mondoon proper) যথাসময়ে আসিয়া গিরিশৃঙ্গে স্থান না পাইয়া আকাশ-পথেই বিলীন হইয়া যাইতেছে। এখন ভাব, বিজ্ঞান কি ভীষণ বিপদ্‌ টানিয়া আনিতেছে? প্রচুর পরিমাণে জলধারা পতিত হইতেছে না, সুতরাং নদ, নদী, কূপ তড়াগ, ঝীল, নালী-প্রণালী শুষ্ক হইয়া যাই-তেছে। জলাভাবে ক্ষেত্রে শস্য উৎপন্ন হইতে পারিতেছে না। বহুকষ্টে আহৃত অপক্ক শস্য আহার করিয়া, বিকৃত জল পান করিয়া, মন্বন্তরের সহিত মহামারী মুখ-ব্যাদন করিয়া নিরীহ প্রজাকুল নির্ম্মূল করিতেছে। তাহা দেখিয়া ধনবানেরা রাজপুরুষদিগের অনুসরণ করিয়া শৈলশিখরে আশ্রয় চাই-তেছেন, আর ভাবিতেছেন বাঁচিলাম! যে ঋত্বিগণ রাক্ষস-তালের উপকূলে বিহার নির্ম্মাণ করিয়া, নিরন্ন বিশ্বাসীদিগের উপর উপহাস-দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা

কোথায়? রাক্ষস-তালের পরপারেরও ঐ দশা! উত্তর হইতে সুদূর উত্তর মত হিমগিরি ভেদ করিয়া যাইবে, ততই পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া উত্তর মহাসাগরে যাইয়া উপনীত হইবে। সেখানে আর উচ্চ নীচ দেখিতে পাইবে না, কুপ-তড়াগ নদী নালা আর নয়ন-গোচর হইবে না প্রশান্ত মহাসাগরের অসীম জলরাশি ধূ ধূ করিয়া ধরাখানা শুষ্ক সরার মত দেখাইয়া দিবে! এখন কথা হইতেছে যে, বিজ্ঞান যদি জ্ঞান হারাইয়া জনসমাজকে এইরূপে ধ্বংশ করিতে বসিল, উপধর্ম্মসকল যদি নিজ নিজ প্রচার বিস্তার করিয়া (অন্ধকে অন্ধ যেমন পথ দেখাইতে গিয়া উভয়েই কূপমধ্যে পতিত হয়, সেই রূপ) জগতে অজ্ঞতাকে প্রশ্রয় দিতে অগ্রসর হইতে অবসর পাইল; তবে আর রক্ষা কোথায়?

(ক্রমশঃ)

হিমারণ্যবাসী পরিব্রাজক।

হরিদ্বারের কথা।

হরিদ্বারকে অনেকে বিষম-বিপৎ সংকুল স্থান মনে করিয়া থাকেন, করিবারইত কথা। গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের পাদদেশে হরিদ্বার অবস্থিত তাই ভয়ের কথা আগে আমাদেরও হরিদ্বারের উপর এমনই একটা বিষম ধারণা ছিল, হরিদ্বারকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া আমার সে ধারণা দূর হইয়াছিল। আমি যে বৎসর কাশ্মীর ও কাবুল গিয়াছিলাম, সেই বৎসরই হরিদ্বার ও নেপাল যাই। নেপালের বিবরণ পরে দিব; নেপালে প্রসিদ্ধ পশুপতিনাথ শিব আছেন। শিবরাত্রিতে মহামেলা হয়।

একদিন আমরা বৃন্দাবনে বসিয়া আছি। বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা-রসামৃত পান করিতেছি। দ্বাপরের কাহিনী ও কৃষ্ণলীলার স্থান-সমূহ দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছি। বাঙ্গালীময় বাঙ্গালী প্রধান মহাতীর্থে বাঙ্গালীর কিসের অভাব? একদিন আমি কয়েকটি বাঙ্গালী গৃহী ও উদাসীন বন্ধুর সহিত বসিয়া আলাপ করিতেছি, তখন আমাদের দেশীয় একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত আসিয়া কহিলেন, "গ্রহণ গো! গ্রহণ"! আমরা গ্রহণের নামে অবাক্ হইয়া আকাশ-পানে চাহিয়া দেখি, গ্রহণ নয়! পণ্ডিতের মূর্খতা! পণ্ডিত কহিলেন—"হাঁ গ্রহণ, পৌষের অমুক তারিখে"। পাঁজি খুলিয়া দেখিলাম, সত্যই পৌষের সেই তারিখে চন্দ্রগ্রহণ"। গ্রহণে গঙ্গাস্নানে মহাপুণ্য, বড় ফল। আমিও "মহাপুণ্য" বা 'বড় ফল' বলিতে প্রয়াসী হইলাম। কোথা যাই, কোথা গেলে গঙ্গা পাই,—ভাবিতে ভাবিতে অগ্রহায়ণের কয়টা দিন কাটিল! পৌষ আসিয়া হামাগুড়ি দিয়া আমাদের দ্বারে উপস্থিত হইল। পৌষটা বড় বিষম, এ মাসে বড় শীত তা' আবার শীতপ্রধান দেশের শীত! এটা ত বাঙ্গালা নয়।

বৃন্দাবন হইতে গঙ্গালাভের জন্য প্রয়াগ, কাশী বা হরিদ্বার আসিতে হয়; তন্মধ্যে হরিদ্বারই নিকটবর্ত্তী। নূতনদেশও দেখা যায়, আমারও একটা সখ মিটে সুতরাং আমি এই বিষমশীতেই শীতের খনি হরিদ্বারে যাইব মনস্থ করিলাম। অনেকের মুখে

শুনিলাম "হরিদ্বারে বড় শীত, গঙ্গায় স্নান করিলে আর বাঁচা নাই।" আমিও বুঝিলাম, আমাকে বুঝি আর বাঁচিতে হইবে না! অনেকের মুখেই নানা গল্পকাহিনী শুনিতে লাগিলাম, কেহ বলিলেন যে—'অমুক ব্যক্তি একদিন শীতে হরিদ্বারের গঙ্গায় স্নান করিয়া গিয়া মরিয়া গেল, আর বাঁচিলনা।" ইত্যাদি কত কহিব। আমি কিন্তু মরিতেই হরিদ্বারযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম। আমি একাকী, আমার সঙ্গে সঙ্গী কেহই নাই সুতরাং কাঁদিবার লোকটাও নাই। আমার সঙ্গী থাকিলে হয়ত সে মরণভয়ে ভীত হইয়া আমাকে ধরিয়া টানাটানি করিত; আমি কি আর যাইতে পারিতাম? আমার বন্ধুবান্ধবেরা বলিয়াছিলেন—তুমি জলস্পর্শ করিয়া মন্ত্রস্নান করিও। আমি "তথাস্তু" বলিয়া বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিলাম। মথুরায় আবার ডাক্তার বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইলাম। আমরা চারিজন, আমার সঙ্গে আমার আত্মীয় দুইজন, আর একজন ভৃত্য। আমি উহাদিগকে সঙ্গে লইতে নারাজ হইয়া তাহাদিগকে আমার বন্ধুবর জনৈক ধর্ম্মপ্রাণ ঋষিতুল্য রায় বাহাদুরের আবাসভবনে রাধাকুণ্ড পাঠাইয়াদিলাম। আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

রাত্রি দশটায় মথুরায় লৌহবর্ত্মে উঠিলাম। গোয়ালিয়ারের আমার কোন বন্ধু আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহার সঙ্গেও সব কথা হইলনা, তিনি ও ডাক্তার বাবু আসিয়া আমাকে গাড়ীতে বোঝাই করিয়া দিয়া গেলেন। প্রাতে উঠিয়া দেখি—আহা! কি মনোহর দৃশ্য! আমরা তখন আলিগড়ে। আমি জানিলাম, গাড়ীটা অনেকক্ষণ এখানে বিলম্ব করিবে, প্রায় তিন ঘণ্টার উপর। এই দীর্ঘকাল গাড়ীতে বসিয়া করিব কি? আমি এখানকার কোন প্রাফেসার বন্ধু ও কোন উকীল বন্ধুর বাড়ীরদিকে একখানি এক্কারথে চাপিয়া রওনা হইলাম। তাদের বাড়ী গিয়া চা ও জলযোগ লাভ হইল। দেখিতে দেখিতে তিন ঘণ্টা কাটাইয়াছিলাম। ইহার মধ্যে আলিগড়ের বৃহৎ কলেজটীও একদৌড়ে দেখিয়া আসিলাম। বেশ যায়গাটি! আমার আলিগড়ের বন্ধুরা আসিয়া আমাকে ষ্টেসনে গাড়ী বোঝাই করিয়া গেলেন। ষ্টেসনে আসিয়া দেখি আমাদের গাড়ীতে পীপড়ার পালের মত মানুষ বোঝাই হইয়া পড়িয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহারাও গঙ্গাযাত্রী হরিদ্বার যাইবে। কেহবা যাইবে নিকটে রাজঘাট; সেখানেও গঙ্গা। আমার বন্ধুরা আমাকে সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী মনে করিয়াছিলেন, তাহারা যখন দেখিলেন যে—আমি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর দুয়ার ধরিয়া ঠেলাঠেলী করিতেছি তখন তাহারা হয়ত লজ্জিত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, থার্ড ক্লাসে যে? আমি কহিলাম "কি করি আর নীচে যে ক্লাস নাই।" তাহারা বলিলেন, রসিকতা ছাড়, এত গেল গ্লাডষ্টোনের কথা, তোমার কথাটা কি? অর্থাভাব না আর কিছু? আমি বলিলাম 'অর্থাভাব এবং আর কিছুও বটে। কেন ভাই অল্পের জন্য পয়সা কটা ফেলাই, এখানেত আমি আর দেশের মত 'কেষ্ট বিষ্টু নই।' তাহারা বেশত বলিয়া বিদায় হইলেন। গাড়ীটা হুস্ হুস্ করিয়া আমাদিগকে লইয়া প্রাণপণে ছুটিল।

বেলা যখন একটার উপরে, আমরা

তখন মুরাদাবাদে ; আমি অবতরণ করিলাম। একটা এক্কাশকট ভাড়া করিয়া তত্রস্থ হেড্‌-মাষ্টারের বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। তিনি আমার পরিচিত বন্ধু। যাইবার সময় আমার অনেক হাকিম বন্ধুর বাড়ীর পাশদিয়াই গিয়াছি. আগে জানিলে সেদিনের জন্ত তাঁহার গলগ্রহ হইতাম। আমি হেড-মাষ্টার বাবুর ভিতরবাড়ীর দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইলাম। ভিতরে মেয়েরা যে যাহার কাজ করিতেছিল। আমি হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া চলিয়া আসিব মনস্থ করিয়াছি, অমনিই তাঁহার বি, এল্‌ পুত্রটী আমাকে ডাকিয়া কহিলেন "আস্থন্ আস্‌তে আজ্ঞা হউক, এ দিকেই আস্থন," আমি অপ্রতিভ হইয়া তাঁহার পিছনে ছুটিলাম। বাহিরবাড়ীর ফরাসে গিয়া শুইয়া পড়িলাম ; আর আমার জঠরানল প্রজ্জলিত হইয়া একটা যে কাণ্ড বাধাইবে, তাহাও কহিলাম। তখন বেলা তিনটা ! এত বেলা পর্য্যন্ত কিছু খাই নাই, সুতরাং লম্বাচৌড়া জলযোগের আয়োজন হইল। গৃহিনী থালার কাছে বসিয়া এক দুই করিয়া সবগুলি গণিয়া পেটের ভিতর পুরিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জলযোগ করিয়া কর্ত্তার বি, এল্‌ পুত্রটীকে লইয়া সহরে বাহির হইলাম। ঘণ্টা হিসাবে এক খানা গাড়ী লইয়া আমার হাকিম বন্ধুর ওখানে গেলাম। তিনি আমাকে পাইয়া কহিলেন "আমিও হরিদ্বার যাইব।" আমিও মনে করিলাম ভাল সঙ্গীই পাইলাম।

আমরা যখন বাসায় ফিরিলাম, সূর্য্যদেব তখন পৃথিবী হইতে পলায়ন করিয়াছেন। পূর্ণিমার চন্দ্র তখন আকাশের একপাশে মেঘের সঙ্গে নাচিয়া কুঁদিয়া খেলা করিতেছে ; আহা ! কি মনোহর দৃশ্য ! পূর্ণিমার চন্দ্র ত সবখানেই উঠে এমন, মনহারিত্ব কি সকলের মনে জাগে? বাসায় আসিলে হেড্‌মাষ্টার বাবুও আমাদের সঙ্গী হওয়ার প্রস্তাব করিলেন। আমি মনে করিলাম মন্দ নয়, ভাল সঙ্গীই হইল। ভিতরবাড়ী হইতে টুন্ টুনি শুনিলাম, গিন্নিরও নাকি গঙ্গালাভেচ্ছা ; আমি ভাবিলাম এ আবার কি ? বরং একটা লোহার সিন্দুক বোঝাই করিয়া টাকা লইয়া যাইতে রাজী আছি, তথাপি একটা স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া যাইতে আমি নারাজ। অবশেষে স্থির হইল গিন্নি যাইবেন না, ভালই।

রাত্রি ১১টায় একটা গাড়ী ছাড়ে। আগে ভাবিয়াছিলাম এটাতেই যাইব ; পরে স্থির করিলাম—আমরা সকলে রাত্রি দুইটার গাড়ীতে যাইব। গাড়োয়ানকে বলিয়া দেওয়া হইল, সে আসিয়া সময় মত আমাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ করিবে। রাত্রিতে আহার করিয়া নিদ্রা গেলাম। অতি ব্যগ্রতায় নিদ্রা হইল না ; ১২টায় জাগিয়া চাকর ও কর্ত্তাকে তুলিলাম, চাকরকে গাড়ী ডাকিতে পাঠাইলাম। গাড়ী আসিলে আমরা একটায় গৃহ ত্যাগ করিলাম। আমরা তিন জন ভদ্র লোক, সঙ্গে আর কেহ নাই। আমার তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট খানিকে প্রমোসান দিয়া মধ্যম শ্রেণীর করিয়া তাঁহাদের এক সঙ্গে গিয়া উঠিলাম। রাত্রি পাঁচটায় হরিদ্বার পঁহুছিলাম। পথেই আমরা গ্রহণ দেখিয়াছিলাম, লাকসার আসিবার পূর্ব্বেই পৃথিবীছায়া অন্ধকাররূপে চন্দ্রকে গ্রাস করিল।

আমরা যখন 'হরিদ্বার আসিলাম, তখনও একটু রাত্রি আছে। আমরা পাণ্ডার চেষ্টা করিলাম না। বরাবর গঙ্গা-তীরে আসিয়া পড়িলাম। গ্রহণের বড় ভিড়। শত শত নরনারী গঙ্গায় ঝাপাইয়া পড়িতেছে, কেহ কিন্তু মরিতেছে না; এটাই যা বাহাদুরী। আমি আমার পাণ্ডাকে আগুন জ্বালিতে কহিলাম; জল হইতে উঠিয়া অগ্নি সেবা করিব ইচ্ছা। পাণ্ডা কহিল "তা নয় বাবু, জলে নামিলে আর শীত থাকিবে না, তখন গরম লাগিবে, আগুনের দরকার মোটেই হবে না!" আমি একথা অগ্রাহ্য করিয়া একটা বিশাল অগ্নিকুণ্ড করিলাম! এমন আগুণ দেখিয়াও কিন্তু সেবা করিতে কেহ আসিল না। সকলেই গঙ্গায় ঝাপ দিয়া উঠিয়া স্ফূর্ত্তির সহিত কাপড় পরিয়া চলিয়া যাইতেছে। এ দৃশ্য মন্দ নয়।

আহা, হরিদ্বারের কি অপূর্ব্ব শোভা! যিনি না দেখিয়াছেন, তাহাকে বুঝান আমার পক্ষে কষ্টসাধ্য, তথাপি চেষ্টা করিব বই কি? পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া গঙ্গা গম্ভীরনাদে, ভীমবেগে প্রবাহিত হইতেছেন। কলিকাতায় গঙ্গার ন্যায় এ স্থানটা তত প্রশস্ত নয়; একটা খাল বিশেষ; এমনই স্রোতাবেগ নৌকা ধরে কার সাধ্য? উত্তর দিকে চাহিয়া দেখি, পাহাড়ের উপর, উচ্চ শৃঙ্গে সাদা তাম্বু খাটাইয়া যেন সৈন্যশিবির করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এগুলি কিসের তাম্বু?" উত্তর পাইলাম, "তাম্বু নয়, এ গুলি বরফের পাহাড়।" পাহাড়টাই বরফে আচ্ছাদিত হইয়া এমন ধবলাকার হইয়াছে। আগে এটা যত নিকটে মনে করিয়াছিলাম, তেমন নহে। এটা হয়ত এখান হইতে প্রায় এক মাসের পথ দূরে। আমার ভ্রম দূর হইল। বল দেখি পাঠক এটা কেমন সুন্দর দৃশ্য? আমার মন আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। ভগবানের রাজ্যের নূতন খেলা দেখিয়া আনন্দে অধীর হইলাম! বরফ গুলি গলিয়া পাহাড় গাত্র দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে, তাহাও যেন বেশ দেখা যায়। যত বেলা হইতে লাগিল বরফের পাহাড় গুলি যেন তত সরিয়া যাইতে লাগিল! এই বা কেমন খেলা।

আমি গঙ্গায় মুখ ধুইতে গিয়া গঙ্গা-স্পর্শ করিয়া দেখি, আমার হাতে যত টুক গঙ্গাজল লাগিয়াছে, সে পর্য্যন্ত যেন হাতটা কাটিয়া নিয়া গেল! এমনই বরফের তেজ। যেন বরফগলা গঙ্গাজল। বাপরে! কি ঠাণ্ডা! স্নান করিতে কি পারিব? যমকে ভয় না করিয়া আমি স্নান করিব মনস্থ করিলাম। বাবুকে বলিলাম "মহাশয়, আমি যদি আর জল হইতে না উঠি, বরফ জলে যদি মরিয়া যাই—এই আমার ঠিকানা রহিল, দেশে একটা টেলিগ্রাম করিয়া দিবেন।" বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আমি বুঝিলাম—তবে বুঝি মরিব না। বন্ধুদ্বয়ও আমার সঙ্গে স্নানার্থী হইলেন। আমরা তিন জনে গঙ্গামধ্যে ঝাপাইয়া পড়িলাম। গঙ্গায় নামিয়া দেখি আমার যেন শীত আর নাই, উঠিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলাম, অগ্নিসেবার আর প্রয়োজন হইল না! আমি যেন এক মধুর

উষ্ণতা অনুভব করিতে লাগিলাম। "গঙ্গা মায়ীকি জয়" রবে চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল। অসংখ্য নরনারী চারিদিকে ছুটা ছুটি করিতেছে! আহা কি অপূর্ব্ব দৃশ্য।

আমি যখন সন্ধ্যাতর্পণাদি করিতেছি, তখনও দেখি শশী রাহুর কবল হইতে মুক্তি লাভ করেন নাই। দেখিতে দেখিতে চারিদিক ফরসা হইয়া উঠিল! কাক, কোকিল ডাকিল, দয়েল, খঞ্জন নাচিয়া উঠিল, পাপিরা তান ধরিল, পার্ব্বত্য পক্ষীরা পর্ব্বতগাত্র হইতে অব্যক্ত কলরব করিয়া উঠিল! তখনও পরের ট্রেণে আগত মানুষ আসিয়া দলে দলে গঙ্গাস্নান করিতেছে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। উঠিয়া দেখি, বন্ধুদ্বয় হরিদ্বারত্যাগের চেষ্টা করিতেছেন। আমিও তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিলাম। আমি হরদ্বার রেল-ষ্টেশন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে তুলিয়া দিলাম। এক জন গেলেন সাহারাণপুর আর এক জন গেলেন দেরাদুন। দেরাদুনে তখন যাত্রী লইয়া রেল যাইত না, রেলের মাল লইয়া যাইত, সুতরাং বন্ধু মাল হইয়া দেরাদুন গেলেন।

আমি ফিরিয়া আসিয়া ব্রহ্মঘাটে শিকল ধরিয়া স্নান করিলাম। শিকল ধরিয়া স্নান না করিলে স্রোতো বেগে কোথায় লইয়া যাইবে ঠিক কি? ব্রহ্মঘাটে যতটা স্রোত এমনটা অন্য ঘাটে নাই। সব খানে সমান স্রোত নাই, কোথাও বা স্থির জল। আশ্চর্য্য আর কি? আবার স্থিরজলের পরই ভীষণবেগে, ভীম গর্জ্জনে গঙ্গা সাগরাভিমুখে দৌড়িতেছেন। স্নানান্তে এখানে পিণ্ডদানাদি করিলাম। এই খানে গঙ্গায় অগণ্য রোহিতজাতীয় মহাকায় মৎস্য খেলা করিতেছে! এরা বেশ, মানুষের হাত হইতে নিয়া খাদ্য খায়! আমিও কৌতুকবশে মৎস্যগুলাকে খাওয়াইতে আরম্ভ করিলাম। উপর হইতে ময়দার গুলি জলে ফেলিতে লাগিলাম, উহারা কাড়া কাড়ি করিয়া খাইতে লাগিল। দেখিতে বেশ। এই সকল মৎস্য মারিবার কাহারও অধিকার নাই। এই ঘাটের উপর উর্দ্দু, দেবনাগরি ও ইংরাজী অক্ষরে লিখিত মৎস্য শীকার নিষেধক বিজ্ঞাপন আছে, কেহ ধরিলে, মারিলে পাণ্ডা ও স্থানীয় লোকেরা তাহার হাড় ভাঙ্গিয়া দেয়, তা ছাড়া ফৌজদারীতেও দেয়।

এখানে কোন বিচারালয় নাই, তবে রুড়কির সব্‌ডিভিসনাল্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ মাসে মাসে কাছারী করেন তা ছাড়া মেলা ইত্যাদিতে ফৌজদারী আদালতের সাথে, পুলিস আফিস, চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্সারী প্রভৃতি হরিদ্বারে বসে। তবে এখানে একটা স্থায়ী ক্যানাল আফিস আছে। কৃষি কার্য্যের সুবিধার জন্য গঙ্গা হইতে খাল কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে গবর্ণমেণ্টের এখানে এই আফিসের নাম ক্যানাল আফিস। এই ক্যানাল আফিসের এক জন সাহেব ইঞ্জিনিয়ার, আর কয়েক জন কর্ম্মচারী মসীজীবী এখানে থাকেন। ক্যানাল আফিস ডোম পারে, সেখান হইতে গঙ্গা কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে। আসল গঙ্গাটায় তাই আর জল নাই, পাথরের উপর দিয়া পা না ভিজাইয়া টপাটপ

চলিয়া যাওয়া যায়। আবার যখন খাল দিয়া জল নেওয়া না হয়, কাটা খাল বন্দ করিয়া দেওয়া হয় তখন কিন্তু আসল গঙ্গায় ঢের জল। বড় ভীষণ বেগে বজ্র গর্জ্জনে খাল দিয়া জল যাইতেছে, গঙ্গাকে লৌহ শিকল দিয়া বাঁধা হইয়াছে ও যখন যতটুকু জলের প্রয়োজন তাহাই নেওয়া হয় অন্যথায় কপাট বন্দ করিয়া দিলেই জল যাওয়া বন্দ হইল, এ এক বেশ খেলা! কাটা খালেও খর-স্রোত বহিতেছে, এখানে মৎস্যাদিও আছে। মাসে মাসে নৌকাও দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে এই খর-স্রোতা গঙ্গা, মানুষেরা কেমন করিয়া পার হয়। বড় বড় মশকের উপর বসিয়া তা ধরিয়া পার হয়। মশক নাম শুনিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, মশা নামক কীট ধরিয়া বুঝি পার হইতে হয়, ফলে তাহা নহে। আস্ত মহিষের চামড়ায় মশক প্রস্তুত হয়, সে গুলি ফুলাইয়া ভাসাইয়া দিয়া তাহার উপর বসিয়া দুই হাত দিয়া আছাড় পাছাড় করিয়া জল-মন্থন করিয়া যাইতে হয়। নৌকার মত দাড় বৈঠা কিছুই নাই, নৌকা এখানকার গঙ্গায়ও নাই। তিন, চারি, বা পাঁচটী মশক একত্র করিয়া দুই তিন জন লোক বাহিলে আরোহীরা বেশ যাইতে পারেন। এই মশক ছাড়া গঙ্গায় বাঁশের মাচা বাঁধিয়া ও এক প্রকারে পার হইবার পন্থা আছে কিন্তু নৌকা আদৌ নাইই কারণ পাহাড়ে লাগিলে নৌকা চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে।

এখানে, তীর্থের হিসাবে যাহা করিলাম তাহা এই শেষ। আর কিছু কার্য্য নাই, প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে তীর্থ-মন্দিরাদি দেখিবার আছে। এখানে একটী স্থান দেখিলাম তাহা এখানকার লোকে পার্ব্বতীর স্থান বলিয়া কহে, সেখানে পর্ব্বতের ছিদ্র পথ দিয়া সর্প দৃষ্ট হয় উহাকে একটু খোঁচা দিলে নড়াচড়া করে। সকলে বলিয়া থাকে স্মরণাতীত কাল যাবত এই একটী সর্পই এখানে বাস করে। এখানে অসংখ্য বেলগাছ, মধ্য স্থলে সর্প বাস করে। এখানে ভীম গ'ড্ড বলিয়া একটী স্থান আছে, কিন্তু সেখানে ভীমের নাম গন্ধও নাই। কতকগুলি বানর ছাড়া আর কিছু দেখিলাম না। এখানকার বন্য বানরেরা মানুষ দেখিলে পালায়, এমনকি মানুষের গন্ধ পাইলেও দৌড়িয়া জঙ্গলে যায়। ক্ষুদ্র বৃহৎ পর্ব্বতের জঙ্গলে বহু বন্য পশু থাকে। অনেক স্থানে দেখা যায়, পর্ব্বতের উপর জঙ্গলে গাছ পালা যেন ভাঙ্গিয়া রহিয়াছে, এগুলি আর কিছুই নহে, বন্য হস্তী আসিলেই গাছের ডালপালা ভাঙ্গিয়া ফেলে। এখানে প্রায়ই রাত্রে বন্য হস্তী আসে।

আমি এক দিন কনখল গিয়াছিলাম। কনখলে দক্ষযজ্ঞ হইয়াছিল, এখানেই দক্ষ রাজের রাজধানী ছিল। এখনও পাণ্ডারা দক্ষের যজ্ঞ স্থান দেখাইয়া থাকে, সেখানে ছাই মাটী দিয়া স্থানটুকু কালো করিয়া রাখিয়াছে। অনেক স্ত্রীলোক সেখান হইতে ভস্ম ও কালী নিয়া থাকে। ফুরাইলে গেলে পাণ্ডারা আবার ভস্ম ও কালী দিয়া রাখে। হরিদ্বার হইতে কনখল দুই মাইল,

হরিদ্বার অপেক্ষা কনখলে জনতা বহু বেশী। এখানে বহু পার্ব্বত্য বেশ্যা দেখিলাম উঁহারা বাস্তবিকই সুন্দরী, তবে গাল মোটা মোটা, নাকটা চেপ্টা। উঁহাদের মধ্যেও বিলাতি বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে। পাণ্ডাদের বাড়ী কনখলেই। এখানকার পাণ্ডার চেনা শোনা, অত্যাচারী বলিয়া বোধ হইল না। কনখলে হাট বাজার সবই আছে। পার্ব্বত্য প্রদেশ বলিয়া গো গাড়ীর সংখ্যা ও অশ্ব নিতান্ত কম নহে।

আমরা একদিন পাহাড়ের উপর উঠিলাম, সেখানে পূজা দিব—দুর্গা-মন্দিরে। এখানে অঞ্জনাদেবী ও পবন দেবের মন্দির আছে। এবং মাঝে মাঝে পূজা হইয়া থাকে। রাত্রে এখানে কেহ থাকে না, বড় বাঘের ভয়। পাহাড়ে উঠিতে চড়াই সুতরাং কষ্ট, নামিতে বেশ আরাম ও শীঘ্র নামা যায়। আমাদের সঙ্গে অনেক যাত্রীই পর্ব্বতে উঠিল। বন্য পশুর উৎপাত দিনমানে নাই, কিন্তু রাত্রিতে যে রকম উপদ্রব করে তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। অনেক গাছই শাখা শূন্য। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম পার্ব্বত্য জঙ্গলী হাতীগুলা এই সকল বৃক্ষকে শাখাহীন করিয়া ফেলিয়াছে। পর্ব্বতের নীচে যে সকল সাধু বাস করে তাহারা সকলেই গৃহস্থের ন্যায় বাগানাদি করিয়া বেশ সুখে আছে।

আর একটা কথা এখনও লিখিনাই যা অতি প্রয়োজনীয় সংবাদ। এখানে আসিয়া কোন যাত্রীরই কষ্ট হয় না। যে কয়টী মোহান্তের বাড়ী আছে তাহারা সকলেই ধনী; অতিথিসৎকার করে। তাছাড়া স্বরবমলের একটী ধর্ম্ম-শালা আছে এখানে বিনা ভাড়ায় স্বচ্ছন্দে থাকা যায়। উদাসীনেরা দেখিয়াছি খাদ্যাদিও পায়। ইহাছাড়া বাঙ্গালী একটী জটাধারী মাই আছেন ইনি স্ত্রীলোক,—মাথায় অনেক জটা বলিয়া এখানকার লোকে ইহাকে জটাধারীমাই বলিয়া ডাকে। ইনি ভিক্ষা করিয়া এক আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বাঙ্গালী মাত্রেই পরিবারসহ এখানে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। জটাধারীমাইর সঙ্গে আমার এলাহাবাদে দেখা। তিনি আমার নিকট হইতে, তখন আশ্রম নির্ম্মাণের ব্যয় বাবত টাকা আনিয়াছিলেন। আমি জটাধারীমাইর সঙ্গে হরিদ্বারে দেখা করিলে তিনি আমাকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া গেলেন, আশ্রমটি বেশ, দুতলা ও একতলা পাকাবাড়ী করিয়াছেন। আমি অন্যত্র উঠায় তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিলেন—আমাকে একদিন তাঁহার অশ্রমে নিমন্ত্রণ করিয়া খিচুরী ও লুচি খাওয়াইলেন। ভিক্ষা করিয়া জটাধারী মাই বোধহয় এপর্য্যন্ত আরো অনেক টাকা করিয়াছেন। এখানে প্রায় সব জিনিষই সস্তা। আমাদের দেশে দ্রব্যাদির অবস্থা শতাবধি বৎসর পূর্ব্বে যেমন ছিল—এখানে তাহাই। ভুটীয়া মানুষ এখানে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ভুটীয়ারা অসভ্য দুর্দ্ধর্ষ ও অমিত বলশালী, মূর্খ মানুষ। রাস্তায় বসিয়া দেখা যায় দলে দলে

ভুটীয়া স্ত্রী পুরুষ পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিতেছে, সঙ্গে কুকুর ও কম্বলই সম্বল। তাহাদের কথা আমরা বুঝিনা। দ্বিভাষী হইলে আলাপ করা যায়। উহাদের মূর্ত্তি দেখিয়া আলাপ করিতেও ভয় হয়।

এখানে গাড়ওয়াল টেহরী রাজার এলাকার ভুটীয়ারাই নীচে অধিক আসিয়া থাকে। আমি যখন হরিদ্বারে ছিলাম তখন পাহাড় কাটিয়া রেল হইতেছিল, উহা দেরাদুন প্রভৃতি অঞ্চলে যাইতেছিল। আমি দেখিয়াছি পাহাড়ের গায় ছিদ্র করিয়া তাহাতে বারুদ পুরিয়া দূর হইতে পলতা দিয়া আগুণ দেওয়া হয়—আর অমনিই গুরুম করিয়া কামানের ন্যায় গভীর আওয়াজ,—সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বত ধসিয়া পড়িল। দশে বিশে মানুষ লাগিয়া পর্ব্বত সরাইয়া পথ করিয়া দিতেছে। আগে আমি এরূপ শব্দ মাঝে মাঝে শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম এখানে বুঝি সৈন্যাবাস আছে তাহা হইতে বুঝি কামান ছাড়িতেছে। পাণ্ডারা আমার ভ্রম দূর করিয়া দিলেন।

হরিদ্বারের মোটামুটি কথা শেষ হইল। এখান হইতে ঋষিকেশ ও লছমনঝোলা গিয়াছিলাম। সে সকল কথা আর এক দিন কহিব। পার্ব্বত্য শোভা নিজ চক্ষে দেখিয়া যে সুখ, বর্ণনা করিয়া বা তাহা পাঠ করিয়া কি তেমন সুখ হয়? এ প্রদেশে শীতের রাজত্ব, শীত প্রায় বারমাসই লাগিয়া আছে, তাই এখানকার মানুষগুলা সুস্থকায় ও বলিষ্ঠ। এখানে এক একটা গৃহস্থ-পরিবারে বহু শীতবস্ত্র রাখিতে হয়, বাঙ্গলায় তেমন দরকার হয় না। এখানে শিখদিগের গুরুদরবার ও গ্রন্থ আছে, তা শিখেরা পূজা করে। এখানে একজন বিলাত ফেরত সন্ন্যাসী আছেন তাহার নাম পশুপতি নাথ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার।

আয়ুর্ব্বেদ মাহাত্ম্য। *

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অধুনা ইয়ুরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক যেসকল আময় "ম্যালেরিয়া জ্বর, কলেরা, বিউবনিক্ প্লেগ ও ব্যারি ব্যারি" নামে অভিহিত হয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রণেতৃগণ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উপর্য্যুক্ত ব্যাধি সমূহের হেতু, লক্ষণ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে বহুল বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যাহারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এই সকল ব্যাধির উল্লেখ আছে স্বীকার করেন না, তাহাদের অবগতির জন্য এই প্রবন্ধে আয়ুর্ব্বেদোক্ত এই সমস্ত ব্যাধির উল্লেখ প্রদর্শিত হইবে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ব্যাধির সংজ্ঞা ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রোক্ত ব্যাধির সংজ্ঞা এক হইতে পারে না, কারণ উভয় চিকিৎসা শাস্ত্র পৃথক্ পৃথক ভাষায় নিবদ্ধ; অতএব হেতু ও লক্ষণ গ্রহণ দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে যে, পূর্ব্ব লিখিত আময় নিচয় এবং আয়ুর্ব্বেদোক্ত "ওষধি গন্ধজ জ্বর, বিসূচিকা,

---

* ১৩১৭ সালের আশ্বিন মাসের হিন্দু-পত্রিকার ২৭৫ পৃষ্ঠার পর।

অগ্নি রোহিনী ও অসাধ্য শোথ,"• যথা ক্রমে সমান ব্যাধি। ওষধি গন্ধজ জ্বর, এক প্রকার জ্বর; অতএব জ্বর জ্ঞানের পূর্ব্বে জ্বরের প্রকার ভেদ জানা যাইতে পারে না, এই জন্য জ্বর সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র জ্বরোৎপত্তির হেতু সম্বন্ধে এই রূপ বলিয়াছেন যথা—

"মিথ্যাহার বিহারাভ্যাং দোষা হ্যামাশয় শ্রিতাঃ।
বহির্নিরস্ত কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরদাঃ স্যুঃ রসানুগাঃ॥"

অর্থাৎ—

অযথা আহার ও বিহার দ্বারা দোষ ত্রয় (বায়ু, পিত্ত ও কফ) আমাশয়াশ্রিত হইয়া কোষ্ঠস্থিত অগ্নিকে (কোষ্ঠ যথা অগ্নি স্থান, পক্বস্থান, মূত্রস্থান, রুধিরেরস্থান, হৃদয়, মলাধার, ফুপ ফুস্) দেহ বহির্ভাগে আনয়ন পূর্ব্বক অপক্ব রসের সহিত সম্বদ্ধ বিশিষ্ট হইয়া জ্বরোৎপাদন করে।

জ্বর রোগের সাধারণ লক্ষণ যথা—

"স্বেদাব রোধঃ সন্তাপঃ সর্ব্বাঙ্গ গ্রহনং তথা।
যুগপদ্ যত্র রোগেচ সজ্বরো ব্যপদিশ্যতে॥"

অর্থাৎ—

ঘর্ম্ম না হওয়া, শরীরে ও মনে সন্তাপ এবং সমস্ত দেহের পীড়া একত্র প্রকাশিত—এই লক্ষণসমূহ দেহের যে অবস্থা আনয়ন করে, সেই অবস্থা জ্বর নামে অভিহিত হয়। ইহাই সাধারণ লক্ষণ অন্যান্য লক্ষণ গুলি অনাবশ্যক বোধে এস্থলে আলোচিত হইল না। এই ব্যাধিকে প্রথমতঃ আট ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে তদ্যথা—

"জ্বরোহষ্টধা পৃথক্ দ্বন্দ্বঃ সংঘাতাগন্তজঃ স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ—

পৃথক্ যথা বাত জ্বর, পিত্ত জ্বর, কফ জ্বর। দ্বন্দ্ব যথা—বাত পৈত্তিক জ্বর, বাত শ্লৈষ্মিক-জ্বর, পিত্ত শ্লৈষ্মিক জ্বর। সংঘাত অর্থাৎ ত্রিদোষজ। আগন্তজ অর্থাৎ সহসা উপস্থিত কোন হেতু কর্তৃক জ্বর, আমাদের আলোচ্য "ম্যালেরিয়া জ্বর," এই জ্বরের অন্তর্ভুক্ত। এস্থলে বক্তব্য এই যে, আমাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মাই রোগের কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, যে কোন কারণেই হউক এই দোষত্রয়ের বৈষম্য হইয়া দেহীর যে অবস্থা আনয়ন করে তাহাকেই রোগ বলে। দোষত্রয়ের অদুষ্ট অবস্থায় রোগ জন্মিতে পারে না।

উপর্য্যুক্ত দোষত্রয় মিলিত ভাবে অথবা পৃথক ভাবে বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে দেহী পীড়িত হয়, কিন্তু আগন্তজ হেতু দ্বারা যখন প্রাণিগণ পীড়িত হয়েন, তাহার পূর্ব্বে দোষত্রয়ের, দ্বয়ের অথবা একটীর ও অদুষ্ট অবস্থাতেই রোগোৎপত্তি হইতে পারে। কারণ আগন্তজ নিমিত্ত দেহে রোগোৎপত্তি করিবার জন্য রোগের উপাদান সংগ্রহ ও দোষত্রয়কেই বিকৃত] অবস্থায় আনয়ন করিতে সক্ষম।

উল্লিখিত আগন্তজ জ্বরের অন্তর্গত "ওষধি গন্ধজ জ্বর" নামে এক প্রকার জ্বরের উল্লেখ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, তাহার লক্ষণ যথা—"ওষধি গন্ধজে মূর্চ্ছা শিরোরুগ্ বমথু-স্তথা"—অর্থাৎ ওষধি গন্ধজ জ্বরে মূর্চ্ছা, শিরঃ-পীড়া ও বমন হয়। ইহা ব্যতীত জ্বরের অন্যান্য সাধারণ লক্ষণ ত অবশ্যই থাকিবে। ডাক্তার মহোদয়গণ বলেন "পর্য্যুষিত দ্রব্যের অর্থাৎ পচা দুর্গন্ধ দ্রব্যের আঘ্রাণ জন্যই এই জ্বর

হয়, আয়ুর্ব্বেদ প্রণেতৃগণের মত পর্য্যালোচনা করিয়াও তাহাই জানা যাইতেছে এবং দেখা যায়। এই জ্বরদ্বারা আক্রান্ত রোগী যদি সত্বর সুচিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক সুচিকিৎসিত না হয়েন, তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যে প্লীহা, যকৃদ্দোষ প্রভৃতি নানারূপ উপদ্রবে উপদ্রুত হইতে থাকেন। কতিপয় ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণও এই প্রকারের জ্বরকেই "ম্যালেরিয়া জ্বর" বলিয়া থাকেন; অতএব দেখা যাইতেছে যে, আয়ুর্ব্বেদসম্মত "ওষধিগন্ধজ জ্বরে" এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রোক্ত "ম্যালেরিয়া জ্বরে" কোন প্রভেদ নাই। এখন দেখা যাউক, ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রোক্ত "কলেরা"-রোগসদৃশ কোন রোগ আয়ুর্ব্বেদে উল্লিখিত হইয়াছে কিনা? অবশ্যই হইয়াছে, কারণ আয়ুর্ব্বেদ অতি প্রাচীন কাল হইতে চিকিৎসাজগতে সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরূঢ় রহিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে অভিহিত হয় নাই এরূপ ব্যাধির অস্তিত্ব, জগতে অসম্ভব। তবে পুরাকালে মানবগণ নিজ নিজ সুকর্ম্ম ও দেশের উত্তম জল বায়ু জন্য স্বাস্থ্যবান্ দৃঢ়কায়, দীর্ঘায়ুঃ ও বলিষ্ঠ ছিলেন, কাজেই তাঁহাদিগের বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ব্যাধিযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতনা।

মানবশরীরে যত প্রকার আময় জন্মিতে পারে, ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান তাহা বলিতে ক্রটী করেন নাই।

আয়ুর্ব্বেদে "বিসূচিকা" নামে একটী ব্যাধি বর্ণিত হইয়াছে, এই ব্যাধিটী অজীর্ণ রোগের অন্তর্গত। অজীর্ণ আবার অনেক প্রকার কথিত আছে, তন্মধ্যে "বিসূচিকা" যে অজীর্ণরোগের অন্তর্গত, তাহাই এস্থলে বলা যাইতেছে।

"অজীর্ণমামং বিষ্টব্ধং বিদগ্ধঞ্চ যদীরিতম্।
বিসূচ্যলসকৌ তস্মাৎ ভবেচ্চাপি বিলম্বিকা॥"

অর্থাৎ—

যে অজীর্ণরোগ আম, বিষ্টব্ধ বিদগ্ধ নামে কথিত হইয়াছে, বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা এই তিন রোগ তাহা হইতেই উৎপন্ন হয়।

এই সমস্ত রোগের মধ্যে "কলেরা"র সহিত সমানলিঙ্গক "বিসূচিকা"নামক ব্যাধি আমাদের আলোচ্য বিষয়; অতএব তৎসম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত মত উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

তদ্যথা—

"সূচীভিরিবগাত্রাণি সুদন্ তিষ্ঠতেঽনিলঃ।
যস্যাজীর্ণেন সাবৈস্তৈরুচ্যতেতু বিসূচিকা॥"

(সুশ্রুতসংহিতা, উত্তরতন্ত্রে)

অর্থাৎ অজীর্ণহেতু বায়ু কুপিত হইয়া যেন সূচীসমূহযোগে সর্ব্বগাত্র পীড়ন করিতে করিতে অবস্থান করে, এই জন্য এই রোগের নাম বিসূচিকা হইয়াছে। বিসূচিকা-রোগের রূপ যথা—

"মূর্চ্ছাতিসার বমথুঃ পিপাসা শূলো ভ্রমোদ্বেষ্টন-
জৃম্ভদাহাঃ।
বৈবর্ণকম্পৌ হৃদয়ে রুজশ্চ ভবন্তি তস্যাং
শিরসশ্চ ভেদঃ॥"

(মাধবনিদানে)

অর্থাৎ এই ব্যাধিযুক্ত রোগীর দেহে উল্লিখিত লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়।

তদ্যথা—

মূর্চ্ছা, অতিসার (নানা বর্ণের তরল-ভেদ, ইহাতে শরীরস্থ দ্রবধাতুসকল মলমার্গদ্বারা বহির্গত হইতে থাকে) বমন, শূলবেদনা, উদ্বেষ্টন, (হস্ত পদ ও সন্ধিস্থানসকল সঙ্কুচিত হওয়া) জৃম্ভা (হাই তোলা) দাহ,

শরীরের বিবর্ণতা, হৃদয়ের পীড়া ও মস্তকে নানারূপ পীড়া। অসাধ্যলক্ষণ যথা—

"নিদ্রানাশোঽরতিঃ কম্পো মূত্রাঘাতো বিসংজ্ঞিতাঃ।
অমী—উপদ্রবা ঘোরা বিসূচ্যাং পঞ্চ দারুণাঃ॥"
(মাধবনিদানে)

অর্থাৎ—নিদ্রানাশ, অসহনীয় শরীরপীড়া, কম্প, মূত্ররোধ ও জ্ঞানলোপ এই পাঁচটী উপদ্রব বিসূচিকাতে অতি দারুণ অর্থাৎ মরণজ্ঞাপক।

পাশ্চত্যচিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসকগণ ও রোগীতে এই সমস্ত লক্ষণ দেখিলে "কলেরা" নামে এই ব্যাধির পরিচয় দিয়া থাকেন এবং আয়ুর্ব্বেদোক্ত অসাধ্যলক্ষণ প্রকাশিত হইলে তাঁহারাও রোগের অসাধ্যতা নির্দ্ধাচন করিয়া থাকেন; অতএব লক্ষণ মিলাইয়া দেখিলে "কলেরা" ও "বিসূচিকা" একই ব্যাধি বলিয়া প্রমাণিত হয়।

যাহারা বলেন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে "কলেরা" রোগ উক্ত হয় নাই; তাহাদের জানা উচিত যে "কলেরা" নামে কোন ব্যাধি আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হওয়া সম্ভব নহে, তবে কলেরার সমানলক্ষণ (বিসূচিকা) অভিহিত হওয়ায় কলেরার অস্তিত্ব সমালোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইয়ুরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্র-নিপুণসুচিকিৎসকগণ, যে আময়কে "বিউবণিক্ প্লেগ্" নামে অভিহিত করেন, আমাদের সনাতন চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ তৎসম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে;—

তদ্যথা—

"কক্ষভাগেষু যে স্ফোটা জায়ন্তে মাংসদারণাঃ।
অন্তর্দাহজ্বরকরাঃ দীপ্তপাবকসন্নিভাঃ॥
সপ্তাহাদ্বা দশাহাদ্বা পক্ষাদ্বা ঘ্নন্তি মানবম্।
তামগ্নিরোহিণীং বিদ্যাদসাধ্যাং সর্ব্বদোষজাম্॥"

অর্থাৎ—যে সমস্ত মাংসদারণকারি ব্রণ কক্ষভাগে (মাংসল স্থানসমূহে অর্থাৎ বাহুমূল, উরুদেশ, গলদেশের উভয়পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে) জন্মিয়া অন্তর্দাহ ও জ্বর প্রকাশিত করে ও প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় যেন শরীরকে দগ্ধ করিতে থাকে এবং সাত দিন, দশ দিন, অথবা এক পক্ষের মধ্যে মানবকে শমন-সদনগামী করায়, তাহাকে "অগ্নিরোহিণী" বলে। এই ব্যাধি ত্রিদোষজ।

অভিজ্ঞ ডাক্তার মহোদয়গণও এই সমস্ত লক্ষণযুক্ত ব্যাধিকে "বিউবণিক্ প্লেগ্" আখ্যায় অভিহিত করেন। সুতরাং পাশ্চাত্যচিকিৎসাশাস্ত্রোক্ত "বিউবণিক্ প্লেগ্" ও আয়ুর্ব্বেদোক্ত "অগ্নিরোহিণী" একই ব্যাধি।

ইয়ুরোপীয়চিকিৎসানিপুণ ভিষগ্‌গণ বলেন, 'বেরি বেরি' নামক ব্যাধি প্রথমে রোগীর পাদদেশ হইতে ফুলিয়া ক্রমে সারাঙ্গব্যাপকরূপে পরিণত হয়", আয়ুর্ব্বেদপ্রণেতাও শোথ-রোগাধিকারে এই রূপ একটী ব্যাধির বর্ণনা করিয়াছেন।

তদ্যথা—

"অনন্যোপদ্রবকৃতঃ শোথঃ পাদসমুত্থিতঃ।
পুরুষং হন্তি নারীঞ্চ মুখজো গুহ্যজোদ্বয়ম্॥"

অর্থাৎ—

অনন্যোপদ্রবকৃত পাদসমুত্থিত শোথ পুরুষকে নষ্ট করে, মুখসমুত্থিত শোথ নারীকে বিনষ্ট করে এবং মলদ্বারসমুত্থিত শোথ উভয়কেই অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষকে কাল কবলিত করায়। "অনন্যোপদ্রবকৃতঃ" ইহার অর্থ বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীকণ্ঠ দত্ত এই শ্লোকের টীকায় এই রূপ বলিয়াছেন,

তত্রথা—

"অন্তস্ত উপদ্রবা অন্তোপদ্রবাস্তদ্বিপরীতা। অনন্তোপদ্রবা এতেনায়মর্থঃ শোথস্যৈব যে উপদ্রবাস্তৈঃ স্বৃতঃ ॥" অর্থাৎ অন্তের উপদ্রবকে অন্তোপদ্রব বলে, তাহার বিপরীতকেই "অনন্তোপদ্রবকৃত" বলে; অতএব টীকাকারের কথার মর্ম্মার্থ এই যে—অন্য রোগের উপদ্রবরূপেও শোথ জন্মিয়া থাকে, যেমন পাণ্ডুরোগে শোথ জন্মিয়া থাকে; এইরূপ শোথকে অন্য রোগের উপদ্রবরূপ শোথ বলে; কিন্তু এই শোথ-রোগ সে ভাবে জন্মিবে না। শোথরোগ নির্দ্দিষ্ট যে সমস্ত উপদ্রব কথিত আছে, সেই সমস্ত উপদ্রবযুক্ত হইবে। চরক ও সুশ্রুতে সেই সমস্ত উপদ্রব প্রদর্শিত হইতেছে,

তত্রথা—

"শ্বাসঃ পিপাসা দৌর্ব্বল্যং জ্বরশ্ছর্দ্দিররোচকঃ।
হিক্কাতিসারকাসাশ্চ শোথিনং ক্ষপয়ন্তিহি ॥"
ইতিসুশ্রুতোক্তিঃ।

চরকেহপ্যুক্তং—"ছর্দ্দিস্তৃষ্ণারুচিঃ শ্বাসো জ্বরোঽতিসার এব চ।
সপ্তকোঽয়ং সদৌর্ব্বল্যঃ শোথোপদ্রবসংগ্রহঃ।"
ইতি

উভয় শ্লোকার্থ যথা—বমন, তৃষ্ণা, অরুচি, শ্বাস, জ্বর, অতিসার ও দৌর্ব্বল্য এই লক্ষণগুলি শোথরোগের উপদ্রব।

টীকাকার "অনন্তোপদ্রবকৃতঃ" ইহার অর্থ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহার মর্ম্ম এই রূপ; যথা—শোথজনক হেতু হইতে উৎপন্ন ও শোথরোগের উল্লিখিত উপদ্রব সকল দ্বারা উপদ্রুত পাদ-সমুত্থিত শোথ (ক্রমে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগামী) পুরুষকে, মুখসমুত্থিত হইলে স্ত্রীকে, ও মলদ্বার হইতে উৎপন্ন হইলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কে বিনষ্ট করে।

অতএব এই শোথরোগকেই "বেরি বেরি" নামক ইয়ুরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রোক্ত ব্যাধি বলা যাইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে এই সমস্ত ব্যাধির বিষয় সমালোচিত হয় নাই, সাধারণের এইরূপ ধারণার কারণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রসম্মত চিকিৎসাব্যবসায়ীদিগের উদ্যম ও অধ্যবসায়ের অভাব।

আয়ুর্ব্বেদসম্মত চিকিৎসাপ্রণালীর উপর ও জনসাধারণের অনাস্থা-প্রদর্শনের কতকগুলি হেতু বর্ত্তমানে পরিদৃষ্ট হয়। উত্তম শিক্ষিত অস্মদ্দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের সংখ্যা অতি বিরল। অপরপক্ষে চিকিৎসাশাস্ত্র ও অতি দুরধিগম্য। কিন্তু কতকগুলি অর্থগৃধ্নু, লোভী, চিকিৎসাশাস্ত্রে ও চিকিৎসাকার্য্যে অনভিজ্ঞ লোক বাহ্যাড়ম্বরে সরলবুদ্ধি লোকসকলকে প্রতারিত করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতেছে! তাহাদের অজ্ঞতা ও চিকিৎসাকার্য্যে অপারদর্শিতায় অস্মদ্দেশীয় চিকিৎসাপ্রণালী সাধারণের অবজ্ঞার পাত্র হইয়াছে।

যদি অস্মদ্দেশীয় রাজন্যবর্গ ও কতকগুলি সুনিপুণ বৈদ্য মিলিত হইয়া, এইরূপ লোভী চিকিৎসাব্যবসায়ীদিগকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত ও চিকিৎসা ব্যবসায় হইতে নিতাড়িত করিবার জন্য অধ্যবসায় অবলম্বন করেন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবার সম্ভাবনা; নতুবা অন্য শত শত চেষ্টা দ্বারাও সেরূপ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত বলিয়া অনুমিত হয়।　　(ক্রমশঃ)

শ্রীউষানাথ কাব্যতীর্থ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্জিকা-সমস্যা।

গত ফাল্গুনমাসের হিন্দুপত্রিকায় 'বঙ্গে পঞ্জিকা-বিভ্রাট' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিলাম। আজকাল বঙ্গীয় পঞ্জিকাসকলের পরস্পর যেরূপ অনৈক্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহাতে বাস্তবিকই ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু জনসাধারণের পক্ষে বিধিব্যবস্থানুমোদিতভাবে ধর্ম্মকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ মতানৈক্যের দিনে প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দুরই প্রকৃত শাস্ত্রার্থ অবগত হইবার জন্য যত্ন স্বীকার করা এবং যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। শাস্ত্রেও আছে—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কার্য্যোহর্থবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

বিগত দোলযাত্রা-বিষয়ে যে মতদ্বৈধ দেখা গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে অপক্ষপাতভাবে দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

দোলযাত্রা প্রভৃতি সমস্ত স্মার্ত্তকর্ম্মেই মুখ্যকর্ম্মের প্রাধান্য সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। এই হেতু মুখ্যকর্ম্ম যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হইলে, তদাত্মক পূজাদিরও অক্ষতভাবে অনুষ্ঠান হইয়া থাকে এবং তদ্বৈপরীত্যে অর্থাৎ মুখ্যকর্ম্ম যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হইলে তত্তৎপূজাদিকর্ম্মও পণ্ড হইয়া থাকে। যাহাতে বিধানসম্মত ও উপযুক্ত সময়ে মুখ্যকর্ম্মনিচয় সমাচরিত হয়, তদর্থে শাস্ত্রকারগণ অতি কঠোর আদেশ করিয়াছেন—

"গণিতাজ্জায়তে কালঃ যত্র তিষ্ঠতি দেবতা।
বরমেকাহুতিঃ কালে নাকালে লক্ষকোটয়ঃ॥"
ইতি মদনপারিজাতবচনং

অর্থাৎ গণিতশাস্ত্র হইতেই দেবাধিষ্ঠিত পুণ্যমুহূর্ত্তের বিষয় অবগত হইতে পারা যায়; তদনুসারে যথাকালে একটি মাত্র আহুতিপ্রদানও অশেষ মঙ্গল বিধায়ক হয়, কিন্তু সেই দিব্যক্ষণ অতীত হইয়া গেলে, লক্ষকোটী আহুতিতেও কোন ফল প্রদান করে না। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা উৎসবে তদীয় 'দোলারোহণ'ই মুখ্যকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। পূজাদি অঙ্গমাত্র। সুতরাং দোলারোহণ যথাসময়ে নিষ্পন্ন হইলে তদাত্মক পূজা, ভোগ ও হোমাদি তৎকালমধ্যে সম্পন্ন না হইলেও কোনওরূপ ত্রুটীর বা কর্ম্মভ্রংশের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে দেখা যাউক যে উক্ত দোলারোহণের বিধিসম্মত সময় কখন?

১। "ফাল্গুন্যাং পৌর্ণমাস্যান্তু দোলয়িত্বা বিধানতঃ।
গোবিন্দমর্চ্চয়েদ্দেবং সভার্য্যমরুণোদয়ে॥
একাদশ্যাং সমারভ্য পঞ্চম্যান্তং সমাপয়েৎ।
পঞ্চাহানি ত্র্যহানি স্যুর্দোলোৎসবো বিধীয়তে"॥
ইতি পদ্মপুরাণবচনম্।

২। "বর্ষে বর্ষে চ ফাল্গুন্যামর্য্যমর্ক্ষে নিশাত্যয়ে।
গোবিন্দং দোলয়েদ্ যস্তু স বৈকুণ্ঠপুরং ব্রজেৎ॥"
ইতি ব্রহ্মপুরাণবচনম্।

৩। ফাল্গুন্যাঃ পূর্ব্বতো বিপ্রাশ্চতুর্দ্দশ্যাং নিশামুখে।
কৃত্বা বহ্ন্যুৎসবং তত্র প্রাতর্গোবিন্দ-দোলনম্॥"
ইতি দোলযাত্রাতত্ত্বধৃত বরাহ সংহিতাবচনম্
"অত্র 'প্রাতঃ' পদং অরুণোদয়কালপরম্॥"
ইতি তদ্বচন ব্যাখ্যায়াং স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যচরণাঃ।

৪। "প্রাতঃ স্নাত্বা চ সংপূজ্য দোলায়াং পুরুষোত্তম।
গোবিন্দমর্চ্চয়েদ্দেবং সভার্য্যমরুণোদয়ে ॥"
ইতি দোলযাত্রাতত্ত্বধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনম্—

এই বচনের ব্যাখ্যায় স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য—"অত্রারুণোদয়ে পৌর্ণমাস্যাং গোবিন্দং সভার্য্যমর্চ্চয়েদিতি অন্বয়ঃ"

৫। "ফাল্গুন্যাং ক্রীড়নং কুর্য্যাদ্দোলায়াং সতি ভূমিপঃ।
রাত্রাবুত্তরফল্গুন্যাং অন্তর্যামে শনৈঃ শনৈঃ ॥"
ইতি দোলযাত্রাবিবেকধৃতস্কন্দপুরাণবচনম্

৬। "ফাল্গুন্যাং পঞ্চদশ্যান্তু দোলযাত্রা হরের্ভবেৎ।
তত্রৈব পূজয়েদ্দেবং নানাবিভববিস্তরৈঃ ॥"
ইতি কৃত্যচিন্তামণিঃ

উপরিলিখিত বচনগুলি আলোচনা করিয়া দেখিলে, ইহা অতি সুস্পষ্টরূপে ও নিঃসংশয়িতভাবে প্রতিভাত হয় যে—"অরুণোদয়কালে পৌর্ণমাসীলাভে" দোলারোপণ অনুষ্ঠেয়। এই জন্যই স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, "যত্ত্বরুণোদয়কালে পৌর্ণমাসীলাভস্তদা তত্রৈব দোলযাত্রা।" ইতি দোলযাত্রাতত্ত্বে স্মার্ত্তলেখঃ।

আবার শূলপাণিও লিখিয়াছেন—"তদিহ ব্যস্তসমস্তবচনৈরেকবাক্যতয়া ফাল্গুনপৌর্ণমাস্যাং রাত্রিশেষযামগতায়াং উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রযুতায়াং দোলযাত্রা, তদ্দিনএব সায়ং বহ্ন্যুৎসবং কুর্য্যাৎ।"

এদিকে শব্দকল্পদ্রুমে যে দোলযাত্রাবিষয়ক সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা লিখিত আছে, তাহাতেও এতদনুকূল বিধানই দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—"যদা—অরুণোদয়কালে পৌর্ণমাসীলাভ- দোলযাত্রা। উভয়দিনে অরুণোদয়কালে পৌর্ণমাসীলাভে পূর্ব্বদিনে, সঙ্গব মধ্যাহ্নকালব্যাপিত্বাৎ ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিত্বেন তিথের্বলবত্ত্বাচ্চ। যদা তিথিক্ষয়বশাদরুণোদয়কালে ন পৌর্ণমাসীলাভস্তদা কদাচিৎ সহায়ভাবেন চতুর্দ্দশ্যাদরঃ" ইত্যাদিঃ—

কেহ কেহ এস্থলে একপ বলেন যে, পূর্ণিমাতিথিপ্রাপ্তির সহিত এই উৎসবের কোনও নিত্য সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা তাহার এই কারণ প্রদর্শন করেন যে, যখন শাস্ত্রে দোলযাত্রার 'প্রত্যব্দকর্ত্তব্যতা' দেখা যাইতেছে এবং যখন পূর্ণিমাতিথি দৈবাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গেলে অরুণোদয়কালে প্রাপ্তি সম্ভব হয় না, তখন পূর্ণিমাতে কার্য্য করিতে গেলে কৃত্যলোপ সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। সুতরাং পূর্ণিমাপ্রাপ্তি এই উৎসবের কোনও বিশিষ্ট প্রকৃতিসিদ্ধ লক্ষণ নহে। এরূপ যুক্তির মূলে কোনও সারবত্তা আছে বলিয়া বোধ হয় না। যেহেতু যদি দৈবাৎ পূর্ণিমাতিথির ক্ষয়বশতঃ উহার অরুণোদয় কালপ্রাপ্তি না ঘটে, তখন কাজে কাজেই বাধ্য হইয়া চতুর্দ্দশীর আদর করিতে হয়। এইজন্য প্রাচীন স্মার্ত্তেরা সেই স্থলে "তদা কদাচিৎ সহায়ভাবেন চতুর্দ্দশ্যাদরঃ।" এইরূপ ব্যবস্থাও করিয়াছেন; কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ণিমাতিথির সেরূপ ক্ষয় না ঘটিলেও অর্থাৎ অরুণোদয়ে পূর্ণিমাতিথি-প্রাপ্তি সত্ত্বেও কি চতুর্দ্দশীতে কার্য্য করিতে হইবে? তবে কি তিথি ইচ্ছানুসারেই গ্রহণ করা যায়? ইহা কিরূপ যুক্তি বুঝিতে পারি না।

এক্ষণে দেখা যাউক্ যে 'অরুণোদয়ে পৌর্ণমাসী-লাভ' কাহাকে বলা যায়। রজনীর শেষ যামার্দ্ধ অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের

পূর্ব্বতঃ চতুর্দ্দণ্ড-পরিমিত কালকে "অরুণোদয় কাল" বলা হয়। প্রমাণ যথা—

চতস্রো ঘটিকাঃ প্রাতররুণোদয় উচ্যতে।
যতীনাং স্নানকালোঽয়ং গঙ্গাম্ভঃসদৃশঃ স্মৃতঃ॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্—

তথাচ—

রজনীশেষযামস্য শেষার্দ্ধমরুণোদয়ঃ"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই চতুর্দণ্ড-সময় মধ্যে পূর্ণিমাতিথির সংঘটনে দোলারোপণ কর্ম্ম সম্পাদ্য। কিন্তু এই অরুণোদয়ে পূর্ণিমাতিথি যদি ১পল বা ২পল বা অর্দ্ধ-পল মাত্র স্থায়ী হয়, তাহা হইলে এই অতি সঙ্কীর্ণ ক্ষণমধ্যে কি করিয়া "দোলারোপণ"কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে? সুতরাং অরুণোদয়ে পূর্ণিমাতিথি পাইলেই যে সব হইল তাহাও নহে। সেইজন্য তিথি-স্থিতিপলাদির অনুষ্ঠানযোগ্য প্রশস্ততা থাকা আবশ্যক। এক্ষণে কত দণ্ড বা কত পল হইলে কর্ম্মযোগ্য প্রশস্ততা লাভ ঘটে, এতৎসম্বন্ধে তর্কের অবতারণা হইতে পারে। ইহা আশঙ্কা করিয়া প্রাচীন ব্যবস্থাপকগণ "মুহূর্ত্তান্যূন" কালের কর্ম্মযোগ্য প্রশস্ততা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তৎপ্রমাণম্ যথা—

..."এতেন পূর্ব্বদিনে অরুণোদয়ং বিনা পূর্ব্বাহ্ণে পৌর্ণমাসীলাভঃ পরদিনে মুহূর্ত্তান্যূন-তিথিলাভস্তদা ফল্গুৎসবঃ পূর্ব্বদিনে যুগ্মবচনাদনুরোধাদিতি নিরস্তম্ উভয়দিনে কর্ম্মযোগ্যপ্রশস্তকাল-প্রাপ্ত-তিথিসন্দেহ এব যুগ্মবচনপ্রবৃত্তেঃ। এবং পঞ্চমীপর্য্যন্তাসু তিথিসু তৎকরণে অনয়ৈব দিশা ব্যবস্থোন্নেয়েতি।" ইতি দোলযাত্রাতত্ত্বম্।

এই কর্ম্মযোগ্য প্রশস্ততার উদ্দেশ্যে যে 'মুহূর্ত্তান্যূনকালে'র নির্দ্দেশ আছে, তাহা যে কেবল দোলোৎসব সম্বন্ধেই লিখিত আছে তাহা নহে। নানাবিধ ব্রতোপবাস, স্নান—এমনকি শ্রাদ্ধসম্বন্ধেও ঐ মুহূর্ত্তান্যূন-তিথিলাভের বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। তৎপ্রমাণঃ যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

"ব্রতোপবাসস্নানাদৌ ঘটিকৈকা যদা ভবেৎ।
উদয়ে সা তিথিগ্রাহ্যা শ্রাদ্ধাদাবস্তগামিনী॥"

অত্র শ্লোকে 'ঘটিকাপদ' মুহূর্ত্তবাচকম্।

আর একটী কথা বলিয়া, প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। আমাদিগের দেশে স্মার্ত্তকর্ম্মসমূহে "তিথি" সর্ব্বোচ্চরূপে বলবৎ ও নিয়ামক হইলেও "নক্ষত্রে"রও যথেষ্ট বিধি-নিয়ামকশক্তি ও মাহাত্ম্যের পরিচয় পাওয়া যায়। দোলযাত্রাসম্বন্ধীয় বিধানেও "বর্ষে বর্ষে চ ফাল্গুন্যামর্য্যমর্ক্ষে নিশাত্যয়ে" "রাত্রাবুত্তর-ফল্গুন্যাং অন্তর্যামে শনৈঃ শনৈঃ," যৎ ফাল্গু-নস্য রাকাদাবুত্তরাফল্গুনী যদা" প্রভৃতি বচন-দ্বারা "দোলারোহণে"র উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে অনুষ্ঠেয়ত্ব পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং এক্ষেত্রে উক্ত নক্ষত্রকে দোলারো-হণকালের নিয়ামকস্বরূপ গ্রহণ না করিলেও পূর্ণিমাতিথির সহিত উহার মিলন যে অধিকতর বাঞ্ছনীয় ও অধিকতর মাহাত্ম্য-বিজড়িত, তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। তিথিবিহিতকৃত্যসমূহে সেই সেই তিথির সহিত বিশিষ্ট নক্ষত্রের সম্মি-লনে ফলের আধিক্য শাস্ত্রে বর্ণিত থাকিতে দেখা যায়। গ্রন্থে নানাস্থানে ও নানাভাবে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেমন রামনবমী দিবসীয় চৈত্রশুক্লনবমী পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্ত হইলে সর্ব্বকামপ্রদ হইয়া

থাকে; যেমন শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীদিনে রোহিণীনক্ষত্রের সংযোগ ঘটিলে উহা আরও দুর্লভ ও শিবময় হইয়া উঠে এবং পরম পুণ্য "জয়ন্তীযোগ" আখ্যা ধারণ করে; যেমন জ্যৈষ্ঠশুক্লদশমীতে দশহরাস্নান দশবিধ পাপ ক্ষয় করিয়া থাকে, কিন্তু উহা হস্তানক্ষত্র-যুক্ত হইলে দশজন্মার্জ্জিত দশবিধ পাপ ক্ষালন করে। ইত্যাদি—

অত্র প্রমাণানি যথা—

১। "চৈত্রে মাসি নবম্যান্তু জাতো রামঃ স্বয়ং হরিঃ।
পুনর্বস্বৃক্ষসংযুক্তা সা তিথিঃ সর্ব্বকামদা॥
পুনর্বস্বৃক্ষ সংযোগঃ স্বল্পোঽপি যদি লভ্যতে।
চৈত্রশুক্লনবম্যাস্তু সা তিথিঃ সর্ব্বকামদা॥"

ইতি অগস্ত্যসংহিতা—

২। "শ্রাবণে বা নভস্যে বা রোহিণীসহিতাষ্টমী।
যদা কৃষ্ণে নরৈর্লব্ধা সা জয়ন্তী প্রকীর্ত্তিতা॥"

ইতি বিষ্ণুপুরাণম্—

"প্রেতযোনিগতানান্তু প্রেতত্বং নাশিতন্তু তৈঃ।
যৈঃ কৃতাঃ শ্রাবণে মাসি অষ্টমী রোহিণীযুতা॥
কিং পুনর্বুধবারেন সোমেনাপি বিশেষতঃ॥"

ইতি পদ্মপুরাণবচনম্—

৩। "জ্যৈষ্ঠে মাসি ক্ষিতিসুতদিনে শুক্লপক্ষে দশম্যাং
হস্তে শৈলান্নিরগমদিয়ং জাহ্নবী মর্ত্ত্যলোকং।
পাপান্যস্যাং হরতি চ তিথৌ সা দশেত্যাহুরার্য্যাঃ
পুণ্যং দদ্যাদপি শতগুণং বাজিমেধাযুতস্য॥"

ইতি শঙ্খঃ।

পুনশ্চ—শুক্লপক্ষস্য দশমী জ্যৈষ্ঠে মাসি দ্বিজোত্তম।
হরতে দশ পাপানি তস্মাৎ দশহরা স্মৃতা॥

হস্তর্ক্ষযোগাত্তু ফলাধিক্যমাহ যথা—

জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে দশম্যাং হস্তযোগতঃ।
দশজন্মাঘহা গঙ্গা দশপাপহরা স্মৃতা॥

ইতি ব্রহ্মপুরাণম্—

এ সম্বন্ধে আর অধিক দৃষ্টান্তের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। উপরিলিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে নির্দ্দিষ্ট তিথিসমূহের সহিত বিশিষ্টনক্ষত্র-নিচয়ের সংযোগবশতঃ এক আরও মনোহর ও অপূর্ব্ব মুহূর্ত্তের উদ্ভব হইয়া থাকে। এবংবিধ তিথি নক্ষত্র-সঙ্গম গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমের ন্যায় জীবগণের অশেষদুরিতনাশের কারণস্বরূপ, নিখিলমঙ্গলের নিদান, পুণ্যের আধার ও পবিত্রতার বীজস্বরূপ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের দোলারোহণে অরুণোদয়কালের সহিত উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রের সংঘটনে যে আরও মাহাত্ম্যবিস্তার হয়, তাহার একটী সূক্ষ্ম রহস্যও আছে। সকল নক্ষত্রের অধিপতি দেবতা সমান নহে। কোনও নক্ষত্রের অধীশ্বর অগ্নি, কাহারও ব্রহ্মা, কাহারও বরুণ, কারও চন্দ্র, কাহারও বা বৃহস্পতি। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রের অধিপতি "সূর্য্য"। এই জন্যই জ্যোতির্জ্জগতে ইহা 'সূর্য্যনক্ষত্র' নামে অভিহিত। প্রমাণং যথা—"যোঽর্যমদিনকৃত্বষ্টৃপবনশক্রাগ্নিমিত্রাশ্চে"ত্যাদিঃ দীপিকায়াং। পবিত্র ব্রহ্মমুহূর্ত্তান্বিত সূর্য্যোদয়সময়ে এই সূর্য্যনক্ষত্রের সংঘটন কি অপূর্ব্ব নহে? অসীমমহিমময়, অতুল-গৌরবমণ্ডিত শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের দোলারোহণ-সময়ে এই নক্ষত্রঘটিত মণিকাঞ্চন যোগ কি

তাঁহার দিব্যজ্যোতিঃপ্রকাশনের ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যবিস্তারের নৈসর্গিক উপাদান নহে? শুধু তাহাই নহে, দোলারোহণকর্ম্মে এই নক্ষত্রের আরও একটী বিশেষ উপযোগিতা আছে। এই নক্ষত্রটী জ্যোতিঃশাস্ত্রে "উর্দ্ধ-মুখ" নক্ষত্র বলিয়া পরিচিত। তন্নিবন্ধন দোলমঞ্চারোপণ প্রভৃতির ন্যায় উর্দ্ধমুখীন কর্ম্মে এই নক্ষত্রের প্রশস্ততা ও উপাদেয়তা শাস্ত্রে বিশিষ্টরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে

এই সকল তত্ত্বগুলি গভীরভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, উত্তরফল্গুনীর সহিত 'দোলারোহণে'র একটি মহৎ নিত্যসম্বন্ধ চিরদিন বিদ্যমান রহিয়াছে। এইজন্যই বোধহয় শাস্ত্রকারগণ "বর্ষে বর্ষে চ ফাল্গুন্যামর্য্যমর্ক্ষে নিশান্তিমে" "রাত্রাবুত্তরফল্গুন্যাং অন্তর্যামে শনৈঃ শনৈঃ" "যৎফাল্গুনস্য রাকাদাবুত্তরা ফল্গুনী যদা" প্রভৃতি বাক্যদ্বারা পুনঃ পুনঃ উত্তর-ফল্গুনীতে অনুষ্ঠানের কথা বলিয়া গিয়াছেন।

বিগত দোলারোহণোৎসবের নির্দ্ধারিত দিনদ্বয় সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১লা চৈত্র অরুণোদয়কালে 'মুহূর্ত্তান্যূনপৌর্ণমাসীলাভ' হইয়াছে. আবার মণিকাঞ্চনযোগস্বরূপ কৃত্যোৎকর্ষবিধায়ক উত্তর-ফল্গুনীনক্ষত্রের সংযোগও ঘটিয়াছে। কিন্তু, ৩০শে ফাল্গুন তারিখে অরুণোদয়ে মুহূর্ত্তা-ন্যূনপৌর্ণমাসীলাভ হয় নাই, ফল্গুনী-যোগও ঘটে নাই। তাহার সাক্ষী পঞ্জিকাসকল।

'কিং ফলং সাক্ষিণান্যেন
চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ॥'

ইত্যলং পল্লবিতেন। *

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘটক।

* অরুণোদয় কালই দোলারোহণের মুখ্য সময়, একথা যাঁহারা বলেন, অর্থাৎ যাঁহারা ১লা চৈত্র দোলযাত্রার পক্ষপাতী, তাঁহাদের অবলম্বন "দোলযাত্রা তত্ত্ব" ও "দোলযাত্রা বিবেক" গ্রন্থদ্বয়। মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত-রঘুনন্দন ও শূলপাণি যে ঐ দুই খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য স্বকৃত সমস্ত-গ্রন্থের কথাই গ্রন্থবিশেষে বলিয়াছেন, অথচ দোলযাত্রাতত্ত্বের নামোল্লেখ করেন নাই। পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন বলেন, উক্ত গ্রন্থ দুই খানি স্মার্ত্ত ও শূলপাণির লিখিত নহে। স্মার্ত্তের ২৮ তত্ত্বই প্রসিদ্ধ। এবার এই গ্রন্থদ্বয়ের বলে যেরূপ ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, এই গ্রন্থদ্বয় প্রামাণিক হইলে বহুবার এই রূপ ব্যবস্থা দেওয়া প্রয়োজন ছিল, কিন্তু পণ্ডিতগণ তখন নীরবই ছিলেন। ঐ গ্রন্থদ্বয়ের প্রামাণ্য-প্রচার প্রয়োজন; নচেৎ সংশয় যাইবে না।

হিঃ পঃ সঃ।

আত্মিক-কাহিনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১১)

অনল আয়ুধ মুখে পাবকের শিখা
হইল প্রদীপ্ত এক, বাহিরিল বেগে,
প্রজ্জ্বলিত ক্ষুদ্র গোলা বিকট গর্জ্জনে।
গভীর নিস্তব্ধ সব মুহূর্ত্তের পরে।
যাতনার প্রকম্পনে শিহরিল দেহ,
নিশ্চল সকলি পরে। পাইল প্রকাশ
সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া মম দৃঢ়তর রূপে
ধীরে ধীরে নিরানন্দ অসাড়-লক্ষণ।
বেড়িয়া আমায়, জাগিছে গভীর নিশা,
ঘোর কৃষ্ণ অন্ধকার দিগন্ত-বসনা।
যদি এসে থাকে মৃত্যু কেন তার সনে
আসে নাই সে স্বর্গীয় সুষুপ্তি অনন্ত,
যার তরে এত দিন আছি ব্যাকুলিত।
কখন বিস্মৃতি মোর ফেলিবে মুছিয়া
অতীতের চিত্রপট! কি হেতু বিলম্ব?

অবশেষে নব এক ভীতির বিকাশে
কাঁপিল হৃদয় মম, ভাবিলাম আমি,
সবিশেষ কিছু যেন হবে সঙ্ঘটন।
কিবা তাহা? তার লাগি, তার প্রতীক্ষায়
বিভীতে—ব্যাকুলচিত্তে রহিনু জাগিয়া।
এড়াইতে দুশ্চিন্তার দারুণ দংশন
সমাদরে আলিঙ্গন ক'রেছি কৃতান্তে,
করিয়াছি আপনিই আপন-বিনাশ।
অবশ্যই মৃত আমি; ত্যজিয়াছি আমি,
দেহ মম যবে হ'ল কঠিন শীতল,
হৃদয়ের যন্ত্র রুদ্ধ, অচল ধমনী।
নশ্বর সে শব মম রহিল পড়িয়া,
সুধু জড়পিণ্ডবৎ, নহে কিছু আর!
সে ঘটনা, যাহে মম চেতনা বিনাশ,
হ'য়েছিল সুনিশ্চিত, তবু মৃত্যুশেষে
কেমনে হইল দেহে চিন্তাসমাবেশ?
ভয়াকুল ছিনু আমি; জানিয়াছি শেষে,
পারি নাই সব আমি করিতে বিনাশ,
মোর মধ্যে ছিল যাহা। ছিল এক বাকি:
চিন্তা মম এখনও রয়েছে সজীব।

(১২)

মানবের কোন কথা না পারে বর্ণিতে
সেই মহাত্রাস, আক্রমিল যাহা মোরে,
বুঝিলাম যবে সেই ঘটনা ভীষণ।
বোধ হ'ল জ্ঞান মম হতেছে ঘূর্ণিত
সে অনন্ত মহাশূন্যে বাত্যাসমাকুল।
কিবা ভবিষ্যৎ মম কবে তা জানিব?

(১৩)

অন্ধকার নিশিথিনী, দীপশিখালোক
পৃথিবীর কোন প্রান্তে নহে বিভাসিত,
করিব প্রতীক্ষা আমি। কিসের লাগিয়া?
না পারে হৃদয় মম করিতে কল্পনা।
এ কিরে অনন্ত কাল, অথবা কি তাহা,
একই মুহূর্ত্তমাত্র, যার কোলে আমি
সহিয়াছি উৎকণ্ঠার পীড়ন বিষম।
নাহি ভাষে বাক্যে মম, যেন অনুমানি
সহস্র বরষ কাল গিয়াছে বহিয়া
ধরিতে জীবন মম ইচ্ছার বিরুদ্ধে।
কিবা দণ্ড মম তরে, যে করেছে আশা
সমাধিই হবে তার চির পরিণাম?

(১৪)

পাষণ্ডের ভ্রান্ত অন্ধবিশ্বাসের মূলে
আছে কি কোনও সত্য, নিরদয় রূপে
প্রতিহিংসা পরবশ জগতের পতি
নিক্ষেপি দুষ্কৃতগণে অনন্তনরকে
তাহাদের মহাদণ্ড করেন বিধান?
তবে আমি দুঃসাহসে বান্ধিয়া হৃদয়
সে নৃশংশ মহাদণ্ড ধরিব মস্তকে।
সহিবারে শান্ত ভাবে লভেছি সাহস
উৎকণ্ঠার উৎপীড়ন যদি হয় শেষ।

(১৫)

নীরবে সময়স্রোতে চলিল বহিয়া,
বৃথা ব'সে রহিলাম দণ্ডের আশায়;
আসিল না বিচারক; হায়! অবশেষে
মম জড়হৃদয়ের অন্তস্তল হ'তে
যাতনার তীব্রধ্বনি হইল উত্থিত!
কহিলাম উচ্চকণ্ঠে দিগন্ত ধ্বনিয়া
"হে প্রভো! আমারে দাও করুণার কণা।"

(১৬)

অকস্মাৎ স্বর এক তিমির-বাহিরে
জিজ্ঞাসিল মোরে "কি বাসনা তব মনে?
কি প্রসাদ চাহ তুমি ঈশ্বরসমীপে,
যার সত্তা আজীবন করনি স্বীকার।"
বিনম্র অস্ফুটকণ্ঠে কহিনু তখন
'হে প্রভো! দেখাও মোরে আলোকের তারা'

(১৭)

তখনই সমুজ্জ্বল দীপ্ত প্রভা এক,
হইল বিস্তৃত মম সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া,
দেখিনু আপনহৃদি ; তীব্র তীব্রতর
জ্বালামুখ লজ্জানলে হ'য়ে অভিভূত!
সে মুহূর্ত্ত মানবের বড়ই ভীষণ—
করিত নিবাস যারা এ মহীমণ্ডলে,
গভীর তিমিরগর্ভে। করহ প্রার্থনা,
হে ললনে! সেই সব অঙ্কগণ তরে,
নিরাশায় তারা যেন না হয় মুর্চ্ছিত,
যবে সবে সঙ্কুচিবে উন্মুক্তনয়ন
নেহারিয়া সেই দৃশ্য জীবনের শেষে—
সে ভীষণ অনাবৃত মানব অন্তর
নিশ্চয় তাদের যাহা হইবে দেখিতে।
ভয়বিকম্পিত দেখি মানব অন্তরে
ঈশ্বরের দূতগণ অমনি তখন
সভয় কটাক্ষ সব করে প্রত্যাহার।
করে আত্মা আকিঞ্চন, সে হেয় সরমে
লুকাইতে আপনারে, অতি সংগোপনে;
পরিপূর্ণ মনস্তাপ দুঃসহ যাতনে
নির্জ্জন নিবাস তরে করে আকিঞ্চন।
জগদীশ সে প্রসাদ করেন প্রদান।
পায় আত্মা রহিবারে একাকী নির্জ্জনে
একাকীই অতীতের প্রতিকৃতি সহ।

(১৮)

দেখিলাম মম সেই পার্থিব জীবন
চলিছে বহিয়া ধীরে স্বপনের কোলে,
দেখিলাম রঙ্গভূমি রঙ্গ ভূমি পরে,
বহুকাল যে সকল গিয়াছি ভুলিয়া।
ভাবিলাম মনে, কিবা অন্ধ ছিনু আমি
অজ্ঞানে উন্মত্ত—অন্ধ জীবন ভরিয়া।
মম সর্ব্বদুষ্কৃতির চিত্র দরশনে
হইলাম হতবুদ্ধি। সেই পাপরাশি
গুরুভারে নিষ্পেষিল আত্মারে আমার।
অবশেষে মৃদুকণ্ঠে কহিলাম আমি—
"হে প্রভো! আমার দণ্ড করহ বিধান।"

(১৯)

উত্তরিল সেই স্বর "না চাহেন প্রভু
পাপ দণ্ড দিতে। পাপই পাপের দণ্ড।
প্রত্যেক পাপের বীজ হয় অঙ্কুরিত
যথেচ্ছ স্বাধীন ভাবে; অবশ্য লভিবে
দুঃখ ক্লেশ-পরিপূর্ণ কটু ফল তার।
ঈশ্বরের দূতগণ নহে ক্রুদ্ধ কভু
মানব দুষ্কার্য্য-তরে ; দেখে ফল তার
বিষাদব্যথিত চিত্তে করেন বিলাপ।
ওরে হতভাগা আত্মা! করিছ যাচ্ঞা
আপনার দণ্ড তরে; জেনে রাখ তুমি
তব ভাগ্য-অবরোধ বহুদিন গত।"
"যথা প্রিয়তম তব তথায় অন্তর"
এই ঈশ্বরের বাণী। একথার মাঝে
তোমার বিচারফল র'য়েছে নিহিত।
আছে কিছু হৃদিগুপ্ত প্রত্যেক নরের
প্রিয়তম যাহা তার; সেই পরমেশ,
কিম্বা সহচর তার, অথবা আপনি।
এই ধরাধামে আছে তার অধিকার,
করিবারে নির্ব্বাচন এক প্রিয়ধন,
অনন্তের তরে যাহা রহিবে তাহার।
শক্তি হীন হয় আত্মা জীবনের শেষে—
করিবারে প্রত্যাখ্যান সেই প্রিয় জনে
যাহার জীবনকালে জেনে ছিল স্থির
প্রণয়ের যোগ্যতম। কি তাহা তোমার
দেখ হতভাগ্য মূর্খ দেখ হে তাহায়!

(২০)

আলোকপ্রবাহ এক হ'ল অবতীর্ণ,
বুঝিলাম আমি, জীবমুক্ত দেহ এক,

শোণিতরঞ্জিত, রহিয়াছে প্রসারিত
ভূমিতল পরে। আমারই শব উহা!
"দেখ হে সর্ব্বস্ব তব" কহিল সে স্বর—
"অন্য কোন কামনার অধিকারে তব
বঞ্চিত এখন তুমি। তব এই দেহ—
ছিল যাহা সদা তব আরাধ্য দেবতা,
রহিবে সতত তব অন্তরে জাগ্রত।
গড়েছিলে দেবমূর্ত্তি মৃত্তিকার পিণ্ডে
অসাধ্য এখনও তব ত্যজিতে তাহায়;
এই তব কর্ম্মফল ভীষণ নিয়তি।"
না, না! রবে আর্ত্তনাদ করিলাম আমি—
করিও না শৃঙ্খলিত মোরে এই ভাবে,
কর মোরে মুক্তি-দান এদেহ হইতে
নাশিয়াছি আমি যাহা; উহাতে আমার
নাহিক আসক্তি আর; এ দৃশ্য হেরিয়া
ঘৃণা হয় মনে; কর মোরে পরিত্রাণ—
কৃপা কর, এ শৃঙ্খল ফেলহ ছিঁড়িয়া।

(২১)

শুন মূর্খ! পশিয়াছ এ প্রেতজীবনে
ঈশ্বরের বিনাদেশে। আমাদের সনে
এখনও তব স্থান হয় নি নির্দ্দেশ।
কার সাধ্য অতিক্রমে অনন্তের দ্বার
যাবৎ তাহার, অন্তিমনির্দ্দিষ্ট কাল
নহে বিঘোষিত। পারে নাই কোন কালে
কোন মর জীব, করিবারে ব্যতিক্রম
বিশ্বনিয়ন্তার সেই অলঙ্ঘ্য বিধান।
জীবনমরণকর্ত্তা একমাত্র সেই।
সেই এক উপদেশ, শিক্ষণীয় যাহা
জগতের জীব তরে; নাহি পারে কেহ
স'রে যেতে, কর্ম্ম তার না করি সাধন,
কিম্বা অনায়াসে দূরে করিতে ক্ষেপণ,
সে মর-মানবসাজ; যাবৎ তাহার

আত্মা নহে উপযুক্ত ত্যজিতে নিবাস।
কুগ্রহ তাহার, যেবা করে উপহাস
জীবন রতন লাভ; যে করে নির্ব্বাণ
সে স্বর্গীয় জ্যোতিঃকণা, আত্মার আলোক,
প্রদর্শিয়া গুরুতর অবজ্ঞা ঈশ্বরে।
বৃথা সেই কার্য্য তার; আরো সুনিশ্চিত
হয় তার ভাগ্য হত, তার আচরণে।
স্বর্গীয় বন্ধন সেই; আত্ম দেহ যাহে,
অবিচ্ছিন্ন একীভূত; পারে ছিন্ন হ'তে,
কেবলই একমাত্র ঈশ্বর-আদেশে।
তব স্রষ্টা অভিশাপে প্রেতাত্মা তোমার
আছে শৃঙ্খলিত, তব এ হীন মরুতে—
(মৃত দেহে) হও নত নিয়তি সমীপে।
শিক্ষা কর বন্দী আত্ম! সহিষ্ণু হৃদয়ে
করিতে প্রতীক্ষা তব, সে দিনের তরে,
যে দিনে হইবে তব মুক্তি—সুপ্রভাত।

(২২)

কহিলাম উচ্চনাদে "র'ল আশা তবে
হবে মম দণ্ড শেষ; অনন্তের তরে
নহি শৃঙ্খলিত আমি" উঠিল কাঁপিয়া
সকল শরীর মম কৃতজ্ঞতা ভরে।

(২৩)

উত্তরিল দেবদূত, "হবে অবসান'
সর্ব্বদুঃখ বিনা সেই এক মাত্র পাপ,
নহে ক্ষমণীয় যাহা কভু কোন কালে—
সেই পাপ অহঙ্কার! নাহি যাচে যাহা
ঈশ্বরের কৃপাভিক্ষা; যে পাপে তাহার
রহে আত্মা বিনিক্ষিত ঘোর অন্ধকারে।
ঈশ্বরের কৃপাকর প্রসারিত সদা।
সেই আত্মা যেবা করে তপস্যা কঠোর
আরোহিতে উচ্চস্তরে, পায় নিরখিতে
সেই জ্যোতিঃ, উর্দ্ধলোক বিভাসিত যাহা;

যদিও তা লক্ষ্য হ'তে স্থিত দুরান্তরে
তবু তথা অবশেষে হয় উপনীত।

(২৪)

অস্ফুট বিনম্রস্বরে কহিলাম আমি—
"বড়ই সদয় তুমি কহিবে আমারে,
হে মহৎ দেবদুত! কিবা তব নাম।"
"পার নাকি অনুমানে চিনিতে আমায়?
নিত্য নিত্য নিরন্তর আসিয়াছি আমি,
পাষাণনির্ম্মিত তব হৃদয়ের দ্বারে,
সাধিয়াছি শ্রম কত পশিতে তথায়;
কিন্তু নিরন্তর, হইয়াছি বিতাড়িত,
সবে আসিয়াছি আমি সমীপে তাহার।
আমিই সে শোকরূপী ত্রিদিবের দুত,
"দুঃখ" নামে অভিহিত মানবভাষায়;
পাঠান আমারে সেই করুণানিদান
এই নিম্ন মর্ত্তলোকে, প্রদর্শিতে সবে,
সেই এক মহাপথ, যাহে নরকুল
হয় শেষে উপনীত তাঁহার সমীপে।
বপন করি হে আমি পঙ্কিল হৃদয়ে
তীব্র অনুতাপবীজ; যাহে অঙ্কুরিত,
অকিঞ্চন দীন-ভাব লজ্জাদাহ হ'তে।
আত্মা তৃষ্ণাকুল সাধয়ে কঠোর শ্রম,
ত্যজি পঙ্কময় তনু, করিতে প্রয়াণ;
যদিও দুর্ব্বল, ভীতিবিকম্পিত সদা,
তবুও সাহস-ভরে করে অন্বেষণ,
আরোহিতে সেই বর্ত্ম কণ্টক-আকীর্ণ,
যাহা আমি প্রদর্শন করি হে তাহারে।
জ্যোতির্ম্ময়লোকবাসী প্রভাবিমণ্ডিত
অভ্যাগতসেবীগণ, যাঁরা নিরন্তর
সাধে কর্ম্ম-প্রেমময় ঈশ্বরের নামে,
হয় ত্বরা অগ্রসর সাহায্যে তাহার।
তাঁদের কোমল কর না হয় সক্ষম,
বিদূরিতে মানবের সকল যাতনা;
কিন্তু তারা সদা শক্তি করেন প্রদান,
সহিবারে যাতনার ভার গুরুতর।
তাঁরা করে পরিপূর্ণ আশ্বাস-সাহসে,
অবসন্ন আত্মিকেরে; করে মৃদু কণ্ঠে
আসন্ন চরম-সুখ প্রতিশ্রুতি-দান।
সেই মহাপথ পান্থ পায় উপদেশ
উত্তোলিতে দৃষ্টি তাঁর স্থির অনিমেশ,
ঊর্দ্ধদেশে, অতিক্রমি এ ভব আঁধার,
সেই দূর দূরাবাসে, চির শান্তিময়।
এখনও তব তরে আছে লভিবারে
দুর্লভ কিরীট সেই, যাহা বিজড়িত
বিশ্বাস, ভরসা আর বিশ্বময় প্রেমে।
রাখিও হে সাবধানে, পোষিও যতনে,
হৃদিমাঝে এ সকল; কিন্তু সর্ব্ব অগ্রে
কর শিক্ষা সহিষ্ণুতা দুষ্কর-সাধন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীশচন্দ্র দত্ত।

'গরমপানি।'

লীলাময়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংসারে কত স্থানে কত ভাবে নৈসর্গিক 'অভিব্যক্তি বিদ্যমান আছে, তাহার ইয়ত্তা করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। বিজন অরণ্যানীর অন্ধতম-গর্ভে কত স্বাভাবিক দৃশ্য অজ্ঞেয় নৈসর্গিক কারণে সমুদ্ভূত হইয়া অনাদিকাল যাবৎ বর্ত্তমান থাকিয়া নীরবে বিশ্বনিয়ন্তার অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে; কিন্তু ইহাদের অতি অল্পসংখ্যকই লোকচক্ষুর বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। আবিষ্কৃত হইলে, ইহাদের

অনেক গুলিই শুধু যে নয়নমনের তৃপ্তি-বিধান করে এমন নহে, বহু আধিব্যাধির উপশম করিয়া 'করুণাময়ের অসীমকরুণা ঘোষণা করে। 'গরমপানি' বা 'নাম্বর'-রক্ষিত বনের অন্তর্গত উষ্ণ উৎস ইহাদের অন্যতম। সর্ব্বদা ইহার জল 'গরম' (উষ্ণ) থাকে বলিয়া স্থানীয় লোকের নিকট ইহা 'গরমপানি' নামে প্রসিদ্ধ।

আসামপ্রদেশের শিবসাগর জিলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ সুবিস্তীর্ণ নিবিড় 'নাম্বর'-রক্ষিত বনের মধ্যে এই উৎস লুক্কায়িত ছিল। কোন সময়ে ইহার উদ্ভব হইয়াছে, নির্ণয় করা কঠিন; তবে শেষ আসাম-রাজাদের সময়ে ইহা সাধারণ্যে পরিচিত ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। শিবসাগর জিলার গোলাঘাট মহকুমা হইতে নাগাহীল পর্য্যন্ত যে সড়ক্ গিয়াছে, উৎসটী তাহাতে সংলগ্ন, এবং গোলাঘাট হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার নৈসর্গিক দৃশ্য অতি মনোহর। উৎসটীর তিন দিক্ অদূরস্থিতা কল্ কল রবে বহমানা 'নম্বর'নাম্নী খরস্রোতা পার্ব্বত্যনদী দ্বারা বেষ্টিত; উৎস হইতে অনবরত জল উথিত হইয়া নদী বক্ষে পতিত হইতেছে; যেন মাতৃদেবী দৃঢ় আলিঙ্গনে নিজক্রোড়ে সন্তানকে ধারণ করিয়া আছেন এবং কৃতজ্ঞ সন্তান তদ্বিনিময়ে ভক্তি-বারি অবিরল ধারায় জননীর বক্ষে স্রবণ করিতেছে! চরিদিকে ঘনসন্নিবিষ্ট বহুদূর-বিস্তৃত অভ্রভেদী প্রকাণ্ড তরুরাজি নানা ফল-পুষ্পে সুশোভিত হইয়া যুগপৎ আনন্দ ও ভীতি সঞ্চার-ক্রমে কি অনির্ব্বচনীয় প্রশান্ত ভাবের সৃষ্টি করিতেছে!

এই অনতি গভীর উৎস আকারে একটী সমচতুর্ভুজের মত; ইহার প্রত্যেক পার প্রায় ৫০ হস্ত দীর্ঘ। ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে ভূগর্ভ হইতে বুদ্ বুদ্, পুট্ পাট্, গুড়্ বুড়্ শব্দে গন্ধকবাসপূরিত বালুকাময় উষ্ণ জল ও বাষ্প অনবরত উৎকীর্ণ হইতেছে! যে স্থান হইতে জল বুদ্ বুদ্ উত্থিত হয় তাহাতে দণ্ডায়মান হইলে ক্রমে অনেক দূর পর্য্যন্ত নীচের দিকে পা চলিয়া যায়; সমস্তই বালুকাময় বোধ হয়। জল অসহনীয় উষ্ণ নহে। ইহাতে অবগাহন করিয়া ইচ্ছানুসারে স্নানাদি করা যায়। এই জলে কিছু দীর্ঘকাল অবগাহন করিয়া থাকিলে খোস্ পাচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগ উপশমিত হয়,—এই কারণে এবং তীর্থ স্নান করিয়া অনেক দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও বহু নরনারী ইহাতে স্নান করিবার জন্য আগমন করিয়া থাকেন। বর্ষাতে পথ দুর্গম ও বিপৎসঙ্কুল থাকে বলিয়া বিশেষ লোকসমাগম হয় না। কিন্তু শীতাগমে পথ ঘাট ভাল ও উৎসের জল সুখস্পর্শ হয় বলিয়া তখনই স্নানার্থীর সংখ্যা অধিক হইয়া থাকে। উৎসের অদূরে সরকারী পরিদর্শন-বাঙ্গালা এবং ফরেষ্ট আফিসের আড্ডা আছে; তথায় রাত্রে বিশ্রাম করিতে পারা যায়। উৎসের অধিষ্ঠাতা কোন পাণ্ডা বা রক্ষক নাই।

অনেক দিন হইল—কোন সদাশয় মহাপুরুষ উৎসের চারি দিকের পার বাঁধিয়া একটী পাকা ঘাট করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে অবগাহনের উপযোগী জল জমা থাকিয়া অবশিষ্ট জল বাহির হইয়া পড়িত; এবং পাকা ঘাটে বসিয়া সকলেই বিশেষ

সুবিধার সহিত স্নানতর্পণাদি করিতে পারিতেন; কিন্তু কালবশে ঘাটটি নিতান্ত জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে এবং যে দিকে উৎসের জল নদীতে গিয়া পড়ে—সেই দিকের পার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—কাজেই এখন উৎসে জল জমিয়া থাকে না। বিশেষতঃ উত্থিত বালুকা ও অন্যান্য আবর্জ্জনা দ্বারা উৎসটী ভরাট হইয়া গিয়াছে,—সে জন্য স্নানার্থীদের বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। অস্থায়ী ভাবে কোন রূপ বাঁধ বসাইতে পারিলে দু'-তিন ঘণ্টার মধ্যেই স্নানের উপযোগী জল জমিয়া যায়। কিন্তু জলের প্রকোপে অধিক সময় বাঁধ টিকান যায় না। কোন সদাশয় ব্যক্তি কৃপা করিয়া এই কল্যাণকর মনোরম উৎসটির সংস্কার-সম্পাদন-পূর্ব্বক পার ও ঘাট বাঁন্ধাইয়া দিলে বহু লোকের আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীদ্বারকানাথ চৌধুরী।

নারী-চর্য্যা।*

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ক্রোধঃ শত্রুঃ শরীরস্থো মনুষ্যানাং দ্বিজোত্তম!
যঃ ক্রোধমোহৌ ত্যজতি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ ৮৭

হে দ্বিজোত্তম! ক্রোধ মনুষ্যগণের শরীরস্থ শত্রু; যে ব্যক্তি ক্রোধ ও মোহ ত্যাগ করেন, তাঁহাকেই দেবতারা 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া জানেন॥ ৮৭

যো বদেদিহ সত্যানি গুরুং সন্তোষয়েত চ।
হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ ৮৮

সংসারে যিনি সত্য কথা কহেন, গুরুকে সন্তুষ্ট রাখেন এবং অন্যকর্ত্তৃক হিংসিত হইয়াও যিনি হিংসা না করেন, তাঁহাকেই দেবগণ 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া জানেন॥ ৮৮

জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ ৮৯

যিনি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, বেদাধ্যয়নে রত, শুচি এবং কাম ক্রোধ যাঁহার বশীভূত, তাঁহাকেই দেবতাগণ 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া জানেন॥ ৮৯

যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মেষু চরতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ ৯০

যে ধর্ম্মজ্ঞ ও মনস্বীর লোকসকল আত্মতুল্য ও যিনি সকলধর্ম্ম আচরণ করেন, তাঁহাকেই দেবতাগণ 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া জানেন॥ ৯০

যোঽধ্যাপয়েদধীয়ীত যজেদ্ বা যাজয়ীত বা।
দদ্যাদ্ বাপি যথাশক্তি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ ৯১

যিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা যজন, যাজন ও যথাশক্তি দান করেন, তাঁহাকেই দেবতাগণ 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া জানেন॥ ৯১

ব্রহ্মচারী চ বেদান্ যোঽপ্যধীয়াদ্দ্বিজপুঙ্গব!
স্বাধ্যায়ে চাপ্রমত্তো বৈ তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ ৯২

হে দ্বিজপুঙ্গব! যিনি ব্রহ্মচারী হইয়া সমুদায় বেদ অধ্যয়ন করেন ও বেদাধ্যয়নবিষয়ে সাবধান থাকেন, তাঁহাকেই দেবগণ 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া জানেন॥ ৯২

---

* ১৩১৭ সালের মাঘমাসের হিন্দুপত্রিকার ৪২১ পৃষ্ঠার পর হইতে।

যদ ব্রহ্মণানাং কুশলং তদেষাং পরিকীর্ত্তয়েৎ।
সত্যং তথা ব্যাহরতাং নানৃতে রমতে মনঃ॥ ৯৩

ব্রাহ্মণদিগের যাহা কুশলজনক কর্ম্ম, তাহাই তাঁহাদের নিকট কীর্ত্তন করিবে; সত্যবাদী লোকদিগের মন কখন অসত্যে রত হয় না॥৯৩

ধর্ম্মস্তু ব্রাহ্মণস্যাহুঃ স্বাধ্যায়ং দমমার্জ্জবং।
ইন্দ্রিয়াণাং নিগ্রহঞ্চ শাশ্বতং দ্বিজসত্তম॥ ৯৪

হে দ্বিজসত্তম! বেদাধ্যয়ন, বহিরিন্দ্রিয়নিগ্রহ, সরলতা অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহ এই কয়েকটি ব্রাহ্মণগণের সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে॥ ৯৪

সত্যার্জ্জবং ধর্ম্মমাহুঃ পরং ধর্ম্মবিদোজনাঃ।
দুর্জ্ঞেয়ঃ শাশ্বতোধর্ম্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ॥৯৫

ধর্ম্মজ্ঞ মানবগণ সত্য ও সরলতাকে পরমধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। সনাতন ধর্ম্ম দুর্জ্ঞেয়, তাহা সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে॥ ৯৫

শ্রুতিপ্রমাণোধর্ম্মঃ স্যাদিতি বৃদ্ধানুশাসনং।
বহুধাদৃশ্যতে ধর্ম্মঃ সূক্ষ্ম এব দ্বিজোত্তম॥ ৯৬

বৃদ্ধগণের ইহা অনুশাসন যে—ধর্ম্ম বিষয়ে বেদই প্রমাণ; ধর্ম্ম বহু রূপ দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং তাহা অতিশয় সূক্ষ্ম॥ ৯৬

ভগবানপি ধর্ম্মজ্ঞঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ।
ন তু তত্ত্বেন ভগবন্! ধর্ম্মং বেৎসীতি মে মতিঃ॥ ৯৭

হে ভগবন্! আপনিও ধর্ম্মজ্ঞ, বেদাধ্যয়নে রত ও শুচি; কিন্তু আমার মতে আপনি যথার্থরূপে ধর্ম্মের মর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। ৯৭

যদি বিপ্র ন জানীষে ধর্ম্মং পরমকং দ্বিজ।
ধর্ম্মব্যাধং ততঃ পৃচ্ছ গত্বা তু মিথিলাং পুরীং॥৯৮

হে বিপ্র! যদি আপনি পরমধর্ম্ম না জানেন, তবে মিথিলা পুরীতে গিয়া ধর্ম্মব্যাধের নিকট জিজ্ঞাসা করুন॥ ৯৮

মাতাপিতৃভ্যাং শুশ্রূষুঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
মিথিলায়াং বসেদ্ ব্যাধঃ স তে ধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যতি॥ ৯৯

সেই ব্যাধ মিথিলাতে বাস করেন; তিনি পিতামাতার শুশ্রূষাপরায়ণ, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়; তিনিই আপনাকে সকল ধর্ম্ম কহিবেন॥ ৯৯

তত্র গচ্ছস্ব ভদ্রন্তে যথাকামং দ্বিজোত্তম!
অত্যুক্তমপি মে সর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হস্যনিন্দিত।
স্ত্রিয়ো হ্যবধ্যাঃ সর্ব্বেষাং যে ধর্ম্মমভিবিন্দতে॥ ১০০

হে দ্বিজোত্তম! আপনার মঙ্গল হউক; যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আপনি তথায় গমন করুন। হে অনিন্দিত! আমি যে সকল কথা কহিলাম, তাহা অত্যুক্ত হইলেও আপনার ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; যেহেতু যাঁহারা ধর্ম্মলাভের আশা করেন তাঁহাদের সকলেরই কাছে স্ত্রীজাতি অবধ্যা॥ ১০০

ব্রাহ্মণ উবাচ।

প্রীতোঽস্মি তব ভদ্রং তে গতঃ ক্রোধশ্চ শোভনে।
উপলম্ভস্ত্বয়াত্যুক্তো মম নিঃশ্রেয়সং পরং॥
স্বস্তিতেঽস্তু গমিষ্যামি সাধয়িষ্যামি শোভনে॥ ১০১

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে শোভনে! তোমার কল্যাণ হউক; আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি; আমার ক্রোধ ও দূর হইয়াছে; তুমি যে তিরস্কার করিয়া অত্যুক্তি করিলে, ইহা আমার পরম মঙ্গলের বিষয়। হে শোভনে! তোমার মঙ্গল হউক; আমি গমন করিব এবং স্বকার্য্যসাধন করিব॥ ১০১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তয়াবিসৃষ্টো নির্গম্য স্বমেব ভবনং যযৌ।
বিনিন্দন্ স স্বমাত্মানং কৌশিকো দ্বিজসত্তমঃ॥ ১০২

মার্কণ্ডেয় কহিয়াছিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ কৌশিক এইরূপে আপনাকে নিন্দা করিয়া সেই স্ত্রীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া আপনার গৃহে গমন করিয়াছিলেন॥ ১০২

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ ও মন্তব্য।

স্বামিসভা—পুণ্যভূমি বারাণসীধামে স্বামিসভা বসিয়াছিল। কাশীরাজ-গুরুস্বামি মঠের শ্রীব্রহ্মানন্দ তীর্থ দণ্ডী স্বামী, গায়ত্রীমঠের স্বামিশ্রীগদাধরানন্দ, চতুঃষষ্টিমঠের শ্রীস্বামী মধুসূদনাশ্রম, সারদামঠের শ্রীমৎ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য, স্বামি শ্রীমাধব তীর্থের প্রতিনিধি স্বামী অচ্যুতাশ্রম প্রভৃতি স্বামিসম্প্রদায় সভা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিত বারেন্দ্র সাহাজাতির বৈশ্যত্ব প্রতিপাদক ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাঁহারা যত দিন ঐ ব্যবস্থার প্রত্যাহার না করিবেন এবং ব্যবস্থার দক্ষিণা ফিরাইয়া না দিবেন, তত দিন আমরা বা আমাদের সম্প্রদায়ের কোনও দণ্ডী স্বামী তাঁহাদের বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে যাইব না বা যাইবেন না। আ'জ কা'ল সর্ব্বত্রই সমাজশাসনের অভিনয় চলিতেছে! শক্তির অল্পতায় অভিনয়টা 'প্রহসনে'ই পরিসমাপ্ত হইতেছে—ইহাই দুঃখ! সন্ন্যাসীরাও 'বহিষ্কার'-নীতির সেবা করিতেছেন! যে রূপ দিন পড়িয়াছে, তাহাতে ভিক্ষা দিতে না হইলেই লোকে বাঁচে, তার পর আবার স্বামীদের প্রতিজ্ঞা! মনে রাখা উচিত—"বেশী রগ্‌ড়াইলে লেবু তিত হয়।"

কালীর কৃপা—পত্রান্তরে প্রকাশ—চট্টগ্রামের এক বালক নখদর্পণে কালীদর্শন করে; শুধু দর্শন নয়, কালীর সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে; বালক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, কালী প্রত্যুত্তর দেন! ঘোর কলিতেও বিশ্বাসীর অশান্তি নাই। বালক নখদর্পণে দেখে, ইচ্ছা করিলে সকলেই হৃদয়-দর্পণে দেখিতে পারেন! তবে যোগাড়যন্ত্র চাই!

উপাধিকথা—আগামী ৩রা জুন মহামহিম ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের জন্মতিথি-উৎসব। জন্মতিথির উৎসবে উপাধি বিতরিত হইয়া থাকে। এবার অভিষেকদিনেই জন্মতিথির ও নববর্ষের উপাধি-বিতরণ হইবে। ভাগ্যবানেরা উৎকণ্ঠিত চিত্তে কালাতিপাত করুন। রাজপ্রসাদ সৌভাগ্যদেবতার কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত মিলে না।

অর্দ্ধ আনার বাহাদুরী—দিল্লীর উকীল লালা মতিসাগর দিল্লীর দেওয়ানী আদালতে ই আই রেল কোম্পানীর নামে নালিশ করিয়াছিলেন। অভিযোগের কারণ, একখানি প্লাট্‌ফরম্ টিকিটের মূল্য অর্দ্ধ আনা গ্রহণ করা। নিম্ন অদালতে মতিসাগর জয়লাভ করেন; চীফ্ কোর্টে কিন্তু কোম্পানীই জিতিয়াছেন।

গমন ও আগমন।—যশোহরের জনপ্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ হিগ্‌নেল যশোহর ছাড়িয়া গিয়াছেন, সুধীবর মিঃ লিন্‌চ ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে আসিয়াছেন। মিঃ হিগ্‌নেলের প্রতি আমাদের বক্তব্য—'শিবাঃ পন্থানঃ সন্তু' মিঃ লিন্‌চকেও বলি—'স্বাগতম্' আশা করি ইনি সর্ব্বজনপ্রিয় হইবেন।

রাজাগমন—পার্লামেণ্ট মহাসভায় প্রকাশ পাইয়াছে—মহনীয় সম্রাট্ সম্ভবতঃ নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি ভারতে পদার্পণ করিবেন এবং জানুয়ারি মাসের শেষ পর্য্যন্ত গড়ে প্রায় দশ সপ্তাহ কাল ভারতে অবস্থান করিবেন। ভারতবর্ষে রাজবংশধরের নিয়ত অবস্থানই আমাদের প্রাণ চায়। হিন্দুর দৃষ্টিতে রাজদর্শন পুণ্যপ্রদ, রাজসান্নিধ্য ততোধিক সৌভাগ্যসূচক।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।



১৮শ বর্ষ, ১৮শ খণ্ড, ২য় সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ। | ১৩১৮ সাল, ১৮৩৩ শকাব্দাঃ

সত্য।

'সত্যাৎ পরতরং নহি' এই মহাজনবাক্য এক সময়ে হিন্দুর কাছে গুরুদত্ত মূলমন্ত্রের ন্যায় সর্ব্বদা সম্মানিত হইত। এই মহাজনবাক্য ভারতের প্রতিগৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রত্যেক হিন্দুসন্তানকে কর্ত্তব্য-কর্ম্মে প্রোৎসাহিত করিত। যদি কোন দিন কোন দেশে কোনও জাতির নিকট সত্যের প্রকৃত আদর হইয়া থাকে, তবে তাহা এই ভারতের আর্য্যজাতির কাছে—ইহাতে সংশয় নাই।

"নহি সত্যাৎ পরোধর্ম্মোন পাপমনৃতাৎ পরং।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ॥"

সত্য হইতে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম আর নাই এবং মিথ্যা হইতে পাপাচরণ আর কিছুই নাই; অতএব মানবগণ সর্ব্বাবস্থায় একমাত্র সত্যই অবলম্বন করিবেন।

কালচক্রের অনিবার্য্য আবর্ত্তনে যে অমূল্যনিধি আমাদের মূলমন্ত্র-স্বরূপ ছিল, তাহা আ'জ আমরা হারাইতে বসিয়াছি। সত্যধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া আমরা মনুষ্যত্ব হইতে পশুত্বে উপনীত হইয়াছি। সত্যহীন হইয়া আ'জ আমরা শান্তিস্বাস্থ্যহীন হইয়াছি, কিন্তু ইহাতেও ত আমাদের চৈতন্যোদয় হয় না; আমরা পুনরায় সত্যানুরাগ জাগাইয়া তুলিতে যত্নবান্ হইকই? যতদিন পর্য্যন্ত আমরা সত্যাবলম্বনে সমর্থ না হইব, ততদিন আমাদের কি ঐহিক, কি পারত্রিক কোন প্রকারই মঙ্গলই হইবে না। সত্যদ্বারা মানব অসাধ্য সাধন করিতে পারে। সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি সর্ব্বজয়ী হইয়া অক্ষয় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া থাকে। এমন কি সত্যের নিকট দেবতারাও পরাজয় স্বীকার করেন, কারণ সত্যপ্রতিষ্ঠ মহাত্মা স্থিরবাক্য।

"সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।"

সত্যপ্রতিষ্ঠ-মহাজন-মুখ-নিঃসৃত বাক্য

অপার্থ। তাঁহার মুখ হইতে যখন যে কথা বাহির হয়, তাহাই তখন ফলিয়া থাকে। যিনি সত্যপথ আশ্রয় করিয়া চলেন, তাঁহাকে কখনও স্থানভ্রষ্ট হইয়া নীচগামী হইতে হয় না। মহাভারতে বর্ণিত আছে—'সত্যই ব্রহ্ম সত্যই তপঃ এবং সত্যই প্রজা পালন করিয়া থাকেন। লোক সমুদয় সত্যপ্রভাবেই স্বর্গলাভে সমর্থ হয়। মিথ্যা অন্ধকারের স্বরূপ। ঐ অন্ধকার-প্রভাবে লোকের অধঃপাত ঘটিয়া থাকে। লোকে সে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে আর সত্যরূপ আলোক নিরীক্ষণ করিতে পারে না। স্বর্গই সত্য ও আলোক এবং নরকই মিথ্যা ও অন্ধকার-স্বরূপ। সত্য ও অনৃতে ধর্ম্ম-অধর্ম্ম প্রকাশ-অপ্রকাশ, সুখ-দুঃখ যথাক্রমে প্রতিষ্ঠাপিত র'হয়াছে। তন্মধ্যে যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম, যাহা ধর্ম্ম তাহাই প্রকাশ এবং যাহা প্রকাশ তাহাই সুখ; আর যাহা অনৃত তাহাই অধর্ম্ম, যাহা অধর্ম্ম, তাহাই অন্ধকার এবং যাহা অন্ধকার তাহাই দুঃখ। সুতরাং দুঃখ হইতে মুক্তি পাইতে ইচ্ছা থাকিলে অনৃতপথ সম্যক্ প্রকারে পরিত্যাগ করিয়া সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সূর্য্য-কিরণ আলোক বিস্তার করিতে পারেনা; মনুষ্য মিথ্যারূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে তাহার অন্তরস্থ সুখ অর্থাৎ সত্য প্রকাশ পায় না; উহা নিদ্রিতের ন্যায় থাকিয়া যায়। শাস্ত্রে আছেঃ—

'সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যংহি পরমংতপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরং নহি॥'

সত্যই পরম ব্রহ্ম, সত্যই পরমতপস্যা, সমুদায় কার্য্য সত্যমূলক, সুতরাং সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়াধৃতং।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥"

মহাভারতম্।

সহস্র অশ্বমেধ একদিকে এবং এক সত্যবাক্য একদিকে, উভয় তুলাযন্ত্রে ধৃত হইলে সহস্র সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যবাক্যই অতিরিক্ত হইবে।

সকল শাস্ত্রেই এইরূপে সত্যের জয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং যদি জীব মুক্তিলাভ ইচ্ছা করে, তবে তাহার একমাত্র সত্যাবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই যে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড প্রতিনিয়ত সমানভাবে চলিতেছে, ইহাও সত্যের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠাপিত। যদি মুহূর্ত্তের জন্যও সত্যের অভাব ঘটে, তাহা হইলে নিমেষ-মধ্যে এই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড যে কখন বিনষ্ট হইয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই।

সত্যের কশাঘাতে আমরা সর্ব্বদা শাসিত হই বলিয়া সংসারে অপেক্ষাকৃত নিরাপদে কালাতিপাত করিতে পারি। সত্যের বলে কি না হয়! সত্য বলেই অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় মরীচিমালী স্বীয় অনন্ত-শক্তি বিস্তারপূর্ব্বক অনন্ত সৌরজগৎ শাসন করিয়া অনন্ত মঙ্গলসাধন করিতেছেন; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবনস্বরূপ পরম-প্রীতিভাজন প্রচেতা আপনার অমৃততুল্য শক্তি বিস্তার করিয়া দয়াময়রূপে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল সাধনে সর্ব্বদা রত আছেন! এইরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণ-কামনায়

মঙ্গল-বিধানকর্ত্তা দেবগণ আপন আপন শক্তি যথাপযুক্তরূপে প্রয়োগ করিয়া যে অতুলনীয় কল্যাণসাধন করিতেছেন, তাহা কেবল সেই সত্যের বলে; তাই সত্যপ্রতিষ্ঠ মহাত্মগণ অনন্ত সৌর-জগতের প্রতিকার্য্যে নিরবিচ্ছিন্ন সত্যের মাহাত্ম্য দর্শনকরিয়া ভক্তিগদ্গদ্ চিত্তে সদানন্দ মনে প্রাণভরিয়া গাহিয়াছেন।

"তস্মাৎ সত্যং পরং ব্রহ্ম সত্যমেব পরংতপঃ।
সত্যমেব পরোযজ্ঞঃ সত্যমেব পরং শ্রুতং॥
সত্যং বেদেষু জাগর্ত্তি সত্যঞ্চ পরমং পদং।
কীর্ত্তির্যশশ্চ পুণ্যঞ্চ পিতৃদেবর্ষিপূজনং॥
আম্বোবিদিশ্চ বিদ্যা চ সর্ব্বং সত্যেপ্রতিষ্ঠিতং।
সত্যং যজ্ঞস্তথা বেদা মন্ত্রা দেবী সরস্বতী॥
ব্রতচর্য্যা তথা সত্যং ওঙ্কারঃ সত্যমেব চ।
সত্যেন বায়ুরভ্যেতি সত্যেন তপতে রবিঃ॥
সত্যেনাগ্নির্দহেন্নিত্যং স্বর্গং সত্যেন গচ্ছতি।
সত্যেন চাপঃ ক্ষিপতি-পর্জ্জন্যোধরণীতলে॥
পরেণ সর্ব্বদেবানাং সর্ব্ব-তীর্থাবগাহনং।
সত্যস্ত বচনাল্লোকঃ সর্ব্বমাপ্নোত্যসংশয়ং॥
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং॥
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥
সত্যেন দেবাঃ প্রীয়ন্তে পিতর ঋষয়স্তথা।
মনুষ্যাঃ সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বাঃ সত্যাৎ সিদ্ধিমিতো-
গতাঃ॥

অগাধে বিপুলে শুদ্ধে সত্যতীর্থে শুচৌহ্রদে।
স্নাতব্যং মনসা যুক্তৈঃ স্নানং তৎ পরমং স্মৃতং॥
আত্মার্থেবা পরার্থেবা পুত্রার্থেবাপি মানবাঃ॥
অনৃতং যে ন ভাষন্তে তে বুধাঃ স্বর্গ-গামিনঃ॥
তস্মাৎ সত্য-কৃতং যচ্চ তদনন্তফলং ভবেৎ॥"

সত্যের মহিমা অসীম, অপার, অচিন্তনীয়, অনির্ব্বচনীয়। স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সত্যের মাহাত্ম্য বর্ণনে অপারগ হইয়া "সত্যমানন্দম্ ব্রহ্ম" বলিয়া নির্ব্বাক্ হইয়াছেন। বিশাল সাগরস্থ অসংখ্য পদার্থমধ্যে মুক্তা যেরূপ দুষ্প্রাপ্য, বহুমূল্য এবং আদরণীয়,—আকাশস্পর্শী উত্তুঙ্গ-শৃঙ্গাবলী পরিশোভিত পর্ব্বতস্থ অগণিত দ্রব্যাদিমধ্যে স্বভাবরচিত নির্ঝরিণী-পরিবেষ্টিত সুরম্য কন্দর যেরূপ স্পৃহনীয়, রত্নপ্রসবিনী বসুন্ধরার গর্ভেস্থিত নানা-রত্নরাজি-মধ্যে অতুলনীয় হিরকখণ্ড যেরূপ দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য, তদ্রূপ যাবতীয় ধর্ম্মের মধ্যে সত্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সম্যক্ আদরণীয় ধর্ম্ম। এক সত্যানুষ্ঠানে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়। সত্যের আশ্রয়ে জীব সর্ব্ববিপদ্ এবং ভীতি হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। দুর্দ্দমনীয় সংসারভীতির একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র সত্য। সত্যের আশ্রয় গ্রহণ কর, চিরশত্রুও বৈরিভাব বিস্মৃত হইয়া পদানত হইবে। বিষধর সর্প হলাহলের পরিবর্ত্তে অমরত্বপ্রদায়িনী সুধা দান করিবে, ভীষণ-দংষ্ট্রকরালবদন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ সস্নেহে সন্তর্পণে ও অতি সমাদরে তোমায় ক্রোড় প্রদান করিবে,—ভূত, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষসগণ ক্রীতদাসের ন্যায় তোমার আজ্ঞাবাহী হইয়া সেবা করিবে,—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি দেবগণ দশদিক্পালগণ প্রভৃতি সকলে স্বীয় স্বীয় অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া তোমার শরীর-রক্ষকরূপে তোমাকে বেষ্টনকরিয়া সর্ব্বদা তোমার রক্ষা করিবে,—এমনকি, স্বয়ং যমরাজ তোমার চিরদাসত্ব স্বীকার করিয়া তোমার দৌবারিক হইতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থজ্ঞান করিবেন।

প্রত্যেক মনুষ্যেরই সত্যাবলম্বন করিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মে অগ্রসর হওয়া একান্ত বিধেয়। দান, যজ্ঞ, হোম ও যথাবিধানে অনুষ্ঠিত তপস্যা ইত্যাদির প্রতিপাদক বেদসকলও একমাত্র সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠাপিত। সত্যই বেদ এবং বেদই সত্য! সুতরাং সত্যহীন পাপাত্মা আপন সত্যাত্মার অপমান করিয়া নিজ নরকগমনের পথ প্রশস্ত করিয়া তোলে। অতএব সত্যবিহীন ব্যক্তিই সর্ব্বপাপের আশ্রয়-স্থল। যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্যকে আশ্রয় করিলে যাবতীয় পুণ্য তাহাকে আশ্রয় করে, তদ্রূপ একমাত্র মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া জগৎস্থ সমুদায় মহাপাতক অবস্থান করে। তাই বলি হে মানব! জীবন গঠিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশকর, দেখিও যেন কদাচ সত্যচ্যুত হইও না। পূর্ণদৃঢ়তার সহিত সত্যের আশ্রয়-গ্রহণ কর ; ভগবান্ তোমার সহায় হইবেন।

শ্রীসুখরঞ্জন সেন গুপ্ত।
সম্পাদক, স্বদেশ লাইব্রেরী।

চিন্তা-রহস্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আর একটা কথা—সকল ধর্ম্মপুস্তকে প্রলয় হইবার কথা লিখিত আছে। খ্রীষ্টান্-মুসলমান্, কেয়ামত নিকটতর বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। সেই প্রলয় বা কেয়ামতের সর্ব্বস্থানে একরূপই বর্ণনা রহিয়াছে। হিন্দুরা বলেন—একেবারে আকাশপথে দ্বাদশসূর্য্য উদিত হইয়া দিগ্দাহ করিতে থাকিবে। অন্য-ধর্ম্মাবলম্বীরাও এই অগ্নিদাহের কথা উল্লেখ করিতেছেন। বর্ত্তমানকালে আমরা তাহার অনেক লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিতেছি। প্রকৃতি বিকৃতিভাব ধারণ না করিলে লোকের মস্তিষ্ক বিগড়াইবে কেন? সেকালে শিরঃপীড়া হইলে মধ্যম নারায়ণ তৈল ব্যবহারের ব্যবস্থা হইত, একালে আর সে মধ্যম-নারায়ণ তৈলের সুফল ফলিতে দেখা যায় না, তাই কুন্তলীন, জবাকুসুম, বিভোর, পুষ্পসার প্রভৃতি বহুবিধ শিরোরোগের ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার বিজ্ঞাপনের ঘটা দেখিলে বোধ হয় যে, পৃথিবীতে বুঝি শিরঃপীড়া আর স্থান পাইবে না, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও কোন প্রতীকার হইতেছে না; সুতরাং চিন্তাশীল মনুষ্যের মস্তিষ্ক আর শীতল হইতেছে না। তাহার উপর অগ্নিমান্দ্য, অনিদ্রা, অস্থিরতা, মাথাঘোরা Giddiness, অবসাদ প্রভৃতি রোগে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে কেমন করিয়া মস্তিষ্ক শীতল থাকিবে! অভাগা ভারতবর্ষের কথা ছাড়িয়া দেও, হিমপ্রধান দেশের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখ, সে স্থানেও এই বিকৃতি বিরাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কথায় কথায় সেই হিমসাগর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। মুসলমান্-নবী হজরৎ আলী একবার এক বিধর্ম্মীর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন; প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহাকে পরাভূত করিতে না পারিয়া, হতাদর করিয়া তাঁহার মুখে থুৎকার

প্রদান করিলে, আলী ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন—কিন্তু পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিলেন, ক্রোধবশে দ্বন্দযুদ্ধ কদাচ হইতে পারে না—এই ভাবিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলে সে তখন হাসিতে হাসিতে পলায়ন করিল। মুসলমান্ ভ্রাতারা সেই নজীর উল্লেখ করিয়া ক্রোধের বশে কোন কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন। এখন বহু সুসভ্য জাতি সেই ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া নিরীহ অপর জাতিকে অম্লানবদনে নিপীড়ন করিতে অনুমাত্র কুণ্ঠিত বা চিন্তিত হইতেছেন না। বৃটীশজাতির ন্যায়বিচার এই যে, যতক্ষণ ধৃত ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে দোষী সাব্যস্ত না হয়, ততক্ষণ তাহাকে নির্দ্দোষ ভাবিয়াই তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে হইবে! এই রূপেই এত কাল তাঁহাদিগের বিচারালয় পুণ্যভূমি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে! কালে সেই শীতল মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া উঠিবে কিনা কে জানে? শান্তি যাঁহাদের শাসন দণ্ড, তাঁহারা দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে বিচার করিতে সমর্থ, সুতরাং তাঁহারা ক্রোধের বশে অবিচার করিতে পারেন না; কারণ, বিচার (Justice) তাঁহাদের মানদণ্ড। সেই মানদণ্ডের 'পাল্লা' সর্ব্বত্র সমানভাবে প্রবমান, তাহার এক বিন্দু এদিক ওদিক হইতে পারে না। এই শান্তিময় বিচার সর্ব্বদেশে সর্ব্বদাই আদৃত ছিল। কালক্রমে সেই শান্তি-সকাশে, যদি ক্রোধরূপ অশান্তির উদয় হয়, তাহা হইলে আর রক্ষা কোথায়? সমস্ত রুষরাজ্যে যে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মূলে অশান্তি—জাপান কোরীয়ার সহিত যে ব্যবহার করিতেছে, তাহার মূলেও অশান্তি—ট্রান্সভাল বিদেশীয়দিগের প্রতি যে ব্যবহার করিতেছে তাহার মূলেও অশান্তি—তুরস্ক আর্ম্মেনিয়ান্ খ্রীষ্টান্‌দিগের প্রতি যে ব্যবহার করিতেছে তাহার মূলেও সেই অশান্তি দৃষ্ট হইতেছে! যদি ইংলণ্ডের সমরসচিবদিগের আশঙ্কা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে মহাবল জার্ম্মণী যে অশান্তির অনলে দগ্ধ হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই বোধ হইতেছে, এখন সমস্ত পৃথিবীতে অশান্তি বিরাজ করিতেছে। যে ধর্ম্ম, শত্রুকে মিত্র করিতে বলিতেছে, সেই ধর্ম্ম এখন মিত্রকে শত্রু করিতে চাহিতেছে—এ কি ভয়ানক কথা? আমার মতে ইহা মানুষের দোষে নহে, স্বয়ং প্রকৃতি বিকৃত হইয়া যত অনর্থ ঘটাইতেছে। এই যে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অকালমৃত্যু এবং নানা অবসাদ উপস্থিত হইতেছে, তাহার যে কারণ, ইহারও সেই কারণ। ইহার উত্তরে কেহ বলেন—সে সকল আমাদের পাপের জন্য, কেহ বলেন একমাত্র প্রকৃতির বিকৃতির জন্য। এখন বিচার করিয়া বল দেখি, এই সকল ঘটনার প্রকৃত কারণ কি হইতে পারে? যাঁহারা প্রথমোক্ত কারণের পক্ষপাতী, তাঁহারা এখন নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন, মানুষ প্রকৃতিপুঞ্জের দাস, তাহাদের কি সাধ্য প্রকৃতির প্রতিকূলে একপদ অগ্রসর হয়; দেশকালের অসীম শক্তিকে অবহেলা করে? প্রকৃতির শক্তির অনুসরণ না করিলে চলিবে কেন? এখন কথা হইতেছে এই যে, এই সুষমাসম্পন্ন প্রকৃতি

কি রূপে বিকৃত হইল? ভাবিতে গিয়া অবাক্ হইয়া পড়িতে হয়! চতুর্দ্দিকের অপারসাগর দ্বীপমালার বলয়াকারে পূর্ণ হইয়া আসিতেছে! পৌরাণিকেরা বলেন যে, এই পৃথিবী জম্বু, শাক, কুশ, প্লক্ষ, শাল্মলি, ক্রৌঞ্চ, এবং পুষ্কর এই সাতটী দ্বীপে বিভক্ত ছিল; এখন তাহার প্রত্যেক সাগরে অসংখ্য দ্বীপ সমুদ্গত হইয়াছে; ইহাতে বেশ বোধ হইতেছে যে, সেই অপারসাগর দিনদিন শুষ্ক হইয়া যাইতেছে! অনাবৃষ্টি আসিয়া নদ-নদী খাল-বীল কূপ-তড়াগ শুষ্ক করিয়া ফেলিতেছে! তাই আর সেই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা শ্রী সম্পন্না থাকিতে পারিতেছে না। এক দিন ত সেই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বসুন্ধরাই প্রকৃতিপুঞ্জকে সুখশান্তিতে ভূষিত করিয়া রাখিয়াছিল—এখন তাহার শ্রী—সৌন্দর্য্য কে হরণ করিল? পাঠক অপাততঃ তাহার লক্ষণ সম্মুখে না দেখিতে পার, কিন্তু একবার ঐ গ্রহতারা-সম্বলিত অনন্ত আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখ, উহা হইতে সেই সৃষ্টিকাল পর্য্যন্ত অসংখ্য উল্কাপিণ্ড পতিত হইয়া ভূপৃষ্ঠ দগ্ধ করিতেছে, সেই পিণ্ডসকল কোথা হইতে আসিতেছে জান কি? যে কক্ষে অনন্ত গ্রহ-তারার সংঘর্ষে এই উল্কাবলী স্থানভ্রষ্ট হইয়া অনন্ত আকাশে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে, তাহার কারণ ভাবিবার বিষয়। আমাদের এই সৌরজগতের ন্যায়, উপরে এইরূপ অনন্ত-সৌরজগৎ ভাসমান, তাহারা নিয়ত নিজ নিজ কক্ষে ভ্রাম্যমান থাকিয়া তৎ তৎ স্থানের জীবপুঞ্জকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আমাদের এই পৃথিবীতে যেমন ঝটিকা—দাবানল—বাড়বানল—ভূমিকম্প প্রভৃতি নৈসর্গিক উৎপাত উপস্থিত হইয়া সময়ে সময়ে প্রলয়ের ভয় প্রদর্শন করে, তাহারাও সকলে ঐ ঐ নিয়মের অধীন। সুতরাং সমস্তগুলেই সেই এক ধারা প্রবাহিত থাকিয়া প্রকৃতি দেবীর পূজা করিতেছে, যাঁহার কোন জীবের কোন অবস্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। এখন কথা হইতেছে এই যে ঐ যে বিপ্লব উপরে—নিম্নে হইতেছে, ঐ যে সংঘর্ষ সম্পন্ন হইতেছে, উহার রহস্য কি? পূর্ব্বোল্লিখিত সকল ধর্ম্মের সারকথা প্রলয়—কেয়ামৎ। এই প্রলয়—কেয়ামৎ আসিবার জন্য সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-পরম্পরা। যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা বিধান-মত কিছুকাল স্থিতি করিয়া তাহার পর সেই বিধানমত লয় প্রাপ্ত হইবে,—এই সংবর্ত্তই তাহার নিয়ামক। আমাদের এই আবাস-স্থান পৃথিবী সেই সৃষ্টিকাল হইতে সেই প্রলয়ের দিকে ধাবমানা রহিয়াছে, তাই আরব সাগর যাহারা মরুভূমিতে পরিণত হইতেছে; সাগরগর্ভস্থ অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জ পুঞ্জে পুঞ্জে সমুদ্গত হইয়া তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গ্রীষ্মের প্রভাব সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হওয়ায় প্রকৃতি বিকৃত হইয়া অনাবৃষ্টি, সম্বন্তর, মহামারী প্রভৃতি দুর্দ্দৈব-ঘটনাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেছে। ইহাতে মানুষের অপরাধ কি? অন্যদিকে শনৈশ্চর আঁতঘালি করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহা তাহার অসহ্য হওয়ায় নিকটস্থ মঙ্গলগ্রহকে সে গ্রাস করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে! এত যে প্রচণ্ড

মার্ত্তণ্ড, যাহার তাপে জগৎ দগ্ধপ্রায় হইয়া আসিল, তাহার গর্ভেও শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে; তাহার গাত্রে অসংখ্য কৃষ্ণবর্ণ রেখা জড়িত হইয়া আসিতেছে। কলির শেষ কালে তাহাও যে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া অপরাপর গ্রহমণ্ডলের উদর পূর্ণ করিবে—তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? উপরে যে উল্কাপিণ্ডের কথা বলিয়াছি, তাহা কি ঐ সকল সংঘর্ষের কণা (Lava) নহে? পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে—ইহাদের মধ্যে নানাবিধ পার্থিব পদার্থ বর্ত্তমান; তাহা দেখিয়া অনেক বিজ্ঞানবিদ্ ভ্রান্ত হইয়া বলিতেছেন,—উহারা এই পৃথিবীরই সংঘর্ষ-কণা (Lava)—সে যাহাই হউক্ তাহারা যে এইরূপ কাহারও প্রক্ষিপ্ত পদার্থ—তাহাতে আর কাহারো সন্দেহ নাই।

এই রূপে আকাশস্থ কত লক্ষ লক্ষ গ্রহতারা কালবশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার ঠিকানা কে করিবে? তাহার ঠিকানা হউক বা না হউক, তাহাদের মধ্যগত অগ্নিরাশি কোথায় গেল? যে রূপ সেই উল্কাপিণ্ডসকল উৎক্রান্ত হইয়া দিগন্তে বিস্তারিত হইয়া পড়িতেছে, তেমনি অন্তর্গত গ্রহ-তারা-সকলের অগ্নি-রাশি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে;—তাহার যে অংশ এই পৃথিবীতে উপর্য্যুপরি পতিত হইতেছে, অন্যান্য তাপের সহিত তাহা সংযোজিত হইয়া অন্তরীক্ষ অগ্নিময় করিয়া তুলিতেছে। এখন ভাবিয়া দেখ, এই ভূমণ্ডলের অভ্যন্তর অগ্নিময়, উপরের এই অগ্নিবৃষ্টি,—ইহাতে প্রকৃতি বিকৃত হইবে না কেন? এই বিকৃতভাব স্থাবর-জঙ্গম এবং জীবজগতে সমান ভাবে দৃষ্ট হইতেছে। কয়েক বৎসর গত হইল "নাইনটিন্থ সেনচুরী" নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজী-মাসিকপত্রে কোন বিজ্ঞানবিৎ স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, এই এই কারণে ইয়োরোপীয় জাতির মস্তিষ্ক ক্রমে বিকৃত হইয়া আসিতেছে এবং এই কারণেই ভারত-বর্ষে আর মনস্বী মুনি-ঋষি উৎপন্ন হইতে পারিতেছে না। আফ্রিকা এবং অপর মহা দেশে সকল প্রকার বিকৃতিভাব বিস্তারিত হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। সকল জীবের অবয়ব খর্ব্বাকারে পরিণত হইয়া আসিতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পাঞ্জাবের শিখ-সমাজে যত দীর্ঘাকার বলবান্ এবং সুশ্রী পুরুষ দৃষ্ট হইত, এখন আর তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না; ইহার কারণ অনু-সন্ধান করিয়া দেখ, দেখিবে—সিন্ধুর পঞ্চ-শাখার খাত খালি দেখিয়া অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিবে না। যে গ্রীষ্ম মুলতান-প্রভৃতি স্থানে আবদ্ধ ছিল, এখন তাহা প্রচণ্ডভাব ধারণ করিয়া সমস্ত পাঞ্জাবভূমি 'আক্রম' করিয়া লইয়াছে। সেই ভাব—কেবল ভারতবর্ষের কি কথা, সমস্ত পৃথি-বীতে পরিব্যাপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এইরূপে প্রকৃতি ক্রমে বিপর্যস্ত হইয়া জলে স্থলে সর্ব্বনাশ সাধন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে, তাহার প্রভাবেই জীব-জগৎ শ্বাসজড়িত হইয়া পড়িতেছে। অন্নগতপ্রাণ মনুষ্যের সর্ব্বাবয়বে বিস্তৃত-ভাব দেখা দিতেছে; দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, মস্তিষ্ক-প্রসার সঙ্কোচভাব করিয়া চিন্তাশক্তির প্রভাব অবগম্য করিয়া

ভুলিতেছে। এই ক্ষীণবলে জগৎ তাই বুঝি বহু বিশৃঙ্খলার আয়োজন করিতেছে? সুতরাং কেন বলিব না যে, জড়ের সহিত জীব ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে? একদিন যে এই পৃথিবী অন্যান্য গ্রহ উপ-গ্রহের সহিত ধূলিকণায় পরিণত হইয়া আকাশপথে উড্ডীন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সকল দেশের সকল শাস্ত্র ইহারই সাক্ষ্য দিতেছেন।

কতকাল এই মৃত্যুমুখ জগতে, জীবের আবাস সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করিতে গিয়া পাশ্চাত্যপণ্ডিতেরা কাল-সংখ্যা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছেন। লর্ডকেলভিনের অনুমান—ইহা দশ কোটী বৎসরের কম নহে; কিন্তু অপর ভূতত্ত্ববিদ্ গীক কহিতেছেন, ইহা সপ্ততিকোটী বৎসরের ও অধিক, সুতরাং এখানে পাশ্চত্য-পণ্ডিতদিগের মত বিবাদের মীমাংসা হওয়া দুর্ঘট হইল; এখন দেখা যাউক্ প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ এ সম্বন্ধে কতদূর চিন্তা করিয়াছেন। আরম্ভ হইতে, এই সৃষ্টির আদিকর্ত্তা "ব্রহ্মা"—পদ্মযোনি এক পদ্মে সমাসীন! ব্রহ্মা রক্তবর্ণ তাঁহার গোলাকার পদ্মাসনও রক্তবর্ণ। সেই রক্তাক্ত-রক্তধারামধ্যে রক্তোৎপল-সদৃশ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা অধ্যাসীন হইয়া, নিজ ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে, এই যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, তাহার বীজ উৎপন্ন করিতে-ছেন! সেই বীজের স্থিতিকাল—ব্রহ্মার এক জীবনের শতবর্ষ; সেই শতবর্ষের হিসাব এইরূপে গণিত হইয়াছে—ব্রহ্মার একদিবসকে কল্প বলে, সেই কল্প—

মানবীয় গণনায়— ৪৩২০,০০০০০০ বৎসর; মানবীয় গণনায় ৩৬৫ দিনে এক বৎসর হয়—তাহা হইলে ব্রহ্মার এক বৎসর হইল ১৫,৭৬,৮০,০০০০০০০ মানবীয় বৎসর ব্রহ্মার শতবর্ষ পরমায়ু, তাহার সংখ্যা:— ১৫,৭৬,৮০০০,০০০ ০,০ মানবীয় বৎসর। কল্পকাল ৪ যুগে বিভক্ত।

১ম সত্যযুগ—১৭,২৮,০০০
২য় ত্রেতা—.১২৯৬০০০
৩য় দ্বাপর—৮৬৪০০০
৪র্থ কলি—৪৩২০০০

সমষ্টিযুগ—৪৩২,০০০০ বৎসর।

শতযুগ সত্য—১৭২৮০০০
ত্রেতা-
দ্বাপর-
কলিগতাব্দা:—৫৪১০

৩৮৯৩০১০ ৩,৮৯,৩০১০

পৃথিবীর অবশিষ্টপরমায়ু—৪,২৯,৯৯০ বৎসর। আবার মনুষ্যগণনার এক বৎসরে দৈব এক অহোরাত্র। এই দৈব দ্বাদশসহস্র বৎসরে অর্থাৎ মনুষ্যমানে ৪,৩২০,০০০ বর্ষে চারি যুগ হয়; তাহার মধ্যে সত্য-যুগের পরিমাণ— ১৭,২৮০০০

ত্রেতার—১,২,৯৬০০০
দ্বাপরের—৮,৬৪০০০
কলির—৪,৩২০০০

বর্ষকাল হইয়া থাকে।

— সৃষ্টির সময় ঈশ্বর হইতে প্রকৃতি, সেই প্রকৃতি হইতে আকাশ, সেই আকাশ হইতে বায়ু, সেই বায়ু হইতে অগ্নি, সেই

অগ্নি হইতে জল, এবং সেই জল হইতে এই ক্ষিতি উৎপন্ন হইয়া, তৎসমুদায়ের পরস্পর মিলনে এই স্থূল বিশ্ব বিস্তারিত হইয়াছে ; এইরূপ লয়ের সময় জগতের ভাবান্তর হইয়া পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ প্রকৃতিতে, এবং প্রকৃতি সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মে লীন হইয়া যাইবে। এই সৃষ্টি-স্থিতি-কাল পূর্ব্বোক্ত রূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ইহারই আর্য্য ঋষিগণ 'প্রলয়' কহিয়াছেন।

পরিবর্ত্তনশীল এই প্রকৃতির পরিণাম-ক্রমানুসারে এই চতুর্যুগে বিভক্ত। এইরূপে সহস্র বার পরিবর্ত্তন হইলে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার এক দিন হয়, এইরূপে চতুর্যুগ সহস্রে ব্রহ্মার এক রাত্রি হইয়া থাকে। এই এক এক ব্রাহ্ম অহোরাত্রে বা এক এক কল্পে এক এক ব্রাহ্মপ্রলয় হইয়া থাকে। ইহাকেই (ব্রহ্মার এক অহোরাত্রকে) নৈমিত্তিক প্রলয় বলে। অর্থাৎ ব্রহ্মা দিবা-ভাগে সৃষ্টি করিয়া রাত্রিতে নিদ্রিত হন। ব্রহ্মাণ্ড-অন্তঃকরণের চালকশক্তি নিদ্রিত হওয়াতে ব্রহ্মাণ্ডের ক্রিয়াও বন্ধ হইয়া যায়, এবং সৃষ্টিতে জলপ্লাবন, বাত্যাদি আধিদৈবিক বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। পুনরায় দিবাভাগে জাগরিত হইয়া ব্রহ্মা যখন দেখেন যে, প্রলয় হইয়া গিয়াছে, তখন আবার সৃষ্টি করেন। এক স্থলে কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন,—

"There are twelve such duel stars or দ্বাদশসূর্য্য, they are slowly approaching one another and in the fulness of time, they would known eventually merge into one another,—producing what is popularly as the মহাপ্রলয়—annihilation of the universe". These twelve duel suns are in turn rotating round an uuknown centre called বিষ্ণুনাভি; the real of ব্রহ্মা the creative power of the universe

অর্থাৎ কারণরূপে অব্যক্ত হইতে এই চরাচর প্রাণিগণ ব্রহ্মার দিবসের উপক্রমে প্রাদুর্ভূত হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রির উপক্রমে পুনরায় সেই অব্যক্তেই প্রলীন হইয়া থাকে। এই রূপ ৩৬৫ অহোরাত্রে এক ব্রাহ্ম সংবৎসর এবং একশত সংবৎসরে এক ব্রাহ্ম শতাব্দী হইয়া থাকে। শতবর্ষ আয়ু অতীত হইলে ব্রহ্মার লয় হইয়া যায় এবং ঐ সঙ্গে প্রকৃতির প্রলয় অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের মহাপ্রলয় সংঘটিত হইয়া থাকে। তখন সমস্ত স্থূল ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্মরূপে স্বকারণে লীন হইয়া যায়। ব্রহ্মা, দেবতা ঋষি পিতৃগণ ব্রহ্মে, ব্রহ্মাণ্ডপ্রকৃতি মূল-প্রকৃতিতে এবং সংস্কারসমূহ সূক্ষ্মরূপে মহাকাশে বিলীন হইয়া যায়। শান্ত-প্রকৃতি চঞ্চলা হইয়া সৃষ্টিলীলাবৈভব বিস্তার করেন, আবার শান্ত হইয়া শান্তিময় ব্রহ্মে মিশিয়া যান। সচ্চিদানন্দ-সাগরে প্রথমেও শান্তি, শেষেও শান্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শান্তির পর অশান্তি—আবার অশান্তির পর শান্তি! অনন্তকাল হইতে প্রকৃতি এই বিচিত্রতাময় সৃষ্টি প্রসব করিয়া চক্রের ন্যায় ঘুরাফেরা করিতেছে।

প্রথমে বলা হইয়াছে যে, বিশ্বাসের শক্তি যাহা সমর্থিত হইয়া বিশ্বাসমহীরুহ প্রকাণ্ড-কাণ্ডাদিযোগে গগনভেদ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বর্দ্ধিত হইয়া যাইতেছে কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর—যাহা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়া দেখান হইয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই অনন্তসৃষ্টির অনন্ত কার্য্যকলাপ অনন্তের সম্মুখে ক্ষণিকমাত্র, স্বপ্নের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, তাহার লীলাকাল মহাকালে বিলীন। এই কালের স্রোতে পড়িয়া তাহা পার হইবার জন্য সন্তরণের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বিজ্ঞানবিদ্ বলিবেন, সন্তরণ না দিলে, আত্মরক্ষা হয় কেমন করিয়া? এই আত্মরক্ষার জন্যই, এত আয়োজন ও প্রয়োজন-সংপূরণ; এত আয়াস ও এত যত্ন। আমি বলিতেছি, তোমার এ আয়াস—এ যত্ন তবে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে কেন? তুমি সংসারী হইয়া সংসারের যে উন্নতি করিয়াছ, সামাজিক হইয়া সমাজের যে হিতসাধন করিয়াছ, দয়াপ্রবণ হইয়া দীন—দুঃখীর যে দুরবস্থা বিমোচন করিয়াছ, স্বদেশ-বিদেশ এক করিয়া যে সভ্যতাবিস্তার করিয়াছ, তাহার শেষ কোথায়? কোথায় সেই মান্ধাতার মহিমান্বিত রাজ্য? কোথায় সেই সূর্য্যবংশীয় নরপতিদিগের অমিত বিক্রম? কোথায় সেই দ্বারকা-পতি বৃষ্ণিবংশীয় রাজগণের অমানুষিক ক্রিয়াকলাপ? কোথায় সেই দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ পাণ্ডবদিগের স্বর্গোপম ইন্দ্রপ্রস্থ বিভব? এ সকল যে কালের গর্ভে বিলীন, সেই কালের গর্ভে সমস্ত নদ-নদী-খাল-বীল বিলীন হইয়া যাইতেছে; তাই দেখিয়া বন-দেবতা অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। তাহা না হইলে সেই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বসুন্ধরার এই অস্থিপঞ্জরসার অবস্থা হইবে কেন? তাই গব্যদুগ্ধে আর সে আস্বাদ পাওয়া যায় না;—ঘৃত হইতে সেই মধুর আঘ্রাণ পাইনা, পুষ্প সকলে আর সে সুবিমল পরিমল প্রবাহিত হয় না, এই উপভোগ্য বস্তুসকলের অভাবে জীবসকল বিশীর্ণকায় হইতেছে, জরা অকালে দেখা দিতেছে, তাই শৈশবে যৌবন—যৌবনে জরা দেখা দিয়া অকাল-মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। বিজ্ঞান কি ইহার গতিরোধ করিতে পারিবে? সে তাহা করিতে গিয়া হিতে বিপরীত করিয়া ফেলিয়াছে। এক দিকে যান-বাহন বিতাড়িত হওয়ায় রেল-মটর ট্রাম-বাষ্পীয়-যন্ত্র দ্বারা ছয় মাসের পথ ছয় দিনে অতিক্রম করায় যে স্বাস্থ্যহানির কারণ হইয়া উঠিয়াছে, ভুক্তভোগী লোক তাহা এখন স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহার উপর Collision and accident রোগের উপর বিষ ফোঁড়ার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। Government Reportএ প্রকাশ—এই সকল দুর্ঘটনায় প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র লোক প্রাণ হারাইতেছে। তবু কি তাহাতে নিস্তার আছে? বিজ্ঞান আবার হাত-পা তুলিয়া আসমান্ পথে লইয়া যাইতে চাহিতেছে, তাহাতে কতদিন যে ঢাকী-শুদ্ধ বিসর্জ্জনে যাইবে, তাহা অনুমানসিদ্ধ। দেবমাতৃক এবং নদীমাতৃক দেশে জল

অভাবে শস্যহানি হইতে দেখিয়া, বিজ্ঞান, (Canal system) খালপ্রণালী কাটিয়া নদী হইতে জল আহরণ করিয়া ক্ষেত্রে সিঞ্চন করিতে আরম্ভ করিয়া, যে সুফল আনয়ন করিয়াছে, গঙ্গাবাসী এবং পাঞ্জাববাসী এত দিনের পর তাহা বেশ অনুভব করিতে পারিতেছে। বৃষ্টিধারা ক্ষেত্রের যে উপকার সাধন করে, খালের স্রোত ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়া তাহা করিতে পারে না, প্রত্যুত তাহাতে 'পলী' পড়িয়া ক্ষেত্রের সার ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাহার পর ক্ষেত্রসকল ফাটিয়া ফুটীফাটা হইয়া দুই এক বৎসর মধ্যে তাহার অবস্থা অনুর্ব্বর হইয়া উঠে; তখন কৃষকেরা হায়! হায়! করিতে করিতে দেবরাজের শরণাপন্ন না হইয়া আর থাকিতে পারে না। মহাভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন—"দোষ কারু নয়গো মা, আমি স্বখাত-সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।" আমরা প্রকৃতির মধুর বাণী শুনিতে পাই না, তাহার ইঙ্গিত বুঝি না, তাই সম্মুখে নৈসর্গিক দুঃখ কষ্ট দেখিয়া চারি দিকে হাত পা ছুড়িতে থাকি।

হে বিজ্ঞানবিৎ মানুষ! বলিতে পার তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ এবং জীবনান্তে কোথায় যাইবে? তাহা যখন জান না, তবে তাহা জানিবার জন্ম সেই স্রষ্টা পাতা বিধাতার শরণাগত হও, তাঁহার বিধান মস্তকে ধারণ কর, এবং প্রতীক্ষা করিয়া দেখ, প্রকৃতি আপনার প্রভাবে তোমাকে কোন দিকে লইতে পারে। যখন এরূপ শতচেষ্টার অধি দেবতা প্রসন্ন হইলেন না, তাঁহার নৈসর্গি নিয়ম অবাধে কার্য্য করিতে লাগিল, আকাশ হইতে অশনিপাত, ঝঞ্ঝাবাত, অতিবর্ষণে জলপ্লাবন, ভূমধ্য হইতে অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, ও ধ্বংস পড়িয়া গ্রাম-নগর ধ্বংস হইতে লাগিল, তাহার ফলে ক্রমে মন্বন্তর, মহামারী, মেলেরীয়া, প্লেগ প্রভৃতি উপতাপ উপস্থিত হইয়া জীবজগত উজাড় করিতে আরম্ভ করিতেছে, তাহার উপর সর্পাঘাত, শ্বাপদগণদিগের তাড়না, বিবিধ প্রকার সংক্রামক পীড়া, দেব দ্বিজের বশবর্ত্তিতায় দন্দবিবাদে প্রাণনাশ, জলে ডুবা, বৃক্ষ বা গৃহছাদ হইতে পতিত হইয়া প্রাণহারাণ, আত্মহত্যা দস্যু ডাকাতের হস্তে প্রাণ হারাণ প্রভৃতি অবাধে চলিতে লাগিল। তখন তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় কি? সে উপায় যাঁহার হস্তে তাঁহার শরণাপন্ন না হইলে আর উপায় কোথায়? তুমি যখন জান না, তুমি কোথা হইতে কেন এখানে আসিয়াছ এবং কোথায় যাইবে, তখন তোমার এত আস্ফালন কেন? যিনি স্রষ্টা নিয়ন্তা, পাতা, তিনি যখন স্বেচ্ছায় সকলি করিতেছেন, তখন তাঁহার প্রতি নির্ভর কর, দেখ তাহার পরিণাম কি হয়! বাইবেলোক্ত আদম তাহা না বুঝিতে পারিয়া স্বর্গোদ্যান হইতে বিতাড়িত হইয়া মৃত্যুর পথে আসিয়া পড়িয়াছিল! তাহার সন্তানদিগের দুঃখত্রয় দেখিয়া এত ভীত হইতেছ কেন? একবিন্দু শুক্রঃ হইতে যিনি জননীগর্ভে মানুষ গড়িলেন, অঙ্গসৌষ্ঠব দিলেন, সৃষ্টিশক্তি রক্ষা করিবার জন্ম চক্ষুঃ মধ্যে তারা গড়িলেন, ধুলামাটি হইতে রক্ষা পাইবার জন্ম তদুপরি ভ্রূযুগলের

সমাবেশ করিলেন, দশ মাস দশ দিন পরে তাহাকে সুক্রশশার জরায়ু হইতে নিরাপদে নিষ্ক্রান্ত করিয়া কি অদ্ভুত লীলা দেখাইতে লাগিলেন? ভূমিষ্ট হইবা মাত্র কোথা হইতে জননীর স্তনে দুগ্ধ আসিল, হৃদয়ে অপত্য-স্নেহ উদিত হইল, তাহার পর-বর্দ্ধিত কলেবরের সঙ্গে সঙ্গে মুখবিবরে দন্তপাঁতি উদ্গত হইল, হাত পা চলিতে লাগিল। তখন সে মাতার ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া আত্মান্বেষণে বহির্গত হইল! সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা তাহাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে নিজ অঙ্কে ধারণ করিল! তখন তাহার আর এক লীলা! সেই সঙ্গে যুব যুগলের প্রসঙ্গ—তাহাই সৃষ্টিপ্রকরণে সমাবেশিত। তাহার পর ইহা হইতে তিনি আরো কি করিতেন বা করিবেন তাহা অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই অন্ধকারে কেহই কিছু না দেখিতে পাইয়া, আপনাপন জ্ঞানে যে যাহা বুঝিল, সে সেই রূপ এক একটা বিবরণ কহিল! সেই বিবরণ এখন লিপিবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মের নামে জগতে প্রচারিত হইয়াছে! এই ধর্ম্ম দেশভেদে কালভেদে কতরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। ধর্ম্ম যদি পারত্রিকের সংবাদ দিবার জন্য আসিয়া থাকে, তবে তাহাকে ব্যবচ্ছেদ—করিয়া সেই অন্ধকারে আলো লইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে—ইহা ধর্ম্ম কি কর্ম্ম?

(ক্রমশঃ)

হিমারণ্যবাসী পরিব্রাজক।

সমাজ-সংস্কার।

সমাজের সকলস্তরেই সংস্কারের আন্দোলন-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত—ক্রীড়ারঙ্গ দর্শন করা যায়। যাঁহারা স্থিরকর্ণে উৎসুকপ্রাণে সমাজের কলকোলাহল শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন—এ রব শুধু শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে না; লোকচক্ষুর অগোচরে কার্য্যকারিতার বীজ রাখিয়া যাইতেছে। এখন আলোচনা করা প্রয়োজন, এই তরঙ্গ-তাড়ন—এই কলরব কি আমাদিগের কল্যাণকল্পে অনুষ্ঠিত, না ইহা আমাদিগকে বিনাশের দিকে লইয়া যাইতেছে? এই আন্দোলন আলোচনায় চিন্তা-চর্চ্চায় আমাদের শক্তি ব্যয়িত হইতেছে, অনেকস্থলে এই পূজায় আমাদের হৃদয়ের রক্ত বলিরূপে দিতে হইতেছে, আমরা কি ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারি? আমাদের জীবনমরণের শঙ্কটসমস্যার সঙ্কুল সময়ে কি ইহার প্রতি উদাসীন থাকিতে পারি?

একদল মনে করেন—"হিন্দুসমাজের সংস্কার হইতে পারে না। ঋষিগণ ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, তাঁহারা সেই সুদূর অতীতকালে সুতীক্ষ্ণ দিব্য ভবিষ্যদৃষ্টির সাহায্যে ইদানীন্তন সমাজের হিত অহিত দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তৎকালেই আমাদের হিতকর বিধানসমূহ লিপীবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। আমরা আত্মদোষেই সেই সকল অমূল্য বিধিব্যবস্থার সুফল ভোগ করিতে পারিতেছি না। ঋষিগণ আমাদের মঙ্গলচিন্তা

করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমরা বুদ্ধি-দোষে তাঁহাদের উপদেশ অনুসরণ করিতে পারিতেছি না। তাঁহাদের বিধান পালনই কর্ত্তব্য, তাহার সংস্কার বা সংশোধন চেষ্টা আমাদের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় ও অহমিকার বিজৃম্ভণমাত্র।" ইঁহাদের বিবেচনায় সংস্কার-প্রযত্ন বৃথা শক্তিক্ষয়কর ও অধর্ম্মকর।

অপর সম্প্রদায় বলেন—ঋষিগণের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টি আমাদের সর্ব্ববিধ আকাঙ্খা পূরণ করিতে পারে নাই। জগতের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মানববুদ্ধির নব নব অঙ্কুরোদ্গম হইতেছে। বর্ত্তমান জগতের অভাব অসুবিধা—আর্যযুগের মনুষ্যগণ চিন্তা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধহয় না। মানব নৈসর্গিক প্রবৃত্তিবলে স্বতই অভাবমোচনে চেষ্টা করে, শাস্ত্রকারগণের উপর সে ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে জীবনযাপন করা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নয়। প্রয়োজন অনুসারে সমাজ শত সহস্র আচারব্যবহার অর্জ্জন ও বর্জ্জন করিয়াছে—ইহার দৃষ্টান্ত চক্ষুষ্মানের অগোচর নহে। পুরাতনের প্রতি স্নেহমমতা মানবমনের দুর্ব্বলতাবিশেষ,—কিন্তু দেশ কাল পাত্রানুসারে পরিবর্ত্তন-স্বীকার—অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করা জগতের প্রত্যক্ষপরিদৃষ্ট সার্ব্বজনীন সত্য। নিজের বাল্যজীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি বার্দ্ধক্যের প্রয়োজন-সিদ্ধি করে না, ইহা দেখিয়াও যাহারা পরিবর্ত্তনের সমর্থন করে না, তাহারা জীবিত হইয়াও মৃত—নরাকারে প্রাণহীন যন্ত্র। যে সমাজ যত পুরাতন, তাহাতে তত অধিক সংস্কার সাধিত হইয়াছে এবং তত অধিক সংস্কারের প্রয়োজন আছে। পরিবর্ত্তন এ বিশ্বের প্রাণ। একভাবে—চিরদিন একই রূপে সংসারের কোনও বস্তু, ব্যক্তি, জাতি বা সমাজ থাকিতে পারে না, পারিতেছে না, পারিবেও না। শাস্ত্রকারগণ সমাজের কল্যাণকল্পে যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা যদি অপরিবর্ত্তনীয় হইত, তবে শাস্ত্রকারগণ সকলে সর্ব্ববিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই কেন? শাস্ত্রে সমাজ-সংস্কারের অসংখ্য দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। আর যদি শাস্ত্র সমাজসংস্কার সমর্থন না করিয়াই থাকেন, তাহা হইলেও সমাজসংস্কার স্বাভাবিক ও স্বতঃপ্রয়োজনীয়। শাস্ত্র যদি সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে না পারেন, অভাব অভিযোগের প্রতীকার করিতে না পারেন, সুখসমৃদ্ধির ব্যবস্থা না করিতে পারেন—এক কথায় যাহা কিছু অনিষ্টকর তাহার হস্ত হইতে সমাজকে রক্ষাকরিয়া, যাহা ইষ্টজনক তাহা প্রদান করিয়া সমাজের মঙ্গলের পথ পরিষ্কৃত করিতে না পারেন, উন্নতি প্রবাহে প্রবলতা দিতে না পারেন, তবে সমাজ কিজন্য শাস্ত্রানুগত্যের নাগপাশে বদ্ধ থাকিবে? সেই বন্ধন সকলে প্রার্থনা করে, যাহাদ্বারা বিষবেগ নিবারিত হয়, আর যাহা শ্বাসরোধের সহায়তা করে—মরণের সেনাপতিত্ব করে, সে বন্ধন কাহারও প্রীতিপদ হইতে পারে না। শাস্ত্রদ্বারা সমর্থিত হয় ভাল, না হয় ক্ষতি নাই, কিন্তু সমাজসংস্কার ব্যতীত অসুবিধার ঔষধ আর নাই। যাহা অসুবিধাকর তাহাই লোকে ত্যাগকরিতে চায়, এই স্বভাবসম্পদের উপর বলপ্রকাশ মূঢ়তার নামান্তর মাত্র।

উভয়পক্ষই স্বীয় স্বীয় মত দৃঢ়ভূমিতে

স্থাপন করিবার জন্য শাস্ত্র ও যুক্তিজালের অবতারণা করেন। কিন্তু কেবল যুক্তি ও শাস্ত্রের একাংশ গ্রহণ করিলে অনন্তকালেও প্রকৃতসত্যের নগ্নমূর্ত্তি দর্শন করা যাইবে না; যুক্তির বিরুদ্ধযুক্তি আছে, শাস্ত্রের বিপরীত শাস্ত্র আছে; সমন্বয় ব্যতীত সত্যলাভ অসম্ভব। নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিতে গেলে বলা যায়—মধ্যযুগের গ্রন্থকারগণ যে সমন্বয়রীতি বা 'একবাক্যতা'র পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন।

সমন্বয়রীতির অনুসরণ করিলে বলা যায়—সংস্কার বিশেষ প্রয়োজনীয়। হিন্দুশাস্ত্র চিরদিনই সংস্কারের সমর্থন করিয়া আসিতেছেন। প্রথম ব্যক্তিজীবন লইয়া আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, আমাদের জীবন সংস্কারময়।

শাস্ত্র বলিয়াছেন—

চিত্রং কর্ম্ম যথানেকৈরঙ্গৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্য মপি তদ্বৎস্যাৎ সংস্কারৈর্বিধিপূর্ব্বকৈঃ।

একটী চিত্র নানা সংস্কারের দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে। রেখাপাত, কোণসংস্থান, বর্ণলেপন, অঙ্গানুকরণ প্রভৃতি নানারূপ সংস্কার একটী চিত্রের পূর্ণবিকাশে সহায়তা করে। জাতকর্ম্মাদি শাস্ত্রোক্ত সংস্কারসমূহ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব—বিকাশে সহায়তা করে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব বিকাশের ব্যবস্থা করে; এইরূপে বর্ণজীবন বিভিন্নসংস্কারের দ্বারাই পুষ্টিলাভ করে। কেবল যে জাতকর্ম্ম, অন্নাশন, উপনয়ন প্রভৃতিই সংস্কার, তাহা নয়, যাহাদ্বারা সংস্কার্য্য বস্তু বা ব্যক্তিতে কোনও প্রকার বিশেষত্ব আবির্ভূত হয়, তাহারই নাম 'সংস্কার'। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন "সংস্কারো নাম বিশেষাধায়কোব্যাপারঃ"। এই বিশেষত্ব দুই প্রকারে হইতে পারে। সংস্কার্য্য ব্যক্তিবস্তুতে গুণাধান এবং দোষনিরসন উভয় প্রকারেই সংস্কার প্রকাশ পাইতে পারে। যেখানে সংস্কার্য্য ব্যক্তিবস্তু কোনও দোষে আক্রান্ত, সেখানে সেই দোষের পরিহারার্থে সংস্কারের সার্থকতা, আবার যেস্থানে সংস্কার্য্য ব্যক্তিবস্তুতে আবশ্যকীয়গুণের সমাবেশ প্রার্থনীয় হয়, সেইরূপস্থলে সংস্কার নূতনগুণ জন্মাইয়াদিয়া সার্থকতালাভ করে। মোটের উপর ইষ্টগুণপ্রাপ্তি ও অনিষ্টদোষপরিহারই সংস্কারের তত্ত্ব। এ সংস্কার যেমন ব্যক্তিজীবনে খাঁটে, তেমনি সামাজিক জীবনেও খাঁটে। সমাজেরও ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের প্রয়োজন আছে, একথা বোধহয় কাহারও দুরবগম্য নয়।

সমাজ চিরদিন একভাবে থাকে না। সামাজিকগণের পরিবর্ত্তন সমাজে পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। সামাজিকজীবন নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং সমাজের পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। মহাভারতপাঠে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, একসময় এই পুণ্যভূমি ভারতে নরনারীগণ স্বেচ্ছারতিভোগ করিতেন। ঋষিপ্রবর শ্বেতকেতুর সম্মুখে তাহার জননীকে অপরে গ্রহণকরিতে উদ্যত হইলে, শ্বেতকেতু পিতার নিকট এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেন; পিতা বলিলেন—এই ধর্ম্মানুমত ব্যবহারে প্রতিবাদ করা সঙ্গত নহে। শ্বেতকেতু এই কুপ্রথার নিবারণকল্পে বদ্ধপরিকর হইলেন, কালে পরনারীসঙ্গ মহাপাপের মধ্যে পরিগণিত হইল। মহাভারতের অপর একটী উপাখ্যানেও আমরা এইরূপ প্রসঙ্গ দেখিতে পাই।

ঋষি দীর্ঘতমা বলিতেছেন—

অদ্য প্রভৃতি মর্য্যাদা ময়ালোকে প্রতিষ্ঠিতা।
এক এব পতির্নার্য্যাঃ যাবজ্জীবং পরায়ণম্।

অদ্য হইতে আমি এই নিয়মস্থাপন করিতেছি যে, রমণী আজীবন একই পতির সেবা করিবে। ইতিহাস পুরাণের বহুস্থানে এরূপ বৃত্তান্ত বিরাজ করিতেছে। এককালে নারীগণের স্বৈরাচার যে কারণেই হউক্ প্রচলিত ছিল, আবার সমাজের অহিতকর বিবেচিত হওয়ায় একসময়ে উহা সমাজ হইতে তিরোহিত হইয়া পাপকর্ম্মমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা কি সমাজসংস্কারের নিদর্শন নহে? সভ্যতাভিমানী মানব বলিবেন—'আর্যসমাজ অনুন্নত ছিল, তখনও সতীত্বের ধারণা—পাতিব্রত্যের মর্য্যাদা তাঁহারা অবগত ছিলেন না, যখন বুঝিলেন, তখনই কুরীতি ত্যাগ করিলেন।' শাস্ত্রকারগণের প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে, ঋষিগণের প্রতি যাঁহারা বিশ্বাসসম্পন্ন, সভ্যতার অভিমানে যাঁহারা স্ফীতবক্ষ নহেন, তাঁহারা বলিবেন—'যেদিন মানবচিত্ত পরনারীদর্শনে বিকৃত হইত না, মানবগণ ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ছিলেন, সেদিন পরনারীগমন পাপরূপে উল্লিখিত হইতে পারে না। বিধানশাস্ত্র সমাজপ্রচলিত দোষের শান্তিব্যবস্থা করে, কল্পিতদোষের প্রশমনে ব্যস্ত হয় না। যখন মানবকুল ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে লাগিল—কামকুভাবের অনলে তাহাদের হৃদয় পুড়িতে লাগিল, তখন তাহারা পরনারী-গ্রহণে অগ্রসর হইল। ধর্ম্মভীরুগণ বিধান-শাস্ত্রে উহার নিষেধবিধি না দেখিয়া প্রথমতঃ আপত্তি করিতে ইতস্তত করিতে-ছিলেন, শেষে উহা পশুভাবের বিকাশ—বুঝিতে পারিয়া দণ্ডবিধানদ্বারা উহার দোষ ঘোষণা করিয়াছিলেন। সতীত্বের ধারণার সহিত সভ্যতার বিশেষ সম্বন্ধ নাই। সভ্যসমাজ মুখে সতীত্বের গুণগান করে; কিন্তু কার্য্যতঃ সভ্যনামধারী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অসভ্যগণ অপেক্ষা সতীত্বের আদর অধিক নয়। সভ্যতার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে গোপনে অপকর্ম্ম করিবার উপকরণ বৃদ্ধি পাইতেছে। অসভ্য সমাজে এ উপদ্রব নাই।' যেদিক্ দিয়াই দেখা যাউক, স্বৈরাচার এককালে ছিল ও সময়ে তাহা বিধানের দ্বারা নিবারিত হইয়াছিল,—এই সমাজসংস্কারের সাক্ষী শাস্ত্র স্বয়ম্।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত; রমণীগণের বেদাধ্যয়ন—উপনয়ন। উহা এককালে প্রচলিত ছিল, হারীত প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান; আবার মনু প্রভৃতির ধর্ম্মসংহিতায় দেখা যায়—বিবাহ উপনয়নের স্থান অধিকার করিয়াছে, নারীগণ বেদপাঠে বঞ্চিত হইয়াছেন। যেরূপ কারণেই হউক, এককালে গার্গী জন্মিয়াছিল, তাহারপর বিধান-শাস্ত্র গার্গীর পুনরাবির্ভাবে বাধা দিয়াছে।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত; মাতুলকন্যাপরিণয়াদি শিষ্টাচার। মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়—

মাতুলস্য সুতামূঢ়্বা মাতৃগোত্রাস্তথৈবচ।
ত্যক্তাং কৃত্বা সমুৎসর্গং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।

মাতুলকন্যা বিবাহ করিলে প্রায়শ্চিত্তভাগী হইতে হয়। সামাজিক কোনও গূঢ় কারণে দক্ষিণাত্যের বেদজ্ঞ বিপ্রগণ এই শাস্ত্রের সম্মানরক্ষা করেন না; মাতুলকন্যাবিবাহ করেন। দক্ষিণাপথের ঋষিকল্প মাধবাচার্য্য 'পরাশরমাধবে' বেদাদি শাস্ত্র হইতে প্রমাণ

উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—মাতুলকন্যা-পরিণয় বেদসম্মত। অনেক দাক্ষিণাত্যবাসী পণ্ডিত বলেন—মাতুলকন্যাপরিণয় বৈদিক-কালে প্রচলিত ছিল, বেদে সুতরাং প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্ত্তিযুগের সংহিতাকারগণ এই প্রথাকে দূষণীয় মনে করিয়া ইহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন। দাক্ষিণাত্যগণ এই পরিবর্ত্তন-প্রস্তাব গ্রহণ করে নাই; কারণ তাহারা বেদসেবক। বৌধায়ন প্রভৃতি ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারগণ দাক্ষিণাত্যের এই আচারের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা অতি প্রাচীন প্রথা।" যে রূপই হউক্, ইহা সমাজসংস্কারের দৃষ্টান্ত। সংস্কারক আর্য্যাবর্ত্তই হউক্, আর দাক্ষিণাত্যই হউক্, শাস্ত্রকারগণ কিন্তু প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন।

অপর দৃষ্টান্ত—ক্ষেত্রজ, পৌনর্ভব প্রভৃতি পুত্রোৎপাদন; বহু সংহিতাকার ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহস্পতি প্রভৃতি সংহিতাকার কলির মানবের পক্ষে ইহার নিষেধ করিয়াছেন। কলিতে দত্তক ও ঔরস পুত্র ব্যতীত অপর সকলগুলিকে পরিত্যাজ্য বলা হইয়াছে অবশ্য কোনও গূঢ় কারণে এগুলি ত্যক্ত হইয়াছে; বিনাকারণে নহে। ইদানীন্তনগণের তপো-বল-বীর্য্যাদির অল্পতা ইহার কারণ, "শক্তি-হীনৈরিদন্তনৈঃ" বাক্য দ্বারা বৃহস্পতি তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক্ এসংস্কারের প্রমাণও শাস্ত্রেরই কুক্ষিতে আত্মরক্ষা করিতেছে।

অন্যদৃষ্টান্ত—বিবাহ, অতিথিকর্ম্ম ও পিতৃ-যজ্ঞ প্রভৃতি স্থানে গোবধ। বেদ বলেন—"ত্রয়ং গোরালম্ভস্থানং অতিথিঃ পিতরো বিবাহশ্চ।" কোনও অনির্দ্দেশ্য কারণে (কারণের আলোচনার স্থানাভাব।) গোবধ বিদায় লইল। শবরস্বামী "বৎসমালভেত" বেদ-বাক্যের 'আলম্ভ' অর্থ বুঝিলেন 'স্পর্শ'। পূর্ব্বে 'আলম্ভ' অর্থ ছিল 'বধ'। বিবাহে গোবধের নিষেধবিধি প্রচারিত হওয়ায় "মুঞ্চ গাং বরুণপাশাৎ" শুনা গেল; গো-দেবতা রুদ্রগণের আদিত্যগণের ও বসুগণের আত্মীয়া হইয়া দাঁড়াইলেন। শাস্ত্রকারগণ গোমেধ ও মধুপর্কে গোপশুবধ কলিযুগে অধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহাকে ধর্ম্ম-সংস্কার—সমাজসংস্কার বলিব না ত কি বলিব?

আরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে; সকল গুলির উল্লেখ এবং কারণের আলোচনা এপ্রবন্ধে সম্ভব নহে; সুতরাং আর একটী-মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া বক্তব্যবিষয়ের উপসংহারে মনোযোগ করিব। ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখা যায়—উদ্ধারবিভাগ বা বিষমবিভাগ বিদ্যমান ছিল। পিতা পুত্রগণকে উত্তম, মধ্যম, অধম বিভাগ করিয়া দিতে পারিতেন। সকল পুত্র সমাংশ পাইতেন না। এ নিয়ম উঠাইয়া দেওয়া যায়। শাস্ত্রে ইহার পরিচয় দেদীপ্যমান।

যথা নিয়োগধর্ম্মোনো নানুবন্ধ্যাবধোঽপিচ।।
তথোদ্ধারবিভাগোঽপিনৈব সম্প্রতি বর্ত্ততে।

অর্থাৎ সন্তানোৎপাদনার্থে অন্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করিয়া অপত্যোৎপাদন করান অধুনা প্রচলিত নাই; গোবধও উঠিয়া গিয়াছে, সেইরূপ পুত্রগণের বিষমবিভাগও এখন বিদ্যমান নাই। কি অর্থনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, কি লোকনীতি—সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সমাজের অবস্থানুসারে প্রয়োজন হওয়ায় এই সকল সংস্কার হিন্দুসমাজে স্থান পাইয়াছে; শাস্ত্রের রত্নভাণ্ডারে তাহার প্রমাণমুদ্রা অদ্যাপি

বিরাজিত থাকিয়া সমাজসংস্কারের ধর্ম্মজনকতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

রক্ষণশীলদল বলেন—"সমাজসংস্কার শাস্ত্রকারগণের কার্য্য, উহাতে ঋষিদের অধিকার। বর্ত্তমানে কেহ শাস্ত্রকার বা তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষি থাকিলে তিনিই এ কার্য্যের অধিকারী ছিলেন। পণ্ডিতগণকে ঋষির আসন প্রদান করা যায় না।" উদারমতিদল প্রত্যুত্তর দেন—আর্ষযুগে ঋষিরা ঐ সকল সংস্কারকার্য্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঋষি না হইলে সংস্কার হইবে না, ইহা সঙ্গত নহে, সময়ের প্রবলবন্যায় ভাসিতে ভাসিতে সমাজ এককূলে গিয়া লাগিবেই; অনিচ্ছায় ও কালধর্ম্মে পরিবর্ত্তনগ্রাসে সমাজ পতিত হইবেই। তখন যদি কোটীকণ্ঠে চীৎকার করিয়া আমরা বলি; "সমাজ হে দাঁড়াও, আমাদের ঋষি আসেন নাই, তিনি আসিলে তোমার সংস্কার আরব্ধ হইবে।" সে কথায় সমাজ কর্ণপাত করিতে পারিবে কি? আমাদের চীৎকারধ্বনি গগনে বিলীন হইতে না হইতেই কালস্রোত সমাজকে অনেকদূরে লইয়া যাইবে। আর চিরদিনই ঋষিরা সংস্কার করেন না, পণ্ডিতেরাও বহুসংস্কার করেন। শাস্ত্রেই দেখা যায়, দীর্ঘকালব্রহ্মচর্য্য, কমণ্ডলুধারণ, দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন, বিবাহিতার পুনর্ব্বিবাহ, অশ্বমেধ, প্রাণত্যাগার্থে সমুদ্রগমন প্রভৃতি কার্য্য সমাজের মঙ্গলার্থে কলির প্রথমে পণ্ডিতগণই নিবারণ করিয়াছেন।

শাস্ত্রই বলিয়াছেন—

এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ।

বুধ অর্থ পণ্ডিত, ঋষি নয়। যাঁহারা পণ্ডিতদের ঋষির আসন দিতে অনিচ্ছুক তাঁহারাই ত মাধবাচার্য্য, বাচস্পতিমিশ্র, নীলকণ্ঠ, রঘুনন্দন প্রভৃতি যুগপরিবর্ত্তক পণ্ডিতগণের আদেশকে ঋষির আদেশ মনেকরেন। সমাজের প্রধান ব্যক্তিগণই চিরদিন সংস্কার করেন।

আমরা বলি—সংস্কার শাস্ত্রসিদ্ধ; নিরপেক্ষ ধর্ম্মপ্রাণ পণ্ডিতগণের সমাজসংস্কারের অধিকার আছে, কিন্তু বিপদ্ দুটী। প্রথমতঃ—যাঁহারা সামান্য অর্থের সহিত বিবেকবুদ্ধির বিনিময় করিয়া পরমতে পরিচালিত হন, তাঁহারা কি প্রকৃত হিতকর সংস্কারের নেতৃত্ব করিতে পারেন? পারিলে এসব বিপদ্ হইত না। দ্বিতীয়তঃ—যাঁহারা সংস্কার-প্রয়াসী, তাঁহারা অনেকেই সংস্কারের নামে সংহার-সাধনে ব্যগ্র। যাহাতে এই জরাজীর্ণ সমাজ সুদৃঢ়, সুদৃশ্য ও সুখসেব্য হয়, তাহাই হিতকর সংস্কার। যাঁহারা এই পুরাতন মন্দির ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া, নূতন উপাদানে, মসজিদ্ বা গির্জ্জার অনুকরণে ইহাকে গড়িতে চাহেন, তাঁহাদের হস্ত হইতে ভগবান্ সমাজকে রক্ষা করুন। আর যাঁহারা মন্দির বজায় রাখিয়া বিনষ্ট, বিকৃত ও বলহীন অংশের পুনর্গঠনে নূতন দৃঢ় ও 'মানানসই' উপাদান নিয়োগ করিতে চাহেন, ভগবান্ তাঁহাদেরই 'স্বাগত' ঘোষণা করুন। অনেকে সমাজসংস্কার করিতে গিয়া সমাজ হইতে দূরে চলিয়া যান, এবং নূতনসমাজগঠনে মনোযোগ করেন; তাঁহারা সমাজসংস্কারক নহেন, কক্ষচ্যুত গ্রহস্বরূপ উপদ্রবকর ও শঙ্কাপ্রদ। সমাজসংস্কারকেরা হিন্দুর সমাজসংস্থান (কনষ্টিটিউশন্) আগে ভাল করিয়া বুঝিয়া, শেষে ক্ষতে প্রলেপ দিবেন।

নূতন ক্ষত উৎপাদন করিবেন না। রোগী, যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতে স্নিগ্ধকর প্রলেপ দিতে প্রথমতঃ আপত্তি করে, ইহা স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু ঔষধ যদি উপকারী হয়, পরক্ষণেই সে আশীর্ব্বাদ করে বা কৃতজ্ঞ হয়। সমাজসংস্কার বিষয়ে আরও বক্তব্য আছে, বারান্তরে বলিব।

শ্রী——ভারতী।

প্রতাপকাটী, যশোহর।

মুনিবংশ।

(I)

বশিষ্ঠবংশ।

ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের মধ্যে একজন।

ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমিরাজের অভিসম্পাতে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ দেহ ত্যাগ করিয়া মিত্রাবরুণ দেব-দ্বয়ের ঔরসে কমল-মধ্যে মহর্ষি অগস্ত্যের সহিত জন্মগ্রহণ করেন।

অযোধ্যার পশ্চিমে মহোদয় প্রদেশে গোমতী নদীর তীরে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল। বশিষ্ঠ হইতে গোমতী নদী 'বাশিষ্ঠী' নাম উপহার পাইয়াছে। এই নদী এক্ষণে 'গুমটী' নামে খ্যাত।

বশিষ্ঠ চণ্ডালকন্যা অক্ষমালা অরুন্ধতীর পাণিগ্রহণ করেন। (১)

ব্রহ্মর্ষির শত পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শক্তি। এক দিন কনৌজপতি রাজা বিশ্বামিত্র মৃগয়া করিতে করিতে বশিষ্ঠের আশ্রমে সৈন্যসামন্ত সহ উপস্থিত হইলেন। সুরভির বৎস নন্দিনী ব্রহ্মর্ষির হোমধেনু ছিল। নন্দিনীর প্রসাদে বশিষ্ঠ রাজাকে দলবল সহ উত্তম ভোজন দিয়া অতিথি সেবা করিলেন। চর্ব্ব্যচোষ্য-লেহ্যপেয় আদি কিছুরই অভাব হয় নাই। রাজা বিশ্বামিত্র নন্দিনীর প্রভাব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া রাজ্যদানে নন্দিনীকে লইতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ হোমধেনু বিক্রয়ে সম্মত হইলেন না। তখন বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলপ্রকাশে নন্দিনীকে অপহরণ করিয়া লইতে উদ্যত হইলেন। ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ব্রহ্মর্ষি ব্রহ্মদণ্ড নিক্ষেপ করিলে রাজা পরাজিত হইলেন। বিশ্বামিত্র বুঝিলেন যে ক্ষত্রিয়-বল বলই নহে 'ব্রহ্মতেজঃ বলং বলম্'। বিশ্বামিত্র তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণ হইলেন এবং তিনি সরস্বতী নদীর এক তীরে বসিয়া সরস্বতীকে আদেশ দিলেন যে "অপর তীরস্থ বশিষ্ঠকে তরঙ্গে ভাসাইয়া আমার নিকট লইয়া আইস"। বিশ্বামিত্রের কু-অভিসন্ধি বুঝিয়া ব্রহ্মহত্যার ভয়ে সরস্বতী তাহার আদেশ

(১) অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তা অধমযোনিজা। (মনু)

বশিষ্ঠপত্নী অধমকুলজাত হইলেও অরুন্ধতী ভারতে আদর্শ সাধ্বী। দক্ষকন্যা স্বাহা দেবী সপ্তর্ষিগণের ছয় পত্নীর রূপ ধরিয়া অগ্নিদেবকে বঞ্চনা করিয়া ছিলেন, কিন্তু পতিব্রতা অরুন্ধতীর রূপ ধারণে অক্ষম হইয়াছিলেন—গতিকে স্বাহাসুত কার্ত্তিকেয় বণ্ডাতুর হইলেন। বিবাহরাত্রে বর, কন্যাকে পতিপ্রাণা অরুন্ধতী তারা আদর্শস্থলে দেখাইয়া দেন।

হুত্বা উপোত্থায় উপনিক্রম্য ধ্রুবম্ দর্শয়তি। অরুন্ধতীম্ চ॥

ভবদেবভট্টধৃত গোভিলবচন ২।৩।৩—৯

পালন করিলেন না। বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন যে "তোমার জল রক্ত হউক"। (২)

মার্ত্তণ্ড আদি অষ্টবসু বশিষ্ঠের হোমধেনু অপহরণ করিয়া ছিলেন। বশিষ্ঠের অভিসম্পাতে অষ্টবসু গঙ্গার গর্ভে শান্তনু রাজার ঔরসে মানবজন্ম গ্রহণ করেন। সাত জন বসু জন্মমাত্র পাপমুক্ত হইলেন। কিন্তু মূল চোর মার্ত্তণ্ডদেব ভীষ্মনামে সুবিখ্যাত হইলেন।

বশিষ্ঠ অযোধ্যাপতি সূর্য্যবংশীয় রাজগণের পুরোহিত ছিলেন। তিনি বহু বেদ-সূক্তের বক্তা। বশিষ্ঠ প্রণীত রামায়ণ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ নামে প্রসিদ্ধ আছে।

এক দিন বশিষ্ঠের শিষ্য অযোধ্যাপতি সৌদাস সম্বরণ মৃগয়ায় শ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া বন মধ্যে এক সংকীর্ণ পথে যাইতেছেন। বশিষ্ঠপুত্র শক্তিও সেই পথে আসিতে ছিলেন। উভয়ে সম্মুখীন হইলে রাজা মুনিপুত্রকে কহিলেন "তুমি পথ ছাড়"। শক্তি মিষ্ট বাক্যে কহিলেন যে, রাজার কর্ত্তব্য যে ব্রাহ্মণকে পথ ছাড়িয়া দেন। কেহই পথ ছাড়িলেন না। ক্রোধে রাজা মুনিপুত্রকে কশাঘাত করিলেন। মুনিপুত্রও রাজাকে অভিশাপ দিলেন "তুমি নরখাদক রাক্ষস হও"। এই বলিয়া মুনিকুমার পথ ছাড়িয়া দিলেন।

বিশ্বামিত্রের আজ্ঞায় কিঙ্কর নামক রাক্ষস রাজার দেহে প্রবেশ করিল। রাজা রাক্ষস হইয়া কল্মাষপাদ নামে খ্যাত হইলেন।

পরে এক দিন কল্মাষপাদ শক্তিকে পথে পাইয়া তাহাকে ভক্ষণ করিলেন এবং বিশ্বামিত্রের আজ্ঞায় শক্তির কণিষ্ঠগণকেও ভক্ষণ করিলেন।

ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ পুত্রশোকে অধীর হইয়া আত্মঘাতী হইবার মানসে সুমেরু-শৃঙ্গ হইতে পড়িলেন, দাবানলে প্রবেশ করিলেন এবং কণ্ঠে শিলা বান্ধিয়া সমুদ্রে ডুবিলেন কিন্তু তিনি প্রাণে মরিলেন না। তিনি দড়াদড়ি দিয়া দেহ বন্ধন করিয়া পাঞ্জাবের পাঁচ নদীর মধ্যে একটী নদীতে ডুবিলেন। নদী ব্রহ্মহত্যার ভয়ে মুনির বন্ধন খুলিয়া দিয়া তাহাকে তীরে ফেলিয়া দিল। পাশ-মোচনে সেই নদী বিপাশা নামে খ্যাত হইল। তখন মুনি পাঞ্জাবের যে নদী কুমীরে ভরা ছিল সেই নদীতে ঝাঁপ দিলেন। ব্রহ্মহত্যার ভয়ে নদী শত ধারা হইয়া পলায়ন করিল। এই নদীর নাম শতদ্রু হইয়াছে। তখন মুনি আত্মহত্যায় নিরাশ হইয়া আশ্রমে ফিরিলেন। পথে শক্তির পত্নী অদৃষ্যন্তী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন। শাপান্তে সৌদাস সম্বরণ রাজার আদেশে তাঁহার রাজ্ঞী মদয়ন্তী, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের সহবাসে অশ্মক নামে যে পুত্র লাভ করেন, সেই অশ্মকের বংশধরগণ অযোধ্যার রাজা ছিলেন। অদৃষ্যন্তীর গর্ভে শক্তিপুত্র মহর্ষি পরাশর জন্ম গ্রহণ করিলেন। পরাশর ভারতের অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন। পরাশর পিতৃ-শত্রু রাক্ষসকুল বিনাশজন্য রাক্ষস-যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। বহু রাক্ষস নিপাতের পর মহর্ষি পুলস্ত্যের অনুরোধে পরাশর

(২) বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের দ্বন্দ্ব বিশ্বামিত্রের চরিতে স্পষ্টীকৃত হইবে।

রাক্ষস-বিনাশে বিরত হইলেন এবং তিনি সেই যজ্ঞের অগ্নি হিমাচলের উত্তরে ফেলিয়া দিলেন। সেই অগ্নি মধ্যে মধ্যে জ্বলিতে দেখা যায়। এই পরাশর-অগ্নিকে বিলাতে 'আরোরা বোরিয়ালিস' (Aurora Borealis) বলে।

পরাশর-প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র কলিযুগে প্রমাণ।

বসু উপরিচর নামে রাজার মৎস্য-গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। ঐ পুত্র মৎস্যরাজ নামে মৎস্যদেশে রাজত্ব পাইয়াছিলেন এবং ঐ কন্যা মৎস্যগন্ধা সত্যবতীকে বসুরাজ দাসরাজকে অর্পণ করেন। ধীবররাজের আদেশে সত্যবতী যমুনা নদীতে খেয়া দিত। এক দিন মহর্ষি পরাশর সেই খেয়ার নৌকায় পার হইবার সময়ে মৎস্যগন্ধার রূপলাবণ্যে মোহিত হইলেন। পরাশর কুজ্ঝটিকা সৃজন করিয়া সত্যবতীর সহবাস করিলেন। সত্যবতী গর্ভ ধারণ করিয়া সদ্যই যমুনাদ্বীপে এক সন্তান প্রসব করিলেন। দ্বীপে জাত বলিয়া পুত্রটীর নাম দ্বৈপায়ন হইল। এই পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামে খ্যাত। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋক্ যজুঃ সাম এবং অথর্ব্ব এই চারি ভাগে বেদ বিভাগ করেন। বেদ বিভাগ করিয়া তিনি 'বেদব্যাস' নাম উপহার পাইলেন। বেদব্যাস মহাভারত (৩) এবং আঠার খানি পুরাণ রচনা করেন।

আঠার পুরাণ।

(১) ব্রহ্মপুরাণ (২) পদ্মপুরাণ (৩) বিষ্ণুপুরাণ (৪) বায়ুপুরাণ (৫) শ্রীমদ্ভাগবত (৬) নারদপুরাণ (৭) মার্কণ্ডেয়পুরাণ (৮) অগ্নিপুরাণ (৯) ভবিষ্যপুরাণ (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ (১১) লিঙ্গপুরাণ (১২) বরাহ-পুরাণ (১৩) স্কন্দপুরাণ (১৪) বামন-পুরাণ (১৫) কূর্ম্মপুরাণ (১৬) মৎস্য-পুরাণ (১৭) গরুড়পুরাণ (১৮) ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ।

হস্তিনার রাজা শান্তনু সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করেন। সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুরাজের বিচিত্রবীর্য্য নামে পুত্র জন্মে। বিচিত্রবীর্য্য কাশীরাজদুহিতা অম্বিকা ও অম্বালিকার পাণি গ্রহণ করেন। নিঃসন্তান বিচিত্রবীর্য্য পরলোক গত হইলেন। সত্যবতীর আদেশে মহর্ষি ব্যাসের ঔরসে অম্বিকার গর্ভে অন্ধধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর জন্ম হয় এবং অম্বিকার দাসীর গর্ভে বিদুর জন্ম গ্রহণ করেন।

মহর্ষি ব্যাসের পুত্র শুকদেব গোস্বামী সংসার ত্যাগ করিয়া বাল্যকালেই সশরীরে স্বর্গে গমন করেন।

(ক্রমশঃ)

তারাদর্শক।

---

(৩) মহাভারতের প্রতি অধ্যায়ের শেষে এক একটী দুর্বোধ্য শ্লোক আছে, এই শ্লোক গুলিকে "ব্যাসকূট" বলে। মহাভারতের লেখক গণপতি-দেবের লেখনী-স্তম্ভন জন্য ব্যাসকূটের অবতারণা হইয়াছিল।

সৃষ্টি-রহস্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

বিজ্ঞানোক্ত যুগ-বিভাগ ও সৃষ্টিক্রম।

যুগ		যুগাংশ বা কাল	সৃষ্টির ক্রম
Poleozoic বা Primary	Primary আদিম	Laurentian [উত্তর আমেরিকার হ্রদবহুল প্রদেশব্যাপী শৈলশ্রেণী যথায় Eozoon নামীয় জীব নিদর্শন পাওয়া যায় তাহার নামে অভিহিত]	Eozoon (গ্রীক Eos অর্থে প্রভাত zoon জীব। অর্থাৎ চৈতন্যের প্রথম বিকাশ। জীব-সৃষ্টির প্রারম্ভ তাই এই নাম। চর্ম্মচক্ষে জড় বলিয়া ভ্রম হয়। Foraminifera ইহাও জড় ও উদ্ভিদ বলিয়া ভ্রম হয় এমন এক প্রকার জীব।
		Cambrian [কাম্বীয় (wales) দ্বীপে প্রাপ্ত বলিয়া সেই নাম]	স্পঞ্জ, প্রবালকীট, কূর্ম্মাদির ন্যায় দৃঢ়চর্ম্ম জীবসমূহ।
		Silurian [দক্ষিণ ওয়েলসের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে যথায় মেরুদণ্ডযুক্ত ও স্থলজ উদ্ভিদ নাই সেই প্রদেশের নামে আখ্যাত]	চিংড়ি প্রভৃতি মৎস্যের ন্যায় খোলাবিশিষ্ট মৎস্যজাতি।
	Age of fishes মৎস্যযুগ	Devovian [ডিভন্‌সায়ারে প্রাপ্ত বা বহু পুরাতন রক্তবালুময় প্রস্তরসদৃশ মৃৎস্তর]	বিবিধ কীট। গ্যানয়েড নামক মহাকায় মৎস্যজাতি।
		Carbouiferovs [আঙ্গারিকস্তর]	মেরুদণ্ডবিশিষ্ট স্থলজ জীব।
		Perinian [সমনামুকারী নাম]	সরীসৃপ
Mesozoic or Secondary		Triassic [নূতন রক্তবালু প্রস্তর যুগ]	অসংখ্য প্রকার সরীসৃপ। সামুদ্রিক দ্বিগ শিশু।
		Jurassic [জুরা পর্ব্বতমালার মৎস্যাণ্ডবৎ দানাদার চুণাপাথরস্তর]	মহাকায় উড্ডীয়মান সরীসৃপ। পক্ষী।
		Cretaceous [খড়িময় মৃৎস্তর]	কঙ্কালবিশিষ্ট মৎস্য প্রকাণ্ড শম্বুক

বৈজ্ঞানিক যুগ।		যুগাংশ বা কাল।	সৃষ্টির ক্রম।
Cainozoic বা	Tertiary	Eocene Eos প্রভাত, Kainos নূতন; অর্থাৎ নবসৃষ্টির প্রারম্ভকাল।	বৃহদাকার স্তন্যপায়ী। সর্প। মুদ্রাকৃতি প্রস্তরীভূত শঙ্খ শম্বুকাদি।
		Miocene Meion কম, Kainos নূতন; অর্থাৎ কিছু পুরাতন কাল।	মহাকায় তিমি।
		Pliocene Pleion অধিক Kainos নব; অর্থাৎ আধুনিক।	মানবাকৃতি মর্কট।
	Quarternary	Glacial Epoch [হিম যুগ] Pleistocene [Pleistos অতিশয়, Kainos আধুনিক]	মহাকায় লোমশ হস্তী। অন্যান্য লোমশ চতুষ্পদ। মানব।
		Historical [ঐতিহাসিক যুগ]	বর্ত্তমান প্রাণীসমূহ।

বলা বাহুল্য, বিজ্ঞান জীবসৃষ্টির পূর্ব্বে উদ্ভিদ্‌জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। পৌরাণিক জগতে এই বিজ্ঞানসম্মত যুগবিভাগ করিতে এক হিন্দু ব্যতীত আর কেহ পারে নাই। বিজ্ঞানেরই ন্যায় হিন্দু পুরাণে সৃষ্টির চারিযুগ নির্ণীত হইয়াছে এবং যুগভেদে সৃষ্টির ক্রমেরও একটা আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। অবশ্য সে সমুদয় রূপকের মধ্যে এমন প্রচ্ছন্ন যে, তাহা সৃষ্টিতত্ত্বের ন্যায়ই জটিল রহস্যময় হইয়া আছে। নিম্নে তাহার আভাসমাত্র প্রদত্ত হইল;—

পৌরাণিক যুগ	যুগাংশ বা কাল	সৃষ্টির ক্রম।
কৃত বা সত্যযুগ	মৎস্য যুগ [বাষ্পময় নীহারিকার প্রথম জমাট অবস্থায় যখন সমস্ত অবিভক্ত একার্ণবে মগ্ন তখন জলজ প্রাণী ব্যতীত আর কোন্ জীবের সৃষ্টি সম্ভব? সুতরাং ইহাই জীবসৃষ্টির প্রারম্ভ কাল]	জলজ জীব এবং এই জাতীয় জীবের পূর্ণ বিকাশ মৎস্যে, তাই এ যুগের অবতার মৎস্য।
	কূর্ম্ম যুগ [ক্রমে যখন জলভাগ স্থানে স্থানে গাঢ় হইয়া আসিতে লাগিল, তখন জল ও কর্দ্দমময় ভূমির উপযোগী জীবের সৃষ্টিকাল]	দৃঢ়চর্ম্মী জীবসমূহ উভচর প্রাণী, মহাকায় কুম্ভীর ও কূর্ম্মাদিও এই যুগের। কূর্ম্ম এজাতীয় জীবের পূর্ণ বিকাশ বলিয়া কল্পিত, তাই এ যুগের অবতার কূর্ম্ম।

পৌরাণিক যুগ।	যুগাংশ বা কাল।	সৃষ্টির ক্রম।
	বরাহযুগ [স্থল যখন জমাটবাঁধিয়া দৃঢ় হইতেছে এবং বহুলাংশে কর্দ্দমময়ও আছে তখন জল, স্থল ও তন্মধ্যবর্ত্তী স্থানোপযোগী জীবের উদ্ভব হইবার কাল।] কূর্ম্ম-যুগ ও বরাহযুগের সন্ধিসময় অর্থাৎ যুগপরিবর্ত্তনকালে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত পর্ব্বতোদ্গম, এবং জল, স্থলের মহাসংঘর্ষজনিত সমুদ্রমন্থন সংঘটিত হয়।]	জলজ, পঙ্কজ, স্থলজ, বনজ ও ভূগর্ভ খনন করিয়া কন্দমূলাহারী এবং মৃদ্গর্ভ বাসোপযোগী জীবজন্তু। মেরুদণ্ডবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী। সরীসৃপ, পক্ষী। কঠিন মৃত্তিকা খনন করিবার উপযোগী এবং পঙ্কপ্রিয় জীবের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ বরাহে, তাই এ যুগের অবতার বরাহ।
সত্য যুগ	নৃসিংহ-যুগ পৃথিবীর ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিরও বৈচিত্র্যবশতঃ এবং জীবের প্রকারবাহুল্য ও সংখ্যাধিক্য জনিত জীবনসংগ্রামের সূত্রপাতকাল। দেবদৈত্যের জীবনযুদ্ধ তাহার রূপক। জীবনযুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হইলে দৈহিক ও মানসিক উভয় শক্তিরই প্রয়োজন। তাহাতে পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব একাধারে বিকাশ প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। পশুরাজ সিংহই পশুত্বের ও নরাবতারই মনুষ্যত্বের আদর্শ, সুতরাং না সিংহ না নর অথচ নরও বটে, সিংহও বটে !]	মহাকায় ও অদ্ভুতমূর্ত্তি জীবসমূহ। না মৎস্য, না নরনারী, না সরীসৃপ, না পক্ষী, স্তন্যপায়ী অথচ মৎস্য, পশু অথচ পক্ষী, পক্ষী অথচ স্থলচর, মর্কট অথচ মানবাকৃতি—ইত্যাদি জীবসমূহ। তাই এ যুগের অবতার নরসিংহ।
	বামন-যুগ [ত্রেতাযুগারম্ভে মানব দেখা দিল, কিন্তু তখনও অপূর্ণ অর্থাৎ তখনও মানবের পূর্ণবিকাশ হয় নাই। ইহা মর্কট (ape) ও মানবের মধ্যবর্ত্তী কাল]	মর্কট ও মানবের মধ্যবর্ত্তী জীব অসম্পূর্ণ মানব। তাই এ যুগের বিকাশ বা অবতার বামন।
ত্রে	পরশুরাম যুগ। মানবের পূর্ণমূর্ত্তি কিন্তু প্রকৃতি ভীষণ, উদ্ধত, নির্ম্মম। এখানেও জীবনসংগ্রাম কিন্তু তাহা পশুজগতে নহে কারণ নৃসিংহ যুগের পর হইতে জীবজগতে মানবের শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—এ সংগ্রাম মানবে মানবে—নির্ম্মম হৃদয় না হইলে, শোণিতপিপাসু না হইলে ভাই ভায়ের কণ্ঠচ্ছেদ করিবে কি প্রকারে ? তাই নির্ম্মমতার অবতার মাতৃঘাতীর হস্তে উদ্যতকুঠার ! (কথিত আছে মাতৃহত্যাপাপে বহুকাল পরশুরামের হস্ত হইতে কুঠার খলিত হয় নাই)।	পূর্ণ মানবদেহ কিন্তু হৃদয়হীন জীবনযুদ্ধে স্ব স্ব অধিকারও স্বার্থ সুদৃঢ় করিবার জন্য পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তাই এ যুগের অবতার পরশুরাম।

পৌরাণিক যুগ।	যুগাংশ বা কাল।	সৃষ্টির ক্রম।
ত্রেতা	রামযুগ—[আকৃতি, প্রকৃতি ও হৃদয়ে মানবের সমুন্নতির কাল। দৈহিক সৌন্দর্য্য, স্বভাবচরিত্র ও মহাপ্রাণতায় ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞানে এযুগে মানব আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায় নহে]	এই যুগে রাজশক্তির বিকাশ, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, প্রজারঞ্জন, সমাজের উন্নতি, শিক্ষার বিস্তার, রাষ্ট্রনৈতিক উৎকর্ষ এবং মানব-সভ্যতার উন্নতিসহ উন্নত মানবের অভ্যুদয়। এ যুগের শ্রেষ্ঠবিকাশ বা অবতার রামচন্দ্র।
দ্বাপর	কৃষ্ণযুগ—[বল, বুদ্ধি, জ্ঞান, সৌন্দর্য্য ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা একাধারে যে যুগে সম্ভব হইয়াছে]	রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভার চরমোৎকর্ষে শিল্পবিজ্ঞান প্রভৃতির বিস্তারে, সভ্য সমাজের মঙ্গল ও অমঙ্গল আয়ত্ত করিয়া যে যুগ আসিয়াছিল, তাহার জলবায়ুতে বর্দ্ধিত মনুবংশে বিচিত্র-প্রকৃতিবিশিষ্ট মানবের উদ্ভব। এ যুগের শ্রেষ্ঠ বিকাশ বা অবতার কৃষ্ণ।
	বুদ্ধযুগ—[মানবের দেহ মন হৃদয় পূর্ণ বিকাশিত করিয়া তুলিতে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল—দয়া ও প্রেমের অবতার বুদ্ধদেবে তাহার চরম উৎকর্ষ]	ধর্ম্মান্ধতা ও স্বার্থান্ধতার পরিণামে ধরা রক্তার্ণবে পরিণত হইলে পর "জীবে দয়া এবং দয়াই ধর্ম্ম" এই মতবাদের সঙ্গে সঙ্গে নব সংস্কারাত্মক জাতির জন্ম ও বিস্তার—তৎসঙ্গে শিক্ষা, সমাজ, শিল্প, বিজ্ঞানাদির পরিবর্ত্তন এবং নবযুগের সূচনা।
কলি	বর্ত্তমান—পৌরাণিক রূপকানুসারে কলির যুগলক্ষণ ভবিষ্যপুরাণ ও কল্কিপুরাণে বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে পুরাণকারের দূরদর্শন শক্তির প্রমাণ আছে।	এ যুগে সৃষ্টির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। রূপকের মধ্যে কলিবংশীয়গণের উদ্ভব ও লয় সম্বন্ধে পৌরাণিক কল্পনার এইরূপ আভাস পাওয়া যায়,—ক্রোধের ঔরসে তদীয় ভগ্নী হিংসার গর্ভে কলির জন্ম। কলির ঔরসে তদীয় ভগিনী দুরুক্তির গর্ভে পুত্র ভয় এবং কন্যা মৃত্যুর জন্ম।

পৌরাণিক যুগ।	বৈজ্ঞানিক যুগ সমন্বয়।
কৃত বা সত্য—প্রথমযুগ ১৭২৮০০০ বর্ষ যুগ-পরিমাণ। নরের (জীবের ?) লক্ষবর্ষ পরমায়ু। ইচ্ছামৃত্যু। দেহ পরিমাণ ২১ হস্ত। মজ্জাগত প্রাণ। সুবর্ণপাত্র ব্যবহার। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ অবতার।	Primary বা প্রথম Paleozoic বা পৌরাণিক (গ্রীক Palaios প্রাচীন)। শত শত বর্ষব্যাপী জীবন—মহাকায়। জীবনের বহিঃপ্রকাশহীন জড়বৎ। Age of fishes &c.
ত্রেতা, ২য় যুগ ১২৯৬০০০ বর্ষ যুগপরিমাণ। দশ সহস্র বর্ষ পরমায়ু, অস্থিগত প্রাণ, দেহ-পরিমাণ ৪ হস্ত। রৌপ্যপাত্র ব্যবহার। বামন, পরশুরাম ও রাম অবতার।	Secondary or ২য় Mesozoic বা মধ্য (গ্রীক Mesos মধ্য)। জীবনের বাহ্য-প্রকাশ—(কঠোর কর্ম্মশীলতার লক্ষণে শক্তির পরিচয় জীবন-সংগ্রাম) আয়ু ও দেহ অপেক্ষাকৃত অল্প।
দ্বাপর ৩য় যুগ। ৮৬৪০০০ বর্ষ যুগপরিমাণ। সহস্র বর্ষ পরমায়ু। দেহপরিমাণ ৭ হাত। রক্তগত প্রাণ। তাম্র-পাত্র ব্যবহার। কৃষ্ণ ও বুদ্ধ অবতার।	Tertiary (লাটিন tertius তৃতীয়) তৃতীয় যুগ বা Cainozoic, গ্রীক kainos নূতন। পূর্ব্ব যুগাপেক্ষা খর্ব্ব-কায় ও অল্পায়ু। ঘোর জীবনসংগ্রামের যুগ।
কলি ৪র্থ যুগ। ৪৩২০০০ বর্ষ যুগপরিমাণ ১২০ বৎসর পরমায়ু দেহ পরিমাণ ৩৷৷০ হাত। অন্নগত প্রাণ। কল্কি অবতার।	Quarternary (Quarters চতুর্থ) এই যুগলক্ষণের প্রায় সবগুলাই পুরাণের সহিত মিলে

এক এক যুগের বয়স সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক- গণের মধ্যে ঘোর মতান্তর আছে, কিন্তু মোটের উপর পৌরাণিক সিদ্ধান্তের সহিত তাহার বহুল সাদৃশ্য আছে। পৌরাণিক যুগপর্য্যায় যদি সত্য—দ্বাপর—ত্রেতা—কলি হইত, তাহা হইলে নামেও কোন গোল ছিল না, কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ জাতি যুগভেদে অবতার সংখ্যা বা নাম অনুসারেই যুগের নাম রাখিয়াছেন। দ্বিতীয় যুগকে ত্রেতা ও তৃতীয়কে দ্বাপর বলিতে আমাদের সংস্কারেও বাধে না, কারণ আমরা শৈশব হইতেই শিক্ষকের নিকট "third person"কে "প্রথম পুরুষ" বলিতে শিখিয়াছি। অধিকন্তু বর্ত্তমান হইতে গণনা করিলে দ্বিতীয় দ্বাপর ও তৃতীয় ত্রেতাই হয়। সে যাহা হউক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে পৌরাণিক কল্পনার এমন মিল আর কোথাও পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে বিজ্ঞান যখন বলিতেছে—সৃষ্টির সময়নির্দ্দেশ আদ্যন্ত সম্পূর্ণ নহে, কারণ মধ্যে মধ্যে জীবের নিদর্শনাভাবে শৃঙ্খল ভঙ্গ হইয়া আছে; "the gaps exist because the record is matilated. Nature, like the Sibyl of camae, has destroyed her books." তখন পুরাণের দোষ কি ? কয়েকটি অবান্তর বিষয়েও উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যে Golden age স্বর্ণযুগের নাম করিতে

পাশ্চাত্য-জগতে আনন্দ আর ধরে না, সেই পৌরাণিক যুগে সাধারণের ব্যবহার-পাত্র ছিল সুবর্ণ। পাশ্চাত্যের Silver age ত্রেতার উক্ত রৌপ্যপাত্র-ব্যবহারের সঙ্গে কতকটা মিলে। দ্বাপরের তাম্রপাত্র ব্যবহার অনেকটা Iron age এর আভাস দেয়, কারণ কালের কঠোরতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার দেখা যায়, সত্যযুগে মানবাবতারের উল্লেখ নাই। ত্রেতায় অপূর্ণ নর-বামনের উল্লেখ আছে। বামনাবতার, নরসিংহ (না নর না সিংহ) অবতার এবং পরশুরাম (পূর্ণ মানব) অবতারের মধ্যবর্ত্তী স্তর সম্পূরণ করিয়াছেন। বিজ্ঞানজগতে মানবজাতির উৎপত্তি ও বংশবৃদ্ধি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই কয়েকটী

(১) একই বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া মানব নানা দিগ্দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং স্থান, কাল ও অবস্থার অনুযায়ী আকৃতি ও প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে ;

(২) ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবস্থা ও কালে মানবজাতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অনুবংশে জন্ম-পরিগ্রহ ও বিভিন্ন বংশ বিস্তার করিয়াছে।

(৩) মানুষ ক্রম-বিকাশ-নীতিতে নীহারিকা-গর্ভ হইতে নানা জন্মের ভিতর দিয়া বিকাশ পাইতে পাইতে জড়, জড়-বং জীব, উদ্ভিদ্, কীট, সরীসৃপ, পক্ষী ও পশুযোনি ভ্রমণ করিবার পর মানবাকৃতি মর্কটের পরবর্ত্তী বিকাশক্রম মানবত্বে পৌছিয়াছে।

(৪) বিজ্ঞান তৃতীয় মন্তব্য—ধ্রুব সত্য বলিয়া এক্ষণে মানিয়া লইতেছে কিন্তু মর্কট ও মানবের মধ্যবর্ত্তী শৃঙ্খল খুঁজিয়া পাইতেছিনা। মানবের উৎপত্তি-তত্ত্ববিদ্ ডারবিন সাহেব এই মতের পাণ্ডা (কেহ কেহ আজি কালি তাঁহার মতেরও ভ্রম আবিষ্কার করিতেছেন)।

মানবের দেহের গঠন ও আকৃতি, প্রকৃতি, সংস্কার, ভাষা প্রভৃতির সাম্য ও বৈষম্যই বৈজ্ঞানিকগণের মতবাদের প্রধান অবলম্বন। আবার প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ভূগর্ভ খনন করিয়া মানবের প্রাচীনত্বের প্রমাণ বাহির করিয়া দিতেছেন। কিন্তু, মানবের বংশবৃক্ষের বীজ ঠিক্ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছেনা। এই মূলসূত্র ধরিতে গিয়া ডারবিন্, ব্লুমেনবাক্, স্পেন্সার্ প্রমুখ বিজ্ঞান-বিশারদগণ পৃথিবীর কোথায় না অনুসন্ধান করিয়াছেন? এমন কি কেহ এ রহস্যের মর্ম্মভেদ-মানসে জীব-জন্তুর চর্ম্মচ্ছেদ করতঃ কঙ্কালের সাদৃশ্য, মর্কট-দেহও মনবাস্থির অপূর্ব্ব সমতা, এবং মানবীয় ধমনীতে মর্কট-শোণিতের প্রবাহ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়াছেন। ক্রমে ইহাও প্রকাশ পাইয়াছে যে আকাশে, পাতালে, জলে, স্থলে সর্ব্বত্রই জীবজগতে কেমন একটা ঐক্য আছে। নরের, বানরের, কুক্কুরের, বাদুড়ের, পাখীর, ঝিঁ ঝি পোকার, কূর্ম্মের, মণ্ডুকের, মীনের কঙ্কালগুলি সব এক ছাঁচে ঢালা। আবার কঙ্কালে যত সাদৃশ্য, ভ্রূণে তদপেক্ষা অধিক এবং অণ্ডাবস্থায় সম্পূর্ণ। বিজ্ঞানের কথায় "The future animal emerge from the gastrula stage and pass into the embryo

stage until an advanced period of which the embryos of vertebrates, whether fish, tortoise, dog, ape or man cannot be distinguished from one another, so close are the likenesses both in outward form and structure." এবং শুদ্ধ সাদৃশ্য বলিয়া নহে আয়তনেও, অণ্ডাকৃতি ভ্রূণ ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জীবেই সমান। যে হস্তী মুষিক অপেক্ষা ১৫০০০০ দেড়লক্ষ গুণ গুরু, তাহার গর্ভস্থ অণ্ড মুষিকের গর্ভস্থ অণ্ডের সমতুল্য। ভ্রূণস্থ অণ্ড হইতে জীবোৎপত্তি, আবার জাগতিক সমস্তই অণ্ডাকৃতি পরমাণুসম্ভূত। মূলে এই অণ্ডের সন্ধান পাইয়াই পুরাণকার কারণবারি গর্ভে হিরণ্ময় ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা করিয়া ছিলেন। এবং ডারবিন্ প্রমুখ পণ্ডিতগণ মর্কট ও মানবের মধ্যবর্ত্তী যে স্তরের সন্ধান পাইতেছেন না, পুরাণ বহু পূর্ব্বেই বামন অবতারের আবির্ভাব কল্পনা করিয়া সে শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। সৃষ্টিতালিকায় বানরের পর যে নরের পর্য্যায় তাহা ডারবিন্ সাহেবের বহুপূর্ব্বে পুরাণকার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যথা—

"স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকং।*
কূর্ম্মাশ্চ নবলক্ষঞ্চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ॥
ত্রিংশল্লক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃকর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে।
সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনি মতোঽভ্যগাৎ॥" বৃ বিষ্ণু পুঃ।

কিন্তু, যেমন "ধর্ম্মস্য তত্বং নিহিতং গুহায়াং" তদ্রূপ সৃষ্টিতত্ব গুহাগত এবং সৃষ্টা বাঙ্‌মনের অগোচর। এ বিষয়ে মানবের জ্ঞান যতই বাড়ে, রহস্য ততই জটিল হইয়া উঠে বৈজ্ঞানিক ঠিকই বলিয়াছেন " * * * the more we advance in knowledge, the more do the mystries of cosmic dynamics multiply * * *." শেষে স্মৃতি ও জ্ঞান যথায় হা'র মানে, কল্পনা তথায় ফুটিয়া উঠে। কল্পনার মত বিশ্বকর্ম্মা এমন স্বয়ম্ভূ আর কোথায়? জগতের সকল জাতির মধ্যেই তাহার নিদর্শন আছে। মানবজ্ঞানের উন্মেষ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কত মুনি কত মতই বাহির করিলেন, কেহ কেহ বা বিরাট্ পুরুষকে হস্তামলকবৎ দেখাইলেন, কিন্তু সত্যান্বেষী আর্য্যঋষি কথায় ভুলিবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহারা 'নেতি নেতি' বলিতে বলিতে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন—তাঁহারা সৃষ্টির মূল দর্শন করিবার জন্য ছয়টী দূরবীক্ষণ রচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিক্ (Standpoint) হইতে দেখিলেন—এবং সারসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ধন্য হইলেন। এমন করিয়া দর্শন করিতে জগতের আর কোন্ জাতি পারিয়াছে? তাই এই ষড়দর্শনবিশিষ্ট জাতিরই Eureka ("প্রাপ্তোস্মি") সর্ব্বপ্রথম জগতে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহারাই পুরাণ, দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রয়াগসঙ্গমে আসিয়া পাইয়াছিলেন—"তত্বমসি", যাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির চক্ষে দেখিয়া আপনাকে হারাইয়া মূলাধারকে খুঁজিয়া পাইলেন, তাঁহারাই বলিতে সাহস করিলেন "সোঽহম্"।

---

* সংখ্যাগুলি জাতিজ্ঞাপক।

তাঁহারা জীবন্মুক্ত হইলেন; কিন্তু যাঁহারা শুকের ন্যায় কর্ণে শুনিয়া পাখীরই মত পড়িয়া 'তত্ত্বমসি'র তত্ত্ব না জানিয়াও 'সোঽহম্' বলিয়া জীবন্মুক্তি কামনা করিলেন, তাঁহাদের মুক্তি আর হইল না—তাঁহাদের সংস্কারের ঘোর কাটিল না—তাঁহাদের শত তর্ক, শত শাস্ত্রপাঠ, সহস্র ধর্ম্মানুষ্ঠান—তাঁহাদের শত উপদেশের আদান-প্রদান কোন কাজেরই হইল না—তাঁহাদের হৃদয়ের মলিনতা জ্ঞানের আগুণেও পুড়িল না, প্রেমের বারিতেও মুছিল না—তাঁহারা "যে তিমিরে সে তিমিরেই" পড়িয়া রহিলেন! জগতে তাহাই হইতেছে। যাহার দৃষ্টি খুলে, সেই জীবন্মুক্ত হয়—দেশ, কাল, বর্ণ ও ধর্ম্মের বাঁধ এখানে ভাসিয়া যায়।

হিন্দুর ন্যায় ষট্‌চক্ষু যাঁহাদের নাই, তাঁহারা ঠিক্ এমন স্পষ্টভাবে না দেখিলেও এবং স্পষ্টবাক্য 'তত্ত্বমসি' বা 'সোঽহম্' বলিতে না পারিলেও তাঁহারা সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে ভেদ খুঁজিয়া পান নাই। পুরাণকার জীবের ব্রহ্মাণ্ড হইতে উদ্ভব হওয়াবধি বিবিধ যোনি-ভ্রমণ করত পুনরায় ব্রহ্মযোনি প্রাপ্তির যেমন সংবাদ দিয়াছেন, ত্রয়োদশ শতাব্দীর মহম্মদীয় কবি জালাল-উদ্দীন তাঁহার মস্‌নবির চতুর্থ সর্গে তদ্রূপ বলিয়াছেন "প্রথম মানব অচেতন বা জড়াকারে দেখা দিয়াছিল; সে জড়ত্ব ঘুচিলে তাহার উদ্ভিদ্ যোনি প্রাপ্তি হয়। কত যুগ যে সে উদ্ভিদ্ জগতে ছিল, কে জানে? কিন্তু তাহার জড়াবস্থার কিছুই মনে ছিল না। উদ্ভিদ্‌জন্ম পরিহার করিয়া সে যখন জীবত্বে পৌঁছিল, তখন তাহার পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ রহিল না। সে যে নিজেই একদিন উদ্ভিদ হয়ে ধরার কোলে শোভা পাইয়াছিল তাহা মনেও করিতে পারিল না। তবু স্বভাবতঃই তাহার গাছপালার প্রতি কেমন একটা টান ছিল। বিশেষতঃ যখন বসন্তে ফলপুষ্পে পত্রপল্লবে সৌন্দর্য্য-সৌরভে দিক দিক আকুল করিয়া তুলিত, তখন মায়ের বুকে শিশু যেমন কি এক অজ্ঞাত টানে লেগে থাকে, তাহাকেও কি এক আকর্ষণে সেই শ্যামা-য়মান প্রকৃতির বুকে অজ্ঞাতসারে টানিত। কতযুগ ধরিয়া সে তির্য্যগযোনি ভ্রমণ করিয়াছিল তাহার ঠিক নাই, শেষে সৃষ্টি তাহাকে পশুত্বের ভিতর হইতে বাহির করিয়া মানুষের আকার দিলেন। এইরূপে মানুষ এক যোনি হইতে অন্যযোনি ভ্রমণ করিতে করিতে বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জনমের কথা তাহার স্মরণ হয় না। মানুষ এখন যাহা আছে পরজন্মে তাহাও থাকিবে না।" মানুষের পূর্ব্বজন্ম যেমন স্বপ্নবৎ মিথ্যা মনে হয়—ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্ম ব্যতীত আর সবই তাই মনে হয়, যদ একবার দৃষ্টি খুলিয়া যায়। পুরাণকার তাই বলিয়াছেন "ব্রহ্মাণ্ডের—আর সবই কৃত্রিম—সমস্তই বিনষ্ট হইবে। এই বিশ্বসমূহ জলবুদ্বুদের ন্যায় অনিত্য। ব্রহ্মই নিত্য ও অকৃত্রিম।" জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসী শিবকল্প শঙ্করাচার্য্য তাই বলিয়াগিয়াছেন "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।" ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণকুমার সুমতি পিতা মহামতিকে এই কথাই বিস্তারিতভাবে বলিয়াছিলেন। (মার্কঃ পু ১০ অ। ১৪-২৫)

ইঁহাদেরই প্রতিধ্বনি উনবিংশশতাব্দীর পাশ্চাত্য মহাপণ্ডিত• রুশ্কিনের মুখে শুনা গিয়াছে। কবির ভাষায় তাঁহার উক্তি এই যে, "জগতের যেখানে যাহাকিছু সত্তা—অর্থাৎ অস্তিত্ববিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হইতেছে, সেই জগন্ময় শক্তিই তাহার পশ্চাদ্ভাগে পরমসত্তারূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত যেন সেই মহাশক্তি জড়জগতে মহানিদ্রায় অভিভূত,—জড় হইতে ঈষদুন্নত উদ্ভিদ্ জগতে অল্প জাগরিত,—জীবজগতে কামনা স্ফুরণে ক্রিয়ান্বিত,—এবং জীবজন্তুর উপরিস্থিত আশান্বিত ও উৎসাহফুল্ল মানব জগতে চৈতন্যস্ফূর্ত্তিতে চিন্তারত।" (মা-না মহাশক্তি)। কি পৌরাণিকঋষি, কি মধ্যযুগের মুসলমানকবি, কিবা আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সকলযুগেই সেই এক কথা,—

"ত্বয়া এতং বিশ্বমনন্তমূর্ত্তি
পৃথগ্ ন তে কিঞ্চিদিহাস্তিদেব।
ভবান্ চান্য ব্যতিরিক্ত মূর্ত্তিঃ" (বরাহ পুঃ ৯৩০।)

এবং সকলেরই দৃষ্টিতে সেই একই দৃশ্য; কেবল মানবমহামণ্ডলী নিদ্রিত। কতদিনে যে মানবের চিদাকাশে সত্য সত্যই জ্ঞানসূর্য্য উদিত হইয়া মধ্যাহ্ন-কিরণ বিকিরণ করত সংকীর্ণতা ও ভিন্নতার তিমিরনাশ করিবে এবং উদার হৃদয়-পটে সচ্চিদানন্দের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেখাইয়া দিবে—মানুষ মানুষ হইতে ভিন্ন নহে, মানুষ মূলাধার হইতে ভিন্ন নহে, সৃষ্টি স্রষ্টা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে,—এখন তাহারই অপেক্ষা। সেই দিন, সেই মহাদিন মানবের জীবন্মুক্তির সুখবাসর,—"The day of days, the great day of the feast of life is that in which the inward eye opens to the unity of things" (Emerson.)—কিন্তু হায়! স্বার্থান্ধ অহংকৃত মানবের সে চক্ষু খুলিবে কি?

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

কৃষকের স্বপ্ন।

নগরের উপকণ্ঠে ক্ষুদ্র পল্লীক্রোড়ে
সুবুদ্ধি করিত বাস দরিদ্র কুটীরে।
তাহার দুয়ারে কভু অর্থী মধুকর
না করিত গুঞ্জরণ প্রার্থনামুখর।
সেই ক্ষুদ্র নীড়ে তার অন্দর বাহির
ছিলনা প্রভেদ। কাজ করিত দ্বারীর
ঊর্দ্ধকর্ণ সারমেয়, বেতন-গ্রহণ
করে চিত্ত কলুষিত; অন্ন আচ্ছাদন
তাই শুধু লভ্য তার। ক্ষুদ্র পরিবার,
জননী, রমণী দুই, পুত্র দুই আর,
ফুটেছে স্নেহের ফুল দুহিতা মালতি,
বরিষার কালে যেন ফুল্ল। স্রোতস্বতী।
বাল্যকালে শিক্ষকের সস্নেহ তাড়ন
ঘটে নাই সুবুদ্ধির অদৃষ্টে কখন।
জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় মুগধ নয়ন
হয় নাই উন্মীলিত, আপন, আপন,
আমার, আমার এই পুত্র পরিবার
বাজিত নিয়ত ধ্বনি হৃদয়ে তাহার।
সযতনে লাঙ্গলাগ্রে আলোড়ন করে
তুলিতেন শস্যসুধা বসুধা-সাগরে।

পুত্রবর বশ্য, শিষ্ট, যুবক সুন্দর
পিতার সাহায্যে ছিল সদা অগ্রসর।
চিরদিন কার কভু সমান না যায়,
প্রভাতের ফোটা ফুল মধ্যাহ্নে শুকায়।
প্রতিদিন যথা যায় সুবুদ্ধি তেমন
প্রভাতে লাঙ্গল লয়ে করিল গমন
কর্ষিতে অকৃষ্ট ক্ষেত্র; সাহায্যের তরে
আসিল দ্বিতীয় পুত্র প্রহর অন্তরে।
দীপ্তিহীন মুখকান্তি ভাবনা-মণ্ডিত,
হৃতকান্তি শতদল মিহির-মথিত।
সুবুদ্ধি জিজ্ঞাসে তারে কেন এতক্ষণ
বিলম্ব করিল ক্ষেত্রে বরিতে গমন।
"না জানি দাদার বাবা, হয়েছে কেমন
বারে বারে করিছেন ভেদ ও বমন।
শরীর দুর্ব্বল অতি, কণ্ঠে নাহি সরে
কথা, তবু কত ক'য়ে মোরে বারে বারে
পাঠালেন বাবা, তব সাহায্য-কারণ।
মায়ের কথায় গিয়ে বৈদ্য একজন
এনে দেখায়েছি তায়। আশা নাই বলে
ঔষধ না দিয়ে বৈদ্য গিয়াছেন চ'লে।
মায়েরে বলিনি কিছু। কাজ নাই আর
চল ঘরে, 'দাদা' ডাক ফুরাল আমার।"
উভয়ে আসিয়া দেখে নিভেছে জীবন।
স্নেহময়ী জননীর আকুল রোদন
উঠিয়াছে উচ্চে; ভগ্নী বালিকা মালতি
দূর হ'তে হেরি পথে পিতার মূরতি
পাগলিনী মত বালা দৌড়িয়া আসিল
যজ্ঞ উপবীত যেন কণ্ঠেতে দুলিল।
"বাবাগো, বাবাগো, তুমি দেখ একবার
হাসি টুকু কে নিয়েছে দাদার আমার!
কত ডাকি তবু দাদা কয়না গো কথা
এত ভালবাসা বাবা; সব ভবে বৃথা!
চক্ষু মেলি কতবার কহিনু চাহিতে
নারিনু আমরা বাবা এ ঘুম ভাঙ্গিতে।"
"মালতি গো" রাখি হল শ্রীর স্কন্ধ হ'তে
কহিলেন তনয়ারে অতি সুস্থ চিত্তে।
"ভাঙ্গিবেনা আর মাগো! এ ঘুম উহার;
আবিল স্বপন ঘোর ফুরাল এবার।"
তনয়ারে এ কয়টী কথা মাত্র বলি
সুবুদ্ধি আপন কাজে পুনঃ গেলা চলি।
অল্প অবশিষ্ট টুকু সম্পাদন করি
আসিলেন অপরাহ্নে স্বগৃহেতে ফিরি॥
শুক্রনেত্রে গ্রামবাসী সকলে ডাকিয়া
চলিলা পুত্রের দেহ শ্মশানে লইয়া।
মিশিছে পুত্রের দেহ শ্মশানভস্মেতে
অপলক নেত্রে পিতা লাগিলা দেখিতে।
একটী শোকের শ্বাস হতাশ আক্ষেপ—
একবিন্দু অশ্রু নাহি করিলা নিক্ষেপ।
তনয়ে শ্মশানে রাখি আসিলেন ঘরে
যবে, জিজ্ঞাসিলা পত্নী চরণেতে ধ'রে,
"বল নাথ, কোন্ প্রাণে হেন পুত্রধনে
দিয়ে ডালি চিরদিন তরে—দুনয়নে
না পড়িল একবিন্দু তব অশ্রুজল,
পুরুষহৃদয় কিগো, প্রস্তর কেবল?"
কহিলা সুবুদ্ধি "শোন বুদ্ধিহীনা তুমি
তাই করিছ রোদন এই কার্য্যভূমি
চিরদিন রঙ্গস্থল নহেত কাহার;
কোন্ অঙ্কে যবনিকা—নাহিক তাহার
নিশ্চয়তা। গত নিশি হেরেছি স্বপন,—
হইয়াছি রাজ্যেশ্বর, অগণিত ধন
কোষ পরিপূর্ণ মম, দাস দাসী কত,
হয় হস্তী মম সেবা করে অবিরত।
সপ্ত পুত্র হ'ল মম কন্দর্পসুন্দর
রাণী প্রেমনির্ঝরিণী; সুখের সাগর

বেদনাহীন ছিল মম ; গৃহ সপ্তভৌম
রত্নালোকে আলোকিত সদা ছিল মম
প্রভাতে নয়ন মেলি জাগিনু যখন
ফুরাল স্বপন, রাণী, রাজ্য, পুত্র, ধন।
হারায়েছি সপ্তপুত্র নিশার স্বপনে
হারানু একটী মাত্র আজি জাগরণে।
সকলি স্বপন প্রিয়ে, সকলি স্বপন,—
ভাঙ্গিলে স্বপন বল কে করে রোদন।

শ্রীসুদর্শন চক্রবর্ত্তী

ধর্ম্মপ্রাণ ইন্দ্রনাথ।

বঙ্গবাসীর গৌরবস্থল রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের অন্যতম আদর্শপুরুষ ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনকল্পে অক্লান্তকর্ম্মা শ্রমশীল সুরসিক সাহিত্যরথী ইন্দ্রনাথ মরধাম ত্যাগ করিয়া কর্ম্মাতীত লোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। হিন্দু-সমাজ দুঃখ, ক্ষোভ ও মর্ম্মবেদনায় কাতর, শোকে অধীর হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হিন্দুর শোকের অবকাশ কোথায় ?

মহাকালের ক্রীড়ানৃত্যরঙ্গে সেই বিশ্ব-বিলোড়নকারী তাণ্ডবতাড়নে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকাকণা হইতে 'মহতোঽপিমহান্' অচল হিমগিরি পর্য্যন্ত প্রতিনিমেষে প্রকম্পিত হইতেছে। পলে পলে পরিণামধারা পরিবর্ত্তন স্রোত সকল সামগ্রীকেই ন্যূনাধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত—পরিচালিত করিতেছে। সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিলেই ইহার যথার্থতা উপলব্ধি করা যায়। স্বল্প পরিবর্ত্তন সকলসময়ে আমরা গ্রাহ্য করি না, তাই প্রবল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইলে সহসা বিষাদে—বিস্ময়ভয়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি। নিপুণ-নেত্রে অবলোকন করিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হয় যে—যাহাকে আমরা প্রবলপরিবর্ত্তন মনে করি তাহা বহুদিনের বহুতর ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তন কণিকার সঙ্কলিতসমাবেশ ছাড়া অপর কিছুই নয় তত্ত্বদর্শীর দৃষ্টিতে তাই দেহত্যাগের মত ভীষণ পরিবর্ত্তনও জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ অপেক্ষা অধিকতর বিষাদজনক, বিস্ময়প্রদ বা শঙ্কাশঙ্কুল নহে। শ্রীভগবান্ শ্রীগীতাশাস্ত্রে পাঞ্চজন্যরবে ঘোষণা করিয়াছেন—বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি, তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী। অকর্ম্মণ্যবসন ফেলিয়া দিয়া নূতন বসন গ্রহণ করা যেমন, মরণও তদ্রূপ।

গীতাকারের ঘোষণা ও তত্ত্বদর্শীর গবেষণা বিজ্ঞবিচক্ষণের নিকট আদরণীয় হইবে, কিন্তু অজ্ঞদের কাছে 'মরণ' শোকের কারণ বলিয়া বিবেচিত হওয়াই অপরিহার্য্য! বিশ্বাসী হিন্দু মরণে ভীত হন না। এরূপ ভীষণ শোকে ও ইন্দ্রনাথের অন্তঃপুরে, শুনিতেছি—শোকাশ্রুর প্রবল প্লাবন বা রোদনধ্বনির মুখররবের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে না। সেস্থান অবাত অক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় ধীর গম্ভীরভাবে বিরাজ করিয়া হিন্দু শিক্ষার মহত্ত্বগৌরব ঘোষণা করিতেছে। ইন্দ্রনাথের মরণে শোকের কথা না থাকিতে পারে, কিন্তু ইন্দ্রনাথের জীবনে শিখিবার অনেক ছিল।

ইন্দ্রনাথ একাধারে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও প্রেমিক ছিলেন, ইন্দ্রনাথের জীবন—সে একটা কর্ম্মের যন্ত্রাগার। সে কর্ম্মালয়ে অদ্ভুতার আদর্শ

ছিল না, আর্যজ্ঞানের সম্মান ছিল। ইন্দ্রনাথ বর্ত্তমান জগতের নবোদিত জ্ঞানারুণের সেবায় পরাঙ্মুখ ছিলেন না, কিন্তু ঋষিজ্ঞানচন্দ্রমার বিমল জ্যোৎস্নাকই তাপহারিণী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। শুধু কথায় নয়—কর্ম্মজীবনে চিরদিনই তাহার পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত বা পশ্চাৎপদ হন নাই। ইন্দ্রনাথের গৃহে স্মার্ত্তযুগের আদর্শ গৃহীত হইয়াছিল, সেই ভাবেই পরস্ত্রীকুল বালকবর্গও এমন কি ভৃত্যগণ পর্য্যন্তও পরিচালিত হইতেছিল। প্রাচীন আচার ব্যবহার শিক্ষাদীক্ষার প্রতি রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ শ্রদ্ধাসম্পন্ন—পুরাতনের পবিত্রস্মৃতি অনেকেরই নিকট আদৃত হয়, কিন্তু পুরাতনের পুনরভিনয় সমাজের সকলের নিকট পূজা পায় না, কারণ তাহা হইলে বহুস্থলেই প্রাচীন প্রথার গুণকীর্ত্তনে কার্য্য সমাপ্ত হইত না, অনুষ্ঠানের দর্শন পাওয়া যাইত। ইন্দ্রনাথ এ শ্রেণীর হিন্দু ছিলেন না। তিনি যাহা শাস্ত্রসঙ্গত বুঝিতেন স্মার্ত্তযুগের সংহিতকারগণের আদেশপালন বর্ত্তমানকালে যতদূর সম্ভব মনে করিতেন, তাহার অনুষ্ঠান না করিয়া ছাড়িতেন না। তাহার গৃহে পূজার উপকরণগুলি যেরূপভাবে সজ্জিত ও রক্ষিত হইত, বস্তুতই অন্যত্র প্রায় সেরূপ দেখা যাইত না। ইন্দ্রনাথের ভবনে অদ্যাপি "চকমকী" চলিতেছে, আতসিপ্রস্তর আদর পাইতেছে। ইন্দ্রনাথই রক্ষণশীলদলের পতাকা ধারণের যোগ্য অধিকারী।

ইন্দ্রনাথ নানাবিদ্যা বিশারদ ছিলেন, কিন্তু ইংরেজী বা ফরাসী ভাষায় পণ্ডিত্য লাভ করিয়া এবং তত্তদ্ভাষায় দর্শনাদি শাস্ত্রসুচারুরূপে অধ্যয়ন করিয়াও তাঁহার দেবভাষা সংস্কৃতের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইয়াছিল বই হ্রাস হইয়াছিল না। ইন্দ্রনাথের সংস্কৃত বিদ্যা স্কুল-কলেজের ব্যাকরণবর্জ্জিত ভাষা শিক্ষা অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্র প্রকারের ছিল। বর্ত্তমান কালের ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃতালোচনা করেন তাহারা অনেকেই সংস্কৃতে ব্যাকরণ ঘটিত ভুল করিয়া থাকেন, (অবশ্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণও ভ্রমের বাহিরে নহেন) কিন্তু ইন্দ্রনাথের সহিত যতদিন শাস্ত্রালাপ করা গিয়াছে, কোনও সময় তাঁহার উচ্চারিত সংস্কৃত বাক্যে ব্যাকরণ ভ্রমের সন্ধান পাই নাই। ইন্দ্রনাথ বেদ ও বেদাঙ্গ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া ছিলেন, কিন্তু তিনি স্মৃতি শাস্ত্রের প্রতি অধিক অনুরক্ত ছিলেন। এক দিন বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখককে ইন্দ্রনাথ বলিয়া ছিলেন—"বেদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কিছু কম, আমরা বেদ খুজিয়া পাইব না বা বুঝিতে পারিব না বলিয়াই কৃপা পরায়ণ ঋষিগণ পুরাণ ইতিহাস ও স্মৃতি শাস্ত্র রাখিয়া গিয়াছেন। এদেশে বেদের 'চাষ' হওয়ার দিন আর নাই। ঐ যে কয়েক খণ্ড পুস্তক 'বেদ' নামে বাজারে বিক্রীত হইতেছে, উহা বেদের কত ভাগের ভাগ তাহা জানেন ত?" ইন্দ্রনাথের সংস্কৃতানুরাগের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'অভয়া চতুষ্পাঠী'তে শাস্ত্র শিক্ষার সঙ্গে সদাচার শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। ইন্দ্রনাথ বলিতেন "আমাদের ধর্ম্মে ত্রিবেণী-সঙ্গম চাই, এক সংস্কার বেণী, দুই আচার বেণী, তিন বিশ্বাসবেণী, তিনটী থাকিলেই হিন্দু, অন্যথায় নয়। শুধু বিশ্বাসী হইলে চলিবে না যথাবিধি সংস্কৃত ও আচারপুত

হইতে হইবে, নচেৎ কেবল সদ্‌বিশ্বাসের বলে হয়ত "ধার্ম্মিক" হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু 'হিন্দু' হওয়া যায় না। সাধারণতঃ লোকে নীতিমান্ অর্থাৎ 'ভাল মানুষ' হইলেই তাহাকে 'ধার্ম্মিক' বলে, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের ভাষায় ধার্ম্মিক অর্থ ঐ ত্রিবেণীসঙ্গমস্নাত।'

ইন্দ্রনাথ সংস্কৃতবিদ্যার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত ছিলেন, সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপকবর্গের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ততোধিক ছিল। ইন্দ্রনাথের "ইন্দ্রালয়ে" যাইয়া কোনও অধ্যাপক অসন্তুষ্ট হইয়া আসেন নাই। সাক্ষাৎপ্রার্থী যোগ্য অধ্যাপকের আদর—আপ্যায়নে এবং অর্থদানে তিনি কখনও পরাঙ্মুখ ছিলেন না। একদা ইন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র এক যুবক অধ্যাপককে প্রণাম করেন; প্রণত ব্যক্তি প্রণামকারী অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ বিধায় এই ঘটনায় কিছু সঙ্কোচ বোধ করেন! ইন্দ্রনাথ যুবক অধ্যাপকটিকে বলেন "আপনারা সমাজের প্রণাম পাইতে পারেন, কারণ আপনারাই ঋষিগণের প্রতিনিধিরূপে সমাজের উর্দ্ধস্রোত রক্ষা করিতেছেন, আর আমরা অধঃস্রোতের গণ্ডী বাড়াইতেছি, তবে কেহ কদাচিৎ স্রোতের সমতা রক্ষা করিতেছি মাত্র।" ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে তিনি স্বতন্ত্র-নেত্রে দর্শন করিতেন, সমাজে অধিক লোকে সেরূপ দৃষ্টিতে দেখেন না। এককালে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার যুবক ধর্ম্মোপদেষ্টা সভার রবিবাসরীয় অধিবেশনে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে ছিলেন; ব্যাখ্যার অবসানে সমাগত সভ্যগণের মধ্যে ২।১ জন প্রশ্নজিজ্ঞাসু হন। ধর্ম্মোপদেষ্টা শাস্ত্রানুসারে সদুত্তর প্রদান করেন। জিজ্ঞাসু বৃদ্ধ, এবং যুবক। জিজ্ঞাসু যেন তুপ্ত হইলেন না! সভায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন; তিনি জিজ্ঞাসুকে বলিলেন—"উপদেষ্টার উত্তর শাস্ত্র-সঙ্গত, বোধ হয় সংক্ষেপে বলায় আপনার বুঝিতে কষ্ট হইতেছে, আমি উপদেষ্টার কথার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছি—" এই বলিয়া তিনি উপদেষ্টার মন্তব্য বিবৃত করিলেন। তখন জিজ্ঞাসু বলিলেন—"আপনাদের মত লোকের মুখে শুনিলেই আমরা নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারি। প্রবীণের উপদেশে যেরূপ বিশ্বাস করা যায়, নবীনের উপদেশে সেরূপ নির্ভর করা যায় না।" ইন্দ্রনাথ বাধা দিয়া উত্তর দিলেন—ব্রাহ্মণসভায় প্রবীণতার প্রসঙ্গ শোভা পায় না, এখানে জ্ঞানের প্রাধান্য, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বালক হইলেও এখানে বৃদ্ধ, উপনিষদে পড়িয়াছি—যাজ্ঞবল্ক্য জ্ঞানবলেই জনকের গোধন-পুরস্কার গ্রহণ করেন এবং সমাদর প্রাপ্ত হন, বৃদ্ধ ঋষিরা ত পাইয়া ছিলেন না! দেখিতে হইবে উপদেষ্টার শাস্ত্রজ্ঞান কিরূপ! বয়স বিচার করার দরকার নাই।" সভাভঙ্গের পর উপদেষ্টা গোপনে ইন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেন—'আপনি কি আমাকে শাস্ত্রে অভ্রান্ত মনে করেন না কি?' ইন্দ্রনাথ উত্তর দেন "না, আপনাকে কেন, কোনও অধ্যাপককে অভ্রান্ত ভাবিনা, অভ্রান্ত মনে করি ঋষিদের, তবে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা হিন্দুর কথা, হিন্দু ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু বলিতে পারেনা।"

বঙ্গের প্রাচীন জ্ঞানকেন্দ্র—যেখানে গঙ্গা-স্রোতের সহিত সারস্বতস্রোতের মিলন হইয়াছে, ইন্দ্রনাথ সেই নবদ্বীপের গৌরবরক্ষাকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া ছিলেন।

নবদ্বীপকে আবার বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সারস্বততীর্থ-রূপে দেখিতে তাঁহার আশা ছিল। নবদ্বীপ-সমাজসংগঠন ও নবদ্বীপ সমাজ পরীক্ষা-প্রবর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্য তাঁহার নিজেরই। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের দুরবস্থার প্রতীকারকল্পে তাঁহার উদ্যোগ আয়োজন তীব্রতা লাভ করিয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণরক্ষার জন্য রাঢ়ের পল্লীতে পল্লীতে ধান্যভিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। নানা রূপে অর্থ সংগ্রহ করিতে ছিলেন; স্বয়ং টাকা দিবার জন্যও কৃতসংকল্প হইয়া কার্য্যারম্ভ করিয়া ছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-বর্গের দুরদৃষ্টের বশে ইন্দ্রনাথের পরলোক-প্রয়াণের ফলে সে প্রকাণ্ডকাণ্ডবহুল রক্ষা-বৃক্ষ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল!

ইন্দ্রনাথকে দেশহিতৈষিবর্গের মধ্য হইতেও বাদ দেওয়া যায় না। ইন্দ্রনাথ দেশকে তীর্থক্ষেত্র বা পুণ্যভূমি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। রাজনীতির আলোচনায় তাঁহার অভিজ্ঞতা অল্প ছিল না, কিন্তু তিনি কংগ্রেসের রাজ-নীতিক আন্দোলনের সফলতায় সন্দিহান ছিলেন। ইন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিতেন "আমাদের সকল নীতিই ধর্ম্মনীতির মধ্যে পড়িয়া যায়। ধর্ম্ম ছাড়া রাজনীতি—হিন্দুর হিতকরী হইতে পারে না। উহাতে হিন্দুর হিন্দুত্ব নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কংগ্রেস কিছু কাজ করিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা হিন্দুর "কনষ্টিটিউশন্" বুঝেন, তাঁহারা কংগ্রেসের কাছে বেশী সুফলের আশা করিতে পারেন না, বরঞ্চ উপকারের বদলে অপকারই বেশী দেখিবেন।" তাহির-পুরের রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরের কলিকাতাস্থ ভবনে একদা রাজা বাহাদুর, ইন্দ্রনাথ এবং অন্য কতিপয় ব্যক্তি সমাজরক্ষার উপায় উদ্ভাবনার্থে সমবেত হন। উক্ত স্থানে স্বদেশ-সেবার প্রসঙ্গক্রমে ইন্দ্রনাথ বলেন—"হিউম্‌সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার দেশের মঙ্গলার্থে আমরা কংগ্রেসে যোগদান করি, কিন্তু আপনি ইহাতে উদাসীন কেন? আমি উত্তর দেই—আপ-নাদের ধন্যবাদ দেই, কিন্তু আমি কংগ্রেসের দ্বারা মঙ্গল হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি না। আমি আমার দেশ ও জাতির মঙ্গলার্থে সকলকে ধর্ম্মের পতাকানিম্নে আশ্রয় লইতে বলি; ধর্ম্ম ছাড়িয়া হিন্দুদের রাজনীতি হইতে পারে না, ইহা আপনার বুঝিতে বোধ হয় বিলম্ব হইবে না। হিউম্ বলেন আপনার পথে আপনি যান, আমাদের পথে আমরা যাই; আপনার সদুদ্দেশ্য—দেশভক্তিতে আমার সন্দেহ নাই, কিন্তু আপনার সফলতায় আমি সন্দেহ করি। আমি বলি আপনার বাক্য আমার পক্ষেরও প্রত্যুত্তর। ভগবান্ জানেন কোন্ পথে কৃতকার্য্যতা!"

ইন্দ্রনাথ স্বদেশীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির পক্ষপাতী ছিলেন; তবে তাঁহার বিশেষত্ব এই—তিনি সকল জিনিষকেই ধর্ম্মের ভিত্তির উপর দাঁড় করাইবার ইচ্ছা করিতেন। তিনি বলিতেন "স্বদেশী নয়, ওটা স্বধর্ম্ম।" এক সময়ে ইন্দ্রনাথের গঙ্গাটিকুরীস্থ প্রাসাদে বর্ত্তমান-প্রবন্ধলেখকের সহিত কথাপ্রসঙ্গে ইন্দ্রনাথ স্বদেশী সমস্যার অবতারণা করেন এবং বলেন "আপনি শুনিয়াছি বিদেশী লবণ, চিনি ও বস্ত্রাদি ব্যবহার করেন না, কেন বলুন ত?" প্রত্যুত্তরে বলা হয় "শুনিয়াছি ঐ সকল পদার্থে হিন্দুর অখাদ্য অস্পৃশ্য পদার্থের সমাবেশ আছে, তাই ব্যবহার করি না এবং লোককেও

বলি, যদি তোমরা ধর্ম্মাচার মান, উহা ব্যবহার করিবে না।” ইন্দ্রনাথ বলেন “এবিষয়ে আপনার সহিত আমার মিল আছে। পবিত্র ও হিতকর দ্রব্য অন্য দেশে জন্মিয়াছে এই অপরাধে আমার বাড়ী স্থান পাইবেন না, অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্ণ ক্রয় করিব না, এরূপ জিদ্ সঙ্গত নয়. ধর্ম্মশাস্ত্রেও বোধ হয় ওরূপ কথা নাই। এই যে শুনিতেছি, স্বদেশ সেবকেরা দশজনের উপকার করিতেছে, আমি মনে করি, উহারা স্বদেশসেবক নয়, স্বধর্ম্মসেবক, ধর্ম্ম ছাড়া ‘স্বদেশ’ হিন্দুর কাছে পরিচিত নয়।” ইন্দ্রনাথ বহু সৎকর্ম্মের সাধক ছিলেন।

শিষ্টাচারে, সামাজিকতায়, অমায়িক ব্যবহারে ইন্দ্রনাথ অদ্বিতীয় ছিলেন। শ্লেষবর্ষণে তাঁহার লেখনী নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ ছিল না, কিন্তু সাক্ষাতে তিনি কখনও কাহারও সহিত অসদ্ব্যবহার করিতেন না। এক দিন এক ব্যক্তি ইন্দ্রনাথকে বলেন, “মহাশয়! লোককে ঘৃণাকরা ও লোকের নিন্দা প্রচার করা আপনার বিবেচনায় সৎকর্ম্ম বোধ হয়?” ইন্দ্রনাথ উত্তর দেন “লোকের দোষ দেখাইয়া দিয়া আমি তাহাকে ‘ভাল’ করিতে চাই। বলাবাহুল্য বহু ব্যক্তির জীবনের কলুষিতগতির পরিবর্ত্তনসাধন করিতে পারিয়াছি, কসিডির তীব্রশ্লেষের ফলাফল জানেন ত! যাহার দোষ দেখিলে দুঃখ হয়, যে ভাল হইলে সুখী হই, তাহার দোষ দেখাইয়া দেওয়া এবং তাহাকে অকঠোর তিরস্কার করা—বোধ হয় ‘ঘৃণা’ বা ‘নিন্দাপ্রচার’ হইতে একটু ভিন্ন। আপনারা যাহাই মনে করুন, আমি জানি পাপ হইতে করা আর অপরকে ঘৃণা করা স্বতন্ত্র বস্তু।” ইন্দ্রনাথ বস্তুতই বহু পথভ্রষ্টব্যক্তিকে সৎপথে আনিয়া গিয়াছেন, আর অনেককে কুকর্ম্মের পঙ্কিল স্রোত হইতে উদ্ধার করিয়া স্নেহভরে বিমল জল দিয়া সর্ব্বাঙ্গের ক্লেদকর্দ্দম ধোয়াইয়া দিয়া গিয়াছেন, ইহা অতিরঞ্জিত নয়—সত্য কথা। ইন্দ্রনাথের জনৈক কর্ম্মচারী এক অভ্যাগত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘মহাশয়ের কি খাওয়া অভ্যাস আছে? জানিলে আপনার জন্য তদনুরূপ আয়োজন করিতে পারি।” ইন্দ্রনাথ কর্ম্মচারীকে মৃদু তিরস্কার করিয়া বলেন, “ওরূপ জিজ্ঞাসা সঙ্গত হয় নাই, অভ্যাগত ব্যক্তি তোমার নিকট তাহার অভ্যস্ত খাদ্যের নাম করিতে অসম্মত হইতে পারেন, জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল—মহাশয়! কি আহার করিতে ইচ্ছা করেন?” এই ভাষার মারপেঁচের মধ্যে শিষ্টাচারের কি বিরাট্ ব্যবধান বিরাজ করে, তাহা ইন্দ্রনাথের ন্যায় শিষ্টেরাই বুঝিতে পারেন।

ইন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে যে সব রত্ন দিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলে সমানভাবে দর্শন করেন না বটে, কিন্তু তাঁহার লেখনীর শক্তি দেখিয়া তাঁহার শত্রুবর্গও বিস্মিত ও ভক্তিনত না হইয়া পারেন না। তাঁহার “পঞ্চানন্দ” ব্যঙ্গচিত্র বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে কহিণুর। ইন্দ্রনাথ শ্লেষসম্রাট্ ও রসসাগর ছিলেন। তাঁহার “ভারত উদ্ধার” পাঠকরিলে মনে হয়, এই শ্লেষকবি কেবলমাত্র এই গ্রন্থখানি লিখিয়া লেখনী সম্বরণ করিলেও বঙ্গভারতী চিরদিন তাঁহার জয় ঘোষণা করিতেন। ইন্দ্রনাথের ইংরেজী পঞ্চানন্দ পড়িয়া, ইংরেজী-লিপিপটুতায় বিমুগ্ধ হইয়া,

বহু বিদ্বান্ ইংরেজও ইন্দ্রনাথকে মার্কিনরসিক মার্কটোয়েনের সমকক্ষ বলিয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথের 'কল্পতরু'র সমালোচনায় সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইন্দ্রনাথ প্রকৃতই শক্তিশালী লেখক ও প্রকৃত রসিক। ইন্দ্রনাথ ধর্ম্মক্ষেত্রে যেমন বিশেষত্বযুক্ত সাহিত্যক্ষেত্রেও তেমনি, সমাজ বিশ্লেষণে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও নৈপুণ্যের পরিচয় যেরূপ পরিস্ফুট, তাহা বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়। রসরচনা ছাড়া তাঁহার আরও বহুচিন্তাপূর্ণ রচনা সংবাদপত্র ও সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কতকগুলিতে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইত, আবার কতক-গুলিতে তাহা দেখা যাইত না, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার বিশেষত্বটুকু বুঝিতেন, তাঁহারাই ঐ সকল রচনার মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিতেন। তাঁহার বহু ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মন্তব্য—দেশের উপর—সমাজের উপর দৈববাণীর ন্যায় ভবিষ্যদ্‌ঘোষণা করিয়াছে; বহুস্থলেই পরে তাহার সার্থকতা বুঝা গিয়াছে। ইন্দ্রবাবুর শ্লেষ বা মন্তব্য সহজেই বুঝা যাইত না; কারণ তাহা বহু চিন্তার পরিণাম! ইন্দ্রনাথ তাঁহার ক্ষুদিরামের আবরণীর উপর একটী সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন তাহার শেষাংশ ছিল "অরসিকেষু রহস্য নিবেদনম্, শিরসি মালিখ মালিখ" সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার 'রসনিবেদন' বহুরসিকের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া-ছিল।

ইন্দ্রনাথ প্রবীণ ও সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক ছিলেন। অনেক সময় সমালোচনার ফলে পুস্তকরচয়িতার অসুবিধা হয় বলিয়া ইন্দ্রনাথ, সমগ্র পুস্তকে একটী প্রশংসার কথা পাইলেও তাহা লিখিতে প্রস্তুত ছিলেন। গ্রন্থকার যদি উপদেশপ্রার্থী হইয়া গ্রন্থের দোষভাগ বুঝিতে চাহিতেন, ইন্দ্রনাথ কেবল গ্রন্থকারের বুঝিবার জন্য তাঁহাকেই গ্রন্থের দোষাংশ দেখাইয়া দিতেন। এরূপে তাহাদ্বারা বহু গ্রন্থকারের ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে। এক দিন ইন্দ্রনাথের কলিকাতাস্থ বাসাবাটীতে বহু সাহিত্যসেবক সম্মিলিত হন; তখন জনৈক গ্রন্থকার ইন্দ্রনাথকে স্বরচিত গ্রন্থ উপহার দিয়া বলেন "সমালোচনার জন্য।" ইন্দ্রনাথ বলেন—'প্রশংসাপত্র চাই, না নিরপেক্ষ সমালোচনা চাই! সমালোচনা দুই প্রকার। যদি সমালোচনার দরকার হয়, সময়মত শুনিবেন; প্রশংসাপত্র দরকার হইলে পুস্তকখানি সম্পূর্ণ পড়িবার পরেই পাইবেন। সমালোচনায় পুস্তকখানি হজম্ করা দরকার হয়, সুতরাং আরও বিলম্ব হয়।'

ইন্দ্রনাথ একজন প্রতিভাবান্ ব্যবহারবিৎ ছিলেন। ঐ কার্য্যে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বিচক্ষণ বিচারপতিরাও বিস্মিত হইতেন। একদা মিঃ লালমোহন ঘোষের সহকারীরূপে তিনি কার্য্যকরিতে গিয়া যেরূপ প্রসংশিত হন, তাহার তুলনা নাই। তিনি যে সব কূটপ্রশ্ন স্থির করেন, তাহা শুনিয়া মিঃ লালমোহন ঘোষ বলেন "ইন্দ্রবাবু! আপনি গোঁড়া হিন্দু না হইলে বোধ হয়, শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টাররূপে আপনাকে দেখিতে পাইতাম। আপনার বুদ্ধিমত্তা ও রহস্য ভেদ-শক্তিতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি।' ইন্দ্রনাথ এক-বার এক মোকর্দ্দমায় ফরীয়াদীর পক্ষা-বলম্বন করেন, আসামী দণ্ডিত হয়! এই সংবাদে ইন্দ্রনাথের রত্নগর্ভা জননী দুঃখিত হন

এবং পুত্রকে আদেশ করেন, "তুমি ফৌজদারীতে ফরিয়াদীর পক্ষ গ্রহণ করিও না।" ইন্দ্রনাথ কখনও এ আদেশ লঙ্ঘন করেন নাই। ইন্দ্রনাথ অসাধারণ মাতৃভক্ত ছিলেন। হায়! ইন্দ্রনাথের জননী এখনও জীবিতা!

ইন্দ্রনাথ বহুগুণে মণ্ডিত ও বহুবিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। শেষজীবনে ইন্দ্রনাথ সমস্ত কার্য্য হইতে অবসর লইয়া কেবল ধর্ম্মালোচনায় কালাতিপাত করিতেন। সুদারুণ পুত্রশোকেও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। ইন্দ্রনাথ বিস্তৃত জমিদারী অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কয়লার ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন। তাঁহার ব্যয় অধিকাংশই ধর্ম্মকার্য্যে। তিনি ধর্ম্মমহামণ্ডলের অন্যতম নেতা ছিলেন। ইন্দ্রনাথ গত ১৩১৭ সালের ৯ই চৈত্র দ্বিপহর ৬২ বৎসর বয়সে জাহ্নবীক্রোড়ে দেহরক্ষা করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছেন ইন্দ্রনাথ রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের এক মহাশক্তি ছিলেন—এ কথা অস্বীকার করা যায় না এখনও ইন্দ্রনাথের তেজঃ—ইন্দ্রনাথের কার্য্য চিন্তা করিলে মনে হয়, 'ফলিবে এমন রত্ন ফলিবে কি আর?'

ইন্দ্রনাথের জীবনী প্রকাশের স্থান আমাদের নাই। অতি সংক্ষেপে তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। ১৭৭১ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে মাতুলালয়ে ক্ষণজন্মা ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺রামচরণ বন্দোপাধ্যায় পূর্ণিয়ার উকিল ছিলেন। ৭ মাস বয়সে ইন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে পূর্ণিয়ায় যান। নবম বর্ষ পর্য্যন্ত পূর্ণিয়ায় থাকেন। কদাচিৎ অবকাশে পিতৃভূমি বর্দ্ধমান কাটোয়ার নিকটস্থ গঙ্গাটিকুরীতে আসিতেন। ষষ্ঠবর্ষে ইন্দ্রনাথ পূর্ণিয়া গবর্ণমেণ্টস্কুলে ভর্ত্তি হন, নবমবর্ষে পিতৃবিয়োগ হয়, পূর্ণিয়া ত্যাগ করেন। পূর্ণিয়া ত্যাগ করিয়া প্রথম কৃষ্ণনগরে শেষে বীরভূমে পড়িতে যান। ১২৬৬ সালে বিবাহ করেন। তৎপরে ভাগলপুরে পড়িতে যান, তথাহইতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া ভাগলপুর ত্যাগ করেন। (ইন্দ্রনাথ এণ্ট্রান্সে স্কলারসিপ্ পাইয়াছিলেন) তাহারপর প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ, এ পড়িতে লাগিলেন, কিছুদিন পরে হুগলীকলেজে গেলেন তথাহইতে আবার "ফ্রিচর্চ্চে" যাইয়া এফ এ পাশ করেন। হুগলীকলেজের প্রিন্সিপাল ইন্দ্রনাথকে আবার হুগলী কলেজে টানিয়া আনেন, কিন্তু তথায় ইন্দ্রনাথের থাকা হইল না; কেথিড্রেল মিশন্ কলেজে আসিয়া তথা হইতে বি এ পাশ করিলেন। তারপর ইন্দ্রনাথ হেতমপুর স্কুলে প্রধান শিক্ষকতা করেন, পরে ওকড়শাস্কুলের শিক্ষক হন। ১৮৭০সালে শিক্ষকতা ছাড়িয়া বি এল্ পড়িতে যান এবং ১৮৭১ সালে বি এল্ পাশ করেন; ঐ বৎসরই হাইকোর্টে নাম লেখান হয়। ইন্দ্রনাথ প্রথম পূর্ণিয়ায় ওকালতী করিতে যান। অল্পকাল মধ্যেই মুন্সেফ হইয়া যান। আবার শীঘ্রই মুন্সেফি ছাড়িয়া দিনাজপুর ওকালতী করিতে যান। ১৮৭১ ডিসেম্বর হইতে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর দিনাজপুরে ওকালতী করিয়া শেষে হাইকোর্টে আসেন; তারপর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের আগষ্টমাসে বর্দ্ধমান যাত্রা করেন। ইহার পর যতদিন কার্য্যক্ষেত্রে ছিলেন, বর্দ্ধমানেই ছিলেন।

ইন্দ্রনাথ ১৮৭০ খৃঃ ইংরেজী এণ্ট্রান্স কোর্সের নোট্ বাহির করেন এবং 'উৎকৃষ্ট-কাব্যম্' নামক কবিতাপুস্তক লেখেন। বঙ্গীয় ১২৮০ সালে 'কল্পতরু' রচনা করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে 'ভারত উদ্ধার' প্রকাশ করেন। সর্ব্বপ্রথম ইন্দ্রনাথের রসায় পঞ্চানন্দ অন্যতম সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত সাধারণী পত্রেই আত্মপ্রকাশ করে তাহার পর খণ্ডাকারেও প্রকাশিত হয়; পরে ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর অনুরোধে বঙ্গবাসীর প্রতি পঞ্চানন্দের কৃপা হয়! ৺কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে গিয়া ৫।৬ দিনে ইন্দ্রনাথ 'ক্ষুদিরাম' লেখেন। ইন্দ্রনাথ এতদ্ব্যতীত বহু সারবান্ প্রবন্ধ বহু পত্রে লিখিয়াছিলেন, অনেক গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সবগুলি প্রকাশ করেন নাই। বঙ্গ-ভাষার প্রতি ইন্দ্রনাথের দান অমূল্য ও অসাধারণ।

ইন্দ্রনাথ অসীম শক্তিশালী ছিলেন। তিনি রক্ষণশীলতা পছন্দ করিতেন বলিয়া সমাজের সকলে তাঁহাকে পছন্দ করিতেন না, কিন্তু জানিনা, তাঁহার শক্তি ও অসাধারণতা অস্বীকার করিতে পারেন, এমন বাঙ্গালী কেহ আছেন কিনা? ইন্দ্রনাথ ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য বিখ্যাত, সেই খ্যাতি মরণদিনে তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক নানারূপে তাঁহার সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন, কিন্তু কখনও পরিণত বয়সে তাঁহার মহত্বে কলঙ্কের ছায়া দেখেন নাই

শ্রীঃ—

নীতি-সার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)।

আজন্মসেবিতং দানৈর্মানৈশ্চ পরিপোষিতং
তীক্ষ্ণবাক্যান্মিত্রমপি তৎকালং যাতি শত্রুতাম্॥
বক্রোক্তিশল্যমুদ্ধর্তুং ন শক্যং মানসং যতঃ॥ ২১৯

বহেদমিত্রং স্কন্ধেন যাবৎ স্যাৎ স্ববলাধিকঃ।
জ্ঞাত্বা নষ্টবলং তং তু ভিন্দ্যাৎ ঘটমিবাশ্মনি॥ ২২০

ন ভূষয়ত্যলঙ্কারো ন রাজ্যং ন চ পৌরুষং।
ন বিদ্যা ন ধনং তাদৃগ্‌ যাদৃক্‌ সৌজন্য ভূষণম্॥ ২২১

অশ্বে জবো বৃষে ধৌর্য্যং মণৌ কান্তিঃ ক্ষমা নৃপে।
হাবভাবৌচ বেশ্যায়াং গায়কে মধুরঃ স্বরঃ॥ ২২২

দান ও মানদ্বারা আজন্ম সেবা ও পরি-পোষণ করিলেও কর্কশ বাক্য দ্বারা মিত্র-ব্যক্তিও তৎকালে শত্রু হইয়া থাকেন, যে হেতু মন দুর্ব্বাক্য-শল্যদ্বারা বিদ্ধ হইলে মন হইতে সে শল্য উদ্ধৃত করা যায় না। ২১৯

শত্রু যতক্ষণ আপন বল হইতে অধিক থাকিবে, তাবৎ তাহাকে স্কন্ধে বহন করিবে, কিন্তু যখন তাহাকে হীনবল জানিবে, তখনই তাহাকে প্রস্তর ঘটের ন্যায় নষ্ট করিবে। ২২০

মনুষ্যের সৌজন্য যেরূপ ভূষণ, সেইরূপ অলঙ্কার, রাজ্য, পৌরুষ, বিদ্যা বা ধন কিছুই নহে। ২২১

অশ্বে বেগ, বৃষে ভারবাহকত্ব, মণিতে দীপ্তি, রাজায় ক্ষমাগুণ, বেশ্যাতে হাবভাব, গায়কে

দাতৃত্বং ধনিকে শৌর্য্যং সৈনিকে বহুদুগ্ধতা।
গোষু দমস্তপস্বিষু বিদ্বৎসু বাবদূকতা॥ ২২৩
সভ্যেষপক্ষপাতস্তু তথা সাক্ষিষু সত্যবাক্।
অনন্যভক্তি ভৃর্ত্যেষু সুহিতোক্তিশ্চ মন্ত্রিষু॥ ২২৪
মৌনং মূর্খেষু চ স্ত্রীষু পাতিব্রত্যং সুভূষণম্।
মহাদুভূর্ষণং চৈতদ্ বিপরীত মমীষু চ॥ ২২৫
গৃহং বহু কুটুম্বেন দীপৈ র্গোভিঃ সুবালকৈঃ।
ভাত্যেকনায়কং নিত্যং ন গৃহং বহুনায়কম্॥ ২২৬
ন চ হিংস্রমুপেক্ষেত শক্তো হন্যাচ্চ তৎক্ষণে॥ ২২৭
পৈশুন্যং চণ্ডতা চৌর্য্যং মাৎসর্য্যমতিলোভতা।
অসত্যং কার্য্য ঘাতিত্বং তথালসকতাপ্যলম্।
গুনিনামপি দোষায় গুণানাচ্ছাদ্য জায়তে॥ ২২৮

মধুর স্বর, ধনী ব্যক্তিতে দানশীলতা গুণ, সৈনিক পুরুষে বীরত্ব, গাভীতে প্রচুর দুগ্ধ, তপস্বীতে দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বিদ্বান্ ব্যক্তিতে বাগ্মীতা, সভ্যে অপক্ষপাতিত্ব, সাক্ষীতে সত্যবাক্য, ভৃত্যে প্রভুর প্রতি একান্তানুরাগ, মন্ত্রীতে হিতবচন, মূর্খে মৌন ও স্ত্রীতে পাতিব্রত্য, ভূষণস্বরূপ হইয়া থাকে কিন্তু এই সকল দ্রব্যে ইহার বিপরীত গুণ হইলে অত্যন্ত কুভূষণ স্বরূপ হইয়া থাকে। ২২২। ২২৩। ২২৪। ২২৫।

বহু পরিবার, দীপ, গাভি, উত্তম-স্বভাব-সম্পন্ন বালক দ্বারা গৃহ শোভিত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই গৃহের যদি এক কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে শোভিত হইয়া থাকে। গৃহের বহু কর্ত্তা হইলে ভাল নহে॥ ২২৬

হিংস্র জন্তুকে উপেক্ষা করিবে না। ক্ষমতাশালী হইলে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিবে॥ ২২৭

নিষ্ঠুরতা, কার্কশ্য, চৌর্য্য, মাৎসর্য্য, অত্যন্ত লোভ, মিথ্যা, কার্য্য ক্ষতিকরণ ও অত্যন্ত আলস্য এই সকল দোষ অভ্যস্ত গুণী ব্যক্তির হইলেও দোষের কারণ হইয়া থাকে, কারণ এই সকল দোষে, মনুষ্যসকলের গুণকে আবরণ করিয়া রাখে। ২২৮

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী

সংবাদ, মন্তব্য ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সৎকর্ম্ম। গত অক্ষয়তৃতীয়া-দিবসে হিন্দু-পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুরের যশোহরস্থ ভবনে শ্রীশ্রীশিবপ্রতিষ্ঠা, ৺নারায়ণপ্রতিষ্ঠা, মঠোৎসর্গ, বাস্তুযাগ-নবগ্রহযাগাদি সদনুষ্ঠান সমারোহ সহকারে সুসম্পাদিত হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে সহরস্থ সমস্ত ভদ্রলোক আহূত ও প্রচুর জলযোগে আপ্যায়িত হইয়াছেন। ২ দিবস কাঙ্গালী-বিদায় হইয়াছে। এরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রাচুর্য্য সজ্জনসমাজের প্রীতিপ্রদ।

গণনায় গোলযোগ। লোক-গণনায়ও আপত্তিকারী আছে। শুনা গিয়াছে, করাচীর এইচ্ জি কিং নামক জনৈক ব্যবসায়ী লোকগণনার সময় গণনাকারীর কাছে যথাযথ সংবাদ প্রদানে অসম্মতি প্রকাশ করে। ইহার ফল অভিযোগ উপস্থাপিত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ব্যবসায়ীর ৫০৲ অর্থদণ্ড হইয়াছে। টাকা না দিতে পারিলে ঐ ব্যক্তিকে একমাস অবরোধ-দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এ অসম্মতির মূলে অবশ্যই রহস্য আছে।

আবিষ্কারে আপদ্। দক্ষিণমেরু আবিষ্কারার্থে অনেকেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, জাপানী-দল বহুদূর অগ্রসর হইয়া তুষার প্লাবন্যে "তক্রভক্ষণের" পর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সিড্‌নি উপস্থিত হইয়াছেন। সারমেয়গুলি প্রায়শই লীলা সম্বরণ করিয়াছে। আর কিছু না হউক্ কতকগুলি জীব উদ্ধার পাইল ত!

নারীক্রয়। নারীক্রয়টা আমাদের দেশে নূতন কথা নয়। "নয়শো রূপেয়া"র দেশে কথাটা আন্‌কোরা নূতন ত নয়ই, পরন্তু বেশ পুরাতন। দক্ষিণ আফ্রিকার উগাণ্ডা প্রদেশে কুমারীবিক্রয় প্রচলিত আছে। ক্রেতা মাত্র দশটাকা ব্যয় করিলেই একটী নিগ্রোকুমারী সংগ্রহ করিতে পারেন। দশমুদ্রার মায়া পরিত্যাগ করা যত সহজ, কুমারীক্রয় কিন্তু তত সহজ নয়; কারণ অনেক ভাবিয়াই ওপথে যাইতে হয়। ভারতের প্রাচীন বৃত্তান্তে স্ত্রী-পণ্যের স্থান অপ্রশস্ত নয়।

নূতন লেবেল্। সম্প্রতি পাশ্চাত্য-প্রদেশে চুম্বনের অপকারিতা প্রচারিত হওয়ায় বহুলোকে নিজের ও বালক বালিকার গলদেশে "আমায় চুম্বন করিওনা" অঙ্কিত লেবেল্ আঁটিতেছেন। অযাচিত প্রেমের ব্যবসায়ে এই ব্যাপার যুগান্তর ঘটনা করিয়াছে। এই নবাবিষ্কৃত ট্রেড্‌মার্ক স্পর্শ-দোষ-বিষয়ক হিন্দুসিদ্ধান্তের জয়পতাকারূপে গৃহীত হইবে, সন্দেহ নাই।

এবার 'হাতে নোতে'। কলি-ধর্ম্মে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ লোভী হওয়ায় তাঁহারা অনেক সময় স্বীয় স্বীয় জ্ঞান-বিশ্বাসের বিপরীত ব্যবস্থায় নাম লিখিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ আত্মসাৎ করিয়া, পরক্ষণেই সে কথা অস্বীকার করিয়া থাকেন! এরূপ ঘটনা দেশে অনেক হইয়াছে। পণ্ডিত-কুলের এই মায়াযুদ্ধে বড় বড় বুদ্ধিমান্ বিষয়ীও পরাস্ত হইয়াছেন। এবার যশোহরের সন্তান সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বভবনে সমাগত অধ্যাপকবর্গের আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া ব্যবহারজ্ঞতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। এবার "হাতে নোতে" ধরা, না বলিবার উপায় কি? ঘুস্‌খোর কর্ম্মচারিদের জন্য বুঝি এমন একটা উপায় হইতে পারে না! 'ধর্ম্ম' বেচিয়া খাওয়াত উভয়ত্রই সমান!

বারাণসী রহস্য। পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রণীত। ডিমাই দ্বাদশাংশিত ৭৪ পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত; গ্রন্থে মূল্যের উল্লেখ নাই। গ্রন্থকারের নৈপুণ্যে আমরা প্রীত হইলাম। পুস্তক-খানির উদ্দেশ্য মহান্। সাধুশুশ্রূষালয় উপলক্ষেই গ্রন্থের অবতারণা। পুণ্যতীর্থ বারাণসীর বহু রহস্য এই গ্রন্থে রসভাবময়ী ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিবেন, তাঁহারা ইহার অন্তঃসৌন্দর্য্যে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবেন। গ্রন্থকার আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। ধর্ম্ম ও সদ্ভাব-প্রচার জগতের চিরহিতকর, ইহাতে সংশয় থাকিতে পারে না। আমরা এ গ্রন্থের আদর দেখিলে আনন্দিত হইব।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্টারীকৃত।)

তত্ত্ব-পত্রিকা।

১৮শ বর্ষ, ১৮শ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। আষাঢ়। ১৩১৮ সাল, ১৮৩৩ শকাব্দাঃ।

শরণাগত

মানব! যে বিশ্বনিয়ন্তার অপার কৃপায় মনুষ্য-রূপে এই ধরায় এসেছ, তাঁহার শরণ লও। শরণ লইতে হইবে কিরূপে? তাহার মীমাংসা মহাত্মা কবির দাস করিয়াছেন। কবিরদাস বলিতেছেন—

কবির রামনাম লইয়ে য্যায়েসা পানিমীন।
প্রাণ ত্যজে পল্ বিছুয়ে দাস কবির কহি দীন॥

কবিরের ভাব এই—রাম নামেতে এরকম মন রাখ, যেমন জলের মাছ এক পল-মাত্র জল ছাড়া হ'লে প্রাণ ত্যাগ করে, সেই রকম যেন তোমারও প্রাণ একপল রামনাম-বিহীন হ'লে দেহ ত্যাগ ক'রে যায়। ঐরূপ শরণ লইতে মহাত্মা কবিরদাস বিনয়সহকারে বলিতেছেন। শরণ লইলে কোন ভাবনাই নাই। শরণ লইবার পূর্ব্বে হয়ত ভাবনা হইবে যে, কে আমার ভরণপোষণ করিবে? কে আমার সংসারের কষ্ট দূর করিবে? কিন্তু বস্তুতঃ কোন ভাবনা নাই! কোন দুশ্চিন্তার দরকার নাই! যদি মনকে আশ্বস্ত করিতে না পার, তবে মহাজনের শরণাপন্ন হও, মহাজনের বাক্য হৃদয়ে গ্রহণ কর। মহাত্মা তুলসীদাস কি বলিতেছেন শুন, প্রাণ জুড়াইয়া যাইবে; তিনি বলিতেছেন—

যো যাকু শরণ লিয়ে
সো রাখে তাকু লাজ,
উলটু জলে মছলি চলে,
বহি যায় গজরাজ।

যে যার শরণ লয়, সেই তার লজ্জা নিবারণ করে, যেমন মাছ জলের শরণ লইয়েছে ব'লে সে তা'র উজান চলে, কিন্তু হস্তী মহাবলশালী হইলেও উজান যাইতে পারে না।

এ শরণ—মানুষের নিকটে লওয়া নয়, এ শরণ সেই মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে লইতে হইবে। মানুষের নিকটে শরণ লওয়ায় কি বিষময় ফল, তাহাও তুলসীদাসেরই জীবন থেকে দেখান যাউক্। তুলসীদাস নিজের স্ত্রী

ছাড়া এক পলও থাকিতে পারিতেন না। একদা তাঁহার স্ত্রী পিত্রালয়ে গিয়াছেন শুনিয়া তাড়াতাড়ি শ্বশুরবাড়ী গেলেন। তারপর তাঁর স্ত্রীর একদিকে বিদ্রূপাত্মক ও অপর-দিকে মহান্ উপদেশপূর্ণ ও ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গলসূচক বাক্যাবলী শুনিলেন ও যথার্থই হৃদয়ে ধারণ করিলেন। সেই বাক্যা-বলী এই—

লাজন লাগত আপুকো, ধৌয়ে আয়োহ সাথ।
ধিক্ ধিক্ অয়সে প্রেমকো, কহা কহোঁ মৈনাথ॥
অস্থিচর্ম্ম দেহ মম, তামে জৈসী প্রীতি।
তৈসীজো শ্রীরামমহ, হোত ন তও ভবভীতি॥

"স্বামিন্! এই অস্থি, চর্ম্ম, মাংস ও শোণিতাদি—নির্ম্মিত আমার অনিত্য শরীরে যে পরিমাণে তোমার স্নেহ ও প্রেম বিরা-জিত আছে, যদি সেই পরিমাণে স্নেহ ও প্রেম ভূতভাবন ত্রিলোকপ্রকাশক রামচন্দ্রের প্রতি বিরাজিত থাকিত, তাহা হইলে তুমি ইহলোক ও পরলোকে বিমল আনন্দ অনুভব করিতে পারিতে।" এইত গেল মনুষ্যের শরণ লওয়ার ফল। তুলসীদাস বুঝিলেন, যে, মানুষের শরণ লয়ে আর কি হবে? একবার শ্রীরামের শরণ লওয়া যাক্। মাছের মতই তাঁর শরণ লইলেন। যেমন শরণ লওয়া অমনি হাতে হাতে ফল! বৃন্দাবনে গেলেন ও শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন—

কাহা কহো আজকী ভালে বলেহ নাথ।
তুলসীমস্তক তব লোয়ে ধনুষবান লেও তবহাত॥
ভক্তবছল ভগবান্‌কী বেদবিদিত ইহগাথ।
মুরলী মুকুট দুরাউকে নাথ ভয়ে রঘুনাথ॥

অর্থাৎ হে নাথ! আজি যে শোভায় শোভিত হইয়াছেন তাহার আর কি কহিব; কিন্তু ধনুর্ব্বাণ হস্তে গ্রহণ না করিলে তুলসী মস্তক নত করিবে না। এই কথা শুনিয়া বেদগাথা প্রসিদ্ধ ভক্তবৎসল হরি, চূড়া ও বাঁশী লুকাইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে গ্রহণ করিয়া-রহিলেন। আহা কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! শরণাগত ভক্তের আব্দার গ্রাহ্য না ক'রে থাকিতে পারিলেন না। চূড়া বাঁশী লুকিয়ে ধনুর্ব্বাণ ধরিলেন, কেননা তুলসী চায় রামরূপ! অবশ্য ইহা সাধনার ফল, তাহা সকলেই বুঝিবেন।

জীব! তাঁর নাম প্রতিনিয়তই গ্রহণ কর। প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে তাঁর নাম জপ কর। কি প্রকারে শ্বাসপ্রশ্বাসে জপ করিবে, তাহা সদ্‌গুরু বলিবেন। সদ্‌গুরু ছাড়া তোমার অজ্ঞানা-ন্ধকার এই জীবনে আর কেহ দূর করিতে পারিবে না। সদ্‌গুরু ধর, জীবন সার্থক হইবে। বুঝ যে আমি সেই সচ্চিদানন্দ, আর কেহ নহি। "আমি" ব'লে যে একটা অদ্ভুত ধারণা আছে, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। সে "আমি" অজ্ঞানান্ধকারের, উহা দিব্য জ্যোতিতে আলোকিত "আমি" নয়। তখন জানিবে যে "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ", আর বুঝিবে যে তুমি—

সর্ব্বভূতে বিরাজিত, সর্ব্বকালে অবস্থিত,
"মৃত' বা 'জীবিত' কথা নাহি এ ধরায়।

শ্রীহরিদাস প্রামাণিক।

ক্রিয়ালক্ষণা ভক্তি অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ।

১। পূর্ব্বপরিচ্ছেদে জ্ঞানলক্ষণাভক্তির ও ক্রিয়ালক্ষণাভক্তির লক্ষণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে বলা গিয়াছে এবং ইহাও বলা গিয়াছে

যে, যাহা জ্ঞানলক্ষণাভক্তি তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। "জ্ঞান" শব্দের মুখ্য অর্থই ব্রহ্মজ্ঞান। সুতরাং জ্ঞানলক্ষণাভক্তির অর্থও ব্রহ্মজ্ঞান। তাহাই আত্মজ্ঞান, আত্মপ্রীতি, আত্মরতি, পরমাত্মপ্রেম এবং পরম-প্রেমাস্পদ আত্মোপাসনা বা নিরঞ্জন-ব্রহ্মোপাসনা শব্দের বাচ্য। অতএব ক্রিয়ালক্ষণা-ভক্তি অপেক্ষা যথোক্তলক্ষণ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। এবং জ্ঞানলক্ষণাভক্তি ঐ জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নহে।

২। ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, এই সিদ্ধান্ত অনেকের রুচিতে ভাল না লাগিতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, জ্ঞানলক্ষণারূপিণী যে পরাভক্তি তাহা জ্ঞান মাত্র। তাহা ক্রিয়ালক্ষণা সাধনভক্তির ন্যায় মনোবৃত্তির কার্য্য নহে। তাহা সবিতৃমণ্ডলবৎ স্বয়ম্প্রকাশ। অতএব সাধন-ভক্তি অপেক্ষা তাহার শ্রেষ্ঠত্ব। এ সম্বন্ধে গীতার সিদ্ধান্তসকল ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। প্রকরণানুসারে বিচার করিলে উপাদেয় তাৎপর্য্য লাভ হইবে।

(১) ক্রিয়ালক্ষণা মনোবৃত্তি-স্বরূপিণী ভক্তি একাকিনী দাঁড়াইতে পারেন না। তিনি ঐ সকল শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মক্রিয়ার এবং ন্যূনকল্প ব্রহ্মবিদ্যাসাধনের সহযোগিনী। তিনি চিত্তশুদ্ধির জননী বা স্বয়ং চিত্তশুদ্ধিরূপিণী হইলেও, ব্রহ্মরূপ পরমমোক্ষের গর্ভধারিণী নহেন। স্বয়ম্প্রকাশ ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যুদয় ব্যতীত সংসারোদ্ধারণ ও মৃত্যুভয়নিবারণ হয়না।

(২) গীতাতে এই ক্রিয়ালক্ষণা কর্ত্তৃতন্ত্রা অপরা ও হৃদয়-বৃত্তিরূপিণী ভক্তির উল্লেখ ও সাধনের কথা বিস্তর স্থানে আছে। কিন্তু জ্ঞান ব্যতীত (অর্থাৎ অকর্ত্রাত্মক-জ্ঞান বিনা) মুক্তি হয়না, ইহাই বার বার কহিয়াছেন। অতি সংক্ষেপে তাহার কতিপয় প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

(৩) গীতার নবম অধ্যায়ের নাম-রাজগুহ্যযোগ। তাহা প্রধানতঃ মোক্ষপ্রতিপাদক হইলেও, তাহার অবান্তরে ক্রিয়ালক্ষণাভক্তির উপদেশ আছে এবং ঊনত্রিংশ শ্লোকাবধি কয়েকটী বচনে সেই ক্রিয়ালক্ষণাভক্তির মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং। ২৯ আমি সর্ব্বভূতে সমান। আমার কেহ প্রিয়ও নাই অপ্রিয়ও নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে ভজনা করে, সে আমাতে বর্ত্তমান থাকে এবং আমি তাহার প্রতি অনুগ্রাহকরূপে বর্ত্তমান হই। ইহার ভাব এই যে, ভক্তেরা ঐরূপ বুঝেন। ইহা আমার ভক্তির মহিমা। শঙ্কর বলেন—স্বভাবতঃ এইরূপ হয়। নতুবা রাগনিমিত্ত নহে। আনন্দগিরি কহেন যে, এই ভজন শব্দের অর্থ "বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মৈ মাং ভজন্তি" বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম অর্থাৎ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা যে আমাকে ভক্তি করে, সে স্বভাবতঃ ঐ রূপ অনুগ্রহ পায়। ২৯ * অধ্যায়সমাপ্তি পর্য্যন্ত এই

* ইহা ধারণার যোগ্য যে, আনন্দগিরি ব্রহ্মজ্ঞানী অনাশ্রমী সন্ন্যাসী হইয়াও বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের যোগে ভগবানের প্রতি ভক্তির ঔচিত্যরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, তাহাই গীতাবচনের তাৎপর্য্য। শুদ্ধ গীতার নহে;

ভক্তিরই মহিমা প্রদর্শিত হইয়াছে। শেষে ৩৪ শ্লোকে কহিয়াছেন, "মন্মনাভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজীমাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।" এ বচনে ভজন-প্রকার দেখাইতেছেন। আমাতে মনোনিবেশ কর, আমার ভক্ত হও, মৎ-পুজনশীল হও, আমাকে নমস্কার কর। এই প্রকারে মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে মন (আত্মাশব্দে এখানে মন বা চিত্ত) সমাধান করিলে পশ্চাৎ আমাকে প্রাপ্ত হইবে। এই নবম অধ্যায় প্রধানতঃ সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি-সাধনরূপ ভক্তিযোগ। এতদনুসারে অনুষ্ঠানপরায়ণ হইলে "মামেবমহং হি সর্ব্বেষাং আত্মা পরাচ গতিঃ পরময়নং তং মামেব এবম্ভুতং এষ্যসি" আমাকে সর্ব্বাত্মা, পরাগতি, পরমায়ন রূপে পাইবে। এস্থানে মনন, ভক্তি, যজন এবং নমস্কার, উত্তরোত্তর সুগমোপায় মাত্র। তৎসমূহ দ্বারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মসাধনই উদ্দেশ্য। তাহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে পশ্চাৎ ভগবান্‌কে আত্মা রূপে লাভ হইবে এই ভাব।

কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রেরই তাৎপর্য্য। মহাভক্তি-শাস্ত্র যে নারদপঞ্চরাত্র তাহাতে আছে "বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ বিজানতা। বিষ্ণুরারাধ্যতে তেন নান্যত্তত্তোষকারণং॥" যিনি নিত্যনৈমিত্তিক দেবার্চ্চনাদি বর্ণাশ্রমাচারনিষ্ঠ এবং জ্ঞানবান্ তাদৃশ পুরুষ কর্ত্তৃকই বিষ্ণুর আরাধনা হইয়া থাকে। অন্য কোন প্রকার অনুষ্ঠান তাঁহার তুষ্টির কারণ নহে। "শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানি পঞ্চরাত্রাণি হাপয়ন্। অত্যুৎকটা হরের্ভক্তিঃ অনর্থায়ৈব কল্পতে॥" শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রসম্মত কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া অত্যুৎকট হরিভক্তি অনর্থ-কল্পনা মাত্র।

(৪) দশম অধ্যায়ের নবম ও দশম শ্লোকে আছে "মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তিচ। তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তিতে।" যাঁহাদের মদ্‌গত চিত্ত ও জীবন, তাঁহারা পরস্পর শ্রুত্যাদি প্রমাণ দ্বারা আমার কথা বোধ করান্। বোধ করিয়া মৎকথা কীর্ত্তন করেন, তাহাতে সন্তোষ লাভ করেন ও রমণ করেন। এই প্রকার সততযুক্ত ও প্রীতিপূর্ব্বক ভজনকারীগণকে আমি সেই বুদ্ধিরূপ যোগ (সম্যগ্‌দর্শনং মত্তত্ত্ববিষয়ং বুদ্ধিঃ) অর্থাৎ আমার সম্যগ্‌দর্শনলক্ষণ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করি, যদ্দ্বারা আমাকে আত্মা রূপে প্রাপ্ত হন। এ বচনটীও ভক্তিযোগপ্রতিপাদক এবং ইহার প্রতিপাদ্য অনুষ্ঠানগুলি শাস্ত্র-সঙ্গত ক্রিয়া অর্থাৎ কর্ম্মযোগ। এতদ্দ্বারাও অন্তিম আত্মজ্ঞানের আশা প্রদত্ত হইয়াছে; সুতরাং এতদুক্তভক্তি জ্ঞানলক্ষণা ভক্তি নহে; কিন্তু কর্ম্মযোগরূপিণী। এই ভক্তি কখনও পরমাত্মজ্ঞানের ঊর্দ্ধপদস্থ নহেন। সমকক্ষও নহেন।

(৫) এই সকল বচন হইতে ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানেরই শ্রেষ্ঠত্ব জানা যায়। অর্থাৎ ভক্তিসাধন, ভজনা, ও সগুণোপাসনা দ্বারা ক্রমে আত্ম জ্ঞান লাভ হয়। সুতরাং ভক্তিআদি ভজনক্রিয়া আত্মজ্ঞানের সোপান। অতএব ভক্তি কখনও পরমাত্ম-জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের ঊর্দ্ধপদ নহেন। ভক্তি দ্বারা ভগবান্ ও ভগবতীর লোকপ্রসিদ্ধ মূর্ত্তিপূজা, জপ, তপ, ধ্যান, ধারণাদি

হইবে ইহাই উদ্দেশ্য। ক্রিয়ানিরপেক্ষ হরিসাধন বা ব্রহ্মোপাসনা উদ্দেশ্য নহে। কেননা ক্রিয়ালক্ষণা ভক্তি ক্রিয়ানিরপেক্ষাও নহে ব্রহ্মজ্ঞানলক্ষণাও নহে।

(৬) এইক্ষণে দ্বাদশে অর্থাৎ ভক্তি-যোগাধ্যায়ে কি বলিয়াছেন তাহা বলা যাইতেছে। উক্ত অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকারম্ভে, ভূমিকা স্বরূপে আছে যে, উপরি-উক্ত শ্লোকসমূহে ভগবদ্ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হইয়াছে। "তথা তেষাং জ্ঞানী-নিত্যযুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে। ইত্যাদিনা। সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সংতরিষ্যসি। ইত্যাদিনাচ জ্ঞাননিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তং। এবমুভয়োঃ শ্রৈষ্ঠ্যবিশেষজিজ্ঞাসয়া ভগবন্ত-মর্জ্জুন উবাচ।" যেমন ঐ সকল শ্লোকে ভগবদ্ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে, সেই-রূপ এই শেষোক্ত শ্লোকসমূহে (পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে। ১৪৮ ক্রম দ্রষ্টব্য) জ্ঞাননিষ্ঠের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে। এইরূপ উভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হওয়াতে, বিশেষ জ্ঞাত হইবার ইচ্ছায় অর্জ্জুন ভগবান্‌কে কহিতেছেন—

(৭) "এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং-পর্য্যুপাসতে। যেচাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ।" স্বামী—এবং সর্ব্বকর্ম্মার্প-ণাদিনা সততযুক্তাস্তন্নিষ্ঠাঃ সন্তো যে ভক্তাস্ত্বাং বিশ্বরূপং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি। যেচাপ্যক্ষরং ব্রহ্ম অব্যক্তং নির্ব্বি-শেষং উপাসতে। তেষামুভয়েষাং মধ্যে কেঽতিশয়েন যোগবিদোঽতি শ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ।" ১। পূর্ব্বোক্ত রূপে কর্ম্মার্পণাদি দ্বারা (অর্থাৎ ফলত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মার্পণন্যায়ে শ্রুতিস্মৃত্যাগম-বিহিত সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠানযোগে) তোমাতে নিষ্ঠ হইয়া যে ভক্ত সকল বিশ্বরূপ (১১ অধ্যায়ে) সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ স্বরূপে তোমাকে ধ্যান করে, আর যে ব্যক্তি অব্যক্ত এবং নির্ব্বিশেষ অবিনাশী ব্রহ্মকে উপাসনা করে, এতদুভয়ের মধ্যে অতিশয় যোগবিৎ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কোন্ ব্যক্তি? আনন্দগিরি কহেন—প্রথমোক্ত উপাসনাটী সোপাধিক এবং ধ্যান; আর দ্বিতীয়টী নিরুপাধিক এবং জ্ঞান। তন্মধ্যে, শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাজ্য নহে! কিন্তু বিশ্বরূপ (বৈরাটিক অলঙ্কারযুক্ত মূর্ত্তি), সর্ব্বজ্ঞ (ঈশ্বর), সর্ব্বশক্তিমান্ (সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা) রূপধ্যানের সহিত ঐ সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তাহাই ক্রিয়া-যোগের উদ্দেশ্য। এস্থানে অর্জ্জুনের প্রশ্নের মর্ম্ম এই যে, যাঁহারা তোমার চরণে অর্পণ-পূর্ব্বক যজ্ঞ ও দেবার্চ্চনাদি ক্রিয়া করেন, আর যাঁহারা অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন এতদুভয়ের মধ্যে কাহারা উত্তম যোগবিৎ। (এখানে ব্রহ্মোপাসকেরাও লোক-শিক্ষার্থে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন কিনা, সে প্রশ্ন নাই।)

(৮) ইহার উত্তরে ২য় শ্লোকাবধি ১২শ শ্লোক পর্য্যন্ত যাহা কহিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপ কহিতেছি। প্রথমতঃ উপক্রম-স্বরূপ ২য় শ্লোক হইতে ৮ম শ্লোক পর্য্যন্ত কর্ম্ম-যোগ উপদেশ পূর্ব্বক মোক্ষানুকূল জ্ঞান-দানের ভরসা দিতেছেন। ইহা প্রণিধানের যোগ্য যে, যেখানেই ক্রিয়া-লক্ষণা অর্থাৎ কর্ম্মযোগধর্ম্মি-ভক্তি উপদেশ করিয়াছেন, সেই স্থানেই জ্ঞানদানের আশা দিয়াছেন। ভগবানের উত্তরগুলি নিম্নে শ্লোকের সংখ্যানুসারে সংক্ষেপে লিখিত হইল।

(৯) "মদর্থকর্ম্মানুষ্ঠানাদিনা।" মৎ-প্রীত্যর্থকর্ম্মানুষ্ঠানাদি দ্বারা যে আমার আরাধনা করে, সেই ব্যক্তি যুক্ততম। ২। "ক্লেশোঽধিকতরঃ" কেননা দেহাভিমানীর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মনিষ্ঠা ক্লেশকর। ৫। "যস্তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি" কিন্তু যে ব্যক্তি শাস্ত্র-বিহিত যজ্ঞাদি সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে অর্পণ পূর্ব্বক আমাকে ধ্যান করত উপাসনা করে। ৬। "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা" তাদৃশ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে আমি শীঘ্র মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে উদ্ধারকর্ত্তা হই। আনন্দগিরি কহেন "জ্ঞানাবষ্টম্ভদানেন" জ্ঞানদীক্ষা দান দ্বারা সম্যগ্রূপে ঊর্দ্ধে তুলিয়া লই। ৭। "মষোব মন আধৎস্ব" অতএব আমাতে মনোবুদ্ধি নিবিষ্ট কর। "এবং কুর্ব্বন্ মৎপ্রসাদেন মদাত্মনা বাসং করিষ্যসি" এরূপ করিলে দেহান্তে মৎকৃপায় তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আমাতেই বাস করিবে। ৮। তথাচ শ্রুতিঃ। "দেহান্তে দেব পরংব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে।" সগুণো-পাসকের দেহান্ত হইলে পর তাঁহার উপাস্য দেবতা তাঁহাকে তারক—স্বরূপ পরব্রহ্মমন্ত্র উপদেশ করণান্তর পরব্রহ্মকে (আত্মারূপে) অপরোক্ষ করিয়া দেন। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ২ অবধি ৮ শ্লোক পর্য্যন্ত ভক্তিযোগে শাস্ত্র-বিহিত যজ্ঞাদি সমস্ত কর্ম্ম ধ্যান চিত্তধারণা, প্রীতি প্রভৃতি রূপ মনোনিবেশ সহকারে অনুষ্ঠানের উপদেশ ও তৎফলে অন্তে জ্ঞানদানের আশা—উপক্রম স্বরূপে প্রদান করিয়া, এক্ষণে ক্রমে ক্রমে উক্ত ভক্তিযোগ অনুষ্ঠানের সুগম উপায় কহিতেছেন।

(১০) যদি ধ্যানে সমর্থ না হও, তবে মদনুস্মরণরূপ অভ্যাসযোগে (অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত চিত্তকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহরণ করিয়া) আমার বিশ্বরূপাদির পূজা দ্বারা আমাকে লাভ কর। ৯। যদি তাদৃশ স্মরণাভ্যাসে অশক্ত হও, তবে মৎপ্রীত্যর্থ ব্রত পূজাদি কর। ১০। যদি প্রীতিতে অশক্ত হও, তবে কেবল আমার শরণাপন্ন হইয়া ফলাসক্তি-ত্যাগ-পূর্ব্বক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মানুষ্ঠান কর। ১১। এখন সর্ব্বাপেক্ষা সুগম উপায় যে ফলত্যাগ—তাহার স্তুতি করিতেছেন। জ্ঞানরহিত কর্ম্ম অপেক্ষা পরোক্ষজ্ঞান, তদপেক্ষা জ্ঞানসহকৃতধ্যান, এবং তদপেক্ষা কর্ম্ম-ফলত্যাগ, ভক্তি ও যজ্ঞাধিকারে উত্তরোত্তর সুগম অর্থাৎ শ্রেয়ঃ। তাদৃশরূপে ত্যাগ-দ্বারা কর্ম্মফলে আসক্তি-নিবৃত্তি হইয়া আমার অনুগ্রহে শীঘ্র সংসার-শান্তি হয়। ১২।

(১১) গীতাশাস্ত্রের এই সকল বচন হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, মনোবৃত্তি-রূপিণী ক্রিয়ালক্ষণাভক্তি, নিত্যনৈমিত্তিক যজ্ঞদেবার্চ্চনাদি শাস্ত্রবিহিত-কর্ম্ম-সমুচ্চিত ব্যতীত সাধককে একাকিনী কৃতার্থ করিতে সক্ষমা নহে। বিশেষতঃ তিনি স্বভাবতঃ ঈশ্বরের রূপ, নাম ও গুণনিষ্ঠা। শাস্ত্রানুসারে তাঁহার সার্থক্য নিমিত্তে হরগৌরী, রাধাকৃষ্ণ, কালীতারা, প্রভৃতি দেবদেবীগণের নানা-বিধ মন্ত্র ও দ্রব্যময়ী অর্চ্চনা প্রতিষ্ঠিত আছে। তৎসমস্ত অর্চ্চনাতে সমুচ্চিত না হইলে, এই বেদস্মৃত্যাগম এবং গুরু-পুরো-হিত দ্বারা শাসিত হিন্দুসমাজে তাঁহার স্থানাভাব।

(১২) এই যে ক্রিয়ালক্ষণা-সাধন-ভক্তি, তাহারই নামান্তর ভক্তিযোগ। এই ভক্তি চিত্তবৃত্তির কার্যাধিকার ভগবান্ বা ভগবতীর রূপ, নাম, গুণ, অর্চ্চনা এবং বন্দনানিষ্ঠা। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এই যে, সেই সমস্ত নাম-রূপাদির পূজা, ধ্যান, স্মরণ, মনন, শরণগ্রহণ, নামসঙ্কীর্ত্তন, নামজপ প্রভৃতি ক্রিয়া শাস্ত্রবিহিতরূপে অনুষ্ঠিত হইবে, স্বাভাবিক বা স্বেচ্ছাকৃত রূপে হইবে না। অতএব এই ভক্তিযোগ কর্ম্মযোগেরই নামান্তর মাত্র।

(১৩) রূপ, নাম ও গুণনিষ্ঠা বিধায় এই ভক্তি নিরঞ্জন ব্রহ্মোপাসনা বা ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গ নহেন। ইহাঁর যোগে ব্রহ্মোপাসনা হয় না। কেননা ইনি ক্রিয়ারূপিণী, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা ক্রিয়াধর্ম্মবতী নহে। অতঃপর ইনি রূপ চান, কিন্তু ব্রহ্মের রূপ নাই। ইনি গুণ চান, ব্রহ্মের গুণ নাই। ইনি নামগান ভাল বাসেন, কিন্তু ব্রহ্মের নাম নাই। ইনি মনোবৃত্তি, কিন্তু ব্রহ্ম মনোবুদ্ধ্যাদির অতীত।

(১৪) গীতার প্রাগুক্ত ভক্তিযোগাধ্যায়ের অবশিষ্ট আটটি শ্লোক জ্ঞাননিষ্ঠা-প্রকরণস্থ। এবং ২০ শ্লোকে যে 'পরমাভক্তাঃ' শব্দ আছে, তাহার অর্থ 'পরমার্থ-জ্ঞানযুক্তা'। "মৎপরমা মদ্ভক্তাশ্চ উত্তমাস্পরমার্থজ্ঞানলক্ষণাং ভক্তিমাশ্রিতাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ। প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমিতি।" পরমার্থজ্ঞানলক্ষণা ভক্তিকে আশ্রয় পূর্ব্বক যাঁহারা আমার "পরমভক্ত" অর্থাৎ "জ্ঞানী" তাঁহারা আমার অতীব প্রিয়। এই যে জ্ঞানলক্ষণাভক্তি ইনি ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান মাত্র। জ্ঞানী, ভগবান্‌কে আত্মস্বরূপে গ্রহণ করায়, তিনি অতীব প্রিয়। এই ভক্তি ভগবানের রূপগুণনামাদিনিষ্ঠা নহেন। ইনি ভগবানেতে স্বনিষ্ঠা। সুতরাং ইনি প্রাগুক্ত-প্রকার কর্ম্মেতে সমুচ্চিত নহেন। পরন্তু ইহাঁর অধিকারে কর্ম্মানুষ্ঠান (optional) করা না করা জ্ঞানীর ইচ্ছাধীন। কোন্ আশ্রমী জ্ঞানীর ইচ্ছাধীন, তাহা পরে বলিব।

(১৫) অতঃপর উপরিউক্ত ভক্তি-যোগাধ্যায়ের ৭ শ্লোকে যে কহিয়াছেন, "যিনি সর্ব্বকর্ম্ম আমাকে অর্পণপূর্ব্বক ধ্যানযোগে আমার অর্চ্চনা করেন, তাদৃশ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে আমি অচিরাৎ মৃত্যু-সংসারসাগর হইতে উদ্ধারকর্ত্তা হই। এতদুপলক্ষে শ্রীধর স্বামী ত্রয়োদশোধ্যায়া-রম্ভে কহিয়াছেন যথা—

(১৬) "নচ আত্মজ্ঞানং বিনা সংসারোদ্ধরণং সম্ভবতীত্যতঃ তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থং "প্রকৃতিপুরুষবিবেকাধ্যায়" আরভ্যতে। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ কর্ম্মযোগী ভক্তদিগের প্রতি কৃপা করিয়া সংসারোদ্ধারের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ক্রিয়ালক্ষণাভক্তি, তাঁহাদের উপাস্য ইষ্ট-দেবতার রূপ, নাম ও গুণ নিষ্ঠা। তাঁহারা ভগবানকে নির্গুণ, অরূপ, অব্যয়, নামহীন আত্মভাবে গ্রহণে অশক্ত, ফলে আত্মজ্ঞান বিনা সংসার হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। এজন্য তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থ "প্রকৃতি-পুরুষবিবেক-যোগ" নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় আরম্ভ করিলেন। ক্রিয়ালক্ষণা রূপনামাদি-নিষ্ঠ ভক্তির সাক্ষাৎ মোক্ষদানে ক্ষমতা থাকিলে, ত্রয়োদশের অবতারণা প্রয়োজন হইত না।

৩। এতাবতা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানলক্ষণা ভক্তি জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র নহেন। আমি উপরি ভাগে বলিয়াছি যে, ইহাঁর অধিকারে কর্ম্ম করা না করা জ্ঞানীর ইচ্ছাধীন। আর পূর্ব্বে ইহাও বলিয়াছি যে, জ্ঞান আর কর্ম্মের সমুচ্চয় হয় না। ফলে এখন বলিতেছি যে, যাঁহারা ব্রহ্মসংস্থ আশ্রমত্যাগী পরম-হংস-পরিব্রাজক, কর্ম্ম করা না করা তাঁহাদেরই ইচ্ছাধীন। গৃহস্থ জ্ঞানীর পক্ষে সে নিয়ম নহে। বিশেষতঃ এই বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত ভাগ্যবান্ গৃহস্থ আপনাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা প্রায়ই আদ্রকের ব্যাপারী। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ জাহাজের খবর লওয়া তাঁহাদের পক্ষে শোভা পায় না। অবশ্য ব্রহ্মাবস্থা শিক্ষা করায় কোন আপত্তি নাই। বরং তদ্দ্বারা তাঁহাদের অশেষ কল্যাণ হইবে। কিন্তু সেই ছল অবলম্বন পূর্ব্বক, অথবা চিত্তবিক্ষেপের ভয় উল্লেখ করিয়া, এবং পক্ষান্তরে ক্রিয়ালক্ষণা ভক্তির ভক্তগণ, ভক্তির ভাবে মগ্ন হইয়া যে, আশ্রম ও কুলাচার বিহিত নিত্যনৈমিত্তিক ও দেব-সেবাদি ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবেন ধর্ম্ম—শাস্ত্রের এমন উদ্দেশ্য নহে এবং তাহা শিষ্টাচারও নহে।

ভাবিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, যাঁহারা স্বভাবতঃ অথবা পাশ্চাত্য-বিদ্যা-সম্পাপ্ত বুদ্ধি-বশতঃ ক্রিয়া-বিদ্বেষী তাঁহারাই ভক্তি অথবা জ্ঞানের ভান করিয়া ক্রিয়াত্যাগে উদ্যত, এবং স্বপক্ষসমর্থনার্থ অসঙ্গত প্রমাণ সমূহের উত্থাপক। কিন্তু হিন্দুসমাজস্থ ভক্ত ও জ্ঞানীগণ সেরূপ চঞ্চল নহেন। ক্রিয়া-ত্যাগেচ্ছুগণ আপনাদের যুক্তির পোষকতা জন্য গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য প্রভৃতি" যে বচনটীর উদাহরণ দেন, সেটী বরং কর্ম্মযোগেরই পোষক।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

সমাজসংস্কারের চেষ্টা।

নানাজাতির সংসর্গে, নানাশিক্ষালাভের সুযোগে, প্রধানতঃ ভারতে ব্রিটিশরাজত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশে একটা স্বাধীনচিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহারই ফলে আধুনিক-ভাবে সমাজসংস্কারের চর্চা, চিন্তা ও চেষ্টার উৎপত্তি হইয়াছে, বলিলে বোধ হয় সত্যের অপলাপ করা হয় না। পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রসারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারচেষ্টাও তীব্রতা লাভ করিতেছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

যাঁহারা সমাজসংস্কারের চেষ্টাকে সমাজ-সংহারের আয়োজন মনে করেন, আর স্বাধীন-চিন্তাকে উচ্ছৃঙ্খল "খেয়াল" বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদেরও বোধ হয় ইহা অপরিজ্ঞাত নয় যে, সুদৃঢ় বিধানরজ্জুর অকোমল বন্ধনে দীর্ঘ—সুদীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকিয়া সমাজ শক্তি-হীন স্পন্দহীন প্রাণহীন হইতে চলিয়াছিল! সাঁড়াশব্দ ছিল না। চিন্তাচালনার অভ্যাস রুদ্ধপ্রায় হওয়ায় মস্তিষ্কের চিন্তাকেন্দ্র প্রায় পক্ষাঘাতরোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল! সমাঙ্গ-ব্যাপিনী জড়তা দেখা দিয়াছিল! দেশের বক্ষে মলীমস বিষাদচ্ছায়া বিস্তৃত হইতেছিল!

আর এখন সমাজ নবস্পন্দন লাভ করিতেছে,—সাড়া দিতেছে, চিন্তার দ্বার খুলিয়া গিয়াছে, জড়ভাব—অবসাদ যেন একটু অন্তভাব ধারণ করিয়াছে। যিনি এই স্পন্দনকে মুমূর্ষু রোগীর মৃত্যুনাড়ীস্পন্দন মনে করেন, যিনি এই সাড়াকে নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের প্রজ্বলন বলিয়া ভাবেন, যিনি উন্মুক্ত উচ্ছৃঙ্খল স্রোতকে সুখশান্তি ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বিপ্লাবক বলেন, যিনি এই উত্থানকে পক্ষধারি-পিপীলিকার নভোবিহারের সহিত তুলনীয় বলিয়া বিশ্বাস করেন, তিনিও কি ইহার অস্তিত্বে—আবির্ভাবে সন্দেহ করিতে পারেন? সুতরাং প্রত্যক্ষপরিদৃষ্ট মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল এই পরিবর্ত্তন—এই স্পন্দন—এই সংস্কারচেষ্টা কিছুই নহে, বলা চলে না।

যেমন আমরা এই নবাগত অতিথির উপস্থিতি অস্বীকার করিতে পারিতেছি না, তেমনি ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারাও সম্ভব নয়। ইহা যদি ভস্মে ঘৃতাহুতিদানের মত নিষ্ফল হয়, তবে এই নিরর্থক আয়োজনে শক্তি ব্যয় করা অসঙ্গত, আর যদি ইহার কিছু ফল থাকে, তবে তাহা ইষ্টকর কি অনিষ্টকর—তাহাই দেখিতে হইবে।

অনেক ব্যক্তি বলেন,—"সংস্কারকগণের চেষ্টায় প্রকৃতপক্ষে কিছুই হইতে পারে না, কারণ হিন্দুসমাজ এমন দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত যে, সংস্কারকের ক্ষুদ্র চেষ্টায় ইহা একটু কম্পিত হইলেও স্থানচ্যুত হইবে না। বহু-বার বহুতরঙ্গ এই সমাজ বুকপাতিয়া লইয়াছে, কিন্তু পরিবর্ত্তিত হয় নাই, তরঙ্গগুলিই কালে জলের কোলে মাথা রাখিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজ প্রলয়ের প্রবলপ্লাবন, ভীষণ ভূমিকম্প, সঙ্কর্ষণাগ্নির জ্বালামালা, কোটি ঝঞ্ঝাবাত, অসংখ্য বজ্রাঘাত সহ্য করিয়াও বিদ্যমান আছে। সংস্কারকের কার্য্য বিদ্যুৎ-স্ফুরণের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, তাহাতে হিন্দুসমাজ কিয়ৎকালের জন্য ক্ষুব্ধ হয় বটে, কিন্তু পরে আবার যেমন-তেমনি হইয়া যায়। ঋষিরা এমন করিয়াই ইহা গড়িয়া গিয়াছেন যে, বিপ্লব, অন্যায় সংস্কার, অশাস্ত্রীয় পরিবর্ত্তন সহ্য করিয়াও ইহা দীর্ঘকাল নিজের ভাবে দাঁড়াইতে পারে।

ভগবান্ যুগে যুগে ধর্ম্মসমাজরক্ষার্থে জন্ম-গ্রহণ করেন। প্রয়োজন হইলেই তিনি আসিয়া হিন্দুসমাজ রক্ষা করিয়া থাকেন। বৌদ্ধধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া বর্ণাশ্রমবিচার তুলিয়া দিয়াছিল, সমগ্রভারত বৌদ্ধধর্ম্মের নীতিপ্লাবনে প্লাবিত হইয়াছিল, বহুকষ্টে বর্ণা-শ্রমধর্ম্ম কায়ক্লেশে আত্মরক্ষা করিতেছিল, তারপর আবার যখন কুমারীলের কঠোর কর্কশ তর্ক-কষাঘাতে বৌদ্ধভাব ব্যথিত হইয়া পড়িল, শঙ্করাবতার শঙ্করের শৃঙ্গনাদে বৌদ্ধ-ভাব স্তম্ভিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, উদ-য়নের উদীয়মান অভ্যুদয়-রবিরশ্মিপাতে শূন্যবাদের কুহেলিকা ভারত পরিত্যাগ করিয়া দিগ্‌দিগন্তে প্রস্থান করিল, তখন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। বুদ্ধি-প্রসূত বৌদ্ধসংস্কার বিচ্ছিন্নমেঘলেখার ন্যায় আপ্তমূলক বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের উপর ২। ৪ বিন্দু জল বর্ষণ করিয়া দূরলোকে অদৃশ্য হইল। এইত সংস্কারের পরিণাম! সংস্কার ধীরস্থির সাগরে আবর্ত্ত উৎপাদন করে বটে, কিন্তু পরক্ষণে নিজেই নীরধি-নীরে বিলীন হয়। সুতরাং শাস্ত্রানুমত সংস্কার ব্যতীত বুদ্ধিপ্রসূত কোনও সংস্কারই হিন্দুসমাজে দাঁড়াইতে পারে না।"

আর একদল বলেন—সংস্কার অমর, উহা সম্পূর্ণরূপে সফল নাও হইতে পারে, কিন্তু উহা সমাজ-শরীরে এমন এক একটী দাগ রাখিয়া যায়, যাহা পরবর্ত্তিকালে সমাজশরীরের বর্ণপরিবর্ত্তনের অসাধারণ কারণ হইয়া পড়ে। আপাততঃ সংস্কারের ফল দুর্লক্ষ্য হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যতঃ উহার ফল দীর্ঘকালের পর সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এজগতে এমন সংস্কার আসে নাই বা আসিবে না, যাহা দ্বারা কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন না হইয়া পারিয়াছে বা পারিবে!

ঐ যে বৌদ্ধসংস্কারের কথা বলা হইতেছে, তাহাও নীরবে মরিয়া যায় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের পর যে সকল হিন্দুশাস্ত্র সঙ্কলিত হইয়াছে, সে গুলির পংক্তিতে পংক্তিতে বৌদ্ধভাবের প্রভাব দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যাহারা নিতান্ত অন্ধ, তাহারাই ইহা দেখিতে পায় না, অবশিষ্ট সকলচক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারেন। পঞ্চদশকোটির অধিক বৌদ্ধ হিন্দুসমাজের জঠরে পরিপাক হইয়াছে; ইহার কি রসরুধিরাদি-পরিণতি আদৌ হয় নাই? অগত্যা উদরাময়জনিত স্বাস্থ্যহানিও ত হইবে! "কিছুই আসে যায় নাই" এ ত বাতুলের প্রলাপ!

বৈদিক বৈধহিংসাকে হিন্দুসমাজ পূর্ব্ববৎ শ্রদ্ধার চক্ষুতে দর্শন করে না, ইহা ত বৌদ্ধ-সংসর্গের ফল! নবীন বৈষ্ণবধর্ম্মের বীজ যে বৌদ্ধধর্ম্মের বৃক্ষ হইতেই সংগৃহীত, এ কথা অস্বীকার করিলে সত্যপরতার প্রতি অবিচার করা হয়। হিন্দুর মহাতীর্থ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে অন্নবিচার নাই; বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এখানে কত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে, আর কত দুর্ব্বলহস্তে শক্তিশালি বৌদ্ধধর্ম্মের-সবল-হস্ত ধারণ করিয়া মিত্রতা প্রচার করিতেছে, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের অপরিজ্ঞাত নহে! বৈদিক সংহিতাগ্রন্থে, সূত্রগ্রন্থে, ইহার পরিচয় আছে কি? বিবর্দ্ধমান পুরাণের কুক্ষিতে এই মৈত্রী-নিদর্শন লিপীবদ্ধ করিয়া কি হিন্দুসমাজ ও হিন্দুশাস্ত্র আপনার দুর্ব্বলতা—বৌদ্ধভাবানুপ্রাণিততা প্রচার করিতেছে না?

বুদ্ধের অবতারত্বে কাহারও আপত্তি আছে কি? অনেক ব্যক্তি বুঝিয়া শুনিয়াও মনঃক্ষোভ নিবারণের জন্য শ্রীক্ষেত্রের দারুব্রহ্মকেই বুদ্ধাবতার বলিয়া প্রচার করেন, কিন্তু তাঁহারা ত জানেন যে—কাষ্ঠব্রহ্ম বুদ্ধ নহেন। তাঁহাদের সেই পুরাণ শাস্ত্রই ত তাঁহাদিগকে শুনাইয়াছে, "বুদ্ধোনাম্নাজিনসুতঃকীটকেষু ভবিষ্যতি।"

হিন্দুসমাজ যে বৌদ্ধভাবে কতদূর অনুপ্রাণিত, তাহার অসংখ্য প্রমাণ ভারতবর্ষের নানাস্থানে বেশ পরিস্ফুট রহিয়াছে। বৈদিক-যুগে যজ্ঞস্থানে চৈত্যভূমির প্রসঙ্গ দেখা যায় না; সমগ্র কর্ম্মমীমাংসায় চৈত্যের প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু মহাভারতে বড় বড় যাজ্ঞিক রাজগণের প্রশংসাস্থলে দেখা যায়, তাঁহাদের সৎকর্ম্মের দৃষ্টান্ত—"চৈত্যযূপাঙ্কিতমেদিনী" বলি, ইহাতেও কি হিন্দুসমাজের কিছু পরিবর্ত্তন স্বীকার করা যায় না? বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুসমাজকে জনহিতকর কার্য্য শিক্ষা দিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

নবীন বৈষ্ণবধর্ম্মের বিষয়ে আলোচনা করিলেও দেখা যায়, সংস্কার-ফলে সমাজ বেশ বদলাইয়া গিয়াছে। চৈতন্যদেব যখন প্রাদুর্ভূত হন, তখন স্মৃতিশাস্ত্রের বন্ধনে সমাজের

আটঘাট বাঁধা ছিল। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত দূরে, যোষিৎ-প্রচলিত ব্রতের ফর্দ্দ ও সত্যপীরের মহিমা লিখিয়াই পণ্ডিতগণ ক্লান্ত! সে সময় চৈতন্যদেব ভক্তির স্রোতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া সর্ব্বজাতির মধ্যে ভেকাশ্রিত সন্ন্যাস প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসময়ে প্রতিবাদী বহু ছিল; তাঁহার নিন্দা করা এক শ্রেণীর লোকের ব্যবসায় ছিল, কিন্তু উড়িষ্যা হইতে জয়পুর পর্য্যন্ত চৈতন্যের প্রেমে বিভোর হইয়া, বেদস্মৃতি জলে ভাসাইয়া দিয়া, কীর্ত্তনানন্দে মাতিয়া ছিল! যে ব্যক্তি স্মৃতিমতে অস্পৃশ্য—অনাচরণীয়, যাহার জলস্পর্শ বা ছায়াস্পর্শ করিলেও স্মৃতি-মতে পাপ হয়, সেও ত শ্রীচৈতন্যের প্রেমের পতাকা-নিম্নে আশ্রয় লইয়া উচ্চবর্ণের পার্শ্বে বসিবার অধিকার পাইয়াছে! কৈ হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে ত ত্যাগ করে নাই! আস্তে আস্তে তাহারা হিন্দুর গৃহে বেশ আদৃত হইতেছে। স্মৃতিশাসিত বর্ণাশ্রমিসমাজে বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধাচার-সম্পন্ন সম্প্রদায়ের স্থান ও সম্মান হইল কেন? হিন্দুসমাজের উপর শ্রীচৈতন্যদেবের সংস্কারই কি ইহার মূল নয়?

আজ নমঃশূদ্র, জালিককৈবর্ত্ত, ধোবা, কাওরা, বাগ্দী, বুনো, ভেক লইয়া 'বৈষ্ণব' হইতেছে, আর সমাজের প্রায় সকলেই তাহাদের "গোঁসাই" বলিয়া আদর করিতেছেন, নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়া দক্ষিণা দিতেছেন, কেহ কেহ বা প্রণামও করিতেছেন! যাঁহারা বাল্যাবধি একত্র বাস করায় তাহাদিগকে চিনিতেন এবং বর্ণাশ্রমাভিমানে ঘৃণা করিতেন, তাঁহারাই সময় সময় এই সকল "গোঁসাই-বাবাজীদিগকে" দেখিলে নাসিকা কুঞ্চিত করেন, সেও অনেকটা অভ্যাস-দোষে! বৈষ্ণবের জল পশ্চিম-বঙ্গের অধিকাংশস্থলেই চলে। এসকল কি স্মৃতিদ্বারা সমর্থিত হইতে পারে? বৌদ্ধযুগে যেমন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের প্রায় তুল্যাধিকার ছিল, অধুনাও ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের অধিকার সেই রূপ। অধিকন্তু "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।" এই সিদ্ধান্তটুকু বর্ণাশ্রমাভিমানের শীর্ষে বজ্রের ন্যায় পতিত! জানিনা, ইহা-পেক্ষা আর বেশী কি পরিবর্ত্তন প্রয়োজন!

নানক, কবীর ও দাদু প্রভৃতির সংস্কারের ফল তত্তৎপ্রদেশের সমাজে সুন্দররূপে উপলব্ধি করা যায়।

উত্তরপশ্চিমের নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের গৃহেও কাম্য "মহরম্" হইয়া থাকে। পুত্রাদির প্রবল পীড়ার সময় ঐ প্রদেশের হিন্দুমাতা যেমন বিষ্ণুপূজা মানস করে, তদ্রূপ "মহরম্" ও মানিয়া থাকে। শুধু কথায় নয়, কার্য্যেও করে। বঙ্গের বহুস্থলে মুসলমানেরা গ্রাম্যপূজায় চাঁদা দেয়। হরিতলা বা কালীবাড়ীতে দুগ্ধ, মিষ্ট, ফল ও সময়বিশেষে ছাগশিশু মানসিক শোধ করিয়া যায়। বঙ্গে মুসলমানের নাম গোপাল, কানাই, কমল প্রভৃতি, আর উত্তর-পশ্চিমে ব্রাহ্মণের নাম ও "মহম্মদ গোবর্দ্ধন" হইতে পারে। সংসর্গ-মাত্রেই যখন এতদূর দাঁড়ায়, তখন সংস্কারের ফলে দীর্ঘকালে প্রবল পরিবর্ত্তন হইতে পারে, ইহা না মানিলে অন্ধতা প্রকাশ পায়।

অত্যল্পকাল মধ্যে হিন্দুসমাজের যে কয়টী শাখাসম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়াছে তাহারাও অল্পবিস্তর সমাজ-সংস্কারে চেষ্টা করিয়াছে, হিন্দুসমাজ তাহার ফলভোগ করিতেছে

ব্রাহ্মধর্ম্ম জাতিভেদের আদর করে না, সাকারোপাসনার কর্ত্তব্যতা স্বীকার করে না, বাল্য-বিবাহ বিধবা-বিবাহ প্রচার করে। এই অত্যল্পকাল মধ্যেই কি হিন্দুসমাজের সর্ব্বাঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব অনুভূত হইতেছে না? কথায় অনেক হিন্দু জাতিভেদ মানেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ সহরে বা বর্দ্ধিষ্ণুসমাজে স্মৃতি-শাস্ত্রের জাতিভেদ নাই বলিলেই চলে। যাঁহারা এই কথা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের জন্য প্রয়োজন হইলে বাক্যান্তরে আমরা লক্ষ্যস্থল-গুলির উল্লেখ করিব। অনেকে সাকারোপাসনার যুক্তির আলোচনা করেন, কিন্তু কার্য্যতঃ গৃহস্থিত প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের প্রাণ-বাঁচান কঠিন হইয়াছে! অনেকগুলি গঙ্গায় নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছেন। অনেকগুলিকে কালীবাড়ী, রঘুনাথের বাড়ী প্রভৃতি স্থানে ফেলাইয়া গৃহস্বামী নিশ্চিন্তে পানগোষ্ঠীর শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন। দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা, রাস, রথ প্রভৃতি বিরলতর হইতে চলিয়াছে। এ সব কি ব্রাহ্মভাবের অলক্ষ্য-বিকাশ নহে? বালিকার বিবাহ দিতে সহজে কেহ স্বীকার করে না, ততোধিক শিক্ষিত বর বালিকাকে বিবাহ করিতে চায় না। বিধবা-বিবাহে ত অনেকেরই সম্মতি, তবে অবস্থার ভাবনায় অনেকে সে ব্যবস্থা লইতে পারেন না।

হিন্দুসমাজে সংস্কারের প্রভাব এত বেশী হইয়াছে যে, এখন বুঝা যাইতেছে না, ইহার কোন্‌টুকু পুরাতন অংশ, আর কোন্‌টুকুই বা পরবর্ত্তি-সংস্কার! বৈদিকযুগ, স্মার্ত্তযুগ, তান্ত্রিক-যুগ—একই ব্যাপারের সম্বন্ধে কেমন বিসদৃশ সিদ্ধান্ত বহন করে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। বৈদিকগ্রন্থ যজ্ঞকর্ম্মে সুরাগ্রহ-গ্রহণ সমর্থিত হইয়াছে। তখন সৌত্রামণীযাগে সুরা-গ্রহ গৃহীত হইত। শুধু তাহাই নয়, দেব-পীতাবশিষ্টের গ্রহণও প্রচলিত ছিল। স্মার্ত্ত-যুগে সুরাস্পর্শে পাপ হয়, সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত মরণ। আবার তান্ত্রিকযুগে পঞ্চ'ম'কারের মধ্যে মদ্যের স্থান কিরূপ, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দুর্লভ নয়! কোন্‌টা হিন্দুর নিজস্ব? শাস্ত্রজ্ঞ রক্ষণশীল বলিবেন "সবই নিজস্ব, সকলের সামঞ্জস্য আছে।" এ কথায় উত্তর "শাস্ত্রের স্বারসিক মর্ম্ম লইলে দুকুল-রক্ষা হয় না। ভিন্ন ভিন্ন দুইজনের কথায় একবাক্যতা বা সমন্বয় করিতে গেলে বহুস্থলে পূর্ব্বাপর-বিরোধ ঘটে।"

যদি ঐ দৃষ্টান্তটী একান্তই ত্যাগ করিতে হয়, তবে পুরাকালের স্বেচ্ছারতি, স্মার্ত্তযুগের পরপুরুষ দর্শনে পাপোৎপত্তি ও তান্ত্রিকযুগের শক্তিজ্ঞানে যত্রতত্র বিহার—বিভিন্ন সময়ের এই অবস্থানিচয় দৃষ্টান্ত-স্বরূপে বলা যাইতে পারে। শাস্ত্রই ঐ সকল আচার ভিন্নসময়ে ভিন্ন-কারণে প্রবর্ত্তিত ও নিরাকৃত হইয়াছে, এ কথায় সাক্ষ্য দিতেছেন। ঐ সকল পরি-বর্ত্তন যে সংস্কারমূলক তাহাও শাস্ত্রেই আছে; সুতরাং কোন্‌টা ঋষির গঠিত সমাজ, তাহা বুঝা যায় না। বৈদিক সময় হইতে এ পর্য্যন্ত বহুবার 'খোল' ও 'নলিচা' দুইই বদ্‌লান হইয়াছে, এ অবস্থায়ও যদি কেহ বলিতে চাহেন 'সেই হুকাটী'ই আছে, তাঁহাকে মনঃকষ্ট দিবার কোনও কারণ দেখি না। তিনি শান্তিতে বাস করুন, সংস্কার চলিতে থাকু।"

আমরা বলি, সংস্কার ফলপ্রদ। শাস্ত্রানু-গত হিতকর সংস্কার চাই। সাময়িক আচার-ব্যবহার-পরিবর্ত্তনেও যাহাতে মূললক্ষ্য সরিয়া

না যায়, সেইরূপ হইলেই হিন্দুসমাজ বলিব। খোঁসীর কিছু নাই, অসলে ব্যতিক্রম না হয়, এইরূপ সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা চাই। বারান্তরে এ বিষয়ে আরও বলিব।

শ্রীঃ——ভারতী

প্রতাপকাটী, যশোহর।

চিন্তারহস্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আদিকালে এই সৃষ্টিরক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি মানসপুত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ঊর্দ্ধরেতা; পিতার কথা অবধান না করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা ক্রোধে অধীর হইয়া দ্বিতীয় প্রকরণে এই যাহা কিছু—সৃষ্টি করিয়া প্রলয়ের পথে ছাড়িয়া দিলেন, সুতরাং তাঁহার নিদান তাঁহারই হস্তে নিবেশিত। বাইবেলোক্ত আদমের ভাগ্য এইসূত্রে সংজড়িত। পুরাকালের ধর্ম্মবিজ্ঞান কি সুন্দররূপে এস্থানে সংমিলিত, ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইতে হয়। এখন কথা হইতেছে, ইহা ধর্ম্ম কি কর্ম্ম? পারত্রিকের কথা লইয়া প্রশ্ন উঠিলে, সে কথার মীমাংসা মানুষে করিতে পারিল না; সুতরাং কর্ম্মের স্রোত ধরিয়া দেখিতে হইবে, তাহার পরিণাম কোথায়? আদিকাল হইতে মনুষ্য জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইতে ব্যগ্র, তাহা দেখিয়াই সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর ক্রোধ করিয়া তাহাকে স্বর্গচ্যুত (জ্ঞানচ্যুত) করিলেন, পিতৃসম্পত্তিহীন পুত্র যেমন হাহাকার করিয়া বেড়ায়, তাহার পর পেটের দায়ে পাগল হইয়া সে যেমন কোনপ্রকারে দিনকাটাইতে চেষ্টা করে এস্থলেও ঠিক সেইরূপ হইয়াছে! কোথা হইতে আসিয়াছে, কেন আসিয়াছে, এবং কোথায় যাইবে, তাহার কিছুই না জানিয়া, পান্থনিবাসে পথিক যেমন কাল কাটায়, এখানেও তাহারা তাহাই করিয়া থাকিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, তাহার সাধন উপলক্ষে যাহাকিছু করে, তাহাকেই তাহাদের কর্ম্ম বা ধর্ম্ম বলা যায়। সেই কর্ম্ম-নীতি-ও শান্তিমূলক বলিয়া তাহারা তাহাকে "ধর্ম্ম" ও বলিয়া থাকে। কিন্তু তাহা যখন সার্ব্বভৌম হইতে পারে না, তখন তাহা যে কেমন করিয়া ঈশ্বরবাক্য হইবে, তাহা বুঝা যায় না; সুতরাং মানিয়া লইতে হইবে, ইহার উপকারিতা দেশভেদে, কালভেদে এবং পাত্রভেদে বিভিন্নতর। ইহার সামঞ্জস্য রক্ষাকরিয়া যাঁহারা প্রেম ও পরমার্থ লাভ করিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা সমাজমধ্যে ধন্যবাদার্হ হইতে পারেন, কিন্তু স্রষ্টার নিকটে তাঁহারা তাঁহার অবাধ্য মানসপুত্রদিগের সহচর অনুচর বৈ আর কিছুই নহেন। নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, তাহার (মনুষ্য-বিশ্বাসের) শক্তি যাহাদ্বারা সমর্থিত হইয়া এই বিশ্বাসমহীরুহ প্রকাণ্ডকাণ্ডযোগে গগনভেদ করিয়া দাঁড়াইতেছে, তাহা বর্দ্ধিত হইয়া মহাকালে বিলীন হইয়া যাইতেছে। ইহাতে সে পারত্রিকের পথও কোথাও দেখিতে পাইবে না। তবে এ অনর্থ কেন?

এখন দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সহজ হইবে। "তবে তাহা কিরূপে কোন সময়ের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া, কোন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এই অবাধব্যবসায় চালাইতেছে ?" মানুষ মহেশ্বর হইতে যে সকল মানসিক বৃত্তি লাভ করিয়াছিল, তাহার পরিচালন করিতে গিয়া তাঁহার প্রতি নির্ভরের ভাব ভুলিয়া গেল ; তাই তাঁহার (Design) অভিপ্রায় কি ছিল, তাহা ভাবিয়া দেখিতে পারিল না, সুতরাং এই "জগৎ" আর "আমি" লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। পশুদিগের সহিত বিবরে বাসকরিয়া সুখশান্তি লাভকরিতে পারিল না, তাহাদের নখদন্তাঘাত সহ্য করিতে পারিল না, বৃক্ষশাখার শাখামৃগ এবং ভল্লুকদিগের উৎপাতে উৎপীড়িত হইয়া, তাহাদের অনুকরণে দলবদ্ধ হইতে শিক্ষা করিল, মঞ্চ-প্রাচীর এই সময়ের আত্মরক্ষার স্থান। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে ইতিপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি যদিও এইভাবে তাহারা জীবনযাপন করিত, কিন্তু মধ্যে মধ্যে পীড়া, জরা এবং মৃত্যু আসিয়া মহাক্লেশ দিল, তাহাতেই চৈতন্য লোপ হইল এ অবস্থা হয় কেন ? ইহারা মরিয়া গেল কেন ? কেহ তাহার কিছুই জবাব দিতে পারিল না, কিন্তু, তাহা না জানিলেও নয়। যাহারা স্নেহ, প্রেম ও ভক্তির আস্পদ ছিল, তাহারা কোথায় গেল ? এ মৃত শরীরও, আর কোন কথাই কহে না, জীবিতকালের ন্যায় উঠিয়া বসিয়া স্নেহ-প্রেম-ভক্তিতে সম্ভাষণ করে না। শব সম্মুখীন হইলে কাহাকেও আর কোন বাধাই দেয় না, তবে এ কি হইল, ? "কই, কি হইল" রবই সকলকে জাগাইয়া তুলিল। পশুপক্ষীর মৃতদেহ যথা-তথা পড়িয়া থাকে, প্রাণের পুত্তলী প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্র-কন্যার, কি ভক্তির আধার মাতা-পিতার প্রেমপ্রতিমা প্রিয়তমার, কি বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনের মৃতদেহ কি সে প্রকারে যথা-তথা পড়িয়া থাকিতে পারে ? তাই এই নিদারুণ দৃশ্য অপসারিত করিবার জন্য, ভূগর্ভে নিহিত বা চিতানলে দহন করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। পৃথিবী তাহার অস্থি-মাংস জর্জ্জরিত করিল, হুতাশন তাহাকে হতসর্ব্বস্ব করিয়া ধূমাকারে পরিণত করত ঊর্দ্ধপথে লইয়া গেল ইহাতেই ঊর্দ্ধপথের সংবাদ লইবার প্রয়োজন হইল। উপরে ঐ নক্ষত্রখচিত উজ্জ্বলতর বিকাশী বস্তু উহারা কে ? নিকটতর চন্দ্রসূর্য্যের সম্বন্ধের সহিত উহারাও পরিচিত হইয়া উঠিল। স্নেহ-প্রেম-ভক্তির আস্বাদ কি বিলুপ্ত হইতে পারে ? কদাচ নহে, তবে উহারা ঐ স্থানেই গিয়াছে, এই স্থিরনিশ্চয়ে স্বর্গ নরকের সৃষ্টি হইল। সেই সুখদুঃখের স্থান, ইহা অপেক্ষাও সুখদুঃখময় ; তাহাই হইবে। তবে আমরা যে ভাবে আছি, তাহাতে স্বর্গলাভ হইবে কি নরকে নিঃক্ষিপ্ত হইতে হইবে—এই চিন্তা প্রবলতর হইয়া উঠিলে, ন্যায় নীতি-ধর্ম্ম-কর্ম্ম অনুসৃত হইয়া গেল। এখানে ভগবানের কথা—স্রষ্টার কথা কোথাও আসিল না, আসিল কর্ম্ম-ধর্ম্ম ! কিরূপে সন্তান-লালন-পালন করিতে হয়, কিরূপে পিতা-মাতা

পরিবার-প্রতিপালনের সেবা করিতে হয়, কিরূপে দেশের মঙ্গলকামনা করিয়া জনহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইতে হয়, কিরূপে প্রজার কর্ত্তব্যসাধন করিয়া রাজার সেবা করিতে হয়, কিরূপে দীনদরিদ্রের প্রতি করুণাপরতন্ত্র হইয়া সমাজের পূর্ণাঙ্গ রক্ষা করিতে হয়, কিরূপ বিদ্যাদান, ঔষধ-পথ্যদান, সাধারণের হিতার্থ জলাশয়, রথ্যা, পান্থশালা, এবং দেবালয়-ভজনালয় নির্ম্মাণ করিতে হয়, ইহাতে যাঁহারা অনুরত, তাঁহারাই সে স্বর্গধামের অধিকারী. তাহার অত্যহিতকারিগণ অধোগামী হইয়া নরক ভোগ করে। এই ভাবে প্রণোদিত হইয়া যাহারা, সংসারে—সমাজে ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে, তাহারা ইহার মধ্যে কোথায় ঈশ্বরের ও পরলোকের সন্ধান হইল? দেবালয়ে পূজার বিধি দেখ, ভজনালয়ে ভজনার অঙ্গাঃ দেখ, সকলেই আপনার বা অন্তরঙ্গের অথবা সমাজের মঙ্গলকামনা করিয়াই ক্ষান্ত। তাহা দেখিয়া সর্ব্বকামনা-পূর্ণকারী ঈশ্বর-বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিতেছেন, হে জীব! তোমরা জন্মিবার পূর্ব্বে তোমার প্রার্থনীয় বস্তুর প্রচুর পরিমাণে আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি, তাহা কি বিশ্বসংসারে বিক্ষিপ্ত দেখিতেছ না? তবে কেন কাতরপ্রাণে তাহার জন্য এত ক্রন্দন করিতেছ? স্থির হইয়া আমার সংকল্প সিদ্ধ করিতে দেও। মানুষ তাহা শুনিতে বা বুঝিতে পারিল না, নিজ অপূর্ণ বিশ্বাসে অপূর্ণজ্ঞান ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া অপূর্ণ-বিজ্ঞান-প্রেতের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতেই যত অনিষ্ট ঘটিয়াছে।

এই প্রসঙ্গ জনসাধারণে প্রকাশিত হইয়া পড়িলে, দুই স্তুপ পড়িয়া যাইবে, তাহা জানিয়াও লোকে বলিবে, তবে এ পণ্ডশ্রম কেন? তাহার উত্তরে এই মাত্র বলিতে পারি যে, হে মানববন্ধু! তুমি তোমার উন্নতির জন্য এত ব্যাকুল হইতেছ কেন? প্রদাতার হস্তে কি আছে, একবার প্রতীক্ষা করিয়া দেখ; ধৈর্য্য কর, অকাতরে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাক। যিনি না চাহিতে ঋতুপর্য্যায়ে-হিম, শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ পাঠাইয়া সৃষ্টিপালন করিতেছেন, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় জরার মধ্যদিয়া মৃত্যুর পারে লইয়া যাইতেছেন, এখানে তাহার মধ্যে যি দিতেন, পার কি দেখাইতেন, তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে পারিলে না? অনন্তের অনন্ত ভাণ্ডারে কি আছে, তাহার তুমি কি জান? যে এত তাড়াতাড়ি করিয়া এই সকল মনঃকল্পিত ধর্ম্মগোল তুলিয়া একে আর করিয়া ফেলিতেছ। ইহার উত্তরে তুমি বলিবে, দুই-এক দিন ত নয় শত শত সহস্র সহস্র কোটি কোটি বৎসর দেখিলাম, কৈ এখানেত তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না, তাব আবার কবে দেখিব? আমি বলি, অনন্তের সঙ্গে যাহার অনন্ত সম্বন্ধ, তাহার এই ক্ষণকালের জন্য ভাবনা কি? এই মাত্র আকাশ হইতে বায়ুরূপে, বায়ু হইতে অগ্নিরূপে, অগ্নি হইতে জলরূপে, জল হইতে স্থলরূপে, স্থল হইছে জীবরূপে, উদয় হইয়া, বনস্পতির সহিত বিহার করিতেছিলে, তাহার পর জলবুদ্ধী হইয়া

স্ব স্ব স্বার্থসাধানার্থ জন্তুসমাজে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া, সে দিন মানুষ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, তাহাতে এখনো পশ্বাচার বর্ত্তমান রহিয়াছে; তখন প্রদাতার সৃষ্টিনিকেতনে আরো যে পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, তাহার তুমি কি জান? সবে সেদিন, ইন্দ্রিয়গ্রামে জ্ঞানাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বৃক্ষরূপে পরিণত হইতে দেও, তাহার শাখা-পল্লব-পত্র-পুষ্প উদ্গত হউক, শ্রেষ্ঠ-জীবের গৌরব-সৌরভ দিগ্দিগন্তে সুবাস প্রকাশ করিলে, তখন বুঝিবে, কি জন্য তোমার এই সৃষ্টিপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে।

কোন কোন শারীরতত্ত্ববিদ্ বলিয়াছেন, সমগ্রজ্ঞান এবং সমগ্রশক্তি লাভ করিবার উপযোগী শরীর এখনও আমরা প্রাপ্ত হইনাই, ইহার মধ্যেই আমরা "সবজান্তা" হইয়া বসিয়াছি। ভূতত্ত্ববিদেরা কহেন, বহুদূর ভূগর্ভে, যে সকল জীবের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের অস্তিত্ব এ জগতে আর দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহারাই বর্ত্তমান জগতের পূর্ব্বপুরুষ। কোন ভবিষ্যত কালে আমাদের কঙ্কালও সেই শ্রেণীভুক্ত হইবে। তখন মানুষের এই আকার থাকিবে কে বলিল? অনন্তের হস্তে অনন্তলীলা বর্ত্তমান, এযে তাহার প্রভাত নয়, কে তাহা বলিতে পারে? ঐ যে হিরন্ময়, হীরকময় আকর দেখিতেছ, উহা কত নিম্নে এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। উহার এক এক খণ্ড পাইয়া তোমরা উল্লাসে আটখানা হইতেছে. তাহা দ্বারা রাজমুকুটের শোভা সম্পাদন করিবার জন্য দৌড়িতেছ, এমন দিন আসিবে, যখন দেখিবে, তোমার সম্মুখে তাহারা পর্ব্বত প্রমাণ হইয়া উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হইয়া, নয়নমনবিমোহনকারী হইয়া রহিয়াছে। কাশ্মীর-ভ্রমণকালে দেখিয়াছিলাম, জঙ্গলের মধ্যে মধুরসে পূর্ণ ফলের বাগান। সুপক্ক ফলসকল বৃন্তচ্যুত হইয়া বৃক্ষমূলে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে! মানুষের কি কথা, পশুপক্ষী অবাধে তাহা খাইতেছে। কাশ্মীরের বায়সের রূপ দেখিলে চমকিত হইতে হয়। মনুষ্যের রূপমাধুরীর কথা যাহা আমার "অমরনাথে" বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বুঝিবে, খাদ্যবস্তুর সহিত শরীরাবয়বের কত নিকটতর সম্বন্ধ। কাশ্মীর স্বাস্থ্যপ্রধান স্থান, কালের বশে এখন তাহা অস্বাস্থ্যকর হইয়া দাঁড়াইতেছে, এসকল প্রকৃতির বিকৃতিলক্ষণ; তাহা দেখিয়াই বোধ হইতেছে, বর্ত্তমান মহাকালে বিলীন হইবার জন্য গা ঢালিয়া দিয়াছে। তুমি তাহাকে রক্ষা করিবে কি করিয়া? সুতরাং তোমার বিশ্বাসগত অবাধবাণিজ্য আর চলিল না!

এই জীবনসন্ধ্যার পূর্ব্বকালে, এই বিষম চিন্তা কোথা হইতে আসিল? জ্ঞান নাই, বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, সাধন নাই, তবে এই দুর্ব্বুদ্ধি কোথা হইতে উপস্থিত হইল? এই সময়ে প্রেমের পুত্তলি "প্রেম ও পরমার্থ"-প্রণেতা শ্রীমান্ গোবিন্দলালের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে বলিলেন—"অনেকেই বলে, ঈশ্বরের মনে যা আছে, তাই হবে ঈশ্বরের মনে যে কি আছে, তাহা মানবের

জ্ঞানের অগম্য বলিয়া তাঁহারা হতাশ হন, কিন্তু বল দেখি, ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ-প্রণয় থাকিলে তাঁহার মনের কথা কিরূপে জানিবে? যাহার সহিত চেনা পরিচয় নাই, সে কি হঠাৎ আসিয়া তোমার কানে কানে তাহার মনের কথা বলিয়া যাইবে? আগে তাঁহাকে জান, তাঁহার সহিত ভাব কর, তবেত তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিবে। খুব ভাব না হইলে সহসা কি কেহ কখন কাহারও কাছে মনের কথা বলিয়া থাকে?" পৃষ্ঠা ৩৬। ৩৭। আমিও তাহাই বলিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিলাম। ভাবিলাম এ সবইত আমরা করিতেছি। আমার জন্য সংসার পাতিলাম, সেই সংসারকে সুনিয়মে পরিচালন করিবার জন্য সকল সংসারীকে আগুলিয়া ধরিয়া সমাজবদ্ধ হইলাম, সকল সমাজ এক হইয়া রাজ্য স্থাপন করিলাম, এইরূপে রাজ্যে রাজ্যে মিলন রাখিয়া, পৃথিবীকে ভাগ করিয়া করায়ত্ত করিয়া লইলাম। তাহার পর বলবিক্রম অনুসারে সসাগরা ধরার আধিপত্য বিস্তার করিতে গিয়া, মতান্তরের ঝড় তুলিয়া, জগত নরশোণিতে আওটাইয়া লইলাম। তাহার পর সমর-কটাহে সেই বলবীর্য্যের মহিমামঞ্চ উত্তোলন করিয়া হামবড়া—হাম্‌বড়া—হাম্‌বড়া বলিয়া উচ্চস্বরে দামামা বাজাইতে লাগিলাম। ঈশ্বরকে পরমেশ্বর বলিতে না দিয়া, প্রজা-সাধারণের মুখ দিয়া "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" বলাইলাম। কালের কটাক্ষে তাহা সহ্য না হইলেও দুই হাত খালি দেখাইয়া চলিয়া গেলাম। তথাপি পরবর্ত্তিকালে, আমার বিয়োগে কাতর সন্তানেরা তাহা বুঝিল না; তাইত এই মানব-সমাজে এই দুর্দ্দিন চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। যিনি মাতার হৃদয়ে স্নেহ দিয়া তোমাকে পালন করিলেন, যৌবনের সীমায় উপনীত হইয়া তাহাকে ভুলিয়া গেলে। তাহার নিত্য নূতন রাগ তোমার মন-মত হইল! প্রণয়িনীর প্রেম বিলাসে মুগ্ধ হইয়া তুমি ছাড়া জগতে আর কাহাকেও দেখিতে পাইলে না! তাহার পর মাকড়সার ন্যায় আপনার জালে আপনি বদ্ধ হইয়া, সংসার-সংগ্রামে পরাভূত হইয়া তাহার দ্বারে দাস-খত লিখিয়া দিলে। তাহা দেখিয়া লোকে কত সহানুভূতি দেখাইতে আসিল। কাল তাহা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তোমাকে জরায় টানিয়া আনিয়া পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মের ফলাফল প্রত্যক্ষ দেখাইয়া ভীষণ যমদণ্ড সম্মুখে খাড়া করিয়া রাখিল! সেত কোথায় চলিয়া গেল, তথাপি তাহার পরবর্ত্তী লোকের তাহা দেখিয়া কি চৈতন্য হইল? চৈতন্য হইবে কোথা হইতে? প্রদাতার হস্ত হইতে প্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি-স্বীকার সে ত করে নাই! সে জানে, হয় তাহা তাহার পিতা-মাতা কি আত্মীয় স্বজন, নয় তাহার প্রভু ভূস্বামী তাহাকে দিয়াছেন, সে তাহার জন্য তাহাদের কাছেই কৃতজ্ঞ, তা ছাড়া পরে আবার কে আছে, কে জানে? যদি কিছু জানিয়া থাকে ত সে যমুনাদাস, গঙ্গাদাস, মথুরাদাস, বৃন্দাবনদাস, প্রয়াগদাস, অযোধ্যাদাস, অথবা মৌলাবক্স, মীরাবক্স, রসুলবক্স বা হাসনবক্স অথবা ঈশাদাস, গোলামমসী বা ঈশাচরণ অথবা

মহাবীরপ্রসাদ ঋক্ষবদাস বা শ্বেতাম্বরদাস, অথবা নারোজী, রুস্তম্‌জী, ভাউদাজী বা তাতাজী। এই দ্বিতীয় সংস্কারাবলী যে শিক্ষা ও সংস্কার দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার প্রভাব যাইবে কোথায়? সেখান হইতে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের প্রভাব বহুদিন হইল তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। এখানে তাঁহার সহিত আলাপ-প্রণয় করে কে? কেইবা তাঁহার সহিত ভাব করিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে যাইবে?

জাতব্রহ্মচারী শুকদেব দেখিলেন, পিতাব্যাস সংসার পাতিয়া, মানবসমাজের হিতার্থ ব্যাকুল, বেদ-পুরাণ-ব্যসন করিয়া বসিয়াছেন। যাগ-যজ্ঞ তাঁহার মুক্তির সোপান। তাহা দেখিয়া সেই প্রকৃতির পুত্রের বিরাগ জন্মিল, বালক শুকদেব বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া তপস্যার্থে মহারণ্যে প্রস্থান করিলেন। (পাঠক! শুকদেবের জীবনী এস্থলে স্মরণ কর, ব্যাস বহির্গত হইলে কুললনারা অবগুণ্ঠন টানিয়া দিত, আর উলঙ্গ শুকদেবকে দেখিয়া কেহই সমীহা করিত না।) তখন ত্রিকালদর্শী ভগবান্ ব্যাসদেবের চৈতন্য হইল। তাই, তখন তিনি বলিলেন—

"রূপংরূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতং
স্তত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্ বিকলতা-দোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

অর্থাৎ-তুমি রূপবিবর্জ্জিত; আমি ধ্যানে যে তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি, তুমি অখিলগুরু ও বাক্যের অতীত, আমি স্তবের দ্বারা তোমার যে সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূরীকৃত করিয়াছি; এবং তুমি সর্ব্বব্যাপী, অথচ আমি তীর্থযাত্রাদি দ্বারা তোমার যে সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করিয়াছি, হে জগদীশ! মৎকৃত এই তিনটি বিকলতা-দোষ ক্ষমা কর।

আশ্চর্য্য এই যে, এত দেখিয়া, এত শুনিয়া, এত করিয়া, তথাপি আমাদের চৈতন্য হইতেছে না, বিষয়-মদে মত্ত হইয়া আত্মহারা হইয়া প্রদাতাকে ভুলিয়া গিয়া প্রদত্ত বস্তুর প্রাপ্তির আশায় প্রকৃতিপুঞ্জের আলয় জড়বস্তুর উপাসনা করিয়া হাস্যাস্পদ হইতেছি। বুঝিতেছি না যে, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বরের কর্ম্ম এবং তাঁহারই নিয়োগে ও শক্তিতে এসমস্তই সম্পাদিত হইতেছে। এই রূপ ধারণা পূর্ণভাবে যে কর্ম্মাচরণের মূলে জাগরূক থাকে এবং যাহাতে আমি কর্ত্তা বা আমার কোন কৃতিত্ব আছে, এরূপ ধারণা আদৌ উদিত না হয়, তাহাই আমি বা আমিত্বশূন্য কর্ম্ম এবং যাহার ফলভোগে আদৌ আকাঙ্ক্ষা না থাকে, অর্থাৎ যে কর্ম্ম আত্মসুখভোগার্থ আত্মশক্তি-প্রকাশার্থ বা আত্মকীর্ত্তি স্থাপনার্থ এ ধারণা-বর্জ্জিত ভাবে কেবল ভগবানেই তাহার ফল অর্পণ পূর্ব্বক আচরিত হয়, তাহাকেই ভোগাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত কর্ম্ম বা নিষ্কামকর্ম্ম কহে। এই কর্ম্মময় জগতে এরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম কোথায়?" তাহা থাকিলে এজগৎ এতদিন কত উন্নতি করিতে পারিত। দৈবদুর্ব্বিপাক এত সংঘটিত

হইতে পারিত না। সে দিন হাইদ্রাবাদ-নগরী জল-প্লাবনে নষ্ট হইয়া গেল; মহানগরী পৌরষ বিনষ্ট হইয়া গেল। অগ্ন্যুৎপাত ভূমি-কম্প, জলপ্লাবন, বজ্রাঘাত, দুর্ভিক্ষ, মহা-মারী এত ঘন ২ হইতে পারিত না।

তবে এই দুর্জ্ঞেয় কূট প্রশ্নের মীমাংসা কে করিবে? যাঁহারা তত দূর আসিয়া ছিলেন, তাঁহারা এই স্বামিত্ব ও কৃতিত্ব পূর্ণ সংসারকে কাষ্ঠ—লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। শুকদেব বল, আর দেবর্ষি নারদ বল, সঙ্গম বল, আর জরৎকারু বল, শাক্যসিংহ বল, আর চৈতন্য বা খৃষ্ট বল, বা নানক বল. ইঁহারা সকলেই এই পথের যাত্রী। নাগরাজ বাসুকি, সমলঙ্কৃতা পূর্ণযৌবনা অপরূপ-মাধুরিসম্পন্না নিজ-কুমারী জরৎকারুকে সঙ্গে লইয়া জরৎ-কারু মুনিকে সম্প্রদান করিতে উপস্থিত হইলে, মুনিবর কহিলেন—বংশ রক্ষা করি-বার জন্য আমাদের উভয়েরই তাহা প্রয়ো-জন হইয়াছে, কিন্তু আমি তাহা যথা-পূর্ব্ব রক্ষা করিতে পারিব না, তোমার কন্যা অন্তঃসত্বা হইলেই আমি অন্তর্দ্ধান হইব, তাহার পর দারাপত্যে আমার আর কোন সম্পর্ক থাকিবে না। তাহা শুনিয়া নাগরাজ যারপর নাই দুঃখিত হইয়া, জামাতার প্রসন্নতার জন্য ধন-রত্নের সহিত অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদান করিতে চাহিলেন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তপঃপরায়ণ মুনি তাহাতে অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া নিজ ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। এ দৃষ্টান্ত কি কাহি-নীতেই আবদ্ধ থাকিবে? এত দিনে এই দুর্জ্ঞেয় কূট প্রশ্নের মীমাংসা হইল না, হইবার আর আশাও নাই। প্রকৃতি হৃদয়শূন্য হইয়া আসিতেছে, ভূমা তাই ভূপৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইতেছেন! আর রক্ষা নাই তুফান উঠিয়াছে—"আর হা'লে পানি পায় না, এখন আপন আপন দেবতার নাম লও।" আমি মহাপ্রস্থানে যাত্রা করি। হরিবোল হরি—সব—গেল—সব ফুরাল!

হে অনন্ত দেব! হে আদ্যাশক্তি—নারায়ণি! হে স্রষ্টা-পাতা-বিধাতা! হে কারুণিক! এ কি দেখিতেছি, এ কি করি-তেছ? এই সমস্ত জগৎ যখন তোমার কারণশক্তিতে নিহিত ছিল, তখন দিগন্ত ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন; সেই অন্ধকারই আমাদের পুরাণোক্ত বৃত্রাসুর, তাহাকে ধ্বংস না করিতে পারিলে ত, অব্যক্ত সৃষ্টি ব্যক্ত হইতে পারে না; তাই দেখিতে পাই, তোমার ঐ কারণ-শক্তি করালী কালিকা-রূপ ধারণ করিয়া বৃত্রবধে কৃপাণ-হস্তে দণ্ডায়মানা হইয়া যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, হিন্দুজগতের সম্মুখে সে দৃশ্য অদ্যাপি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। করালবদনী রক্তদন্তা কালী লোলজিহ্বা হইয়া, দিগন্ত গ্রাসকরিতে আরম্ভ করিলে, শান্তিময় শিব আর স্থির থাকিতে পারি-লেন না; তখন ভূমিতলে শয়ন করিয়া কালীর ক্রোধ সম্বরণ করিতে ধ্যানস্থ হইলেন। তখন মহামায়া কৃপাণ-হস্তে নৃত্য করিতেছিলেন; পায়ে পায় পাদক্ষেপ করিতে করিতে শিবের দেহোপরি দণ্ডায়-মানা হইয়া অবাক্ হইয়া গেলেন! সেই অবাক্কান্তি, কান্তের সেইরূপ অবস্থা

দেখিয়া লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া অন্তরীক্ষে অন্তর্হিতা হইলেন। তখন কি হইয়াছে দেখিবার জন্যই বুঝি দিগন্ত ব্যাপিয়া গ্রহ, তারা, নক্ষত্রপুঞ্জ চারিদিক্ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া শিবের অপরাভূতা শিবানী সকল (দশমহাবিদ্যার নয় মহাবিদ্যা) মণ্ডলাকারে হাত ধরাধরি করিয়া দণ্ডায়মানা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন লজ্জায় অবনতমুখী কালী সপত্নী-দিগের এবম্প্রকার ব্যঙ্গযুক্ত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, স্বামীর শরণাপন্ন হইলেন। শিব তখন কি করিতে কি করিয়া ফেলিয়াছেন দেখিয়া, ধ্যানস্থ হইয়া "একোহং বহুস্যাম" হইয়া যেরূপ দেখাইলেন, তন্ত্র তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

দশ অবতার।	দশমহাবিদ্যা।
১—মৎস্য	কালী
২—কূর্ম্ম	তারা
৩—বরাহ	ষোড়শী
৪—নৃসিংহ	ভুবনেশ্বরী
৫—বামন	ভৈরবী
৬—পরশুরাম	ছিন্নমস্তা
৭—রামচন্দ্র	ধূমাবতী
৮—বলরাম	বগলা
৯—বুদ্ধ	মাতঙ্গী
১০—কল্কি	কমলা

তখন সকলে মিলিয়া তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করিলেন; এই তাণ্ডবনৃত্যের তালে তালে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় আরম্ভ হইল। অব্যক্তের এই ব্যক্তরূপ কি শোভাই ধারণ করিল! ভাবুকভক্ত একবার চিন্তা করিয়া দেখ। ইহার বিস্তারিত বিবরণ "দশাবতার এবং দশমহাবিদ্যা" প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। এতকাল তোমার এই সকল রূপ প্রকৃতি নিজে দেখিতেছিল। মানুষ তাহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, তোমার সৃষ্টবস্তুর সহায়ে, আপনার মনের মতন নূতন সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল! তাহাতেই যত বিফলতা-দোষ সংঘটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। হে অনাথের নাথ—দীনের করুণাময়ী জননি, তোমার এ মায়া অপসারিত করিয়া আমা-দিগকে দিব্যচক্ষু প্রদান কর; আমরা তোমার মহিমার বল বুঝিতে পারিয়া, তোমার করুণার প্রতি নির্ভর করিতে শিক্ষা করি। তোমার মহিমাতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া, তোমার করুণার কিরণ না দেখিতে পাইয়া, আমরা যে মানসিক ভ্রান্তিমরীচিকায় বিভোর হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি, তাহা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। তোমার নামে আজি পর্য্যন্ত জগতে যত ধর্ম্মের সমাগম হইয়াছে তাহারাও, কেহই তোমার সংবাদ দিতে পারিল না, তাই তাহারা মরীচিকার ন্যায় অল্পকাল মধ্যে বিলয় পাইয়া যাইতেছে। তুমি দশাবতারে দশমহা-বিদ্যা সঙ্গে করিয়া যেমন দশদিক্ রক্ষা করিতেছ, আমাদিগকেও তেমনি ভ্রান্তিজাল হইতে মুক্ত করিয়া তোমার অনন্তপথের অনুগামী কর। কালিকার মানুষ আমরা, তোমার সমক্ষে দুগ্ধপোষ্য বালক। আমা-দিগকে পরীক্ষায় আনিয়া এ কি করিতেছ? যাহারা এখনো হামাগুড়ী দিতে শিখে নাই, তাহাদিগকে নিজবলে দাঁড়াইতে বলিতেছ কেন? তাইত পদে পদে পড়িয়া

যাইতেছে! হে প্রভো! হে করুণাময়ী জননি! আর আমাদিগকে পরীক্ষায় আনিও না। তুমি যে গুপ্তভাবে তোমার মহনীয় শক্তি সঙ্কোচ করিতেছ, তাহা ত জানিতে পারিতেছি! সমুদ্র শুষ্ক হইতেছে, পর্ব্বত মেঘশূন্য হইতেছে, গ্রীষ্মের তাপ প্রচণ্ড হইয়া আসিতেছে, রোগ-শোক-অকালমৃত্যু মুখব্যাদন করিয়া চারিদিক্ আগুলিয়া ধরিতেছে! ইহা সত্ত্বেও ভ্রাতায় ভ্রাতায় দ্বন্দ-বিবাদ পরিবর্দ্ধিত হইয়া পড়িতেছে। মনে শান্তি নাই, সংসারে শান্তি নাই, প্রকৃতির মধ্যে শান্তির প্রবাহ নাই; তাহারা যে দিগ্দাহ করিয়া আমাদিগকে ঝল্সাইয়া মারিতে বসিয়াছে। আমরা আর সফরীর ন্যায় এই দুইদিনের স্বল্প জীবন-জলে ফর্-ফরাইয়া বেড়াইতে পারি না। আমাদের জ্ঞানের, বলের এবং ঐশ্বর্য্যের সীমাও দেখিলাম। অপার সমুদ্রের গর্ভে নামিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে শামুকের মধ্যে মুক্তা পাইলাম, তাহার মালা পরিয়া ধন-ঐশ্বর্য্যের কত বড়াই না করিতেছি! খানকতক কাষ্ঠ-খণ্ড একত্র করিয়া অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করত অপার অর্ণবে অবতরণ এবং ভ্রমণ করিয়া কতদেশ, কত রাজ্য, কত দ্বীপ দর্শন করিয়া, বাণিজ্য বিস্তার করিয়া ধন-মান-সংগ্রহ করত বিপুল যশের অধিকারী বলিয়া অভিমানে আট্খানা হইতেছি! মেদিনীর রত্নভাণ্ডার উৎখাত করিয়া কত রত্ন উদ্ধার করত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া বসিয়াছি। জ্ঞান-বিজ্ঞানরাজ্যে-প্রবেশ করিয়া বিবিধ বিধানে তোমার মহিমা দেখিতেছি। কেহ শিল্পকলায় সুপণ্ডিত হইয়া কত কল-কৌশল দেখাইয়া জনসমাজকে চমকিত করিতেছি; কেহ, লিপিচাতুর্য্য দেখাইয়া, ভাষা-বিজ্ঞানের উন্নতি করিতেছি, কেহ অপার অনন্ত আকাশের দিকে তাকাইয়া, অনন্ত-নক্ষত্রপুঞ্জের অনন্তগতি নিরীক্ষণ করিয়া অবাক্ হইতেছি। আমাদের মধ্যে কেহ গ্রহ-উপগ্রহের গতি-বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দিন-মান ও রাত্রিমান কোন এক নির্দ্দিষ্ট-রেখায় পরিচালিত দেখিয়া জীব-জগতের ভাগ্যকোষ্ঠি লিপিবদ্ধ করিয়া ত্রিকালদর্শী বলিয়া পরিচয় দিতেছে। কেহ সূর্য্যের রেখাপাতে কালিমার চিহ্ন দেখিয়া আতঙ্কে দিশাহারা হইতেছে! কেহ মঙ্গলের মেঘ-মালা দেখিয়া অনুমান করিতেছে, তাহাও এই পৃথিবীর ন্যায় জীবপূর্ণ! যদি তাহাই হয়, তবে কেননা তাহাদের সহিত সম্পর্ক পাতান যাইবে? শনৈশ্চর এখন শূন্যগর্ভ, সেও মহাকালে বিলীন হইতে চলিল! এখন ধ্রুবতারা কোন দিকে গতি ফিরাইয়া তাহার গন্তব্য পথ স্থির করিতেছে তাহা জানিবার বিষয়। যে নিয়মে ইহারা কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইবার জন্য নীয়মান, সে নিয়ম যাঁহার হাতে, তাঁহাকে কেহই জানিতে চাহিল না! তাহারা এই অপার জ্ঞানসমুদ্রের উপকূলে বিক্ষিপ্ত অনন্ত বালুকাকণার দুই একটী কণা সঞ্চয় করিয়া, ধনী-জ্ঞানী-মানী হইয়া গর্ব্ব করিতেছে, তাহাদিগকে কি তুমি দিব্যজ্ঞান দান করিবে না? প্রভো! আর যে অজ্ঞতার অবিমৃষ্যকারিতা দেখিতে পারি না! তুমি বুঝাইয়া দাও,

আমরা কি ভাবে থাকিয়া তোমার সেই অনন্ত অপরিহার্য্য নিয়মের বশবর্ত্তী থাকিয়া, তোমার প্রীতিসাধন করিতে পারি। অভীষ্টপথে বিচরণ করিয়া অনন্তধামের যাত্রী হইতে পারি। তুমি অবাধে আপনার কার্য্য আপনি সাধন কর, আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া চরিতার্থ হই।

হে জীব (এখন)—

অনন্ত সাগর মাঝে দেও তরি ভাসাইয়া,
আগে পিছে কাহারো লাগি দেখিওনা
তাকাইয়া।
পশ্চাতে মোহের রাত্রি আসার তুফান যাত্রী,
সম্মুখের শুভ্রজ্যোতি সে অনন্ত প্রকাশিয়া।
পারাপার নাহি তার, অনন্ত বিস্তার যার,
অনন্তে মিশিয়া আছে, অনন্ত আঁধার,—
জীবনজলধি স্থির, ধূমাকার সিন্ধুনীর,
প্রশান্ত সুনীলানিলে নীলশূন্য মিশাইয়া।

সেথা—

নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মন্ত্র যেন সব স্তব্ধ,
শান্তির প্রবাহ বহে, দুই বাহু প্রসারিয়া।
যাবে দুঃখ, যাবে সুখ, যাবে সব পাসরিয়া,
সম্মুখের শুভ জ্যোতি-শান্তি সুধা প্রসারিয়া।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

হিমারণ্যবাসী জনৈক পরিব্রাজক।

ভূপেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবিত আইন্ ও অসবর্ণ-বিবাহ।

পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় জানেন, যে ১৮৭২ সালে একটী আইন্ জারি হয়, যাহার নাম "স্পেশাল্ ম্যারেজ্ একট্" বা বিশেষবিবাহবিধি। ঐ আইন্ অনুসারে যাঁহারা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে চাহেন, তাঁহাদের প্রকাশ্য ঘোষণা করিতে হয় যে, তাঁহারা হিন্দু, মুসলমান্, খৃষ্টান্ বৌদ্ধ জৈন, শিখ ও পার্শী নহেন। এই আইন্ ৺ কেশবচন্দ্র সেন-প্রমুখ ব্রাহ্মদিগের চেষ্টায়ই প্রবর্ত্তিত হয়। ব্রাহ্মেরা জাতিভেদ মানেন না অসবর্ণবিবাহে তাঁহাদের কোন আপত্তি ছিলনা; কিন্তু হিন্দুসমাজে বহুকাল অসবর্ণবিবাহ অপ্রচলিত থাকায় পাছে অসবর্ণবিবাহ অসিদ্ধ হয়, এইজন্য ঐরূপ বিবাহ আইনসঙ্গত করিবার জন্য এই আইন্ প্রকটিত হয়।

এই আইন্ প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরে, অনেক অসবর্ণবিবাহ হইয়াছে বটে, কিন্তু হিন্দুসমাজের লোকসংখ্যার তুলনায় তাহা অত্যল্প। এই আইনে কাহাকেও অসবর্ণবিবাহ করিতে বাধ্য করা হয় নাই। যাহারা স্বেচ্ছায় এইরূপ বিবাহ করিতে প্রস্তুত, তাহাদের অসুবিধা দূর করা হইয়াছে মাত্র।

সমাজসংরক্ষণের দুটী উপায়। যোগ ও ক্ষেম। যাহা কিছু আছে, তাহা রক্ষা করিতে হইবে, যাহা কিছু নাই, তাহা অর্জ্জন করিতে হইবে। যে সমুদয় আচার বা বিধি আমাদের ভাল আছে, তাহার সংরক্ষণ ও যাহা নাই তাহার অর্জ্জন প্রয়োজন একথা যেমন ব্যক্তিসম্বন্ধে সত্য, তদ্রূপ সমাজ সম্বন্ধেও সত্য।

আর একটি কথা, প্রত্যেক সমাজে দুটী ভাব আছে, একটী স্থিতিশীলতা ও একটী গতিশীলতা। একটু ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, ইহারা যোগক্ষেমের অন্তর্গত, কিন্তু এই দুটী পরস্পর এতই সংসৃষ্ট যে, একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। আমি যেখানে আছি, সেখানেও দাঁড়াইতে না পারিলে আমার আর অগ্রসর হওয়ার যো থাকে না।

আমার যাহা আছে, তাহা না রাখিতে পারিলে, নূতন কিছু পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। হিন্দুসমাজেও এই দুই ভাব আছে, কিন্তু এই দুই ভাবের সামঞ্জস্য না করিতে পারিয়াই সমাজে গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। গতিশীলতা ও স্থিতিশীলতার মধ্যে, বেশ চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, বিরোধমাত্র নাই; ইহারা পরস্পরাপেক্ষ। মানবের দেহ সুস্থ রাখিতে গেলে যেরূপ শ্রম ও বিশ্রাম উভয়েরই প্রয়োজন, সেইরূপ সমাজদেহ সুস্থ রাখিতে গেলে গতিশীলতা ও স্থিতিশীলতার প্রয়োজন।

আর একটী কথা, একথা খুব ঠিক্ যে, সমাজ-সংরক্ষণ করিতে হইলে ব্যক্তিগত ভাবের গতিরোধ অনেক সময় আবশ্যক, কিন্তু একথাও ঠিক্ যে, এই ব্যক্তিগত ভাবের গতি-রোধের আধিক্য হইলে সমাজ একেবারে নিস্তেজ ও জড়বৎ হইয়া যায়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর যে-সে কারণে হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত নহে। চৌর্য্য ব্যভিচার প্রভৃতি যে সকল অপরাধ এবং যাহা সর্ব্ববাদিসম্মতে সমাজের পক্ষে অমঙ্গলজনক, তাহাতে ব্যক্তিগত প্রবণতা থাকিলেও সমাজের মঙ্গলের জন্য তাহার নিমিত্ত দণ্ডবিধান প্রয়োজন। কিন্তু জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যে যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে মানুষ ক্রীড়কের হস্তে পুত্তলিকার মত হইয়া পড়ে। আমি কি খাইব, কি পরিব, কিরূপ ভাবে ঈশ্বরোপাসনা করিব, কিরূপ স্ত্রী গ্রহণ করিব, এ সমুদয়ের বিবেচনার ভার আমার হস্ত হইতে লইয়া, যদি সমাজ একটী কঠোর অনুশাসনের অধীনে আমাকে আনয়ন করেন, তাহা হইলে, সমাজ চলিতে পারে না। আমার এই সব ব্যক্তিগত কার্য্যে সমাজের কোন ক্ষতি নাই, অথচ অনর্থক আমার স্বাধীনতা হরণ করা হয়।

বিবাহ বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দিবার যুক্তি এই প্রকার। আমি ব্রাহ্মণ, কিন্তু একটী ক্ষত্রিয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে আমার ইচ্ছা হইল। রূপে গুণে যদি তাহাকে আমার সহধর্ম্মিণী করিবার কোনও বাধা আমি না দেখি, তাহা হইলে, সমাজ কেন আমাকে এইরূপ বিবাহ করিতে বাধা দিবে? তুমি বলিবে, 'অপর ব্রাহ্মণ তোমার বাড়ী যাইবে না বা তোমার অন্ন ভোজন করিবে না, তুমি তাহাদিগকে তাহা করিতে বাধ্য করিতে পার না।' ঠিক কথা! আমার তাহাতে কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু আমি রাজদ্বারে একথা জানাইতে পারি যে "এইরূপ বিবাহ করিলে আমি যদি সমাজচ্যুত হই, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু বর্ত্তমান সামাজিক বিধানে যদি এইরূপ বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতীকার পাইবার জন্য আমি সম্পূর্ণ অধিকারী। কারণ আমরা দুজনে যদি স্বেচ্ছায় বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হই, তাহাতে অপরের কি আপত্তি হইতে পারে?" রাজা বলিলেন, "ঠিক্, তোমরা স্বচ্ছন্দে বিবাহ করিতে পার, এই বিবাহ আইন্ অনুসারে অবৈধ হইবে না।" কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিলেন, 'তুমি যে হিন্দু নহ—একথা তোমায় বলিতে হইবে।' আমাকে অনুমতি দিলেন, বটে, কিন্তু একটু সঙ্কোচ করিয়া দিলেন।

ভূপেন্দ্র বাবু বলেন, এই সঙ্কোচ অনাবশ্যক।

যদি কোনও ব্রাহ্মণ হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া অন্তবর্ণের কন্যা বিবাহ করে, তাহাতে বাধা কি? আমি অসবর্ণবিবাহ করিলাম বলিয়া যে আমি হিন্দু থাকিতে পারিব না, তাহার মানে কি? তাই তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন—১৮৭২ সালের তিন আইনে বর-কন্যার, তাহারা হিন্দু নহে প্রভৃতি বলিয়া যে ঘোষণা করিতে হইত, এই সঙ্কোচাত্মক বাক্য উঠাইয়া দেওয়া হউক্।

এই সঙ্কোচজনক বাক্য উঠাইয়া দিলেই যে হিন্দুসমাজে অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত হইয়া যাইবে, তাহার কোন মানে নাই; কারণ এ আইনের দ্বারা কাহাকেও অসবর্ণবিবাহ করিতে বাধ্য করিবে না। যদি কেহ অসবর্ণবিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহার বাধা দূর করিবে মাত্র।

এইক্ষণ অসবর্ণবিবাহ ভাল কি মন্দ, তাহার বিচার তত প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয় না; কারণ এ আইনে অসবর্ণবিবাহ করিতে কাহাকেও বাধ্য করা হইল না। যাহারা সমাজের বর্ত্তমানপ্রথার পক্ষপাতী, তাহারা বলিবেন, যে অসবর্ণবিবাহ অত্যন্ত দূষণীয়। তাহাদের বিরুদ্ধবাদীরা ইহার প্রশংসাই করিবেন। যুক্তিতর্ক উভয়পক্ষেই সমানভাবে চলিবে। প্রত্যেক পক্ষ বলিবেন, তাহারা জিতিয়াছেন এবং অপর পক্ষ হারিয়াছেন।

বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আইন্ হওয়াতেও সমাজে বহুল বিধবাবিবাহ এখনও হয় নাই, সমাজের বহুলোক কোনও প্রথার পক্ষপাতী হইয়া না দাঁড়াইলে, কেবল অনুমত্যাত্মক আইনের দ্বারা ঐ প্রথার বহুল প্রচলন হইতে পারে না। অসবর্ণবিবাহ সম্বন্ধেও ঐ কথা। ২। ৪ জন, যাহাদের ইচ্ছা হয়, তাহারা অসবর্ণ-বিবাহ করিবে, তাহাতে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ এখনও সমাজের অধিকাংশ লোকই যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন না; প্রচলিত আচার যাহা আছে, তাহা যুক্তিযুক্তই হউক্ আর অযুক্তিক হউক্—তাহার দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকেন। ইহাদ্বারা কেবল অসবর্ণবিবাহেচ্ছু ব্যক্তিদের একটু সুবিধা করা হইবে মাত্র।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রস্তাবিত আইনের বিচার করিতে গেলে, অসবর্ণবিবাহ ভাল কি মন্দ এবিচার নিষ্প্রয়োজন, তবে এ সম্বন্ধে আলোচনা হওয়াও সকলের পক্ষে মন্দ নহে; কারণ একটা বিষয়ে আলোচনা হইলেই তাহার ভালমন্দ বুঝিয়া লইবার সুবিধা হয়।

বর্ণ বা জাতিভেদ ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে নাই। অন্য কোনও সমাজে যে সামাজিক শ্রেষ্ঠতা বা নিকৃষ্টতা নাই, ইহা আমরা বলি না, উহা সর্ব্বত্র চিরকাল আছে এবং সর্ব্বত্রই চিরকাল থাকিবে। আমাদের বলার উদ্দেশ্য এই যে, ভারতবর্ষে যেরূপ আঁটা-আঁটি ভাবে ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে ইহাকে আনিয়া ফেলা হইয়াছে, অন্য কোনও দেশে তাহা করা হয় নাই। প্রাচীন ভারতেও এরূপ বাঁধাবাঁধি ছিলনা। আর্য্যেরা অনার্য্যদিগের সংস্পর্শে আসিলেই 'শ্বেতবর্ণ' 'কৃষ্ণবর্ণ' কথা উঠিল। আর্য্য বলিতে তিনটী জাতি বুঝাইত—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য। এই তিন জাতি 'দ্বিজাতি' বলিয়া বর্ণিত হইত। শূদ্রই একজাতি অর্থাৎ উপনয়নাদি-সংস্কার-বর্জ্জিত ছিল। ক্রমে আচারভ্রষ্ট আর্য্যদিগকে

'শূদ্র' বলিয়া গণ্য করা হইত এবং আচার-পূত অনার্য্যেরাও দ্বিজত্ব বা আর্য্যত্ব প্রাপ্ত হইত। আর্য্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব—ব্যবসায়ের দ্বারা সূচিত হইত। পরস্পরের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ বা পংক্তি-ভোজন সম্বন্ধে কোনও বাধা ছিল না। প্রাচীনকালেও স্থিতিশীল ও গতিশীল ঋষিরা ছিলেন। কেহ কেহ জাতির গণ্ডী সঙ্কীর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেন, কেহ বা বাড়াইতে চেষ্টা করিতেন। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা বিশেষ জানিতে চাহেন, তাঁহারা পূর্ব্বপূর্ব্ব বর্ষের হিন্দুপত্রিকায় জাতিভেদ সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।

যখন বর্ণ সম্বন্ধে আঁটা আঁটি হইতে লাগিল, তখনই সবর্ণবিবাহ অসবর্ণবিবাহ কথা উঠিল; তাহার পূর্ব্বে উহা ছিল না। বর্ণবিভাগের আঁটাআঁটির সময়েও অনুলোম অসবর্ণ বিবাহে বাধা দেওয়া হইত না। প্রতিলোম অসবর্ণ-বিবাহই নিন্দনীয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু, শাস্ত্রবচন যাহাই থাকুক, ব্যবহার সব সময়ে শাস্ত্র মানিয়া চলে না। শাস্ত্র তখন ব্যবহারের নিকট হা'র মানে এবং হা'র মানিয়া আপনাকে ব্যবহারের অধীন করিয়া লয়।

যাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্র নিপুণতার সঙ্গে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা "বচনশতেন বস্তুনোঽন্যথা-ন কর্ত্তুং শক্যতে" এই স্মৃতিবচনের মধ্যেই প্রচলিত ব্যবহারের নিকট শাস্ত্রের পরাজয় বুঝিতে পারিবেন।

যযাতি দেবযানীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকাল-প্রচলিত শাস্ত্র অনুসারে দেবযানীর পুত্রেরা 'সূত' হইতেন।

শাস্ত্রে আছে—

ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতঃ।

মহর্ষি মনু বলেন—

ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।
বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ॥

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণকন্যার গর্ব্ভে যে সন্তান জন্মে, সে সূত-জাতি। বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ব্ভে যে সন্তান জন্মে সে মাগধজাতি, আর বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণ-কন্যার গর্ব্ভে যে পুত্র জন্মে, সে বৈদেহ-জাতি হইবে; কিন্তু দেবযানীর পুত্রেরা কেহ সূত হইলেন না, বা পুরাণপাঠ-ব্যবসায় গ্রহণ করিলেন না, তাঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয় হইলেন। যযাতির বংশধরেরাই ভারতবর্ষের সম্রাট্। যদুবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ যদিও সম্রাট্ ছিলেন না, কিন্তু সম্রাট্ অপেক্ষাও বড় ছিলেন। শান্তনু ধীবরকন্যা বিবাহ করাতে তাঁহার অনুলোমজ সন্তানদিগের ক্ষত্রিয়ত্বে বাধা হয় নাই। দ্বৈপায়ন সত্যবতী-গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও যে সে নহেন, ঋষিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বেদব্যাস হইয়াছিলেন। বশিষ্ঠের ঔরসে অক্ষমালার গর্ব্ভজাত সন্তান ব্রাহ্মণত্ব হইতে চ্যুত হন নাই। শাস্ত্রানুশাসন, ব্যবহারের প্রবলতার কিছুমাত্র লাঘব করিতে পারে নাই।

এই প্রাচীন কথাগুলি স্মরণ করিলে মনে হয় যে, সমাজের স্রোত যেদিকে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে যাহা কিছু করা যাক্ না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। যখন আর্য্যসমাজে বর্ণভেদের বাড়াবাড়ি ছিলনা, বা বিবাহের নিয়ম সম্বন্ধে কোনও বাঁধাবাঁধি ছিলনা, তখন বিপরীত শাস্ত্র-অনুশাসনের দ্বারা যেমন প্রচলিত ব্যবহারের অপ্রচলন

হয় নাই, তদ্রূপ বর্ত্তমানেও হিন্দুসমাজে যে সমুদয় ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহার বিপরীত অনুমত্যাত্মক বিধানের দ্বারা সমাজের ব্যবহারের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ হইবার সম্ভব নাই।

এইরূপ ব্যবহার ভাল কি মন্দ, তাহার বিচার করা বড় সহজ নহে। যে সমাজে যে ব্যবহারটী প্রচলিত, সেই ব্যবহারটীকে লোকে ভাল বলিয়া জ্ঞান করে, তাহার বিপরীত ব্যবহারকে মন্দ বলিয়া মানিয়া লয়। বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজে যদি অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে উহার বিরুদ্ধে কেহ কথা বলিলে, তাহাকে শাস্ত্রদ্বেষী ধর্ম্মদ্বেষী বলিয়া ঘোষণা করা হইত। মহর্ষি শ্বেতকেতু যখন স্ত্রীলোকের স্বচ্ছন্দবিহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থাপিত করেন তখন তাহার পিতা বলেন যে 'বাপ্! স্বচ্ছন্দবিহারই সনাতন ধর্ম্ম,' আবার যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা যখন দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন, তখন দ্রুপদ ঐরূপ প্রস্তাবকে অনার্য্যজনোচিত প্রস্তাব বলায়, যুধিষ্ঠির ঐরূপ প্রথাকে (একস্ত্রীর বহুস্বামী হওয়া) সনাতনধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করেন। সুতরাং যুক্তিতর্ক দুইদিকেই পাওয়া যায় এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোনও পক্ষের কাহারও নিকট হা'র মনিবার সম্ভব নাই। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে, সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া মানুষ স্বীয় স্বীয় সুবিধার জন্য যাহা করে, তাহাতে যদি অপরের কোনও ক্ষতি না হয়, তাহা হইলে তাহা ভালই হউক্ আর মন্দই হউক্, তাহাতে বাধা দিবার আবশ্যক দেখা যায় না।

এখন যদি একজন কায়স্থ কোনও বৈদ্যের বা ব্রাহ্মণের বা অপর জাতির কন্যা বিবাহ করেন, তাহাতে অপরের ক্ষতিবৃদ্ধি কি? এরূপ বিবাহ ত ব্রাহ্মসমাজে এখনও হইতেছে! তবে বেশীর মধ্যে এই হইবে যে, এখন ঐ কায়স্থ নিজেকে 'হিন্দু' বলিতে পারিবেন। অন্য কায়স্থ যদি তাহার সহিত আহার-ব্যবহার বা বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন না করেন, তবে তিনি তাহাদিগকে বাধ্য করিতে পারিবেন না। তোমার মতে ঐ কায়স্থ হিন্দু না হইয়াও নিজেকে হিন্দু বলিবেন। এখন হয়ত অনেক গোঁড়াহিন্দু বিলাত-প্রত্যাগত হিন্দুদিগকে হিন্দু বলেন না, কিন্তু সেই সকল বিলাত-প্রত্যাগত ব্যক্তিরা নিজেদের হিন্দু বলিতেছেন এবং হিন্দুর আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিতেছেন, তাহা কেহ ঠেকাইতে পারিতেছেন না।

যদিও এই আইনটী অনুমত্যাত্মক আইন, তথাপি গবর্ণমেণ্ট এ বিষয় সাধারণের মতামত জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এদেশের গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত আছেন যে, কোনও শ্রেণীর প্রজার ধর্ম্মকার্য্যাদির প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং যদি কোন শ্রেণীর প্রজার এইরূপ ধারণা হয় যে, গবর্ণমেণ্ট তাহাই করিতেছেন বা এই আইনের ফলে তাহাই হইবে, সেজন্য এ বিষয়ে একটু বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে যেরূপ ছোট ছোট গণ্ডী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে অনেকেরই ধারণা এই যে, ইহার দ্বারা সমাজ ক্রমে নির্জ্জীব হইয়া পড়িতেছে। সমাজ সংস্কারকদিগের ইচ্ছা এই যে, এই ছোট ছোট গণ্ডী ভাঙ্গিয়া তাঁহারা হিন্দুসমাজকে বিরাট্ জীবন্তসমাজে পরিণত করেন। রক্ষণশীলেরা বলেন

যে, আমরা যাহা আছি তাহাই থাকি, আমাদের উহার প্রয়োজন নাই। একদিকে যত বাড়াবাড়ি করিতে যাওয়া হয় এবং অপর দিকে তত আঁটাআঁটি করিতে দেখা যায়; এই উভয় দিকেরই কোনও দিকেরই প্রবণতা সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়া বোধ হয় না। মোটামুটী কথায় বলে "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্." সব কার্য্যের মাঝামাঝি ভাল;—এই কথাটী মনে রাখিয়া, যদি উভয়দলই স্বীয় স্বীয় কার্য্য নিয়মিত করেন, তাহা হইলে সমাজের মঙ্গল; অন্যথা যাহা অনেক দিন হইয়া আসিতেছে অর্থাৎ হিন্দুসমাজ দুর্ব্বল থাকিবে এবং কেবল দলাদলি ও গালাগালি দিবার সময়েই নিজের জীবনীশক্তির কিছু কিছু পরিচয় দিবে!

অথর্ব্ববেদীয়া ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ।

ওঁ মনোহি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধঞ্চাশুদ্ধমেবচ।
অশুদ্ধং কামসঙ্কল্পং শুদ্ধং কামবিবর্জ্জিতম্। ১

বঙ্গানুবাদ। মন দুই প্রকার; শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ। কামনার তাড়নায় যে মনে সতত শত শত সঙ্কল্পের বিকাশ হইতেছে, সেই মন অশুদ্ধ, আর যে মন কামসম্পর্ক-শূন্য অর্থাৎ কামনা-স্পর্শে যাহা কলুষিত নয়, সেই মন শুদ্ধ। ১

মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তৈ্য নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্। ২

মনই মানুষের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ, বিষয়াসক্ত মন বন্ধের কারণ এবং বিষয়বাসনা-বিহীন মন মুক্তিপথের সম্বল। ২

যতো নির্ব্বিষয়স্যাস্য মনসো মুক্তিরিষ্যতে।
তস্মান্নির্ব্বিষয়ং নিত্যং মনঃ কার্য্যং মুমুক্ষুণা। ৩

যখন মনের বিষয় সম্পর্ক বিনষ্ট হইলেই মুক্তি-পথে অগ্রসর হওয়া যায়, তখন প্রত্যেক মুমুক্ষু ব্যক্তিরই মনকে বিষয় স্পর্শ বিহীন করা কর্ত্তব্য। মনে বিষয়-বাসনার লেশ থাকিতেও মুক্তি নাই। ৩

নিরস্তবিষয়াসঙ্গং সন্নিরুদ্ধং মনো হৃদি।
যদা যাত্যুন্মনীভাবং তদা তৎ পরমং পদম্। ৪

যে সময়ে সর্ব্বপ্রকারে বিষয়াসঙ্গ-বিরহিত মন হৃৎপদ্মে নিরুদ্ধ হয়,—উন্মনীভাব অর্থাৎ সঙ্কল্পশূন্যতা প্রাপ্ত হয়, তখনই সেই পরমপদ প্রকটিত হয়। (তাৎপর্য্য এই যে, মন স্থির না হইলে আত্মজ্যোতির উপলব্ধি হয় না। চঞ্চল জলে অচঞ্চল চন্দ্রের প্রতিবিম্বও সহজে গৃহীত হয় না। মনকে নির্ব্বিষয় করা চাই। মনঃস্থিরতার নাম 'মনোন্মনী' অবস্থা। শাস্ত্রে আছে—'যো মনঃসুস্থিরীভাবঃ সাচাবস্থা মনোন্মনী।') ৪

তাবদেব নিরোদ্ধব্যং যাবৎ হৃদি গতং ক্ষয়ম্।
এতজ্জ্ঞানঞ্চ মোক্ষঞ্চ অতোঽন্যো গ্রন্থবিস্তরঃ। ৫

মন ততক্ষণ নিরুদ্ধ রাখিতে হইবে, যতক্ষণে হৃৎপদ্মে বিষয়-বাসনা-শূন্য মন বিলীনতা প্রাপ্ত হইতে পারে। মন এইরূপে নির্ব্বিষয় হইলে জ্ঞানের উদয় হয়, ঐ জ্ঞানেই মোক্ষ প্রতিষ্ঠিত। এই পন্থা ভিন্ন অন্য সকল উপদেশই গ্রন্থবাহুল্য মাত্র। (সার কথা, মন স্থির হইলেই জ্ঞান মোক্ষ—সকলের আশা, অন্যথা দুরাশা মাত্র।) ৫

নৈব চিন্ত্যং ন চাচিন্ত্যং অচিন্ত্যং চিন্ত্যমেব চ।
পক্ষপাতবিনির্ম্মুক্তং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা। ৬

(যদি মনে কর, 'মন নির্ব্বিষয় হইবে কেমন করিয়া? মন যে তত্ত্বচিন্তায় নিয়ত রত!' তাহার উত্তরে বলা হইতেছে) তত্ত্ববস্তু অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তার অতীত—চিন্তার অবিষয়, তাহা চিন্তা করা যায় না, আর যে সকল বিষয় চিন্তার যোগ্য, তাহাদিগকেও চিন্তা করা সঙ্গত নয়, কারণ তাহারা অবস্তু। (ভাবিতে গেলে বলিতে হয়, সংসারে ভাবিবারও কিছু নাই, ভুলিবারও কিছু নাই।) মন যখন অবস্তু অতত্ত্বপদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বপদার্থের প্রতিও পক্ষপাত শূন্য হয় অর্থাৎ প্রকৃততত্ত্ব চিন্তার অতীত জানিয়া তত্ত্বচিন্তা ত্যাগ করে—নির্ব্বিষয় হয়, তখনই জীব ব্রহ্মভূত হইয়া থাকে। ৬

স্বরেণ সন্ধয়েদ্‌যোগং অস্বরং ভাবয়েৎ পরম্।
অস্বরেণ হি ভাবেন ভাবো নাভাব ইষ্যতে। ৭

স্বর অর্থাৎ গুরূপদিষ্ট মন্ত্র বা প্রণবদ্বারা যোগ অর্থাৎ চিত্তনিরোধ আরম্ভ করিবে; অস্বর অর্থাৎ শব্দাতীত পরম বস্তুকে ভাবনা করিবে। অস্বর বস্তুর ভাবনায় ভাবুকের আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মরূপ পরমবস্তু অভাবাকারে প্রকাশ পায় না, পরন্তু "অস্তি" এই সদ্‌রূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (প্রকারান্তরে বলা যায়, চিন্তাশীল সাধক স্বয়ং পরব্রহ্মরূপে প্রকাশ পাইতে পারেন, "সোঽহমস্মি" ধারণা হয়, "নাহমস্মি" হয় না)

তদেব নিষ্কলং ব্রহ্ম নির্ব্বিকল্পং নিরঞ্জনম্।
তদ্‌ব্রহ্মাহ মিতি জ্ঞাত্বা ব্রহ্মসম্পদ্যতে ধ্রুবম্। ৮

মন নির্ব্বিষয় হইলে, সে যে পরমবস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ করে, তাহাই ব্রহ্মস্বরূপ। সেই নির্ব্বিষয় চিত্তে প্রতিভাত ব্রহ্মস্বরূপই আমি—এইরূপ জ্ঞান দৃঢ় হইলেই সাধক ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকে। (এখানে "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই তত্ত্ব বলা হইতেছে।) ৮

নির্ব্বিকল্পমনন্তঞ্চ হেতুদৃষ্টান্তবর্জ্জিতম্।
অপ্রমেয়মনাদ্যঞ্চ জ্ঞাত্বা চ পরমং শিবম্। ৯
ন নিরোধো নচোৎপত্তি র্ন বন্দ্যো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষা ন মুক্তিশ্চ ইত্যেষা পরমার্থতা। ১০

অদ্বিতীয়তা-প্রযুক্ত বিকল্প বিহীন, দেশ-কালাতীত বলিয়া অনন্ত, নিত্যতাহেতুক কারণবর্জ্জিত, সদৃশাভাব-বশতঃ দৃষ্টান্তহীন, জ্ঞানাতীতবিধায় অপ্রমেয়, অকারণতা-প্রযুক্ত অনাদ্য সেই পরম শিবস্বরূপ পরমাত্ম ব্রহ্মকে অবগত হইলে, মরণ ভয় থাকে না; জননের শঙ্কাও পলায়ন করে; স্তুতি গীতি বা বন্দনার ভাগী হইতে হয় না; শাসন-দমন নিন্দনের অধীনে থাকিতে হয় না, বন্ধন রহিত হওয়ায় মুক্তির ইচ্ছাও থাকে না, মুক্তদশার অপেক্ষাও থাকে না; উক্তরূপ এক সর্ব্বাতীত সত্যার্থজ্ঞতা বা পরমার্থতা আবির্ভূত হয়। (এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্র জলদ-ঘোষে প্রচার করিয়াছেন "সর্ব্বাতীতো নিরঞ্জনঃ।" বস্তুতঃ বন্ধ গেলে মুক্তিও থাকে না; কারণ বদ্ধই মুক্ত হইতে চায়, মুক্ত আর মুক্ত হইতে চাহিবে কেন? দুঃখ গেলে, সঙ্গে সঙ্গে সুখও যায়, কারণ উহারা পরস্পরাপেক্ষ, একটী গেলে অপরটীর মরণ ঘটে। খাঁটি খাঁটি সুখ-দুঃখের অতীত অবস্থাকে অনেকে চরমসুখ বা পরমসুখ বলেন; "সুখং দুঃখসুখাত্যয়ঃ।" সংসার যাহাকে 'সুখ' বলে সে সুখ, আর ঐ সুখ দুঃখাতীত সুখ এক পদার্থ নহে, বলা বাহুল্য।) ১০

এক এবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
স্থানত্রয়ব্যতীতস্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে। ১১

জাগরণ সময়ে, যে আত্মা ধাবন-পচন-চিন্তনাদির দ্রষ্টা, স্বপ্নে সেই আত্মাই স্বপ্ন-কার্য্যকলাপ ও স্বপ্নপ্রপঞ্চসৃষ্টির দ্রষ্টা, আবার সুষুপ্তিসময়ের সৌষুপ্ত তমোবৃত্তির দ্রষ্টা সেই একই আত্মা জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই তিন স্থান অতিক্রম করিয়া তুরীয়দশা লাভ করিলে, সেই জীব আর জনন মরণ চক্রে ভ্রাম্যমাণ হয় না। (কারণ, স্থানত্রয়েই সৃষ্টি-বিনাশ আছে, তাহার পরপারে উৎপত্তি-নাশ কিছুই নাই ; কেবল নিত্যমুক্ততা বিরাজ করে।) ১১

এক এবহি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধাচৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ। ১২

একই আত্মা ঘটে ঘটে পৃথক্ পৃথগ্ রূপে অবস্থিত বলিয়া প্রতীতি হয়, বস্তুতঃ সর্ব্বত্র একেরই প্রকাশ অনুভূত হইয়া থাকে।) যেমন চন্দ্র একটী জলাধারের জলে প্রতিবিম্বিত হইলে 'একটী চন্দ্র' বলিয়াই ধারণা হয়, আবার বহু জলাশয়ের জলে যুগপৎ প্রতিবিম্বিত হইলে 'বহু চন্দ্র' মনে হয়, (অজ্ঞলোকে বহু চন্দ্র বলিয়া মনে করিলেও বস্তুতঃ চন্দ্রের একত্বে কোনও সংশয় হয় না) তদ্রূপ আত্মাও ক্ষেত্র-ভেদে বহুধা প্রকটিত হয়েন। (এখানে বেদান্তের প্রতিবিম্ববাদ আলোচিত হইতেছে। জগতে যে বহু জীব দৃষ্ট হইতেছে, তাহা জীবের বহুত্বজ্ঞাপক নয়। এক চন্দ্র যেমন বহু জলাধারে বহুরূপে দৃষ্ট হয়, এক আত্মাও তদ্রূপ বহুদেহে বহু জীবরূপে অনুভূত হই-তেছেন, ইহাই সার কথা।) ১২

ঘটসম্বৃতমাকাশং লীয়মানে ঘটে যথা।
ঘটোলীয়েত নাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোপমঃ। ১৩

ঘটাকাশ অর্থাৎ ঘটান্তর্বর্ত্তী আকাশ যেমন ঘট নষ্ট হইলে নষ্ট হয় না, তদ্রূপ দেহ নষ্ট হইলে আকাশসদৃশ জীবও বিনাশ-প্রাপ্ত হয় না। (এখানে বেদান্তশাস্ত্রের অবচ্ছেদবাদ বিবেচিত হইতেছে। আকাশ সর্ব্বগত অনন্ত, আমরা ঘট দিয়া আকাশের যে টুকুর অব-চ্ছেদ করিতে পারি, তাহাকে বলি 'ঘটাকাশ' এইরূপ গৃহাকাশ প্রভৃতি। আকাশের এই-সকল ভিন্ন ভিন্ন নাম ও ভাব আমরা কল্পনা করি বটে, কিন্তু আকাশ "যথাপূর্ব্বং তথা-পরম্"। ঘট ভাঙ্গিয়া গেল, ঘটাকাশ যেমন-তেমনি রহিল। অবচ্ছেদক বা পার্থক্যকল্পনার উপকরণ বা উপাধি ঘট চলিয়া গেলে আকাশ যেমন এক মহাকাশরূপেই প্রকাশ পাইতে লাগিল, জীবও তেমনি অবচ্ছেদক বা পার্থক্য-কারক দেহ বিনষ্ট হইলে পূর্ব্ববৎ অমর অনন্ত আত্মস্বরূপে প্রকট হইতে লাগিল। বেদান্তশাস্ত্রে বিশেষতঃ অদ্বৈতমতে অবচ্ছেদ-বাদ ও প্রতিবিম্ববাদ দ্বারাই জীবব্রহ্মরহস্য বুঝান হইয়া থাকে।) ১৩

ঘটবদ্বিবিধাকারং ভিদ্যমানং পুনঃ পুনঃ।
তদ্‌ভগ্নং ন চ জানাতি স জানাতি চ নিত্যশঃ। ১৪

ঘট বার বার ভাঙ্গিয়া যায়, দেহও পুনঃ পুনঃ নষ্ট ও সৃষ্ট হয়। ঘট জানেনা যে সে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, শরীরও জানে না যে সে বার বার নষ্ট ও সৃষ্ট হইতেছে ; কিন্তু আত্মা সর্ব্বদাই ঘটের ও দেহের সৃষ্টি ও বিনাশ দর্শন করিতেছেন। (আত্মা সর্ব্বদ্রষ্টা সাক্ষী, অচেতনের দ্রষ্টৃত্ব বা সাক্ষিত্ব সম্ভব নয়, এজন্য ঘট জানে না, আর চেতন আত্মা জানেন।) ১৪

শব্দমায়াবৃতো যাবৎ তাবৎ তিষ্ঠতি পুষ্করে।
ভিন্নে তমসি চৈকত্বমেকমেবানুপশ্যতি। ১৫

যতক্ষণ জীব শব্দনাম-মায়ায় আবৃত থাকে, ততক্ষণ সহস্রদল কমল-কোষে অবস্থান করে; অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে দেখে;) যখন জ্ঞানদীপ্তিবলে মায়ান্ধকার বিদূরিত হয়, তখন একমাত্র একত্ব বা জীবব্রহ্মাভেদ দর্শন করিতে থাকে। (পার্থক্য "বস্তুতঃ" নয় কেবল বাক্যমাত্রে পার্থক্য—এই জন্য "শব্দমায়া" বলিতেছেন। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং। বিকারগুলি কেবল নামমাত্র, বস্তুতঃ অদ্বৈত জ্ঞানোদয় না হইলে যথার্থ একত্বও দেখা যায় না। চক্ষুর দোষে একটী চাঁদকে দুটী দেখিতে হয় ভুল দূরে গেলে, আর ওরূপ হয় না।) ১৫

শব্দাক্ষরং পরং ব্রহ্ম যস্মিন্ ক্ষীণে যদক্ষরম্।
তদ্বিদ্বানক্ষরং ধ্যায়েৎ যদীচ্ছেচ্ছান্তিমাত্মনঃ। ১৬

শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম এই দুয়ের মধ্যে একটী ক্ষীণ বা বিনষ্ট হইলেও অপর যেটী অক্ষর বা অক্ষীণ থাকে, যদি সাধক সেইটীর ধ্যান করেন, তবে তিনি ইচ্ছা করিলে শান্তিলাভ করিতে পারেন। (এখানে শব্দব্রহ্ম বেদ প্রণবাদি-রূপ বস্তুকে ক্ষর ও চিদানন্দমূর্ত্তি পরব্রহ্মকে অক্ষর ও একমাত্র আশ্রয়ণীয় বলা হইতেছে।) ১৬

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে তু শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ১৭

বিদ্যা দ্বিবিধা; শব্দব্রহ্মবিদ্যা ও পর-ব্রহ্মবিদ্যা। শব্দব্রহ্মবিদ্যার পরপারে গমন করিলেই পরব্রহ্মকে লাভ করা যায়—পর-ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ পায়। (শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্ম-লাভের উপায়মাত্র। ফল উপস্থিত হইলে লোকে ফলসাধন উপকরণ-সামগ্রীকে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। পরব্রহ্মস্বরূপলাভ মুখ্য লক্ষ্য, উহার পথ শব্দব্রহ্ম-সেবা।) ১৭

গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞান-বিজ্ঞানতত্ত্বতঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থমশেষতঃ। ১৮

বেদাদি শাস্ত্র অভ্যাস করিয়া, মেধাবী ব্যক্তি, শাস্ত্রপাঠলব্ধ জ্ঞান ও সাক্ষাৎকাররূপ বিজ্ঞান এই উভয়ের তত্ত্ব সম্যক্ প্রকারে অবগত হইয়া, গ্রন্থ অর্থাৎ বেদাদিশাস্ত্রকে "গ্রন্থ" বা বন্ধন মনে করিয়া পরিত্যাগ করেন; যেমন ধান্যার্থী ব্যক্তি পলাল হইতে ধান্য-গুলি পৃথক্ করিয়া লইয়া, শেষে ধান্য লইয়া যায়, আর পলালগুলি পরিত্যাগ করে, ইহাও তদ্রূপ। (যতক্ষণ পলালে ধান্য থাকে, ততক্ষণ পলালের সেবা। যতক্ষণ অপরোক্ষ জ্ঞানের পূর্ব্বাভাস পরোক্ষজ্ঞান প্রয়োজন হয়, ততক্ষণ শাস্ত্রসেবা, শেষে শব্দব্রহ্মকে অপ্রয়োজনীয় ও নশ্বরজ্ঞানে পরিত্যাগ করা যায়।) ১৮

গবামনেকবর্ণানাং ক্ষীরস্যাপ্যেকবর্ণতা।
ক্ষীরবৎ পশ্যতে জ্ঞানং লিঙ্গিনস্তু গবাং যথা। ১৯

নানাবর্ণের গাভীর দুগ্ধ যেরূপ এক শ্বেতবর্ণই হইয়া থাকে, ঐরূপ নানাভাবের নানা-শাস্ত্রের মধ্যেও একই অমর আত্মজ্ঞান বিরাজ করে বিদ্বান্ ব্যক্তি সযত্নে ঐজ্ঞান সংকলন ও গ্রহণ করেন; বেত্রধারিগোপগণ যেমন নানাবর্ণের গাভী হইতে দুগ্ধ দোহন এবং গ্রহণ করে, ইহাও তদ্রূপ। (বহুত্বের মধ্যে একত্বদর্শন—বৈষম্যের মধ্যে সাম্যদর্শনের ভাব বেদান্তের সারসিদ্ধান্ত এখানে সুব্যক্ত রহিয়াছে।) ১৯

ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে চ বসতি বিজ্ঞানম্।
সততং মন্থয়িতব্যং মনসা মন্থানভূতেন। ২০

যেরূপ দুগ্ধের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মরূপে ঘৃত বিরাজ করে, সেইরূপ ভূতে ভূতে অর্থাৎ

সর্ব্বজীবে গূঢ়ভাবে আত্মবিজ্ঞান বিদ্যমান আছে। মন্থানদণ্ড দ্বারা মন্থন প্রক্রিয়ার সাহায্যে যেমন দুগ্ধ হইতে ঘৃত পূর্ব্বরূপ নবনীত পাওয়া যায়, সেই প্রকার মনোরূপ মন্থান-দণ্ড দ্বারা সংসারদুগ্ধ মন্থন করিয়া বিজ্ঞান-নবনীত সংগ্রহ করিতে হয়। ('নেতি নেতি' প্রক্রিয়ায় এই ব্যাপার সংসাধিত হয়।) ২০

জ্ঞান নেত্রং সমাদায় চরেদ্বহ্নিমতঃ পরং।
নিষ্কলং নির্ম্মলং শান্তং তদ্‌ব্রহ্মাহমিতিস্মৃতম্। ২১

শাস্ত্রসেবায় ও গুরুসেবায় শাস্ত্রজ্ঞানরূপ তৃতীয়নেত্র বা জ্ঞাননেত্র লাভ করিয়া, তৎপরে অনুভবরূপ বহ্নির সাধনা করিবে, অর্থাৎ অপরোক্ষজ্ঞান উপার্জ্জন করিবে। সেই অপ-রোক্ষানুভবের পরিচয় এইরূপ যথা,—নির্ম্মল নিষ্কল শান্ত সেই ব্রহ্মস্বরূপ "আমিই"। (এখানে "সোঽহং"-ভাবের কথা বলা হই-তেছে; বারিবিন্দু বারিনিধিতে মিশিয়া যে অপরূপ রূপ ধারণ করে, তাহারই কথা হইতেছে। শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানকে অগ্নিরূপে বলা হইয়াছে, কারণ উহা কর্ম্মবন্ধন দগ্ধ করে। গীতায় শ্রীবিশ্বরূপ বলিয়াছেন—জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব-কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন!) ২১

সর্ব্বভূতাধিবাসঞ্চ যদ্ ভূতেষু বসত্যধি
সর্ব্বানুগ্রাহকত্বেন তদস্ম্যহং বাসুদেব ইতি। ২২

অপরোক্ষজ্ঞানে প্রতিভাত হইবে—আমি সেই সর্ব্বভূতের অধিবাসস্থান, সর্ব্বানুগ্রাহক-রূপে সর্ব্বভূতে আমি অধিবাস করি; আমি সেই সর্ব্বব্যাপী বাসুদেব পরমাত্মা ব্রহ্মস্বরূপ। (এখানে সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন ও আত্মায় সর্ব্ব-ভূতদর্শন প্রদর্শিত হইতেছে। আমি সকলেতে এবং সকল আমাতে, এই দর্শনই যথার্থ ব্রহ্মদর্শন। ইহা পাইলেই জীব কৃতার্থ হয়। গ্রন্থ সমাপ্ত হওয়ায় শেষ অংশের দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে।

ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ সম্পূর্ণ।

শ্রী ——ভারতী।

প্রতাপকাটী—যশোহর।

আত্মিক-কাহিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২৫)

বড়ই নির্জ্জন, অতি হিমপরিপূর্ণ—
হ'তেছিল অদ্ভুত সমাধি প্রাঙ্গণ—
সেই একমাত্র মম নিবাস-ভবন—
সে ভীষণ অন্ধতম হিমানি-নিশীথে।
যদি আমি করিতাম সাধুব্যবহার—
জীবনের মর্য্যাদান, করিয়া নির্ম্মাণ,—
বিশ্বাসি-হৃদয় মাঝে বাসস্থান মম,
তুষার সন্নিভ মম জড় আত্মা এবে,
ক'রিত আতিথ্য-লাভ তা'দের সকাশে
লভিত বান্ধবালয়ে আরাম-উত্তাপ।
হায় রে! এ সুবিশাল পৃথিবী ভিতরে
নরকুলে নাহি ছিল হেন কোন জন,
চুম্বকের মত বলে যাতনা যাহার,—
আকর্ষিত এ অধম আত্মারে আমার—
জীবিত জগৎ যারে বিস্মৃত এখন!
একাকীই ছিনু আমি নির্জ্জন আঁধারে
জীবমুক্ত দেহ মম একমাত্র সঙ্গী!
দুরাশায় অন্বেষিনু সহস্র-সমাধি—

অন্য আরো আত্মা এক দেখিবার আশে
সঞ্জীবিত, শৃঙ্খলিত শূন্যদেহ সনে—
ক্রম-ধ্বংস-দশাগত তুষারের তলে
এই খানে। কিন্তু হায়! বৃথা আশা মম।
যত ছিল আত্মা সবে গিয়াছে চলিয়া,
একে একে ত্যজি তার জীর্ণ আবরণ—
মৃত্তিকায় বিগঠিত; যাহা ছিল তার—
গর্ব্বের সামগ্রী বড় অতীত সময়ে।
উল্লসিত চিত্তে সবে গিয়াছে চলিয়া।
এখনও আছি আমি—আমিই একাকী,
নিরন্তর বন্দিভাবে এ ভীষণ স্থলে,
অচ্ছেদ্য-শৃঙ্খলবদ্ধ মম শব সনে।
অন্য কিছু এ ধরায় কোন কালে মোরে,
করে নাই নিপীড়িত হেন ঘৃণাভরে,
ভীষণ সর্ব্বস্ব মম (মৃতদেহ) যথা।
প্রগাঢ় বিরাগ ভরে নিত্য নিত্য আমি
সাবধানে দেখিতাম ক্রমধ্বংস তার।
বিগলিত আঁখি মম, বুঝিতাম কভু
করিত রোদন, করিত উদ্যম যেন
প্রকাশিতে মম যাতনার গুরু ভার;
শত ধারে অশ্রুনীর বরষি কখন,
চাহিত আরাম মম হৃদয়ে আনিতে।

(২৬)

একদা নিশীথকালে করিয়া ভ্রমণ,—
চৌদিক্ ব্যাপিয়া সেই সমাধিপ্রাঙ্গণে.
হইলাম উপনীত দ্বারদেশে তার।
তখনই ঘোরতর অন্ধকার মাঝে,
শ্রবণ-কন্দরে মম করিল প্রবেশ
ভগ্ন এক দীর্ঘশ্বাস—কাতর ক্রন্দন!
কে রে সেই, যে ভাঙ্গিল এ হেন ভীষণ—
নিশার নীরবভাব? জীবিত মানব?
যদি তাই, কেনরে সে আসিল এখানে?

(২৭)

ছিল সেই শিশু এক, পরিত্যক্ত এক
ক্ষুদ্র শিশু; হইয়াছে নিক্ষিপ্ত এখানে
হিমানিতুষার-মাঝে মরিবার তরে।
উপজিল দয়া মম হৃদয় মাঝারে,
অসহায় পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র-শিশু তরে,
ত্যজি দীর্ঘশ্বাস যেই ক্ষীণ—ক্ষণতর
চিরতরে নিদ্রাকোলে লভিবে বিরাম।
উপজিল ক্রোধ তার জননী উপরে,
যে তাহার ত্যজিয়াছে সন্তানে একাকী,
তুষারজড়তাগত মৃত্যু আলিঙ্গিতে।
কোন দণ্ড অতি গুরু অতীব ভীষণ,—
হয় উপযুক্ত তার এ পাপের তরে?
কোন কর্ম্মে এ নৃশংস দুষ্কার্য্যের তরে,
হয় প্রায়শ্চিত্ত তার? কহিনু হুঙ্কারি,
ন্যায়-ধর্ম্ম প্রণোদিত দীপ্ত-ক্রোধ ভরে,—
হউক্ সে অভিশপ্ত, যে নারী তাহার
ত্যজেছে সন্তান এই আত্মরক্ষাহীন।

(২৮)

বজ্রের নিনাদ সম উঠিল গর্জ্জিয়া—
অমনি উত্তর। কে হে তুমি, হে মানব!
যে জন নির্ভীক চিত্তে করিছে আহ্বান,
হেন ভাবে আপনার ভগিনীর শিরে,
বিধাতার ঐশ ক্রোধ! এখনি দেখিবে
সে দুষ্কৃত জনে তুমি, যাহার এখন
অবধান বিনা দণ্ড করিলে বিধান!
কর অনুতাপ তব অভিশাপ তরে!
কর সমর্পণ তুমি ঈশ্বরে তোমার—
প্রতিশোধ নিয়ন্তার সেই দৃঢ় করে,
নরহত্যা-অপরাধ-বিচারের ভার।

(২৯)

মম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল একজন
দেবদূত। দেখিলাম আমি দৃষ্টি তার

বিষম কঠোর! হ'তেছিল বিদারিত
যাহে আত্মা মম। ধরিল সবলে সেই,
মুষ্টিমধ্যে মম কর, যাহা সেই কালে
ক'রেছিনু প্রসারিত কম্পিত-হৃদয়ে।
অমনিই চিন্তা সম দ্রুততমবেগে,
হইল সে অন্তর্হিত আমার সহিত।
ল'য়ে গেল সে আমারে সেই নগরীতে,
যথা ছিল গত দিনে বসতি আমার।
হনু উপনীত এক নিকৃষ্ট আলয়ে,—
কলুষপঙ্কিল যাহা, যথা নিরন্তর—
হ'তেম অতিথি আমি জীবিত সময়ে।
তাঁহার আদেশে আমি করিনু প্রবেশ
পুনরায় সে ভবনে। কিবা অপার্থিব!
কি বিচিত্র! দেখিলাম সে পাপ আলয়।
ভীতি-সশঙ্কিত চিত্তে দেখিলাম আমি,
লজ্জাহীন সমবেত জনতামণ্ডলে,
অলক্ষিত অভ্যাগত কত কত জন,
সমাগত শব্দহীন প্রেতলোক হ'তে,
দাড়াইয়া বিমলিন ভীষণদর্শন
জীবিতগণের পাছে অতি সন্নিকটে।

(৩০)

দেখিলাম আমি, কেমনে সে দুরাশয়
নীচ আত্মগণ, মর্ম্মান্তিক ঘৃণা-ভরে
করে উত্তেজিত, পতিত মানবগণে,
চিরদিন সমধিক দুষ্কার্য্য-সাধনে।
ঈশ্বরের দূতগণ, দেখিলাম আমি,
যুঝিছে কঠোর ভাবে তাহাদের সনে।
রক্ষিতে ধর্ম্মের ক্ষীণ আলোকের কণা—
এখনও যার জ্যোতি হয়নি নির্ব্বাণ!
কোলাহলপূর্ণ সেই বিশাল ভবন
হ'ল পরিণত যেন রণক্ষেত্ররূপে,
যথায় মানবগণ বড়ই নিশ্চিন্ত,
তাঁ'দের নিয়তি যথা ছিল বিলম্বিত,
আলোক-আঁধার-মাঝে নীরব আহবে।
সবিশেষ মনোযোগে দেখিলাম আমি,
বিষণ্ণ আত্মিক আরো কত কত জন,
নির্লিপ্ত আহবে যারা, করিছে ভ্রমণ,
সে স্থলের চারিভিতে, তীব্র প্রহরায়,
বিষাদে মলিন অতি হতাশায় মূক।
ইহারাই সেই আত্মা, যারা কোন দিন
হ'য়েছিল সমুন্নত সে দুষ্ট আলয়ে।

(৩১)

যে সব মানবগণ কাটায় জীবন
যথেচ্ছ আমোদে, জ্বলে অনুতাপানলে
তীব্র তীব্রতর—দেখা দেয় যবে সেই
পবিত্র মরণ; যখন কঠোরভাবে—
করে সে আহ্বান, সে সকলে চিরতরে
মোহময় ধরা হ'তে লইতে বিদায়।
করয়ে উদ্যম তারা নিয়তি বিরুদ্ধে,
তবু চাহে কালক্ষয় করিতে ধরায়,
জঘন্য আনন্দ যথা করে অবরোধ
মৃত্যুশেষে তাহাদের দুর্ভাগ্য আত্মায়।
শক্তিহীন হয় আত্মা ছিন্ন করিবারে
কলুষ-কর-গঠিত জঘন্য নিগড়।
তখনও তাহাদের জাগে স্মৃতিপটে
ধরার আনন্দ যত। হায় দাসগণ!
বড় হতভাগ্য তারা। এখনও তারা
ভালবাসে সে সকল, কিন্তু নাহি পায়।
তখনও তাহাদের অধম বাসনা—
রহে সজীবিত হৃদে; করে নিপীড়ন
সে সকলে; সে কারণে—নহে যবে আর
বাসনার পরিতৃপ্তি কভু কোন দিনে।
যাবৎ না বাসনার হয় তিরোধান,
এই ভাবে রহে তারা সে কালের তরে,
রহে বাধ্য জীবিতের কলুষদর্শনে।

(৩২)

অবশেষে ঘৃণা করে তারা অতিশয়
দৃষ্টিমাত্র পাপদৃশ্য। ধীরে ধীরে তারা—
ভুলে যায় তাহাদের অধম বাসনা,—
কলঙ্কের স্মৃতি সব হয় অন্তর্হিত,
হয় আত্মা স্পৃহাকুল করিতে সেবন
পবিত্র সমীর; করে উত্তোলিত তারা
অবসন্ন আঁখি, মর্ত্তের আঁধার হ'তে;
যাবৎ না, আহা দেখ, সেই সব জন
পায় নিরখিতে দূর স্বর্গের আলোক,
করে প্রসারিত তারা অনভ্যস্ত কর
প্রার্থনা লাগিয়া। খ'সে যায় গুরুভার
শৃঙ্খলনিকর, করে আত্মা মুক্তিলাভ।
আকর্ষিত হয় আত্মা চুম্বকের বলে
ঈশ্বরসমীপে। নহে যবে শৃঙ্খলিত
কোন অনুতাপে, আত্মা এই ধরাধামে,
হয় ঊর্দ্ধে উত্তোলিত জ্যোতির্ম্ময় দেশে,
আকুলিত তৃষাবলে; কিন্তু নাহি পারে
হ'তে উপনীত তথা, যাবত না শিখে
মৃত্যুই জীবের মুক্তি—দুঃখের বিরাম।

[ক্রমশঃ]

শ্রীশ্রীশচন্দ্র দত্ত।

শুক্রগ্রহ।

"শুকতারা" এবং "সাঁজের তারার" কথা সকলেই জানেন; "শুকতারা ডুবিলেন রাতি পোহাইল" এই পাঠ শৈশবে পাঠশালায় পড়িয়াছেন; অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যে—"আইলা গোধূলী একটী রতন ভালে" একথাও অনেকেই পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু 'শুকতারা' বা 'সাঁজের তারা' কি? অথবা উহা আকাশে পরিদৃশ্যমান অগণিত নক্ষত্রমণ্ডলীর একটী সাধারণ তারা ব্যতীত আর কিছু, জ্যোতির্ব্বিদ্ ভিন্ন অপর কেহ এ বিষয়ে কোন আলোচনা করিয়া থাকেন কিনা সন্দেহ। শৈশব-পাঠ্য গ্রন্থের শুকতারা আমাদের পৃথিবীর ন্যায় একটী বৃহৎ গ্রহ—একই নির্দ্দিষ্ট পথে একই নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সূর্য্যের চারিদিকে অবিরাম গতিতে পরিভ্রমণ করিয়া, বিশ্বরচয়িতার সৃষ্টিকৌশল প্রচার করিতেছে। যাঁহার অলঙ্ঘ্য আদেশে আমাদের এই ধনজনপূর্ণা বসুন্ধরা, অসংখ্য নগর, গ্রাম, অসীম সমুদ্র, উত্তুঙ্গ পর্ব্বত, নদ, নদী, অরণ্যানী এবং কর্ম্মকোলাহলময় অগণিত মানব এবং জীব বক্ষে ধারণ করিয়া মহাশূন্যে প্রচণ্ডবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে; আমরাও প্রতিনিয়ত প্রকৃতির রূপপরিবর্ত্তন এবং জন্ম-মৃত্যুর বিচিত্র রহস্য অবলোকন করিয়া ভীতিবিহ্বলিত এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে যাঁহার চরণে প্রণাম করি, আকাশের পরিদৃশ্যমান অগণিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী তাঁহারই সৃষ্ট অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ড,—এ কথা চিন্তা করিতেও হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে! আমাদের পৃথিবীও অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডের একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, শুকতারাও তাহাই।

শুক্র আকারে প্রায় পৃথিবীর মত। উহার ব্যাস প্রায় ৭৬৬০ মাইল। সূর্য্য হইতে শুক্রের ভ্রমণকক্ষা ৬৭০০০০০০ মাইল দূর। আমাদের পৃথিবী যেমন ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় একবার সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, শুক্র সেরূপ ১২৫ দিনে একবার সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে—অর্থাৎ আমাদের সৌর বৎসর হইতে শুক্রের সৌর বৎসর পার্থিবদিনের ১৪০ দিন কম। শুক্র আমাদের প্রতিবেশী এবং আমাদের

নিকট হইতে ২৫২,৯৬,০০০ মাইল দূরে উহার ভ্রমণকক্ষা। সূর্য্যের পরে প্রথমেই বুধ, পরে শুক্র, তৎপরে আমাদের পৃথিবী অবস্থিত। শুক্র ও পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে উহাদের অবস্থান-ভেদে শুক্র যখন সূর্য্যের পশ্চিমে আইসে, তখন আমরা উহাকে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্ব গগনে দেখিতে পাই। ঐ সময়ে উহাকে শুক্ররাজ বা প্রভাতনক্ষত্র বলে। আর যখন সূর্য্যের পূর্ব্বে আইসে, তখন আমরা উহাকে পশ্চিমগগনে সূর্য্যাস্তের পর দেখিতে পাই। এই সময় উহাকে 'সাঁজের তারা' বলে। আজকাল সূর্য্যাস্তের পর পশ্চিম গগনে শুক্রকে দেখা যায়। এক্ষণে উহা 'সাঁজের তারা।' দিব্য চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেও খালি চক্ষে একটু অভিনিবেশসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে শুক্রকে দেখিতে পাইবেন। শুক্র কখনও পৃথিবীর অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়; কখনও অতিদূরে গমন করে।

শুক্র যে সময়ে পৃথিবীর অতি নিকটে আগমন করে, সে সময় দূরবীক্ষণযোগে শুক্রকে পর্য্যবেক্ষণ করা অসম্ভব; কারণ সে সময়ে উহার যে অংশ সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হয়; উহা সূর্য্যের দিকেই উন্মুক্ত থাকে;—পৃথিবীর দিকে অমাবস্যার চন্দ্রের ন্যায় শুক্রের অন্ধকারাবৃত অংশ থাকে বলিয়া কিছুই দেখা যায় না। এই সময়ে কখনও কখনও শুক্রকে সূর্য্যমণ্ডলের উপর দিয়া গমন করিতে দেখা যায়। উহাকে উপগ্রহণ বা Transit বলে। শুক্র যে সময় সূর্য্যের নিকট হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে দৃষ্ট হয়, সেই সময়ই শুক্রকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার উপযুক্ত অবসর। এই সময়ে আকাশে পরিদৃশ্যমান জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর মধ্যে শুক্র অধিকতর উজ্জ্বল ও বৃহৎ দেখা গিয়া থাকে। জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি ও জ্যোতিষ্ক পর্য্যবেক্ষণের জন্য বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির আবিষ্কার হওয়ায় নভোমণ্ডলের বিচিত্র রহস্য এবং মহিমময়ের অপার মহিমা ক্রমেই মানবের নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হইতেছে। পাশ্চাত্যদেশের বহু জ্যোতিষী দূরবীক্ষণ ও ফটোগ্রাফের যন্ত্রের সাহায্যে শুক্রগ্রহের বহুসংখ্যক ছবি তুলিয়াছেন। ঐ সমস্ত ছবিতে শুক্রের পৃষ্ঠদেশের অবস্থার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু শুক্রগ্রহে মনুষ্য বা তদনুরূপ অন্য কোন জীবের অস্তিত্ব আছে কিনা, তাহা আজিও নিঃসন্দিগ্ধ হয় নাই। জীবনিবাসের উপযুক্ত হইতে হইলে গ্রহে জল ও বায়ু, আলোক ও উত্তাপ এবং বাসোপযোগী ভূমির আবশ্যক। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে Tacchini আলোকবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে শুক্রের আকাশে জলীয় বাষ্পের বিদ্যমানতা প্রমাণ করিয়াছেন।

শুক্রের আহ্নিক গতির সময় সম্বন্ধে আজিও কেহই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। আমাদের চন্দ্র যেমন একবার পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করে এবং ঠিক এই সময়েই নিজের মেরুদণ্ডের উপর একবার পাক খাইয়া লয়, তদ্রূপ শুক্রও আহ্নিকগতি নিষ্পাদন করে। অনেকের মতে শুক্রের আহ্নিকগতির কাল ও ঐরূপ উহার বার্ষিকগতির কালের সমান। জ্যোতিষী শিয়া পেরলী (Sehia paraelli) ১৮৮৯ খৃঃ অঃ এইমত প্রচার করিলে, উহা সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে গৃহীত হয় নাই, কিন্তু উহার পর হইতে আচার্য্য লাউয়েল-(Lowell) প্রমুখ প্রসিদ্ধ জ্যোতিষীগণ শুক্রমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঐ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন।

তাঁহারা শুক্রের পূর্ব্ব-দেশস্থিত নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন-সকল ২২৫ দিন অন্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্তে যে ভ্রমশূন্য, তাহা বোধ হয় না। আমাদের আকাশে মেঘ হইলে যেমন চন্দ্র, সূর্য্য ও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীকে দেখা যায় না, তদ্রূপ শুক্রের বা অন্য কোন গ্রহের আকাশে মেঘের আবির্ভাব হইলে, ঐ মেঘ ভেদ করিয়া মানুষের দৃষ্টি গ্রহগণের পৃষ্ঠদেশে পৌছায় কিনা সন্দেহ। তবে যে সময়ে গ্রহগণের আকাশ নির্ম্মল থাকে, সে সময়ে উহাদের পৃষ্ঠদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ ঘটে। শুক্রের আকাশে যে সময়ে সময়ে মেঘের উদয় হয়, তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শুক্র, বুধের ন্যায় জল ও বায়ুশূন্য নহে। যেখানে জল, বায়ু ও উত্তাপ আছে, সেখানে মেঘের অস্তিত্বও অবশ্যম্ভাবী। ঐ সকল মেঘ পর্য্যবেক্ষকের নিকট ধূসর ও কপিল প্রভৃতি বর্ণের কলঙ্কের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সুতরাং ঐ সকল কলঙ্কচিহ্নের আবির্ভাব ও তিরোভাবের উপর নির্ভর করিয়া যে সকল আবিষ্ক্রিয়া লোকসমাজে প্রচারিত হইতেছে, তাহা সন্দেহশূন্য নহে। Dominie cassini ১৬৬৭ খৃঃ অঃ একটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কলঙ্কচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া নিপুণতার সহিত পর্য্যবেক্ষণে ২৩ ঘঃ ২১ মিঃ ১৫ সেঃ শুক্রের আহ্নিকগতির কাল নির্ণয় করেন। ১৭২৬ খৃঃ অঃ Biau chini নামক জনৈক ইটালীদেশীয় জ্যোতিষী ২৪ দিন ৮ ঘণ্টায় শুক্রের আহ্নিকগতি নিষ্পন্ন হয় বলিয়া প্রচার করেন। এই দুইজন জ্যোতিষীর মত লইয়া অনেক আলোচনার পর cassini র মতই জ্যোতিষীগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে জ্যোতিষী Schroter ২৩ ঘঃ ২১ মিঃ ১৯ সেঃ এ শুক্রের আহ্নিকগতি নিষ্পন্ন হয় বলিয়া মত প্রচার করেন।

শুক্রকে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় গোলাকৃতি দেখিবার সম্ভাবনা আমাদের নাই। যে সময় শুক্রের এই অবস্থা ঘটে, তখন উহা সূর্য্যের কিরণ-ছটার সীমার মধ্যে থাকায় সূর্য্যের সহিত ইহার উদয় ও অস্ত হয়। পরে যখন সূর্য্যের কিরণ-ছটার বাহিরে সূর্য্য হইতে কতকদূরে আইসে, তখনই আমরা উহাকে দেখিতে পাই—আজকাল শুক্র সূর্য্য হইতে ক্রমশই দূরে আসিতেছে, এই সময় দূরবীক্ষণ-যোগে শুক্রকে সপ্তমীর চন্দ্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব হইতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। ১৫ই মে শুক্র রাত্রি ১১-১৫ মিনিটে অস্ত গিয়াছে এবং ৩১ শে মের অস্তকাল ১১ ২২ মিনিট। শুক্রের পরিদৃশ্যমান ব্যাস ১৬"। শুক্র সূর্য্য হইতে যতই দূরে আসিবে, এই পরিদৃশ্যমান ব্যাসও ক্রমশই বৃদ্ধি পাইবে, এবং শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই ব্যাস বর্দ্ধিত হইয়া ৪০" হইবে, তখন শুক্রকে আরও বড় দেখাইবে; এই সময় উহা দ্বাদশীর চন্দ্রের ন্যায় দেখাইবে। শুক্রকে ইহার বেশী আর বড় দেখা যাইবে না। ৩০শে মে শুক্রও নেপচুন্ গ্রহ একই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাকে conjunction বা গ্রহযুতি বলে।

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র।

সংবাদ, মন্তব্য ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

গোমাতার সমাদর। গত ৪ঠা জুন কলিকাতা পিঞ্জরাপোলের ২০ বার্ষিক উৎসব সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ

নৃপতি "মহারাজ বাহবঙ্গ" সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিঞ্জরাপোলের কার্য্যক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে, জানিয়া আনন্দিত হইলাম। গাভী দেবী-রূপা। হত্যাকারীর হস্ত হইতে রুগ্ন ভগ্নস্বাস্থ্য গোকুলের উদ্ধার ও রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া পিঞ্জরাপোলের কর্ত্তৃপক্ষ সমগ্র হিন্দুজাতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ভগবৎকৃপায় তাঁহারা আরও অধিকদূর অগ্রসর হইয়া গোরক্ষাব্রতে পূর্ণ সাফল্য লাভ করুন।

হিন্দু-বিদ্বেষ। হল্ওয়েল্স্ লেনস্থ হামিদিয়া প্রেস হইতে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার ক্ষুদ্র কলেবর হিন্দুবিদ্বেষবিষে পরিপূর্ণ। পুস্তিকা-রচয়িতা একজন মুসলমান্। পুস্তকে প্রকা-রান্তরে মুসলমান্গণকে সর্ব্বত্র গোবধের অনুকূলে উত্তেজিত করা হইয়াছে, আর গবর্ণমেণ্টকে হিন্দুদের প্রতিমাপূজা বন্ধ করিয়া দিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। চিন্তাশীল ধর্ম্মপ্রাণ স্বদেশহিতৈষী মুসলমান্-গণ এই পুস্তক ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিবেন, এচিন্তা বোধ হয় তরলমতি গ্রন্থকারের সঙ্কীর্ণ মস্তিষ্কে স্থান পায় নাই! এই শ্রেণীর লোকই সমাজের শত্রু। যাঁহারা দেশে অশান্তিকর পুস্তকাদি খুজিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহারা এই "গোরু ও হিন্দুমুসলমান্" নামক পুস্তকের সন্ধান রাখেন কি?

সতীর কাহিনী। ৬নং চড়কডাঙ্গা রোডের সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের পত্নী শৈবলিনী দাসী স্বামীর মুমূর্ষুদশায় নিজেই নিজের গায়ে কেরোসিন মাখিয়া আগুণ ধরাইয়া দিয়া মৃত্যুর আয়োজন করিয়া-ছিলেন। নিয়তির বিধানে পতি ও পতিব্রতার দেহ একই শ্মশানে ভস্মীভূত হয়। অল্প দিন হইল ইহাদের শ্রাদ্ধাদি হইয়া গিয়াছে। সহমরণ রাজবিধানে উঠিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু যে সতী স্বামীর অবর্ত্তমানে সংসারে থাকিতে চাহেন না, তাঁহাকে কে নিবারণ করিতে পারে? ভারতের মাটীতে অনেক সতীর দেহভস্ম মিশিয়া আছে, উহাই ভারতের "যথার্থ বিভূতি"। ভারতীয় হিন্দু-জাতিই জগৎকে এই দৃশ্য সুচারুরূপে দেখাইতে পারিয়াছে।

অন্তর্দ্রোহ। হিন্দু ও মুসলমান্ বিধা-তার বিধানে একই অবস্থাশৃঙ্খলে বদ্ধ, এ অবস্থায় পরস্পরের প্রতি প্রেম-প্রবণতার প্রয়োজন। অন্তর্দ্রোহ ঘটিলে উভয়েরই সর্ব্ব-নাশের পথ পরিষ্কৃত হইবে। এই সেদিন খুলনা জেলায় হিন্দুমুসলমানে ভীষণ বিবাদ উপস্থিত হইল, এখনও তাহার জের মিটে নাই, আবার ক্যানিং টাউনের অন্তর্গত দারায়াবাদে বারোয়ারি পূজা উপলক্ষে হিন্দুমুসলমানে ভীষণ মারামারি হইয়া গিয়াছে। এই সকল সংবাদে আমরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া পড়িতেছি। নিজেরা ইচ্ছা করিয়া সুখের পথে কাঁটা দিলে কে রক্ষা করে? ভগবান্ এই অন্তর্দ্রোহ শান্তি করুন। হিন্দুমুসলমানের সুমতি দিন।

তাম্রকূট না কালকূট? ল্যান্সেট্ পত্রিকায় ডাক্তার ফেরাণ্ট তামাকের অপকারিতা ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে তামাক-সেবনে বধিরতা জন্মে ও হৃদ্‌যন্ত্রের বিকৃতি ঘটে। আমাদের দেশে বালক-বৃদ্ধ সকলেই সিগারেট্‌খোর হইয়া পড়িতেছে। আগে গুড়ুক্ তামাক বেশী চলিত, সেটা তত অপকারী নয়; কারণ জলের অভ্যন্তর দিয়া আসিবার সময় দূষিত অংশ অনেকটা সংশোধিত হয়, কিন্তু সিগারেট্ বা চুরুটে অপকারের সীমা নাই। এ উৎপাত ছাড়িলে ক্ষতি কি?

অন্তর্দ্ধান না আর কিছু? শ্রীবৃন্দাবনধামের শ্রীগোবিন্দজী বিগ্রহ খণ্ডিত হইয়াছেন, শুনিয়া আমরা নিরতিশয় দুঃখিত হইলাম। শুনিলাম, পুনরায় নববিগ্রহ স্থাপনের জন্য উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। আমরা কিন্তু শঙ্কিত। দেবমূর্ত্তির এরূপদশা দেখিয়া মনে হয়—এদেশে দেবতারাও বুঝি তিষ্টিতে পারিতেছেন না! ভাবিয়া চিন্তিয়া অবাক্ হইতেছি।

সেরপুরের ইতিহাস। শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু প্রণীত। মূল্য আট আনা। এই গ্রন্থখানি রঙ্গপুরসাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার পঞ্চমভাগের এক অতিরিক্ত-সংখ্যাস্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্যপরিষদের সভ্যগণ এই পুস্তক বিনামূল্যে পাইবেন। পুস্তকে বহুতর চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকের কাগজ ভাল, ছাপাও নিতান্ত মন্দ নয়। গ্রন্থকার এই পুস্তকে প্রভূত গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীন বিবরণ এত সংক্ষিপ্ত ও এত অসম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, পুস্তক পাঠ করিয়া এমন অনেক কথা জানিতে ইচ্ছা হয়, যে সকল বিষয়ে গ্রন্থকার একটু কষ্ট করিলেই পাঠকের ঔৎসুক্য-নিবৃত্তি করিতে পারিতেন। ইতিহাস জাতীয়তার অবলম্বন। যাঁহারা এইভাবে দেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস-রচনার উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন, তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে এইশ্রেণীর গ্রন্থ রচিত হইতেছে দেখিয়া, আমরা আশান্বিত হইতেছি, কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটী কথা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। কতিপয় সম্ভ্রান্তবংশের বা ব্যক্তির বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া ঐতিহাসিক স্থানের সাধারণ-বিবরণ অপূর্ণভাবে অতিসংক্ষেপে প্রকাশ করিলে ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস উহা হইতে বহুদূরে। ঐতিহাসিকগণ এই কথাটীর প্রতি মনোযোগ করিলে, দেশের—দশের ও ভাষার অধিক উপকার করিতে পারিবেন। উপসংহারে আমরা গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, ভবিষ্যতের জন্য আশাপোষণ করিতে লাগিলাম।

অন্নসংস্থান। শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ প্রণীত। এই পুস্তক আকারে ডবল ক্রাউন ১৬ পেজির ১ ফর্ম্মা মাত্র। ইহা ময়মনসিংহ-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত শিল্প-ব্যবসায়-সমস্যাবিষয়ক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। গ্রন্থকার কতকগুলি ক্ষুদ্র ব্যবসায়

অবলম্বন করিয়া অন্নসংস্থানের পরামর্শ দিয়াছেন। অনেক সময়ে বিরাট্ আয়োজনে কার্য্য করিতে গিয়া আমরা বিফল-মনোরথ হই। অল্প মূলধনে তীব্র প্রতিযোগিতার ভয় এড়াইয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ব্যবসায় গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহাতে অপেক্ষাকৃত সহজে ও নিরাপদে অন্নসংস্থানের দ্বার উন্মুক্ত হয়; এ গুলির দিকে নজর দিলে হানি কি? গ্রন্থকার জাতিগত শিল্প-ব্যবসায়ী ব্যতিরেকে আপাততঃ আপামর-সাধারণকেই শিল্পব্যবসায়ে যাইতে বাধা দিতে চাহেন। তাঁহার মত,—নানা অবস্থার মধ্য দিয়াও আমাদের জাতিশিল্পীরা আত্মরক্ষা করিতেছে, ইহাদের শক্তি অল্প নয়। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ই বিরাট্ কারবারের কাছে জয়লাভ করিতে সমর্থ। বৃহৎ ব্যবসায়ের চেষ্টায় আমরা বহুধা অকৃতকার্য্য হইতেছি, সুতরাং ক্ষুদ্র ব্যবসায় লইয়া অর্থ সংগ্রহ ও কর্ম্মপটুতা লাভ করি, পরে ক্রমে বৃহতের দিকে অগ্রসর হওয়া যাইবে। গ্রন্থকারের মন্তব্যগুলি সকলেরই চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। আমরা ইহা পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম।

উত্তরবঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন। তৃতীয় অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ। প্রথমভাগ। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত। মুদ্রণ ও কাগজ সুন্দর, বহুতর চিত্র সুশোভিত। কার্য্যবিবরণ পাঠ করিয়া জানা যায়,—উত্তরবঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন ক্রমশঃ সফলতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সম্মিলনের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত। একবার ৩,৪ দিনের জন্য সাহিত্যিকগণ সম্মিলিত হইলেই সাহিত্যের ঋণশোধ হয় না। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, উত্তরবঙ্গসাহিত্যসম্মিলন আসামীর ভাষার মধ্য দিয়া বঙ্গ ও আসামের ইতিহাসের লুপ্তপ্রায় উপকরণ-সংগ্রহে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া এবং পুরাতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ের গবেষণায় মনোযোগ করিয়া, আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিকপঞ্জী অসম্পূর্ণা, তথাপি আনন্দের ও আশার আলোক আনয়ন করে। পূর্ব্বে যে 'সাহিত্যে দলাদলির' একটা রব উঠিয়াছিল, সেটা ভালরূপ থামিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে না। বিচ্ছিন্নভাবে বা সম্মিলিতভাবে, যে, যে ভাবে সমর্থ, কাজ করিলেই হইল। আমরা বিবরণ পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম এবং ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় রহিলাম।

কোহিনুর। মাসিকপত্র ও সমালোচন। প্রথমখণ্ড, প্রথমসংখ্যা। ১৩১৮ বৈশাখ। বার্ষিক মূল্য দুইটাকা। কাগজ—ছাপা মন্দ নয়। পুরাতন কোহিনুর নব-পর্য্যায়ে আবির্ভূত। কোহিনুর হিন্দুমুসল্মানে সম্প্রীতি স্থাপন করিতে চাহেন। আগেকার কোহিনুরও চাহিতেন। কথা ভাল, কিন্তু কাজ হওয়ার অনেক অন্তরায়। কোহিনুর পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত

হইলাম। প্রবন্ধগুলি মোটের উপর মন্দ লাগিল না। কোহিনুরের দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

নির্ম্মাল্য। মাসিকপত্র ও সমালোচন। ২য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। সম্পাদক শ্রীবসন্তকুমার বসু। নির্ম্মাল্য কান্তিতে মলিন, কিন্তু সৌরভে দীন নহে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের কর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি সুপাঠ্য, তবে বিশেষত্ব উপলব্ধি করিতে কষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের 'চুকুল ও পারিকা' বৌদ্ধকাহিনী মন্দ নয়। শিশিরকুমারের একটী ক্ষুদ্রতম জীবনী আছে। কালে সৌরভ ছুটিতে পারে। আপাততঃ ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া থাকা যাইতে পারে। নির্ম্মাল্যের সদ্ব্যবহার হউক্।

প্রতিবাসী। সুলভ মাসিকপত্র। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩১৮ বৈশাখ। বার্ষিক মূল্য ৸৹ আনা। সস্তাই বটে, তবে শেষে 'কর অবস্থা' হয়, তা কে জানে! এই সংখ্যায় সম্রাট্ ও সম্রাট্-মহিষীর মনোরম চিত্র আছে। প্রতিবাসীর লেখকগণ সাহিত্য-সংসারের লোক। প্রবন্ধগুলি বিশেষত্ব-বর্জ্জিত হইলেও সুরুচিবিবর্জ্জিত নহে। পরমহংসের উপদেশ চিরনূতন। মহাপুরুষের জীবনী কয়েক পংক্তির পরেই "ক্রমশঃ" তবুও ভাল। প্রতিবাসীর মঙ্গল হউক্।

দেবালয়। মাসিকপত্র ও সমালোচন। ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৩১৮ জ্যৈষ্ঠ। এই সংখ্যার মূল্য ৵৹ আনা। মোটের উপর মন্দ নয়। প্রবন্ধগুলিতে উদারতা ও সত্যপক্ষপাত দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। "আধ্যাত্মিক জাতিবিচার" প্রবন্ধটী চিন্তার দ্বারে আঘাত করে। "দেবালয়" দেবকৃপায় বঞ্চিত নহে ত? ভগবান্ করুন, নাম সার্থক হউক্।

শান্তিকণা। ১৩১৭ অগ্রহায়ণ ও পৌষ। সুদীর্ঘকাল পরে অতীত বৎসরের অগ্রহায়ণ-পৌষ যুগল-সংখ্যার 'শান্তিকণা'র সাক্ষাৎ পাইয়া পুলকিত, বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম। শান্তিকণা 'কণা' হইলেও সংসারের সকলেরই প্রাণের জিনিষ, তাহাতে সন্দেহ নাই; এই 'কণা' টুকুও যে আবার জন-সমাজে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাতে আমরা আনন্দিত হইলাম। শান্তিকণা প্রবন্ধগৌরবে নিতান্ত দীনা নহে, কিন্তু সুদীর্ঘ অর্দ্ধবর্ষকাল শান্তিকণার সাক্ষাৎ না পাইয়া আমরা সনাতন নিয়মানুসারে শান্তিকণার ভাগ্য-লিপী সম্বন্ধে যাহা চিন্তা করিয়াছিলাম, সেই চিন্তা স্রোত সহসা প্রতিহত হওয়ায় বিস্মিতও হইলাম। আবার, মাসিক-পত্রিকার যথারীতি প্রকাশের বাধা ও সঙ্গে মাসিক-পত্র-পাঠকের বিরলতা এবং উদাসীনতা স্মরণ করিয়া দুঃখিতও হইলাম। শান্তিকণার এ সংখ্যা বেশ হইয়াছে। ভগবান্ শান্তিকণার উপর কৃপাকণা বর্ষণ করুন।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১৮শ বর্ষ, ১৮শ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। শ্রাবণ। ১৩১৮ সাল, ১৮৩৩ শকাব্দাঃ।

যোগদর্শন-ভাষ্য

(পাতঞ্জলদর্শনের অর্থবোধ-প্রয়াস।)

অবতরণিকা।

যোগশাস্ত্রে কোন প্রকার দ্বৈতমত প্রতিপন্ন হয় নাই। দ্বৈতমত এবং দৃশ্য-দর্শন-নিবৃত্তির জন্যই যোগশাস্ত্রের উপদেশ। ব্রহ্মজ্ঞানই ইহার লক্ষ্য। ব্রহ্মজ্ঞানে কোন প্রকার দ্বৈতমত থাকিতেই পারে না। উদাহরণ স্বরূপ যোগশাস্ত্র হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল ;—

যথৈকঃ কল্পকঃ স্বপ্নে নানাবিধতয়েষ্যতে।
জাগরেঽপি তথাপ্যেকস্তথৈব বহুধা জগৎ॥
সর্পবুদ্ধির্যথা রজ্জৌ শুক্তৌ বা রজতভ্রমঃ।
তদ্বদেবমিদং বিশ্বং বিবৃতং পরমাত্মনি॥
রজ্জুজ্ঞানাদ্যথা সর্পো মিথ্যারূপো নিবর্ত্ততে।
আত্মজ্ঞানাত্তথা যাতি মিথ্যাভূতমিদং জগৎ॥
রৌপ্যভ্রান্তিরিয়ং যাতি শুক্তিজ্ঞানাদ্যথা খলু।
জগদ্ভ্রান্তিরিয়ং যাতি চাত্মজ্ঞানাৎ সদা তথা॥
যথা বংশোরগভ্রান্তির্ভবেত্তেকবসাঞ্জনাৎ।
তথা জগদিদং ভ্রান্তিরধ্যাস-কল্পনাঞ্জনাৎ॥
আত্মজ্ঞানাদ্ যথা নাস্তি রজ্জুজ্ঞানাদ্ভুজঙ্গমঃ।
তথা দোষবশাৎ শুক্লং পীতং ভবতি নান্যথা।
অজ্ঞানদোষাদাত্মাপি জগদ্ভবতি দুস্ত্যজম্॥
দোষনাশে যথা শুক্লং গৃহ্যতে রোগিণা স্বয়ম্।
শুদ্ধজ্ঞানাৎ তথাজ্ঞাননাশাদাত্মতয়া ক্রিয়া॥
কালত্রয়েঽপি ন যথা রজ্জুঃ সর্পো ভবেদিতি।
তথাত্মা ন ভবেদ্বিশ্বং গুণাতীতো নিরঞ্জনঃ॥

"স্বপ্নে যেমন এক বস্তুর কল্পনা নানা প্রকারে হয়, কিন্তু জাগ্রতাবস্থায় সে বস্তু একই থাকে, সেইরূপ মায়ানিদ্রাভিভূত ব্যক্তি আত্মা ভিন্ন জগৎকে অনেক প্রকার দেখে। যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ভাসে, সেইরূপ পরমাত্মাতে এই বিশ্বরূপ (নিষেধকরে) বিস্তারিত হইয়াছে। যথার্থ রজ্জুজ্ঞান হইলে যেমন মিথ্যা সর্পরূপ নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ আত্মজ্ঞান জন্মিলে মিথ্যাভূত এই বিশ্বরূপের নিবৃত্তি

হয়। যথার্থ শুক্তিজ্ঞান জন্মিলে যেমন রৌপ্য-ভ্রান্তি আর থাকে না, সেইরূপ আত্মজ্ঞান জন্মিলে জগদ্‌ভ্রান্তি নষ্ট হয়। যেমন মণ্ডুক-তৈলকৃত অঞ্জন, নেত্রদ্বয়ে দিলে, বংশে সর্পভ্রম হয়, সেইরূপ অভ্যাস-কল্পনারূপ অঞ্জন-হেতু আত্মাতে জগদ্‌ভ্রান্তি জন্মে। যেমন রজ্জু-জ্ঞানে সর্পভ্রম দূর হয়, তদ্রূপ আত্মজ্ঞানে জগদ্‌ভ্রান্তির শান্তি হয়। যেমন পিত্তরোগ-বিশিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টির দোষে শুক্লবর্ণ পীত-বর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তাহার অন্যথা হয় না, তদ্রূপ অজ্ঞানদোষে আত্মাও জগদ্রূপে ভাসেন, কিন্তু মুগ্ধ ব্যক্তির সে ভ্রম দুস্ত্যজ হয়। যেরূপ দোষনাশে অরোগি-ব্যক্তির ভ্রান্তি দূর হইয়া স্বরূপজ্ঞান জন্মে। যদ্রূপ আগামী, বিদ্যমান, গত, এই ত্রিকাল ব্যাপিয়া রজ্জুতে সর্পভ্রম থাকে না, সেইরূপ গুণাতীত নিরঞ্জন পরমাত্মাও জ্ঞানদশাতে বিশ্বরূপে ভাসেন না।"

ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইল যে, দৃশ্য-দর্শন (জগদাদি) প্রকৃত প্রস্তাবে নাই, তবে ভ্রমে ইহা দেখা যায়। এই ভ্রমনাশের জন্যই যোগ-সাধনা। যোগশাস্ত্র হইতে এইরূপ সহস্র সহস্র শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা নিষ্প্রয়োজন। "নির্ব্বিকল্প-সমাধির" উপদেশ থাকায় এই কথা আরও সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। পূর্ণ ও স্থায়ী ব্রহ্ম-জ্ঞানের স্ফুরণ কেবল নির্ব্বিকল্প সমাধি অব-স্থাতেই উদিত হয়। এই নির্ব্বিকল্প সমাধি সমস্ত সাধনার শেষ। এই সমাধির কথা মুখে বলা যায় না। ইহা সাধন দ্বারা নিজবোধ-রূপ। তথাপি আংশিকভাবে শিষ্যবোধের জন্য এই নির্ব্বিকল্প সমাধির কথা বলিতে হইলে (তাঁহাদের কথাতে) এইভাবে বলা যায়,—'লয়-বোধ-আনন্দ-স্তম্ভন স্বরূপে নির্ব্বিকল্প-সমাধি-দশায় অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান অতি বর্ণাশ্রম-নির্ব্বাণ মৌন শান্ত অতীত ব্রহ্মলিঙ্গ-স্বরূপ যোগীশ্বর হইবে। এই অবস্থায় জ্ঞানাকাশ বা আত্মচেতন শিরঃকপাল হইতে বহিষ্কৃত হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এইভাবে ব্যাপ্ত করিবে। যথা—

ব্রহ্মজ্ঞান—"শান্তাতীতম্।"
ব্রহ্মজ্ঞান—"শূন্যাতীতম্।"
ব্রহ্মজ্ঞান—"ব্যাপকাতীতম্।"
ব্রহ্মজ্ঞান—"সাক্ষ্যাতীতম্।"
ব্রহ্মজ্ঞান—"আনন্দাতীতম্।"

এইরূপ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সম্পূর্ণ লীন হইলে, তুমি স্বয়ং ব্রহ্ম বা সর্ব্বব্যাপী অনন্ত আত্মা হইবে। যাবৎ এই দেহত্যাগ না কর, তাবৎ যোগীশ্বর ভাবে অবস্থিতি করিবে। চিরকাল অহরহ এই নিত্য আনন্দ ভোগ করিবে। এই অবস্থায় তোমার ত্রিপুটি-ভেদ থাকিবে না। ব্রহ্মাহম্, শিবোহহম্, নিত্যোহহম্, শূন্যোহহম্, সাক্ষ্যহম্, একোহ-হম্, আনন্দোহম্ এইরূপ ভাব জন্মিবে।' এ সম্বন্ধে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত এই যোগ-গ্রন্থখানি যোগ-শাস্ত্রের দর্শন, (অতএব) ইহাতে ভগবান্ পতঞ্জলি কোন প্রকার দ্বৈতমত স্থাপন করেন নাই বা করিতে চেষ্টা করেন নাই। তবে অদ্বৈতমত-সংস্থাপনার্থে নানা প্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন এই মাত্র। এই যুক্তিগুলি আজকাল বুঝিবার দোষে দ্বৈতমতে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রকৃত উহা দ্বৈত-মতের জন্য নহে, গ্রন্থমধ্যে তাহা পরিস্ফুট

করিতে চেষ্টা পাইব। পূর্ব্বে সকলে দৈবী-স্পন্দনে থাকিতেন—ছন্দে থাকিতেন। তাঁহারা দেহ মন ইন্দ্রিয়াদিকে স্বেচ্ছামত স্পন্দনে স্পন্দিত করিতে পারিতেন। সেইজন্য তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার ভেদাভেদ ছিল না। আর সমাধি অবস্থায় প্রত্যক্ষানুভূতির দ্বারা যে সমস্ত সত্য তাঁহাদের মধ্যে প্রকটিত হইত, তাহাই তাঁহারা সাধারণের হিতকল্পে প্রকাশ করিতেন। তাহাতে ভ্রমের লেশমাত্রও থাকিতে পারে না। সেইজন্য মহাযোগেশ্বর-প্রকটিত গ্রন্থগুলি ছন্দোবদ্ধ ও অতি সংক্ষিপ্ত হইত। সেইকালে উহা বুঝিতে কোন প্রকার গোলযোগ হইত না; কারণ শিষ্যেরা শ্রীগুরূপদেশ অনুসারে শাস্ত্রের অর্থ প্রাপ্ত হইতেন এবং ছন্দে থাকিতেন। শিষ্যেরা সেই সত্যগুলির উপদেশ পাইয়া সমাধি-অবস্থায় সেগুলি স্বয়ং অনুভব করিতেন। কিন্তু আজকাল আমরা যোগেশ্বর-প্রকটিত অতি সংক্ষিপ্ত ছন্দোবদ্ধ সূত্রগুলি বুঝিতে পারিনা কেন? অবশ্য আমরা শ্রীগুরূপদেশ পাই না বলিয়া, ছন্দে থাকিতে জানি না বা পারি না বলিয়া, কোন প্রকার সাধন ভজন নাই বলিয়া। এখন ভাষ্যের পর ভাষ্য রচনা হইতেছে—পরস্পর সমস্তই ভিন্ন। সেকালে এত ভাষ্যও ছিল না, বুঝিতে কাহারও এত কষ্টও হইত না। আমাদের সংযম নাই, শিক্ষা নাই, আছে কেবল ব্যভিচারী চিত্তের জল্পনা—কল্পনা। আমরা এই অশাস্ত্রীয় বুদ্ধির দ্বারা শাস্ত্রবিষয়ে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা করিয়া নিজ নিজ মত স্থাপনে চেষ্টা করিতেছি, তাহা যে আমাদের কতদূর মূঢ়তা, তাহা বলা যায় না। যোগ-শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব গুরুবক্ত্রগম্য। আমি সাধন ভজনবিহীন অতি মূঢ় ব্যক্তি। আমি যে ইহার আলোচনা করিতেছি (ও করিয়া প্রকাশ করিতেছি) তাহা কেবল সাধু মহাত্মাগণের কৃপা-প্রার্থনার জন্য। মহাত্মাগণ যেন আমাকে কৃপা করেন ও আশীর্ব্বাদ করেন!

(সমাধিপাদ।)

অথ যোগানুশাসনম্॥ ১

অনন্তর যোগানুশাসন (যোগসাধন-পদ্ধতি) কথিত হইতেছে। যোগশাস্ত্র বলেন—

অথ ভক্তানুরক্তোহি বক্তি যোগানুশাসনং।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানামাত্মমুক্তি-প্রদায়কম্॥
ত্যক্ত্বা বিবাদশীলানাং মতং দুর্জ্ঞানহেতুকং।
আত্মজ্ঞানায় ভূতানামনন্যগতি-চেতসাং॥

"অনন্তর ভক্তানুরক্ত, সর্ব্বজীবের আত্ম-মুক্তিপ্রদ ঈশ্বর, বিবাদশীলদিগের দুর্জ্ঞান-হেতুক মতসকল পরিত্যাগ করিয়া, অনন্যগতি ও অনন্যচেতা ভক্তগণের আত্মজ্ঞান-লাভের জন্য যোগানুশাসন কহিতেছেন।"

যোগ-সাধনের প্রয়োজন কি? না—আত্ম-জ্ঞান-লাভ। এই আত্মজ্ঞান-লাভের জন্যই যোগ সাধন করা সকলের প্রয়োজন। সেই জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক ইহা প্রকাশিত। ঈশ্বর যেমন জীব সৃষ্টি করেন, সেই সঙ্গে করুণাপরবশ হইয়া জীবের উদ্ধার-জন্য—সর্ব্ব-দুঃখ-নিবৃত্তি-জন্য যোগশাস্ত্র প্রকাশ করেন; যাহার আচরণে জীব শিব হইতে পারে। গীতাশাস্ত্রেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥ ৩।১০ অঃ

"সৃষ্টির আদিতে (প্রথম সৃষ্টি করিবার সময়) প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন—এই সমস্ত যজ্ঞ পালন দ্বারা তোমরা (স্বরূপপথে) উন্নতি প্রাপ্ত হও—ইহা তোমাদের চরম উদ্দেশ্যের প্রসবিতা হউক্।" যজ্ঞের কতকগুলি তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিবৃত করিয়া বলিতেছেন—

"এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণোমুখে।"

৩২।৪ অঃ

"এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞের কথা গুরুর নিকট গুপ্ত আছে। (অর্থাৎ ঐ সমস্তের সাধন-প্রণালী গুরুর নিকট পাইতে হয়, তবে সাধন করা যায়।"

এই যজ্ঞের ফল কি তাহা বলিতেছেন,—

"যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্॥

৩০।৪ অঃ।

"গুরুমুখে (অধিকারানুসারে) যজ্ঞের প্রণালী জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিয়া, সিদ্ধিলাভ করিলে, অমৃত ফল উৎপন্ন হয়। সাধক ঐ সাধনপ্রাপ্য (ক্রিয়ার পর অবস্থা) অমৃতফল ভোজন করিয়া ব্রহ্মে লীন হন" ইহাই নির্ব্বাণ। ইহাই যোগ। ইহার কথা পর শ্লোকে বলা যাইবে। (যজ্ঞের অর্থ অধিকার-ভেদে নানা প্রকার যোগসাধনপদ্ধতি।)

তাহা হইলে কেন যোগ সাধন করিতে হইবে, তাহা বুঝা গেল।

যোগশাস্ত্র আরও বলেন—

আলোচ্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং যোগশাস্ত্রমতং পরং॥
যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বমিদং জ্ঞাতং ভবতি নিশ্চিতং।
তস্মিন্ পরিশ্রমঃ কার্য্যঃ কিমন্যৎ শাস্ত্র ভাষিতং॥

সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনা করিয়া এবং সর্ব্ব-শাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া, এই যোগ-শাস্ত্রোদিত মতকেই সুনিষ্পন্ন করা হইয়াছে। যোগসাধনা দ্বারা সাধক ব্রহ্মস্বরূপ হন। অত-এব অন্য শাস্ত্রানুমোদিত মতে প্রয়োজন কি? একান্তভাবে সকলেরই (নিজস্বরূপ-প্রাপ্তির জন্যে) যোগসাধনে পরিশ্রম করাই উচিত।

যোগবাশিষ্ঠে মহর্ষি বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন—

"দুঃসহা রাম! সংসার-বিষ-বেগ-বিসূচিকা।
যোগ গারুড়-মন্ত্রেণ পাবনেনোপশাম্যতি॥)

"রাম! সংসার-বিষে যে বিসূচিকা রোগ জন্মে, তাহা অত্যন্ত দুঃসহ। যেমন গারুড়-মন্ত্র দ্বারা উক্ত ব্যাধির নিবারণ হয়, সেইরূপ এই সংসার নিবৃত্তির একমাত্র উপায় যোগ।"

স্কন্দপুরাণ বলিতেছেন—

"আত্মজ্ঞানেন মুক্তিঃ স্যাত্তচ্চ যোগাদৃতে ন হি।"

"একমাত্র আত্মজ্ঞান (বা ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ হইলেই মুক্তি হয়, কিন্তু যোগ ব্যতীত এই আত্মজ্ঞান-লাভ হয় না।"

দেব ও দেবর্ষিগণ কপিলদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—যাহা সর্ব্বভূতের একান্ত মঙ্গল-কর, এমন কি কীট পতঙ্গাদিরও উপকারক এবং শ্রেয়স্কর, তাহা আমাদিগকে বলুন। ইহার উত্তরে কপিলদেব বলেন—

"যোগ এব পরং শ্রেয়স্তেষামিত্যুক্তবান্ পুরা।")

বিষ্ণুপুরাণ।

"একমাত্র যোগই সকলের মঙ্গলপ্রদ। ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহর্ষিগণ কর্ত্তৃকও কথিত হইয়াছে।"

শ্রীভগবান্‌ও গীতায় বলিতেছেন,—
"মষ্যাসক্তমনাঃ পার্থ! যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥"

"হে পার্থ। তুমি যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রথমতঃ আমাতে একান্ত অনুরক্ত ও একান্ত আশ্রিত হইয়া, পরে (যোগে পরিপক্ব হইলে) যে রূপে সর্ব্ব প্রকার সন্দেহশূন্য হইয়া আমার নির্গুণ বা পরমভাবকে সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে (অর্থাৎ তাহাতে থাকিতে) পারিবে, তাহা (অর্থাৎ সেই যোগসাধন) শ্রবণ কর।"

শ্রুতি বলিতেছেন,—
"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

তাঁহাকে (অর্থাৎ ব্রহ্মকে অপরোক্ষভাবে) জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তির আর অন্য পথ নাই।"

দক্ষস্মৃতি বলেন,—
'অযোগী নৈব জানাতি জাত্যন্ধো হি যথা ঘটম্‌'

"যেমন জন্মান্ধ ব্যক্তি ঘটাদি কোন পদার্থ দেখিতে পায় না, সেইরূপ অযোগী ব্যক্তি (অর্থাৎ যে যোগসাধন করে না সে) ব্রহ্মকে জানিতে পারে না।" ব্রহ্মকে (অপরোক্ষভাবে) না জানিলে কিছুতেই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হইবে না, ব্রাহ্মীস্থিতি না হইলে শোকাদির হস্ত হইতে চিরদিনের জন্য মুক্ত হইবার কোন পথই নাই, আবার যোগসাধন ব্যতীত ব্রাহ্মীস্থিতি-লাভ হইতে পারে না। সেইজন্য যোগবীজ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—
নানাবিধৈর্ব্বিচারৈস্তু ন সাধ্যং জায়তে মনঃ।
তস্মাত্তস্য জয়ঃ প্রায়ঃ প্রাণস্য জয় এব হি॥

অতএব আত্মজ্ঞানলাভেচ্ছুর যোগসাধন করিতে হইবে।

কূর্ম্মপুরাণ বলেন——
"অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি যোগং পরমদুর্ল্লভম্‌।
যেনাত্মানং প্রপশ্যন্তি ভানুমন্তমিবেশ্বরম্‌॥
যোগাগ্নির্দ্দহতি ক্ষিপ্রমশেষং পাপপঞ্জরম্‌।
প্রসন্নং জায়তে জ্ঞানং জ্ঞানান্নির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥"

"অতঃপর পরম দুর্ল্লভ যোগের কথা বলিব। কেন না ইহার দ্বারা সাধকগণ আত্ম-দর্শন করিতে পারিবেন। যোগরূপ অগ্নিদ্বারা (পাপস্বরূপ) ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মবন্ধন হইতে সাধকগণ মুক্ত হন, ক্রমে যোগ সাধন করিতে করিতে দিব্যজ্ঞান (অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান) জন্মে (এই অবস্থাই ব্রাহ্মীস্থিতি); পরে সেই জ্ঞান হইতেই (নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বনে শরীরপতন-) সাধক 'নির্ব্বাণ' পাইয়া থাকেন।"

এতাবতা যোগসাধনের আবশ্যকতা দেখান হইল। যোগ কি? বলিলে একটা কিম্ভূত-কিমাকার কিছু বুঝিতে হইবে না। যেখানে সেখানে যোগ শব্দের উল্লেখ আছে, সেখানে মূল পঞ্চবিধ যোগের মধ্যে কোন একটার কথা (অধিকারী বিশেষে) বলা হইতেছে। যোগ-সাধন ব্যতীত কিছুতেই আমরা নিত্য-শুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত হইতে পারিব না। সেইজন্যই ভগ-বান্‌ পতঞ্জলি যোগানুশাসন বলিতেছেন। এখন যোগ এবং তৎ প্রাপ্তির (একমাত্র প্রধান) উপায় কি তাহাই পরশ্লোকে বলিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মচারী শ্যামসুন্দর গোস্বামী।

মুনি-বংশ।

ভৃগুবংশ।

বরুণযজ্ঞে পুরোহিত প্রজাপতি যে অগ্নি স্থাপন করেন সেই বহ্নিগর্ভে মহর্ষি ভৃগু সমুদ্ভূত হন। ভৃগুপত্নী (পুলোমা) ইন্দ্রবধে উদ্যত হইলে, বিষ্ণু ভৃগুপত্নীকে নিহত করেন।— জায়াশোকে অধীর হইয়া, বিষ্ণুর বক্ষে মহর্ষি পদাঘাত করেন। ভৃগুপদ-লাঞ্ছনে তদবধি বিষ্ণুর বক্ষ সুশোভিত হইয়া আছে।

ভৃগুপত্নী পুলোমাকে পুলোমা রাক্ষস বরাহ-রূপ ধারণে হরণ করিতেছে দেখিয়া, ভৃগুপত্নীর গর্ভস্থ সন্তান কোপভরে গর্ভ হইতে নিঃসৃত হইলেন। এই ভৃগুপুত্র চ্যবন নামে বিখ্যাত আছেন। খ্যাতির গর্ভে মহর্ষি ভৃগুর ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র জন্মে এবং শ্রীনামে কন্যা জন্মে। এই শ্রীদেবী—স্ত্রীগ্রহ শুক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং তিনি দেবদেব নারায়ণের পত্নী। মধ্যভারতে নর্ম্মদা ও বাণগঙ্গা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে মহর্ষি ভৃগুর আশ্রম ছিল। বেদমতে মহর্ষি চ্যবন বৃদ্ধ হইলে পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। অশ্বিদ্বয়, মহর্ষির মায়াময় জরাগ্রস্ত দেহ মোচন করিয়া তাঁহাকে দীর্ঘ আয়ু ও নব যৌবন দান করেন এবং তাঁহাকে তাঁহার পত্নীর কমনীয় করেন।

শতপথব্রাহ্মণ-মতে যখন ভার্গবগণ বা আঙ্গিরসগণ স্বর্গারোহণ করেন, তখন ভার্গব চ্যবন বা আঙ্গিরস চ্যবন মায়াময় জীর্ণদেহ ধারণ করিলেন বলিয়া পরিত্যক্ত হইলেন। মনুপুত্র শর্য্যাতরাজ সদলবলে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি চ্যবনের প্রতিবেশে উপনীত হইলেন। তাঁহার কুমারবৃন্দ চ্যবনের জরাক্রান্ত দেহ অপদার্থ-জ্ঞানে তাহাতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিল। চ্যবন শর্য্যাত-সন্তানগণের প্রতি কুপিত হইলেন; এবং তিনি তাহাদিগকে সংজ্ঞাহীন করিলেন। পিতা পুত্রের সহিত এবং ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল। শর্য্যাত মনে মনে চিন্তা করিলেন—আমি কি অপরাধে অপরাধী—যে এই আপদে পড়িলাম। তিনি গোপাল ও অবিপালগণকে ডাকিয়া তথ্য জানিলেন। 'অদ্য তোমরা এখানে কে কি দেখিয়াছ?' তাহারা উত্তর করিল—এই জরাক্রান্ত দেহ জীবন্ত মানব বটে, কিন্তু উহা মূল্যহীন-বোধে কুমারবৃন্দ উহাকে লোষ্ট্র দ্বারা আহত করিয়াছে। শর্য্যাত বুঝিলেন যে—এই ব্যক্তি চ্যবন হইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় দুহিতা সুকন্যাকে লইয়া চ্যবন-সমীপে উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন "না জানিয়া আপনার হিংসা করিয়াছি। এই সুকন্যা দানে আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি। আমার দলবলকে আপনি সংজ্ঞা প্রদান করুন;" মহর্ষির বরে তাহাই হইল। শর্য্যাত প্রস্থান করিলেন। দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয় চিকিৎসা যাত্রায় জগৎ ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহারা সুকন্যার সমীপে উপনীত হইয়া তাহাকে বিপথে লইতে যত্ন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—যাহাতে তুমি লিপ্ত রহিয়াছ—এই জরাক্রান্ত দেহ কাহার?

আমাদিগকে ভজনা কর। সুকন্যা বলিলেন—আমার পিতা আমাকে যে বরে সম্প্রদান করিয়াছেন তাঁহাকে আমি পরিত্যাগ করিব না। ঋষি এই ব্যাপার জানিলেন। তিনি সুকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সুকন্যে! উঁহারা তোমাকে কি বলিতেছিল? সুকন্যা সমস্ত পতির নিকট ব্যক্ত করিলেন। ঋষি বলিলেন, যদি উঁহারা ফের তোমাকে ওকথা বলে, তবে তুমি এই উত্তর দিবে যে 'তোমরা সুসর্ব্ব বা সুসমৃদ্ধ নহ, তবে কেন আমার পতির নিন্দাবাদ কর"? যদি উঁহারা তদুত্তরে বলে "আমরা কিসে অসর্ব্ব বা অসমৃদ্ধ" তবে তুমি বলিবে "অগ্রে আমার পতিকে যুবা করিয়া দেও, পশ্চাৎ সে কথা বলিব"। পুনরায় অশ্বিদ্বয় সুকন্যার নিকট উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব প্রস্তাব করিল। সুকন্যা বলিলেন "তোমরা সুসর্ব্ব বা সুসমৃদ্ধ নহ, তবে কেন আমার পতির নিন্দা কর"? উঁহারা উত্তর করিলেন "আমরা কিসে অসর্ব্ব বা অসমৃদ্ধ?" সুকন্যা উত্তর করিলেন—"অগ্রে আমার পতিকে যুবা কর, পশ্চাৎ সেকথা বলিব"। উঁহারা বলিল "এই শৈশব হ্রদে তোমার পতিকে লও। তিনি তাঁহার স্পৃহনীয় বয়স সহ উদিত হইবেন"। সুকন্যা পতিকে সেই হ্রদে লইলেন এবং চ্যবন যুবা বয়স প্রাপ্ত উদিত হইলেন। অশ্বিদ্বয় বলিলেন "সুকন্যে আমরা কিসে অসর্ব্ব বা অসমৃদ্ধ"? ঋষি উত্তর করিলেন কুরুক্ষেত্রে দেবগণ যজ্ঞ করিতেছেন, তাঁহারা সেই যজ্ঞে তোমাদিগকে স্থগিত করিয়াছেন। সেইজন্য তোমরা অসর্ব্ব ও অসমৃদ্ধ।" তৎ শ্রবণে অশ্বিদ্বয় প্রস্থান করিলেন। অশ্বিদ্বয় কুরুক্ষেত্রে দেবগণকে কহিলেন—'যজ্ঞে আমাদিগকে আহ্বান কর।' দেবগণ উত্তর করিলেন "চিকিৎসা উপলক্ষে তোমরা বহু মানবের সংসৃষ্ট হইয়াছ। তোমাদিগকে যজ্ঞে আহ্বান করা যায় না।" অশ্বিদ্বয়—বলিলেন "তোমরা শীর্ষহীন যজ্ঞ করিতেছ।" দেবগণ উত্তর করিলেন 'কিসে?' অশ্বিদ্বয়—বলিলেন 'অগ্রে আমাদিগকে যজ্ঞে আহ্বান কর পশ্চাৎ সে কথা বলিব' দেবগণ অশ্বিদ্বয়কে যজ্ঞে আহ্বান করিলেন এবং তাহাদিগের জন্য আশ্বিন গ্রহ গ্রহণ করিলেন; অশ্বিদ্বয় যজ্ঞে অধ্বর্য্যু হইলেন। যজ্ঞের শীর্ষ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

ভার্গবঋচীক কন্যোজপতি বিশ্বামিত্রের ভগিনী কৌশকী সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করেন। এই দম্পতীর অপত্য মহর্ষি জমদগ্নি। জমদগ্নি ঈক্ষাকুবংশীয় রেণুরাজ-দুহিতা রেণুকার পাণিগ্রহণ করেন। রেণুকার গর্ভে পরশুসহ রামের জন্ম হয়, এজন্য তিনি পরশুরাম নামে বিখ্যাত ছিলেন। বাল্যকালে পরশুরাম পিতৃ-আজ্ঞায় মাতা রেণুকার শিরশ্ছেদ করেন। পিতা প্রসন্ন হইলে রামের প্রার্থনায় রেণুকা পুনর্জীবিত হইলেন। পরশুরাম কৈলাসে পিণাকধন্বার নিকট ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিতেন।

মাহিষ্মতীপতি হৈহয়-বংশীয় রাজা কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন মৃগয়াশ্রান্ত হইয়া জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। হোমধেনু শবলার প্রসাদে মহর্ষি অনায়াসে নৃপতির যথেষ্ট অতিথি সৎকার করিলেন। শবলার প্রভাব দর্শনে নৃপতি মুগ্ধ হইয়া মহর্ষির সকাশে হোমধেনুর প্রার্থী হইলে,

জমদগ্নি বিমুখ হইলেন। ক্রোধে রাজা জমদগ্নির শিরশ্ছেদ করিলেন। এদুঃবার্ত্তা-শ্রবণে কৃত্তিবাসশিষ্য হিমাচল ভেদ করিয়া কৈলাস হইতে পিতার আশ্রমে উপনীত হইলেন। এবং তিনি পিতার নিধন দর্শনে মাহিষ্মতী নগরীতে উপনীত হইয়া পিতৃ-হন্তার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সমরে কার্ত্তবীর্য্যের সহস্রবাহু ছিন্ন করিয়া, পরে তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন। এবং তিনি পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিবার দুরূহ প্রতিজ্ঞা করিলেন। পরশুরাম ত্রিসপ্তবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া সসাগরা ধরা অধিকার করেন। কেবল মাতা রেণুকার অনুরোধে ঈক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথের হিংসা করেন নাই। পরশুরামের ধনুক বহনে রাজা দশরথের মস্তকে ধনুশ্চিহ্ন হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়-শোণিতে সামন্তপঞ্চক পরিপূর্ণ করিয়া, মহর্ষি কশ্যপের পৌরোহিত্যে পরশুরাম পিতৃতর্পণ করিয়া ক্রোধ শান্তি করিলেন এবং তিনি সসাগরা ধরা দক্ষিণা-রূপে মহর্ষি কশ্যপকে প্রদান করিলেন ও স্বয়ম্ মহেন্দ্র-পর্ব্বতে আশ্রয় লইলেন। তদবধি কশ্যপদুহিতা ধরা কাশ্যপী নাম ধারণ করিলেন। তদবধি ধরার সন্তানগণ কাশ্যপের সূর্য্যকে মাতুল বলিয়া জানে।

মাতৃহত্যা-পাপ-বিমোচন-জন্য ভার্গব ব্রহ্মসর খনন করিয়া তথায় অবগাহন করেন। পাপমুক্তি হইলে হস্তলিপ্ত পরশু সেই জলে হারাইয়া গেল।

দক্ষযজ্ঞের অবসানে অস্ত্রগুরুর আদেশে পরশুরাম শিবধনু জনকালয়ে রাখিয়া আসিলেন।

গুরুর ধনুর্ভঙ্গে কুপিত হইয়া পরশু-রাম মহেন্দ্র-গিরি হইতে ধাবমান হইলেন এবং জনকালয় হইয়া—সীতাসহ শ্রীরামের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কালে, তাহার পথ রোধ করিলেন ও শ্রীরামকে বৈষ্ণব ধনু ও বাণ অর্পণ করিয়া বলিলেন, "বাণ যোজনা কর"। শ্রীরাম বাণ যোজনা করিয়া ভার্গবকে বলিলেন—"এই বাণ-ক্ষেপে তোমার স্বর্গপথ বা পরাপথ রোধ করিব ?" পরশুরাম স্বর্গে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, শ্রীরাম তাঁহার স্বর্গপদ্ধতি রুদ্ধ-করণার্থ ঐ বাণ স্বর্গদ্বারে নিক্ষেপ করিলেন এবং রামধনু বরুণদেবকে অর্পণ করিলেন।

শ্রীরাম পরশুরামের তেজ হরণ করিলেন। পরশুরাম মহেন্দ্র-গিরিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং তিনি দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব-পশ্চিম উভয় উপকূলে সমুদ্রের নিকট ভূমি ভিক্ষা লইয়া কর্ণাটে 'কর্ণাট ব্রাহ্মণ' এবং কঙ্কনে 'কঙ্কন ব্রাহ্মণ' স্থাপন করিলেন।

পরশুরাম ভীষ্মদেবের অস্ত্রগুরু ছিলেন। দাতাকর্ণ ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ—পরিচয়ে তাঁহার অস্ত্রশিষ্য হইয়াছিলেন। একদা অলর্ক-জাতীয় পুরুলোমা নামক এক দারুণ দংশকীট কর্ণের উরুভেদ করিয়া তাঁহার ক্রোড়স্থিত নিদ্রিত পরশুরামের মস্তক দংশন করিল। গুরুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি কীট দর্শন করিলেন। তাঁহার দর্শনে ভৃগুপত্নী-অপহারক কৃষ্ণবর্ণ লোহিতগ্রীব পুলোমা রাক্ষস পাপ-মুক্ত হইল এবং সে বিমান আরোহণ করিল। গুরু, শিষ্যকে ক্ষত্রিয় জানে তাহার যথার্থ আত্ম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

কর্ণ আপনাকে সূতপুত্র বলিয়া পরিচয় দিলেন। পরশুরামের অভিশম্পাতে কর্ণের ব্রহ্মাস্ত্রশিক্ষা বৃথা হইল।

একদা পরশুরাম গুরু-দর্শনে কৈলাসে উপনীত হইলেন। দ্বার-রক্ষক গণপতি পথ ছাড়িয়া দিলেন না। তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সমরে গজাননের এক দন্ত ভগ্ন হইল। তদবধি 'একদন্ত গজানন' খ্যাতি হইল।

'পরশুরাম অব্দ' ভারতে বহুদিন প্রচলিত ছিল। তাঁহার মূর্ত্তি দাক্ষিণাত্যে বহু মন্দিরে অদ্যাপি অর্চ্চিত হইতেছে।

উশনা

শুক্রপুত্র উশনা প্রভাতী-তারার অধিষ্ঠাতা দেবতা। বেদমতে শুক্র আচার্য্য উশনা-নামে ইন্দ্রের বন্ধু ছিলেন এবং তিনি ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। বিষ্ণু, কাব্যমাতাকে বধ করায়, শুক্র ইন্দ্র-বৈরী অসুরগণের নেতা ও পুরোহিত হইলেন। বৃহস্পতিপুত্র কচ মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষার জন্য শুক্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শুক্রের দুহিতা দেবযানী কচকে আত্ম সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেও কচ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। এই দেবযানী যযাতি-রাজের মহিষী হইয়াছিলেন।

শুক্রশিষ্য অসুরগণ দেবগণের অজেয় হইলে, দেবগুরু বৃহস্পতি শুক্রমূর্ত্তি ধারণে অসুরগণকে অসৎ উপদেশ দিয়াছিলেন।

ঔর্ব্ব।

ভৃগুবংশে ঔর্ব্ব জন্ম গ্রহণ করেন। যখন হৈহয়রাজগণ ভৃগুবংশ নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে গর্ভস্থ শিশু বিনাশে উদ্যত হইল, তখন ঐ শিশু, জননীর উরু ভেদ করিয়া বহির্গত হইল, এইজন্য ঐ শিশু 'ঔর্ব্ব' নামে খ্যাত হইল।

ঔর্ব্ব সর্ব্ব-লোক-সংহারে প্রতিজ্ঞা করিলে, তাঁহার ক্রোধাগ্নি শান্ত করিবার জন্য ভৃগুকুলের পিতৃগণ ঔর্ব্বকে সান্ত্বনা করিতে যত্ন করিলেন। তাঁহাদিগের অনুরোধে ঔর্ব্ব স্বীয় ক্রোধাগ্নি বরুণ-আলয়ে নিক্ষেপ করিলেন; ঐ ঔর্ব্বানল বড়বানল নামে খ্যাত। ঐ অগ্নি বিলাতে রাশিচক্র-আলোক (The Zodiacal Light) নামে খ্যাত আছে।

রত্নাকর।

প্রচেতার দশম সন্তান ভার্গব রত্নাকর যৌবনের প্রারম্ভে দস্যুবৃত্তি দ্বারা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দোয়াবে বিঠুর নগরে রত্নাকরের আবাস ও আশ্রম ছিল।

তপস্যার প্রভাবে ঋষিপুত্র রত্নাকর মহর্ষি হইলেন। একদা শিষ্য ভরদ্বাজ সহ মহর্ষি স্নানার্থে তমসা নদীতে কর্দ্দম-বিহীন তীর্থের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে অভীষ্ট-তীর্থ-সন্দর্শনে আনন্দিত মনে সুমধুর ক্রৌঞ্চরব শুনিতে শুনিতে ভ্রমণ করিতেছেন। এমন সময়ে এক নিষাদ ক্রৌঞ্চ-মিথুনের পুংক্রৌঞ্চকে নিপাতিত করিল। শোকে ক্রৌঞ্চী করুণ-স্বরে মাটীতে লুটাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে শোকে অভিভূত হইয়া মহর্ষি নিষাদকে ধিক্কার দিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেনঃ—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাম্ ত্বম্
অগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাৎ একম্
অবধীঃ কাম-মোহিতম্॥

শোকাভিভূত আদিকবির মুখনিঃসৃত আদিশ্লোক-শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইল এবং মহর্ষি উৎসাহপ্রফুল্ল হৃদয়ে সেই পাদবদ্ধ অক্ষরসম তন্ত্রীলয়-সমন্বিত পদ্যে রামায়ণ রচনা করিলেন।

কচ।

পুরাকালে এই বিশ্বরাজ্য-লাভার্থে দেব ও অসুরের মধ্যে যে তুমুল সংগ্রাম হইত, সেই যুদ্ধে দেবগণ যে সকল অসুর সংহার করিতেন, অসুরাচার্য্য শুক্রাচার্য্য তৎসমুদয়কে মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যাবলে পুনর্জ্জীবিত করিতেন; কিন্তু অসুরেরা যুদ্ধে যে সকল দেবতার প্রাণ সংহার করিত, দেবগুরু বৃহস্পতি মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যায় অনভিজ্ঞ থাকায় তাহাদিগকে আর পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিতেন না। দেবগুরু বৃহস্পতির কচ নামক এক পুত্র ছিল। একদিন দেবতারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন তুমি অসুরাচার্য্য শুক্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ কর। তাঁহার দেবযানী নাম্নী এক কন্যা আছেন, তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারিলে তুমি অচিরে এই বিদ্যা লাভ করিতে পারিবে।

অনন্তর কচ অসুরেন্দ্র বৃষপর্ব্বার নিকট উপস্থিত হইয়া, শুক্রকে তথায় নিরীক্ষণ করতঃ তাঁহাকে কহিলেন, আমি বৃহস্পতির পুত্র, আমার নাম কচ, আমি আপনাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিতে চাহি, এবিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন। শুক্র কচের বাক্য শুনিয়া তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে দীক্ষিত করিতে অঙ্গীকার করিলেন। কচ ব্রত-গ্রহণ করিয়া উপাধ্যায় ও তৎপুত্রীর আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন এবং প্রতিদিন নৃত্য, গীত, বাদ্য ও ফলপুষ্পাদির দ্বারা অত্যল্প দিবস মধ্যেই যুবতী দেবযানীর প্রীতি জন্মাইলেন; দেবযানীও গীত-বাদ্যাদির দ্বারা ব্রহ্মচারী কচের মনোরঞ্জনে ও পরিচর্য্যায় রত হইলেন। এইরূপে প্রবাসী ব্রহ্মচারীজীবনের উপর দিয়া দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইল।

পূর্ব্বকালে ভারত-রমণীবৃন্দের মধ্যে বর্ত্তমান বঙ্গরমণীনিবদ্ধ অবরোধপ্রথার ন্যায় কোন প্রথা ছিল না। স্ত্রীগণ ইচ্ছানুসারে পুরুষগণের সহিত অবাধে কথাবার্ত্তায়, নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদে—একে অন্যের পরিচর্য্যার নিমিত্ত, কিম্বা কোন কার্য্যের সহায়তার নিমিত্ত সর্ব্বদা মিশিতেন। স্ত্রীগণ কি রাজকার্য্যে, কি সামাজিক কার্য্যে, কি ধর্ম্মসাধনে, কি গার্হস্থ-জীবনে, কি বিদ্যাসাধনে, কি স্বাধীন প্রণয়ে পুরুষের সহিত যোগদান করিতেন। আধুনিক বঙ্গরমণীদের ন্যায় অনর্থক বাক্যালাপপূর্ণ পাকশালায়, অসূর্য্যম্পশ্য গৃহকোণে বা আবর্জ্জনা-পূর্ণ আস্তাকুড়ে তাহাদের জীবন-নাটকের অভিনয় হইত না। শান্তনুপত্নী সত্যবতী, দুষ্মন্তপত্নী শকুন্তলা, পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদী, পাণ্ডবমাতা কুন্তী প্রভৃতি প্রায় সকল প্রাচীন ভারতীয় রমণীবৃন্দ নানা বিদ্যায় বিভূষিত হইয়া, মানব-সমাজের নানা উপকারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

স্ত্রীলোকদের মধ্যে গীতবাদ্যের প্রচলন ছিল। আধুনিক বঙ্গে গীতবাদ্যের চর্চ্চা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে,—সঙ্গীতালোচনা বারাঙ্গনার মধ্যে নিবদ্ধ হইয়াছে। ভদ্রপরিবারস্থিত স্ত্রীলোকেরা

সঙ্গীতালোচনার স্বাধীনতাহীনা। স্ত্রীলোক ত দূরের, কথা পুরুষের ভিতর কয়টী ব্যক্তি বর্ত্তমানে বঙ্গে সঙ্গীতবিশারদ? তখন দেবযানী অবাধে কচের নিকট গীতবাদ্যাদি করিতেন। রাজপরিবারে স্ত্রীলোকদের সঙ্গীত শিখাইবার নিমিত্ত শিক্ষক নিযুক্ত হইত—বিরাটের অন্তঃপুরে বৃহন্নলা সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। স্ত্রীলোকদের ভিতর মুক্তপ্রণয় ছিল—তাহারা অবাধে যাহাকে ইচ্ছা করিতেন, তাহাকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেন। বর্ত্তমান সমাজের ন্যায় অপর কর্ত্তৃক বিবাহ নিগড়ে আবদ্ধ হইতে হইত না। শকুন্তলা দুষ্মন্তের করে প্রেমোপহার প্রদান করিয়াছিলেন; দেবযানী ব্রাহ্মণবালক কচের করে আত্মসমর্পণ-হেতু উন্মাদিনী হইয়াছিলেন; স্বয়ম্বরসভায় কুন্তী পাণ্ডুর গলদেশে বরমাল্য স্থাপন করিয়াছিলেন; দময়ন্তী নলরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। মুক্তবিহারিণী বিহঙ্গিনীর ন্যায় পুরাতন ভারতবর্ষের রমণীবৃন্দ সর্ব্বদা স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেন। ভদ্রা অর্জ্জুনের রথে সারথ্য করিয়াছিলেন;—রাণী প্রমীলার দেশে স্ত্রীবাহিনী সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

কিছুকাল পর একদিন কচ গোচারণের নিমিত্ত নির্জ্জন কাননে প্রবেশ করিলে, অসুরগণ তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করতঃ শৃগালকুক্কুরের ভক্ষণের নিমিত্ত প্রদান করিল। ক্রমে ক্রমে দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন, কিন্তু তথাপি কচ গৃহে ফিরিলেন না। তখন দেবযানী, কচ আহত হইয়াছেন কিম্বা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন—এইরূপ সন্দেহ করিয়া, পিতৃ-সন্নিকটে কাতরবদনে ইহা জ্ঞাপন করিলে, তিনি কন্যাকে সান্ত্বনা করতঃ মৃত-সঞ্জীবনী-বিদ্যা প্রয়োগে কচকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন।

অনন্তর অন্য একদিন দেবযানী পুষ্প-চয়নের নিমিত্ত কচকে অরণ্যে প্রেরণ করিলে, অসুরেরা কচকে বধ করিয়া সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিল। দেবযানী কচের বিলম্ব দেখিয়া পিতার নিকট ইহা নিবেদন করিলেন; কচ, শুক্রের সঞ্জীবনী-বিদ্যাবলে পুনর্ব্বার জীবিত হইলেন এবং শুক্রের নিকট আগমন করতঃ সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। তৃতীয়বার অসুরেরা কচকে হত্যা করিয়া, উহার দেহ ভস্মীভূত করতঃ শুক্রাচার্য্যের সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিল। দেবযানী কচ-বিরহে অত্যন্ত শোকাকুলা হইয়া পিতার নিকট কচ-বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, শুক্রাচার্য্য তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন—কচ নিশ্চয়ই অসুরকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। অসুরেরা তাহাকে বার বার নিহত করিতেছে আমার বোধ হইতেছে—কচ পুনর্ব্বার জীবনপ্রাপ্ত হইলে অসুরেরা তাহাকে পুনর্ব্বার নিহত করিবে, অতএব উহার জীবন রক্ষা করা বৃথা। তুমি শোকমগ্না হইও না, তোমার ন্যায় প্রভাবশালিনী সর্ব্বলোকপূজ্যা রমণীর সামান্য একজন পুরুষের জন্য চঞ্চলা হওয়া উচিত নহে। তখন দেবযানী কহিলেন, বৃহস্পতিপুত্র তপোনিরত ব্রহ্মচারী কচ কখনই সামান্য ব্যক্তি নহেন। আমি কচ-বিরহে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব। দেবযানীর বাক্য-শ্রবণানন্তর শুক্রাচার্য্য সমগ্র অসুর জাতির উপর ক্রোধান্বিত হইয়া কচকে বিদ্যাবলে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কচ, গুরুর জঠর হইতে

মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন। শুক্রাচার্য্য নিজের জঠর হইতে তাহার কথা শুনিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কচ কহিলেন—অসুরেরা তাহাকে বিনষ্ট ও দগ্ধ করিয়া তাহার শুরুর সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল। শুক্র দেখিলেন যে, নিজেকে বিনষ্ট না করিলে জঠরাভ্যন্তর হইতে আর কচকে উদ্ধার করা যায় না; তখন তাহাকে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা দিলেন। কচ, শুক্রকুক্ষি ভেদ করতঃ বহির্গত হইবা মাত্র শুক্র প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু শিষ্য, সঞ্জীবনীবিদ্যা-প্রভাবে গুরুকে পুনর্জীবিত করিলেন।

অনন্তর কচ অসুরগুরু শুক্র-কৃপায় সঞ্জীবনী-বিদ্যালাভ করিয়া দেবাবাসে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, দেবযানী অত্যন্ত দুঃখে ম্রিয়মানা হইয়া কচের প্রতি যে তাহার আন্তরিক অনুরাগ—তাহা কচকে জ্ঞাপন করিলেন। বৃহস্পতিপুত্র বহুদিন পর দেবযানীর সন্নিধান ত্যাগ করিতেছেন দেখিয়া, বর্ষাসংযোগে স্রোতস্বিনীর অকুল-জলপ্রবাহের ন্যায় শুক্রদুহিতা যুবতী দেবযানীর প্রেমতরঙ্গ উথলিয়া উঠিল। বহুদিনের কথা—কচ যখন ব্রহ্মচারী-বেশে পিতার নিকট ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিতেন, যখন ব্রতচারী তপঃক্লিষ্ট, কিম্বা গোচারণ-প্রত্যাগত, তখন তিনি তাঁহার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত গীত-বাদ্যাদি করিতেন; তিনবার অসুরেরা কচকে বিনষ্ট করিয়াছিল, তিনবার প্রেমময়ী দেবযানী তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া পিতার দ্বারা কচের প্রাণদান করিয়াছিলেন,—সকলই তাহার মানসপটে উদিত হইতে লাগিল—তিনি তাহা একে একে কচের নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। কচকে তাহার পাণিগ্রহণ করিতে অনেক অনুনয় করিলেন, কিন্তু কচ গুরু-কন্যাকে সহোদরা জ্ঞান করিয়া দেবযানীর কোন প্রস্তাবেই কর্ণপাত করিলেন না। ইহাতে দেবযানী রুষ্টা হইয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, কচের মৃতসঞ্জীবনীমন্ত্র ফলপ্রদ হইবে না। কচ ইহাতে উত্তর করিলেন "মন্ত্র অমোঘ, ইহা ব্যর্থ হইবার নহে। আমি এ মন্ত্রে ফল পাইব না বটে, কিন্তু আমি যাহাকে শিক্ষা দিব, সে অবশ্যই ফল পাইবে।" ইহা বলিয়া কচ দেবযানীকে অভিশম্পাত করিলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণের সহিত পরিণীতা না হইয়া ক্ষত্রিয়ের সহিত পরিণীতা হইবেন।

ব্রহ্মচারী কচ দেবযানীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। একার্য্য তাহার পক্ষে সঙ্গত হইল কিনা, ভগবান্ জানেন; তবে গুরুগৃহবাস-সঙ্গিনী দেবযানীর দেবীমূর্ত্তি তাঁহার মানসপটে ক্ষণকালের জন্য অঙ্কিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এই দেবীমূর্ত্তি তাঁহার সাধনার বিঘ্নকারিণী হয় নাই, বরঞ্চ রক্ষণশক্তির ন্যায় হিতকরী হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা। এই তপস্যার ফলে মহাবীর্য্য লাভ হয়। মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা কচের কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের মনোহর পুরস্কারস্বরূপ। আজ কচের তীব্র তপস্যা-সংযম-ব্রহ্মচর্য্যবৃক্ষে সুফল ফলিল। কচদেব মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যালাভানন্তর দেবভূমিতে প্রত্যাগত হইলেন। দেবভূমিতে দেব-দুন্দুভি নিনাদিত হইল। ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা ঘোষিত হইল। দেবভবনে আনন্দপীযূষ ধারা প্রবাহিত হইল। সঞ্জীবনী-বিদ্যাবলে কচ দেবালয়ে দেবপূজা প্রাপ্ত হইলেন। অচিরেই অমররাজ্যের প্রতি গৃহে মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যা বিতরিত হইতে লাগিল।

শ্রীকুমারবিক্রম মজুমদার।

যোগের কথা।

প্রথম উপদেশ।

পুরাকালে যোগশিক্ষার্থী চণ্ড, যোগিপ্রবর ঘেরণ্ডের নিকট উপনীত হইয়া, বহুবিধ বিনয়-প্রদর্শন-সহকারে হঠযোগ-বিদ্যা প্রার্থনা করেন। যোগীশ্বর ঘেরণ্ড প্রশ্নকর্ত্তার ভক্তিপ্রাচুর্য্য ও সঙ্কল্পস্থৈর্য্য আলোচনা করিয়া, ধন্যবাদপ্রদান-পূর্ব্বক প্রসন্নচিত্তে যোগতত্ত্বের উপদেশ দান করেন।

যোগাচার্য্য ঘেরণ্ড বলেন,—যোগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বল। যে লোক যোগবলে বলীয়ান্, জগতে তাহার অসাধ্য কর্ম্ম নাই বা থাকিতে পারেনা। যোগ সমস্ত যন্ত্রণা বারণ করে—সকল ক্লেশ বিনাশ করে—মুক্তির সহায়তা করে। যোগাভ্যাসের ফলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। তত্ত্ববিদ্যাই মোক্ষের উন্মুক্ত দ্বারস্বরূপ। তত্ত্ববিদ্যা বা যথার্থজ্ঞান রাজযোগের দ্বারাই প্রকটিত হয়। সুকঠিন রাজযোগ আয়ত্ত করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে শরীরের দৃঢ়তা, রোগশূন্যতা ও চিত্তের প্রসাদ বা নির্ম্মলতা লাভ করা দরকার। রাজযোগের অনুষ্ঠান করিতে হইলে 'হঠযোগ'সাধন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। হঠযোগ অবলম্বন করিলে শরীরের শোধন ও নিয়ময়তা সাধন এবং মনের শুদ্ধি ঘটে। দেহ ও মন সুস্থ হইলেই জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানদেবতার সিংহাসন সুনির্ম্মল চিত্ত—ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত। জীবদেহ আমকুম্ভবৎ অর্থাৎ কাঁচামাটীর কলসীর মত, উহার অভ্যন্তরে জলবৎ জীবন সর্ব্বদাই ক্ষরিত হইতে উদ্যত, এই জীবন জলকে ঐ কাঁচামাটীর কলসীতে রাখিতে পারা কঠিন, কিন্তু যদি ঐ কলসীকে হঠযোগাদিদ্বারা দগ্ধ করিয়া সুদৃঢ় করা যায়, তাহা হইলে জীবন-জল ক্ষরণের ভয় অল্প হইয়া পড়ে—জরাব্যাধির আক্রমণ কমিয়া যায়—সাধনের জন্য সুদীর্ঘ সময় ও সুস্থশরীরের সদ্ব্যবহার করা যায়। অভ্যাসবলে বহুকালের সাধনায় সিদ্ধির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

হঠযোগই সকলের মূল। শাস্ত্রে হঠযোগের যে উপদেশ আছে, তাহার সারকথা—ষট-শোধন বা দেহশুদ্ধি। যোগশিক্ষা করিতে গেলে আগে দেহ দৃঢ় ও শুদ্ধ করিতে হইবে। শরীর অশুদ্ধ থাকিলে কোনও কার্য্যই ফলপ্রদ হইতে পারেনা। দেহশুদ্ধি, অন্তঃশুদ্ধি প্রভৃতির জন্য যাহা কিছু করিতে হয়, সে সবই সাধন।

সাধন সপ্তবিধ যথা—শোধন, দার্ঢ্য, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, লাঘব, প্রত্যক্ষ ও নির্লিপ্ত। ধৌতি, বস্তি প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা শরীরের মলাপনোদন শোধন, সিদ্ধাসন, পদ্মাসনাদি আসন আচরণের দ্বারা দেহের দৃঢ়তাসম্পাদন দার্ঢ্য, মুদ্রাভ্যাস দ্বারা দেহ ও মনের স্থিরতাসাধন স্থৈর্য্য, প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়-বশীকারপূর্ব্বক সাক্ষ-মনের ধীরতা-সম্পাদন ধৈর্য্য, প্রাণায়াম অভ্যাসের সহায়তায় দেহের লঘুতা নিষ্পাদন লাঘব, ধ্যানযোগে আত্মায় ধ্যেয়তত্ত্বের সাক্ষাৎ-কার-লাভ প্রত্যক্ষ এবং চরম-সমাধি-বলে সর্ব্ববিধ-বাসনা-ধ্বংস বা সর্ব্ব-সংস্কারের মূলোচ্ছেদ-করণ নির্লিপ্ত। এইভাব শেষে আবির্ভূত হয়। এই অন্তিম সাধনই মুক্তির আশ্রয়।

ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠানে দেহশোধন হয়। ষট্‌কর্ম্ম যথা—ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী,

ত্রাটক ও কপালভাতি। যে সকল লোকের শরীর শ্লেষ্মভারগুরু মেদঃপ্রচুর তন্দ্রালস্যাদির প্রভাবে জাড্যবহুল—যাহারা আসন-মুদ্রাদির অনুষ্ঠানে অসমর্থ, সেই সকল লোকেরাই শরীরের দোষসংশোধনের জন্য ষট্‌কর্ম্ম করিবে, অপরে নহে। যোগেশ্বর ঘোষণা করিয়াছেন—নেতি-যোগ কফদোষ বিনাশ করে, দণ্ডযোগ হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ করে, ধৌতিযোগ মলদোষ নিবারণ করে, বস্তিযোগে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও উদরের চালনা হয়, ক্ষালনযোগের সহায়তায় নাড়ীর ক্লেদকলঙ্ক ক্ষালিত হয়। এই নেতি, দণ্ড, ধৌতি, বস্তি ও ক্ষালন যোগ এই পঞ্চকর্ম্মকে পঞ্চামরাযোগ বলে। এই নেতি, ধৌতি, বস্তি প্রভৃতি দেহের দোষশোধনের জন্যই প্রযুক্ত। যাহাদের দেহ স্বভাবতঃ নির্ম্মল, তাহাদের ষট্‌কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রায় সমস্ত মানবের দেহই অবিশুদ্ধ ও তমোময়।

ধৌতিযোগ চারি প্রকার; অন্তর্ধৌতি, দন্তধৌতি, হৃদ্ধৌতি ও মূলশোধন। এই চারি প্রকার ধৌতিযোগ আচরণ করিলে ঘট বা দেহ নির্ম্মলতা লাভ করে। ইহার মধ্যে অন্তর্ধৌতি চতুর্ব্বিধা যথা,—বাতসারধৌতি, বারিসারধৌতি, বহ্নিসারধৌতি, বহিষ্কৃতধৌতি।

বাতসারধৌতি।

মুখ কাকমুখবৎ করিয়া অর্থাৎ ওষ্ঠদ্বয় চঞ্চুবৎ করিয়া, আস্তে আস্তে মুখদ্বারা বায়ু পান করিবে—বায়ু টানিয়া দেহাভ্যন্তরে লইবে, পরে ঐ বায়ু উদরের মধ্যে সঞ্চালিত করিবে। অনন্তর ঐ বায়ু শনৈঃ শনৈঃ মুখ দিয়া রেচন বা ত্যাগ করিবে; এই কার্য্যের নাম বাতসারধৌতি। এই বাতসারধৌতি নানারোগ নিবারণ করে, পরন্তু ইহাদ্বারা মন্দাগ্নির উদরাগ্নি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রতিদিন প্রভাত-সময়ে ও সন্ধ্যাকালে যিনি যথাবিধানে পুনঃ পুনঃ নির্ম্মলবায়ু পান করেন, উন্মুক্তস্থানের দোষশূন্য বায়ু গ্রহণ ও রেচন করেন, তাঁহার জীর্ণজ্বর, দাহরোগ ও ভীষণ ক্ষয়রোগ বা যক্ষ্মারোগ নিবারিত হয়। *

বারিসারধৌতি।

মুখের দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ আকণ্ঠ জল-পান করিবে, পরে গাত্রসঞ্চালন করিয়া ঐজল উদরে চালিত করিবে, পরে ঐজল অধোমার্গ দ্বারা পরিত্যাগ করিবে। ইহার নাম বারিসারধৌতি। এই ধৌতি অভ্যাস করিলে দেহ দেবদেহবৎ নির্ম্মল হইয়া থাকে।

বহ্নিসার-ধৌতি।

শ্বাসরোধ সহকারে উদর সঙ্কুচিত করিয়া নাভিগ্রন্থি মেরুদণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করিবে। জীর্ণাহার যোগী এইরূপে অভ্যাস বলে নাভিগ্রন্থি ও পৃষ্ঠদণ্ড শতবার সংযুক্ত করিবে। এই প্রকারে বহ্নিসার-ধৌতি নিষ্পন্ন করিতে হয়। এই বহ্নিসার-ধৌতি বহ্নিদীপন সাধন করে, আর মন্দাগ্নিজনিত নানাবিধ পীড়া প্রশমন করে। এক কথায় শত শত ঔষধ-সেবনেও যে উদরাময়ের

* বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্যপ্রদেশীয় চিকিৎসা-তত্ত্ব বিশারদগণ বলিতেছেন—"ক্ষয়-রোগের একমাত্র ঔষধ বিশুদ্ধ বায়ুসেবন এবং উন্মুক্তবায়ুপূত ও আলোকযুক্ত স্থানে অবস্থান।" আমরা না বুঝিলেও, বহুসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে যোগীশ্বর ঘেরণ্ডদেব 'বাতসার'ধৌতি বা বায়ুপান ক্ষয়রোগ নাশক' বলিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম পাশ্চাত্যগণ এতদিনে বুঝিয়াছেন।

প্রতিরোধ করা যায় না; বহিসার-ধৌতি শিক্ষা করিলে সেরূপ উদরাময়ের ভয়ই থাকে না। অগ্নিশুদ্ধিই শরীরের সর্ব্ববিধ আরোগ্যের মূল। অধিকাংশ রোগের মূল-বীজ জীবের দগ্ধোদরের মধ্যই নিহিত আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। নিয়মিতরূপে একমাত্র বহিঃসার-ধৌতি সেবা করিলেই দেহ রোগশূন্য ও নির্ম্মল হয়।

বহিষ্কৃত-ধৌতি।

কাকের ঠোঁটের মত মুখ করিয়া আস্তে আস্তে বায়ু গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা উদর পূর্ণ করিবে। ঐ গৃহীত বায়ু অর্দ্ধ-প্রহরকাল উদরের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিবে শেষে মলদ্বার দিয়া ঐ উদরস্থ বায়ু রেচন করিবে। এই কার্য্য বহিষ্কৃত-ধৌতি নামে প্রসিদ্ধ। বাতসার-ধৌতি ও বহিষ্কৃত-ধৌতি দুইই বায়ু-গ্রহণ ও রেচনস্বরূপ; বাতসারে মুখদ্বারা রেচন, বহিষ্কৃত ধৌতিতে মলদ্বারযোগে রেচন করিতে হয়। উদরের পেশী সকল ও স্নায়ুগ্রন্থির উপর এরূপ আধিপত্য হইলে যোগী আর সত্বর রোগী হন না। যতদিন পর্য্যন্ত যোগী অর্দ্ধপ্রহর কাল বায়ু ধারণে অর্থাৎ শ্বাসরোধে সমর্থ না হন, ততদিন কোনও মতে বহিষ্কৃত-ধৌতি অভ্যাস করিতে চেষ্টা করিবেন না।

অন্তর্ধৌতি বলিয়া যোগীশ্বর ঘেরণ্ড, চণ্ডকে দন্তধৌতি বলিতেছেন। দন্তধৌতি পঞ্চবিধ; দন্তমূলধৌতি, জিহ্বামূলধৌতি, কর্ণরন্ধ্রদ্বয়ধৌতি, কপালরন্ধ্রধৌতি। দন্তমূলধৌতি দন্তরোগ নাশ করে এবং দন্তদার্ঢ্যসম্পাদন করে। খাদিররস (খয়েরের জল) অথবা শুদ্ধ মৃত্তিকা (আঁঠাল মাটী) দ্বারা পুনঃ পুনঃ দন্তমূল মার্জ্জনা করিবে। যখন দন্ত ও দন্তমূলের মল বা ক্লেদ অপনীত হইবে, তখন মার্জ্জনা বন্ধ করিবে। এই কার্য্যকে দন্তমূলধৌতি বলা যায়।

জিহ্বামূল-ধৌতি।

তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা—এই তিন অঙ্গুলী একত্রিত করিয়া গলার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে জিহ্বামূল মার্জ্জনা করিবে। পুনঃ পুনঃ নবনীতের (মাখনের) দ্বারা জিহ্বা দোহন করিবে, আর জিহ্বার অগ্রভাব লৌহযন্ত্র (চিম্‌টা) দ্বারা আস্তে আস্তে আকর্ষণ করিয়া জিহ্বার দীর্ঘতা সম্পাদন করিবে। প্রভাতে ও সন্ধ্যাসময়ে অক্লেশকর-ভাবে এইরূপ করিয়া জিহ্বার মালিন্য এবং হ্রস্বতা দূর করিবে। ইহার নাম জিহ্বামূল-ধৌতি। জিহ্বামূলধৌতি অভ্যাস করিলে কফদোষ নিবারিত হয়, গলনলীর পীড়ার শঙ্কা থাকে না। (যাঁহারা সর্ব্বদা সর্দ্দিকাশিতে কষ্ট পান, তাঁহারা ইহার দ্বারা উপকার পাইতে পারেন।)

কর্ণরন্ধ্রদ্বয়-ধৌতি।

তর্জ্জনী ও অনামিকা অঙ্গুলী যোগে কর্ণরন্ধ্রযুগল, প্রভাতকালে ও সন্ধ্যাসময়ে মার্জ্জনা করিবে। দীর্ঘকাল এই অভ্যাস চলিতে থাকিলে পরে অনুচ্চ শব্দ শ্রবণ করিবার শক্তি জন্মে। এইরূপে কর্ণরন্ধ্রদ্বয়ের মার্জ্জনা করাকে কর্ণরন্ধ্রদ্বয়ধৌতি বলে। (কেহ কেহ বলেন, ইহার প্রভাবে অলৌকিক-শব্দ শ্রবণের সৌভাগ্য আবির্ভূত হয়। কেহ বলেন, এই অনুষ্ঠান করিলে সাধক প্রেতলোকস্থ ব্যক্তিগণের বাক্যালাপ শুনিতে পারেন।)

কপালরন্ধ্র-ধৌতি।

দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা নিজের কপালরন্ধ্র শনৈঃ শনৈঃ মার্জ্জনা করিবে। ভ্রূযুগলের সন্ধিস্থানকে কপালরন্ধ্র বলা হয়। ঐস্থান অল্পে অল্পে ঘর্ষণ করিতে হইবে। দীর্ঘকাল পবিত্রচিত্তে এইরূপ অনুষ্ঠান করার নাম কপালরন্ধ্র-ধৌতি। এই ধৌতি নিদ্রা হইতে উঠিয়া পরে, আহার করিয়া উঠিয়া পরে এবং দিনের শেষ সময়ে প্রতিদিন করা কর্ত্তব্য। এই ধৌতি অভ্যাস করিলে নাড়ীদোষ প্রশমিত হয়। চক্ষুর্জ্যোতি বর্দ্ধিত হয়—দিব্যদৃষ্টি-লাভ ঘটে।

অতঃপর যোগাচার্য্য হৃদ্ধৌতির কথা বলিতেছেন। হৃদ্ধৌতি তিন প্রকার; দণ্ডধৌতি, বমনধৌতি, বাসোধৌতি। গলার মধ্যে রম্ভাদণ্ড। (কলার মাইজ) হরিদ্রাদণ্ড (হলুদ গাছের ডগা) অথবা বেত্রদণ্ড (কোমল বেতাগ্রের আবরণ ত্যাগ করিয়া অভ্যন্তরে যাহা থাকে তাহা) প্রবেশ করাইয়া দিয়া হৃদয় পর্য্যন্ত প্রেরণ করিবে, আবার ক্রমে বাহিরে করিবে। আস্তে আস্তে ক্রমে সুকৌশলে এই কার্য্য করিতে হয়। এই কার্য্য দণ্ডধৌতি নামে খ্যাত। দণ্ডধৌতি দ্বারা কফপিত্তাদি ক্লেদ মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায় এবং হৃদ্‌রোগ উপশমিত হয়। ইহা অভ্যাস করিলে হৃদ্‌যন্ত্র সবল হয়। দণ্ডধৌতির পরে বমনধৌতি। আহারের পর আকণ্ঠ জল পান করিয়া ক্ষণকাল ঊর্দ্ধদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া থাকিবে, পরে ঐ জল বমন করিবে। প্রতিদিন ভোজনের পর এইরূপে জলপান ও বমন করিলে কফপিত্ত-দোষ অচিরেই প্রশমিত হয়। ইহার পর বাসোধৌতি। ইহা অত্যন্ত হিতকরী, কিন্তু বিশেষ সাবধানতাসহকারে এই কার্য্য করিতে হয়। চারি-অঙ্গুলী-বিস্তৃত এবং ১৫ হস্ত পর্য্যন্ত দীর্ঘ অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র স্নিগ্ধ জলে সিক্ত করিয়া তাহাতে অল্প মাত্রায় নবনীত লেপন করিয়া আস্তে আস্তে অল্পে অল্পে গিলিয়া খাইবে। কিছুক্ষণ পরে আবার অল্পে অল্পে বাহির করিয়া উহা ধৌত করিবে। এই ব্যাপারের নাম বাসোধৌতি। এই ধৌতি অভ্যাস করিলে গুল্ম, জ্বর, প্লীহা, কুষ্ঠরোগ ও কফপিত্ত-দোষ অনায়াসে বিদুরিত হয়। বস্ত্র গিলিয়া ফেলিয়া উহা পুনরায় বাহির করিলে উহাতে সংলগ্ন শ্লেষ্মাদি দেহ হইতে পরিত্যক্ত হয়। উহা অবশ্যই নানা আরোগ্যের নিদান। অল্পে আরম্ভ করিয়া ক্রমে অভ্যাসযোগে পঞ্চদশহস্ত, এমন কি ৩২ হস্ত পর্য্যন্ত সূক্ষ্মবস্ত্র (পাতলা নেকড়া) গ্রাস ও পুনরায় বাহির করা যাইতে পারে। দীর্ঘকাল এরূপ করিলে পীড়া সকল পলায়ন করিতে প্রস্তুত হয়।

ইহার পর মূলশোধন। মূলশোধন বা গুহ্যশোধন নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য; কারণ যতদিন মূলশোধন সম্পন্ন না হয়, ততদিন অপান-বায়ুর ক্রূরতা বিদুরিত হয় না। হরিদ্রামূল অথবা বামহস্তের মধ্যমাঙ্গুলীযোগে জলধারা পুনঃ পুনঃ মৃদু সঞ্চালনে গুহ্যপ্রদেশ প্রক্ষালন করিবে। ইহার নাম মূলশোধন। মূলশোধন করিলে কোষ্ঠবদ্ধতা ও আমাজীর্ণ রোগ নিবারিত হয়, কান্তি ও পুষ্টির উদয় হয়, অগ্নি দীপিত হয়।

অতঃপর ঘেরণ্ড বস্তিকর্ম্ম বলিতেছেন। বস্তি দুই প্রকার, জলবস্তি ও শুষ্কবস্তি।

জলবস্তির অনুষ্ঠান জলে থাকিয়া করিতে হয়।° শুষ্কবস্তি স্থলে অনুষ্ঠেয়। নাভি পর্য্যন্ত যাহাতে জলমগ্ন হয়, এইভাবে জলে উৎকটাসনে (যাহাকে 'উব' হইয়া বসা বলে সেইভাবে) বসিয়া, মলদ্বার আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিয়া জলগ্রহণ ও জলত্যাগ করিবে; ইহাকে জলবস্তি কহা যায়। জলবস্তি অভ্যাস করিলে প্রমেহ প্রভৃতি রোগ সারিয়া যায়। বায়ুর ক্রূরতা থাকে না। শরীর সুস্থ ও সুরূপ হয়। স্থলে পশ্চিমোত্তান আসনে উপবেশন করিয়া ক্রমে অধোভাগে বস্তি চালনা করিয়া, অশ্বিনীমুদ্রা-যোগে গুহ্যদেশ আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিবে। ইহার নাম শুষ্কবস্তি। এই বস্তি আমবাত বিনাশ করে ও কোষ্ঠদোষ নিবারণ করে।

বস্তিকর্ম্মের পর নেতি। বিতস্তি-পরিমাণ (এক বিঘত) সূক্ষ্ম সূত্র নাসাদ্বার দিয়া ঢুকাইয়া মুখ দিয়া বাহির করিবে। প্রতিদিন এইরূপ করার নাম নেতি। নেতিকর্ম্ম সুসম্পন্ন হইলে কফ-দোষ যায়, দিব্য দৃষ্টি হয়, খেচরীসিদ্ধিলাভ হয়।

নেতির পর লৌলিকীযোগ। প্রবলবেগে উদরস্থ পেশী ও মাংসগ্রন্থিসমূহের পরিচালন দ্বারা উদরকে উভয় পার্শ্বে অনবরত চালিত করিবে; ইহার নাম লৌলিকীযোগ। এই কার্য্য অভ্যস্ত হইলে দেহস্থ জাঠরাগ্নি সমধিক দীপিত হয়। উদরাগ্নির শোধন হইলে প্রায়ই রোগ হয় না।

অতঃপর ঘেরণ্ডদেব ত্রাটক সম্বন্ধে বলিতেছেন। কোনও সূক্ষ্ম বা উজ্জ্বলতম লক্ষ্যের প্রতি একদৃষ্টিতে দীর্ঘ কাল চাহিয়া থাকিবে, যেন চক্ষুর পলক না পড়ে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অশ্রুপাত না হয়, ততক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে হইবে। ইহার নাম ত্রাটক-যোগ। ইহার দ্বারা চক্ষুরোগ প্রশমিত হয়, দিব্যদৃষ্টিলাভ হয়।

ত্রাটকের পর কপালভাতি। কপালভাতি ত্রিবিধ; বাতক্রম-কপালভাতি, ব্যুৎক্রম কপালভাতি, শীৎক্রম কপালভাতি। বাম নাসিকা দ্বারা আস্তে আস্তে বায়ু গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ নাসাপথে উহা পরিত্যাগ, আবার দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু পূরণ করিয়া বাম-নাসা-যোগে রেচন করিবে। এই কার্য্যের নাম বাতক্রম-কপালভাতি। ইহা কফ-দোষের পরম ঔষধ। নাক্ দিয়া জল নিঃশব্দে টানিয়া লইয়া মুখ দিয়া বাহির করিবে, আবার মুখ দিয়া নীরবে জল লইয়া নাক্ দিয়া পরিত্যাগ করিবে। এই কার্য্যকে ব্যুৎক্রমকপালভাতি কহে। ইহাতে কফদোষ সারে। মুখের দ্বারা শীৎকার-সহকারে অর্থাৎ শব্দ-সহকারে চুমুক্ দিয়া জল লইয়া নাসিকা-দ্বারপথে পরিত্যাগ করিবে। ইহার নাম শীৎক্রম-কপালভাতি। ইহার প্রভাবে বার্দ্ধক্যের অধিকার কমিয়া যায়, জরা দূরে পলায়ন করে; দেহ স্বচ্ছন্দ হয়।

এই ষট্‌কর্ম্ম-সাধনের দ্বারা দেহকে নীরোগ ও সবল সুস্থ করিয়া লইয়া পরে আসন ও প্রাণায়ামাদি উচ্চ-যোগাঙ্গের অনুশরণ করিতে হয়। যোগানুষ্ঠান অপরোক্ষ ফলপ্রদ। ইহাতে ফলের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয় না। কার্য্য ঠিক্‌ঠিক্ অনুষ্ঠিত হইলে হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়। ক্রমে সকল কথা সংক্ষেপে যথাসাধ্য বলা যাইবে।

শ্রী——ভারতী

শিশুর আধ্যাত্মিকতা।

(১)

জোছনা-লহর মাখিয়া পরাণে
কোথা হ'তে তুমি এসেছ ?
কোথাকার খেলা খেলিছ এখানে
কোথাকার আলো এনেছ ?
তোমারে দেখিলে ভুলি যে বিশ্ব,
উথলে জীবন কুঞ্জে হর্ষ,
ভূতলে যেন গো নবীন বর্ষ
অরুণের সাথে এনেছ ;—

(২)

যেন শান্ত শীতল স্বচ্ছ উৎস
বহিয়া এসেছে মরতে,
মৃদুল বাতাসে চলে বাঁকা পথে
বিটপী-শ্যামল-ছায়াতে,
কল কল কল উছলিয়া জল
চলিছে সদাই চিত চঞ্চল,
আলোক-পরশে ভয়বিহ্বল
কাঁদিছে নীরব ভাষাতে।

(৩)

এত মাখামাখি, এত ভালবাসা—
কোথা হ'তে তুমি আনিলে ?
স্ফটিক-নির্ম্মল জ্যোতিঃ মাখিয়া
কেমনে আসিলে মরতে ?
প্রেমের পশরা মাথায় লইয়া
অভিনব-প্রেম-রসেতে রসিয়া
গগনের শশী বুঝি বা খসিয়া
পড়িল আসিয়া জগতে !

(৪)

যেথায় মধুর ওই আধ স্বর
বাজিয়া নাহিক উঠে,
করুণ-মধুর হাসির লহর
যেথায় নাহিক ছুটে,
শ্মশান সেস্থান, তথা হাহাকার,
প্রাসাদের প্রাণে বিষাদ আঁধার—
সকলি শূন্য, সকলি অসার,
যেন অঙ্কিত মরু পটে !

(৫)

তুমি নিশা-শেষে উষার আলোক—
আশার করুণ রাগিণী,
তোমা তরে দেয় কুসুম সাজা'য়ে
ব্যাকুলিত ধরা কামিনী !
তুমি আধ আলো, তুমি আধ ছায়া,—
চেতনা-সাগরে গরীয়সী মায়া,
সসীমে অসীমে তব ক্ষুদ্র কায়া
যেন অঙ্কিত ছবি খানি।

(৬)

হে সুন্দর ! শান্ত, প্রেম-প্রতিমা,
মণ্ডিত জ্যোতিনিকরে ;
নাহি পৃথিবীর ভীষণ দৃশ্য
ও কোমল হিয়া ভিতরে ;
এনেছ সুদূর ত্রিদিব বারতা,
এনেছ ধরিয়া পূর্ণ সরলতা,
হৃদয়ে বাঁধিয়া কঠিন মমতা
নিরানন্দময় গেহে।

(৭)

উষার প্রথম নীহার-কণিকা
শ্যাম দুর্ব্বাদল উপরে

ক্ষুদ্র বিন্দু ধরে—মহাসিন্ধু সম
সৌর-কর-জাল আদরে,—
তোমার শুভ্র হৃদয়-মাঝে
কি গভীর প্রেম-শান্তি বিরাজে!
জগতের চিরমোহ-সৌন্দর্য্যে
(ঐ) নূতনতা সদা রহে রে;—

(৮)

এ যে ঢল-ঢল আঁকা মধুর প্রতিমা
বসন্তের ভরা তৃপ্তি,
এ যে কল-কল-কল বরষা সলিল
নিদাঘ-রুদ্ধ স্ফূর্ত্তি,
এ যে হেমন্তের ক্ষেত্র ভরা-ভরা,
এ যে শরতের শ্বেত বসুন্ধরা,
এ যে অনন্তের সান্ত-সাকারা
নির্ম্মল প্রেমমূর্ত্তি।

(৯)

ওই শান্ত প্রতিমা না করহ যদি
আরতি হৃদয়ে বসিয়া,
অব্যক্ত অনন্ত অচিন্তনীয়ে
কেমনে দেখিবে ব্যাপিয়া?
শুধু ছায়াময় নহে গো, বিশ্ব,
জগত নহেত মলিন নিঃস্ব,
ভিতরে দেখরে জীবন-সর্ব্বস্ব
হাসিছে নীরবে রহিয়া।

(১০)

তুমি মানবের জীবন সলিলে
সুনির্ম্মল প্রস্রবণ,
তুমি মানবের জীবন-প্রভাতে
তরুণ অরুণ সুকিরণ।
ক্ষুদ্র বীজ যথা রাখে লুকাইয়া
বিশাল-রসাল-সুশ্যামল-কায়া
তেমতি ও ক্ষুদ্র দেহভাণ্ড মাঝে
বিরাজিত নিত্যনিরঞ্জন।

(১১)

নিতুই আসিছে তরুণ তপন
দিনক্ষয়ে যায় ডুবিয়া,
আসিছে যামিনী হাসিছে চাঁদিনী
নিশাশেষে যায় মিশিয়া,—
ঝরণার জলে উথলে তটিনী,
সাগর চুমিছে সিন্ধুবাহিনী,
ঊর্দ্ধে নবঘন চপলা সঙ্গিনী,
বর্ষণে বাঁচে গিরি জায়া।

(১২)

ওগো মূঢ়, তুমি দেখ না বিশ্ব
গ্রথিত নিয়ম-শৃঙ্খলে,
শুধু কি কোমল প্রেম-প্রতিমা
ডুবিবে অকূল গরলে?
হে নাস্তিক! তুমি বো'ল না বো'ল না
মানব-জীবন ক্ষণিক খেলনা
ভাঙ্গিলে নূতন জীবন হ'বে না
ডুবিবে বিনাশ-সলিলে!

(১৩)

হে শান্ত শীতল স্বচ্ছ উৎস!
সবে বাঁধা তব ঋণে,
দিতেছ ভরিয়া সলিল, অন্ন
অগণ্য বিপন্ন জনে;—
কত মরুভূমি, প্রান্তর, বন,
কত জনপদ, রম্য তপোবন,—
কত সুখ-দুঃখ পা'বে অনুক্ষণ
ধাইতে সাগর পানে।

শ্রীফণীন্দ্রমোহন ঘোষ।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া
ধ্যানবিন্দূপনিষৎ।

অনাদিসিদ্ধ-প্রবর্ত্তিত যোগসাধনই জ্ঞান-পথের সম্বল, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত। ধ্যানবিন্দূপনিষদে বলবতী যোগবিদ্যার বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। সর্ব্ব প্রথমেই প্রতিজ্ঞা স্থাপিত হইতেছে।

ওঁ যোগতত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি যোগিনাং হিতকাম্যয়া, যচ্ছ্রুত্বাচ পঠিত্বাচ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ১

যোগিগণের হিত কামনায় যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইতেছে। এই যোগতত্ত্ব শ্রবণ করিলে বা অধ্যয়ন করিলে, মানব, সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। ১

বিষ্ণুর্নাম মহাযোগী মহামায়ো মহাতপাঃ।
তত্ত্বমার্গে যথাদীপোদৃশ্যতে পুরুষোত্তমঃ। ২

বিষ্ণু অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ঐন্দ্রজালিক, তিনিই সর্ব্বোত্তম যোগী-পুরুষ, আবার তিনিই সর্ব্বপ্রধান তাপস। অন্ধকারস্থিত বস্তুজাত যেমন দীপালোকে উদ্ভাসিত হয়—প্রকাশ পায়, যোগতত্ত্বরূপ গুহানিহিত পরমবস্তু সেইরূপ পরমগুরু পরমেশ্বর কর্ত্তৃকই প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। সেই ভগবৎ-প্রদর্শিত প্রণালীমতে সাধনা করিলে, সেই পরমপুরুষ হৃৎপদ্মে প্রতিভাত হন,—সাধক দ্বারা দৃষ্ট হন। (জগতের সকল জ্ঞানই সেই জ্ঞানের অফু-রন্ত উৎস পরমেশ্বর হইতে আবির্ভূত বা প্রকাশিত,—এই হিন্দু-ধারণার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে বিরাজমান। শ্রীভাগবতে আছে, 'তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে।' ব্রহ্মার হৃদয়ে ভগবান্ই বেদতত্ত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, পরম্পরায় ব্রহ্মপুত্র ঋষিগণ সকল বিদ্যা প্রাপ্ত হন এবং শিষ্য-প্রশিষ্যানুক্রমে উহার বিবৃতি বিস্তৃতির সহায়তা করেন মাত্র; সকল শাস্ত্রের প্রভব সেই পরমেশ্বর। শ্রীবাদরায়ণ বলিয়াছেন—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ")২

যদি শৈলসমং পাপং বিস্তীর্ণং যোজনান্ বহূন্। ভিদ্যতে ধ্যান-যোগেন নান্যোভেদঃ কদাচন। ৩

যদি বহুযোজনব্যাপী শৈল-সমান পাপ-পুঞ্জও সঞ্চিত থাকে, তাহাও একমাত্র ধ্যান-যোগের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়, অন্য কোনও প্রকারে (সহজে) হয় না। (এখানে ধ্যানযোগের শ্রেষ্ঠতা বা অন্তরঙ্গতা কথিত হইতেছে। যম, নিয়ম, প্রণায়াম, প্রত্যাহার—এগুলি সাক্ষাৎ-সাধন বা অন্তরঙ্গ-সাধন নয়; একমাত্র ধ্যানযোগই তত্ত্বসাক্ষাৎকারের প্রধান সাধন।)

বীজাক্ষরাৎ পরং বিন্দুং নাদং বিন্দোঃ পরে স্থিতং, সুশব্দঞ্চাক্ষরে ক্ষীণে নিঃশব্দং পরমং পদম্। ৪

বীজাক্ষর বা স্পষ্টবর্ণ অকার, উকার এবং মকার—এই তিনের পর বিন্দু ও তৎপরে নাদ, তৎপরে শক্তি অবস্থিতা। এই বর্ণ-বিন্দু-নাদ শক্ত্যাত্মক প্রণব বা ওঁকার বিশ্বসৃষ্টির মূলাধার।

অক্ষর ক্ষীণ হইলে অর্থাৎ মাত্রাবিহীন হইলে, শব্দাতীত তুরীয় পরব্রহ্ম-ভাব আবির্ভূত হয়। (অকার, উকার ও মকার,—নাদ, বিন্দু ও শক্তি—এই ষট্‌সমবায়ে প্রণবতত্ত্বের

প্রকাশ। জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তি—সৃষ্টি, স্থিতি-লয়—এই ষড়্ভাব ও 'জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে ক্ষীয়তে' নশ্যতি এই ষড়্বিকারের তিরোভাব ঘটিলে, পঞ্চমাত্রক প্রপঞ্চ ও অর্দ্ধমাত্রাত্মিকা শক্তি, এতদুভয়ের বিলয় হয়—এককথায় শক্তি, সত্তা ও কার্য্য—এই তিনের মধ্যে কার্য্য ও শক্তির বিনাশ হয়, থাকে কেবল সত্তা—শুদ্ধচিন্ময় গুণাতীত ও মাত্রাতীত জ্ঞানাতীত পরমব্রহ্মস্বরূপ। ধ্যান-যোগস্থ যোগী ঐস্বরূপ উপলব্ধি করেন) ৪

অনাহতঞ্চ যচ্ছব্দং তস্য শব্দস্য যৎপরম্।
তৎপরং চিন্তয়েদ্ যস্তু স যোগী ছিন্নসংশয়ঃ ।৫

অনাহত শব্দের পরে কারণীভূতা শক্তি, শক্তির পরপারে সর্ব্বকারণ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি চির বিরাজিত। সেই সচ্চিদানন্দ সর্ব্বাতীত নিরঞ্জনতত্ত্ব যে যোগী চিন্তা করেন, তাঁহার সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয়—হৃদয়গ্রন্থিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। (নাদবিন্দু প্রণবের উপ-করণ। বিন্দুটীর প্রতিকৃতি গোলাকারে লিখিত হয়, আর নাদ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে তন্নিম্নে অঙ্কিত হয়। চন্দ্রবিন্দুর অভিজ্ঞান 'ঁ' সকলেই জানেন। উর্দ্ধস্থটী বিন্দু এবং নিম্নস্থ বক্ররেখা নাদের পরিচায়ক। নাদও আঘাত হইতে অভিব্যক্ত। অকার, উকার, মকার তত্ত্বত্রয়ের অভিজ্ঞান। ব্রহ্ম-বিষ্ণু শিব-রূপে—সৃষ্টি-স্থিতিলয়রূপে প্রবৃত্তি-প্রকাশ-নিরোধরূপে এই তত্ত্বত্রয় ব্যাখ্যাত হয়। নাদ বিন্দু শক্তি—এই তিন একই পদার্থ। শক্তিরই বিকাশভেদে নাদ ও বিন্দু এই আখ্যাদ্বয় হয়। অনুসন্ধিৎসু পাঠক তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রে ইহার গূঢ় বিবরণ পাইবেন। নাদ ও বিন্দু উভয়েই শক্তির সূক্ষ্মাবস্থার প্রকটন; ইহার মধ্যে নাদাবস্থায় ইহা আহত অর্থাৎ দ্বৈততত্ত্বাত্মক, আর বিন্দু অবস্থায় ইহাতে আঘাত বা দ্বৈতাবধান নাই, কিন্তু দ্বৈতবীজ আছে। শক্তির এই বীজাত্মক সূক্ষ্ম প্রকটন অনাহত শব্দ। তখনও ইহা সূক্ষ্ম-ব্যোমতত্ত্বের গণ্ডী অতিক্রম করে নাই। তৎপরে শক্তি—প্রকৃতি—মায়া—অব্যক্ত। সেই তিমিরময় অব্যক্ত-রাজ্যের পরপারে প্রকাশ-স্বভাব চিৎপ্রদীপ দেদীপ্যমান। যে সাধক ধ্যানযোগে এই তত্ত্বসাক্ষাৎকার লাভ করেন, তাঁহার সংশয় বা কোথায়, বিস্ময় বা কোথায় ? ।)৫

বালাগ্রশতসাহস্রং তস্য ভাগস্য ভাগশঃ।
তস্য ভাগস্য ভাগার্দ্ধং তজ্জ্ঞেয়ঞ্চ নিরঞ্জনং।৬

কেশাগ্রের শত ভাগের একভাগ, তাহার সহস্র ভাগের একভাগ, তাহার অর্দ্ধাংশ,—তাহার অর্দ্ধাংশ যেমন সূক্ষ্ম, নিরঞ্জন পর-ব্রহ্মতত্ত্বও তদ্রূপ সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্মতর। (এখানে সূক্ষ্মবস্তু কেশের বহুভাগের একভাগ দেখা-ইবার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম পরমসূক্ষ্ম – সূক্ষ্ম-ধারণার শেষসীমা। ভাগ-সংখ্যা-প্রদর্শন উদ্দেশ্য নহে। যদি প্রদর্শিত সূক্ষ্ম ভাগাত্মক বস্তুর ভাগ সম্ভব হয়, তবে উহাও ব্রহ্ম নহে। জড় বস্তুর সূক্ষ্মাংশ ব্রহ্ম, এরূপ বলা বক্তার অভিপ্রায় নয়। সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্ম দুর্লক্ষ্য দৃষ্টি-দর্শনের অতীত সত্তা বুঝাইবার জন্য কেবল সূক্ষ্ম-ভাগের অবতারণা। বেদে ভগবান্‌কে সহস্রচক্ষু সহস্রপাদ্ বলা হইয়াছে, তাৎপর্য্য অনন্তশক্তি। ১০০০ চরণ ও ১০০০ চক্ষুর্বিশিষ্ট জীবকে ঈশ্বর বলা বেদের ইচ্ছা নয়। এখানে কেশাগ্রের চারিলক্ষভাগের একভাগকে পরমাত্মা বলাও শাস্ত্রের অভিসন্ধি নয়।)৬

পুষ্পমধ্যে যথা গন্ধং পয়োমধ্যে যথা ঘৃতম্। তিল-মধ্যে যথা তৈলং পাষাণেষ্বিব কাঞ্চনম্। ৭

এবং সর্ব্বাণি ভূতানি মণিসূত্রমিবাত্মনি।
স্থিরবুদ্ধিরসং মূঢ়োব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মণিস্থিতঃ। ৮

পুষ্পে যেমন গন্ধ বিরাজ করে, দুগ্ধে যেমন ঘৃত অবস্থান করে, তিলে যেমন তৈলের অধিষ্ঠান, পাষাণময় খনিতে যেমন স্বর্ণ বাস করে, সেইরূপ পরমেশ্বর সর্ব্ব-ভূতের অভ্যন্তর ব্যাপিয়া অবস্থান করেন, আর সেই পরমেশ্বরে সমস্ত জীব-জড়—জগৎ অবস্থিতি করে। যেমন মণিসকল একটী সূত্রে গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ সমস্ত-সংসার চিৎসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। জগৎ পরমাত্মায় অবস্থিত এবং পরমাত্মা জগতের সর্ব্বত্র অনুস্যূত। এই ভাবে যে যোগী আপনাতে ভগবত্তত্ত্ব ধারণা করেন ও ভগবানে নিজেকে অবস্থিত মনে করেন, তিনিই স্থিরবুদ্ধি, মোহশূন্য ও ব্রহ্মজ্ঞ। (এখানে যে সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইল, ইহাই শ্রীগীতায় সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্ব ভূতানি চাত্মনি—সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন ও আত্মায় সর্ব্ব-ভূতদর্শন-স্বরূপে বিবৃত হইয়া বেদান্ত-বিজ্ঞানকে মানবের কর্ম্মজীবনেও স্থাপন করিয়াছে।) ৭-৮

তিলানাস্তু যথা তৈলং পুষ্পে গন্ধমিবাশ্রিতম্। পুরুষস্য শরীরে তু সবাহ্যাভ্যন্তরঃ স্থিতঃ। ৯

তিলে তৈলবৎ ও পুষ্পে গন্ধবৎ, জীবদেহের সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া চৈতন্যস্বরূপ আত্মা বিরাজিত। (পূর্ব্ব-শ্লোকদ্বয়ে এই কথাই কথিত হইয়াছে, এখানে প্রাণিদেহ লইয়া বিশেষভাবে বলা হইতেছে মাত্র। পূর্ব্বমন্ত্রে স্থূলবুদ্ধিগণের আশঙ্কা থাকে যে, পরমাত্মা বুঝি কেবল জড়-জগতে অনুস্যূত। এখানে সেই সংশয়-নাশের জন্য বলা যাইতেছে, জীবের জড়দেহের বাহ্যাভ্যন্তর উভয়ত্রই তাঁহার বিদ্যমানতা)৯

বৃক্ষস্তু সকলং বিদ্যাৎ ছায়া তস্যৈব নিষ্কলা। সকলে নিষ্কলে ভাবে সর্ব্বত্রাত্মা ব্যবস্থিতঃ।১০

বৃক্ষসকল বা সাবয়ব অর্থাৎ প্রকৃত পদার্থ, আর সেই বৃক্ষের ছায়া নিষ্কলা বা নিরবয়বা বা অপদার্থরূপা। পরমাত্মা, সকল ও নিষ্কল, সাবয়ব ও নিরবয়ব, প্রকৃত ও অপ্রকৃত সকল পদার্থেই বিদ্যমান। (এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল, ব্রহ্ম যথার্থ বস্তু, সেই যথার্থ বস্তু হইতে অযথার্থ জগতের উদ্ভব সম্ভব হয় কিরূপে? দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান হইতেছে—যথার্থ বৃক্ষ হইতে অযথার্থ ছায়ার আবির্ভাব যেমন অনুভবযোগ্য, তদ্রূপ সত্যস্বরূপ পরমাত্মা হইতে এই অসত্য-ময় জগতের উদ্ভব অসম্ভব নহে। কারণ ও কার্য্য একপ্রকার হইবে, ইহার যুক্তি নাই, যেহেতু সাবয়ব বৃক্ষের নিরয়বা ছায়া দেখা যায়। চিন্ময় আত্মা হইতে জড় জগৎ জন্মিতে পারে। সংশয় হইতে পারে, বৃক্ষ ও ছায়া যেমন বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাক্রান্ত, ব্রহ্ম ও জগৎ সেরূপ হইলে অন্যায় হয়, কারণ ব্রহ্ম নিত্য এবং জগৎ অনিত্য এই দ্বিবিধ ভাব বা সত্তা স্বীকার করিলে দ্বৈতাপত্তি হয়। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—মিথ্যা কোনও পদার্থ নয়, তাহা দ্বারা দ্বৈতশঙ্কা ঘটে না। মিথ্যার বস্তুতঃ কোনও সত্তা নাই, সত্যের সত্তায় মিথ্যার স্ফুরণ হইয়া থাকে। আত্মা সর্ব্বময়,

তিনি সকল নিষ্কল, সাবয়ব নিরবয়ব, নিত্য অনিত্য, সত্য অসত্য, সকলেরই অধিষ্ঠান-সত্তা মাত্র। মিথ্যা—অসত্য স্বতন্ত্র কিছু নয়, তাঁহারই অপ্রকাশ-ভাব বা অধিষ্ঠান-সাক্ষাৎকার না হওয়া মাত্র; নূতন কিছু নহে, সুতরাং দ্বৈতভয়ের মূলেই ভুল।)১০

অতসীপুষ্প-সঙ্কাশং নাভিস্থানে প্রতিষ্ঠিতং। চতুর্ভুজং মহাবীরং পূরকেণ বিচিন্তয়েৎ।১১
কুম্ভকেন হৃদিস্থানে চিন্তয়েৎ কমলাসনং। ব্রহ্মাণং রক্তগৌরাঙ্গং চতুর্ব্বক্ত্রং পিতামহম্।১২

রেচকেণ তু বিদ্যাত্মা ললাটস্থং ত্রিলোচনং। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং নিষ্কলং পাপনাশনম্।১৩

যোগী নিজের নাভিমণ্ডলে অবস্থিত মহাবীরমূর্ত্তি—প্রণবের প্রথমমাত্রার বাচ্য-দেবতা শ্রীবিষ্ণুকে পূরককালে অর্থাৎ বায়ুগ্রহণরূপ পূরক-প্রাণায়ামের জন্য অবধারিত ষোড়শ-মাত্রাত্মক সময়ে, প্রণব-জপসহকারে ধ্যান করিবে। আর কুম্ভককালে অর্থাৎ চতুঃষষ্টিমাত্রাপরিমিত বায়ুরোধনরূপ প্রাণায়াম-বিশেষের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে, প্রণবজপ-সহকারে হৃদয়স্থানে প্রণবের দ্বিতীয়-মাত্রার দেবতাস্বরূপ রক্তগৌরাঙ্গ চতুর্ম্মুখ কমলযোনি ব্রহ্মাকে চিন্তা করিবে। অনন্তর সাধক, রেচক-কালে অর্থাৎ বায়ুত্যাগ রূপ রেচক-প্রাণায়ামের জন্য অবধারিত দ্বাত্রিংশৎমাত্রাত্মক সময়ে, প্রণব-জপপূর্ব্বক প্রণবের তৃতীয় মাত্রারূপ মকারবাচ্য বিশুদ্ধ স্ফটিকধবল জ্ঞানময় কলাতীত পাপহারী মহেশ্বরকে ললাটস্থানে ধ্যান করিবে। (প্রণবের মাত্রাত্রয় ত্রিদেবময়। প্রণব একাধারে ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবাত্মক, সৃষ্টিস্থিতি-সংহারময়। এখানে ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য—চেতনাস্থানের এই কেন্দ্রত্রয়ের অধিষ্ঠাতা ত্রিমূর্ত্তির চিন্তন বা সাকাররূপের স্থূলধ্যান বর্ণিত হইতেছে। শুধু চিন্তামাত্রই ধ্যান নহে, বিহিতকালে বিহিতমন্ত্র-জপাদির সঙ্গে বৈধতত্ত্বের চিন্তা করাই ধ্যানশব্দের যথার্থ অর্থ। প্রাণায়াম-প্রণালী কালের পরিমাণ করে। পূরক বা বায়ুসংগ্রহ ষোড়শমাত্রা সময়ে করিতে হইবে,—তাহার চতুর্গুণ সময় বায়ুরোধ বা কুম্ভক,—তাহার অর্দ্ধ সময় বায়ুত্যাগ বা রেচক, এইরূপ প্রণালী শাস্ত্রের অনুমোদিত। যদি চারি মাত্রায় পূরক করিতে হয়, তবে ১৬ মাত্রায় কুম্ভক ও ৮ মাত্রায় রেচক করিতে হইবে। ষোড়শমাত্রাত্মক প্রাণায়ামই ধ্যানের পক্ষে বিহিত। সময়-নিরূপণের জন্য জপের ব্যবস্থা, নচেৎ পূরক-কুম্ভক-রেচকের কাল-পরিমাণ স্থির করা যায় না। যোগশাস্ত্রে মাত্রা সম্বন্ধে নানাকথা কথিত হইয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ পাতঞ্জল দর্শনে দ্রষ্টব্য।) ১১-১২-১৩

অষ্টপত্রমধঃপুষ্পমূর্দ্ধনালম্ অধোমুখম্। কদলীপুষ্প-সঙ্কাশং সর্ব্বদেবময়াত্মকম্।১৪
শতাব্দং শতপত্রাঢ্যং বিপ্রকীর্ণাজ্ঞ কর্ণিকম্। তত্রার্কচন্দ্রবহ্নীনামুপর্য্যুপরি চিন্তয়েৎ।১৫

পূর্ব্বোক্ত দেবতাত্রয়ের অবস্থান শক্তি-কেন্দ্রত্রয় তিনটী পদ্মরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে নাভিস্থানস্থিত প্রথমপদ্ম অষ্টদল, হৃদয়স্থ দ্বিতীয়পদ্ম ঊর্দ্ধনাল ও অধোমুখ, এবং তৃতীয়পদ্ম (ললাটস্থ) কদলীপুষ্পবৎ পরিদৃশ্যমান। এই পদ্মগুলি সর্ব্বদেবময়। এতদ্ভিন্ন মূর্দ্ধদেশে শতপত্রময় পদ্ম বিরাজমান

আছে। ইহাকে সংস্রদল পদ্ম কহা যায়। বহুপদ্মময় ও বহুকর্ণিকাসঙ্কুল পূর্ব্বোক্ত পদ্মত্রয় সুষুম্নাসূত্রে গ্রথিত থাকায় একরূপে বিবেচিত হইলেও বস্তুতঃ ইহারা ভিন্ন। কেবল যে পদ্মগুলিই ভিন্ন তাহা নহে, ইহাদের দলগুলি পৃথক্, কর্ণিকাগুলি পৃথক্, প্রভৃত পদ্মগুলি সম্পূর্ণ পৃথক্। ইহাদের প্রত্যেকটীতে চন্দ্র, সূর্য্য ও বহ্নিতত্ত্ব ঊর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। (সুষুম্না নাড়ী সূর্য্য-চন্দ্রাগ্নিরূপা ত্রিগুণময়ী; ঊর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিত প্রত্যেক পদ্মই সুষুম্নাস্থ, সুতরাং ত্রিতত্ত্বের বিকাশমাত্র।)

পদ্মস্যোত্থাপনং কৃত্বা বোঢ়ুং চন্দ্রাগ্নি-সূর্য্যয়োঃ। তস্যাস্তর্বীজমাহৃত্য আত্মা সঞ্চরতে ধ্রুবম্। ১৬

যোগবলে সূর্য্যচন্দ্র ও বহ্নির বহনার্থে তত্ত্বত্রয়ের যথাযথ স্থাপনার্থে পদ্মের উত্থাপন সম্পাদন করিয়া অর্থাৎ অধোমুখতা বা অধর্ম্মোন্মুখতা রোধ করিয়া ঊর্দ্ধমুখতা বা ধর্ম্মোন্মুখতা সাধন করিয়া, পদ্মান্তর্গত বীজ অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া (জ্ঞান-কর্ম্ম-সংস্কারানুপ্রাণিত হইয়া) জীব সঞ্চরণ করে অর্থাৎ শুভাশুভ লোকান্তর লাভ করে,—ইহা বেদসম্মত সিদ্ধান্ত।১৬

ত্রিস্থানঞ্চ ত্রিমার্গঞ্চ ত্রিব্রহ্ম চ ত্রিরক্ষরং। ত্রিমাত্রঞ্চার্দ্ধমাত্রঞ্চ যস্তং বেদ স বেদবিৎ। ১৭

নাভিদেশ, হৃদয়দেশ ও ললাটদেশ—এই ত্রিস্থানে অবস্থিত পদ্মত্রয়, বিষ্ণুব্রহ্মশিবাত্মক দেবতাত্রয় ও তদুপাসনার ত্রিবিধ মার্গ, নাভিস্থানে ব্রহ্মা, হৃদয়ে বিষ্ণু, ললাটে শিব এই ত্রিব্রহ্ম, অকার উকার ও মকার—এই ত্রিমাত্র প্রণব ও তদ্বাচ্য দেবত্রয়, এবং অর্দ্ধমাত্রাত্মক শক্তিময় তত্ত্ব,—এ সমস্ত যিনি অবগত আছেন, তিনিই বেদবিৎ।' (যিনি প্রণবের প্রকৃতবাচ্য সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার-এই ত্রিশক্তির অবতার পরাৎপর শক্তিময় পুরুষকে অবগত আছেন, তিনিই যথার্থ বেদজ্ঞ। যোগাচার্য্য বলিয়াছেন,—"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।)১৭

তৈল ধারামাবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টা নিনাদবৎ। অবাগ্জং প্রণবস্যাস্তং যস্তং বেদ স বেদবিৎ।১৮

নাদ-ধ্যানের ফল ও স্বভাব বর্ণনার্থে বলা হইতেছে—অবিচ্ছন্ন তৈলধারার ন্যায় ও দীর্ঘঘণ্টাধ্বনির ন্যায় অবিচ্ছিন্ন এবং বিশদ এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা অনুভূত হয় না অথবা ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বে যাহার অনুভব হইয়া থাকে, প্রণবের মাত্রাসমূহের পরে অনুভূয়মান অমাত্র নাদ যিনি জানিতে পারেন, তিনিই বেদবিৎ। (যাঁহার কর্ণে নাদধ্বনি প্রবেশ করে, তিনি অলৌকিক শব্দ-শ্রবণের মহিমায় মহীয়ান্ হইতে পারেন।)১৮

প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।১৯

প্রণব বা ওঁকার ধনুস্বরূপ, আত্মা শর বা বাণস্থানীয়, পরমাত্মা ব্রহ্ম ইহার লক্ষ্য। যে সাধক অপ্রমত্তভাবে প্রণবধনুতে আত্ম-বাণ যোজনা করিয়া ব্রহ্মলক্ষ্য ভেদ করিতে পারে, প্রণব-ধ্যানবলে আত্মাকে ব্রহ্মে মিশাইয়া দিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মময় হইয়া যান। (শর লক্ষ্য বিঁধিয়া তাহাতে ডুবিয়া যায় আপনাকে হারাইয়া ফেলে, সাধকের আত্মাও ব্রহ্মে ডুবিয়া যায়। আত্মসত্তা হারাইয়া ব্রহ্মসত্তা মাত্র অনুভব করে।)১৯

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিং।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥২০

নিজ দেহকে অরণিরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রণবকে উত্তরারণি কল্পনা করিয়া, ধ্যানরূপ নির্ম্মথন-প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া, গুপ্ত-সুপ্তভাবে অবস্থিত পরমাত্মতত্ত্বরূপ অগ্নির সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। (পুরাকালে দুইটী কাষ্ঠ-খণ্ডের ঘর্ষণে যজ্ঞের জন্য অগ্নি-প্রণয়ন করা হইত। একটী কাষ্ঠের উপরে অন্য কাষ্ঠ রাখিয়া ঘর্ষণ করা হইত; প্রথম-টীর নাম অরণি, দ্বিতীয়টীর নাম উত্তরারণি। ঘর্ষণে যেমন কাষ্ঠস্থ অগ্নিরই বিকাশ হয়, সেইরূপ ধ্যানে আত্মস্থ ব্রহ্মরূপের বিকাশ হয়, নূতন কিছুর আগম হয় না।)২০

যথৈবোৎপলনালেন তোয়মাকর্ষয়েৎ পুনঃ। তথৈবোৎ কর্ষয়েদ্বায়ুং যোগী যোগ-পদে স্থিতঃ। ২১

অর্দ্ধমাত্রাং রজ্জুং কৃত্বা কূপভূতস্ত পঙ্কজম্।
কর্ষয়েন্নালমার্গেণ ভ্রুবোর্ম্মধ্যে নয়েল্লয়ম্। ২২

যেমন পদ্মনাল দ্বারা জল উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করা যায়, সেইরূপ যোগপদস্থ যোগী শক্তি-চালন-ক্রিয়ার দ্বারা ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া উর্দ্ধমুখে প্রাণবায়ুকে সমাহরণ করিবেন। বায়ুকে যথাস্থানে নিশ্চলভাবে স্থাপন করিতে পারিলেই সুখদুঃখাতীত জীবন্মুক্তদশা উপস্থিত হয়। কৃষক যেমন ঘট-রজ্জু-যোগে কূপ হইতে জল উত্তোলন করে, সাধকও তদ্রূপ অর্দ্ধমাত্রা-রূপ তত্ত্বকে ঘটবন্ধন-রজ্জু রূপে গ্রহণ করিয়া, তদ্‌যোগে কূপস্বরূপ পঙ্কজ বা চক্র হইতে কুল-কুণ্ডলিনী শক্তিকে সুষুম্নাচ্ছিদ্রপথে আকর্ষণ করিবেন, এবং ভ্রূমধ্যে অমৃততত্ত্বের অবস্থান-স্থান লয়স্থানে স্থাপন করিবেন। (এখানে, সাধক অমৃতপানে পরিতৃপ্ত হন ও জরামৃত্যু অতিক্রম করেন, এ তত্ত্ব বর্ণিত হইতেছে।) ২১। ২২

ভ্রুবোর্ম্মধ্যে ললাটস্তু নাসিকায়াস্তু মূলতঃ।
অমৃতস্থানং বিজানীয়াৎ বিশ্বস্যায়তনং মহৎ
বিশ্বস্যায়তনং মহৎ ইতি ধ্যানবিন্দূপনিষৎ সমাপ্তা। ২৩

নাসিকার মূল-দেশের উর্দ্ধে ভ্রূযুগলের মধ্যভাগে ললাটে যে বিন্দুস্থান আছে, উহাই অমৃতস্থান, ঐস্থান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আয়তন। (ভ্রূমধ্যে যখন দৃষ্টি স্থাপিত হয়—অর্থাৎ যখন জীবকর্ম্মের অধঃস্রোত প্রশমিত হয়, কেবল উর্দ্ধস্রোতই প্রবহমান থাকে, অধোবাহী কর্ম্মস্রোত রুদ্ধপ্রায় হয়, জ্ঞান-স্রোত প্রবলতা লাভ করে, সেই সময় সাধক পরমানন্দরূপ অমৃতধারা পানে পরিতৃপ্ত হন। যোগশাস্ত্রানুসারে কুলকুণ্ডলিনী ললাট-দেশে উপনীত হইয়া, উর্দ্ধমুখে সহস্রদল-কমলগলিত সুধারস পান করিয়া পরিতৃপ্ত হন। যোগবিদেরা কেহ কেহ বলেন, এই অমৃতস্থান চন্দ্রস্থান মাত্র, সহস্রার-ক্ষরিত সুধা, ইহারও উর্দ্ধে মূর্দ্ধদেশে। এখানে কুল-কুণ্ডলিনী চন্দ্রমণ্ডলস্থ অমৃত আস্বাদন করেন। ইহারও পরে চিদানন্দের স্থান। তাহার জন্য খেচরীমুদ্রার ব্যবস্থা রহিয়াছে। যে ভাবেই হউক, এখানে সাধক তৃপ্ত ও কৃতার্থ হইয়া থাকেন,—তাহাতে কোনও সংশয়লেশ পরিলক্ষিত হয় না।) ২৩

'ধ্যানবিন্দু' উপনিষদের বঙ্গানুবাদ পরি-সমাপ্ত হইল। ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মার্পণমস্তু।

শ্রী—ভারতী, যশোহর।

দর্শনচ্ছায়া।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

প্র। যাক্, আকাশ সম্বন্ধে যে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান হইল, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট মনে করিতেছি। এখন তুমি কাল সম্বন্ধে কিরূপ ব্যাখ্যা করিবে তাহাই জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি।

উ। "কোনও কালে এই জগৎ-সৃষ্ট হইয়াছে এবং কোনও কালে ইহা পুনরায় বিলয় প্রাপ্ত হইবে।" এখন দেখ এই জগৎ-সৃষ্টিরূপ কার্য্যের প্রাথমিক সংযোগ কোথায় দাঁড়াইল এবং উহার লয়ই বা কোথায় পুনরায় দাঁড়াইতেছে। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, এই সৃষ্টির মূলে অধিকরণরূপ 'কাল' নামক এক সত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সেই সত্তাই আবার ইহার লয়ের মূলে অধিকরণ-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই সত্তাই কাল নামে অভিহিত হইয়াছে। এই কাল আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ গোচর নহে, কেননা সেরূপ কোন গুণের সমাবেশ ইহাতে নাই। সুতরাং ইহাও আমাদের ন্যায় সূক্ষ্ম এবং নিরবয়ব। শাস্ত্রে ইহা অনাদি অনন্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

প্র। আচ্ছা, এখানে সৃষ্টির মূলে যে কাল ছিল, তাহাই কি পুনরায় লয়ের মূলে আসিয়া দাঁড়াইল?

উ। হাঁ, সেই একই কাল এই উৎপত্তি এবং বিনাশবিশিষ্ট সৃষ্টির উভয় প্রান্তে অখণ্ডভাবে স্থির রহিয়াছে। কাল সত্তাময়, সুতরাং ইহা একই প্রতিপন্ন হইতেছে। আর দেখ, 'এখন' বলিলে কালের সত্তা সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ জ্ঞান হয়, 'তখন' বলিলেও ঠিক্ সেইরূপই হয়; এখন এই জ্ঞানের কোনরূপ বৈষম্য উপলব্ধি না হওয়ায় কালের সত্তা সম্বন্ধে একত্ব স্পষ্টই সিদ্ধ হইতেছে। অপিচ ইহা অখণ্ড; তবে উৎপত্তি-বিনাশশীল কর্ম্মবিশেষের সহিত সংযোগবশতঃ ইহা এইরূপ খণ্ডাকার পরিচ্ছেদে অনুভাবিত হইতেছে। বস্তুতঃ এই পরিচ্ছেদ উহার স্বাভাবিক নয়। দেখ, দিন, মাস—বৎসর ইত্যাদি কালিক বিভাগগত বাক্যনিচয়-ব্যবহারের মূলে আমরা কি দেখিতে পাই; ইহাতে কি ইহাই দৃষ্ট হয় না যে, উৎপত্তিবিনাশশীল সূর্য্যের কর্ম্ম—উদয় এবং অস্ত, ঐ কালে সংযুক্ত থাকা হেতু উহা দিনাখ্যা প্রাপ্ত হইতেছে, পুনরায় মেষাদি দ্বাদশরাশি পরিভ্রমণরূপ সূর্য্যগতি ঐ কালপ্রবাহে সংযুক্ত থাকিয়া নির্ব্বাহ হইতেছে বলিয়া উহা মাস এবং বৎসরাখ্যা প্রাপ্ত হইতেছে? তবেই দেখ, এই চরাচর বিশ্বস্থ যাবতীয় প্রাণী এবং দ্রব্যনিচয় সমস্তই, অর্থাৎ তাহাদের নিজ নিজ কর্ম্মবিশেষে এই অখণ্ড কালগর্ভে নিমগ্ন থাকিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে কি না! সুতরাং কালের যে এই খণ্ডাকার পরিচ্ছেদ দেখিতেছ, ইহা উৎপত্তিবিনাশযুক্ত—দ্রব্যঘটিত না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে?

প্র। তাহা হইলে তোমার যুক্তি অনুসারে এই উৎপত্তিবিনাশের মূল এই কালই একরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে; তাই কি?

উ। উৎপত্তি এবং বিনাশের অধিকরণরূপ ভিত্তি যখন ইহা স্থির হইল, তখন ইহা অবশ্য ঐ বিকারদ্বয়ের হেতুভূত হইয়া দাঁড়াইতেছে,

ইহা স্বীকার্য্য। তবে ইহা কেবল মাত্র সংযোগাধীন হেতু এবং এই হেতুত্ব থাকায় কালকে সর্ব্বমূর্ত্তসংয়োগী সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং কাল যে, জন্য বস্তু মাত্রেরই অধিকরণরূপ কারণ, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। দীপশিখার উৎপত্তিস্থল যেরূপ বায়ুপ্রবাহ এবং উহা নির্ব্বাপিত হইলেও যেরূপ ঐ প্রবাহেই পুনরায় নিমীলিত হইয়া যায়; অবয়বের উৎপত্তিস্থল ও সেইরূপ এই কালপ্রবাহ এবং ইহা বিনাশ-প্রাপ্ত হইলেও পুনরায় ঐ প্রবাহেই নিমজ্জিত হইয়া যায়। তবেই দেখ, ভাব এবং অভাবরূপ কার্য্য এই কালপ্রবাহে তুল্যরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে কি না?

প্র। বুঝিলাম, কিন্তু কালের ব্যাপকতা সম্বন্ধে কিছুই বল নাই। ইহার ব্যাপকতা সম্বন্ধে শাস্ত্রের উক্তি কি?

উ। কাল যখন সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগী কারণ হইল, তখন ইহা যে পরম মহৎ তদ্বিষয়ে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে? এই যে বিশাল বিশ্বরচনা—পূর্ব্বোক্ত পঞ্চমহাভূতাত্মক অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড, যাহা আমাদের নিকট স্থূল এবং স্থির বলিয়া বিবেচিত হইতেছে; কিন্তু স্বরূপতঃ ইহা স্থূলও নয় এবং স্থিরও নয়। নদী যেরূপ অবিরাম অবিশ্রাম প্রবল তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে সাগরাভিমুখে প্রবাহবতী, সেইরূপ এই সৃষ্টিপ্রবাহও ঘোর নৃত্যাবেশে তরঙ্গায়িত হইয়া কালসাগরাভিমুখে প্রবহমান। এখানেই দেখ, এই সৃষ্টিপ্রবাহের উৎপত্তিমনিমিত্ত কাল কি না? আকাশবক্ষে ফলিত রামধনুর ন্যায় স্পন্দিত এই দৃশ্যজাল, এই কালসাগরের তরঙ্গ-লেখায় ভাসমান কি না! অতএব এখানেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই কাল যে কেবল বর্ত্তমান-ব্যবহার সম্বন্ধে সার্ব্বত্রিক এবং সর্ব্বগত তাহা নয়, অতীতানাগত-ব্যবহার সম্বন্ধেও ইহা ঠিক তদ্রূপ। এখন একবার ধ্যানস্থ হইয়া দেখ দেখি, এই কালসত্তার আদি অন্ত কোথায় এবং কোথায়ই বা এই চন্দ্র সূর্য্য-পৃথিবী-সমন্বিত বিশাল সংসারজাল অবস্থান করিতেছে!

শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

অবতার।

১। পরমসত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম এই সৃষ্টিতে যত প্রকার পুরুষ অথবা স্ত্রীরূপে আবির্ভূত আছেন, হইয়াছিলেন বা হইতে পারেন, তাহা; সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম ও স্থূল এই ত্রিবিধ দৃষ্টিতে আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক এই তিন ভাগে বিভক্ত। সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, জল, পৃথিবী, চন্দ্রমণ্ডল, তারকামালা, জলদজাল প্রভৃতি ভৌম ও স্বর্গীয় দ্যোতনবান্ দেবতাতে পরব্রহ্মের যে অন্তর্যামী, অধিষ্ঠাতৃত্ব ও বরণীয়রূপ-অধিষ্ঠান, সেই সমস্ত তাঁহার আধিদৈবিকরূপ। সূর্য্যের অন্তর্যামী বরণীয় রূপের যে ধ্যান বেদে বিহিত হইয়াছে, তাহাই পরব্রহ্মের অধিদৈব-মূর্ত্তির উপাসনা। মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদিতে পরব্রহ্মের যে নিয়ন্তারূপ গূঢ় অধিষ্ঠান, তাহাই তাঁহার আধ্যাত্মিক অবতার। যিনি বুদ্ধিবৃত্তির অধিদেবতা হইয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে বিষয়ে প্রেরণ করেন, সেইভাবে বেদে তাঁহার যে ধ্যানের বিধি দিয়াছেন, তাহাই তাঁহার আধ্যাত্মিক-মূর্ত্তির

উপাসনা। রাম, কৃষ্ণ, দুর্গা প্রভৃতি মায়িক স্থূলদেহ পরিগ্রহ-পূর্ব্বক তাঁহার যে লীলা, তাহাই তাঁহার আধিভৌতিক অবতার। এই সকল রূপের উপাসনা প্রসিদ্ধই আছে। পরম কারুণিক পরমেশ্বর, প্রকৃতি বা মায়া বিরচিত নানাপ্রকার সূক্ষ্ম ও স্থূল উপাধি অবলম্বনপূর্ব্বক এই জগতের আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক রাজ্যে, যথায় যেমন প্রয়োজন, নিত্য অথবা যুগে যুগে পুরুষ ও স্ত্রীরূপে আবির্ভূত হইয়া, জগৎ পালন, ধর্ম্মরক্ষা ও অধর্ম্মক্ষয় করিয়া থাকেন। নিম্নে, আমরা ক্রমে আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ বিভাগে তাঁহার কতিপয় লোকপ্রসিদ্ধ ও শাস্ত্রসিদ্ধ প্রধান প্রধান পুরুষ ও স্ত্রী অবতারের বিবরণ প্রদান করিতেছি। এই বর্ত্তমান কালে, কৃতবিদ্য যুবা পুরুষগণের স্বাধীন অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহারা অনেকেই অবতার-সমূহের কোনরূপ আধিদৈবিক বা আধ্যাত্মিক অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। ইহা অবশ্য প্রশংসনীয় কার্য্য, কিন্তু তাঁহারা আপনাদের বুদ্ধিকেই সর্ব্বেসর্ব্বা ভাবিতেছেন; সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া ঋষি ও আচার্য্যগণ যেরূপ ভাবে সেই সকল গূঢ়তত্ত্বের অর্থ সিদ্ধান্তস্বরূপে স্থির করিয়া গিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য করিতেছেন; এবং শাস্ত্রার্থদর্শী কর্ম্মব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও সন্ন্যাসীগণকে অসভ্যদলের মধ্যে ঠেলিয়া রাখিয়া, আপনাদের বুদ্ধি বিদ্যানুযায়ী সিদ্ধান্ত করিতেছেন। এইজন্য তাঁহাদের মনোরথ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে সফল হইতেছে না। তাঁহারা যদি শাস্ত্রীয় বুদ্ধি উপার্জ্জন করিতেন এবং সেই বুদ্ধিরূপ নয়ন দিয়া দেখিতেন, তবে অবতারগণের কেবল আধিদৈবিক ও অধ্যাত্মিক-তাৎপর্য্য মাত্রে সন্তুষ্ট হইতেন না। তাঁহাদিগের আধিভৌতিক দেহধারণের অভিপ্রায় ও তদানুষঙ্গিক ঘটনাসকল বুঝিয়া কৃতার্থ হইতেন। বেদান্তসূত্রে মীমাংসা করিয়াছেন, "অন্তর্যাম্যধি-দৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ"। জীবের মনোবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় গ্রামে অন্তর্যামিরূপে এবং সূর্য্যাদি দেবলোকে অধিদেবতারূপে বাস-করা ব্রহ্মের ধর্ম্ম। বেদে আছে "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে" এবং "ব্রহ্মাদেবানাং প্রথমঃ সম্ভব বিশ্বস্যকর্ত্তা ভুবনস্যগোপ্তা"। হিরণ্যগর্ভ ও ব্রহ্মারূপে তিনিই নরলোকে আধিভৌতিক কলেবরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রুতি এবং গীতায় আছে, তিনি ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে যুগেযুগে দেহধারণপূর্ব্বক অবতীর্ণ হয়েন। অতএব এই ত্রিবিধ অবতার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ।

২। রামচন্দ্র, অধিদৈবতরূপে সূর্য্যান্তর্যামি বিষ্ণু অথবা গোলকাধিপতি, আধ্যাত্মিকরূপে আত্মারাম, এবং আধিভৌতিকরূপে দশরথরাজার পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ অধিদৈবতরূপে প্রাগুক্তপ্রকার বিষ্ণু, আধ্যাত্মিকরূপে হৃষীকেশ, এবং আধিভৌতিক রূপে বসুদেবসুত। সাবিত্রী, অধিদৈবত রূপে সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থা বৈষ্ণবী-শক্তি, আধ্যাত্মিকরূপে তপস্যাশক্তি এবং আধিভৌতিকরূপে অশ্বপতি-রাজতনয়া। রাধা, অধিদৈবতরূপে গোলকস্থা বৈষ্ণবীশক্তি, আধ্যাত্মিকরূপে জীবের ভক্তিরূপিণী আরাধনা শক্তি, এবং আধিভৌতিকরূপে বৃষভানুরাজ নন্দিনী *। শ্রীদুর্গা। অধিদৈবতরূপে সর্ব্বদেবতাতে দৈবীশক্তি, মহাপ্রলয়ে

* 'রাধান' শব্দে 'আরাধন' বা 'সেবন'। ঋগ্বেদে 'রাধান' শব্দ সাধয়ান' অর্থে গৃহীত হইয়াছে। (১।৪০৬)। তাহাতে অন্যত্র

কালরাত্রিস্বরূপিণী, অর্চ্চনাদি-বিদ্যাতে মহাবিদ্যা; আধ্যাত্মিক তত্ত্বে তিনি দয়া, নিদ্রা, স্মৃতি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি; এবং আধিভৌতিক মূর্ত্তিতে তিনি সতী ও হৈমবতী। লক্ষ্মী প্রকৃতি, অধিদৈবতভাগে স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী, আধ্যাত্মিক-ভাগে সর্ব্বপ্রাণিতে ও সর্ব্বদ্রব্যেতে শোভারূপা মনোহরা, এবং আধিভৌতিক বিভাগে তিনি জানকী, রুক্মিণী ও দ্রৌপদী। সরস্বতী দেবী, অধিদৈবতবিভাগে, সবিতৃমণ্ডল বা অগ্নিলোক-স্বরূপ ব্রহ্মলোকের ঈশ্বরী, তিনি ব্রহ্মদ্বারাবধি ভূলোকস্থ উপাসকগণের হৃদয়ধামপর্য্যন্ত আয়ত সুষুম্নানামক বিদ্যুতীয় অগ্নিময় মার্গস্বরূপিণী আতিবাহিকী দেবতা। § আধ্যাত্মিক-বিভাগে তিনি উপাসকগণের জ্ঞাননাড়ী বহির্মূর্ত্তি-রূপিণী। আধিভৌতিক বিভাগে তিনি ব্রহ্মাবর্ত্তদেশীয় সরস্বতীনদীরূপিণী। সেই স্থানে তিনি মূর্ত্তিমতী নদীরূপে অবতীর্ণ হইয়া, প্রত্যেক আদিযুগে ব্রহ্মর্ষিগণের যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও বেদবেদান্ত অধ্যয়নের অভিনেত্রী হয়েন।

'রাধ' শব্দ মন বা প্রাণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (১।৬০৬)। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীরাধিকা পঞ্চপ্রাণরূপিণী বলিয়া উক্ত হন।

‡ শ্রীদুর্গা "সতী" মূর্ত্তিতে আধিভৌতিক বিভাগে দক্ষপ্রজাপতি ও প্রসূতীর কন্যা; কিন্তু আধ্যাত্মিক তত্ত্বরূপে তিনি মানবের বৈরাগ্যধর্ম্মিনী সতী-প্রকৃতি। তদ্ভিন্ন তিনি প্রত্যেক জীবের হৃদয়স্থা দয়া, ক্ষমা, তুষ্টি, পুষ্টি, স্মৃতি, মেধা প্রভৃতি। অতঃপর তিনি হৈমবতী উমারূপেও ঐরূপ আধ্যাত্মিক মূর্ত্তি। মৎকৃত প্রলয়তত্ত্ব "মন্বন্তর" প্রকরণে স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ-বিবরণ দ্রষ্টব্য।

§ বিস্তারিত বিবরণ মৎকৃত-পরলোক-তত্ত্বে 'মার্গবিচার' প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

এই পঞ্চপ্রকৃতিই প্রধান। অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী এবং দশমহাবিদ্যা, দুর্গাপ্রকৃতির অন্তর্গত। এই পঞ্চপ্রকৃতির অর্চ্চনা সমস্তই বেদাগম-বিহিত মন্ত্র ও দ্রব্যসমবায়িনী। আর সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র যে প্রকৃতিকে জীবের কামকর্ম্ম ও উপাধি-লক্ষণ অনাদিবন্ধন-স্বরূপিণী বলেন এবং জ্ঞানোদয়ে যাহার তিরোভাব বিজ্ঞাপন করেন, তাহা অবিদ্যা শব্দে উক্ত হয়। তাহা অর্চ্চনীয়া নহে; কিন্তু ত্যাজ্যা।

রামায়ণ।

৩। রামায়ণ বুঝিতে হইলে প্রথমে কতিপয় সারকথা বুঝা উচিত—ব্রহ্মোতে সকল উপাসনার উদ্দেশ্য, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ সংসারী মানবের অগোচর। এইজন্য মানব, সূর্য্যাদি গ্রহ, আপনার বুদ্ধিবৃত্তি, ও প্রণবাদি মন্ত্রের এবং তাঁহার স্বীয় স্থূলদেহ অবধি সমগ্র-সৃষ্টিরূপ বিরাট্ শরীর পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠাত্রী, অন্তর্যামী ও নিয়ন্তা রূপে তাঁহার উপাসনা করেন। সূর্য্যাদিগ্রহে, বুদ্ধিবৃত্তিতে, প্রণবাদি মন্ত্রে, ত্রৈলোক্যব্যাপী বিরাট্রূপ-দেহোপাধিতে পরমাত্মার যে অধিষ্ঠাতৃত্ব, অন্ত-র্যামিত্ব বা নিয়ন্তৃত্ব, তাহা ব্রহ্মরূপ অনন্ত ও অপার জ্ঞানার্ণবের তটস্বরূপ। তাহা ব্রহ্মকৃত কল্পনামাত্র। স্বকীয় অলক্ষণ, অব্যপদেশ্য, একাত্মপ্রত্যয়সার, উপাধিকল্পনাশূন্য স্বরূপভাব গ্রহণে অসমর্থ জীবের প্রতি কৃপা করিয়া, পরাৎপর পরব্রহ্ম, সূর্য্যাদি দেবতাতে বুদ্ধি-প্রভৃতি আধ্যাত্মিকবৃত্তিতে, প্রণবাদি মন্ত্রেতে এবং ব্রহ্মাণ্ডীয় সমগ্র দেহরাজ্যে আপনার রূপকল্পনা করিয়াছেন। এই সকল রূপকে, সেই ব্রহ্মরূপ অনন্তসাগরের তটস্থ-লক্ষণ

বলা যায়। এই সমস্ত লক্ষণ ধরিয়া তাঁহার উপাসনা হয়। সুতরাং উপাসনামাত্রেই লাক্ষণিক। জীব সেই ব্রহ্মের লাক্ষণিক উপাসক। উপাসক জীব, যখন পরমাত্মাতে মতি স্থির রাখিয়া, সর্ব্বকর্ম্মফল তাঁহাতে অর্পণপূর্ব্বক, তাঁহার অধীন হইয়া যাগযজ্ঞাদি আচরণ, সংসারপালন, রাজকার্য্যসম্পাদন ও প্রজার ভরণপোষণ করেন, তখন তাঁহার উপাসনা "নিষ্কাম উপাসনা" অথবা "ঈশ্বরার্থক্রিয়া" শব্দের বাচ্য হয়। আত্মা হননও করেন না, হতও হন না; প্রকৃতিই, সকল কর্ম্ম করেন, কেবল অহঙ্কাররূপ অধ্যাসবশতঃ প্রকৃতির কর্ম্মকে আপনাতে আরোপ পূর্ব্বক, আত্মা আপনাকে কর্ম্মকর্ত্তারূপে অভিমান করেন; এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ে রাখিয়া যে নিষ্কাম উপাসক অথবা ঈশ্বরার্থকর্ম্মী, সমরক্ষেত্রে শত্রুহননে প্রবৃত্ত হন, তিনিও অনাসক্ত কর্ম্মী এবং ঈশ্বরার্থসংসারী। ব্রহ্মজ্ঞানের এই চারিপ্রকার ভাব। (১) স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বা নিরুপাধিক আত্মানন্দভাব, (২) লাক্ষণিক বা গৌণ উপাসনা-ভাব, (৩) ঈশ্বর প্রীতি-কামনায় সংসারের ভরণপোষণভাব, এবং (৪) ঈশ্বরের সংসাররক্ষাজন্য সমরে শত্রুহনন-ভাব। এই চারিপ্রকার আদর্শে জীবের সংসার নির্ব্বাহ করা প্রয়োজন। এই সমস্তের মধ্যে স্বরূপভাবই ব্রহ্মভাব। অবশিষ্ট ভাবত্রয় জীবের মোক্ষমার্গস্বরূপ। ব্রহ্মবিদ্যা বা নিবৃত্তি, উক্ত স্বরূপভাবেরই সহবর্ত্তিনী। ব্রহ্মবিদ্যা বিনা ব্রহ্মানন্দ, কৈবল্যানন্দ বা আত্মানন্দ স্থিরতর হয় না এবং পরমাত্মা হইতে বিরহিত হইলেও ব্রহ্মবিদ্যা বা নিবৃত্তি মহামোহ-কর্ত্তৃক অপহৃতা হন। এই ভাবটী রামায়ণে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক উভয় আকারেই সংলগ্ন হইয়া আছে।—*

৪। দশরথ, স্মৃত্যুক্ত দশবিধধর্ম্মরথী। তাঁহার তাদৃশ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলস্বরূপ যে আত্মজ্ঞান বা আত্মারাম-স্বরূপ বিশুদ্ধ পরমাত্মভাব তাহাই রামচন্দ্র। পরমাত্মা আপনাতে আপনি রমণ করেন বলিয়া রাম নামে উক্ত। লক্ষণ, তটস্থলক্ষণে উপাসক জীব। ভরত, ঈশ্বরার্থ বা রামচন্দ্রার্থ আত্মীয়, স্বজন ও প্রজাভরণকারী মন। শত্রুঘ্ন, রামচন্দ্রার্থ রাজ্যের বিদ্রোহী শত্রুনাশন অহঙ্কার। সীতা, নিবৃত্তিরূপিণী ব্রহ্মবিদ্যা। জনক, দেহাত্মজ্ঞান-পরিমুক্ত বিদেহরাজ। তাঁহার ব্রহ্মযজ্ঞীয় ক্ষেত্রভেদপূর্ব্বক সীতার আবির্ভাব। দেহাত্মজ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা ও পরমাত্মজ্ঞানের চিরবিরোধী। শান্তির শত্রু, পরাবিদ্যার বৈরী, অনিষ্টের হেতু। দেহত্ম-জ্ঞানরূপ নানাপ্রকার ইন্দ্রিয় ও বিষয়-সুখের আয়তন এই দেহরাজ্যই স্বর্ণলঙ্কা, তাহা ভবসাগরের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপস্বরূপ। আত্ম-রাজ্য—যোগরাজ্যরূপ তপোভূমি পঞ্চবটীস্বরূপ।

* এই সকল অধিদৈব, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক লীলার পদে পদে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেওয়া অসম্ভব। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপনিষৎ, গীতা, পুরাণ ও রামায়ণাদি শাস্ত্র পাঠ করেন, তাঁহারা তৎসমস্ত সহজে বুঝিতে পারেন। তলবকার উপনিষৎ পাঠ করিলে ভগবানের অধ্যাত্মতত্ত্ব, এবং উমানাম্নী ব্রহ্মবিদ্যার মনোহররূপ আবির্ভাব বুঝিতে পারা যায়। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক পাঠ করিলে, পরমাত্মীয় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সুন্দর আভাস পাওয়া যায়। রামায়ণ পাঠ করিলে, শ্রীরাম ও সীতাদেবীর আধিভৌতিক ও অধিদৈবতত্ত্ব এবং অধ্যাত্মরামায়ণে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ভাব লাভ হয়।

মহামোহরূপ রাবণ, দেহাত্মজ্ঞানরূপ লঙ্কাপুরীর অধিপতি। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি দশপ্রকার রূপ তাহার দশস্কন্ধ। জীবের আত্ম-রাজ্য-স্বরূপ তপোবনে, সে যদি ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সীতাকে, ব্রহ্মস্বরূপ রামচন্দ্র হইতে ক্ষণমাত্র বিচ্ছিন্না দেখে, তবে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ হরণ পূর্ব্বক যোগভূমির অপরপারে দেহাত্মজ্ঞান-রূপ স্বর্ণলঙ্কাপুরে আবদ্ধ করে। অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বা নিবৃত্তিধর্ম্ম যদি ক্ষণকালও ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হয়, তাহা হইলে তাহা মহামোহ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া থাকে। সুগ্রীবাদি কপি ছয়জন ষড়ঙ্গ-যোগস্বরূপ। হনুমান্ প্রাণা-য়াম-স্বরূপ। প্রাণাদি বায়ুকে যে ক্রিয়াদ্বারা বশীভূত করা যায়, তাহার নাম প্রাণায়াম। প্রাণায়ামরূপী বিধায় হনুমান্ পবননন্দন। প্রাণাদি বায়ু পবনেরই অংশ। জীব প্রাণায়াম যোগদ্বারা মহাবিদ্যারূপিণী অপহৃতা শক্তিকে দেহরাজ্য হইতে আত্মরাজ্যে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারেন। পাঠক, এই সমস্ত শাস্ত্রীয় তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক রামাবতার-কথা হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক পড়িলেই জানিতে পারিবেন যে, ভগ-বান্ বিষ্ণু কেমন চমৎকার রূপে অযোধ্যানগরে আধিভৌতিক শরীর পরিগ্রহ-পূর্ব্বক নরলোকের পরমকল্যাণার্থ এই সকল বেদবিহিত পারমা-র্থিকতত্ত্ব ও পরমগুহ্য আধ্যাত্মিকী লীলা নটের ন্যায় অভিনয়ন দ্বারা চিরকালের নিমিত্তে সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। পাঠক, আরো বুঝিতে পারিবেন যে, রামচন্দ্রই এখানে শিব-স্থানীয় এবং সীতা তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী শক্তিদেবী। সমস্ত রামায়ণের তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মবিদ্যা ক্ষণকালের নিমিত্তে ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন না হয়। একবার বিচ্ছিন্ন হইলে এজন্মে উভয়ের সুখ-সম্মিলন প্রায় অসম্ভব যোগী-ব্যক্তি যদি ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী বৈষ্ণবীশক্তিকে বিচ্ছিন্নপূর্ব্বক কেবল ব্রহ্মারাধনা করেন, তাহা হইলে, সীতাবিরহিত রামচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার দুরবস্থা হইয়া থাকে এবং যদি ব্রহ্মকে ছাড়িয়া কেবল ব্রহ্মবিদ্যা লইয়া উন্মত্ত হন, তাহা হইলে, শ্রীরামবিরহিত সীতার ন্যায় সে বিদ্যা মায়ামোহকর্ত্তৃক অপহৃত হয়।

মহাভারত।

৫। পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী ও শ্রীকৃষ্ণ একসময়ে ভৌতিক দেহে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রে তাঁহাদের মূলগত আধিদৈবতত্ত্বও পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠির ক্ষমাধর্ম্মী পৃথিবীদেবতা, ভীম বায়ুদেবতা, অর্জ্জুন আকাশধর্ম্মী ইন্দ্র-দেবতা, নকুল সহদেব জল ও জ্যোতীরূপী যুগল অশ্বিনীকুমার দেবতা। দ্রৌপদী সকলের সাধারণ-প্রকৃতিরূপিণী শ্রী ও ঐশ্বর্য্য। প্রভু-ভগবান্ উহাঁদের সকলের অধিদেব। তিনিই কৃষ্ণ। এই সমস্ত তত্ত্বকে অধিদৈব-তত্ত্ব কহে। এই আধিদৈবিক ও প্রথমোক্ত আধিভৌতিক পাণ্ডব-তত্ত্ব ব্যতীত তাহার গূঢ়মূলগত আধ্যা-ত্মিক তত্ত্বও আছে। যথা শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা, দ্রৌপদী যোগমায়া, যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম, অর্জ্জুন উপাসকরূপ আকাশকল্প জীবাত্মা, ভীম অধর্ম্ম-রূপ-শত্রু নাশন প্রাণায়ামযোগ, নকুল পিতৃতৃপ্তি এবং সহদেব অগ্নীন্ধনবিশিষ্ট দৈবকার্য্যরূপ দীপ্তি। *

৬। শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদী সহ পঞ্চ পাণ্ডবের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই

* নকুল—যাহার কুল নাই, বন্ধুবান্ধব নাই। প্রেতলোক বা পিতৃলোক—জলধর্ম্মী পিতৃস্বর্গ। এইজন্য নকুল জলাংশ ও পিতৃতত্ত্ব-স্বরূপ।

যে ত্রিবিধ তাৎপর্য্য দেওয়াগেল, ইহা সমুদয়ই শাস্ত্রীয়। ইহার মধ্যে আধিভৌতিক বর্ত্তমানতা অনিত্য হইলেও আধিদৈবতত্ত্ব কল্পকালস্থায়ী, আবার আধিদৈবতত্ত্ব কল্পান্তে উপসংহৃত হইলেও তাহা প্রবাহরূপে নিত্য। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, সমুদয় তত্ত্বের মূল। তাহা হইতে, ভগবানের নিয়মে, কল্পে কল্পে ও যুগবিশেষে, আধিদৈব ও আধিভৌতিক তত্ত্বসকল প্রকাশিত হইয়া, নরলোকের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। তদ্দ্বারা প্রকৃতির সহিত ব্রহ্ম মূর্ত্তিমান্ হন; প্রলয়-প্রলয়ান্তর-ব্যাপী সনাতনী বেদবাণী মূর্ত্তিমতীহন; উপাসনা ও আরাধনা-লক্ষণ মূর্ত্তিমান্ হয়, এবং ব্রহ্মবিদ্যা ও মোক্ষপুরী-সকল পুণ্যভূমি ভারতখণ্ডে মূর্ত্তিমতী হইয়া থাকে। পাণ্ডবীয় আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য, ইহাই স্থাপন করিতেছে যে, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিষ্ক্রিয়; ধর্ম্ম আপনা আপনি ফলে পরিণত হয় না, কেননা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ফলদাতা; প্রাণায়ামাদি-যোগ-ফলও কৃষ্ণাশ্রিত; জীবাত্মা-রূপ নয়ন, পরমাত্মারূপ কৃষ্ণ-বিরহে অন্ধ, কেননা কৃষ্ণই জীবাত্মার সযুজা-সখা এবং আত্মবুদ্ধিপ্রদ জ্যোতিঃ; পিতৃকর্ম্ম ও দেবকর্ম্ম, কৃষ্ণেরই উদ্দেশে। কিন্তু মায়া ব্যতীত ইহার কোন ক্রিয়াই প্রতিফলিত হয় না। এইজন্য স্বয়ং ক্রিয়াহীন শ্রীকৃষ্ণ, যোগমায়া রূপিণী স্বীয় শক্তিকে প্রাগুক্ত ধর্ম্ম, যোগ, উপাসকরূপ জীবাত্মা, পিতৃকর্ম্ম ও দেবকর্ম্ম—এই পঞ্চবিধ পদার্থের সহিত যোজনা করিয়া তাহাদ্বারা সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতদিগের বিনাশ করিয়া থাকেন। স্বয়ং কিছুতেই লিপ্ত নহেন। এই তত্ত্বগুলি আমাদের প্রথমোক্ত আধিদৈবতত্ত্বে অর্থাৎ পৃথিবী, বায়ু, ইন্দ্র, জল, জ্যোতিঃ প্রভৃতি পঞ্চদেবতাতে প্রয়োগ করিয়া দেখ, ব্রহ্ম বিনা কাহারও স্বয়ংসিদ্ধ কার্য্যকারিতা নাই। কিন্তু ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় থাকিয়া স্বীয় মায়াশক্তি বা প্রকৃতি দ্বারা উহাদের কার্য্যসিদ্ধি করিয়া দেন। তলবকার উপনিষদের আখ্যায়িকাতে ইন্দ্রাদি দেবগণের শক্তি-হীনতা এবং ব্রহ্মেরই সর্ব্বক্ষমতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। দেবতারা তাঁহাদিগের মধ্যে আবির্ভূত ব্রহ্মস্বরূপ বরণীয় রূপকে বুঝিতে পারেন নাই। সেজন্য ভগবতী যোগমায়া দেবী তথা ব্রহ্মবিদ্যা রূপে প্রাদুর্ভূত ইন্দ্রের যোগে সর্ব্বদেবতাকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। এই আধ্যাত্মিক ও আধিদৈব তত্ত্বগুলি আধিভৌতিক পাণ্ডবগণের ক্রিয়াতে যোজনা করিয়া দেখ, তোমার দিব্যজ্ঞান সমুদিত হইবে। পরমপুরুষ পরমেশ্বর যেমন অধ্যাত্মভাবে যোগমায়ার যোগে, ধর্ম্ম, যোগ, উপাসনা, পিতৃকার্য্য ও দেবকার্য্য প্রভৃতি আধ্যাত্মিকতত্ত্বের নিয়ামক; যেমন আধিদৈবরূপে যোগমায়ার যোগে পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতির নিয়ামক; সেইরূপ আধিভৌতিক রূপে দ্রৌপদীর যোগে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেবের অধিনায়ক হইয়া, অনির্ব্বচনীয় রূপে, স্বীয় কৃষ্ণাবতার ও পাণ্ডবীয় লীলাদ্বারা, একেবারে সম্পূর্ণ বৈদিকতত্ত্ব সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। দ্রৌপদীই পাণ্ডব সমরের মুখ্যা যোজয়িত্রী। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা সঙ্কারিণী শক্তি হইয়া ভূভার-হরণের নিমিত্ত কৃষ্ণের ইচ্ছায় পঞ্চভূত-রূপ ও পঞ্চধর্ম্মরূপ পঞ্চপাণ্ডবকে আশ্রয় করিয়াছিলেন।

সহদেব—দেবতার সহবাসী—দেবলোক সাধন—জ্যোতির্ম্মার্গ। এইজন্য সহদেব জ্যোতিস্তত্ত্ব ও দেব-তত্ত্বস্বরূপ।

ব্রজলীলা।

৭। যে প্রভু ভগবান্, আধিদৈবভাগে, সূর্য্যেন্দ্রবায়ুবরুণাদি দেবগণের অন্তরে বসতি করিয়া তাঁহাদিগকে পালন ও প্রকাশ করেন; যিনি তাঁহাদের অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইয়া আপনিও তাঁহাদের বরণীয় স্বরূপে প্রকাশ পান; যিনি ব্রহ্মলোকস্বরূপ মহাসৌর-গোলকে বা গোলক-ধামে বিশুদ্ধ উপাস্যমূর্ত্তিতে বিদ্যমান থাকিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে বিশ্বদেবগণের প্রেমপূর্ণ-আরাধনা গ্রহণ করেন; তিনিই আধ্যাত্মিকভাগে, সূর্য্য ও ইন্দ্রাদি দেবগণের স্ব স্ব অবান্তর-পালিত চক্ষু, শ্রুতি, রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-রাজ্যকে একেবারে সমষ্টিভাবে প্রতিপালন ও প্রকাশ করেন। তাঁহা-দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া নয়ন, তাঁহার জগতের শোভা দেখিতেছে; রসনা, শ্রুতিস্মৃতি উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার নামগান করিতেছে; শ্রুতি (কর্ণ) তাঁহার কথামৃত পানকরিয়া শ্রুতিগণের (বেদবাণীর) মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে। তাঁহার প্রকাশিত সেই ইন্দ্রিয়সমূহের নামান্তর "গো"। দেহ, ইন্দ্রিয়-গ্রামস্বরূপ। সুতরাং দেহই "গোকুল। সূর্য্যাদি দেবগণ, ইন্দ্রিয়প্রাণাদির অবান্তর প্রতিপালক বিধায় "গোপ"। "গো" ইন্দ্রিয়; "প" পালক। পক্ষান্তরে, ঐ গোপগণের পালিতা ইন্দ্রিয়-প্রাণাদিশক্তি যেন "গোপী", কিন্তু ভগবান্ই ঐ গোপ ও গোপীগণকে সমষ্টিভাবে পালন ও প্রকাশ করেন বিধায় তিনি "হৃষীকেশ"। হৃষীক—ইন্দ্রিয়, ঈশ—স্বামী—অর্থাৎ ভগবান্ ইন্দ্রিয়াধীশ বা গোপীগণের সাধারণ স্বামী শ্রীকৃষ্ণ। তিনি চক্ষুশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে, তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতিপালক ও দীপ্তি-দাতা সূর্য্যাদি দেবগণকে, এবং ঐ সকল ইন্দ্রিয়শক্তির পরিচালিকা পঞ্চপ্রাণ বৃত্তিকে সমানে পালন, প্রকাশ ও মোক্ষপথে আকর্ষণ করেন বিধায় তাঁহার নাম কৃষ্ণ। বেদ * কহেন, তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, চক্ষুর চক্ষু, মনের মন, প্রাণের প্রাণ। আধ্যাত্মিক রাজ্যে তাঁহার এইরূপ পবিত্র অবতীর্ণ প্রভাব। এই "গোকুল-লীলাটী" অধিদৈবতরূপে জীবের স্থূল-সূক্ষ্ম কলেবরে প্রবাহনিত্য-ভাবে অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রয়োজন হইলেই নরলোকের মঙ্গলার্থ ভগবান্ নটের ন্যায় হইয়া, তাহা মধ্যে মধ্যে অভিনয়ন করিয়া থাকেন।

৮। বিগত দ্বাপরযুগের শেষভাগে জগতে ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের বৃদ্ধি ও ভক্তিমার্গের হ্রাস হওয়াতে, দীনহীন মর্ত্তভুবনের অক্ষয়-কল্যাণকামনায়, ভগবান্, প্রাগুক্ত আধিদৈব ও আধ্যাত্মিক আদি গুহ্যাতিগুহ্যতম তত্ত্বসমূহকে স্বীয় অনির্ব্বচনীয় আধিভৌতিক ব্রজলীলায় মূর্ত্তিমান্রূপে সর্ব্বতোভাবে সপ্রমাণ করিয়াছেন। ঐ মহালীলায় চর্ম্মচক্ষুর দর্শনীয় গোকুল নামক ব্রজভূমে, যোগিজন দুর্লভ, সুরনেত্রের দর্শনীয়, বিষ্ণুপদস্বরূপ গোলকধাম অবতীর্ণ হইয়াছিল। সেই মহামোক্ষপদ মর্ত্তলীলাক্ষেত্রে, শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমন-প্রতীক্ষায়, তাঁহার উপাসনা-কামনায়, নরলোকে তাঁহার পূজাপ্রচারার্থে, সূর্য্যাদি দেবগণ; তাঁহাদের শক্তিস্বরূপিণী দেবীগণ; তাঁহাদের প্রভাবপ্রাপ্ত তাপসগণ; তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতিপালিতা ও প্রকাশিতা

* তলবকার উপনিষৎ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে, ব্রজলীলার মূল বুঝিতে পারা যায়। তথায় চক্ষুশ্রোত্রপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমষ্টি গোগ্রাম (গোকুল) পরব্রহ্ম সর্ব্বেন্দ্রিয় ও মনের প্রকাশক (হৃষীকেশ)।

ইন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাণশক্তিসমূহ ; সর্ব্বদেবস্বরূপিণী আদরবতী শ্রুতিগণের অধিষ্ঠাত্রী পূর্ণরসা, রসগীতা, কলাবতী, ক্রিয়াবতী, উগ্রতপা, প্রিয়ব্রতা, গুণবতী ইত্যাদি বহুগুণ-বিশিষ্টা সরস্বতী, গায়ত্রী, সাবিত্রী এবং আরাধনা-শক্তিরূপিণী রাধিকা—মনুষ্যমূর্ত্তি গোপগোপী-রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ হৃষী-কেশ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাদের অধিনায়ক হইলেন। লাঙ্গলহস্তাগ্র, উর্দ্ধরতাবিধায়ক, বিষ্ণুর অনন্তনাগমূর্ত্তিস্বরূপ সঙ্কর্ষণানলের সাক্ষাৎ অবতার প্রভু হলবাহন বলরাম আসি-য়াও ঐ লীলায় যোগদান করিলেন। তিনি প্রভু ভগবানেরই অংশ। আবির্ভূত গোপ-গণের হল বা যোজনশক্তিরূপে এবং ধর্ম্মবিদ্বেষী পাষণ্ডদিগের প্রলয়ের ভাব জ্ঞাপন করিবার জন্য এই মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছিল। এই প্রভু ভগবান্ ব্রজলীলাতে অবতীর্ণ দেবদেবী-গণের সহ মিলিত হইয়া আপনার নিত্য আধিদৈব ও আধ্যাত্মিক লীলাকে সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই লীলাদ্বারা বৈদান্তিক পরমার্থতত্ত্ব, সম্পূর্ণরূপে স্ফুর্ত্তিলাভ করিয়াছে। এই লীলাদ্বারা শাণ্ডিল্য-বিদ্যা ও ভক্তিমার্গ বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সাধনার সাক্ষাৎ মূর্ত্তিস্বরূপিণী ব্রহ্মশক্তিবিশেষ যে রাধিকা দেবী, এই লীলাতে ব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণের সহিত তাঁহার বিশেষ যোগ প্রতিপন্ন হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণ, এই যুগলতত্ত্বের মধ্যে অতি মনোহর-রূপে মিথুনাবৃত্ত অদ্বয়ভাব সমন্বিত হইয়া আছেন। কৃষ্ণলীলার মধ্যে রাধিকা আরাধনা-শক্তি, দ্রৌপদী ক্রিয়াশক্তি এবং রুক্মিণী ঐশ্বর্য্যশক্তিরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই একমাত্র যোগমায়াস্বরূপিণী, অথচ, ব্রহ্মসমন্বিতা দেবীরূপে প্রকাশ পাইয়া-ছিলেন। রাম ও কৃষ্ণ প্রভৃতি সমস্ত অবতারই পরব্রহ্মের মায়াবিরচিত দেহ মাত্র। পরব্রহ্ম তত্তদ্ দেহে দেহীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এইরূপে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তিস্বরূপিণী মায়া। এই উভয়ের যোগই তারতম্যানুসারে পুরুষ ও স্ত্রীরূপ আধিদৈব, আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক অবতারের হেতু। মায়াই দেহঘটনের কারণ, কিন্তু ব্রহ্ম, মায়াকে বশীভূত করিয়া অবতীর্ণ হন ; আর জীব, মায়ার বশতাপন্ন হইয়া জন্ম-গ্রহণ করেন, এই মাত্র প্রভেদ।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

সংবাদ।

সম্রাট্ চিরং জীবতু। বিগত ২২জুন (৭ই আষাঢ়) বৃহস্পতিবার লণ্ডন-নগরে "ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবি"তে আমাদের মহা-মহিম সম্রাট্ ঈশ্বরাবতার পঞ্চম জর্জ্জ মহো-দয়ের শুভ রাজ্যাভিষেকোৎসব যথাবিধানে সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে লণ্ডনে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। সমগ্র বৃটিশরাজ্যে আনন্দের আলোকমূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র, কি রাজপ্রাসাদে, কি দরি-দ্রের কুটীরে আনন্দোৎসব হইয়াছিল। যশো-হরে কালেক্টরীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে স্থানীয় জনসাধারণ ও রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ বিরাট্-শোভাযাত্রাসহকারে উপস্থিত হইয়া সম্রাটের মহত্ত্ব ও জীবনকথার আলোচনা করেন এবং ভগবানের নিকট মহিমান্বিত সম্রাট্

মহাশয়ের নির্বিঘ্নরাজত্ব ও দীর্ঘজীবন কামনা করেন। সম্রাটের কল্যাণকামনায় শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন, কাঙ্গালীবিদায় প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত যশোরেশ্বর শিবের মন্দিরে, সম্রাটের মঙ্গলকামনায় পূজা, হোম, বেদপাঠ, হরির লুট প্রভৃতি হইয়াছিল। সমাগত ছাত্রবৃন্দ ও ভদ্রমণ্ডলী সম্রাটের কল্যাণকামনা করিয়াছিলেন।

মান-ও-প্রাণনাশ। ময়মনসিংহ জামালপুরের মেলানদহ গ্রামের ধরণীকান্ত মুরের ভৃত্য আসামৎ শেখ একদা ধরণী-কান্তের পত্নীকে কোথায় লইয়া যায়। ধরণী অগত্যা আসামতের নামে জামালপুরের ফৌজদারীকোর্টে ৪৯৮ ধারার অভিযোগ উপস্থিত করে। ধরণী তৎকাল পর্য্যন্ত পত্নীর কোনও সন্ধান পায় না। শেষে একদিন ধরণীর প্রতিবেশী কালু শেখ ধরণীকে বলে যে, ১৫ টাকা দিলে সে ধরণীর পত্নীর সন্ধান বলিয়া দিবে। ধরণী টাকা দেয়, কালু তাহাকে সন্নিহিত মাঠে প্রতীক্ষা করিতে বলে। ধরণী ২।৩ জন লোক লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। পরে দেখিল, আসামৎ, রমজান্ প্রভৃতিরা ধরণীর পত্নীকে সেই পথ দিয়া লইয়া যাইতেছে। দেখিয়াই ধরণী পত্নীকে ধরিতে উদ্যত হইল। আসামৎ প্রভৃতিরা ধরণীকে যষ্টি প্রহার করিল, তাহাতেই ধরণীর প্রাণনাশ হইল! আসামৎ ও কালু নিরুদ্দেশ, ধরণীর পত্নীরও সন্ধান নাই! রমজান আর একজন লোক, পুলিশের দ্বারা ধৃত হইয়াছে। পুলিশ, মান ও প্রাণ-রক্ষা করিতে পারিল কৈ? ভগবান্ ভরসা।

অধ্যাপকের মহত্ত্ব। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়, গ্রাজুয়েট পুত্রের বিবাহেও কন্যাপক্ষের নিকট হইতে পণ গ্রহণ করেন নাই! পাশ-ওয়ালা জামাতার জন্য শ্বশুরকে সর্ব্বস্ব পণ করিতে হয়, আ'জ কা'ল ইহাই সচরাচর দেখা যায়। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি যে অর্থলোভ সম্বরণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সমাজের প্রশংসার পাত্র সন্দেহ নাই।

মত-বদল। চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র দে কিছুদিন পূর্ব্বে খৃষ্টীয় আলোকে আলোকিত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি আবার শুনিতেছি তিনি নাকি 'ব্রহ্মকৃপা' লাভ করিয়াছেন। বঙ্গচন্দ্র সেই জলই খাইয়াছেন, তবে আলোড়নের পর!

সম্রাটের নিকট প্রার্থনা। শুনিতেছি, আমাদের মহনীয় সম্রাটের নিকট গোহত্যা নিবারণের জন্য এক দরখাস্ত করা হইবে। দেশের হিন্দু-মুসলমান্ সকলেই নাকি তাহাতে স্বাক্ষর করিবে। কৃষি-প্রধান দেশে—বিশেষতঃ ভারতের ন্যায় হিন্দুবহুল দেশে, গোবধ রহিত হইলে পরমোপকার হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। এ সংবাদে হিন্দুর প্রাণে আনন্দ জাগিয়া উঠে। ভগবান্ সেদিন দিবেন কি?

ভারতীয় নৃপতি। সম্রাট্ মহোদয়ের অভিষেক উপলক্ষে ভারতের কতিপয় নৃপতি শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়াছেন। তাঁহারা সেখানে ভারতের রাজভক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন! নাভার রাজা সেদিন বিলাতে সহস্র কাঙ্গালী ভোজনের ব্যবস্থা

করিয়াছিলেন। পাতিয়ালার মহারাজ সম্রাটের অভিষেকের স্মরণার্থ বিলাতে এক ধর্ম্মশালা-প্রতিষ্ঠাকল্পে এক লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সৎকর্ম্ম চিরদিনই সৎকর্ম্ম। রাজা, মহারাজ মহাশয়গণ অভিষেকোৎসবের স্মরণার্থে নিজরাজ্যের অন্ততঃ কতিপয় দরিদ্র প্রজাকেও করভার হইতে মুক্ত করিয়াছেন, এ সংবাদ পাইলে আমরা আরও আনন্দিত হইব।

শোক-সংবাদ। বঙ্গের গৌরবস্বরূপ রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর বিগত ১৬ই আষাঢ় শনিবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় দেহ ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছেন। রায় বাহাদুরের ন্যায় ব্যক্তির তিরোধানে দেশ একটী সুসন্তান হারাইল,—বাঙ্গালী জাতির একটী গৌরবস্তম্ভ উৎপাটিত হইল। রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেন ৺হরিমোহন সেনের চতুর্থ পুত্র। নরেন্দ্রনাথ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যালয়ের (শারীরিক অসুস্থতাজন্য) শিক্ষায় বহু উচ্চে উঠিতে পারিয়াছিলেন না, কিন্তু উদ্যম ও অধ্যবসায়-বলে অনুশীলনের প্রভাবে অসাধারণ বিদ্যার অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি খ্যাতনামা এটর্ণী ছিলেন ও 'ইণ্ডিয়ান্ মিরর' নামক বিশ্ববিশ্রুত সংবাদ-পত্রের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ মিউনিসিপালিটী ও ব্যবস্থাপক-সভায় প্রবেশ করিয়া, দেশের অশেষ শুভসাধন করিয়াছিলেন। দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণকর কার্য্যে তিনি অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। তিনি ভীরু বা স্তাবক ছিলেন না। নির্ভীক্ স্পষ্টবাদী ও পক্ষপাতরহিত ছিলেন। রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফরিণ্ নরেন্দ্রনাথের তেজস্বিতায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ, হিতকারি-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি একজন যথার্থ ঈশ্বরবিশ্বাসী ও ভক্তিমান্ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দয়া, পরোপকারপ্রবৃত্তি ও উদারতার তুলনা নাই। বুদ্ধদেবের পবিত্রজীবন ও পবিত্র বৌদ্ধনীতি তাঁহার বড় ভাল লাগিত। তাঁহার নিকট হইতে কোনও দিন কোনও প্রার্থী বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। যদি শত্রুও তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিত, তিনি সাধ্যসত্ত্বে প্রাণপণে তাহার উপকার করিতেন। একদিন নয়, চিরজীবন তিনি এই মহাব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন। মিথ্যা, কাপট্য, অমিতাচার, তাঁহার মনুষ্যত্ব কলঙ্কিত করে নাই। তিনি কোনও বিষয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ করিতেন না। দেশের রাজনীতিক আন্দোলনে অসংযমের আভাস পাইলে তিনি দূরে থাকিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার জীবন কর্ম্মময়। সম্প্রতি তিনি 'সুলভ-সমাচারে'র কর্ণধারত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। আশা ছিল, তাঁহাদ্বারা অনেকের ভ্রান্তধারণার অপনোদন হইবে। কাল, সে অবসর দিল না! তাঁহার মৃত্যুতে দেশের বক্ষে যে সুগভীর ক্ষত উৎপন্ন হইল, তাহা আর সারিবে কি না ভগবান্ জানেন। আমরা তাঁহার শোকতপ্ত পরিজনগণের প্রতি হৃদয়ের গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া নীরব হইলাম। ওঁ শান্তিঃ।

৴৹৹

সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা।

মাহিষ্য-সমাজ। মাসিক পত্র। ১৩১৮ সাল—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ,—(সংখ্যা-দ্বয়।) এখানি বঙ্গীয় মাহিষ্যজাতির মুখপত্র। মাহিষ্যসমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধনার্থেই ইহার প্রচার। বৈশাখসংখ্যায় 'মাহিষ্য-জাতি' শীর্ষক প্রবন্ধে মাহিষ্যজাতি যে বৈশ্য—তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠসংখ্যায় 'গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ' শীর্ষক প্রবন্ধে মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণই 'গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ' এ সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইয়াছে। পত্রিকাখানিতে চাষী কৈবর্ত্ত বা হালিক কৈবর্ত্ত সম্প্রদায়কে মাহিষ্য স্থির করা হইয়াছে। মাহিষ্য-সমাজ পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

হিন্দুসখা। ১৩১৮ বৈশাখ। শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদস্মৃতি কাব্যতীর্থ ও শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত। হিন্দুসখায় সামবেদ-সংহিতা অন্বয়, সরলব্যাখ্যা, ভাষ্য, অনুবাদ ও গান-সঙ্কেত প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইতেছে। প্রবন্ধগুলি মোটের উপর ভালই। হিন্দু-সখার নাম সার্থক হউক্।

বীরভূমি। ১৩১৮ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। বীরভূমি আবার নবপর্য্যায়ে আবির্ভূত। এবার শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ, ইহার সম্পাদকতা করিতেছেন। এবার 'বীরভূমি' বীরভূম-সাহিত্যপরিষদের মুখপত্র হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বীরভূমির প্রবন্ধগৌরবের অভাব নাই। 'মহাত্মা টলষ্টয়' বেশ লাগিল। "বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম" মন্দ নয়, "বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুশাস্ত্রোক্ত আর্য্যধর্ম্ম মাত্র" এই পুরাতন কথার—অন্নকূটের আমলের কথার আলোচনা। হৃদয়ের বলপ্রদ বটে! 'বীরভূমের টেকারু জাতি' তথ্যপূর্ণ। অন্যান্য প্রবন্ধের এবং সাহিত্যসমালোচনারও মূল্য আছে। আমরা বীরভূমির দীর্ঘজীবন কামনা করি।

মন্দাকিনী। ১৩১৮ বৈশাখ। মেদিনীপুর জেলার মাছনান্ গ্রাম হইতে "মন্দাকিনীসাহিত্যসমিতি" কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নূতন মাসিক পত্র। বিশেষত্বর্জ্জিত। আশাকরি, ভবিষ্যতে মন্দাকিনীর পবিত্র-প্রবাহে প্রাণ শীতল হইবে। আরম্ভে কিন্তু বেশী আশান্বিত হইতে পারিতেছি না।

কণিকা। ৫ম বর্ষ ১৩১৮ বৈশাখ। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি, এ, সম্পাদিত। কণিকা ক্ষুদ্রকায়া বটে, কিন্তু প্রবন্ধ-গৌরব-বর্জ্জিতা নহে। ২।১টী প্রবন্ধ বেশ লাগিল, কিন্তু মুদ্রণ ভাল নয়, পাঠের অসুবিধা হয়। কণিকার উন্নতি হউক্।

বিজয়া। মাসিক পত্রিকা। প্রথম সংখ্যা ১৩১৮ বৈশাখ। কুমার শ্রীবিপ্রনারায়ণ

বি, এ, ইহার সম্পাদক। ধুবড়ী হইতে বিজয়া প্রকাশিত হয়। ক্ষুদ্রকায়া হইলেও বিজয়া মন্দ নয়। 'মৃত্যুর পরপার' প্রবন্ধটী বেশ। 'রাজবংশীজাতি' তথ্যপূর্ণ। বিজয়ায় অনেক খ্যাতনামা সাহিত্য-সেবক লেখেন। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা। শ্রীকামখ্যাচরণ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত ক্ষুদ্র পুস্তিকা। ইহাতে পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে জল, বাতাস, বাসগৃহ, ভোজন ও নিদ্রাদি বিষয়ে স্থায্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সর্পাঘাত, জলে ডোবা, কুকুরে কামড়ান, প্রভৃতি ব্যাপারের হিতকর মুষ্টিযোগ লিখিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার জন্য কুইনাইন্‌সেবন ও মশকনিবারণ, জল-শোধন, বাসস্থানের রৌদ্রপূততা-সম্পাদন প্রভৃতি উপায় ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের উপদেশ ফলপ্রসূ; এজন্য ইহার প্রশংসা করিতেছি। নচেৎ পুস্তকে বহুজ্ঞতার নিদর্শন নিতান্ত অল্প। মশারি খাটাইয়া শুইলে মশায় কামড়ায় না, এ উপদেশ সুন্দর, কিন্তু সর্ব্বজন-বিদিত। গ্রন্থ ঘরে থাকিলে কাজে লাগিবে। মূল্য এক আনা। অবশ্য এগ্রন্থ চারি পয়সার বেশী উপকার করিতে পারিবে।

বৈশ্য-পত্রিকা। ১৩১৮, আষাঢ়; একাদশ সংখ্যা। বৈশ্যবারুজীবি-সভার মুখপত্র। আষাঢ় সংখ্যার "শিক্ষা ও ধনোপার্জ্জন" প্রবন্ধ 'বৈশ্যপত্রিকা'র উপযুক্তই হইয়াছে। পত্রিকার আকার ক্ষুদ্র হইলেও এই জাতীয় নব্যভ্যুত্থানের দিনে ইহা অমূল্য। আমরা বৈশ্যপত্রিকার দীর্ঘজীবন ও উত্তরোত্তর উন্নয়ন কামনা করি।

শাক্যসিংহ। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় ইহার প্রণেতা। এই পুস্তক ডবল ক্রাউন্‌ ষোড়শাংশিত ৬০ পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত। পুস্তকখানি এন্টিক কাগজে মুদ্রিত। এই পুস্তকে জগতের অন্যতম অনিন্দ্য পুরুষ বৌদ্ধধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মা শাক্যসিংহের পুণ্যজীবনকাহিনী সরল-প্রাঞ্জল, মধুরগম্ভীর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পূতপ্রাণ শাক্যসিংহের জীবনকথা পাঠ করিলে প্রাণ পুলকিত ও ভক্তিনত হয়। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে শ্রীযুক্ত তর্কভূষণ মহাশয়ের রচনাচাতুর্য্যের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। এই পুস্তক বালকপাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত হইলে, আমরা, মনে করিব ইহার সুযোগ্য সমাদর হইয়াছে।

জাগদীশ অক্ষর-বিজ্ঞান। 'ডবল্‌ ক্রাউন্‌ ষোড়শাংশিত ৯৩ পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত। এন্টিক কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ২৲ টাকা। প্রণেতা নানাতত্ত্ববিৎ বেদাধ্যায়ি শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায় বাচস্পতি মহাশয় ও তাঁহার স্বর্গাত পুত্র ৺জগদীশ মুখোপাধ্যায় তর্কালঙ্কার। এইগ্রন্থ পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথমাধ্যায়ে অক্ষরনিরুক্তি—দেবাক্ষর—বেদশব্দ—আর্য্যজাতি—আর্য্যশব্দের

নিরুক্তি, দ্বিতীয়াধ্যায়ে আদিশব্দ বেদশব্দ—আদি অক্ষর দেবাক্ষর—অক্ষরোৎপত্তি—শ্রুতি-শব্দের নিরুক্তি, তৃতীয়াধ্যায়ে আর্য্যজাতি আদিমজাতি—সংস্কৃত আদিভাষা আর্য্য-জাতির আদি বাসস্থান—সংস্কৃতের সহিত অন্যান্য ভাষার সম্বন্ধ, প্রাচীন ভাষার সম্বন্ধ; প্রাচীন ভাষা—সংস্কৃতাক্ষর, আর্য্যজাতির নির্ব্বাসন প্রভৃতি, চতুর্থাধ্যায়ে সংস্কৃত অক্ষরের সহিত অন্যান্য ভাষার অক্ষরের বিচার ও পঞ্চমাধ্যায়ে কতিপয় বৈদেশিক মত ও তৎ-সম্বন্ধে বিচার, সর্ব্বশেষে দেবোপম পুত্র জগদীশের তিরোভাব কথা আছে। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, দেবাক্ষর সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত আদিম অক্ষর। অন্যান্য ভাষার অক্ষর, উহারই অপূর্ণ অনুকরণ বা বিকার ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সগররাজার সময়ে কতকগুলি আর্য্য-সন্তান বিরূপতা প্রাপ্ত হন, ও বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাহীন দেশে তাড়িত হন, তাঁহারাই বর্ত্তমানকালের বহু উন্নত-জাতির পূর্ব্বপুরুষ, তাঁহাদের দ্বারা ব্যবহৃত বিকৃত অসম্পূর্ণ অক্ষরই অন্যান্য ভাষার অক্ষর। তাঁহাদের সভ্যতাও ভারতীয় আর্য্যসভ্যতার বিকৃত অভিব্যক্তি মাত্র। আর্য্যশব্দ 'ঋ' ধাতু হইতে উৎপন্ন এবং আর্য্য অর্থ কর্ষক, এমত এই গ্রন্থে উপেক্ষিত হইয়াছে। হিরণ্ময় বাবু বলেন—আর্য্য শব্দের পরি-ভাষিক অর্থ যাহা হিন্দুশাস্ত্রে আছে, তাহাই সত্য, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের কল্পিত অর্থ শব্দশাস্ত্রানুসারে ভ্রমসঙ্কুল। ঐরূপে তিনি গ্রীক্ Aroma শব্দ সংস্কৃত 'ঘ্রা' ধাতু হইতে উৎপন্ন, এই পাশ্চাত্যসিদ্ধান্তেরও ভ্রম প্রদ-র্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতে Ari উপসর্গ ও ওজো ধাতু হইতে Aroma শব্দ জন্মি-য়াছে। বেদের নাম 'শ্রুতি'—ইহাতে অনেকে মনে করেন, অক্ষর সৃষ্টি না হওয়ায় মুখে শুনিয়া পাঠ করা হইত বলিয়াই 'শ্রুতি' নাম। হিরণ্ময় বাবু শাস্ত্র হইতে দেখাইয়াছেন, বৈদিককালেও অক্ষর ছিল, অক্ষরের স্রষ্টা ও বেদের প্রকাশক স্বয়ং ব্রহ্মা। শিক্ষিত বিষয়ে ভ্রম-সম্ভাবনায়ই উহা লিপিবদ্ধ করা হয়। বেদ গুরুমুখ হইতে শ্রুত, কাহারও দ্বারা কৃত নয়, এজন্য বেদের নাম শ্রুতি, এই প্রাচীন সিদ্ধান্তই এই গ্রন্থে গৃহীত হই-য়াছে। গ্রন্থকারের মতে ভারতের কাশ্মীর-দেশই প্রথম মনুষ্যবাসস্থান। সত্যযুগে ভারতের মানুষ বিদেশে যান নাই। ত্রেতায় সগররাজার সময়ে ও দ্বাপরে যযাতি রাজার সময়ে বিদেশগমন ঘটে। বিদেশগামিগণ কতকগুলি শব্দ, অক্ষর ও জ্ঞান লইয়া যান, তাহাই বিদেশের সম্পত্তি হয়। সগররাজার শাসনে বিতাড়িত বিদেশগামীগণ দেবাক্ষর ও সংস্কৃত ভাষা অবিকল ব্যবহার করেন নাই। সংস্কৃত ভাষা হইতে বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশীয় ভাষা, হিব্রুভাষা, চীনভাষা, জেন্দ-ভাষা, পহ্লবীভাষা প্রভৃতির জন্ম। সংস্কৃত ও হিব্রু হইতে আরবীর জন্ম, সংস্কৃত, জেন্দ ও আরবী হইতে পারসীর জন্ম, সংস্কৃত ও হিব্রু হইতে গ্রীক্ ভাষার জন্ম, সংস্কৃত ও গ্রীক্ হইতে লাটিন্ ভাষার জন্ম—ইহা এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বলেন, গ্রীক্ ও রোমকেরা যে হিন্দুবংশীয়, তাহা প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমকদিগের প্রতিকৃতির দ্বারাই প্রমাণিত হয়। দেশভেদে আচার, সংস্কার, আহার্য্য প্রভৃতির ভিন্নতা হওয়ায়,

দেহের বিকৃতি ও উচ্চারণ শক্তির ব্যতিক্রম ঘটায় তাহাদের ভাষায় অক্ষরের ন্যূনতা ও অপূর্ণতা ঘটিয়াছে। শাস্ত্রে আছে, খশাদি-জাতি ঘ ঝ ঢ় ধ ভ উচ্চারণ করিতে পারে না,—ম্লেচ্ছভাষায় ঠ ড ঢ ণ নাই। এই সকল দেখিলে পূর্ব্বোক্ত মত স্থিরীকৃত হয়। চতুর্থাধ্যায়ে গ্রন্থকার 'অ' হইতে 'ঃ' পর্য্যন্ত প্রত্যেক বর্ণের মূলতত্ত্ব ও উচ্চারণ-স্থান-ভেদাদি শাস্ত্র হইতে দেখাইয়াছেন। ইহার কোন বর্ণ গ্রীক্, লাটিন্, আরবী, পারসী প্রভৃতি ভাষায় নাই বা আছে, অথবা কিরূপ বিকৃতভাবে আছে, তাহা এই অধ্যায়ে বিশদরূপে বুঝাইয়া প্রকৃত ও বিকৃতের সম্বন্ধ ও ব্যবধান দেখাইয়াছেন। গ্রন্থকার বলেন, মিশরীয়, সিরীয়, গ্রীক্, ইহুদী ও রোমীয় প্রভৃতি জাতির প্রাচীন পূজাপদ্ধতি হিন্দুপদ্ধতির অসম্পূর্ণ অনুকরণ মাত্র। বিদেশগামী আর্য্যগণ 'নিঃস্বাধ্যায়বষট্‌কার' হইয়া বিতাড়িত হন। তাঁহারা যথাসাধ্য বিধিবর্জ্জিত তামসীপূজা ও অগ্নিপরিচর্য্যাদি করিতেন। ঐ সকল জাতির প্রাচীন পদ্ধতি ইহার সাক্ষী। গ্রন্থকার বলেন, কুমারদ্বীপ মহীরাবণের বাসস্থান। রামচন্দ্রের পরেও ইহা হিন্দুদের হাতে ছিল। কুমার হইতে 'আমেরিকা' হইয়াছে। সূর্য্যারিকা আফ্রিকা, তুরস্ক টার্কী, অস্মীয়া অষ্ট্রেলীয়া এবং আবর্ত্তন হইতে বৃটন ইত্যাদি রূপান্তর হইয়াছে। পেরুদেশের রাজারা নিজেদের সূর্য্যবংশোদ্ভূত বলিতেন ও 'রামসীতোয়া' উৎসব করিতেন। সুমালী সোমালী হইয়াছে, শর্ম্মন্ হইতে জর্ম্মন্ হইয়াছে। জর্ম্মণেরা ব্রাহ্মণ ছিলেন। গ্রন্থকার বলেন, এই সকল স্থান ও জাতির নাম এবং প্রাচীন ব্যবহার আলোচনা করিলে বলিতে হয়, ইহারা সকলেই হিন্দু সন্তান। এই গ্রন্থে 'প্রাকৃত হইতে সংস্কৃত জন্মিয়াছে' এই মত ও এতাদৃশ বহুমত ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হইয়াছে। পরে গ্রন্থকার বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন, যাঁহারা হিন্দুর ভাব ও শিক্ষা এবং আচার-ব্যবহার অনুসরণ না করিয়া, কেবল লৌকিক ভাবে হিন্দুশাস্ত্রের চর্চা করেন, তাঁহারা ইহার সারমর্ম্ম বুঝিতে অধিকারী নহেন। হিন্দুর আচরণ ব্যতীত হিন্দুর বুদ্ধি প্রকাশ পায় না। সায়ণ প্রভৃতি বেদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই সত্য, অর্ব্বাচীন ব্যাখ্যা হেয়। হিন্দুর ভাবে শাস্ত্র পড়িলে প্রতিভাত হইবে, দেবাক্ষর আদিম অক্ষর, সংস্কৃত আদিম ভাষা, ভারতীয় আর্য্যজাতি আদিম জাতি। পরিশেষে গ্রন্থকার জ্ঞান-প্রৌঢ় যুবক জগদীশের পবিত্র দেহত্যাগের বিবরণ ও তাহার অকাল-প্রয়াণেই এই গ্রন্থলিখন তাঁহাকে করিতে হইল, বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে, গ্রন্থকারের বহুভাষা-জ্ঞান, শাস্ত্রে সূক্ষ্মদৃষ্টি ও মীমাংসা-পটুত্বে মুগ্ধ হইতে হয়। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্রকলেবর হইলেও বঙ্গভাষা-ভাণ্ডারে অমূল্য রত্ন। হিন্দুর কাছে এগ্রন্থ অমূল্য, তথাপি বলি, মূল্য কম করিয়া দিলে বোধহয় এগ্রন্থ হিন্দুর গৃহে গৃহে গৃহপঞ্জিকার ন্যায় গৃহীত হইবে। গ্রন্থকার হিন্দু-সমাজের ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্টরীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।



১৮শ বর্ষ, ১৮শ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। ভাদ্র। ১৩১৮ সাল, ১৮৩৩ শকাব্দাঃ।

দ্রোণাশ্রম।

পুরাণে যে সকল সিদ্ধাশ্রমের নাম ও মহিমা কীর্ত্তিত আছে, কালে তাহার অধিকাংশের লোপ হইয়া গিয়াছে। পুণ্যভূমি অযোধ্যায় সরযূ-কূলে মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের যে আশ্রম "নৈমিষারণ্য" নামে বিখ্যাত ছিল, আজি তাহা হিংস্র-শ্বাপদকুলে পূর্ণ ঘোরারণ্য! পুণ্য-তোয়া-গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম-কূলে প্রতিষ্ঠিত প্রয়াগের ভরদ্বাজাশ্রম, এক সময়ে মহিমান্বিত ছিল, পরে সঙ্গমস্থান তাহাকে বহুদূরে ফেলিয়া উজাড় করিয়া রাখিয়াছিল; এখন বৃটিশ-পতাকার অধীনে আসিয়া তাহা 'কর্ণেলগঞ্জের গোশালা'য় পরিণত হইয়া রহিয়াছে। মধ্যদেশের এই দুইটী পুরাতন আশ্রম ব্যতীত অন্যান্য আশ্রমের নাম পর্য্যন্ত আর কোথাও জানিতে পাওয়া যায় না।

ভারতপূজ্য পুরাতন ঋষিদিগের অধিকাংশ আশ্রম হিমালয়-প্রদেশে, তন্মধ্যে কেদারখণ্ডে বদরিকাশ্রম—ব্যাসদেবের আশ্রম—সুদূর উত্তর-হিমাচলে, গঙ্গাযমুনার মধ্যস্থল শিবালয়ে দ্রোণাশ্রম, জালন্ধরপীঠে ত্রিগর্ত্ত দেশে সিদ্ধাশ্রম, এবং কাশ্মীর-প্রদেশে ভৃগুমুনির আশ্রম প্রধান ও প্রসিদ্ধ। ইহার মধ্যে বদরিকাশ্রম তীর্থস্থানে পরিণত হওয়ায় তাহার চিহ্ন অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। শিখগুরু রাম রায়ের আশ্রম-স্থান দেহরাদুনে উপত্যকাভূমিতে ইংরাজ-দিগের স্বাস্থ্য-নিবাস সংস্থাপিত হওয়ায় সিবি-লিয়ান মিঃ জি, আর, সি, উইলিয়ম (Mr. G. R. C. Willeams B. A. Bengal Civil service.) গবর্ণমেণ্টের আদেশে, "Historical and Statistical Meaoir of Dehra Doon" 'দেহরাদুন পুরাতত্ত্ব' নামে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে দেহরা-দুনকেই প্রাচীন "দ্রোণাশ্রম" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সেই আশ্রমের কোন চিহ্ন কোথাও দৃষ্ট হয় না। সিদ্ধাশ্রমের রমণীয় শোভা অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ থাকিলেও তাহা এখন জনশূন্য ঘোরারণ্যে পরিণত। কাশ্মীর-প্রদেশে অমরনাথ

নামক তীর্থের পথে, দণ্ডকারণ্য নামে একটী ঘোরদর্শন অরণ্য মধ্যে ভৃগুমুনির আশ্রম; সেই আশ্রম এখন জনশূন্য অরণ্যে পরিণত। সেই আশ্রমস্থিত উৎসের জল অতি শীতল ও তৃপ্তিকর। সেখানকার প্রকৃতির শোভা দেখিলে চিত্ত সহজে সমাধিস্থ হইয়া আইসে এবং ভগবান্ রামচন্দ্র ও মনস্বী ভৃগুর মাহাত্ম্যে মনের ভাব সহজে অনুভব করা যায়। দূরতা এবং দুর্গমতা নিবন্ধন, অমরনাথ দর্শনার্থী যাত্রী ব্যতীত, ও বৎসরে একবার ব্যতীত, এপথে আর কেহই গমনাগমন করে না। পুরাতন আশ্রম সকলের এই সকল দুরবস্থা দেখিলে মনোমধ্যে বড়ই ক্ষোভের উদয় হয়।

মনোমহেশ তীর্থ দর্শন করিয়া প্রত্যাগত হইয়া হরিদ্বারে উপস্থিত হইলে, দেহরাদুনের বন্ধুগণ আমাদিগকে দ্রোণাশ্রম দর্শনে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস—বর্ত্তমান দেহরাদুন্‌ই পুরাতন দ্রোণাশ্রম। ভ্রমণকারীগণ সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বোধ হইবে, তাঁহারা কেহই কষ্ট স্বীকার করিয়া পুরাতত্ত্ব উদ্ধার করিতে যত্ন পান নাই; কিন্তু বর্ত্তমান দেহরাদুন্ যে দ্রোণাশ্রম, তাহা পাঠকের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিতে যত্ন পাইয়াছেন। তাহার পর পাঠকেরা সেই কথায় নির্ভর দিয়াছেন। আমরা তাহার তথ্য নির্ণয় করিতে যত্ন পাইয়া—হতাশ্বাস হইয়া পড়িলাম। তাহার পর পুরাণশাস্ত্র মন্থন করিতে গিয়া, তাহা হইতে কি উদ্ভূত হইল, পশ্চাৎ বিবৃত হইতেছে।

মহাভারত—সম্ভবপর্ব্ব ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ে—

প্রশ্ন। ধনুর্ব্বেদপারগ দ্রোণাচার্য্য কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিলেন, কি প্রকারে অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ হইলেন, কি নিমিত্ত কুরুদিগের নিকট আগমন করিলেন? * * * * *

উত্তর। ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ 'হিমালয়' নামে পর্ব্বত আছে, তথা হইতে ভগবতী ভাগীরথী নির্গত হইতেছেন। পূর্ব্বকালে সেই স্থানে দৃঢ়ব্রত মহর্ষি ভরদ্বাজ তপস্যা করিতেন, তিনি যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া একদা মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে অপ্সরোগ্রগণ্যা ঘৃতাচী স্নান করিয়া তীরে উঠিতেছিল দৈবাৎ বায়ুবেগে তাহার গাত্রবসন উড্ডীন হইল। মহর্ষি সেই সুরূপা নবযৌবনমদদীপ্তা অপ্সরাকে বিবসনা দেখিয়া কামশরে জর্জ্জরিত-কলেবর হইলেন—দুর্জ্জয় কুসুমায়ুধের দুঃসহ প্রভাবে তপোধনের রেতঃ স্খলিত হইল। তিনি সেই রেতঃ এক দ্রোণ (অর্থাৎ কলসের) মধ্যে রাখিলেন। কিয়দ্দিন পরে সেই বীর্য্য এক পুত্ররূপে পরিণত হইল। মহর্ষি ভরদ্বাজ, দ্রোণমধ্যে জাত বলিয়া, ঐ পুত্রের নাম 'দ্রোণ' রাখিলেন।

দ্রোণ ক্রমে ২ সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে প্রতাপশালী অস্ত্রবিদের অগ্রগণ্য মহাত্মা ভরদ্বাজ অগ্নিসম্ভূত 'অগ্নিবেশ' নামক তপোধনকে এক অস্ত্র দিয়াছিলেন, এক্ষণে ঐ তপোধন সেই আগ্নেয় অস্ত্র গুরুপুত্র দ্রোণকে প্রদান করিলেন।

পৃষত নামা নরপতি মহর্ষি ভরদ্বাজের পরমসখা ছিলেন। তাঁহার 'দ্রুপদ' নামে এক সন্তান জন্মে। দ্রুপদ প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া দ্রোণের সহিত একত্র

ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। কিয়দ্দিনানন্তর নৃপতি পৃষত পরলোক প্রাপ্ত হইলে, মহাবাহু দ্রুপদ সমুদায় উত্তর পাঞ্চালের অধিপতি হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজও কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। মহাত্মা দ্রোণ সেই পৈতৃক আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে ২ সমস্ত বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিলেন। তপোনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়া গেল। কিয়দ্দিন পরে দ্রোণ মহাশয়, পিতৃনিয়োগানুসারে পুত্রলাভাকাঙ্ক্ষায় শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে বিবাহ করিলেন। এই কামিনী দমগুণযুক্তা অগ্নিহোত্রনিরতা ও ধর্মপরায়ণা ছিলেন। ইঁহার গর্ভে দ্রোণাচার্য্যের অশ্বত্থামা নামে পুত্র জন্মে। * * *

এক সময় * * মহাত্মা পরশুরাম ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। দ্রোণ উহা অবগত হইয়া রামের নিকট হইতে ধনুর্ব্বেদ, দিব্যাস্ত্র সমুদায় ও নীতিশাস্ত্র গ্রহণ করিতে সাতিশয় সমুৎসুক হইলেন। অনন্তর তিনি ব্রতচারী তপোনিষ্ঠ শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, যে, * * জমদগ্নিকুমার একবারে সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া তত্রত্য বাসে অবস্থিতি পূর্ব্বক কালযাপন করিতেছেন। তখন ভরদ্বাজ-নন্দন শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার পাদবন্দন করিলেন এবং আত্মপরিচয় দিয়া কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমি ধনাকাঙ্ক্ষায় আপনার নিকট আসিয়াছি। তদুত্তরে ভগবান্ পরশুরাম তাঁহাকে সাদরসম্ভাষণ ও স্বাগতপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! তোমাকে কি ধন প্রদান করিতে হইবে? দ্রোণ কহিলেন ভগবন্! আমাকে বিবিধ অনন্তধন প্রদান করুন। রাম কহিলেন * * আমার যাবতীয় হিরণ্য ও অন্যান্য ধন ছিল, সমস্তই ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়াছি, * * এক্ষণে কেবল আমার শরীর ও বিবিধ মহার্হ অস্ত্রশস্ত্র মাত্র আছে. ইহার মধ্যে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় শীঘ্র প্রার্থনা কর, তাহাই প্রদান করিব। তখন দ্রোণ কহিলেন, হে বিপুলব্রত ভৃগুনন্দন! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে প্রয়োগ সংহারসমবেত আপনার অস্ত্র সমুদায় আমাকে প্রদান করুন। পরশুরাম 'তথাস্তু' বলিয়া দ্রোণকে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ও রহস্য সমবেত ধনুর্ব্বেদ প্রদান করিলেন। * দ্রোণ এই রূপে * অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রীতমনে প্রিয়সখা দ্রুপদ সমীপে গমন করিলেন।

তদনন্তর মহাপ্রতাপশালী দ্রোণ, মহারাজ দ্রুপদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন "রাজন্! আমি তোমার সখা।" ঐশ্বর্য্যমদমত্ত দ্রুপদ রাজা দ্রোণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে কিছুমাত্র আস্থা প্রদর্শন করিলেন না; প্রত্যুত রোষকষায়িত লোচনে ভ্রুকুটী প্রদর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি হঠাৎ আমাকে 'সখা' বলিয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য করিতেছ; ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতিগণের সহিত ভবাদৃশ শ্রীহীন নির্ধন লোকের বন্ধুতা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; বাল্যাবস্থায় তোমার সহিত আমার সখ্য ছিল যথার্থ বটে, কিন্তু এক্ষণে তোমার সহিত সেরূপ বন্ধুত্ব থাকা কোন ক্রমেই উচিত নহে। কাহারও সহিত চিরকাল বন্ধুতা থাকে না। হয় সর্ব্বসংহর্ত্তা কৃতান্ত উহা বিলুপ্ত করেন,

নয় ক্রোধবশতঃ বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব তুমি সেই পূর্ব্বতন সৌহার্দ্দ এক্ষণে দূরে পরিত্যাগ কর। হে দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার যে বন্ধুতা ছিল, তাহা কেবল অর্থ-নিবন্ধন মাত্র। যেমন পণ্ডিতের সহিত মূর্খের ও শূরের সহিত ক্লীবের বন্ধুতা কদাচ হইবার নয়, তদ্রূপ ধনবানের সহিত দরিদ্রের সখ্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; অতএব তুমি কিজন্য পূর্ব্বতন বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক হইতেছ? হে ব্রাহ্মণ! যাহারা ধনে ও জ্ঞানে আপনার সদৃশ, তাহাদিগেরই সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ও সখ্য সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য; তদ্ব্যতীত উৎকৃষ্টের সহিত নিকৃষ্টের বা নিকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের মৈত্রী বা বৈবাহিক সম্বন্ধ করা নিতান্ত অনুচিত। হে বিপ্র! যেমন অশ্রোত্রিয়ের সহিত শ্রোত্রিয়ের ও অরথির সহিত রথীর বন্ধুতা হওয়া একান্ত অসম্ভব, সেইরূপ রাজার সহিত দরিদ্রের কখনই সখ্য হয় না; তবে তুমি কি নিমিত্ত অদ্য পূর্ব্বের ন্যায় আমার সহিত সখ্য করিতে অভিলাষী হইতেছ?

মহাতেজাঃ দ্রোণ, দ্রুপদের এই কটূক্তি শ্রবণে মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া ক্রোধে কম্পিত-কলেবর হইলেন এবং সেইক্ষণেই দ্রুপদরাজার প্রতি তাঁহার নিতান্ত বৈরিভাব জন্মিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইয়া হস্তিনা-নগরে আগমন পূর্ব্বক নিজ শ্যালক কৃপাচার্য্যের আবাসে প্রচ্ছন্নরূপে বাস করিতে লাগিলেন। * *

একদা হস্তিনাপুরস্থ বালকগণ নগর হইতে বহির্গমন-পূর্ব্বক মিলিত হইয়া লৌহ-গুলিকা দ্বারা ক্রীড়া করিতেছিল, দৈবাৎ ঐ গুলিকা এক জলশূন্য কূপমধ্যে নিপতিত হইল। কুমারগণ কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। তখন তাহারা সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ও যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে দ্রোণাচার্য্য তাহাদিগের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। তাঁহার অঙ্গ কৃশ ও শ্যামবর্ণ, মস্তক পলিত এবং সমভিব্যাহারে অগ্নিহোত্র রহিয়াছে। গুলিকোদ্ধরণে ভগ্নোৎসাহ কুমারগণ ঐ মহাত্মাকে দেখিয়া উঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। দ্রোণ তাহাদিগকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'হে বালক-বৃন্দ! তোমাদিগকে ধিক্, তোমাদের ক্ষত্র-বলে ধিক্ এবং তোমাদিগের অস্ত্রশিক্ষায়ও ধিক্, যেহেতু তোমরা ভরতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই সামান্য কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিতে পারিলে না। আমি লৌহগুলিকা এবং এই অঙ্গুরীয়ক উভয়ই ঈষীকা দ্বারা উদ্ধার করিব, তোমরা আমাকে ভোজন করাও।' এই বলিয়া আপনার অঙ্গুরীয়ক ঐ নিরুদক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির দ্রোণকে কহিলেন মহাশয়! যদি আপনি কূপ হইতে এ গুলিকা উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে কৃপাচার্য্যের অনুমতিক্রমে আপনি চিরকাল ভিক্ষা পাইবেন। দ্রোণ তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে ২ এক-মুষ্টি ঈষীকা হস্তে লইয়া কহিলেন—'এই যে ঈষীকামুষ্টি দেখিতেছ, ইহার প্রভাব দেখ! একটী ঈষীকা দ্বারা কূপমধ্যস্থিত সেই গুলিকা বিদ্ধ করিব, সেই ঈষীকা অপর একটি দ্বারা এবং তাহা অন্য একটি দ্বারা বিদ্ধ করিব। এইরূপে ক্রমে ২ একটি দ্বারা অন্য ঈষীকা বিদ্ধ করিয়া ঐ গুলিকা উত্তোলন করিব।'

দ্রোণাচার্য্য তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ঈষীকামুষ্টি দ্বারা স্বীয় প্রতিজ্ঞানুরূপ কূপ হইতে গুলিকা উত্তোলন করিলেন। বালকেরা তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিল, 'বিপ্রর্ষে! আপনার অঙ্গুরীয়কটা শীঘ্র উত্তোলন করুন।' তখন মহাযশাঃ দ্রোণাচার্য্য হস্ত হইতে ধনুঃশর লইয়া কূপ মধ্যে বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং তদ্দ্বারা সেই অঙ্গুরীয়ক বিদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া কুমারগণের সম্মুখে আনিয়া দিলেন। তাহারা অঙ্গুরীয়ক দর্শনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, 'হে ব্রাহ্মণ! আপনাকে অভিবাদন করি; আপনি যেরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন, ইহা অন্যের সাধ্য নহে, অতএব মহাশয় আপনার পরিচয় প্রদান ও কর্ত্তব্যবিষয়ে আদেশ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন।' দ্রোণাচার্য্য কুমারদিগের বচন শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'হে বালকগণ! তোমরা ভীষ্মের নিকট যাইয়া আমার রূপ ও গুণ বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া তাঁহাকে কহিবে যে, 'সেই মহাতেজাঃ এস্থানে সমুপস্থিত হইয়াছেন।' কুমারগণ দ্রোণের আদেশানুসারে ভীষ্মের নিকট গমন করিয়া দ্রোণের রূপ ও আশ্চর্য্য কর্ম্ম সবিশেষ বর্ণন করিল। মহাত্মা ভীষ্ম, কুমারগণের বাক্য শ্রবণ করিবা মাত্র বুঝিতে পারিলেন যে, দ্রোণাচার্য্য আগমন করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বেই তিনি একজন সুশিক্ষিকের হস্তে কুমারগণকে সমর্পণ করিবার মানস করিয়াছিলেন একণে ধনুর্ব্বিদ্যা-বিশারদ স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগের অধিকারে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া, যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি স্বয়ং দ্রোণসমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে স্বীয় ভবনে আনয়ন পূর্ব্বক যথোচিত সৎকার করিয়া সাদর সম্ভাষণ কুশলপ্রশ্ন ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্রোণ, ভীষ্মের বচনাবসানে পূর্ব্বের কথা বিবৃত করিয়া ধনুর্ব্বেদশিক্ষার জন্য মহর্ষি অগ্নিবেশের নিকট কিরূপ বহুবৎসর বাস করিয়া বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন, কিরূপে পঞ্চালদেশীয় রাজপুত্র মহাবল দ্রুপদ তাঁহার সহিত তথায় অবস্থিতি করিয়া শিক্ষা ও বন্ধুত্বলাভ করিয়া, রাজা হইলে কিরূপে তাহার পরিচর্য্যা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার পর রাজ্যলাভ হইলে প্রহৃষ্ট মনে তাঁহার নিকট গমন করিলে কতদূর লাঞ্ছিত হইয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হস্তিনানগরে উপনীত হইয়াছেন, আনুপূর্ব্বীক সমস্ত বর্ণনা করিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে মহাত্মন্! শরাসনের গুণ মোচন করুন; আপনি অনুগ্রহ করিয়া বালকগণকে সম্যক্‌রূপে অস্ত্রশিক্ষা করান, এবং সতত পূজিত হইয়া প্রীতি-প্রসন্ন মনে পরমসুখ ভোগ করুন। কুরুদিগের যাবতীয় ধন ও রাজ্য—সমস্তই আপনার অধীন হইবে; আপনিই রাজা; কুরুগণ আপনারই আজ্ঞাবহ হইবেন। হে ব্রাহ্মণ! আপনি যখন যাহা চাহিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবেন। হে বিপ্রর্ষে! আপনি আমাদিগের সৌভাগ্যবশতঃ যদৃচ্ছাক্রমে এ স্থানে আগমন করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুগ্রহ করিয়াছেন।'

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য, মহানুভব ভীষ্ম

কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া, পরম সমাদরে কুরুগৃহে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তিনি বিশ্রান্ত হইলে, ভীষ্মদেব প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া প্রচুর অর্থের সহিত পৌত্রদিগকে শিষ্যরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং তাঁহার বাসের নিমিত্ত পরিচ্ছন্ন ও ধনধান্য-সম্পন্ন এক গৃহ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তৎপরে পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা আচার্য্য দ্রোণকে অভিবাদন করিলে, তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহাদিগকে 'অন্তেবাসী' বলিয়া স্বীকার করিয়া, নির্জ্জনে কহিলেন, "হে শিষ্যগণ! আমি উত্তমরূপে অস্ত্র শিক্ষা প্রদান করিব, কিন্তু পরিশেষে তোমাদিগকে আমার একটি অভিলষিত সম্পাদন করিতে হইবে, এক্ষণে তাহা অঙ্গীকার কর।" তাহা শুনিয়া দুর্য্যোধন প্রভৃতি কুরুনন্দনগণ সকলেই মৌনভাব অবলম্বন করিলেন; কেবল অর্জ্জুন তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, "আপনি যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহা পালন করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।" আচার্য্য দ্রোণ অর্জ্জুনের অঙ্গীকার-বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রীতি-প্রফুল্লমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও বার ২ তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অবিরল আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর রাজকুমারদিগকে দিব্য ও মানুষ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রের শিক্ষাদান করিয়া, কৃতবিদ্য করিয়া তুলিয়া, একদিন আচার্য্য শিষ্যগণকে সম্মুখে আনয়ন করিয়া কহিলেন—'হে শিষ্যগণ! তোমরা পঞ্চালরাজ দ্রুপদকে রণক্ষেত্র হইতে ধৃত করিয়া আনয়ন করতঃ গুরুদক্ষিণাস্বরূপ আমাকে প্রদান কর।' শিষ্যগণ "তথাস্তু" বলিয়া গুরুবাক্য অঙ্গীকার করত তৎক্ষণাৎই সমরসজ্জা করিয়া পাঞ্চালদেশ আক্রমণ-পূর্ব্বক দ্রুপদকে বন্ধন করিয়া দ্রোণসমীপে আনয়ন করিলেন। দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদরাজকে হৃতসর্ব্বস্ব ও বশতাপন্ন দেখিয়া, পূর্ব্ববৈর স্মরণপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে দ্রুপদরাজ! আমি বলপূর্ব্বক তোমার রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পুরী বিমর্দ্দিত করিয়াছি, এক্ষণে সেই বিপ্রের করায়ত্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ সখিত্ব করিতে কি ইচ্ছা হয়?" এই কথা বলিয়া হাস্যপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তিনি মনে ২ নিশ্চয় করিয়া রাজাকে কহিলেন, 'হে বীর! তুমি প্রাণভয়ে ভীত হইও না, আমরা ব্রাহ্মণ, সুতরাং ক্ষমাশীল। হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! তুমি যে বাল্যাবস্থায় আমার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলে, তাহাতেই তোমার প্রতি আমার স্নেহ ও প্রীতি সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল, অতএব হে জনাধীশ! আমি পুনর্ব্বার তোমার সহিত সখ্য প্রার্থনা করিতেছি। হে রাজন্! তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তুমি এই রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইবে। হে যজ্ঞসেন! রাজা না হইলে কেহ রাজার সখা হইতে পারে না, এই জন্যই আমি তোমার রাজ্যের নিমিত্ত যত্ন করিতেছি। হে পাঞ্চাল! তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণকূলের রাজা হইবে, আমি উত্তর-কূলের রাজা হইব। এক্ষণে যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে আমাকে 'সখা' বলিয়া মনে কর।' দ্রুপদ কহিলেন 'হে ব্রাহ্মণ! বিক্রমশালী পুরুষদিগের পক্ষে ইহা আশ্চর্য্য নহে। আমি আপনার প্রতি প্রীত হইয়াছি, এবং আপনিও আমার

প্রতি চিরস্থায়িনী প্রীতি লাভ করুন,—এরূপ ইচ্ছা করিতেছি।”

দ্রুপদ ইহা কহিলে, দ্রোণ তাঁহাকে বিমোচন করিয়া প্রীতমনে সৎকার পূর্ব্বক রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলেন। দ্রুপদ গঙ্গা-তীরস্থ জনপদযুক্ত মাকন্দীদেশ ও চর্ম্মণ্বতী-নদী পর্য্যন্ত দক্ষিণ-পাঞ্চালে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া পুরশ্রেষ্ঠ কাম্পিল্য-নগরে দীনচিত্তে অধিবাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর দ্রোণের শত্রুতা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষত্রিয়-বলদ্বারা দ্রোণের পরাজয় অসম্ভব বোধ করিলেন। এদিকে দ্রোণ ‘অহিচ্ছত্র’ নামক রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন; ধনঞ্জয় অহিচ্ছত্র পুরী সংগ্রামে জয় করিয়া আচার্য্য দ্রোণকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন।

মহাভারতের এই অংশ পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম—

১—হিমালয়ের গঙ্গাদ্বারের কোন প্রদেশে, শংসিতব্রত ভগবান্ ভরদ্বাজ ঋষি বাস করিতেন, তৎপুত্র দ্রোণ।

২—তিনি পিতৃসদনে বেদ ও বেদাঙ্গ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

৩—ভরদ্বাজের শিষ্য অগ্নিবেশ তাঁহাকে আগ্নেয় অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

৪—ভরদ্বাজের সখা পাঞ্চালাধিপতি পৃষতের পুত্র দ্রুপদের সঙ্গে দ্রোণের সখিত্ব ছিল।

৫—পৃষত পরলোক গমন করিলে, দ্রুপদ উত্তর-পঞ্চালের রাজা হন। ভরদ্বাজ ঋষিও সেইসময়ে স্বর্গারোহণ করেন। তখন মহাতপা দ্রোণ সেইস্থানে অবস্থিতি করিয়া বেদ-বেদাঙ্গ বিদ্বান্ ও তপোবলে নিষ্পাপ হইয়া পিতার পূর্ব্বনিয়োগানুসারে শরদ্বৎ-কন্যা কৃপীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার গর্ভে অশ্বত্থামা নামে পুত্র উৎপাদন করেন। তাহার পর মহেন্দ্রপর্ব্বতে গমন করত মহাত্মা পরশুরামের নিকট হইতে প্রয়োগ, সংহার ও রহস্যের সহিত সমগ্র অস্ত্রবিদ্যা প্রাপ্ত হন।

৬—তাহারপর দ্রোণের অবস্থা দ্রোণ নিজে ভীষ্মের নিকটে যাহা বর্ণন করিয়াছেন তাহা এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে!

আমি পূর্ব্বে ধনুর্ব্বেদ ও অস্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত মহর্ষি অগ্নিবেশের নিকট গমন করিয়াছিলাম; তথায় ব্রহ্মচারী, বিনয়ী, জটাধারী ও গুরুশুশ্রূষা-তৎপর হইয়া বহু বৎসর বাস করিলাম। তৎকালে পাঞ্চাল-দেশীয় রাজকুমার মহাবল প্রভাব-সম্পন্ন যজ্ঞসেন সেই গুরুর নিকটই অস্ত্রবিদ্যা ও ধনুর্ব্বিদ্যা শিখিবার জন্য বাস করিতেন। সেখানে তিনি আমার উপকারী, সখা ও প্রিয় ছিলেন। তাঁহার সহিত একত্র হইয়া বহুকাল সুখে ছিলাম। বাল্যাবধি তাঁহার সহিত আমার একত্র অধ্যয়ন হয়, এ নিমিত্ত তিনি আমার সর্ব্বদা প্রিয়কারী প্রিয়বাদী সখা ছিলেন। তিনি আমার প্রীতির নিমিত্ত সর্ব্বদা বলিতেন যে, “হে দ্রোণ! আমি মহানুভব পিতার প্রিয়তম পুত্র, অতএব যখন পাঞ্চালরাজ আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, তখন সেই রাজ্য তোমার ভোগ্য হইবে, ইহা আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলাম। হে সখে! আমার ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও সুখ সকলেই তোমার অধীনে থাকিবে।” পরে যখন তাঁহার অস্ত্রশিক্ষা সমাপন হইল,

তখন্‌। তিনি আমা কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া তথা হইতে গমন করিলেন। আমি সেই অবধি নিরন্তর তাঁহার ঐ বাক্য মনোমধ্যে ধারণ করিয়া রাখিলাম। অনন্তর আমি পিতৃনিয়োগানুসারে পুত্রলোভ প্রযুক্ত বুদ্ধিমতী, ব্রতপরায়ণা এবং অগ্নিহোত্র যাগে ও ইন্দ্রিয়দমনে নিরত নিরতা কৃপীকে বিবাহ করিলাম। কৃপী 'অশ্বত্থামা' নামে ভীমবিক্রম আদিত্যতুল্য তেজস্বী পুত্র লাভ করিলেন। ভরদ্বাজ যেরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রীত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও ঐ সন্তান দ্বারা আপ্যায়িত হইলাম। অশ্বত্থামা বাল্যাবস্থায় এক দিবস ধনিপুত্রদিগকে দুগ্ধপান করিতে দেখিয়া এরূপ রোদন করিতে লাগিল যে, তাহাতে আমার দিগ্‌ভ্রম হইয়া পড়িল! যাঁহারা যাগাদি-কর্ম্মের অনুষ্ঠায়ী স্নাতকব্যক্তি অবসন্ন না হন, (যাগশীল ব্যক্তির যদি অল্প গো থাকে, তবে তাঁহার নিকট গো-প্রতিগ্রহ করিলে তাঁহার ধর্ম্মলোপ হইতে পারে,) ইহা চিন্তা করিয়া আমি ধর্ম্মযুক্ত বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহ করিবার নিমিত্ত অনেকবার সেই দেশ ভ্রমণ করিলাম। দেশের একসীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়াও দুগ্ধবতী গাভী প্রাপ্ত হইলাম না। পরে অন্য বালকেরা পিষ্টোদক (তরল পিটালী) দ্বারা ঐ বালককে প্রলোভিত করিল,—বালক অশ্বত্থামা ঐ পিষ্টজল পান করিয়া বাল্যপ্রযুক্ত বিমোহিত হইয়া "আমি দুগ্ধ পান করিয়াছি" এই বলিয়া উত্থান-পূর্ব্বক আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। সেই পুত্র, বালকগণ পরিবৃত ও তাঁহাদিগের হাস্যস্থল হইয়া নৃত্য করিতেছে দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্ষোভ জন্মিল। বিশেষতঃ জল্পনাকারী লোকদিগের "দরিদ্র দ্রোণকে ধিক্! যিনি ধনাভাবে পানীয় দুগ্ধ প্রাপ্ত হন্ না, যাঁহার পুত্র দুগ্ধের তৃষ্ণায় পিষ্টোদক পান করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে 'আমি দুগ্ধপান করিলাম, বলিয়া নৃত্য করিয়াছিল'"—এইরূপ সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইল। পরে আপনিই আপনাকে নিন্দা করিয়া ভাবিতে লাগিলাম যে, আমি ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বর্জ্জিত ও নিন্দিত হইয়া বাস করিব, তথাপি ধনলোভে পাপকর্ম্ম—পরসেবা অবলম্বন করিব না। এইরূপ বিবেচনা করিয়া আমি প্রিয়তম পুত্র ও পত্নীকে লইয়া পূর্ব্বস্নেহানুবন্ধ-প্রযুক্ত দ্রুপদরাজার নিকট গমন করিলাম। আমার সেই প্রিয়সখা রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন শুনিয়াই আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিয়া সুপ্রীত মনে তাঁহার নিকট গমন করিলাম। তাঁহার সহিত একত্র বাস ও তাঁহার প্রতিজ্ঞাত সেইবাক্য স্মরণ করিতে ২ আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া মিত্রতাপূর্ব্বক কহিলাম, "হে পুরুষব্যাঘ্র! আমি তোমার সখা।" ইহা বলিয়া সখার ন্যায় সন্নিহিত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলাম। তাহাতে ইতর লোকের ন্যায় আমার প্রতি তিনি হাস্য করিয়া কহিলেন "হে ব্রাহ্মণ! তোমার এই বুদ্ধি সমাচীন নহে; হে দ্বিজ! যেহেতু তুমি হঠাৎ আমাকে কহিলে যে "আমি তোমার সখা"। কালক্রমে সকলই জীর্ণ হইয়া থাকে, সুতরাং সৌহার্দ্দও জীর্ণ হয়। তোমার সহিত পূর্ব্বে যে আমার সখ্য হইয়াছিল,

তাহা তৎকালীন সম্বন্ধ বশতই হইয়াছিল; ফলত অশ্রোত্রিয় ব্যক্তি শ্রোত্রিয়ের সহিত, অরথী ব্যক্তি রথীর সহিত এবং রাজা না হইলে রাজার সহিত কখনও সখ্যস্থাপন করিতে পারে না; অতএব তুমি কি নিমিত্ত পূর্ব্বের সখিত্ব ইচ্ছা করিতেছ? উভয়ে সমান হইলেই সখ্য হয়, পরস্পর বিসদৃশ হইলে কিরূপে সৌহার্দ্দ হইতে পারে? এই ভূমণ্ডল-মধ্যে কোনও বস্তু অপরিবর্ত্ত্য বা অমর নহে; বন্ধুতা বা সখিত্বও চিরস্থায়ি হইতে পারে না, অতএব তুমি সেই পুরাতন সখ্যের উপাসনা করিতে নিরস্ত হও; এখন আর তাহা বর্ত্তমান বলিয়া বিশ্বাস করিও না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কোন প্রয়োজন বশতই তোমার সহিত আমার সখ্য হইয়াছিল; সে প্রয়োজন এখন পরিসমাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং প্রয়োজনমূলক সখ্যও বিনষ্ট হইয়াছে। হে অল্পমতে! যাহারা অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ভূপাল, তাঁহাদের কখনও ঈদৃশ শ্রীহীন দরিদ্র মনুষ্যের সহিত সখ্য হইতে পারে না। আমি রাজ্যের নিমিত্ত যে তোমার সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ইহা আমার স্মরণ হয় না, তবে যদি তুমি একরাত্রি ভোজন করিতে বাঞ্ছা কর, আমি তাহা প্রদান করিতে সম্মত আছি।' তাঁহার ঐ কথা শ্রবণ করিয়া আমি যাহা অচিরাৎ সম্পন্ন করিতে পারিব, এমত প্রতিজ্ঞা করিয়া পত্নীর সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। আমি দ্রুপদরাজ কর্ত্তৃক ঐরূপ তিরস্কৃত হইয়া রোষ বশত গুণবৎ শিষ্য-সকলের প্রার্থনীয় কুরুরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলাম। পরে আপনার অভিলাষানুরূপ কার্য্য করিবার নিমিত্ত এই রমণীয় নাগপুরে উপনীত হইলাম। সম্প্রতি কি কার্য্য করিতে হইবে বলুন?

(ক্রমশঃ)

শ্রীসারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

ঈশোপনিষৎ।

ও

সুমতিনাম্নী বঙ্গব্যাখ্যা।

(আবশ্যক-সূচনা।)

ঈশোপনিষৎ শুক্লযজুর্ব্বেদের বাজসনেয়সংহিতার শেষ বা চত্বারিংশত্তম অধ্যায় স্বরূপ। বাজসনেয়সংহিতার প্রথমাবধি ৩৯তম অধ্যায় পর্য্যন্ত কর্ম্মকাণ্ডের এবং কেবল এই শেষ অধ্যায়েই জ্ঞানকাণ্ডের নিরূপণ বিদ্যমান। এই অধ্যায়ের মন্ত্রগুলি আত্মতত্ত্বপ্রকাশক, কর্ম্মবোধক নহে, সুতরাং এই অধ্যায়, সংহিতার অন্তর্গত হইলেও উপনিষৎ; আর এইজন্যই ইহার নাম বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ।

মূল বাজসনেয়সংহিতায় এই উপনিষদের মন্ত্র-সংখ্যা সপ্তদশ। প্রথম ৩টি মন্ত্র অনুষ্টুপ্‌ছন্দে গ্রথিত, চতুর্থ মন্ত্র ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দে রচিত, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম মন্ত্র অনুষ্টুপ্‌ছন্দস্ক। ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ, ১৩শ, ১৪শ মন্ত্র অনুষ্টুপ্‌ছন্দোবদ্ধ, ১৫শ মন্ত্র, দুইটী যজুর্মন্ত্রের সমষ্টি। ১৬শ মন্ত্র ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দে নিবদ্ধ, সপ্তদশ মন্ত্র উষ্ণিক্‌ছন্দোময়, ১টী ঋক্ ও দুইটী যজুর্মন্ত্রের সমষ্টিস্বরূপ। বাজসনেয়সংহিতার ভাষ্যকার মহামান্য

মহীধর এই ভাবের মন্ত্র-বিন্যাস সমর্থন করিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু ঈশোপনিষদের অন্যতম ভাষ্যকার জগদ্‌গুরু শঙ্কর এবং প্রকাশিকা-কার পূজ্যপাদ শ্রীনারায়ণ মুনি ও মাননীয় শ্রীবালকৃষ্ণদাস প্রভৃতি, বাজসনেয়সংহিতার মন্ত্রবিন্যাসক্রম রক্ষা করেন নাই। সংহিতার ৯ম মন্ত্র ইঁহারা উপনিষদে ১২শ মন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঐরূপ সংহিতার ১০ম, ১১শ, ১২শ, ১৩শ ও ১৪শ মন্ত্র ইঁহারা যথাক্রমে ১৩শ, ১৪শ, ৯ম, ১০ম ও ১১শ মন্ত্ররূপে স্থাপন করিয়াছেন। সংহিতার ১৫শ ও ১৬শ মন্ত্র ইঁহারা ১৭ ও ১৮ মন্ত্ররূপে গ্রথিত করিয়াছেন। সংহিতার ১৭শ মন্ত্র উপনিষদে অবিকল গৃহীত হয় নাই। সংহিতায় সপ্তদশ মন্ত্র যথা—"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং। যোঽসাবাদিত্যে পুরুষঃ সোঽসাবহম্, ওঁখং ব্রহ্ম।" ইহা উষ্ণিক্‌ছন্দস্ক মন্ত্র; "ওঁখং ব্রহ্ম" এই শেষাংশ যজুর্মন্ত্রদ্বয়। আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি এই মন্ত্রটীকে নিম্নস্বরূপে পাঠ করিয়াছেন যথা—"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং। তত্ত্বং পূষন্ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।" মন্ত্রটী সম্পূর্ণরূপে অনুষ্টুপ্‌ছন্দে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সংহিতার ১৫শ মন্ত্র "বায়ুরনিলম-মৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরং ওঁ ক্রতোস্মর ক্লিবে স্মর কৃতং স্মর"। উপনিষদের শঙ্করাদি ব্যাখ্যা-কারগণ এই মন্ত্রকে "বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরং। ওঁক্রতোস্মর কৃতং স্মর ক্রতোস্মর কৃতং স্মর," এইরূপে ১৭শ স্থানে পাঠ করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি উপনিষদের ১৬শ মন্ত্ররূপে এই মন্ত্র গ্রথিত করিয়াছেন যথা—"পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজা-পত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ, যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।" এই মন্ত্রটী সংহিতার ৪০তম অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়না। সুতরাং এখানে আমরা অন্ধকারে রহিলাম। এই অনুষ্টুব্‌বহুল চত্বা-রিংশত্তম অধ্যায়ের দ্রষ্টা দধীচাথর্ব্বণ ঋষি। মুক্তিকোপনিষদে অষ্টোত্তরশত উপনিষদের যে নাম-তালিকা আছে, তাহার প্রথমেই এই ঈশোপনিষৎ গৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমান-গ্রন্থে বাজসনেয়সংহিতার পাঠক্রমানুসারে মন্ত্র-বিন্যাস করা হইবে; আচার্য্য-শঙ্করমতানুযায়ী মন্ত্রক্রম প্রদর্শিত হইবে না বা সেইক্রমে মন্ত্রসকল ব্যাখ্যাত হইবে না।

উপনিষদারম্ভ।

তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষি প্রথম মন্ত্রে শমদমাদি-সম্পন্ন উপসন্ন মুমুক্ষু শিষ্যকে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন—ঋষি বলিতেছেন,—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মাগৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥ ১

এই দৃশ্যমান অসত্যস্বরূপ বিশ্ব সত্যময় পরমেশ্বর কর্ত্তৃক আচ্ছাদনীয়—অর্থাৎ আমিই পরমেশ্বর পরমাত্মা বিশ্বাকারে বিরাজমান,—আত্মসত্তা ভিন্ন সংসারের স্বতন্ত্র সত্তা নাই এইরূপ চিন্তা করিবে—আত্মজ্ঞানের সেবা করিবে। আর, এ সংসারে স্থাবরজঙ্গম যে কিছু বস্তু আছে, সে সকলের প্রতি মমতাশূন্য হইয়া, অনাসক্তভাবে সকল বস্তু ভোগ করিবে। কোনও বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা রাখিও না; কারণ জগতের ধনসম্পৎ কাহারও নয়, যাহা আজ তোমার, তাহা কা'ল অপরের হইবে, সুতরাং 'ইহা আমার' এরূপ ধারণা পরিত্যাগ কর—আত্মজ্ঞানের অনুশীলন কর। ১

যাহারা আত্মজ্ঞানের অধিকারী নহে,

তাহাদিগের প্রতি ঋষি, কর্ম্মসাধনের উপদেশ প্রদান করিতেছেন; ঋষি বলিতেছেন ;—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥ ২

ইহলোকে চিত্তশুদ্ধিকর বেদবিহিত নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর। তাৎপর্য্য এই যে, চিরজীবন ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে তোমার মনঃশুদ্ধি হইবে এবং পরম্পরায় মোক্ষলাভ ঘটিবে। জ্ঞানসাধনে অসমর্থ কর্ম্মাধিকারীর পক্ষে নিষ্কামকর্ম্মসেবা ভিন্ন মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই। তুমি বলিবে, কর্ম্ম করিলেই ফল হইবে, কর্ম্মফলবন্ধন দৃঢ় হইবে, মুক্তির উপায় কি? জানিয়া রাখ, ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশে কর্ম্ম করিলে, সে কর্ম্ম কর্ত্তায় লিপ্ত হয় না—তাহার বন্ধন সম্পাদন করে না। ২

অতঃপর ঋষি কাম্যকর্ম্মরত আত্মজ্ঞান-চেষ্টাবিমুখ মূঢ় ব্যক্তিগণের দোষ কীর্ত্তন করিতেছেন, যথা,—

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ ৩

যাহারা আত্মহা অর্থাৎ অবিদ্যামুগ্ধ, আত্মজ্ঞানবিমুখ ও জ্ঞানসাধন-নিষ্কামকর্ম্ম-পরাঙ্মুখ, কেবল কাম্যকর্ম্মপরায়ণ, তাহারা দেহত্যাগের পর, (যে সকল লোক বা জন্ম 'অসূর্য্য' অর্থাৎ যে সকল যোনিতে জন্ম লইলে জীব প্রাণপোষণরত অধম সঙ্কীর্ণচেতন বলিয়া পরিচিত হয়—এবং যে সকল যোনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন—সেই সকল) নিকৃষ্ট লোক বা স্থাবরাদি জন্ম লাভ করে। তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল জীব আত্মজ্ঞানের পথে অগ্রসর হয় না, তাহারা পুনঃপুনঃ জন্মমরণযন্ত্রণা ভোগ করে। ৩

মুমুক্ষুগণ যে পরব্রহ্মকে আত্মরূপে উপাসনা করিয়া সংসারের পরপারে গমন করেন, যে আত্মতত্ত্ব না জানিলে সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ঋষি সেই আত্মার স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছেন—

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্‌পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥ ৪

আত্মা অচল, অদ্বিতীয় ও মনের অগম্য। দীপ্তিশালী চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ আত্মাকে আয়ত্ত করিতে পারে না। আত্মা, সকলের উৎপত্তির পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান আছেন, আবার সকলের বিনাশ হইলেও বিনষ্ট হইবেন না। আত্মা বস্তুতঃ অচল, কিন্তু তিনি দ্রুতগামী গ্রহনক্ষত্রাদিকেও অতিক্রম করিয়া গমন করেন। আত্মার সত্তায় অনুপ্রাণিত হইয়া সূত্রাত্মা—বায়ুর প্রবহন, রবির প্রকাশন ও অগ্নির দহনপচনাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, অথবা আত্মার সত্তায় সত্তাবান্ হইয়া ক্রিয়াশক্তিরূপে সংসারের সমস্ত কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। ৪

ঋষি, আত্মস্বরূপ আরও বিশদরূপে বলিতেছেন, যথা—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ৫

আত্মা নিরুপাধিক পরমার্থ—সত্যরূপে অচল, কিন্তু উপাধি-সম্পর্ক-বশতঃ সচলবৎ প্রতীত হন। আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণের

কাছে আত্মা বহুযোজন-দূরস্থ বস্তু, কিন্তু তিনি জ্ঞানিগণের হৃৎপদ্মে নিজাত্মরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। আত্মা আকাশবৎ ব্যাপী। তিনি প্রতিবস্তুর অন্তরে ও বাহিরে বিরাজমান আছেন।

মতান্তরে—

এই মন্ত্রে ঋষি আত্মার কার্য্যরূপ প্রদর্শন করিতেছেন। চতুর্থ মন্ত্রে আত্মার কারণরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণ কার্য্যরূপ বর্ণন অনুপযুক্ত নহে। ঋষি বলিতেছেন,—

আত্মা গ্রহনক্ষত্রাদিরূপে সচল, আবার স্থাবররূপে অচল। আত্মা চন্দ্র সূর্য্যাদিরূপে দূরস্থ, কিন্তু জল-ফলাদিরূপে নিকটস্থ। তিনি চিদ্রূপে জীবকুলের অভ্যন্তরে ও জড়রূপে বাহিরে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ৫

ঋষি অতঃপর আত্মচিন্তার প্রকার-প্রণালী বলিতেছেন,—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিচিকিৎসতি॥ ৬

যে মুমুক্ষু ব্যক্তি আত্মায় সর্ব্বভূত দর্শন করেন এবং সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত সংসার আত্মায় অবস্থিত—আত্মভিন্ন নয়, এবং সমগ্র বিশ্বে সর্ব্বত্র সাক্ষিরূপে অবস্থিত চিদ্রূপ আত্মাই আমি—এইরূপ আত্মদর্শন প্রাপ্ত হন, তাঁহার সকল সংশয় তিরোহিত হয়—সমস্ত বিচার অপগত হয়। ৬

অতঃপর ঋষি বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্তরূপ সর্ব্বাত্মদর্শন সমাপ্ত হইলে, অবিদ্যার বিনাশ ও জ্ঞানদীপ্তির বিকাশ হয়।

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ। ৭

যে অবস্থায় সাধকের 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' 'আত্মৈবেদং সর্ব্বম্', এই সর্ব্বাত্মদর্শন সম্পূর্ণ হয়—সমস্ত সংসার উপাসকের আত্মস্বরূপে সমন্বিত হয়, সে অবস্থায় একত্বদর্শী সাধকের অবিদ্যা বিনষ্ট হয়—অবিদ্যামূলক সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়—শোক-মোহশূন্য আত্মভাবের নগ্নমূর্ত্তি—সত্য-শিব-সুন্দরকান্তি প্রকটিত হয়। ৭

ঋষি, জ্ঞানের ফলস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি কীর্ত্তন করিতেছেন—

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণম্ অস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুঃ যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ৮

যে ব্যক্তি উক্তরূপ আত্মদর্শন-সৌভাগ্য লাভ করেন, তিনি চিদানন্দরূপ অচিন্ত্যশক্তিস্বরূপ স্থূলসূক্ষ্ম-শরীর শূন্য শুদ্ধসত্ত্বময় পুণ্যপাপাতীত পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। পরন্তু ঐ ব্রহ্মভূত সাধক, জড়াজড় বস্তুজাত নির্লিপ্তভাবে ভোগ করিতে সমর্থ হন। ব্রহ্মভূত জ্ঞানী, কবি, মেধাবী, জ্ঞান বলে সর্ব্বস্বরূপ হন এবং স্বয়ম্ভুরূপে বিরাজ করেন। ৮

অতঃপর উপাসনাপ্রসঙ্গ। যাহারা মরণই মুক্তির দ্বার মনে করে, ঋষি, বর্ত্তমান-মন্ত্রে সেই ভ্রান্তগণের শোচনীয় পতন কীর্ত্তন করিতেছেন,—

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তমো যউ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥ ৯

যে মূঢ়গণ অসম্ভূতির উপাসনা করে অর্থাৎ দেহত্যাগের পরই মুক্তি হয়, জীবের পুনঃসম্ভব নাই, মনে করে, তাহারা অজ্ঞানতমঃকূপে প্রবেশ করে, আর যাহারা সম্ভূতি বা বিশ্বসম্ভবহেতু আত্মায় রত অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানাভাবে চিত্তশুদ্ধি-বিহীন অথচ আত্মজ্ঞানের

সেবা করিতে প্রস্তুত, তাঁহারা ততোধিক অন্ধকারময় অজ্ঞানগহ্বরে স্থান প্রাপ্ত হয়।

এই মন্ত্রে ঋষি মতান্তরে ব্যাকৃতোপাসনা ও অব্যাকৃতোপাসনার সমুচ্চয়—প্রতিপাদনার্থে প্রত্যেকের নিন্দা কীর্ত্তন করিয়া, প্রকারান্তরে সমুচ্চয়-পক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

যাহারা অসম্ভূতি অর্থাৎ অব্যাকৃতোপাসনা করে, তাহারা অন্ধতম অর্থাৎ সংসারে প্রবেশ করিবে, আর যাহারা সম্ভূতি বা ব্যাকৃতোপাসনা (হিরণ্যগর্ভোপাসনা) করে, তাহারা তদপেক্ষাও তীব্রতমোময় সংসারে স্থান লাভ করিবে।৯

বর্ত্তমান মন্ত্রে সম্ভূতি-উপাসনা ও অসম্ভূতি-উপাসনার ফলপার্থক্য বর্ণিত হইতেছে। মতান্তরে সমুচ্চয়-সিদ্ধান্তের অনুকূলে ব্যাকৃতোপাসনা ও অব্যাকৃতোপাসনার ফলভেদ কথিত হইতেছে।

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যেনস্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১০

যাহারা মরণকেই মুক্তি মনে করে, তাহারা স্বতন্ত্র ফল লাভ করে, আর যাহারা কর্ম্মহীন মলিনচিত্ত আত্মোপাসক, তাহারাও স্বতন্ত্র ফল প্রাপ্ত হয়—ধীরগণ ইহা আমাদিগকে কহিয়াছেন, তাঁহাদের কাছেই আমরা ইহা শ্রবণ করিয়াছি।

ব্যাখ্যান্তর—

ব্যাকৃতোপাসনা বা হিরণ্যগর্ভোপাসনার ফল পৃথক্ (অণিমাদি-ঐশ্বর্য্যলাভ) আর অব্যাকৃতোপাসনার পরিণাম ফলও পৃথক্, (প্রকৃতি-লয়) ইহা ধীরগণের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহারাই আমাদিগের নিকট ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (প্রকৃতির উপাসনা করিলে সাধক প্রকৃতিতে লীন হন। প্রকৃতিলয় মুক্তির কাছাকাছি। সুষুপ্তির ক্রোড়ে শয়ন করিয়া জীব ক্ষণকাল সংসার-যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়—ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে। প্রকৃতি-লয় দশমন্বন্তরকালস্থায়ী আনন্দভোগ—সুদীর্ঘ সুষুপ্তি। প্রকৃতিলীন ব্যক্তি যথাকালে আবার সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মুক্ত জীবের প্রত্যাবর্ত্তন নাই। বেদ বলেন—ন স পুনরাবর্ত্ততে।)
১০

ঋষি, সম্ভূতি-উপাসনা ও অসম্ভূতি-উপাসনার সমুচ্চয় প্রচার করিতেছেন—

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে॥ ১১

যে যোগী সম্ভূতি বা পরব্রহ্ম এবং বিনাশ বা বিনাশী শরীর এই উভয়কে একীভূত বলিয়া জানেন, অর্থাৎ আমি দেহাতিরিক্ত অবিনশ্বরদেহী আত্মা, এই নশ্বর দেহ আমা হইতে ভিন্ন, কিন্তু কর্ম্মবশে আমি এই দেহে তাদাত্ম্যাধ্যাসসম্পন্ন—এইরূপ চিন্তা করিয়া নিষ্কামকর্ম্ম সাধন করেন, তিনি বিনাশ বা নশ্বর শরীরের দ্বারা নিষ্কামকর্ম্মবলে মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া, সম্ভূতি বা আত্মজ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লাভ করেন।

এই মন্ত্রের 'বিনাশ' শব্দ দুটী 'অবিনাশ' রূপে গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ 'সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ স্থলে 'সম্ভূতিঞ্চ অবিনাশঞ্চ' এবং 'বিনাশেন মৃত্যুংতীর্ত্বা' স্থলে 'অবিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা' পাঠ করিয়া, আচার্য্য মহীধর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর 'বিনাশ' শব্দস্থলে 'অবিনাশ' পাঠ করিয়াছেন, অধিকন্তু 'সম্ভূতি' স্থলে 'অসম্ভূতি' পাঠ করিয়াছেন। শঙ্কর 'অসম্ভূতিঞ্চ অবিনাশঞ্চ' এবং 'অবিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা অসম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে' পাঠ গ্রহণ করিয়া

ব্যাখ্যান্তর লিখিয়াছেন। মহীধরমতে মন্ত্রের ব্যাখ্যান্তর এইরূপ—

যে উপাসক অবিনাশ বা অব্যাকৃতোপাসনা ও সম্ভূতি বা হিরণ্যগর্ভোসনা করেন, তিনি অব্যাকৃতোপাসনা দ্বারা অনৈশ্বর্য্য-অধর্ম্ম-কাম-প্রভৃতিরূপ মৃত্যু অতিক্রম করিয়া, হিরণ্য-গর্ভোপাসনা দ্বারা প্রকৃতিলয়-রূপ গৌণ অমৃত বা মুক্তিলাভ করেন। মহীধরাচার্য্যের এই ব্যাখ্যা ভ্রমশূন্য নহে, কারণ হিরণ্যগর্ভোপাসনা দ্বারা প্রকৃতিলয় ফল হইতে পারে না। দশম-মন্ত্রের ভাষ্যে স্বয়ং মহীধরই বলিয়াছেন, হিরণ্যগর্ভোসনায় অণিমাদিলাভ ও অব্যাকৃতো-পাসনায় প্রকৃতি-লয় ঘটে, এখানে তাঁহার নিজের কথায়ই পূর্ব্বাপরবিরোধ হইতেছে। আচার্য্যশঙ্করের ব্যাখ্যান্তরই সুসঙ্গত। শঙ্কর বলেন—

যে উপাসক 'অবিনাশ' বা হিরণ্যগর্ভো-পাসনা ও 'অসম্ভূতি' বা অব্যাকৃতোপাসনার সমুচ্চয়ানুষ্ঠান করেন, তিনি অবিনাশ-রূপ হিরণ্যগর্ভোপাসনা দ্বারা (অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া) অনৈশ্বর্য্যরূপ মৃত্যু অতিক্রম করিয়া, অসম্ভূতি বা অব্যাকৃতোপাসনা দ্বারা প্রকৃতিলয়-রূপ গৌণমোক্ষ লাভ করেন। ১১

১২ মন্ত্রে যাহারা কর্ম্ম করিয়া জীবন যাপন করিতে চায়, তাহাদের জন্য কর্ম্ম ও দেবতা-জ্ঞানের সমুচ্চয় প্রতিপাদনার্থে অন্যতরের নিন্দা প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততোভূয়ইব তমো যউ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ১২

যাহারা কেবল অবিদ্যা বা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্ম্মের সেবা করে, তাহারা অন্ধতমঃ লাভ করে—সংসার পরম্পরা প্রাপ্ত হয়, আর যাহারা শুধু দেবতাজ্ঞানের সেবা করে, বিহিত কর্ম্ম করে না, তাহারা প্রত্যবায়গ্রস্ত হয়, চিত্তশুদ্ধির অভাবে আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত হয় এবং অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। ১২

১৩ মন্ত্রে সমুচ্চয়বাদের পোষকরূপে বিদ্যা ও অবিদ্যোপাসনার ফলভেদ দর্শিত হইতেছে।

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়া অন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যেনস্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১৩

বিদ্যা বা দেবতাজ্ঞানের ফল স্বতন্ত্র (দেবলোকপ্রাপ্তি), অবিদ্যা বা কর্ম্মসেবার ফলও স্বতন্ত্র (পিতৃলোকপ্রাপ্তি), এই ফল-পার্থক্য ধীরগণের কাছে শুনিয়াছি, তাঁহারা আমাদিগের নিকট ইহা বিবৃত করিয়াছেন। ১৩

অতঃপর ঋষি, দেবতাজ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন—

বিদ্যাঞ্চ অবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥ ১৪

যে সাধক বিদ্যা বা দেবতাজ্ঞান এবং অবিদ্যা বা যজ্ঞাদিকর্ম্ম—একই ব্যক্তির অনুষ্ঠেয় মনে করেন, তিনি কর্ম্মদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া, দেবতাজ্ঞানবলে দেবাত্মভাবরূপ অমৃত প্রাপ্ত হন, আত্মায় দেবত্ব দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। ১৪

১২শ, ১৩শ, ১৪শ—তিনটীমন্ত্রে 'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা' শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। মহীধর-শঙ্কর প্রভৃতি জ্ঞানবাদিগণ, 'বিদ্যা' অর্থে এখানে 'আত্মজ্ঞান' বুঝেন না, কারণ এখানে 'সমুচ্চয়' বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞান ও কর্ম্ম একযোগে মুক্তির কারণ—এরূপ সমুচ্চয়বাদ, জ্ঞানবাদিগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, কর্ম্ম, জ্ঞানোদয়ের সহায়তা করে, কিন্তু জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র কারণ; সুতরাং 'বিদ্যা' বলিতে আত্মজ্ঞান

বা ব্রহ্মজ্ঞান বুঝা যায় না। ব্রহ্মজ্ঞানও কর্ম্মের সমুচ্চয় শ্রুতিবিরুদ্ধ—অথচ এখানে বিদ্যা ও অবিদ্যার সমুচ্চয়—শ্রুতি স্বয়ং ঘোষণা করিতেছেন; কাজেই কর্ম্মের সহিত যাহার সমুচ্চয় সঙ্গত, সেই 'দেবতাজ্ঞান' বা 'দেবতাবিদ্যা'ই এখানে বুঝিতে হইবে। রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ সমুচ্চয়বাদ স্বীকার করেন। তাঁহারা 'বিদ্যা' বলিতে এখানে 'ব্রহ্মজ্ঞান'ই বুঝিয়া থাকেন।

এই মন্ত্রে উপাসক যোগী অন্তকালের প্রার্থনা জানাইতেছেন। যোগী বলিতেছেন,—

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতোস্মর ক্লিবে স্মর কৃতং স্মর। ১৫

এই অন্তকালে আমার প্রাণ বা কর্ম্মজ্ঞানসংস্কৃত সূক্ষ্মশরীর বায়ুমণ্ডল প্রাপ্ত হউক্—জগৎপ্রাণে স্থানলাভ করুক্—উৎক্রান্ত হউক্। আর আমার এই স্থূলশরীর অগ্নিতে নিঃক্ষিপ্ত হইয়া ভস্মভাব লাভ করুক্। হে ওঙ্কারাত্মক অগ্নিরূপ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম! হে ক্রতো! হে সঙ্কল্পাত্মক! আমার সম্বন্ধে যাহা স্মরণীয়, তাহাই স্মরণ করুন্। কর্ম্মানুরূপ—লোকপ্রদানের জন্য স্মরণ করুন্; আর আমার দ্বারা ইহজীবনে যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলিও স্মরণ করুন। ১৫

আচার্য্য শঙ্কর 'ক্লিবে স্মর' এই অংশ পাঠ করেন নাই। সুতরাং তন্মতানুসারে ব্যাখ্যা করিতে হইলে, 'কর্ম্মানুরূপ লোক প্রদানের জন্য স্মরণ করুন্' এই অংশ ত্যাগ করিতে হয়। বাজসনেয়সংহিতায় ঐ মন্ত্রাংশ দৃষ্ট হয়, সুতরাং শঙ্করমতে ব্যাখ্যা করা গেল না।

১৬ মন্ত্রে সাধক অগ্ন্যাত্মক—ব্রহ্মের নিকট উত্তরমার্গ বা দেবযানগতি প্রার্থনা করিতেছেন। উপাসক বলিতেছেন,—

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্. বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো, ভূয়িষ্ঠাস্তে নমউক্তিং বিধেম। ১৬

হে দ্যোতন স্বভাব অগ্নে! অর্থাৎ তেজোময় অগ্নিরূপ ব্রহ্ম! আমাদিগকে কর্ম্মফলভোগার্থে সুশোভন দেবযান-পথে লইয়া যান্। আপনিই শুভাশুভ তাবৎ কর্ম্মের ও বিজ্ঞানের জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা। আপনি আমাদিগের পাপরাশি বিনাশ করুন। আমরা বহুবার আপনাকে নমস্কার করি!

আচার্য্য শঙ্কর এই ১৬শ মন্ত্রটী ১৮শ বা শেষমন্ত্রস্বরূপে গ্রহণ করিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন; অপর একটী মন্ত্রকে ১৬শ মন্ত্ররূপে স্থাপন করিয়াছেন। সেই ১৬ মন্ত্রটী এই—

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।

সাধক বলিতেছেন—হে জগৎপোষণ-সমর্থ পূষণ্! হে অদ্বিতীয়-গতিশীল একর্ষে! হে সংযমক্ষম যম! হে সংসার-প্রকাশক সূর্য্য! হে প্রজাপতি-নন্দন! আপনার দীপ্তিময় উত্তপ্ত কিরণজাল সংযত করুন্—সম্পিণ্ডিত করুন্, আমি আপনার মঙ্গলময় রূপ দর্শন করি। আদিত্য মণ্ডলস্থ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে আমি 'সোঽহমস্মি'রূপে দর্শন করি—আত্মভাবে উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হই। শঙ্করাচার্য্য, মন্ত্রের শেষাংশ অর্থাৎ 'যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি'র ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, 'হে দেব, আমি তোমার কাছে ভৃত্যবৎ প্রার্থনা জানাইতেছি না; আমি সেই আদিত্যমণ্ডলস্থ

ধ্যাহৃতিশরীর জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ'। এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য দুর্ব্বোধ্য! প্রার্থনাপটু উপাসকের এত জোর কেন, বুঝা যায় না!

১৭ মন্ত্রে আদিত্যরূপ ব্রহ্মের উপাসনা প্রদর্শিত হইতেছে—

হিরণ্ময়েণ পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
যোঽসাবাদিত্যে পুরুষঃ সোঽসাবহম্। ওঁ খং ব্রহ্ম। ১৭

জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যমণ্ডলরূপ পাত্রদ্বারা সবিতৃ-মণ্ডলস্থ সত্যস্বরূপ পরম-পুরুষের মুখ বা শরীর আচ্ছাদিত রহিয়াছে, (তথাপি) 'পরিদৃশ্যমানমণ্ডলস্থ পুরুষ আমিই'—এইরূপে (অর্থাৎ রবিমণ্ডলস্থ পুরুষে আত্মভাব ধারণা করিয়া) উপাসনা করিবে। শেষে "ওঁঙ্কারাত্মক ব্রহ্ম আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী এবং সেই ব্রহ্মই আদিত্যপুরুষ-স্বরূপ আমি" এইরূপে উপাসনা করিবে। ১৭

বাজসনেয়সংহিতার ৪০তম অধ্যায় এই মন্ত্রেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার আচার্য্য মহীধরও এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াই লেখনী সম্বরণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীনারায়ণমুনি ও শ্রীবালকৃষ্ণ দাস প্রভৃতি মনীষিবর্গ এস্থানে বিশ্রাম করেন নাই। তাঁহারা ঠিক্ এই মন্ত্রটী উপনিষদে সংগ্রহ করেন নাই, ইহার সদৃশ একটী মন্ত্র পঞ্চদশ মন্ত্ররূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মন্ত্রটী এই—

হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।

শঙ্কর বলিয়াছেন—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, অবিদ্যা বা কর্ম্মদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া, বিদ্যা দ্বারা অমৃতলাভ করিবে,—এখানে সেই অমৃতলাভের দ্বারমার্গ প্রদর্শিত হইতেছে। আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষের উপাসনাকারী সাধক, অন্তকালে, সত্যাত্মস্বরূপ আদিত্যের কাছে নিজের প্রাপ্তিদ্বার যাচ্‌ঞা করিতেছেন। সাধক বলিতেছেন,—পূষণ্ অর্থাৎ হে সত্য-স্বরূপ বিশ্বপোষক সূর্য্য! জ্যোতির্ম্ময় আবরণ-পাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত রবিমণ্ডলস্থ ব্রহ্মপুরুষের মুখ বা দ্বার, সত্যধর্ম্মা আমার জন্য উদ্‌ঘাটন করুন। অথবা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুরুষের যে তত্ত্ব বা স্বরূপ আবৃত আছে, আমাদের উপলব্ধির জন্য তাহা প্রকাশ করুন।

উপনিষদ্ব্যাখ্যাতৃ-শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির সহিত সংহিতাভাষ্যকার মহীধরাচার্য্যের ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য না থাকায় যাঁহারা চিন্তিত হন, তাঁহারা মনে রাখিবেন, পাঠভেদে মন্ত্রভেদ হওয়ায় ব্যাখ্যাভেদও অসঙ্গত নহে। সংহিতার শেষ অধ্যায় স্বরূপ 'উপনিষদ্' সংহিতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই অন্যভাবে পরিবর্ত্তিত হইল কেন? ইহার উত্তরে চিরদিনই নীরবতা অবলম্বন করিতে হইবে!

—:ওঁ:—

শান্তিমন্ত্র।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

উপনিষৎপাঠের প্রথমে ও অবসানে শান্তি-মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। ঈশোপনিষদের শান্তি-মন্ত্র 'ওঁ পূর্ণমদঃ' ইত্যাদি। মুক্তিকোপনিষদের ব্যাখ্যায় সকল বেদের শান্তিমন্ত্র বিবৃত ও বিচারিত হইবে।

ব্রহ্মার্পণমস্তু।

শ্রীকেদারনাথ ভারতীকৃতা সুমতি-
বঙ্গব্যাখ্যা সমাপ্তা।

যোগদর্শন-ভাষ্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ ॥ ২

ব্যাখ্যাঃ—চিত্তবৃত্তি-নিরোধই যোগলাভের একমাত্র উপায়। যোগ কি ?

'সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ॥'

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগের নাম যোগ।

দক্ষস্মৃতিতে আছে—

"বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ কেচিদ্‌যোগং বদন্তি বৈ।
অধর্ম্মো ধর্ম্মবুদ্ধ্যা তু গৃহীতস্তৈরপণ্ডিতৈঃ॥
আত্মনো মনসশ্চৈব সংযোগস্তু তথাহপরে।
উক্তানামধিকাহ্যেতে কেবলং যোগবঞ্চিতাঃ॥
বৃত্তিহীনং মনঃ কৃত্বা ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি।
একীকৃত্য বিমুচ্যন্তে যোগোহয়ং মুখ্য উচ্যতে॥"

"কেহ কেহ বলেন—ধ্যেয় বিষয়ের সহিত মনের সংযোগ হইলেই যোগ হয়। অপণ্ডিতগণই এই অধর্ম্মকে ধর্ম্মবুদ্ধিতে গ্রহণ করে। কেহ বলেন—আত্মা ও মনের সংযোগ হইলেই যোগ হয়। ইহারাও যোগ-বিষয়ে অপেক্ষাকৃত বঞ্চিত। মনকে নির্ব্বাত দীপের ন্যায় সংকল্প-বিকল্প-শূন্য করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে এক করাই মুখ্য যোগ বলিয়া কথিত।"

এই প্রমাণের দ্বারা স্পষ্টই বলা হইল যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগই যোগ। আর চিত্তবৃত্তি-রোধ উক্ত যোগলাভের উপায়; কারণ চিত্তবৃত্তি-রোধ ব্যতীত জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ হইতে পারে না। এই কথাই স্পষ্ট করিয়া দক্ষস্মৃতি বলিতেতেছেন,—"বৃত্তিহীনং মনঃ কৃত্বা ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি—একীকৃত্য * *" পূর্ব্বেই বলিয়াছি—যোগসূত্রে অতি সংক্ষেপে, সংকেতে যোগসাধন-পদ্ধতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আরও সমাধি হৃদয়ে উদিত বলিয়া, যোগসূত্র অতি-সংক্ষেপেই হইয়াছে। সেইজন্য গুরুমুখে ইহা জানিলে সমস্ত গোলই চুকিয়া যায়। ঋষি অতি সংক্ষেপে "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। এসম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। জীবাত্মার পরমাত্মাতে লয়ই যোগ। 'সংযোগ' আর 'লয়' এখানে একার্থ-বাচক। লয়কেই নির্ব্বাণ বলে। এই যোগেরই নামান্তর 'নির্ব্বাণ'। এ সম্বন্ধে দক্ষস্মৃতি বলেন,—"সর্ব্বভাববিনির্মুক্তক্ষেত্রজ্ঞং ব্রহ্মণি ন্যসেৎ।" "মনের সংকল্প-বিকল্প নাশ হেতু (চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইবে), জীব সর্ব্ব-ভাব-মুক্ত হইবে, তৎপরে তাহার ব্রহ্মে লয় হইবে।" ইহাই যোগ—ইহাই নির্ব্বাণ। কিন্তু যতদিন শরীর থাকিবে, ততদিন নির্ব্বাণ হইবে না। চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-পূর্ব্বক শরীর-ধারণ-কাল পর্য্যন্ত 'ব্রাহ্মীস্থিতি' এবং শরীর-ত্যাগে নির্ব্বাণ'। এই সমস্ত কথা পরে বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইবে।

যোগ কয় প্রকার ?

যোগ এক প্রকার—জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগই যোগ।

এই যোগ-প্রাপ্তির উপায় কি ?

পঞ্চ প্রকার উপায় দ্বারা এই যোগ-লাভ হয়। পঞ্চ উপায় যথা—(১) লয়যোগ (২) জ্ঞানযোগ (৩) রাজযোগ (৪) হঠযোগ। (৫) মন্ত্রযোগ। এই পঞ্চ উপায়ের যে

কোনও উপায় দ্বারা (কে কোন্ যোগের অধিকারী, তাহা শ্রীগুরু নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।) পূর্ব্বোক্ত যোগ-লাভ হয়।

এই পঞ্চ প্রকার উপায়কে 'যোগ' বলে কেন?

এই গুলি যোগ নহে,—যোগ লাভের উপায়। তবে এই গুলিকে 'যোগ' বলে এই জন্য যে, এই পঞ্চ উপায়েই উক্ত যোগ লাভ হয়। ইহারা যোগাঙ্গ বা যোগ লাভের উপায়-স্বরূপ। এই পঞ্চ উপায়ের মধ্যে যে সমস্ত অঙ্গ আছে, তাহাদিগকেও যোগ বলে; যথা—ধৌতি-যোগ, প্রাণায়াম-যোগ, ধ্যান-যোগ, সমাধি-যোগ ইত্যাদি। যোগ-সাধকের সাধন দ্বারা যে একএক অবস্থা-প্রাপ্তি হয়, তাহাদিগকেও যোগ বলে, যথা—মোক্ষযোগ ইত্যাদি। যোগের সাধন দ্বারা যে সমস্ত স্বরূপ দর্শন হয়, তাহাদিগকেও যোগ বলে, যথা—বিশ্বরূপ দর্শন-যোগ ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই গুলি যোগ নহে। এই সমস্ত যোগ-লাভের উপায় এবং উহা লাভের পূর্ব্বে সাধকের যে সমস্ত অবস্থা প্রাপ্তি হয়, তাহাই। আরও 'লয়', 'জ্ঞান', 'রাজ', 'হঠ', 'মন্ত্র' ইহাদের সহিত 'যোগ' কথা কেন যুক্ত হইয়াছে, তাহা ঐ সমস্ত যোগের ব্যাখ্যার সময় বলা যাইবে। প্রকৃত যোগ একই—জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ।

উক্ত প্রকার যোগ লাভের উপায় চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ। এই চিত্তবৃত্তি-নিরোধ, পঞ্চ উপায়ের যে কোন উপায় দ্বারা হইতে পারে—অর্থাৎ লয়যোগ দ্বারাও হয়, হঠযোগ দ্বারাও হয় ইত্যাদি। তবে কে কোন্ যোগের অধিকারী, গুরুদেব তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। এখন চিত্তবৃত্তি-নিরোধ কাহাকে বলে, বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক্। এই কথাটা শ্রীভগবান্ গীতোপনিষদে অতি উত্তমরূপে বলিয়াছেন; যথা;—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।" ২।৫৫

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা ইহার অনুকূল। "যদা" অর্থাৎ সমাধিকালে "সর্ব্বান্ মনোগতান্ কামান্ প্রজহাতি" সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন হইতে জাত (এবং বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চিত) সমস্ত চিত্তবৃত্তি একেবারে রুদ্ধ হয়। চিত্তবৃত্তির অপর নাম "কাম"; চিত্তবৃত্তি বা কাম-ই বন্ধনের কারণ। প্রথম আদি-উৎপত্তির কথা সংক্ষেপে বলা যাউক্। এক ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুই নাই; সেই ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন—"অহং বহুস্যাম" আমি বহু-হইব। কেন ইচ্ছা করিলেন, তাহা বলা যাইতে পারে না, কারণ তিনি স্বাধীন। (এ সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত তথ্য, তাহা সাধন দ্বারা নিজ-বোধ রূপ। তবে জীব-ভাবকে বুঝাইবার জন্য এইরূপ একটা বলা ব্যতীত আর উপায় কি?) যখনই এই সংকল্প উৎপন্ন হয়, তখনই স্বপ্রকাশ-চৈতন্যে (অর্থাৎ ব্রহ্মে) সেই সংকল্পের একটা—প্রতিবিম্ব ভাসে। এই প্রতিবিম্বকে 'সূক্ষ্ম বিষয়' বলা যাইতে পারে। পুরুষ তখন ঐ বিষয় দেখিয়া 'সুন্দর' বোধ করেন। ইহাই শোভনাধ্যাস। পরে ঐ বিষয়কে সুন্দর ভাবিয়া তাহার ধ্যান করেন; তাহা হইতে সঙ্গ উৎপন্ন হয়। বিষয় সঙ্গ হইতেই কাম জন্মে। সেই জন্য শ্রুতি, এই সংকল্পময় পুরুষকে বলেন—অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষঃ। আদি কাম বা আদি সংকল্পের কথা বলা হইল তাহা হইলেই কথা হইতেছে—'চিত্তের যে বৃত্তি উঠে, তাহাই কাম'। এখন

আমাদের মধ্যে কিরূপে বৃত্তি উঠে? প্রথমে বিষয়-সমূহ (যাহার অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে নাই, কেবল আদি সংকল্পের দ্বারা ব্রহ্মে বিশেষ-কল্পে অসদ্‌রূপে প্রতিবিম্ব-স্বরূপে ভাসিয়াছে।) ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া চিত্তে পড়ে। চিত্ত একটা প্লেটের ন্যায়। বিষয়, চিত্তে পড়িবামাত্র মনের নিকট টেলিগ্রাফ্ যায়। যাইলেই মন, সংকল্প-বিকল্প তুলেন; পরে বুদ্ধি সেই বিষয় পাইয়া ভাল-মন্দ বিচার করেন, তৎপরেই চিত্ত সেই বিষয়ের আকারে আকারিত হয়,—ইহাই চিত্তবৃত্তি।"

চিত্তবৃত্তির নিঃশেষ-রোধ ব্যতীত আত্মার প্রকাশ হইতে পারে না। 'জ্ঞান' অখণ্ডরূপে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু এই জ্ঞান গুণ-শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে। দেহের জাগ্রদবস্থায় জ্ঞান সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে—এই সময় 'অহং ভাব'ও (ইহাও জ্ঞানে প্রকাশ পায়) সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে। ইহার পর স্বপ্নাবস্থায় জ্ঞান স্থূল-দেহ হইতে আকৃষ্ট হইয়া সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থিতি করে এবং তৎকালে 'অহং ভাব' সূক্ষ্ম-দেহে প্রবল হয়। পরে সুষুপ্তি—অবস্থায় জ্ঞান স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীর ত্যাগ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া, কারণ-শরীরে অবস্থিতি করে এবং 'অহং ভাব'ও ক্ষীণ হইয়া জ্ঞানে লীন থাকে। এই জ্ঞান, অন্তঃকরণ-যন্ত্র এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় যন্ত্র এই উভয় যন্ত্রে যন্ত্রিত বা রুদ্ধ থাকিয়া আকুঞ্চিত ও প্রকাশিত হইতেছে—কখন বা অন্তঃকরণ-যন্ত্রে, কখন বা জ্ঞানেন্দ্রিয়-যন্ত্রে। এই যন্ত্রিত জ্ঞানের দুই শক্তি,—প্রকাশ করা এবং প্রকাশ হওয়া। জ্ঞানের এই আকুঞ্চিত ও প্রকাশিত হওয়া অর্থাৎ এই প্রকার স্পন্দন রুদ্ধ না হইলে, আমরা জ্ঞানের অখণ্ডভাবে উপস্থিত হইতে পারিব না। জ্ঞান স্বয়ম্প্রকাশ এবং ও অন্যান্য বিষয়াদির প্রকাশক হইয়াও গুণ-শক্তির দ্বারা এরূপ যন্ত্রিত যে, উহা ক্ষণমাত্র স্পন্দিত না হইয়া থাকিতে পারে না। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ গ্রহণ করিয়াই জ্ঞান—জগৎ পদার্থে আকৃষ্ট হইতেছে। এই পাঁচটা আবার গুণশক্তি-রচিত। জ্ঞানও এই গুণ-শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া উহারই রচিত বিষয় গ্রহণ করিয়া বিকার ভাব প্রাপ্ত হইতেছে। ইহাতে জ্ঞানের যে প্রকৃত স্বয়ম্প্রকাশ ভাব তাহার প্রকাশ হইতেছে না; কারণ গুণ-শক্তির নিঃশেষে বিরাম না হইলে এই অবস্থা প্রকাশিত হয় না। গুণশক্তির নিঃশেষ-বিরাম হইলে, জ্ঞানের যে নিস্পন্দ স্বয়ম্প্রকাশ-ভাব থাকে, তাহাই 'ব্রহ্ম'। এই জ্ঞানকে গুণশক্তি-বর্জ্জিত করার সাধনই মনের সংকল্প-বিকল্প রোধ করা। মনের সংকল্প-বিকল্প রোধ হইলেই আর চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হইবে না। তাহা হইলে কথা হইতেছে—জ্ঞান গুণসক্তি-বর্জ্জিত হইলেই চিত্তবৃত্তি রোধ হইবে। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ প্রকার যোগ-সাধনের যে কোনও একটার দ্বারা জ্ঞানকে গুণশক্তি-বর্জ্জিত করিয়া চিত্তবৃত্তি রোধ করা যায়।

আরও, যোগ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ গীতোপনিষদে সাংখ্যযোগের ৪৮ শ্লোকে যাহা বলিতেছেন, তাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য। ঐ শ্লোক যথা—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়!
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮

ব্যাখ্যাঃ—হে ধনঞ্জয়! "সঙ্গং ত্যক্ত্বা"

প্রাণকর্ম্ম দ্বারা সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া; (সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেই সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান হইবে; তাই বলিতেছেন—"সিদ্ধ্য-সিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা") সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান করিয়া, তৎপরে 'যোগস্থঃ (সন্' যোগস্থ হইয়া অর্থাৎ নিত্য-সমাধিতে অবস্থান করিয়া (ইহার নাম চৈতন্য সমাধি) "কর্ম্মাণি কুরু" যথা প্রাপ্ত কর্ম্মমাত্রে স্পন্দিত হও! এখানে জীবন্মুক্তের যে রূপে কর্ম্ম হয়, তাহাই বলিলেন। ইহার উপরে আবার বিদেহ মুক্তও আছে। আবার বিদেহমুক্তির পর নির্ব্বাণ। "সমত্বং যোগ উচ্যতে" সাম্যাবস্থা—যেখানে কোন প্রকার স্পন্দন নাই, তাহাই যোগ অর্থাৎ পূর্ব্বে যে যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করার কথা বলিলেন, তাহা জীবন্মুক্তের কর্ম্ম, পরে যখন সমস্ত কর্ম্মই শেষ হয়, যখন সাধক সপ্তজ্ঞান-ভূমিকারও অতীত হন। যখন বিদেহমুক্ত হন, তখনই মহাসাম্য ভাব উপস্থিত হয়। ইহাই নির্ব্বিকল্প-সমাধির শেষ অবস্থা! এই অবস্থার কথা, কথায় বলা যায় না, ইহা সাধন দ্বারা নিজ বোধ রূপ। চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-পূর্ব্বক শরীর-ধারণ কাল পর্য্যন্ত 'ব্রাহ্মীস্থিতি'—এবং শরীর-ত্যাগে 'নির্ব্বাণ'-লাভের উপায় পাঁচটী। (১) লয়যোগ (২) জ্ঞানযোগ (৩) রাজযোগ (৪) হঠযোগ (৫) মন্ত্রযোগ। সকলেই কিন্তু সকল যোগের অধিকারী নহে। এই পঞ্চবিধ যোগের মধ্যে সাধক শ্রীগুরূপদেশে অধিকারানুসারে কোন একটি যোগ গ্রহণ করিবে। এই পঞ্চবিধ যোগ মূলতঃ কাহাকে বলে, তাহা বলা যাইতেছে:—

(১) লয়যোগঃ—সাক্ষাৎ লয়ের সাধনা দ্বারা চিত্তবৃত্তি রোধ করিয়া যে যোগ (বা নির্ব্বাণ লাভ হয়, তাহাকে লয়যোগ বলে। জ্ঞান ব্যতীত ব্রাহ্মীস্থিতি নাই। এই জ্ঞান লাভের সাক্ষাৎ সাধন চিত্তবৃত্তি-নিরোধ। চিত্তবৃত্তি-নিরোধ হইলেই জ্ঞান স্পন্দিত হইতে না পাইয়া স্বরূপভাবে প্রকাশিত হয়। চিত্তবৃত্তি রোধের সাক্ষাৎসাধনই নির্ব্বিকল্প (বা অসম্প্রজ্ঞাত) সমাধি।* যে সাধক প্রথম হইতেই (অন্য সাধন না করিয়া) এই নির্ব্বিকল্প-সমাধি-সাধনে সক্ষম হন, তিনিই লয়যোগী। এরূপ সাধক অতীব বিরল। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সুপ্রসিদ্ধ শিষ্য 'হস্তামলক' প্রকৃত লয়-যোগী। তিনি প্রথম হইতেই একেবারে নির্ব্বিকল্প সমাধি অভ্যাসে সক্ষম হইয়াছিলেন।

লয়যোগের নিম্নাবস্থাঃ— যিনি (সাক্ষাৎ) নির্ব্বিকল্প-সমাধি অভ্যাস করিতে সক্ষম, অথচ শরীর-ধারণাদির জন্য যে প্রতিবন্ধক আসিয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্য বাধা প্রাপ্ত, তিনি প্রথমে ত্রিশক্তির মধ্যে "অধঃশক্তির দ্বারা ঊর্দ্ধ শক্তি-নিপাতন-পূর্ব্বক মধ্যশক্তি উত্তেজিত করা রূপ" ক্রিয়ার অভ্যাস এবং নবচক্রে শ্রীগুরূপদেশ অনুসারে মনোলয় করিবেন। ইহাই লয়-যোগের নিম্নাবস্থা। ইহা দ্বারা সমস্ত প্রতিবন্ধক দূর হইলে সাক্ষাৎ লয় যোগ করিতে সক্ষম হইবেন। সর্ব্বোচ্চ এবং পূর্ব্বজন্মের কোনও কারণ বশতঃ সমাধিভ্রষ্ট সাধকই লয়-যোগের সাধক এবং লয়-যোগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

[এসম্বন্ধে সবিশেষতত্ত্ব গুরুবক্ত্রগম্য।]

(২) জ্ঞানযোগ (বৈদান্তিক):—লয়-যোগে অনধিকারীর পক্ষে জ্ঞানযোগ। সাক্ষাৎ জ্ঞানের (বিচার-রূপ) সাধনা দ্বারা চিত্তবৃত্তি-নিরোধ করিয়া যে যোগ (বা নির্ব্বাণ) লাভ

* সমাধির কথা পরে বিশেষ করিয়া বলা যাইবে।

হয়, তাহার নাম জ্ঞানযোগ। একেবারে যে সাধক নির্ব্বিকল্প-সমাধি অভ্যাস করিতে না পারিবেন, তিনি, প্রথমে বিচার-রূপ সাধনা অবলম্বন করিয়া তাহাতে পরিপক্ক হইলে, তখন নির্ব্বিকল্প সমাধি অভ্যাসের অধিকারী হইবেন। নির্ব্বিকল্প-সমাধি-আরোহণেচ্ছুর বিচার—সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনা। অনেকে ভাবিতে পারেন—তবে আর কি? যোগের সুকঠিন সাধনার আর প্রয়োজন নাই। বিচারই আমাদের অবলম্বনীয়। তাঁহারা কিন্তু অত্যন্ত ভ্রান্ত। বিচার অত্যন্ত কঠিন সাধনা। জ্ঞান-যোগে বিচারে নিষ্পন্ন হয়—"দেহ কিছুই নহে, উহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই।" এই বিচার কি সহজ? যে সাধক এইরূপ বিচার-সম্পন্ন, তাঁহার শরীর যদি শস্ত্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করা যায়, তাহা হইলেও তিনি তাহাতে ব্যথা অনুভব করেন না! আর, তোমার আমার কি সেরূপ বিচার থাকে? পাণ্ডিত্যের বেলায় এইরূপ বিচার চলিতে পারে, কিন্তু কার্য্যের বেলায় তাহা কোথায় চলিয়া যায়—ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ! প্রাণ-সংরোধাদি, বিচার অপেক্ষা অনেক সহজ। জ্ঞানযোগের দুই অংশ যথা,—(১) সাংখ্যযোগ (২) নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ।

সাংখ্যযোগঃ—সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ-পূর্ব্বক বিচাররূপ সাধনা অবলম্বন করিতে হইবে। 'বিচার'রূপ সাধনার সবিশেষ-তত্ত্ব গুরুবক্ত্রগম্য তবে, শ্রীভগবান্ শ্রীগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগের কয়েকটা শ্লোকে এই বিচার-প্রণালীর আংশিক বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭।১৮।২০।২৯ শ্লোক এবং পঞ্চম অধ্যায়ের সন্ন্যাসযোগের ১৩,১৪। ১৫।১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। [এই শ্লোক কয়টার ব্যাখ্যা জ্ঞানযোগ অবলম্বনে করিতে হইবে।] বিচারে পরিপক্ক হইলে, শ্রীগুরূপদেশ অনুসারে 'শ্রবণ' ও 'মনন' ক্রিয়া অভ্যাস করিবে। সাধনের এই অবস্থার নাম 'বিচারণা'। ইহাতে পরিপক্ক হইলে 'নিদিধ্যাসন' ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। শ্রীভগবান্ গীতোপনিষদে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগে কয়েকটা শ্লোকে নিদিধ্যাসনানুকূল অনুষ্ঠান বর্ণন করিয়াছেন। [৬ অঃ—১৪।১৯ শ্লোক ও ২৪।২৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।] সাধকের এই অবস্থার নাম তনুমানসা। নিদিধ্যাসনে পরিপক্ক হইলে, তবে নির্ব্বিকল্প সমাধি অভ্যাসে সক্ষম হইবেন। এই নির্ব্বিকল্প-সমাধির প্রথমাবস্থায় শ্রীগুরুমুখে মহাবাক্য-বিচার শুনিতে হয়। মহাবাক্যার্থ শ্রবণ করিলে জীবব্রহ্মের একত্ব-বোধ, অখণ্ড আত্মার স্বরূপানুভূতি এবং কৈবল্য মুক্তিলাভ অতি সহজ হয়। মহাবাক্য চারটা, যথা—(১) তত্ত্বমসি (২) অয়মাত্মা ব্রহ্ম (৩) অহং ব্রহ্মাস্মি (৪) 'প্রজ্ঞানমানন্দ' ব্রহ্ম। ভাগত্যাগ লক্ষণা-দ্বারা (জীবব্রহ্মের একত্ব লক্ষ্য) মহাবাক্য-বিচার করিতে হয়। মহাবাক্য-বিচারে নির্ব্বিকল্প সমাধি স্থায়ী হয়। ইহাই সাংখ্যযোগ—ইহাই জ্ঞানযোগের উচ্চাবস্থা। একেবারেই সাংখ্যযোগ গ্রহণে অক্ষম হইলে, জ্ঞানযোগের নিম্নাবস্থা নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ—গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ গীতোপনিষদে বিশেষ করিয়া ইহার কথা বলিয়াছেন। জ্ঞান-যোগে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-সাধনার অবস্থার নাম 'শুভেচ্ছা'। এই জ্ঞানযোগে সাধনের সাতটা অবস্থা আছে; তাহাকে সপ্তজ্ঞানভূমিকা বলে। এই সপ্তজ্ঞানভূমিকার মধ্যেই নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ,

বিচার, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, মহাবাক্য-বিচার, নির্ব্বিকল্প-সমাধি অভ্যাস করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত জ্ঞানযোগীর আরও সাধন আছে, যথা যম, নিয়ম, ত্যাগ, মৌন, দেশ, কাল, আসন, মূলবন্ধ দেহসাম্য, দৃক্‌স্থিতি, প্রাণসংযম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান। সপ্তজ্ঞান-ভূমিকা এবং জ্ঞানযোগের সমস্ত সাধনার কথা পরে বিশেষ করিয়া বলা যাইবে। [এ সম্বন্ধে সবিশেষ তত্ত্ব গুরুবক্ত্রগম্য।]

(৩) রাজযোগ (বৈদান্তিক:):—যে সাধক জ্ঞান যোগ সাধনে অক্ষম, তিনি রাজযোগ সাধন করিবেন। মানসিক কৌশল অভ্যাস দ্বারা ইচ্ছাশক্তির দার্ঢ্য সাধন পূর্ব্বক চিত্ত-বৃত্তিরোধ করিয়া যে যোগ (বা নির্ব্বাণ) লাভ করা যায়, তাহার নাম রাজযোগ। রাজযোগ-প্রণালী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে আত্ম-জ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান বিবৃত হইয়াছে; দ্বিতীয়ে আত্মসাক্ষাৎকার ও তদ্দ্বারা জীবাত্মার পরমাত্মভাবে পরিণত হওয়ার কৌশল বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথমভাগ—তিন প্রকরণে বিভক্ত; যথা—

(১) দৃষ্টান্তের দ্বারা বিবৃত করণ।

(২) পরমাত্মা কিরূপে জীবাত্মরূপে পরিণত হইলেন, তাহার বিবরণ।

(৩) জীবাত্মা কিরূপে দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন, তাহার বিবয়।

পরমাত্মার দুইভাব রাজযোগ ব্যক্ত করেন। (১) নিষ্ক্রিয়-ভাব বা নিবৃত্তি-ভাব (২) প্রবৃত্তি-ভাব। ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে তিনটী নাড়ী অবতরণ করিয়া লিঙ্গমূলে কুণ্ডলীতে সংযোজিত হইয়াছে। এই অংশের নাম "সুষুম্না-যন্ত্র।" পরে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ব্রহ্মরন্ধ্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই অংশের নাম "কুম্ভক"-যন্ত্র। সুষুম্না যন্ত্রে প্রবৃত্তিভাব ও দ্বাদশ বৃত্তির উদয় বিদ্যমান। কুম্ভক যন্ত্রে নিবৃত্তি-ভাব এবং দ্বাদশ বৃত্তি হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মরূপে অবস্থানের ক্রিয়া-কৌশলের উপদেশ আছে। আত্মার নিষ্ক্রিয় ভাব হইতে যে দ্বাদশবৃত্তি বা আভাসের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাদের নাম যথা—

(১) চিৎ বা জ্ঞানতন্মাত্রের স্বয়ম্প্রকাশ।

(২) বিজ্ঞান বা বুদ্ধি-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(৩) জ্ঞান-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(৪) প্রজ্ঞা তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(৫) স্মৃতি-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(৬) চিত্ত-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(৭) বাসনা ও কল্পনা-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(৮) বিবেচনা-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(৯) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বা বিচারবৃত্তি-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(১০) রিপু ও ভাব-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(১১) জ্ঞানেন্দ্রিয়-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(১২) প্রাকৃতিক এবং ভৌতিক তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

এই দ্বাদশ বৃত্তি সম্বন্ধে নিগূঢ় তত্ত্ব ও তাহার সাধন-প্রণালী গুরুবক্ত্রগম্য। রাজযোগ মধ্যম। একেবারেই কিছু সমস্ত চিত্তবৃত্তি রোধ করিয়া নির্ব্বিকল্প-সমাধি করা সহজ হয় না, তজ্জন্য প্রথমে ক্রম অনুসারে এই দ্বাদশবৃত্তির লয় করিতে হইবে। ঐ বৃত্তিগুলির লয় হইলে পরে 'আপনাকে শূন্য ভাবনা'রূপ ক্রিয়া দ্বারা সর্ব্ব-বৃত্তি-রোধ-পূর্ব্বক নির্ব্বিকল্প-সমাধি করিতে হইবে। এই দ্বাদশ বৃত্তির সম্পূর্ণ ভাবে লয়-সাধন-ক্ষমতা-প্রাপ্তির জন্য প্রত্যাহার-সাধন করিতে হইবে।

প্রত্যাহার-সাধন হইতে রাজযোগের প্রকৃত ক্রিয়া আরম্ভ। প্রাণায়াম, রাজযোগের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় নহে। তবে প্রত্যাহার সাধনে একান্ত অক্ষম হইলে, রাজযোগ-প্রণালী অনুসারে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়। প্রাণায়ামের পর প্রত্যাহার, পরে ধ্যান, তৎপর সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি। উহার পরিপাকাবস্থায় নির্ব্বিকল্প-সমাধির পূর্ব্বেই পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ বৃত্তির লয় করিতে হইবে। এই নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে নির্ব্বাণ বা ঐশিতত্ত্বের রহস্য "আপনাকে শূন্য জ্ঞান করিবে।" ইহা রাজযোগের বিশেষ উপদেশ। [সবিশেষ তত্ত্ব গুরুবক্ত্রগম্য]

(৪) হঠযোগঃ—রাজযোগে অনধিকারী ব্যক্তির পক্ষে হঠযোগ ব্যবস্থা। যিনি মনের উপর বিশেষ ভাবে আধিপত্য করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত রাজযোগের অধিকারী, আর যে মানব দেহসর্ব্বস্ব, মনের উপর যাহার আধিপত্য নাই বা যে আধিপত্য করিতে পারে না,—সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মবিচারের সহিত হঠযোগ সাধন করিবে। সেইজন্য হঠযোগ অধম। শারীরিক কৌশলাদির অভ্যাস দ্বারা ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা সাধনপূর্ব্বক নির্ব্বীজ সমাধি-দ্বারা চিত্তবৃত্তি-রোধ করিয়া যে যোগ (বা নির্ব্বাণ) লাভ করা যায়, তাহাকে হঠযোগ বলে।

সমস্ত চিত্তবৃত্তি একেবারে রুদ্ধ করা যায় না। সেইজন্য অগ্রে বিশেষ বিশেষ বৃত্তিগুলি জয় করিতে হইবে। এই বিশেষ বিশেষ বৃত্তিগুলি নবচক্রের এক এক চক্রে অবস্থিত। তাহাদিগের নাম যথা ;—

(১) মূলাধার (পৃথ্বীতত্ত্ব) গুণ—গন্ধ, জ্ঞানেন্দ্রিয়—নাসিকা, কর্ম্মেন্দ্রিয়—উপস্থ, সদ্‌গন্ধাদি অনুভব, এবং রমণাদি-জনিত মনের মুগ্ধতা—এই সমস্ত বৃত্তি এই চক্রোদ্ভূত।

(২) স্বাধিষ্ঠান (জলতত্ত্ব):—গুণ—রস, জ্ঞানেন্দ্রিয়—জিহ্বা, কর্ম্মেন্দ্রিয় পায়ু, মধুরাদি নানাবিধ রসাস্বাদন, এবং ত্যাগজনিত মনের মুগ্ধতা—এই সমস্ত বৃত্তি। আরও এই পদ্মের ছয় দল। এই ছয় দলে,—প্রশ্রয়, অবিশ্বাস, অবজ্ঞা, মূর্চ্ছা, সর্ব্বনাশ, ক্রূরতা এই ছয় বৃত্তি আছে।

(৩) মণিপুর (তেজস্তত্ত্ব):—গুণ—রূপ, জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ম্মেন্দ্রিয়—পাদ, সুন্দরাসুন্দর দর্শন, এবং গমনাগমন জনিত মনের মুগ্ধতা—এই সমস্ত বৃত্তি। এই দশ দলে—লজ্জা, পিশুনতা, ঈর্ষা, তৃষ্ণা, সুষুপ্তি, বিষাদ, কষায়, মোহ, ঘৃণা, ভয়—এই দশ বৃত্তি আছে।

(৪) অনাহত (বায়ুতত্ত্ব):—গুণ স্পর্শ, জ্ঞানেন্দ্রিয়—ত্বক্, কর্ম্মেন্দ্রিয়—হস্ত, সুকোমল ও কঠিন স্পর্শন, এবং গ্রহণ-জনিত মনের মুগ্ধতা-এই সমস্ত বৃত্তি। এই পদ্মের দ্বাদশ দল। এই দ্বাদশ দলে—আশা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিফলতা, বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, কপটতা, বিতর্ক এই দ্বাদশ বৃত্তি আছে।

(৫) বিশুদ্ধ (আকাশতত্ত্ব):—গুণ-শব্দ, জ্ঞানেন্দ্রিয়—কর্ণ, কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্ সুমধুর—বাক্য ও শব্দাদি-শ্রবণ, এবং মনোভাবের অভিব্যক্তি, পরস্পর আলাপাদি-জনিত মনের মুগ্ধতা-এই সমস্ত বৃত্তি। আরও চক্রে বিশেষ ক্রিয়া আছে। মানুষ যে সর্ব্বদা সদসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহাতে সে বদ্ধ হইতেছে এবং তাহা হইতে অসদ্‌বৃত্তি উদ্ভাসিত হইতেছে। হঠযোগ বলেন—এই পদ্মে সদসৎ

কর্ম্মের নিয়োজিকা এক প্রকার শক্তি আছেন, তাঁহার নাম সদাশিব। সাধন দ্বারা এই শক্তি জয় করিলে, তবে, সদসৎ-কর্ম্মের প্রবৃত্তির হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করা যাইবে।

(৬) ললনা (গুপ্তচক্র):—ইহার দ্বাদশ দল; দ্বাদশদলে—শ্রদ্ধা, সন্তোষ, স্নেহ, দম, মান, অপরাধ, শোক, খেদ, অরতি, সম্ভ্রম, উর্ম্মি ও শুদ্ধতা এই দ্বাদশটী বৃত্তি আছে।

(৭) আজ্ঞাচক্র (জ্ঞানপদ্ম):—এই চক্রকে রুদ্রগ্রন্থি বলে, এই চক্র ভেদ করিতে না পারিলে কুলকুণ্ডলিনী সহস্রারে যাইতে পারে না। সেইজন্য সাধককে এই চক্র ভেদ করিতে হয়। আরও এই পদ্মে আত্মজ্যোতি-দর্শন হয়। এই আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্তই ত্রিগুণের স্থান। আজ্ঞাচক্র হইতে বিশুদ্ধ পর্য্যন্ত সত্ত্ব-গুণ, বিশুদ্ধ হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত রজোগুণ, এবং তন্নিম্নে তমোগুণের স্থান। এই চক্রের উপর উঠিতে পারিলেই ত্রিগুণের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া, ত্রিগুণাতীত হইতে পারা যায়।

(৮) মনশ্চক্র (গুপ্তচক্র):—এই চক্রে মন অবস্থিত। ইহার ছয়টি দল। ইহার এক এক দলে—শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, আঘ্রাণোপলব্ধি, রসোপযোগ ও স্বপ্ন এই কয়েকটী বৃত্তি আছে। এই চক্রের কোন দল শ্বেত, কোন দল রক্ত ইত্যাদি। ইহার কারণ, মনে যখন যে গুণ প্রবল হয়, তখন দলগুলি সেই বর্ণে রঞ্জিত হয়। কোন গুণের কোন বর্ণ, তাহা গুরুবক্ত্রগম্য।

(৯) সোমচক্র (গুপ্তচক্র):—ইহার ষোড়শ দল। এক এক দলে কৃপা, মৃদুতা, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, ধৃতি, সম্পৎ, হাস্য, রোমাঞ্চ, বিনয়, ধ্যান, সুস্থিরতা, গাম্ভীর্য্য, উদ্যম, অক্ষোভ, ঔদার্য্য, একাগ্রতা এই কয়েকটী বৃত্তি আছে।

সাধক গুরূপদেশ অনুসারে পতিচক্রে ক্রম অনুসারে প্রাণবায়ু উত্তোলন করিয়া এক এক চক্রে গুরূপদিষ্ট-সময়ানুসারে উক্ত প্রাণবায়ুকে বিশ্রাম করাইয়া ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধে উঠাইতে থাকিবেন। ইহাতে ক্রমে ক্রমে এক এক দল ও সেই সেই দলের বৃত্তিগুলি রুদ্ধ হইবে। এই নবচক্রস্থিত বৃত্তি গুলি জয় করিতে পারিলেই তবে সর্ব্ব-বৃত্তি-রোধ করিবার ক্ষমতা জন্মিবে। তবে এই চক্রে প্রাণবায়ু উত্তোলন পূর্ব্বক যে ক্রিয়া, তাহা অতীব কঠিন ব্যাপার। ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধন আয়ত্ত না হইলে একার্য হওয়া সম্ভব নহে। সেইজন্য সর্ব্ব-প্রথমে ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা শরীর শোধন করিতে হইবে। ষট্‌কর্ম্ম যথা—ধৌতি, নেতি, নৌলিকী, বস্তি, ত্রাটক ও কপালভাতি। (গুরুবক্ত্রগম্য)। পরে আসনসিদ্ধি ও নাড়ী-শোধন করিয়া প্রাণায়াম আরম্ভ করিতে হইবে। প্রাণায়াম অভ্যাস জন্য 'মুদ্রা' অভ্যাস করিতে হয়। কারণ (আসনবদ্ধ হইয়া) মুদ্রা-যোগে প্রাণায়াম করিলে অতি-শীঘ্র প্রাণায়াম সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রাণা-য়ামের প্রথম অবস্থাতে দশবিধ নাদ ক্রমে শ্রবণগোচর হয়। দশবিধ নাদ যথা— (১) "চিনিনাদ"—ইহাতে ক্লান্তি বোধ হয়। (২) "চিঞ্চিনিনাদ"—ইহাতে শরীরকম্প, (৩) "ঘণ্টানাদ"—ইহাতে দুর্ব্বলতা, (৪র্থ)- "শঙ্খনাদ"—ইহাতে শিরঃকম্প, (৫ম) "তন্ত্রি-নাদ"—ইহাতে অমৃতস্রাবের অনুভব (৬ষ্ঠ) "তালনাদ"—ইহাতে অমৃতপান (৭ম) "বেণুনাদ"—ইহাতে বিজ্ঞান অর্থাৎ

বিশিষ্ট সূক্ষ্মজ্ঞানের প্রকাশ (৮) "মৃদঙ্গনাদ" —ইহাতে বাক্যসিদ্ধি (৯ম) "ভেরী-নাদ" ইহাতে অন্তর্ধানশক্তি ও দিব্যদৃষ্টি (১০ম) "মেঘনাদ"—ইহাতে সাক্ষাৎ অনাদি ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া যায়। প্রাণায়ামের দ্বিতীয় অবস্থাতে ভেক-গতি হয়। প্রাণায়ামের তৃতীয় অবস্থাতে ভূমিত্যাগ। এই সময়ে সমস্ত পার্থিব আকর্ষণের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ভূমিত্যাগের পরই আত্মজ্যোতি দর্শন হয়। প্রাণায়াম-ক্রিয়া শেষ হওয়ার মধ্যেই নবচক্রে প্রাণবায়ু চালনা করা যাইতে পারে। যাহা হউক্ প্রাণায়াম-প্রত্যাহার সাধন করিতে হইবে। ১০মিনিট ২৮ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত কুম্ভক করিবার শক্তি হইলে প্রত্যাহার সিদ্ধ হয়। পরে ধারণার অধিকারী হওয়া যায়। ২১ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ড কুম্ভক করিবার শক্তি জন্মিলে ধারণা অভ্যাস করা যায়। পরে ধ্যান অভ্যাস করিতে হয়। ধ্যানকালে ৪৩ মিনিট ১২ সেকেণ্ড কুম্ভক করিতে হয়। ধ্যান তিন প্রকার যথা— ১ম সমিতাধ্যান, ২য় সানন্দধ্যান, ৩য় প্রকৃতি-লয় ধ্যান। সমিতাধ্যান,—কেবল "ওঁ" অথবা কিঞ্চিৎ তমোগুণ-মিশ্রিত সাংখ্যশাস্ত্রের শেষ পঞ্চতত্ত্বের কোন একটা তত্ত্বের ধ্যান করার নাম সমিতাধ্যান। এ অবস্থায় আপন শরীরের অস্তিত্ব অনুভব হয় না। সানন্দধ্যানঃ—অহং-বোধ হ্রাস হইয়া মন যখন নিজ সূক্ষ্ম কারণে বিলীন হয়, তখন তাহাকে সানন্দ ধ্যান বলে। প্রকৃতিলয় ধ্যানঃ—শুদ্ধ সত্ত্বগুণ বা ঈশ্বরে 'অহং' সহিত ধ্যান করিলে, তাহার নাম প্রকৃতি-লয় ধ্যান। এ অবস্থার সমস্ত পদার্থই স্বাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার ধ্যানের মধ্যে 'অহং ভাবে'র কিছু কিছু বোধ থাকিয়া যায়, কিন্তু যখন 'অহং বুদ্ধি' সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়, তখনই সমাধির সূত্রপাত হয়। ১ ঘণ্টা ২৬ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড বা ততোধিক কাল কুম্ভক করিবার শক্তি জন্মিলে সমাধি-সিদ্ধি হয়। সমাধি দুই প্রকার; যথা— (১) সবীজ (২) নির্ব্বীজ। সবীজ সমাধিতে পূর্ব্বসংস্কার কেবল বিলীন থাকে মাত্র, কিন্তু বিনষ্ট হয় না, এজন্য সবীজ-সমাধিমান্ পুরুষকে ঐ সমস্ত সংস্কার রাশি পুনঃ জাগ্রত দশায় আনিতে পারে, এবং সে সমাধি আপনা আপনি ভঙ্গ হয়; কিন্তু নির্ব্বীজ সমাধিতে পূর্ব্ব-সংস্কার সমস্তই নষ্ট হয়, এজন্য সমাধিমান্ পুরুষের সমাধিভঙ্গ হয় না। এই নির্ব্বীজ-সমাধিকালে মনের সম্পূর্ণ বিনাশ হয়; তখন আত্মা ভিন্ন আর কোন কিছুরই বিকাশ থাকে না। এই সময়েই চিরতরে সমস্ত চিত্তবৃত্তি একেবারে রুদ্ধ হয়। শরীর ধারণ পর্য্যন্ত এই অবস্থায় স্থিতির নামই ব্রাহ্মীস্থিতি। পরে এই অবস্থায় থাকিয়া শরীর ত্যাগে—'নির্ব্বাণ' লাভ হয়।

(সবিশেষ তত্ত্ব গুরুবক্ত্রগম্য)

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী।

অসবর্ণ-বিবাহ কি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ? *

(আলোচনার্থ প্রশ্ন।)

অসবর্ণবিবাহ লইয়া বর্ত্তমানে প্রবল আন্দোলন চলিতেছে। একদল ইহার প্রতি

* প্রশ্নকর্ত্তা, সন্দেহ-ভঞ্জনার্থে এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। হিন্দুপত্রিকার শাস্ত্রজ্ঞ পাঠকবর্গ

খড়্গহস্ত, আর একদল ইহার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত,—একপক্ষ ইহাতে বাধা দিতে চাহেন, অপরপক্ষ ইহার 'স্বাগত' প্রচার করেন। জগতের প্রথাই এই, সকলে সব সমর্থন করে না, করিতেও পারে না। শাস্ত্রজ্ঞগণ, ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজ ও সমাজের হিতাকাঙ্খী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া উভয়পক্ষের যুক্তিজাল ভেদ করিয়া স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হউন্। ইহাই আমরা চাই। কেবল আন্দোলন সহায়তা করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

যাঁহারা অসবর্ণবিবাহ অন্যায় বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ মনে করেন, উহার ফলে হিন্দুত্ব নষ্ট হইবে, হিন্দুসমাজ ভাঙ্গিয়া যাইবে—ভাবেন, তাঁহাদের প্রতি অসবর্ণবিবাহ-সমর্থনকারিগণের বক্তব্য এই যে, "অসবর্ণবিবাহের কথা শাস্ত্রে বহুস্থানে দেখা যায়—

ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে—শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সাচ স্বাচ বিশঃস্মৃতে, তে চ স্বাচৈব রাজ্ঞস্ত তাশ্চ স্বাচাগ্রজন্মনঃ" শূদ্র, শূদ্র কন্যা বিবাহ করিবে, ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্য, বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রকন্যা বিবাহ করিতে পারে—ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণকন্যা, বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রকন্যা বিবাহ করিতে পারে। তবে ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রকন্যা-বিবাহ প্রশস্ত নহে, শূদ্রকন্যা ব্রাহ্মণের স্ত্রী হইলে, সে সহধর্ম্মিণী হইবে না, রতিবর্দ্ধিনী মাত্র হইবে, এরূপ কথাও যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন। একই ব্যক্তির যদি ভিন্ন বর্ণের ২। ৩ স্ত্রী থাকেন, তবে বর্ণ-শ্রেষ্ঠতা অনুসারে তাঁহাদের সম্মান হইবে, এরূপ উল্লেখও শাস্ত্রে আছে। স্বামীর সবর্ণা স্ত্রী ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা করিবে, অন্যবর্ণা স্ত্রী সবর্ণার এই প্রাধান্যে আপত্তি করিতে পারিবে না, ইহাও ধর্ম্মশাস্ত্রেই দেখা যায়। এগুলি কি অস-বর্ণবিবাহের প্রমাণ নয়? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের কন্যা বিবাহ করিলে, অনুলোম বিবাহ হয়, কিন্তু ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করে, তবে সেই বিবাহ প্রতিলোম-বিবাহ। প্রতিলোম-বিবাহ শাস্ত্রে নিন্দিত। মহাভারত প্রভৃতি প্রামাণিক ইতিহাস গ্রন্থে অনুলোম-বিবাহের দৃষ্টান্ত ত আছেই, অধিকন্তু নিন্দিত প্রতিলোম বিবাহের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। রাজা যযাতি, ব্রাহ্মণদুহিতা দেবযানির পাণি-গ্রহণ করেন, ইহাত সকলেই জানেন! এই বিবাহ প্রতিলোম-বিবাহ। ক্ষত্রিয় রাজা শান্তনু, ধীবর-কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেন, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ অক্ষমালা অরুন্ধতীর পাণিগ্রহণ করেন। ঋষি মন্দপাল হীন-জাতীয়া সারঙ্গীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ সৌভরি, ক্ষত্রিয়-রাজার কতিপয় কন্যা বিবাহ করেন—অনুলোম বিবাহের এইসব উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের সংবাদ ত সকলেই রাখেন! অসবর্ণবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ ত নহেই, বরঞ্চ সমধিক শাস্ত্রসম্মত। অসবর্ণবিবাহে আর্য্য-সমাজ ভাঙ্গে নাই, এখন ভাঙ্গিবে কেন? স্বাধীন হিন্দু রাজ্য নেপালে, অদ্যাপি হিন্দুর মধ্যে অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলিত আছে। তথাকার হিন্দুসমাজে অসবর্ণবিবাহের জন্য কোনও অনিষ্ট ঘটে নাই ত! অসবর্ণবিবাহ আমাদের মধ্যে বহুদিন না থাকায় আমরা উহাকে আশঙ্কার চ'খে দেখি, সে কেবল অনভ্যাসদোষে! বস্তুতঃ উহাতে অনিষ্টশঙ্কা নাই, উহা দ্বারা সমাজের প্রসার হইবে এবং কন্যাদায় সমস্যার সুমীমাংসা হইবে।"

অথবা যে কোনও যোগ্য ব্যক্তি নাতিবৃহৎ প্রবন্ধে সংশয়নিরাসে প্রয়াস পাইলে সাদরে ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। হিঃ পঃ সঃ।

অসবর্ণবিবাহের বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন, "ঐ সকল শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত বা প্রমাণের দ্বারা বর্ত্তমানকালে অসবর্ণবিবাহ সঙ্গত বলিয়া বুঝা যায় না! প্রাচীনকালে ঐরূপ বিবাহের ফলে অনুলোমজ-প্রতিলোমজ সঙ্কীর্ণ-জাতিসমূহের উৎপত্তি হইয়াছিল! তৎপরে প্রয়োজন না থাকায় শাস্ত্রকারগণ উহার গতিরোধ করিয়াছিলেন! আদিপুরাণে কতকগুলি কার্য্য কলিকালে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে! ঐস্থানে অশ্বমেধ, গোপশুবধ, নিয়োগধর্ম্মে পুত্রোৎপাদন প্রভৃতির নিষেধ করা হইয়াছে! উহার মধ্যেই 'কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ' আছে, অর্থাৎ অসবর্ণা কন্যাকে বিবাহ করাও দ্বিজগণের পক্ষে অকর্ত্তব্য;—একথা ঐস্থানেই বলা হইয়াছে! সুতরাং নেপালের শূদ্র ও শূদ্রবৎ পতিত ক্ষত্রিয়জাতির মধ্যে অসবর্ণবিবাহ থাকিলেও শিক্ষিত সদাচার ভারতীয় হিন্দু-ত্রৈবার্ণিক সমাজে উহা থাকিতে পারে না! এখন আর অনুলোমজ-প্রতিলোমজ সঙ্কীর্ণ-জাতির আবির্ভাবের প্রয়োজন নাই, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলি নিরর্থক! আর্যসমাজে তপস্যার প্রভাবে সকল সমস্যার মীমাংসা হইত! এখন সে তপস্যা কোথায়? অসবর্ণ-বিবাহ ত অধুনা শাস্ত্রসিদ্ধই নহে, পক্ষান্তরে যে সব কার্য্য শাস্ত্রসিদ্ধ, তাহার ব্যবস্থা করিলেই কন্যাদায়সমস্যার সুমীমাংসা হয়। ব্রাহ্মণের রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক, মহারাষ্ট্রীয়, পঞ্চনদস্থ—প্রভৃতি শাখার মধ্যে আদান প্রদান শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে কায়স্থের বঙ্গজ, দক্ষিণরাঢ়ীয়, উত্তররাঢ়ীয় প্রভৃতি শাখার মধ্যে দানাদান অশাস্ত্রীয় নয়! এইসব শাস্ত্রসম্মত সংস্কার প্রচার করিলেই সহজে যে গোল চুকিয়া যায়, তাহার জন্য কলিতে অবৈধ অসবর্ণবিবাহের আয়োজন কেন? অসবর্ণবিবাহ সঙ্করকারক ও পাতিত্যজনক!"

অসবর্ণ বিবাহের সমর্থকগণ বলেন—"ধর্ম্ম-শাস্ত্রে—স্মৃতি-সংহিতায় অসবর্ণবিবাহের নিষেধ নাই, মহাপুরাণেও নাই! আদিপুরাণের প্রমাণ স্মৃতিবিরুদ্ধ বিধায় অপ্রমাণ! শাস্ত্রে আছে—শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে। তত্র শ্রৌতং প্রমাণং স্যাৎ দ্বয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা। শ্রুতির সহিত স্মৃতিপুরাণের বিরোধ হইলে শ্রুতিপ্রমাণ বলবৎ হয়, স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে বিরোধ হইলে, স্মৃতি প্রমাণ বলবৎ হয়! আদিপুরাণ অপেক্ষা স্মৃতিশাস্ত্রই প্রবল, সুতরাং অসবর্ণ-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত। অসবর্ণবিবাহ দ্বারা হিন্দুসমাজের ধ্বংসোন্মুখতার প্রতীকার হইতে পারে। একই জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে দানাদান প্রচলিত হইলে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যাঁহারা হিন্দুজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহারা অসবর্ণবিবাহ সমর্থন না করিয়া পারিবেন না। যাহাতে হিন্দুজাতি ধ্বংসকবল হইতে রক্ষা পায়, সেই হিতকর অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত হওয়া আবশ্যক।"

উভয়পক্ষের বক্তব্য সংক্ষেপে বলা হইল। এখন সমাজের হিতকাঙ্খী মনীষিবর্গকে অসবর্ণবিবাহের উপকারিতা এবং অপকারিতার আলোচনা ও অবধারণ করিতে অনুরোধ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম। ইতি।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সামাজিক।

গোময়ের পবিত্রতা ও উপকারিতা।

(১)

মঙ্গলময়ের মঙ্গল-বিধানাবলী সম্বন্ধে স্থির-চিত্তে চিন্তা করিলে ধারণা হয় যে, স্থূলবুদ্ধি মানবগণ যে সকল পদার্থকে অতিতুচ্ছ ও ঘৃণার্হ বলিয়া মনে করেন, শিবদাতা ধাতা, সেই সব বস্তুতেই মানবের মঙ্গলকরী শক্তি প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে গোজাতির উপর দেবত্ব আরোপকারী, আর্য্যবংশধরগণের মধ্যে গোপালন সম্বন্ধে যেরূপ অনাদর দৃষ্ট হয়, অন্যদেশস্থ গোখাদক জাতি সমূহের মধ্যেও সেরূপ পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু এই গোকুল আমাদের কত উপকারী—তাহা বর্ণনাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অমৃতোপম গোদুগ্ধ ও তজ্জাত ভক্ষ্য-নিচয় কিম্বা গোজাতির শ্রম-জাত শস্য সম্পদের কথা ত দূরে, এমন কি, গোময় অর্থাৎ গোবিষ্ঠা পর্য্যন্তও যে আমাদের স্বাস্থ্যসাধক ও পবিত্রতাদায়ক, তাহাতে সংশয় নাই। যাঁহারা ফলমূলাশী হইয়াও জ্ঞান-বিজ্ঞান-রাজ্যের সম্রাট্ ছিলেন, যাঁহারা কুটীরকোণে বসিয়া সমগ্র সংসারের জ্ঞাতব্য-বিষয়চয় করামলকবৎ দেখিতেন, সেই আর্য্য ঋষিগণ-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্র, গোময়েরও মহিমা প্রচার করিয়াছে।

স্মৃতিশাস্ত্রে দেখা যায়, বিধানসপ্তমী-ব্রতে ফাল্গুনমাসে যবমাত্র গোময় ভক্ষণ বিধেয়। ইহাতে বোধহয় গোময় পবিত্র।

ঋষি জাবাল বলেন—

"কেশকীটাবপন্নঞ্চ স্ত্রীভিঃ স্পৃষ্টং তথৈবচ,
শ্বোদক্যাশূদ্রসংস্পৃষ্টং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি।"

অর্থাৎ কেশ ও কীটযুক্ত, শূদ্রা স্ত্রী কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট, কুকুর স্পৃষ্ট, ঋতুমতী ও শূদ্র-সংস্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিলে যে পাপ হয়, পঞ্চগব্য সেবনে তাহা বিদূরিত হয়। পঞ্চগব্যের মধ্যে গোময় আছে। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময়, গোমূত্র পঞ্চগব্য।

মহর্ষি হারীত বলেন—

"মৎস্যকণ্টকশম্বুক-শঙ্খশুক্তি-কপর্দ্দকান্,
পীত্বা নবোদকঞ্চৈব পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি।"

অর্থাৎ—মৎস্যের কণ্টক, শম্বুক, শঙ্খ, শুক্তি (ঝিনুক) কপর্দ্দক (কড়ি) ও নবোদক পান করিলে যে পাপ হয়, পঞ্চগব্য-সেবনে তাহার নাশ হয়।

অঙ্গিরা বলেন—

"যস্তু চাণ্ডাল-সংস্পৃষ্টং পিবেত্তোয়মকামতঃ।
সতু সান্তপনং কৃচ্ছ্রং চরেৎ শুদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥"

অর্থ যথা—যে ব্যক্তি অনিচ্ছাপূর্ব্বক চণ্ডাল-সংস্পৃষ্ট জল পান করে, সে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির জন্য কষ্ট সাধ্য সান্তপনব্রত আচরণ করিবে। সান্তপনব্রতে গোময় ভক্ষণ করিতে হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

"কুশোদকঞ্চ গোক্ষীরং দধিমূত্রং শকৃদ্ঘৃতম্।
প্রাশ্যাপরেহ্হ্যুপবসেৎ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরন্॥"

কুশোদক, গোদুগ্ধ, গব্য দধি, গোবিষ্ঠা ও গব্যঘৃত একত্র ভক্ষণ করিয়া পরদিবস উপবাস করিবে,—ইহার নাম সান্তপন। যে শ্রীনারায়ণ-শিলা গৃহে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, সর্ব্ব অশুভ বিনষ্ট হয়, সেই শ্রীনারায়ণ-শিলার অভিষেক কার্য্যে গোময় একটী প্রধান ও প্রথম প্রয়োজনীয় দ্রব্য। ইহা ছাড়াও বহুল কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া গোময়, দেশের পবিত্রতা ও স্বাস্থ্য প্রদান করিতেছে। শাস্ত্রে, যে কোন মাঙ্গলিক কার্য্য ও

দেবার্চ্চনাদির স্থান পবিত্র ও পরিষ্কৃত করিবার জন্য গোময়োপলেপনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। গৃহাদির দুর্গন্ধ নিবারণ ও পরিচ্ছন্নতা সাধন-জন্য গোময়ের—দৈনন্দিন বহুল ব্যবহার প্রচলিত আছে। সদ্যোগোময়োপলিপ্ত স্থান দর্শন করিলে মনে পবিত্রতা আসে। গোময়ের একটী আশ্চর্য্য গুণ এই যে, যে কোন আর্দ্রস্থান—যাহা একদিনেও শুষ্ক হওয়া কঠিন—সেইস্থান গোময়োপলিপ্ত হইলে, এক প্রহরের পূর্ব্বেই ভালরূপ শুষ্ক হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে গোময়ের পবিত্রতা জ্ঞাপক বহু প্রমাণ রহিয়াছে, যাহা উদ্ধৃত করিলে, বৃহদাকার গ্রন্থে পরিণত হয়, বাহুল্য-ভয়ে সে সকল পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা ঋষিগণের জ্ঞানগাম্ভীর্য্য ও অলৌকিক দৃষ্টিতে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা উদ্ধৃত কয়টী প্রমাণ দ্বারাই বুঝিতে পারিবেন যে, গোময় একটী পবিত্র দ্রব্য। আয়ুর্ব্বেদ, গোময়ের উপকারিতা বিষয়ে যাহা প্রচার করেন, তাহাও প্রণিধান-যোগ্য। প্রাচীন গ্রন্থ সুশ্রুতসংহিতার চিকিৎসিত স্থানে নবম অধ্যায়ে, কুষ্ঠচিকিৎসিতে 'মহানীল' নামক ঘৃতপাক-বিধানে উক্ত হইয়াছে; 'শকৃদ্রস দধিক্ষীরং মূত্রানাম্ পৃথগাঢ়কম্' ইত্যাদি। শকৃদ্রস শব্দে গোময়রসকে বুঝাইতেছে, যথা "শকৃদ্রসো গোময়রসঃ" ইতি "পরিভাষা-প্রদীপে"। উপরিলিখিত শ্লোকাংশের অর্থ এই যে, গোময়-রস ১৬ সের, দধি ১৬ যোল-সেরও দুগ্ধ যোলসের—একত্রিত এই সমস্ত দ্রব্য "মহানীল" নামক ঘৃতজ্বালে প্রয়োজনীয়। এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে গোময়-রসই প্রথমে কথিত হইয়াছে।

সুশ্রুতসংহিতার মহাকুষ্ঠ-চিকিৎসিতাভিধ দশমাধ্যায়ে আছে—"গোশকৃদ্ ভূতানাং বা যবানাং শক্তূন্ কারয়িত্বা পায়য়েৎ" গাভীকে ভরপেট্ যব খাওয়াইলে তাহার বিষ্ঠার সহিত যে অপরিপক্ব যব নিপতিত হইবে, তাহাদ্বারা শক্তু (ছাতু) প্রস্তুত করিয়া, ঔষধাদির ক্বাথসহ পান করাইলে রোগী নিরাময় হইবে। এই কুষ্ঠচিকিৎসিতে আরও দেখা যায়—"গোময়-মৃদাবলিপ্তমবকীর্য্যেন্ধনৈর্গোময়মিশ্রৈরাদীপয়েৎ যথাস্য দহ্যমানস্য রসঃ স্রবত্যধস্তাৎ"। ইত্যাদি। উদ্ধৃতাংশের অর্থ যথা—কলসকে গোময়-মিশ্র-মৃত্তিকা দ্বারা অবলিপ্ত করিয়া বৃক্ষের মূলদেশ ছেদন পূর্ব্বক মৃত্তিকার নিম্নে স্থাপিত করিবে, তৎপরে গোময়মিশ্র ইন্ধন (কাষ্ঠ) দ্বারা খদির-বৃক্ষটীর চারিদিকে সেইরূপে জ্বালাইয়া দিবে, যাহাতে বৃক্ষস্থ সমস্তরস বিগলিত হইয়া নিম্নস্থ কলসটীর মধ্যে নিপতিত হয়। ইহা কুষ্ঠের একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

কুষ্ঠরোগাধিকারে "সোমরাজী তৈল"-পাকে গোময়ের প্রয়োজন। ভৈষজ্যরত্নাবলীতে আছে—আকন্দ, শ্বেতকরবী, ছাতিমছাল ও গোময় ইত্যাদি দ্রব্য "সোমরাজী তৈলের" কল্ক—পাকে প্রয়োজনীয়। কুষ্ঠরোগোক্ত "মরীচ্যাদি তৈলে" গোময় প্রয়োজনীয়, প্রমাণ যথা—"শকৃদ্রসঃ বিশালা" ইত্যাদি "ভৈষজ্য-রত্নাবলী"। অর্থ যথা—গোময়-রস ও রাখালশসার রস ইত্যাদি দ্বারা তৈলপাক-বিধানমত কটু (সার্ষপ) তৈল পাক করিতে হইবে। "বৃহন্মরী-চ্যাদি তৈলে"ও গোময় প্রয়োজনীয়—প্রমাণ যথা—"মরিচং ত্রিবৃতা দন্তী ক্ষীরমার্কং শকৃদ্রসঃ" ইত্যাদি ভৈষজ্যরত্নাবলী। উদ্ধৃতাং-শের অর্থ যথা—গোলমরিচ, তেউড়ী, দন্তী, আকন্দের আটা ও গোময়রস ইত্যাদি দ্বারা তৈলপাক-বিধানে উক্ত তৈলটী পাক করিবে।

কন্দর্পসার তৈলেও গোময়ের প্রয়োজন। গোময়, আকন্দ ও সেঙ্গিগাছের পত্র ইত্যাদি দ্রব্য দ্বারা উক্ত তৈলটীর পাক করিতে হয়। এই সকল তৈলের উপকারিতার সীমা নাই, সুতরাং গোময়ের উপকারিতাও অসাধারণ।

বাতরক্তরোগ-চিকিৎসাতেও গোময় প্রয়োজনীয়; যথা,—

"শারিবেন্দ্বে সপ্তপর্ণী গোময়স্য রসস্তথা" ইত্যাদি—"মহারুদ্রগুড়ুচী তৈল"-পাক বিধানে "ভৈষজ্যরত্নাবলী"। সংস্কৃতাংশের অর্থ এই যে, অনন্তমূল, শ্যামালতা, ছাতিম্ছাল ও গোময়-রস ইত্যাদি দ্রব্য দ্বারা তৈল পাক করিবে। এই তৈলের উপকারিতা অসীম। কুষ্ঠরোগের ন্যায় নিন্দনীয়, যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি আর নাই। এই রোগের গোময় একটী প্রয়োজনীয় ভেষজ। শুষ্কগোময়কে করীষ বলে। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদি প্রস্তুত করিবার জন্য (লৌহাদি ধাতুকে ভেষজরূপে ব্যবহার করিতে) করীষ (শুষ্ক গোময়) দ্বারা বহু পুট (পোঁড়) দিতে হয়। অনেকেই অবগত আছেন যে, প্লীহা অথবা যকৃৎ বর্দ্ধিত হইলে গোময় উত্তপ্ত করিয়া পীড়াস্থানে স্বেদ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

শ্বেতবর্ণ—দগ্ধ—গোময়োপলেপনে বসন্তরোগীর গাত্রচিহ্ন নষ্ট হয়। গোময়ের বিষনাশকতা প্রত্যক্ষ; কোনও স্থানে "এড়াবিষ" লাগিলে সেইস্থান স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয়। যদি "এড়াবিষ"যুক্ত স্থানে সদ্যোগোময় দেওয়া যায়, তবে রোগের আশঙ্কা থাকে না। গোময় উৎকৃষ্ট সার। অতএব দেখা যাইতেছে, গোময়ের ন্যায় উপকারী দ্রব্য আমাদের খুব কমই আছে।

শ্রীউষানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ।
সংস্কৃতশিক্ষক, সম্মিলনী বিদ্যালয়,
যশোহর।

মুনিবংশ।

(৩)

অঙ্গিরাবংশ।

(মহাভারত ৩।২১৭।৯)

ব্রহ্মার তৃতীয়পুত্রের নাম মহর্ষি অঙ্গিরা (১) মহর্ষির শুভা নাম্নী (২) সহধর্ম্মিণীর গর্ভে বৃহস্পতির জন্ম হয়। বৃহস্পতি (বৃহৎ+পতি) দেবগণের পুরোহিত বলিয়া 'দেবগুরু' বা "গুরু" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। (৩) কিন্তু দেবকার্য্য-সাধনার্থে সুরগুরু বৃহস্পতি দৈত্য গুরু শুক্র আচার্য্যের রূপ ধারণে দৈত্যগণকে কুনীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। (৪)

বেদ মতে (ঋঃ ৪।৫০।৪) পরমব্যোমে মহঃ জ্যোতি হইতে বৃহস্পতি প্রথম জন্ম গ্রহণ করেন। (৫)

বেদে (৪।৪০।১) বৃহস্পতিকে আঙ্গিরস (অঙ্গিরার অপত্য) বলা হইয়াছে।

বেদে (৮।৬১৪) বৃহস্পতি আর্ক্ষ (ঋক্ষ-সপ্তর্ষিমণ্ডল—পুত্র) নামে অভিহিত হইয়াছেন। (৬)

(১) অঙ্গিরা সপ্তর্ষিমণ্ডলের (The great Bear) বৃহত্তম তারায় অধিষ্ঠিত আছেন।

(২) বিষ্ণুপুরাণ (১।৮) ও হরিবংশের (৩।৪২) মতেঃ—অনিলস্য শিবা ভার্য্যা তস্যাঃ পুত্রোমনোজবঃ।

(৩) গুরুঃ তু গীষ্পতৌ শ্রেষ্ঠে.....

(৪) অতি প্রাচীনকালে প্রভাতী তারা ("শুক্রগ্রহ) 'বৃহস্পতি গ্রহ' বলিয়া কিছুদিন গৃহীত ছিল।

(৫) বৃহস্পতিঃ প্রথমংজায়মানঃ মহঃ জ্যোতিষঃ পরমে ব্যোমন্।

(৬) পুরাণ মতে বৃহস্পতি চিত্রশিখণ্ডিজ

বেদে (২২৬'৩) বৃহস্পতিকে "দেবানাম্ পিতরম্" অর্থাৎ দেবগণের পিতা—বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

বেদমতে (১।৪০৮; ১০।৫৩৯) বজ্রধর বৃহস্পতি রণে অজেয়।

বেদমতে (২২৪৮; ১০।১৮২৩) বৃহস্পতি সুদৃঢ় ক্ষিপ ধনু ধারণ করেন।

বেদমতে (৭'৯৮।৭) বৃহস্পতি খড়্গধর।

বেদমতে (২।২৩১) বৃহস্পতি "গণানাং গণপতিঃ" অর্থাৎ দেবসেনার নায়ক। (৭)

বেদমতে (২।২৩'২) বৃহস্পতি "ব্রহ্মণাম্ জনিতা" অর্থাৎ বেদমন্ত্রের জনয়িতা। এবং তিনি ব্রহ্মণস্পতি নাম ধারণ করেন।

বেদমতে (২।২৩১) বৃহস্পতি "জ্যেষ্ঠ-রাজঃ" অর্থাৎ রাজশ্রেষ্ঠ বা সম্রাট্।

বেদমতে (৭।৯৭ ৩) বৃহস্পতি 'ইন্দ্র' নাম ধারণ করেন। (৮)

বৃহস্পতির পত্নী চান্দ্রমসীর গর্ভে শংযু জন্ম গ্রহণ করেন।

ভরদ্বাজ।

শংযুর পত্নী সত্যাদেবীর গর্ভে ভরদ্বাজের জন্ম হয়। (৯) ভরদ্বাজ মহর্ষি বাল্মীকির প্রিয় শিষ্য ছিলেন। যে উত্তরবাহিনী তমসা নদী (the Tons) প্রয়াগের দূর—পূর্ব্বে গঙ্গায় পতিত হইয়াছে, একদা সেই ক্ষুদ্র তমসার তীরে শিষ্য ভরদ্বাজ, আচার্য্যের কলস ও বল্কল-ভার লইয়া স্নানার্থী মহর্ষির অনুগমন করিয়াছিলেন। এবং মহর্ষি ক্রৌঞ্চ-বধ-দর্শনে শোকার্ত্ত হইয়া "পাদবদ্ধ অক্ষরসম তন্ত্রীলয়-সমন্বিত শ্লোক" উচ্চারণে নিষাদকে ভর্ৎসনা করিলে, এই তীক্ষ্ণধী শিষ্য "এই পদ্য যশোলাভ করিবে" বলিয়া আচার্য্যকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ইতিহাসে ক্ষুদ্র তমস অমরত্ব লাভ করিয়াছে এবং ভাবী হিন্দুকবিসমাজে এই ক্ষুদ্রনদী পরমতীর্থ বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রয়াগে ভরদ্বাজের আশ্রম বর্ত্তমান আছে।

মহর্ষি ভরদ্বাজ "অস্ত্রজ্ঞ-প্রধান" ছিলেন এবং ঋষি অগ্নিবেশ তাঁহার প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

ভরদ্বাজের ভার্য্যার নাম বীরা। ইনি 'বীর' নামে পুত্র প্রসব করেন।

ভরদ্বাজ-দুহিতা দেববর্ণিনী মহর্ষি পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবাকে বরণ করেন এবং ধনাধিপ কুবের-দেবকে পুত্ররূপে লাভ করেন।

আদিপর্ব্বমতে গঙ্গাদ্বারে অপ্সরা ঘৃতাচীকে দখিয়া দ্রোণ—কলস মধ্যে ভরদ্বাজের এক বীর পুত্র জন্মে। এই পুত্রের নাম দ্রোণ।

(চিত্রশিখণ্ডীর—পুত্র) নাম ধারণ করেন যথা—জীবঃ আঙ্গীরসঃ বাচস্পতিঃ চিত্রশিখণ্ডিজঃ।

Jupiter was hurtured by Helike who was made the Great Bear.

(৭) গণেশবীজম্ তম্ ইমম্ গুরোঃ মন্ত্রম্ প্রকীর্ত্তিতম্। কালিকাপুরাণ

(৮) ইন্দ্র কোন ব্যক্তি-বিশেষ নহে; যে দেবতা বা অসুর স্বর্গের সিংহাসন অধিকার করেন, তিনি 'ইন্দ্র' উপাধি গ্রহণ করেন। ইন্দ্রত্বের এই সার তত্ত্ব গ্রহণ না করিয়া, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অকুল পাথারে পড়িয়াছেনঃ—

"He (Brihaspati) is also in some of his attributes is identical Indra, al though with some inconsistency he is spoken of as distinct from although associated with him : but this may be a misconception of the Scholiast"

Wilson.

(৯) মতান্তরে বৃহস্পতির ঔরসে এবং বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠভ্রাতা উতথ্যের ভার্য্যা মমতাদেবীর গর্ভে ভরদ্বাজের জন্ম হয়।

মহর্ষি ভরদ্বাজ বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তর্ষি মণ্ডলের (কাশ্যপীয় মণ্ডল—Cassiopeia) অন্যতম তারায় অধিষ্ঠিত আছেন। (১০)

দ্রোণ আচার্য্য।

দ্রোণ, পিতৃশিষ্য অগ্নিবেশ ঋষির নিকট ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেন। দ্রোণ, দ্রুপদ-রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন অধিরথপুত্র কর্ণ এবং পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুন আদি তাঁহার সমকালীন রাজন্যপুত্রগণকে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়া 'গুরু দ্রোণ' নামে সুবিখ্যাত হইয়া ছিলেন।

দ্রোণের সহধর্ম্মিনী কৃপী অশ্বত্থামাকে পুত্র লাভ করেন।

দ্রোণ আচার্য্য কুরুক্ষেত্রের বিরাট্ সমরে ভীষ্মের পরে দিনচতুষ্টয় কুরুসৈন্য চালনা করিয়াছিলেন।

গুরু দ্রোণের রথধ্বজে ধনু, স্বর্ণ কমণ্ডলু ও বেদি শোভা পাইত।

গুরুর যে অদ্ভুততম (১১) দীপ্তিমান্ কবচ ছিল, তাহা অস্ত্রশস্ত্রের অভেদ্য। জয়দ্রথরক্ষার্থে গুরু সেই কবচ দুর্য্যোধনের শরীরে বন্ধন করিয়া দিলেন।

প্রিয়পুত্র অশ্বত্থামার নিধনের কল্পিত বার্ত্তা রণাঙ্গণে শ্রবণে গুরু দ্রোণ অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। অবসর পাইয়া শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতৃরাজ্যাপহারক দ্রোণের শিরশ্ছেদন করিলেন। (১২)

মরণান্তে "দ্রোণাচার্য্য আকাশপথ অতিক্রম করিয়া ক্রমে নক্ষত্রমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইলেন" । (১৩)

বস্তুতঃ দ্রোণ অঙ্গিরাকুল-শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতির দেহে প্রবেশ করিলেন ১৪)

তারাদর্শক।

রিপণপল্লী, যশোহর।

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-দ্বন্দ্ব।

১। 'প্রবৃত্তি' 'নিবৃত্তি' নামে দুইটী যুবতী
হৃদয়মন্দিরে সদা করয়ে বসতি।
প্রবৃত্তি করিয়া দ্বেষ ধরিয়া মোহন বেশ
কহিছে, নিবৃত্তি তুমি শুনলো যতনে;
"তোমার সমান নাহি নিঠুর ভুবনে"

---

(১০) বশিষ্টঃ কাশ্যপঃ অথ অত্রিঃ জমদগ্নিঃ সগৌতমঃ, বিশ্বামিত্রঃ ভরদ্বাজঃ সপ্ত সপ্তর্ষয়ঃ অভবন্ ॥ বিষ্ণুপুরাণ ৩।১।৩২

(১১) "The wing of the Euphrateare Archer has become the 'martial cloak" of the Ptolemaic figure. (Brown)

(১২) অর্জ্জুন, দ্রুপদরাজকে রণে পরাজিত ও বন্দী করিয়া, দ্রুপদের পাঞ্চাল রাজ্যের উত্তরার্দ্ধ গুরুদক্ষিণা-রূপে দ্রোণকে দিয়াছিলেন। ভাগীরথীর উত্তরস্থ এই রাজ্যার্দ্ধের রাজধানী অহিচ্ছত্র নগরে অবস্থিত ছিল।

(১৩)ধানুকী দ্রোণের নক্ষত্রমণ্ডলে গমনের কথা পড়িলে পাশ্চাত্য ধনুরাশির উৎপত্তির যে ইতিহাস প্রচলিত আছে, তাহাই মনে পড়ে; যথাঃ—

"Chiron was famous for his knowledge of shooting etc. He had for pupils the greatest heroes of his age, Achilles, Hercules, Jason, Agneas etc. And he was accidentally wounded by his pupil Hercules, and was placed by Jupiter as the constellation Sagittarius."

(Beeton)

(১৪) বৃহস্পতিম্ বিবেশ অথ দ্রোণঃ হি অঙ্গিরসাম্ বরম্। মহা ১৮।৫।১২

ধনুরাশি ধানুকী বৃহস্পতির গৃহ। সুতরাং ধানুকী দ্রোণ নক্ষত্রমণ্ডলে ধনুরাশিতে প্রবেশ করেন।

২। সতত মানবগণে দিতেছ মন্ত্রণা—
'প্রবৃত্তিকুহকে কেন পেতেছ যন্ত্রণা।
ভক্তিপথ সবে ধরি, মায়ামোহ পরিহরি
ষড়রিপু বশ করি ডাক' ভগবানে,—
ইহা বিনা সুখ নাহি এই ধরাধামে।'

৩। এই তো তোমার কথা শুনি চিরদিন,
ইহাতে কি সুখ কেহ পায় কোনদিন?
সুখ আমি দিতে পারি—জেনে যত নরনারী
সতত করয়ে মম আদেশ পালন;
তোমার সন্তোষ বল কে করে সাধন?

৪। কহিছে নিবৃত্তি-দেবী সুমধুর স্বরে
'না বুঝি আমার তত্ত্ব থাক' ঈর্ষ্যাভরে
মম বাক্য যারা ধরে, তারা সে জানিতে পারে—
কি যে শান্তি দেই আমি মানব অন্তরে!
স্বর্গসুখ ভোগে নর অবনী ভিতরে।

৫। তোমার ছলনে ভুলি মানবসকল
আপাতসুখের লাগি হইয়া চঞ্চল,
পুরাতে তোমার আশ করিয়ে সর্ব্বস্ব নাশ,
শেষে জ্ব'লে মরে সদা অনুতাপানলে,—
শান্ত রাখি তাহে আমি বৈরাগ্যের জলে!'

৬। প্রবৃত্তি বলয়ে রোষে—'শুন ওলো সতি!
না মাতি গরবে নিজ স্থির কর মতি।
কেন দর্প কর এত? জানি তব গুণ যত;—
আমি আছি ব'লে তোমা যত্ন করে নরে।
মম সম ভাগ্য-বতী কেবা ধরা 'পরে?'

৭। নিবৃত্তি হাসিয়া বলে—'প্রবৃত্তি-ভগিনি!
অনর্থ কলহে কেন হ'তেছ তাপিনী?
সরল অন্তরে বলি, তোমার আদেশে চলি,
শান্তি নাহি পায় নর—না মিটে পিপাসা।
কামনা থাকিতে শান্তি কেবল দুরাশা'!'

৮। কবি কহে কেন দ্বন্দ্ব কর অকারণ?
তোমা দোঁহা ধর্ম্মপথে আছে প্রয়োজন।
প্রবৃত্তিকে বশ করি নিবৃত্তির সঙ্গ ধরি;
ভক্তিভরে শান্তিপথে যে করে গমন;
প্রেমানন্দ পায় সেই নাহিক পতন!

শ্রীবরদাকান্ত দেব।

নীতি-সার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

মাতুঃ প্রিয়ায়াঃ পুত্রস্য ধনস্য চ বিনাশনম্।
বাল্যে মধ্যে চ বার্দ্ধক্যে মহাপাপ-ফলং ক্রমাৎ॥
২২৯

শ্রীমতামনপত্যত্বমধনানাং চ মূর্খতা।
স্ত্রীণাং ষণ্ডপতিত্বং চ ন সৌখ্যায়েষ্টনির্গমঃ॥
২৩০

মূর্খঃ পুত্রোঽথবা কন্যা চণ্ডী ভার্য্যা দরিদ্রতা।
নীচসেবা ঋণং নিত্যং নৈতৎষট্কং সুখায় চ॥
২৩১

নাধ্যাপনে নাধ্যয়নে ন দেবে ন গুরৌ দ্বিজে।
ন কলাসু ন সঙ্গীতে সেবায়াং নার্জবে স্ত্রিয়াং॥
২৩২

ন শৌর্য্যে চ ন তপসি সাহিত্যে রমতে মনঃ।
যস্য মুকঃ খলঃ কিংবা নররূপ-পশুশ্চ সঃ॥ ২৩৩

মাতা, পত্নী, পুত্র ও ধনের নাশ—বাল্যে যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে হইলে ক্রমান্বয়ে অর্থাৎ বাল্যে মাতৃবিয়োগ, যৌবনে পত্নীবিয়োগ ও বার্দ্ধক্যে পুত্রনাশ ও ধননাশ হইলে মহাপাপের ফল সূচিত হইয়া থাকে। ২২৯

ঐশ্বর্য্যশালীর অপুত্রতা, নির্দ্ধনের মূর্খতা, স্ত্রীলোকের ক্লীবপতি ও প্রিয়বস্তুর বিচ্ছেদ দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। ২৩০

মূর্খ পুত্র কিম্বা মূর্খা কন্যা, প্রখরা ভার্য্যা, দরিদ্রতা, নীচসেবা, নিত্য ঋণ—এই ছয়টি সুখের কারণ হয়না। ২৩১

যাহার মন, পাঠন-পঠনে, দেবতা, গুরু, ব্রাহ্মণে, নৃত্যে, সঙ্গীতে, সেবায়, সরল ব্যবহারে, স্ত্রীলোকে, বীরত্বে, তপস্যায়, সাহিত্যে

অন্যোদয়াসহিষ্ণুশ্চ ছিদ্রদর্শী বিনিন্দকঃ।
দ্রোহশীলঃ স্বান্তমলঃ প্রসন্নাস্যঃ খলঃ স্মৃতঃ॥ ২৩৪

একস্যৈব ন পর্য্যাপ্তমস্তি যদ্ ব্রহ্ম কোশজম্।
আশয়া বৰ্দ্ধিতস্যাস্তি তস্যাল্পমপি পূর্ত্তিকৃৎ॥ ২৩৫

করোত্যকার্য্যং সংশোহন্যং বোধয়ত্যনুমোদতে॥ ২৩৬

ভবত্যন্যোপদেশার্থে ধূর্ত্তাঃ সাধুসমাঃ সদা।
স্ব-কার্য্যার্থং প্রকুর্ব্বন্তি হ্যকার্য্যাণাং শতন্তু তে॥ ৩৭

পিত্রোরাজ্ঞাং পালয়তি সেবনে চ নিরালসঃ।
ছায়েব বর্ত্ততে নিত্যং যততে চাগমায় বৈ॥ ২৩৮

কুশলঃ সৰ্ব্ববিদ্যাসু সপুত্রঃ প্রীতিকারকঃ।
দুঃখদো বিপরীতো যো দুর্গুণো ধননাশকঃ॥ ২৩৯

পত্যৌ নিত্যং চানুরক্তা কুশলা গৃহকৰ্ম্মণি।
পুত্র প্রসূঃ সুশীলা যা প্রিয়া পত্যুঃ সুযৌবনা॥ ২৪০

পুত্রাপরাধান্ ক্ষমতে যা পুত্রপরিপোষিণী।
সা মাতা প্রীতিদা নিত্যং কুলটা সাতিদুঃখদা॥ ২৪১

বিদ্যাগমার্থং পুত্রস্য বৃত্ত্যর্থং যততে চ যঃ।
পুত্রং সদা সাধু শাস্তি প্রীতিকৃৎ সপিতানৃণী॥ ২৪২

অথবা কাব্যশাস্ত্রাদি আলোচনায় আনন্দ লাভ না করে, সে ব্যক্তি যোগী, খল কিম্বা নররূপ পশু। ২৩২, ২৩৩

যে অন্যের অভ্যুদয়ে কাতর, ছিদ্রান্বেষী, নিন্দুক, অনিষ্টকরণশীল, প্রসন্নবদন কিন্তু মনে মলিন, সে ব্যক্তি 'খল' বিবেচিত হইয়া থাকে। ২৩৪

এই ব্রহ্মাণ্ড-জনিত প্রচুর দ্রব্যের আশাতে যাহার তৃষ্ণা প্রবল হইয়াছে, অল্প বস্তু তাহার আশা নিবারণ করিতে পারেনা। ২৩৪

আশাযুক্ত ব্যক্তি,অকার্য্য করে, অকার্য্যকরণ-জন্য অন্যকে উত্তেজিত করে ও অন্যের অকার্য্যকে অনুমোদন করে। ২৩৬

ধূর্ত্তগণ অন্যকে উপদেশ দিবার সময় সর্ব্বদা সাধুর ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে এবং স্বকার্য্য-জন্য শত শত অকার্য্য করিয়া থাকে। ২৩৭

যে পুত্র মাতাপিতার আজ্ঞাপালন করে তাঁহাদের সেবাকার্য্যে আলস্যশূন্য হইয়া থাকে, সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে থাকে, ধনলাভ বা বিদ্যালাভ-জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিয়া থাকে, সর্ব্ববিদ্যায় কুশল সেই পুত্র পিতামাতার আনন্দ বৰ্দ্ধন করিয়া থাকে, কিন্তু যে দুর্গুণ ও ধননাশক পুত্র ইহার বিপরীত আচরণ করে, সে মাতাপিতার কেবল দুঃখ বর্দ্ধন করে। ২৩৮, ২৩৯

যে নারী পতিতে সর্ব্বদা অনুরক্তা, গৃহকার্য্যে কুশলা, পুত্রপ্রসবিনী, সুশীলা ও প্রাপ্তযৌবনা, তিনি পতির প্রিয়া হইয়া থাকেন। ২৪০

যে মাতা পুত্রের অপরাধ-সকল ক্ষমা করেন ও পুত্র-পোষণ-কার্য্যে তৎপরা, সে মাতা, সর্ব্বদা আনন্দ-দায়িনী হইয়া থাকেন; কিন্তু এতদ্ব্যতিরিক্ত কুলটা মাতা দুঃখদায়িনী হইয়া থাকেন। ২৪১

যে পিতা পুত্রের বিদ্যা-শিক্ষার জন্য ও জীবিকার জন্য যত্ন করেন ও পুত্রকে সর্ব্বদা সৎ উপদেশ দেন, সে পিতা প্রীতিবর্দ্ধনকারী ও অনৃণী। ২৪২

যঃ সহায়ং সদা কুর্য্যাৎ প্রতীপং ন বদেৎ কচিৎ।
সত্যং হিতং বক্তি যাতি দত্তে গৃহ্লাতি মিত্রতাম্ ॥ ২৪৩

নীচস্যাতিপরিচয়ো হ্যন্য-গেহে সদা গতিঃ।
জাতৌ সঙ্ঘে প্রাতিকূল্যং মানহানৈ দরিদ্রতা ॥ ২৪৪

ব্যাঘ্রাগ্নিসর্পহিংস্রাণাং নহি সন্ধর্ষণং হিতম্।
সেবিতস্বাত্তু রাজ্ঞোনৈতে মিত্রাঃ কস্য সন্তি কিম্ ॥ ২৪৫

দৌর্ম্মনস্যং চ সুহৃদাং সুপ্রাবল্যং রিপোঃ সদা।
বিদ্বৎস্বপিচ দারিদ্র্যং দারিদ্রো বহুপত্যতা ॥ ২৪৬

ধনি-গুণি-বৈদ্যনৃপজলহীনে সদা স্থিতিঃ।
দুঃখায় কন্যকাপ্যেকা পিত্রোরপি চ যাচনম্ ॥ ২৪৭

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সাহায্য করেন, কখনও প্রতিকূলবাক্য-প্রয়োগ করেন না, সত্য ও হিত বাক্য বলেন, তিনি যথার্থ মিত্র। ২৪৩

নীচ ব্যক্তির সহিত অত্যন্ত পরিচয়, সর্ব্বদা অন্যগৃহে গমন, ব্রাহ্মণাদি জাতিসমূহে প্রতিকূলাচরণ ও দরিদ্রতা—মাননাশের জন্য হইয়া থাকে। ২৪৪

ব্যাঘ্র, অগ্নি, সর্প ও হিংস্রজন্তুগণকে আক্রমণ মঙ্গলজন্য হয় না, রাজাকে সেবা করিলেও কখনও তিনি মিত্র হন না; ইহারা কখনও কি মিত্র হইতে পারে? ২৪৫

বন্ধুদিগের দুঃখিতমন ও শত্রুর সর্ব্বদা প্রবলতা, বিদ্বান্ ব্যক্তিরও দারিদ্র্য, দরিদ্রব্যক্তির বহু সন্তান-সন্ততি; ধনী, গুণী, বৈদ্য, রাজা ও জলহীন স্থানে সদা অবস্থিতি; একটি কন্যা, এমন কি মাতাপিতার নিকট যাচ্ঞাও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। ২৪৬। ২৪৭

সুরূপঃ সধনঃ স্বামী বিদ্বানপি বলাধিকঃ।
ন কাময়েদ্ যথেষ্টং যৎ স্ত্রীণাং নৈব সুসৌখ্যকৃৎ ॥ ২৪৮

যো যথেষ্টং কাময়তে স্ত্রী তস্য বশগা ভবেৎ।
সঙ্কারণাল্লালনাচ্চ যথা যাতি বশং শিশুঃ ॥ ২৪৯

কার্য্যং তৎ সাধকাদীংশ্চ তদ্ব্যয়ং সুবিনির্ণয়ম্।
বিচিন্ত্য কুরুতে জ্ঞানী নান্যথা লঘ্বপি কচিৎ ॥ ২৫০

ন চ ব্যয়াধিকং কার্য্যং কর্ত্তুমীহেত পণ্ডিতঃ।
লাভাধিক্যং যৎক্রিয়তে তৎ সেব্যং ব্যবসায়িভিঃ।
মূল্যং মানঞ্চ পণ্যানাং যথাস্থানানুগাত্তে সদা ॥ ২৫১

রূপবান্, ধনশালী, বিদ্বান্ ও বলবান্ হইলেও যদি স্বামী পত্নীর প্রতি যথেষ্ট প্রণয় প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে তিনি পত্নীর সুখকর হন না। ২৪৮

যে পতি পত্নীতে যথেষ্ট প্রণয় প্রদর্শন করেন, যেরূপ শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ ও লালন-পালন করিলে বশবর্ত্তী হয়, পত্নী, তদ্রূপ তাঁহার বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন। ২৪৯

জ্ঞানী ব্যক্তি কোন্ কার্য্য কিরূপে সাধিত হইবে ও সেই কার্য্যে কত ব্যয় হইবে, উত্তমরূপে বিচার করিবেন; এরূপ না করিয়া সামান্য কার্য্যও করিবেন না। ২৫০

জ্ঞানী ব্যক্তি ব্যয়াধিক কার্য্য কখনও করিবেন না; যে কার্য্য করিলে অধিক লাভ হইবে, সেই কার্য্য করিবেন। পণ্যদ্রব্যের মূল্য ও পরিমাণ যথাযথ নিয়মে নির্দ্ধারণ করিবেন। ২৫১

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

সংবাদ।

সুলভ ঔষধ। 'এড্‌ভোকেট্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়া'য় প্রকাশ—উৎকট বিষের সুলভ ঔষধ সর্ব্বত্র বিরাজমান! বিষধর-দংশনে প্রতিবর্ষে দেশের অসংখ্য নরনারী প্রাণত্যাগ করিতেছে! চিকিৎসকগণ এ পর্য্যন্ত আশীবিষ-বিষবেগের প্রতিষেধে সক্ষম হন নাই! অপরদিকে রুদ্রমূর্ত্তি প্লেগের প্রকোপে বহু জনাকীর্ণ নগর, উপনগর, গ্রাম—শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে! এক্ষেত্রেও চিকিৎসক-বর্গের প্রাণপণযত্ন বিফলতা-সাগরে ডুবিয়া যাইতেছে। সর্পবিষ, প্লেগবিষ—দুইই ভীষণ বিষ। এই দুই প্রাণনাশক বিষের প্রতিষেধকল্পে সম্প্রতি যে ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সহজলভ্য ও সর্ব্ববিধ ঔষধ অপেক্ষা অধিকসংখ্যক-ভাবে বিরাজিত আছে। বস্তুটী কেঁচোর রস। কেঁচো বা ভূমিলতা সর্ব্বত্রই মাটীর মধ্যে আছে। অনায়াসেই পাওয়া যায়। কেঁচোর দেহ হইতে একরূপ উজ্জ্বল রস বহির্গত হয়,—এই রস জলের সঙ্গে মিশাইয়া সর্পদষ্ট রোগীকে ৩ ৪বার খাওয়াইলেই বিষবেগ নিবারিত হয়। প্লেগবিষেও কেঁচোর রস বিশেষ ফলপ্রদ। সকলেই এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। যদি সত্যই 'কেঁচোর রস" এরূপ উপকারী হয়, তবে অবশ্যই বলিব,—ভগবানের লীলা বোঝা কঠিন! সর্প কেঁচোর কাছে পরাজিত হইল! বোধহয় জগতে সর্প অপেক্ষা কেঁচো অনেক অধিক আছে!

সম্রাটের শুভাগমন। অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর মহামহিম ভারতসম্রাট্ শ্রীযুক্ত পঞ্চমজর্জ্জ মহোদয় ও সম্রাট্‌মহিষী মেরী মহোদয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ সমীপস্থ দিল্লীনগরীতে আসিয়া রাজভক্ত ভারতবাসীর ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিবেন। সম্রাট্ মহোদয়ের সহিত সপত্নীক লর্ড ক্রু এবং রাজপরিবারের ২৬ জন ব্যক্তি আসিবেন। আগামী ২রা ডিসেম্বর মহনীয় সম্রাট্ বম্বে বন্দরে উপনীত হইবেন। ৭ই ডিসেম্বর বম্বে হইতে দিল্লী পৌছিবেন, ১২ ডিসেম্বর দিল্লীতে মহাসমারোহে সম্রাটের 'দরবার' হইবে। ১৬ ডিসেম্বর সম্রাট্ নেপাল যাত্রা করিবেন. ১৮ ডিসেম্বর নেপালে উপস্থিত হইবেন। সম্রাট্‌মহিষী নেপালযাত্রী সম্রাট্ মহোদয়ের সঙ্গে থাকিবেন না। তিনি ১৬ ডিসেম্বর আগ্রায় আসিবেন। তিনি আগরার পরে সম্ভবতঃ রাজপুতনা এবং মধ্যভারত ভ্রমণ করিবেন। অতঃপর ২রা জানুয়ারি সম্রাট্ মহোদয় ও সম্রাট্‌মহিষী সম্মিলিত হইয়া ৩রা জানুয়ারী কলিকাতায় আসিবেন। এই দিনতালিকার পরিবর্ত্তনও হইতে পারে! রাজভক্ত ভারতসন্তান! রাজদর্শনে সৌভাগ্যবৃদ্ধি ও পুণ্যলাভ—শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, এই অমূল্য সিদ্ধান্তের সম্মান-রক্ষার্থে তোমার উন্নিদ্র নয়ন ও আনন্দোচ্ছল অন্তঃকরণ যেন যথাকালে প্রস্তুত থাকে!

'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।' যুক্তপ্রদেশের আগ্রার দুইজন একাওয়ালা ভুরিয়া নাম্নী এক চামারজাতীয়া যুবতীর সতীত্বনাশের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। উক্ত প্রদেশের উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণের বিচারে কামকিঙ্কর

পাষণ্ডদ্বয়ের দণ্ডবৃদ্ধি হইয়াছে। আশ্রয়-প্রার্থিনী ভুরিয়ার সর্ব্বনাশ করিয়া এই নরপশুদ্বয় যে দণ্ড প্রাপ্ত হইল, তাহা অত্যল্প না হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে ভরসার কারণ দেখিতে পাই না। যতদিন মানব ধর্ম্মলাভ না করিবে, যতক্ষণ প্রকৃত সংযমের সুখকর স্বাদ না পাইবে, ততদিন বা ততক্ষণ যত তীব্র দণ্ডভোগ করুক্ না কেন, পিশাচ-প্রবৃত্তির দমন-সাধনে সমর্থ হইবে না। দণ্ডের তীব্রতা সুযোগের পথ-রুদ্ধ করে না। হৃদয় সমুন্নত হইলে ভীষণ দণ্ডও কোমল কুসুম-বাণের কাছে পরাজিত হয়। সুনীতি ও সদ্ধর্ম্মের প্রচার ইহার অমোঘ ঔষধ।

হিন্দুবিবাহ-সংস্কার। কিছুদিন পূর্ব্বে রিপণ কলেজগৃহে নেতৃবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সভাধিবেশন হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেশবদেব শাস্ত্রী মহাশয় ঐ সভায় হিন্দু বিবাহসংস্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভাপতি দেশমান্য সুরেন্দ্রনাথ বাল্যবিবাহের দোষকীর্ত্তন ও যৌবনবিবাহের গুণকীর্ত্তন করেন। রাজনীতির সুদীর্ঘ বক্তৃতা আর এখন বড় শোনা যায় না! নেতারা এখন সমাজের দিকে দৃষ্টিপাতের অবসর পাইয়াছেন এভাবের সমাজ-সংস্কার-চেষ্টা অনেকদিনই হইতেছে; কাজের পরিচয় ত বড় দেখিনা! মনে খট্‌কা লাগে, তবে কি ইঁহারা যথার্থ 'সমাজের নেতা' নহেন!

ফুটবলে আনন্দ। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় গড়ের মাঠে মোহনবাগানের ফুটবল্-খেলোয়ারগণ সাহেব-খেলোয়ারগণকে হারাইয়া দিয়াছেন! এই উপলক্ষ্যে দেশীয় সংবাদপত্র সমূহ আনন্দপ্রকাশ করিয়াছেন। কেহ আহ্লাদে আট্‌খানা হইয়া বলিতেছেন "এই যুবকগণ দীর্ঘজীবী হইয়া জগতের সমক্ষে দুর্ব্বল বাঙ্গালীজাতির এইরূপে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করুক্!" আমরা এইরূপ আনন্দপ্রকাশেই অধীর হইতে চলিলাম! ভাগ্য!!

পদকোপাহার। দিল্লীর 'দরবার' উপলক্ষে ভারতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীগণকে 'পদক' দেওয়া হইবে, স্থিরীকৃত হইয়াছে। এইসকল পদক বিলাতী পদকের অনুরূপই হইবে। প্রথমে কথা হয়, পদকের উপরে সংস্কৃতভাষাতেই বিবরণ লিখিত হইবে, এখন নাকি ঠিক্ হইয়াছে, উহা পারস্য-ভাষায় হইবে। দেবভাষা সংস্কৃতের 'তে হি দিবসা গতাঃ' সুতরাং ইহাতে ক্ষোভের কারণ থাকিলেও বলিবার কিছুই নাই; কারণ—"মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ।"

ম্যারেজ্ বিলের প্রতিবাদ। বোম্বের হিন্দুসাধারণ, বোম্বে সহরে সভা করিয়া, ভুপেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবিত ম্যারেজ বিলের প্রতিবাদ করিয়াছেন। সভার অভিমত এই যে, গবর্ণমেণ্ট যেন হিন্দুদের ধর্ম্মাচারে হস্তক্ষেপ না করেন!

সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা।

মায়াবাদ।—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্ত্তৃক বিবৃত। ডবল ক্রাউন্ ষোড়শাংশিত ১০০ পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত। এন্টিক্ কাগজে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। মায়াবাদ ভারতের গৌরব। এই মায়াবাদই অদ্বৈতবাদ, অনির্ব্বচনীয়তাবাদ প্রভৃতি নামে কথিত হইয়া থাকে। আচার্য্য শঙ্কর এই মায়াবাদেরই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত তর্কভূষণ মহাশয়, জটিল মায়াবাদকে সরল করিয়া বুঝাইয়াছেন। মায়াবাদের প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে তিনি ন্যায়-বৈশেষিকের আরম্ভবাদ এবং সাংখ্য-যোগের পরিণামবাদ সংক্ষেপে বুঝাইয়াছেন। শেষে মায়াবাদের কুঠারে সকল বাদবৃক্ষ চ্ছেদন করিয়াছেন। দর্শন শাস্ত্রের জটিল তত্ত্বগুলি সহজ বঙ্গভাষায় সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করিয়া, তর্কভূষণ মহাশয় বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি-বর্দ্ধন এবং বঙ্গীয় পাঠকের মহোপকার-সাধন করিয়াছেন—এজন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া, আমরা পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। তবে স্বীয় বিদ্যা-বুদ্ধির দারিদ্র্যবশতঃ গ্রন্থের কয়টি স্থানের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারি নাই। তর্কভূষণ মহোদয়ের ন্যায় মনীষি পণ্ডিতের বিবৃতিতে দোষস্পর্শ আছে—মনে করি না, নিজেদের অজ্ঞতাকেই উহার কারণ মনে করি। মায়াবাদির মতে জগৎ অসৎ—মিথ্যা—মায়াময়। মায়াবাদ গ্রন্থে তর্কভূষণ মহাশয় (৫৭ পৃষ্ঠায়) জগৎকে 'অলীক' বলিয়াছেন, পূর্ব্বে ৫৬ পৃষ্ঠায় গগনকুসুমকে অলীক বলিয়াছেন,—আবার ৫৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—"যাহা পূর্ব্বে ছিল না এবং যাহা পরেও থাকিবে না, কেবল মধ্যে কিছু কালের জন্য যাহা ব্যবহারের গোচর হইয়া থাকে, তাহারই নাম ত অলীক।" গগনকুসুম, শশবিষাণ অলীক—ইহা প্রসিদ্ধ, কিন্তু "মধ্যে কিছু কালের জন্য" "ব্যবহারের গোচর হইয়া থাকে" না। জগৎ অসৎ বা মিথ্যা—ইহা বেদান্তশাস্ত্রে আছে—কিন্তু জগৎ অলীক—একথা বেদান্তশাস্ত্রে আছে কি? যদি "অসৎ"কে অলীক বলা হইয়া থাকে, তবে জগৎকে "অসৎ" বলা সঙ্গত কি? শশবিষাণাদিকে "অসৎ" বলিলে, জগৎকে অসৎ না বলিয়া—'সৎও নয় অসৎও নয়—অনির্ব্বচনীয়' বলা সঙ্গত নহে কি? ৭৪ পৃষ্ঠায় পূজ্যপাদ তর্কভূষণ মহাশয় মায়াবাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ইহার উদ্দেশ্য স্থাপন নহে, ইহার উদ্দেশ্য খণ্ডন; ইহা বিশদভাবে দেখাইয়া দেয় যে—জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যত প্রকার সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইয়াছে, সেই সকল সিদ্ধান্তই ভ্রমমূলক।" বড়ই আশঙ্কার কথা। মায়াবাদ যদি পরমত-খণ্ডনেই পরিসমাপ্ত হয়, অদ্বৈতস্থাপনে পর্য্যবসিত না হয়, তবে মায়াবাদ 'বাদ' হয় না, 'বিতণ্ডা' হইয়া যায়। কেবল খুঁৎ ধরিতে পারে—কোনও সিদ্ধান্ত প্রচার করে না, এরূপ মায়াবাদে শান্তি বা বিশ্রামের স্থান আছে কি? জগদুৎপত্তিবিষয়ক সকল মতই ভ্রান্ত, কিন্তু এক অবিনশ্বর জ্ঞানময় আত্ম-স্বরূপে এই জগৎ কল্পিত—এই মায়াবাদীর

নিজস্ব-মতও কি ভ্রমমূলক ? মায়াবাদী জ্ঞানকে ছাড়িতে পারেন নাই ত! উপ-সংহারে ৯৮ পৃষ্ঠায় তর্কভূষণ মহাশয়ও বলিয়াছেন—"স্বকীয় অজ্ঞতার জ্ঞানই মানবীয় জ্ঞানের শেষসীমা।" সুতরাং কেমন করিয়া বলা যায় যে, মায়াবাদ সর্ব্বশেষে এক অনন্ত অজ্ঞতা-জ্ঞানের আশ্রয়চ্ছায়ায় বিশ্রাম-লাভ করে নাই ? শ্রীহর্ষের "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" পড়িলে আপাততঃ মনে হয়, মায়াবাদ বুঝি কেবল খণ্ডনই করে, স্থাপন করে না, কিন্তু শ্রীশঙ্কর এবং মধুসূদন সরস্বতীপাদ, প্রকাশানন্দ প্রভৃতি মায়াবাদিগণের গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে শত শত স্থানে "এষ বেদান্তসিদ্ধান্তঃ" "অখণ্ডং সচ্চিদানন্দস্বরূপং ব্রহ্ম সিদ্ধমিতি স্থিতম্" এই ভাবের লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মায়াবাদকে শুধু খণ্ডনস্বরূপ না বলিয়া চরম-সিদ্ধান্ত-স্বরূপ বলিলে সমধিক সঙ্গত হইত না কি ? "যস্যামতং তস্য মতং" ইত্যাদি বাক্যকে ভঙ্গ্যন্তরে মায়াবাদ-গ্রন্থে মায়াবাদের উৎস বলা হইয়াছে, কিন্তু নাসদীয় স্থক্তের "নাসদাসীৎ নো সদাসীৎ" প্রভৃতি বাক্যকে মায়াবাদের পরিস্ফুট মূলসূত্ররূপে গ্রহণ করা সঙ্গত নয় কি ? আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে ঐরূপ করাই ঠিক্ বোধ হইল। আরও কতিপয় স্থলে আমাদের সন্দেহ আছে। পূজ্যপাদ তর্কভূষণ মহোদয় আমাদের গুরুকল্প—আশাকরি, পুনঃসংস্করণে যাহাতে আমাদের ন্যায় স্থূলধী ব্যক্তিরাও ভালরূপে বুঝিতে পারে—সন্দেহে না পড়ে, সেইভাবে বিবৃত করিয়া, তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভার সমধিক সদ্ব্যবহার করিবেন। গ্রন্থখানি সুন্দর হইয়াছে। আরও সুন্দর হইলে আমাদের আশা মিটে।

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবন চরিত। বেঙ্গল্ ন্যাশানাল্ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। এই গ্রন্থ দেশীয় এণ্টিক্ কাগজে মুদ্রিত, ৬খানি সুরঞ্জিত চিত্রে শোভিত, ও ১৪৩ পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত। বঙ্গগৌরব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া, গ্রন্থখানির গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন। ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কবিতা-রচনায় বঙ্গসাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। অন্য ভাষার রত্ন-ভাণ্ডার হইতে রত্ন আহরণ করিয়া যাঁহারা বঙ্গভারতীর চরণে অর্ঘ্য দিয়াছেন, কবি কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যেও অগ্রণীত্ব লাভের অধিকারী। সুতরাং তাঁহার জীবন কথা জানিবার জন্য বঙ্গভাষাভাষী লোকমাত্রেরই আগ্রহ থাকা উচিত। কবির উপযুক্ত জীবন-চরিত না থাকায় অনেকে আগ্রহ-সত্বেও সে সুবিধা প্রাপ্ত হন নাই। এতদিনে সেই অভাব—অসুবিধার পূরণ হইল! গ্রন্থকার এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য বহুস্থানে ভ্রমণ, বহুলোকের নিকট হইতে বিবরণ-সঙ্কলন ও বহু ক্লেশস্বীকার করিয়া পুরাতন-পুস্তক-সংগ্রহ ও অধ্যয়ন-সমালোচনাদি করিয়াছেন—এজন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। কবি কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখাইতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার ধার্ম্মিক, বিশ্বাসী, সংস্কারক, সময়জ্ঞ, আড়ম্বরশূন্য ও অকপটহৃদয় কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখাইয়াছেন। আমরা এই পুস্তকে সামাজিকজীবন, নৈতিকজীবন ও ধর্ম্মজীবনের মধ্য দিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে যত পরিস্ফুটভাবে দেখিতে

পাইয়াছি, কবিতার ভিতর দিয়া ততটা সুব্যক্তভাবে দেখিতে পাই নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের কাব্য-সমালোচনা, গ্রন্থকার এত সংক্ষেপে ও এত সশঙ্কচিত্তে করিয়াছেন, যে, তাহার মধ্যে কাব্যের প্রকৃষ্ট উপভোগের অবসরই নাই,, কাব্যের পরিচ্ছদে কবিকে উপভোগ করা ত দূরের কথা! এজন্য, গ্রন্থকারের উপর অভিসন্ধি আরোপ করিতে চাই না, কিন্তু কাব্যের বিস্তৃত পরিচয় না দিলে কবির যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয় না;—কারণ যাঁহারা কবি কৃষ্ণচন্দ্রকে বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা গ্রন্থকারের নিকট আরও প্রত্যাশা করেন—একথা না বলিয়া পারি না। গ্রন্থ-বিস্তৃতি-ভয়ে যদি গ্রন্থকার সংক্ষেপে কাব্য-সমালোচনার প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্য বক্তব্য নাই। মাইকেল্ মধুসূদনের চরিত্যাখ্যায়ক পূর্ব্বোক্ত বিষয়টী ভালরূপ বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার গ্রন্থ অতটা সুন্দর হইয়াছিল। আমরা আশাকরি, গ্রন্থকার পরসংস্করণে এই অসম্পূর্ণতা দূর করিতে প্রয়াস পাইবেন। অবশ্য একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত ও উপকৃত হইলাম। কৃষ্ণচন্দ্রের মহত্ব পুস্তকের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে! একদিকে যেমন সদ্ভাব শতক-প্রণয়নের পরদিন জীবলীলা শেষ করিলেও কৃষ্ণচন্দ্র গৌরবমণ্ডিত হইয়া মরিতেন, অপরদিকে তেমনি কবিতা না লিখিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেও তিনি 'মহা প্রাণ মানব' বলিয়া সম্মানিত হইতে পারিতেন, তাহার সন্দেহ নাই; কৃষ্ণচন্দ্র মানুষ ছিলেন, মানুষ দোষশূন্য হয় না, সুতরাং তাঁহারও দোষ ছিল। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনে এমন বহু শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় গুণ ছিল, যেগুলি অধুনাতম সমাজে দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গবাসী বঙ্গের অমরকবি কৃষ্ণচন্দ্রের সমুচিত সম্মান করিলে, আমরা আনন্দিত হইব। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণচন্দ্রের বাসস্থান সেনহাটী পূর্ব্বে যশোহরের অন্তর্গত ছিল। (তখনও 'খুলনা' জেলা হয় নাই।) কৃষ্ণচন্দ্রের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্রও যশোহর। আবার যশোহরের মহাকবি মধুসূদন ও কবি কৃষ্ণচন্দ্র—দারিদ্র্যের জ্বালাময় অনলে আত্ম-জীবন আহুতি দিতে বাধ্য হইয়া কবি-পরিণতির সাদৃশ্যও দেখাইয়া গিয়াছেন,—সুতরাং যশোহরবাসীর নিকট কৃষ্ণচন্দ্রও মধুসূদনের ন্যায় 'আপনার' বিবেচিত হইতে পারেন। যশোহরবাসী—কৃষ্ণচন্দ্রের সদ্ভাবশতকাদি গ্রন্থের ও এই জীবনচরিতের আদর করিলে কর্ত্তব্য-পালনই করিবেন।

বৈশ্য পত্রিকা। ১৩ ৮ শ্রাবণ।

প্রথমবর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। শ্রাবণের বৈশ্য পত্রিকা-পাঠ করিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইলাম। বৈশ্যপত্রিকা ক্ষুদ্রকায়া হইলেও প্রবন্ধগৌরবে মহীয়সী। বঙ্গ-সাহিত্যের কতিপয় প্রসিদ্ধ লেখক ইহার জন্য লেখনীচালনা করিতেছেন। 'বারুজীবির বর্ণোচিত আচার' প্রবন্ধটী সারবান্। বর্ণাচারগ্রহণ ব্যতীত প্রকৃতি উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। উদীয়মান ভাবুক-লেখক শ্রীমান্ কুমারবিক্রম মজুমদারের 'আমি একা' প্রবন্ধটী গভীর চিন্তার পরিচায়ক। অন্যান্য প্রবন্ধগুলিও সুন্দর হইয়াছে। বৈশ্য-পত্রিকা উত্তরোত্তর উন্নতির সোপানে আরোহণ করুক, ইহাই ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি। আমাদের বিশ্বাস, অচিরে এই পত্রিকা বঙ্গীয় বৈশ্যকুলের পরমাদরের সামগ্রী হইবে।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা



১৮শ বর্ষ, ১৮শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। আশ্বিন। ১৩১৮ সাল, ১৮৩৩ শকাব্দাঃ।

সংসার।

রজনীতে, দিবসের শ্রান্তির পর বিভু-নাম স্মরণ করিয়া অবসন্ন শরীর শয্যায় ঢালিয়া দিয়াছি। শরীর অবসন্ন, মন বিক্ষিপ্ত। শয্যা-প্রান্ত-বিবর্ত্তন দ্বারা অর্দ্ধযামিনী গত হইল, তথাপি ক্লমহারিণী নিদ্রাদেবীর কোমল হস্তস্পর্শ অনুভব করিলাম না! আমার হৃদয়-গগনে কত অসংলগ্ন চিন্তা, মেঘের আড়ে সূর্য্যের মত উঁকি ঝুঁকি মারিয়া চলিয়া গেল! নদীবক্ষে যেমন ঊর্ম্মির পরে ঊর্ম্মি উত্থিত হয় এবং একে একে ঊর্ম্মিগুলি তীরে মিলাইয়া যায়, তেমনি আমার হৃদয়ের চিন্তাগুলিও একে একে কোথায় মিলাইয়া গেল! হৃদয়তীরে কাহারও যেন কিছুমাত্র চিহ্ন রহিল না! ক্ষণপরে অজ্ঞাত-সারে আমার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইল।

বহিরিন্দ্রিয়গণ অবসর গ্রহণ করিল। আমার নয়নদ্বয় মুদ্রিত হইল, কিন্তু অলৌকিক ভাবে দিব্যনেত্র লাভ করিয়া আমি দিব্যদৃশ্য দেখিতে লাগিলাম! দৃশ্যের লৌকিকতা এত অল্প যে তাহাকে বাধ্য হইয়া 'দিব্য' বলিতে হইতেছে! আমি দেখিলাম, একটী সুপ্রশস্তা নদী, কোন্‌দিকে, কতদূরে, তাহার তীর, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহার তরঙ্গায়িত বক্ষে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা তরঙ্গভঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া আপনি স্রোতের অনুকূলে ভাসিয়া চলিয়াছে, আমি স্বয়ং সেই তরণীর আরোহী। কেমন একটা কুয়াসায় সমাবৃত বলিয়া প্রথমে নৌকাখানির আকৃতি ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। তরীখানি যেন কাচবৎ স্বচ্ছ উপাদানে গঠিত; আমি ভিতর হইতে সামান্য চেষ্টায়ই তরণী-গাত্রে উৎকীর্ণ বাহিরের লেখা পড়িতে পারিলাম; বিশাল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে "বাসনা"। পলে পলে তরীখানির বর্ণ ও আকার ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সবিস্ময়ে দেখিলাম, স্বয়ং পিতৃদেব আমার তরণীর নিয়ন্তা, তিনি স্বয়ং এই তরণীখানির কর্ণ—ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। প্রেরকের অভাবে অলস ক্ষেপণীদ্বয় তরণীতে সজ্জিত! দেখিতে দেখিতে সংখ্যাতীত তরণী

নয়নপথের পথিক হইল। কচিং দুই এক-খানা তরণীতে দেখিলাম, আরোহী স্বয়ং কর্ণধার, কিন্তু তাহাদের সকলেরই দৃষ্টি ঊর্দ্ধে—কোন্ এক ঊর্দ্ধতম ধ্রুব-নক্ষত্রের দিকে সংস্থাপিত। নদীর আবর্ত্ত-সমূহ ও তরঙ্গনিকর তাহাদের নৌকার খরগতি প্রতিহত করিতে পারিতেছেনা। কোন কোন তরণীতে দেখিলাম, আরোহী স্বয়ং কর্ণ ধারণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু দৃষ্টি নিম্নদিকে, নদীর উত্তুঙ্গ তরঙ্গ ও ভয়াবহ আবর্ত্তের প্রতি! তাঁহারা দিগ্‌ভ্রষ্ট হইয়া বিপথে চালিত হইতেছেন। পদাহত ক্রীড়া-গোলকের মত তাহাদের তরণী তরঙ্গদ্বারা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত ও পতিত হইতে লাগিল।

তরঙ্গগুলির মুখে "অভিমান" এই চারিটী অক্ষর ফুটিয়া উঠিল। আর আবর্ত্তের ঘূর্ণায়মান জলরাশির মধ্যে "মমতা" এই তিনটী অক্ষর ভাসিয়া উঠিল। দেখিলাম, নদীর মধ্যে ইতস্তত: বিশাল-দেহ ছয়টী নানাবর্ণ-রঞ্জিত কুম্ভীর ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের পৃষ্ঠে যথাক্রমে "কাম," "ক্রোধ," "লোভ," "মোহ," "মদ" "মাৎসর্য্য" নাম লিখিত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে কুম্ভীরগণ পুচ্ছদ্বারা এরূপ ভয়ঙ্কর আন্দোলন উপস্থিত করিতেছে যে, তৎসমীপস্থ তরণীগুলি আবর্ত্তের আকর্ষণে তন্মধ্যগত হইয়া ডুবিয়া যাইতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সেই আরোহীগণই ভিন্ন-প্রকার গঠনের নৌকা লইয়া নদীবক্ষে অন্যত্র ভাসিয়া উঠিতেছে। নৌকার আকৃতি-পরিবর্ত্তনে কোন নৌকাই চিহ্নিত রাখিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু আরোহিগণ বহুবার ডুবিয়া ভাসিয়া উঠিলেও তাহাদিগের এমন একটু পূর্ব্বসাদৃশ্য রহিয়া যায়, যে, একটু নিপুণ অবলোকনেই তাহাদিগকে চিনিতে পারা যায়! এইরূপে অসংখ্য ব্যক্তিকে বহুবার তরণীসহ এই নদীতে ভাসিতে ও ডুবিতে দেখিলাম।

কতকগুলি নৌকায় কর্ণধার আছে। কর্ণধার ও আরোহী—ইহাদের পরস্পর আলাপ হইতে সংগ্রহ করিলাম যে, কোন নৌকার কর্ণধার আরোহীর "পিতা." কোন নৌকার মাতা, কোনটীর ভ্রাতা এবং কোনটীর বা শোণিত-সম্পর্কহীন বন্ধু। কোন কোন নৌকার সহিত একত্র সংলগ্ন অবিচ্ছিন্ন-ভাবে সম্বন্ধ আরও একখানি তরণী দৃষ্ট হইল। এই যুগল—তরণীর গঠন আরও বিচিত্র। এই দুইখানির একখানি ছাড়িয়া অন্যতরা তরণী যেন অসম্পূর্ণ! দুইখানিকে একত্র করিয়া ইহাদের সম্পূর্ণতা। এই তরণীযুগলের একটীর আরোহী পুরুষ, অন্যতরের আরোহিণী স্ত্রী। ইহাদের উভয়েরই দৃষ্টি পরস্পরের মুখে দৃঢ় সংবদ্ধ, মুহূর্ত্তও যেন চক্ষু ফিরাইবার অবসর নাই! অপলক নেত্র। এই নদীর একটী পরম বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে নদীর এমন উত্তুঙ্গ তরঙ্গ ও ভয়াবহ আবর্ত্ত দেখিয়াও বড় কেহ ভীত হইতেছে না! কচিৎ দুই এক-জন তরঙ্গে ভীত হইয়া সহস্রচেষ্টায় তরণী তীরের দিকে লইয়া যাইতেছেন! কেহ কেহবা স্বয়ং কর্ণ ধারণ করতঃ স্বেচ্ছায় হৃষ্টচিত্তে তরঙ্গের দিকে ও আবর্ত্তের মধ্যে নৌকা লইয়া যাইতেছেন। চক্ষুর সম্মুখে অসংখ্য তরণী তরঙ্গাভিঘাতে ভগ্ন ও আবর্ত্তের আকর্ষণে সলিল-নিমগ্ন হইতেছে দখিয়াও ইঁহারা মহাহর্ষে সেই দিকেই নৌকা চালিত করিতেছেন!

আমার নৌকাখানি খরবেগে স্রোতের সহিত ভাসিয়া চলিয়াছে। আমি তদুপরি

নিরুদ্যম অবস্থায় বসিয়া রহিয়াছি। আমার নৌকাখানি যেন অতি কষ্টে উন্মত্ত তরঙ্গাবলীর অভিঘাত সহ্য করিতেছে। এক একবার নৌকাখানি দুইটী তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া কোন অতলে ডুবিয়া যায়—মুহূর্ত্তের জন্য প্রাণের আশা শিথিল হয়—ক্ষণপরে আবার ভাসিয়া উঠে। মাঝে মাঝে নৌকাখানি এক একটী আবর্ত্তের আকর্ষণে স্থির হইয়া দাড়ায়, মনে হয় বুঝি, এই আকৃষ্ট তরণী আর কখনও গতি প্রাপ্ত হইবেনা! নদীবক্ষ একবার-মাত্র অবলোকনেই এই সকল বৈচিত্র্য আমার নয়ন গোচর হইল।

সর্ব্বপ্রথমে দেখিলাম, আমার বালক দেহ, তরণীর উপর সমাসীন রহিয়াছে বটে, কিন্তু তরণীর আকৃতি ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিনা,—গঠন ও বর্ণ অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল। দেখিলাম, পিতৃদেব কর্ণধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তিনিই তরণীর বস্তুতঃ নিয়ন্তা। মনে ভাবিলাম, পিতৃদেব আমার তরণীর নিয়ন্তা, তাঁহার স্বীয় তরণী কোথায়! ক্ষণপরে নিপুণ অবলোকনে দেখিলাম, আমার ক্ষুদ্র তরণীখানি তাঁহারই তরণীর উপরে সযত্নে রক্ষিত। সময়ে সময়ে আমাদের তরণী তরঙ্গে অভিহত হইতে লাগিল! পিতৃদেব একবার উর্দ্ধদিকে ও একবার আমার দিকে স্নেহ-মধুর মৌন-দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন।

সহসা পিতৃদেব তরণীসহ জলমগ্ন হইলেন। আমার কর্ণধার-বিহীন তরণী তরঙ্গাভিঘাতে আন্দোলিত হইতে লাগিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম, আমার বালকদেহ পরিবর্ত্তিত হইয়া শরীরে যৌবন লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। বুধগণ বলিয়া থাকেন, বালকেরাই বর্ণ-বৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু হায়, একি হইল! নানা বর্ণে-চিত্রিত কুম্ভীরগুলিকে এতদিন আমি উদাসীন-নেত্রে অবলোকন করিতেছিলাম, আমার জন্য ইহাদের কোন আকর্ষণ ছিলনা। তরঙ্গে ও আবর্ত্তে ভয় না হইলেও কেমন এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়ে মুগ্ধ হইতাম,—কিন্তু আজ যেন সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শরীরের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে হৃদয়ের ভাবগুলিও যেন আমূল পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছে। কুম্ভীরগুলির সৌন্দর্য্যে আমার নয়ন মুগ্ধ, হৃদয় এক অপরূপ বিস্ময়-মিশ্রিত প্রীতিভরে আকৃষ্ট। বনবাসে রঘুকুলবধূ জনকাত্মজা যেমন কনকমৃগ-দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ এই নয়ন-রঞ্জন কুম্ভীরগুলির বলবান্ মৌন আকর্ষণ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে লাগিলাম। আমার হৃদয় যেন তাহাদের একটী আন্তরিক আহ্বান শুনিতে পাইয়া উতলা হইয়া উঠিয়াছে। আমি এতক্ষণ তটহীন নদীতে পড়িয়া পারের উপায় খুজিয়া পাইতেছিলাম না। কুম্ভীরগুলিকে দেখিয়া মনে হইল—আমার মত নিরুপায় পরিতিতীর্ষু ব্যক্তিকে বুঝি ইহারাই পার করিয়া থাকে। আশে পাশে দেখিলাম, ডল্‌ফিনের পৃষ্ঠচারী এরায়ণের মত বহুব্যক্তি এই কুম্ভীরগুলির পৃষ্ঠ আশ্রয় করিয়া ভাসিয়া চলিয়াছেন। তাই মনে ভাবিলাম, আমিও এরূপে এই অপার জলরাশি পার হইতে পারিব। স্বয়ং নৌকার হা'ল ধরিলাম। 'কাম' নামক একটী নয়নরঞ্জন কুম্ভীরের সমীপস্থ হইয়া তাহার পৃষ্ঠে অবরোহণের চেষ্টা করিলাম। একটী মাত্র পদ কুম্ভীরের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করাইয়াছি, অমনি কুম্ভীর বিশাল স্বুবর্ণ-পুচ্ছের আলোড়ন দ্বারা এমন একটী আবর্ত্ত

সৃষ্টি করিল যে, আমি নৌকা সহিত উক্ত-প্রকার সঙ্কটজনক অবস্থায় বায়ুবশে ঘূর্ণায়মান গলিত বৃক্ষপত্রের মত ঘুরিতে লাগিলাম। বুঝি নৌকাখানি ডুবিল ! এখন আমাকে অপার অতল জলরাশি মধ্যে ভাসিয়া উত্তুঙ্গ তরঙ্গ-রাশির প্রচণ্ড আঘাত বক্ষে ধারণ করিতে হইবে—এই চিন্তায়, নদীর তরল রজত—রাশি মুহূর্ত্তে যেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মসীসমুদ্র বলিয়া প্রতিভাত হইল। আমার হৃদয় মৌন আর্ত্ত নাদ করিতে লাগিল! পিতাগো! তোমার স্নেহপূত মঙ্গলদৃষ্টি যদি অকালে আমার উপর হইতে প্রতিসংহৃত না হইত, তবে বুঝি আজ আমার এ বিপদ্ ঘটিত না ”

সহসা একটী অলৌকিক আলোকে আমার চক্ষু উদ্ভাসিত হইল। এতক্ষণ আকাশ ঘোর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন ছিল; সহসা ঘনরাশি ভেদ করিয়া দ্রব রজতবর্ণ একটী প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আকাশ-মণ্ডলে উদিত হইলেন! সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম, গ্রহরাজের সে প্রচণ্ডতা নাই,—আমি অনায়াসেই তাঁহার দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিতে পারিতেছি। কৃতাঞ্জলি হইয়া "উদয়গিরিমুপেতং ভাস্করং পদ্মহস্তং, নিখিল-ভুবন-নেত্রং রত্নরত্নোপমেয়ম্। তিমির-করি-মৃগেন্দ্রং বোধকং পদ্মিনীনাং, সুরবরমভি-বন্দে সুন্দরং বিশ্বদীপম্" বলিয়া নমস্কার করিলাম। দেখিতে দেখিতে গ্রহরাজের বক্ষে জলদক্ষর-লিখিত 'বিবেক' কথাটী ফুটিয়া উঠিল। প্রাণ অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে উচ্ছলিত হইল! মুহূর্ত্ত মধ্যে নদীবক্ষের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইল!! আবর্ত্ত ও তরঙ্গ-রাশি অনেকাংশে শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। কুম্ভীরদিগের সেই নয়ন-রঞ্জন মূর্ত্তি আর নাই, গলিত শবদেহের মত তাহাদের গাত্র হইতে পূতিগন্ধ বহির্গত হইতেছে, ঘৃণায় তাহাদের দিক্ হইতে চক্ষু ফিরাইলাম। চক্ষু ফিরাইবামাত্রই দেখিলাম,—এক সুদৃঢ় তরণী কর্ণধার কর্ত্তৃক চালিত হইয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে আবর্ত্ত ও তরঙ্গরাশি উপেক্ষা করিয়া, স্রোতের প্রতিকূলে নৌকাখানি খর-বেগে আসিতেছে, যে সকল আরোহী নদীর আবর্ত্তে ও তরঙ্গে ভয় পাইয়া, আকুল প্রাণে সেই নৌকার কর্ণধারকে আহ্বান করিতেছে, কর্ণধার, তাহাদিগকে তাঁহার সেই সুদৃঢ় তরণীতে তুলিয়া লইতেছেন। নৌকা নিকটে আসিলে দেখিলাম,—তাহাতে ২।৪ জনমাত্র আরোহী; তাহাদের ঊর্দ্ধ-প্রেরিত নয়ন-যুগল প্রেমের প্রভায় প্রোদ্ভাসিত, বদনমণ্ডল সৌম্য শান্তিসমুজ্জ্বল এবং সমস্ত কলেবরে একটী দিব্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত। নিপুণ অবলোকনে দেখিলাম, তরণীতে খোদিত রহিয়াছে "বিভু-নাম"। কর্ণে লিখিত রহিয়াছে "আত্মজ্ঞান"। দুইধারে দুইটী ক্ষেপণী প্রেরিত হইতেছে, তাহাতে লিখিত রহিয়াছে "নির্ম্মমতা"। কর্ণধার ও ক্ষেপণী-প্রেরকদ্বয়ের হস্তে স্বনাম-পরিজ্ঞাপক এক একটী পতাকা রহিয়াছে। কর্ণধারের নাম "গুরু" ও ক্ষেপণী-প্রেরকদ্বয়ের নাম "সাধু"। সেই তরণীতে আরুরুক্ষু ব্যক্তিকে গুরু প্রথমে অশিথিল আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতেছেন এবং সাধুদ্বয়ের অন্যতর তাহাকে হাতে ধরিয়া নৌকায় তুলিতেছেন। কর্ণধার উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন—"মানব, যদি এই অপার জলরাশি পার হইয়া "শান্তিধামে" যাইবার বাসনা থাকে, তবে এই বিভু-নাম-তরণীতে আরোহণ কর।

তোমার বাসনা তরণী ত্যাগ কর ” আহ্বান শুনিয়া নৌকার দিকে অগ্রসর হইতেছি, এমন সময় আমার নিদ্রাবেশ ভঙ্গ হইল। জাগিয়া দেখিলাম, শয্যা স্বেদসিক্ত হইয়াছে,—স্বপ্নের আন্দোলন এখনও শরীরে অনুভব করিতেছি! হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল! স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তবে বুঝি আমি 'বিভু-নাম'-তরণীতে আরোহণ করিতে পারিব না !!

শ্রীসুদর্শন চক্রবর্ত্তী।

দ্রোণাশ্রম

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

দ্রোণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম তাঁহাকে বলিলেন, আপনি শরাসন হইতে গুণ উন্মোচন করুন, এই কুমারগণকে উত্তমরূপে অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করুন; কুরুগৃহে পূজিত হইয়া সুপ্রীতমনে ভোগ্য বস্তু ভোগ করুন; কুরুদিগের এই রাজ্য ও যে কিছু ঐশ্বর্য্য আছে, আপনিই সমুদায়ের রাজা স্বরূপ হইয়া থাকুন; সমস্ত কৌরবেরা আপনারই হইল। হে ব্রাহ্মণ! আপনার যে কিছু প্রার্থিত, তাহা সিদ্ধই হইয়াছে, নিশ্চয় করুন। হে বিপ্রর্ষে! আমাদিগের ভাগ্যক্রমেই আপনি অনুগ্রহ করিয়া এখানে উপনীত হইয়াছেন।

অনন্তর মহাতেজস্বী দ্রোণ, ভীষ্ম কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া কুরুগৃহে সমাদরের সহিত বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

দারিদ্র্য-দশাগ্রস্ত দ্রোণ—পুত্র-বাৎসল্যে মুগ্ধ হইয়া—দুগ্ধপীড়ায় দগ্ধ হইয়া দ্রুপদ-সন্নিধানে গমন করিয়া যেরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, নিজমুখে তাহা ব্যক্ত করিলে তাঁহার দুরবস্থা দূর হইল। তিনি পরমসুখে কুরুগৃহে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়া, কুরু পাণ্ডব-যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। সুতরাং মহাভারতের মধ্যে দ্রোণাশ্রম বলিয়া কোন একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিলাম না। বরং তাঁহার পরিচয় লইতে গিয়া, তাঁহাকে আপৎকালে বিপন্ন হইতে (স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে) দেখিলাম।

এখন পাঁচটী বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে। (১) পাঞ্চাল-প্রদেশ, (২) কাম্পিল্য-নগর (৩) অহিচ্ছত্র নামক পুরী, (৪ মাকন্দী নামক নগরী, তথা (৫) চর্ম্মণ্বতী নদী। এই নামগুলি অতিপ্রাচীন, কোন বিপ্লবে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহার ঠিকানা করা সহজসাধ্য নহে, এইজন্য ইংরাজকৃত মানচিত্রে তাহা দৃষ্ট হয় না। ভারতীয় অধুনাতন অভিধানের মধ্যে শব্দকল্পদ্রুম প্রধান, তাহাতেও তাহাদের কোন তথ্য পাইলাম না। সাধারণ অভিধানে "দেশবিশেষ" বা "পুরীবিশেষ" বলিয়া দুই কথায় প্রত্নতত্ত্বের মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন।

শব্দকল্পদ্রুম।

(১) পাঞ্চাল—দেশবিশেষ—দ্রুপদ-রাজ-নগর, অধুনা—ফরক্কাবাদ
(২) কাম্পিল্যনগর—উত্তরদেশ-বিশেষ—
(৩) অহিচ্ছত্র—পুরীবিশেষ, দেশবিশেষ—
(৪) মাকন্দী নগরী—নগরীবিশেষ—
(৫) চর্ম্মণ্বতী নদী—নদীবিশেষ, 'বন্দেল-খণ্ডদেশে চম্বল ইতি খ্যাতা।

এইরূপ লেখায় শব্দকল্পদ্রুমের মর্য্যাদা যে কত অল্প হইয়াছে, ভারত-ভ্রমণকারী পাঠকদিগকে তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

অনেকে পাঞ্চাল দেশকে পঞ্চনদ-মধ্যগত পাঞ্জাব প্রদেশ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, আর যদি ফরক্কাবাদ জেলা ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা মধ্যদেশ-মধ্যগত বলিয়া বিবেচিত হইবে, সুতরাং এস্থলেও সংশয়ের নিরশন হইল না।

কাম্পিল্য—নগরের উদ্দেশ কোথাও পাওয়া যাইতেছেনা, কিন্তু দুন (উত্তর-হিমালয়ের উপত্যকাভূমিতে) প্রদেশে দুইটী প্রাচীন নগরের নাম "কালসী" এবং "কামলী"। বর্ত্তমানকালে তাহাদের অবস্থা অতি হীনভাবাপন্ন হইলেও, বৌদ্ধযুগে তাহারা যে সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল, পুরাতন ভগ্ন স্তূপসকল তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বৃটিশ বন্দোবস্ত কালে তাহার কোনরূপ অনুসন্ধান হয় নাই বলিয়া, তাহার জন্য আমাদিগকে এত কষ্ট পাইতে হইতেছে। বস্তুতঃ 'কালসী' না হউক্, 'কামলী' যে কাম্পিল্যের অপভ্রংশ—তাহাতে বিচিত্রতা নাই। তাহা হইলে, পাঞ্চালদেশ অতি বিস্তৃত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে, এবং তাহা পঞ্চনদ-মধ্যগত না হইয়া গঙ্গাযমুনার মধ্যগত বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে।

অহিচ্ছত্র-নগরী নির্দ্দেশ করিতে গিয়া আমরা যে পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার করিব, তাহার ফল নিতান্ত বিস্ময়জনক।

পুরাণে কথিত আছে, পুরাকালে মহর্ষি কশ্যপ এক মহাযজ্ঞ করিয়া সমস্ত দেব, ঋষি এবং মানবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। ইন্দ্রদেব মহাসমারোহে যজ্ঞস্থলে আসিতেছিলেন। পথে দেখিলেন, এক গোষ্পদে, ষষ্টিসহস্র বালখিল্য মুনি সন্তরণ দ্বারায় পার হইতেছেন। তাহা দেখিয়া, তিনি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না! ইন্দ্রের এইরূপ অকারণ হাস্য দেখিয়া, তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দ্বিতীয় ইন্দ্র সৃষ্টি করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাহাতে যে তপস্যার প্রয়োজন হইয়াছিল তজ্জন্য তাঁহারা ঘর্ম্মাক্ত হইয়া পড়েন। সেই ঘর্ম্ম—স্রোতোরূপে পরিণত হইয়া "শুভা" নামে নদী প্রবাহিতা হইয়াছে। কালে সে নাম বিকৃত হইয়া "শুসোয়া" নামে অভিহিত হইয়াছে। এই শুসোয়া নদী, হিমাচলের নাগসিদ্ধ বা নাগাচল, বা নাগ-পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দুন-প্রদেশ প্লাবিত করতঃ ভাগীরথীতে মিলিতা হইয়াছে। এই নাগ-পর্ব্বতে যে নাগজাতি (ঐতিহাসিকেরা ইহাদিগকে শকজাতি scythian বলিয়া অনুমান করিয়াছেন) অবস্থিতি করিত, তাহারাই ঐ শুসোয়া নদীর ধার ধরিয়া দুন-প্রদেশে আসিয়া অবস্থিতি করতঃ ভারত আক্রমণ করিবার জন্য যে আয়োজন করে, তাহা এই দুন-প্রদেশের ছত্রশীলা নামক নগরীতে সম্পাদিত হয়। বর্ত্তমান সৈনিক-নিবাস চাকরাতা শৈলের পথে কালসীর অনতিদূরে এই ছত্রশীলা নগরী সংস্থাপিত ছিল। নাগজাতির প্রতিষ্ঠিতা এই ছত্রশীলা, কি সেকালে "অহিচ্ছত্র" বলিয়া কথিত হইত না? দুর্দ্দমনীয় নাগদিগকে লোকে "অহি" বলিয়া সম্বোধন করিবে তাহাতে আর

বিচিত্রতা কি? বিচিত্র না হইলেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। এই অহিচ্ছত্র নগরী যে দ্রোণাচার্য্যের রাজধানী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সংশয় থাকিতেছে না।

দ্রোণাশ্রম নির্ণয় করিতে গিয়া কিরূপ বিভ্রাটে পড়িয়াছি, পাঠক একবার অনুভব করুন!

ইংরাজগবর্ণমেণ্ট কৃত মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলে প্রতীত হয়, বর্ত্তমান দ্রোণাশ্রম বা দেহরাদুন উত্তরহিমাচলের পাদপীঠে ৪৫ × ১১ = ৪৯৫ বর্গমাইল। তাহাতে শিবালয়ের ২০০ এবং উপত্যকা-ভূমির প্রাচীন জনস্থলী ৬০ বর্গমাইল যোগ করিলে বর্ত্তমান দ্রোণাশ্রম ৭৫৫ বর্গমাইল পরিমাণ হয়। এই বৃহদায়তন স্থানের উত্তর পশ্চিমাংশে হিমালয়ের গাড়োয়ান এবং মসূরী শৈলশ্রেণী, পশ্চিম দক্ষিণাংশের জলসার এবং সরমূর-রাজ্য, পূর্ব্বাংশে বৃটিশ গাড়োয়ান, এবং দক্ষিণাংশে অম্বালা এবং সাহারণপুর জেলা। জলসার হইতে যমুনা প্রবাহিতা হইয়া, সিরমোর রাজ্যকে দক্ষিণে রাখিয়া, দ্রোণাশ্রমকে ক্রোড়ে করিয়া যুক্ত প্রদেশে যাত্রা করিয়াছেন। পূর্ব্বাংশে তপবন এবং লক্ষ্মণঝোলার পার্শ্বদিয়া দ্রোণাশ্রমকে ক্রোড়ে করত ভাগীরথী হরিদ্বারে উপনীত হইয়াছেন। এই স্থানের পরিমাণ ৭৫৫ বর্গমাইল।

শিবালয়ের দক্ষিণ শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া, মসূরী-পর্ব্বত-শ্রেণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, তন্নিম্নস্থ জনপদ কোন কালে যে হ্রদ ছিল, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণয় করা যাইতে পারে। যাঁহারা কাশ্মীর-প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং তাহার রাজধানী শ্রীনগরের হরিপর্ব্বতের শিখরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া উলর হ্রদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, উপত্যকা-ভূমির হ্রদসকল কিরূপ কালে শুষ্ক হইয়া তাহার জলস্থান জনপদে পূর্ণ হইয়া থাকে! দ্রোণাশ্রম তাহারই নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে। এই শুষ্ক হ্রদ অবস্থান্তরিত হইয়া একদিকে যেমন আবাদ হইয়া যাইতেছে, অন্যদিকে তাহার পরিণাম বৃহৎ বৃহৎ ঝীলরূপে পরিণত হইয়া, তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে! দুনের পূর্ব্বাংশে 'যোগীওয়ালা' ঝীল প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ এবং অর্দ্ধ-মাইল প্রস্থে বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহাতে অপরিমিত নলখাগড়া জন্মিয়া, তাহার জলরাশি কর্দ্দমাক্ত করিয়া রাখিয়াছে। তাহারই অপর পার্শ্বে 'গোসাইওয়ালা' ঝীল প্রায় তিন বর্গমাইল দীর্ঘ প্রস্থে প্রলম্বিত। তাহার অপর পার্শ্বে আর একটী ঝীল প্রায় দেড় মাইল দীর্ঘ এবং— ¾ মাইল প্রশস্ত বিস্তারিত রহিয়াছে। এই তিনটী ঝীল হইতে সং, সুসোয়া এবং রাকতুণ্ডু নামে তিনটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইয়া, হৃষীকেশ এবং হরিদ্বারের মধ্যবর্ত্তী গঙ্গায় মিলিতা হইয়াছে। ঠিক্ এই ভাবে আমরা কুরুক্ষেত্রের মধ্যে দ্বৈপায়ন হ্রদ এবং সন্নাহসকল সরস্বতীর গতিপথে দেখিয়াছিলাম। যদি দুনের সমস্ত সমতল ক্ষেত্র সেইরূপে প্রাচীন হ্রদ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, দ্বাপরের দ্রোণাশ্রম কোথায় নির্দ্দিষ্ট করা যাইবে?

জনশ্রুতি একেবারে উড়াইয়া না দিলে, যে ফল-লাভ হয়, অনুসন্ধান-সূত্র ধরিয়া তাহাতে বঞ্চিত হই নাই, বরং অনুসন্ধান করিতে গিয়া অনেক প্রকৃত তথ্য লাভ করিয়াছি।

বৈদিক-কালের গ্রন্থনিচয় সাক্ষ্য দিতেছে যে, বহুদূর উত্তর-হিমালয় হইতে আর্য্য-সন্তানগণ ক্রমে সিন্ধুতীরে অবস্থিতি করিয়া সমস্ত শাখা নদীর ধার ধরিয়া পঞ্জাবে আসিয়া উপনীত হন। তখন তাহাকে তাঁহারা ব্রহ্মর্ষিদেশ বলিতেন। সেই ব্রহ্মর্ষি-দেশের স্বর্গ দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক, অপ্সরোলোক, তন্নিকটস্থ হিমাচল অবধারিত ছিল সেইজন্য ভূস্বর্গ কাশ্মীরে আমরা প্রাচীন ঋষিমুনিদিগের আশ্রম অদ্যাপি বর্ত্তমান দেখিতে পাই। নিজ কাশ্মীর কশ্যপপুরী—তাহার প্রান্তবর্ত্তী হিমাচলে নাগপুরী, তাহারই অভ্যন্তরে মধ্যভাগে ভৃগু-মুনির আশ্রম। এই নাগপুরীর পূর্ব্বাংশের শৈলমালা গন্ধর্ব্বপুরী বলিয়া কথিত হয়। তাহার পরপ্রান্তে ভগবান্ মহেশ্বরের কৈলাশ-পুরী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শিখরে অবস্থাপিত হইয়া, দেবদুর্লভ স্থান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। এই সকল কথা উল্লেখ করিয়া কাশ্মীর-বাসী পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থান-কালে এই পথ ধরিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। এই হরি-পর্ব্বতের নিম্নতলে দ্রৌপদী পতিতা হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই অনন্তনাগে সমা-গত হইয়া, সুঠাম সুন্দর নকুল-সহদেব দেহলীলা সম্বরণ করেন এই চন্দনবাটীর তুষারমণ্ডিত নদী-সৈকতে মহাবীর সব্যসাচী শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই ভৈরব-ঘাটীর শিখরোপরি উঠিতে না পারিয়া ভীম-প্রতাপ মহাবীর ভীম মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগমনে অসমর্থ হইয়া লীলা সম্বরণ করেন—এই অমরনাথের পথই মহাপ্রস্থান-মার্গ। এই স্থান অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মরাজ সশরীরে স্বর্গারোহণ করেন। গণেষবল তীর্থের পরপ্রান্তে পাহালগাম নামক একটী ক্ষুদ্র জনপদ, তাহার চারিদিকে গগনভেদী পর্ব্বতশ্রেণী বরফে আচ্ছন্ন। নিম্নে ঘন-বিজন বন মধ্যে, লম্বোদরী ঘোর গর্জ্জনে প্রবাহিতা। এই পর্ব্বতশ্রেণীর দক্ষিণ প্রান্তে যে ঘন বন রহিয়াছে, তাহাকে দণ্ডকারণ্য কহে। অনতিদূরে ভৃগুমুনির আশ্রম। মহাভারত এবং রামায়ণের পাঠকগণ ইহার সমস্যা কিরূপে পূরণ করিবেন, জানিতে সকলেই উৎসুক হইবেন, সন্দেহ নাই।

আর্য্যগণ সরস্বতীর তীর ছাড়িয়া মধ্যদেশে প্রস্থান করিয়া, পবিত্রসলিলা গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, মধ্যদেশেই সমস্ত তীর্থ বর্ত্তমান। তন্মধ্যে কেদারখণ্ড পবিত্রতম। এই কেদারখণ্ডে গঙ্গাযমুনার অনুপমলীলা। গঙ্গা, হরজটা (গোমুখী) হইতে নিস্রাবিতা হইয়া যে মহীমণ্ডল পবিত্র করত সাগরবক্ষে সমর্পিত হইয়াছেন, তাহার ন্যায় পুণ্যভূমি জগতে আর নাই। সেই স্থানেই শ্রীরাম-চন্দ্রের অযোধ্যানগরী, তথা হইতে রাম-চন্দ্র বনবাস-কালে দক্ষিণাপথের দণ্ডকা-রণ্যে অবস্থিতি করিয়া দুর্দ্দম দশাননকে

দমন করিয়াছিলেন। তবে কাশ্মীরের 'দণ্ডকারণ্য' কোন্ রামের! তাহার পর কৃষ্ণ-প্রাণ পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থানে প্রয়াণ করিলে, দেখিতেছি, তাঁহারা কেদারখণ্ডের মধ্য দিয়া বদরিকাশ্রম অতিক্রম করিয়া যাত্রা করিতেছেন! তাহা হইলে অমরনাথের পথের যাত্রী কোন্ যুগের পাণ্ডবেরা—পাঠক বলিতে পারেন? কাশ্মীরবাসী পণ্ডিতদিগের সহিত মধ্যদেশের পণ্ডিতদিগের যে শাস্ত্রবিসম্বাদ উপস্থিত হইল, কোন্ পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত তাহার মীমাংসা করিবেন?

পৃথিবীর আদিম মনুষ্য জাতির মধ্যে হিন্দুজাতি যে কত পুরাতন, তাহার ধর্ম্মগ্রন্থ যে কত পুরাতন, দেশভেদে তাহার ব্যবহার-গত পার্থক্য যে কত বিভিন্নাকারে পরিণত, তাহার ইয়ত্তা করিতে না পারিয়া, পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অবাক্ হইয়া গিয়াছেন! এই গোলকধাঁধায় পড়িয়া তাঁহারা কহিয়া থাকেন যে—The early history of the Hindoos is lost in the mists of mythology, a wilderfield which it is impossible to explore thoroughly + + + আমরা বলি, ইহা সত্য সত্যই ছয় হাজার বৎসরের সৃষ্টিনিকেতন হইলে, তাঁহাদিগকে এত বিভীষিকাময় চিন্তাসাগরে নিমজ্জিত হইয়া হতাশ হইতে হইত না! ইহা কল্প-কল্পান্তরের মনু-মন্বন্তরের সামগ্রী। যুগ-ধর্ম্মের প্রবাহে পড়িয়া, কত রাম, কত কৃষ্ণ ভাসিয়া গিয়াছেন! কেদারখণ্ডের বিচিত্র লীলা তাই বর্ত্তমান গঙ্গা-যমুনা-কূলে দর্শন করিতেছি! কথিত আছে, এই কেদারখণ্ডের উন্নত হিমালয়-শৃঙ্গ হইতে পতিতপাবনী গঙ্গা প্রবাহিতা হইয়া, শিবালয় ভেদ করত বহুদূর সাগরে মিলিতা হইয়াছেন। তাহা দেখিয়া জনতোষিণী যমুনা উর্দ্ধবাহু হইয়া, শিবালয়ের পার্শ্ব দিয়া, প্রবাহিতা হইয়া, মথুরা-বৃন্দাবনের অপূর্ব্ব-লীলায় সংমিলিত হইয়াছেন! মর্ত্ত্যের শিবালয় পরিত্যাগ করিয়া, শিব, শিবলোকে চলিয়া গেলে, চক্রধারী হরি, শিবালয় শূন্য পাইয়া বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত সমস্ত হিমালয়ে যে লীলা বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহারই প্রসঙ্গ ধরিয়া আমরা দ্রোণাশ্রমের স্থান নির্ণয় করিতে যত্ন পাইতেছি। শিবলীলা-প্রসঙ্গে দক্ষালয়ে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে দক্ষপুরী ছারখার্ হইয়া যায়! তাহার পর ত্রেতাযুগে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের জীবন-লীলা বিস্তারিত। কথিত আছে, রাবণের নিধনসাধন করিয়া রামচন্দ্র প্রত্যাগত হইলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-বধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত আদেশ করেন। তদনুসারে রাম, লক্ষণ—প্রব্রজ্যা অবলম্বন করতঃ শিবালয়ে উপনীত হইয়া কঠোর তপস্যায় নিরত হন! রাম হৃষীকেশে এবং লক্ষ্মণ তপবনে অবস্থান করিয়া আপ্তকাম হন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাল্মীকির রামায়ণে ইহার বিন্দুবিসর্গের উল্লেখ নাই! তাহার পর দ্বাপরে কৃষ্ণলীলা আরম্ভ হয়। ব্যাস হৃষীকেশের গঙ্গাপুলিনে উপবিষ্ট হইয়া, তাহা যে ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে সকল সংশয় নিরসিত হইতেছে বটে, কিন্তু ভরতাশ্রম, শত্রুঘ্নাশ্রম এবং লক্ষণাশ্রমের

স্থায় দ্রোণাশ্রম কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছেনা। মহারথী দ্রোণ সামান্য লোক ছিলেন না। যিনি ভার্গব পরশুরামকে প্রসন্ন করিয়া সমস্ত দিব্যাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যিনি পঞ্চালাধিপতি দ্রুপদকে শিক্ষা দিয়া তাঁহার অর্দ্ধেক রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি সমরে অজেয় বলিয়া বিখ্যাত থাকায় ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির বীরধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া অসত্য অবলম্বন করত যাঁহার নিধন সাধন করেন, সেই অগাধশক্তিশালী শূরবরের আশ্রমের কোন চিহ্ন বর্ত্তমান নাই—কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব! তবে বিশ্বাসীর অন্তরে প্রবোধ দিবার অবসর আছে। বিপ্লবের উপর বিপ্লব আসিয়া তাহা কি ধ্বংস করে নাই! এখন আমরা তাহারই সমালোচনা করিব।

দ্বাপরলীলার শেষাংশে কুরুপাণ্ডবের তুমুল যুদ্ধ আরব্ধ ও পরিসমাপ্ত হয়। তাহাতে আত্মীয়, স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের নিধন হইলে, বিদুর, পুত্রশোকাতুর ধৃতরাষ্ট্র এবং দেবী গান্ধারীকে সঙ্গে করিয়া, এই হিমাচলের পথে মহাপ্রস্থান করেন। তাহার পর পাণ্ডবেরা এই পথে তাঁহাদিগের অনুসরণ করেন। তখন পরীক্ষিৎ বালক, সেই বালকের হস্তে বিশাল ভারতরাজ্য! রাজ্য অরক্ষিত দেখিয়া, নাগাধিপতি তক্ষক ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন (এই নাগপুরের রাজধানী "তক্ষশিলার" ভগ্নাবশেষ পেশোয়ারের সন্নিকটে মহাবন নামক অরণ্যে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে) এবং পরীক্ষিৎকে করায়ত্ত করিয়া, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করেন। তাহার পর কিরূপ সন্ধি স্থির হইয়াছিল, তাহা অবগত হইবার উপায় বর্ত্তমান না থাকিলেও ইহা নিশ্চয় যে, পশ্চাৎ পরীক্ষিৎ নিষ্কৃতি না পাইয়া, সেই নাগপুরেই ঘাতক দ্বারায় নিহত হন; তাহার পর বহু আয়াসে তৎপুত্র জনমেজয়, সর্পযজ্ঞে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। ইহাতে যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে ভারত আবার ছার-খার হইয়া যায় এবং ব্রাহ্মণবল চূর্ণীকৃত হইয়া পড়ে। সম্ভবতঃ নাগজাতি বৌদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত ছিল। তাহাদের প্রবল বলের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধমত প্রবলতর হইয়া ভারতের ধর্ম্মকর্ম্ম আক্রমণ করে। পুরাতন তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিলে দেখা যায়, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে চিরকাল ধর্ম্ম লইয়া কলহ হইয়া আসিতেছে। তা'ই দেখিতে পাই, ক্ষত্রিয়রাজ জনক ব্রাহ্মণাধিকারের রাজর্ষি, ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ, সুতবধে বলরামের ব্রহ্মশাপ! এপর্য্যন্ত ধর্ম্ম লইয়া কলহ না হইলেও, শক্তিসামর্থ্যের উপর ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় কেন ব্রাহ্মণাপেক্ষা হীন হইবে! ধর্ম্ম কেন একতন্ত্রী হইয়া ব্রাহ্মণাধিকারে বিরাজ করিবে? শক্তিশালীক্ষত্রিয় বেদ অধ্যয়ন করিয়া যখন 'বেদবিৎ' বলিয়া প্রথিত হইতে পারেন, তখন তদনুসারে কর্ম্ম-ধর্ম্ম পালন করিয়া, কেন ব্রাহ্মণাধিকার প্রাপ্ত হইতে পশ্চাৎপদ হইবেন? সুতরাং এতকাল বেদ এবং ব্রাহ্মণমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহার পর ক্ষত্রিয়পুত্র শাক্যসিংহ তাহাও লোপ করিতে বসিলেন, (১)

(১) তিনি কেবল হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র কেন, দেবভাষা "সংস্কৃতভাষা"কেও উড়াইয়া দিয়া,

তিনি এককালে বৈদিক ধর্ম্মকে উড়াইয়া দিলেন, বর্ণধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মনামে এক অভিনব ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। সে বিপ্লব সহজে নিবারিত হয় নাই। তাহার জন্য অনেক বীর ব্রাহ্মণ-পুরুষকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল,—হিমালয় হইতে কুমারীকা, ব্রহ্মদেশ হইতে বেলুচিস্থান পর্য্যন্ত সমস্ত 'বিহার' তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই বিপ্লব প্রায় দুই সহস্র বৎসর ভারতে রাজ্য করিয়া বিতাড়িত হইলে, কোথা হইতে মুসলমান্ বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহার প্রকোপে পড়িয়া ভারত আবার ছার্ খার্ হইয়া যায়! সুঠাম দেব-বিগ্রহ সকল বিকলাঙ্গ হইয়া যায়, অপূর্ব্ব মন্দিরসকল বিচূর্ণিত হয়, হিন্দু-বৌদ্ধ-শাস্ত্র সকল ভস্মাবশেষে পরিণত হয়! এই কেদারখণ্ডে দেখিতেছি, এমন পুরাতন কীর্ত্তির স্থান নাই, যেখানে দুরন্ত মুসলমান্ হস্ত নির্ম্মম হইয়া তরবারির আঘাত না করিয়াছে! হৃষীকেশের ঘোরারণ্য মধ্যে কত খণ্ডমূর্ত্তি বিকৃতাকারে পতিত রহিয়াছে! তন্মধ্যে বিশেষরূপে তিনটী বিপ্লবের (গ্রীক্, বৌদ্ধ এবং মুসলমান্) চিহ্ন বর্ত্তমান। অন্যদিকে যমুনার উপকূলে কালেসী নগরের ভগ্নাবশেষ যাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার প্রস্তরফলক অবলোকন করিলে বৌদ্ধকীর্ত্তি কিরূপে বিধ্বংস্ত হইয়াছে, তাহা আর ভাবিয়া স্থির করিতে হয় না! এইরূপ বিপ্লবের উপর বিপ্লব আসিয়া অন্যান্য কীর্ত্তিকলাপের সহিত দ্রোণাশ্রমের চিহ্ন যে বিলুপ্ত করিয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

যুক্তপ্রদেশ বৃটিশ-করায়ত্ত হইলে, যৎকালে নূতন বন্দবস্ত হইতে আরম্ভ হয়, তৎকালে মনস্বী রাজকর্ম্মচারিগণ, পুরাতত্ত্বের অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহারা উপরোক্ত বিপ্লব সকলের অনেক কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু দ্রোণাশ্রমের প্রকৃত স্থান নির্ণয় করিতে না পারিয়া অগত্যা বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, সমস্ত 'দেহরাদুনই' দ্রোণাশ্রম, কিন্তু "দেহরাদুন" শব্দের অর্থ সংগ্রহ করিলে, কদাচ তাহা বলিতে পারিতেন না।

"দুন" শব্দের অর্থ—উপত্যকাভূমি এবং "দেহরা" শব্দের অর্থ—আশ্রম বা কুটীর। "দুন" পাহাড়ী ভাষা, "দেহরা" পাঞ্জাবী, এই পাহাড়ী ভাষার সহিত পাঞ্জাবী ভাষা কোন্ সূত্রে সংযুক্ত হইল, জানিতে পারিলেই স্থানটীর নাম উপলব্ধ হইবে।

সম্রাট্ আরংজেবের রাজত্বকালে, পঞ্জাবের শিখগুরুদিগের মধ্যে গদী লইয়া বিবাদ আরম্ভ হয়, তাহাতে গুরু তেগ্‌বাহাদুর কৃতকার্য্য হন। কিন্তু অচিরকালমধ্যে দিল্লীর দরবারে ধর্ম্মের জন্য তাঁহাকে শির দিতে হয়, সুতরাং আবার গদী লইয়া গোল উঠে, এই অবসরে গুরু হররায়ের পুত্র, গুরু রামরায়, দণ্ডায়মান হইয়া গদী অধিকার করিতে যত্নবান্ হন, কিন্তু তেগ্‌বাহাদুরের বীরপুত্র গুরু গোবিন্দ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দণ্ডায়মান হইলে, তাঁহাকে আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন করিয়া সম্রাট্ আরংজেবের শরণাগত হইতে হয়।

সামান্য বেহারদেশমাত্র-প্রচলিত 'পালি' ভাষাকে তৎস্থানে উচ্চাসন দিয়াছিলেন

সম্রাট্ তাঁহার হিতকামনা করিয়া গাড়োয়ানাধিপতির নিকট আশ্রয়-দান-জন্য পাঠাইয়া দেন। রামরায় তাঁহারই প্রসাদে এবং নিজ-প্রভাবে 'দেহরা'য় অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করেন। কালে তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তির প্রভাব সমস্ত দূন-প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে, অনেক ভূসম্পত্তি জাইগীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন, তাহাতে তাঁহার নামে 'দেহরা-দূন' আশ্রম প্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে। এই গুরু রামরায়ের শিষ্য প্রশিষ্যেরা, এখনও দেহরা দূনের প্রকৃত অধিপতি। সুতরাং বর্ত্তমান দেহরাদূন আশ্রমের সহিত দ্রোণাশ্রমের কোনরূপ সম্বন্ধ রহিল না।

যে দ্রোণাশ্রম লইয়া আমরা এত আন্দোলন করিলাম, তাহার ঠিকানা কোথাও না পাইয়া দুঃখিত হইতে পারি, কিন্তু হতাশ্বাস হইতে পারিনা, কারণ মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারতে অগ্রেই উল্লেখ করিয়া রাখিয়াছেন, যে মহর্ষি ভরদ্বাজ উত্তর-হিমালয়ের কোন প্রদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া ঘৃতাচীর সম্মিলনে দ্রোণাচার্য্যকে উৎপাদন করেন। তাহার পর দ্রোণের শিক্ষা, দীক্ষা, সেই স্থানেই হইয়াছিল, পরে পঞ্চালাধিপতি দ্রুপদকে রণে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্যার্দ্ধ গ্রহণ করতঃ অহিচ্ছত্র নগরে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন। এই অহিচ্ছত্র-নগর গঙ্গাযমুনার মধ্যগত প্রদেশে সংস্থাপিত বলিয়াই বোধ হইতেছে। তাহা হইলে, দেওদার পর্ব্বতের শিখরোপরি বর্ত্তমান দেহরাদুন হইতে প্রায় বার মাইল দূরে যে "দোয়ারা" নামক জনপদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকে দ্রোণাশ্রম বলিয়া অবধারণ করিলে, জনপ্রবাদের সত্যতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। এই জন-প্রবাদ উপেক্ষণীয় নহে, কারণ ইতঃপূর্ব্বে আমরা যে উপত্যকাভূমিতে "হ্রদ ছিল" ভাবিয়াছিলাম, তাহা প্রকৃত হইলে তাহার কূলে "দোয়ারা"—দ্রোণাশ্রম সঙ্গত হইতে পারে; কালে প্রকৃত নাম অপ্রকৃত হইয়াগিয়াছে।

এখন পঞ্চালদেশ কোথায়, নির্ণয় করিতে পারিলে, অহিচ্ছত্র নগরী এবং কাম্পিল্য নগর কোথায় অবস্থিত ছিল, স্থির করিতে পারা যায়। অভিধান-প্রণেতা মহাপুরুষেরা কহেন, পাঞ্চাল "দেশবিশেষ" দ্রুপদরাজার দেশ—"ফরক্কাবাদ"! কি আশ্চর্য্য অনুসন্ধান!!! তাহার পর পঞ্চজাতির নাম করিয়া—(তক্ষা, তন্ত্রবায়, নাপিত, রজক এবং চর্ম্মকার লইয়া) এই পঞ্চজাতির বাসস্থানকে পঞ্জাব বা পঞ্চাল দেশের উদ্ভব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং তাহা ধরিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারিলাম না। বহুকাল পূর্ব্বে জেনারেল্ ক্যানিংহাম (General Cunninghum, The great archæological serveyor of India in 1862—65) অহিচ্ছত্র এবং কাম্পিল্য নগর খুঁজিয়া বাহির করিতে আমার মত মহাবিপদে পড়িয়াছিলেন! তখন সর্ব্বত্রই বৌদ্ধকীর্ত্তিতে পরিব্যাপ্ত ও মুসলমান্ বীরপুরুষদিগের দ্বারা বিকৃত এবং বিধ্বস্ত; কাহার সাধ্য তাহার পক্কোদ্ধার (explose) করে? কিন্তু

দেখিতে পাই, তিনি গবেষকের গৌরবান্বিত আসন গ্রহণ করিয়া, সমস্ত ভারতবর্ষের পুরাতন অতুল্য অমূল্য.নিধি উৎক্ষিপ্ত করিতে, কষ্ট-স্বীকারে অণুমাত্র বিরত হন নাই।

তিনি ব্যাস-প্রণীত হিন্দুজাতির অপূর্ব্ব ইতিহাস মহাভারত পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন, যে, মহারাজ্য পাঞ্চাল-প্রদেশ, হিমালয়ের ক্রোড় হইতে আরব্ধ হইয়া চম্বল নদী পর্য্যন্ত বিস্তারিত। এই চম্বল স্রোতস্বতী যমুনার একটি প্রথম শাখা কোহারী নদীকে পরপ্রান্তে ফেলিয়া চেনপুরবারি প্রান্তরে যাইয়া প্লাবিত রহিয়াছে। ইহারই অপর প্রান্ত হইতে গঙ্গা-যমুনার বিকাশ। তাহা হইলে, মহামতি চৈনিক পরিব্রাজক 'হিউএন্ তাসান্' যে পথ দিয়া ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়া গেলে স্থানটি সুন্দররূপে চিনিয়া লইতে পারা যায়। (see plate II map of N. W. India A. D. 650, Published in vol. I. Cunningham's archæological servey of India page 2/3)।

যে হিমালয় নৈনিতাল হইতে নাহন রাজ্য অতিক্রম করিয়া, পাঞ্জাব প্রদেশে প্রলম্বিত হইয়াছে, তাহার উপত্যকাভূমি ক্রমে বিস্তৃত হইয়া চম্বল * নদী পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়া পুরাতন পাঞ্চাল রাজ্য নির্দ্দেশ করিতেছে। তাহার ঠিক্ দক্ষিণে 'অহিছত্র' রাজধানী নৈনিতাল হইতে প্রায় ৮০ মাইল এবং তথা হইতে কাম্পিল্য-নগর প্রায় ৪৮ মাইল ঠিক্ দক্ষিণে গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থলে—ইহারই সুদূর উত্তর হিমালয়ে বদরিকাশ্রম। এই আশ্রম হইতে ক্রমে দক্ষিণ প্রদেশে অবতরণ করিতে হইলে, ব্রহ্মপুর হইয়া রামনগর গোবিষাণ অতিক্রম করিয়া দক্ষিণে চান্দাসী এবং বামে বাঁশবেরেলী রাখিয়া অগ্রসর হইলেই দ্রোণাশ্রম 'অহিচ্ছত্র' নগরী সম্মুখে পতিত হয়। তথা হইতে বাদাউন পশ্চাৎ করিলে পুরাতন গঙ্গাতীরে যে বিস্তীর্ণ রাজ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই রাজধানী কাম্পিল্য-নগর দ্রুপদ রাজার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

যদি বর্ত্তমান-কালের "চম্বল" পূর্ব্বকালের 'চর্ম্মণ্বতী' নদী বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে দ্রোণাচার্য্যের রাজ্য-বিভাগ ঐতিহাসিক সত্যে সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হইল। এরূপ হইলে দ্রুপদরাজার জনপদযুক্ত "মাকন্দীদেশ" চর্ম্মণ্বতী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত পাঞ্চাল রাজ্য আবিষ্কার করিতে আর কালবিলম্ব হয় না। পূর্ব্বকালের পাঞ্চাল অতি বিস্তৃত দেশ। হিমালয়-প্রদেশ দ্রোণাচার্য্যের রাজ্য নির্দ্ধারিত হইলে, অবশিষ্ট দক্ষিণাংশ (পুরাতন গঙ্গার দক্ষিণাংশ) দ্রুপদ রাজা ধরিয়া লইলে, বর্ত্তমান

* চম্বল নদী সম্বন্ধে মহাভারতে একটি কৌতুকাবহ উপাখ্যান আছে। রন্তিদেব-নামে রাজা অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও ক্রিয়াবান্ ছিলেন। লিখিত আছে, তাঁহার যজ্ঞে বহু-সংখ্যক পশুবধ হয়, সেই সমস্ত পশুর চর্ম্মক্লেদ হইতে একটি মহানদী উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার নাম চর্ম্মণ্বতী। ঐ চর্ম্মণ্বতীরই বর্ত্তমান নাম "চম্বল"। কালিদাস মেঘদূতে উহাকেই রন্তিদেবের 'সুরভিতনয়ালম্ভজাং' অর্থাৎ গোবধজনিত-রক্তোদ্ভবা নদী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মথুরা-ব্রজভূমির পশ্চিমাংশ এবং কান্য-কুব্জের পূর্ব্বাংশ—উত্তরে ভাগীরথী এবং দক্ষিণে চম্বলনদী—পাঞ্চাল-দেশ বলিয়া স্থির করিতে হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে "মাকন্দী-দেশ' বলিয়া কোন একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করা যায় না। তবে কি বর্ত্তমান "মইনপুর জেলা" পুরাতন মাকন্দীদেশ বলিয়া অবধারিত হইবে? ফরক্কাবাদ এবং ফিরোজবাদ (আগ্রার অপর পার্শ্ব) ইহারই অন্তর্গত।

এতদূর আসিয়া আমরা দ্রোণাশ্রম নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেছি। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, বর্ত্তমান "দেহরাদূন" দ্রোণাশ্রম নহে। দ্রোণাচার্য্যের রাজ্যের (পাঞ্চালের উত্তরার্দ্ধ) একটি হ্রদ মাত্র, কালে তাহার অনেকাংশ আবাদ হইয়া আসিলে, তক্ষশিলার নাগরাজ তাহা অধিকার করেন, তাহার পর বৌদ্ধরাজ্য-বিস্তারে, তাহা তাহারই অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আইসে, তাহার পর মুসলমান্‌দিগের অধিকারে একেবারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এই সময়ে নেপাল তরাইএর দুরন্ত গুরখাগণ আল্‌মোরা অতিক্রম করিয়া, দুন প্রদেশ ছাইয়া পড়ে। তৎকালে গাড়োয়ালের অধিপতি মুসলমান্‌-সম্রাটের পদ-লেহন করিতেছিলেন। শিখেরা সেই সুযোগে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া, নাহন তরাই-এ দণ্ডায়মান হইয়া, অগ্রসর হইতেছিল, এই সময়ে বৃটিশসিংহ তাহাদের মুখ হইতে সমস্ত শীকার গ্রাস করিয়া ফেলেন। বর্ত্তমান দ্রোণাশ্রম গুরু রাম-রায়ের আশ্রম বলাই সঙ্গত, তদ্বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে 'তীর্থযাত্রা' প্রবন্ধে "এডুকেশন্ গেজেটে" লিখিত হইয়াছে।

শ্রীমান্ উইলিয়াম নিজ-লিখিত দেহরা-দূন-"মেময়সর" নামক গ্রন্থে দ্রোণাশ্রম সম্বন্ধে যে ভুল করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অণুমাত্র দোষ দেখিতে পাইনা। তিনি দ্রোণাচার্য্যের নাম শুনিয়াই, টোলের ভট্টাচার্য্য বৈ আর কি ভাবিতে পারেন? তাহাই ভাবিয়া 'দোয়ারা' জনপদে দ্রোণাশ্রম স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাভারত পাঠ করিলে, কদাচ তাহা মনে করিতে পারিতেন না। প্রথমে দ্রোণ কৃপীকে বিবাহ করিয়া ক্লেশে দিন-যাপন করিতেছিলেন, তাই বালক অশ্বত্থামা পিষ্ঠজল পান করিয়া দুগ্ধপান করিয়াছি বলিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর ঘটনাচক্র ফিরিয়া আচার্য্য দ্রোণকে যে ধনবান্ করিয়াছিল, এস্থলে তাহাও স্মরণ করা উচিত। কৃত-কর্ম্মা দ্রোণকে দেখিয়া প্রীত হইয়া মহাত্মা ভীষ্ম কহিলেন"এই কুমারগণকে উত্তমরূপে অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করুন, কুরুগৃহে পূজ্যমান হইয়া সুপ্রীতমনে ভোগ্যবস্তু ভোগ করুন, কুরুদিগের এই রাজ্য ও যে কিছু ঐশ্বর্য্য আছে, আপনিই সমুদায়ের রাজাস্বরূপ হইয়া থাকুন, সমস্ত কৌরবেরা আপনারই হইল।" তাহার পর দেখিতে পাই—দ্রোণাচার্য্য কৌরবগণের সেনাপতি এবং পরে দ্রুপদকে বিদ্রাবিত করিয়া সমস্ত পাঞ্চাল-দেশ অধিকার করতঃ দ্রুপদকে কৃপা করিয়া তাহার অর্দ্ধাংশ বিতরণ করিয়া 'অহিচ্ছত্রে' নিজ রাজ্য বিস্তার করিতেছেন।

পাঠক এখন বল—সেই আচার্য্য দ্রোণ এখন রাজা নহেন কি? এখন দ্রোণাচার্য্যের আশ্রমস্থান সামান্য "দ্বোয়ারা" জনপদ না হইয়া সুবিস্তৃত রাজধানী অহিচ্ছত্রই সম্ভাবিত কিনা? টোল না হইয়া সুসজ্জিত প্রাসাদই সঙ্গত কিনা? এখন আইস, তোমাকে মহারাজ দ্রোণাচার্য্যের সুবিশাল আশ্রম অহিচ্ছত্র নগরী দেখাইয়া দেই।

সুদূর উত্তরহিমালয় হইতে, যে ভাবে ভাগীরথী প্রবাহিতা হইয়া, মধ্যপথে ত্রিধারা হইয়া (টিরী প্রদেশে) দেবপ্রয়াগে অলকানন্দায় মিলিত হইয়া, হরিদ্বারে আসিয়া, মহীতল পবিত্র করিতে গমন করিয়াছেন, তাহারই উত্তর-পশ্চিমে শিবালয়-গিরিমালার শিখরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর-হিমালয়ের অপূর্ব্ব শ্রী—সৌন্দর্য্য সন্দর্শন কর। দেখিবে কি—সুন্দরভাবে শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিতাম্বরা শত সহস্র ধারে বিস্তারিতা হইয়া গঙ্গাযমুনার কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে! পূর্ব্বকালে এই সকল স্থান অপ্সরোগণের ক্রীড়াভূমি ছিল। এই গঙ্গাসঙ্গমে স্নান করিতে আসিয়া মহাভাগ ভরদ্বাজ ঘৃতাচীর প্রেমে আসক্ত হইয়া, দ্রোণাচার্য্যকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্র "গোবিষাণ" নামে প্রসিদ্ধ। এই গোবিষাণের পরবর্ত্তী ভূমিখণ্ড "অহিচ্ছত্র" প্রদেশনামে পরিচিত, সেই "অহিচ্ছত্র" রাজধানী দ্রোণাশ্রম বলিয়া চিহ্নিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বর্ত্তমান দেহরাদূন—অহিচ্ছত্র রাজধানীর অন্তর্গত মাত্র বলিতে পারা যায়।

এখন এই 'অহিচ্ছত্রনগরী' কোথায়? স্থির করিতে পারিলে, পৌরাণিক দ্রোণাশ্রমের নির্ণয় হইতে পারে। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্‌ত্‌সাং যে পথ ধরিয়া বর্ত্তমান যুক্ত-প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার মানচিত্র দেখিলে বোধ হইবে, অহিচ্ছত্রের উত্তর সীমা গোবিষাণ, অমরোহ এবং রামপুর, পশ্চিমে বাঁশবেরেলী, পূর্ব্বে চান্দাশী এবং দক্ষিণে বাদাউন জেলা। ইহারই পার্শ্ব দিয়া পুরাতন ভাগীরথী হিমাচল হইতে প্রবাহিতা হইয়া, কান্যকুব্জ হইয়া, বেহার প্রদেশে প্রস্থান করিয়াছেন। এই অহিচ্ছত্র হইতে বর্ত্তমান দেহরা'দূন প্রায় ১৬০ মাইল সুদূর উত্তর হিমাচলে।

শ্রীসারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

একলব্য।

মহামতি আচার্য্য দ্রোণ কুরুবালকগণকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত হইলে তাহার যশঃপ্রভা চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত হইল। দেশ-দেশান্তর হইতে রাজকুমারগণ অস্ত্রশিক্ষার্থে দ্রোণের নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য দ্রোণ-সন্নিধানে আগমন করিয়া তাঁহার নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিবার বাসনা জ্ঞাপন করিলেন। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য, একলব্যকে হীনজাতি বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। সামান্য একজন নিষাদ যে ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়-রাজগণের সহিত একত্রে শিক্ষালাভানন্তর তাহাদের সমতুল্য হয়, ইহা অস্ত্রবিৎ দ্রোণের

নিকট ভাল লাগিল না। একলব্যের প্রত্যাখ্যান-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে ইহা অনুমিত হয় যে, পুরাতন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেরা দ্বিজাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতিকে শিক্ষা প্রদান করিতেন না। পাছে অসভ্য সভ্য হয়, অশিক্ষিত শিক্ষিত হয় এই ভয়ে বোধ হয় তাঁহারা ভীত হইতেন। নানা অনর্থ এবং ধ্বংসের কারণস্বরূপ ঐ প্রথা নবসভ্যতাময় বর্ত্তমান ভারতে এখনও বিদ্যমান আছে।

একলব্য ব্যথিত হৃদয়ে দ্বিরুক্তি না করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন এবং এক অরণ্যে প্রবেশ করতঃ মৃণ্ময়ী দ্রোণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও আচার্য্যভাবে সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহার সম্মুখে ব্রতধারণ করিয়া, ব্রহ্মচারী বেশে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। যাহাকে কেহ স্থান দেয় না, তাহাকে অরণ্য স্থান দেয়—সে স্থানে জাতির অভিমান নাই, ব্রাহ্মণ চণ্ডালের পার্থক্য নাই; মনুষ্যের দুর্ব্বাক্যবহ্নি নাই—নীরব মানব-কোলাহল-হীন স্থান! এই স্থানে বালক ব্রহ্মচারী একলব্যের সাধনা আরম্ভ হইল। প্রতিজ্ঞা হইল, মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন। অবিরত অস্ত্রসাধনায় রত থাকিয়া অচির কাল মধ্যে তিনি অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন।

এদিকে একলব্যকে প্রত্যাখ্যান করিবার কিছুদিন পরে, একদিন ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবরাজকুমারগণ দ্রোণাচার্য্যের আজ্ঞানুসারে রাজধানী হইতে মৃগয়ার্থ নির্গত হইলেন। তাহাদের সহিত একব্যক্তি আপনার কুক্কুর ও বাগুরা লইয়া গমন করিল। তাঁহারা সকলে সেই বনমধ্যে বিচরণ করিতেছেন,—এমন সময় সেই কুক্কুর মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে মলিন-কলেবর কৃষ্ণাজিন-জটাধারী একলব্যের সন্নিধানে উপস্থিত হইল ও তাহার এবম্বিধ আকারাদি দর্শনে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। ব্রহ্মচারীর সাধনাভঙ্গ হইল—তিনি কুক্কুরের পর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, আপনার অস্ত্রপ্রভাব এবং ইহার প্রয়োগের লঘুতা-পরীক্ষার্থ সেই কুক্কুরের মুখবিবরে অলক্ষ্যে এককালে সাতটি শর নিক্ষেপ করিলেন। শরের কি অমানুষিক শক্তি! অলক্ষ্য হইতে শর নিক্ষেপ মাত্র কুক্কুরের স্বর বন্ধ হইল। কুক্কুর সবেগে পলায়ন করিয়া কৌরবগণ সন্নিধানে উপস্থিত হইল। তাঁহারা মুখমধ্যে সপ্তশর-পূরিত কুক্কুরকে দর্শন করিয়া এবং শরের শব্দভেদিত্ব ও লঘুত্ব দর্শনে অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, শর-প্রয়োক্তার শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বুঝিলেন, যিনি এইরূপ বাণ নিক্ষেপ করিতে পারেন, তিনি অস্ত্রজ্ঞানে কত জ্ঞানী এবং তাঁহারা কত নিকৃষ্ট! অনন্তর দ্রোণশিষ্য-মণ্ডলী সেই অস্ত্রবিদ্ বীরের অনুসন্ধান উদ্দেশে বনে বিচরণ করিতে করিতে তাহার সন্ধান পাইলেন; দেখিলেন—এক মৃণ্ময়ী দ্রোণমূর্ত্তি সম্মুখে স্থাপন করিয়া এক ব্রহ্মচারী অস্ত্র-সাধনায় রত। কঠোর পরিশ্রম, অন্য কোন দিকে মনোযোগ নাই—অবিশ্রান্ত শর ত্যাগ করিতেছেন। বহুদিন যাবৎ তপস্যা করিতে করিতে পঙ্কমলাদি সংযোগে তাহার দেহ বিকৃত সহজে মনুষ্য বলিয়া বোধ হয় না। তাহাকে এবম্বিধ অবস্থায় দর্শন করিয়া রাজপুত্রগণ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন,—আমি নিষাদপতি হিরণ্যধনুর পুত্র, মহাত্মা দ্রোণের শিষ্য; এই অরণ্যে একাকী ধনুর্ব্বিদ্যা আলোচনা করিতেছি।

কৌরবেরা এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজধানীতে গমন পূর্ব্বক, দ্রোণ-সমীপে আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। অর্জ্জুনের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল! একলব্যের প্রতিভা-সম্মুখে অর্জ্জুনের কৌশলাদি নিষ্প্রভ হইল। তিনি দুঃখিত-চিত্তে গুরু-সন্নিধানে উপনীত হইয়া নিবেদন করিলেন—গুরো! আপনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ধনুর্বিদ্যায় আমি অদ্বিতীয় হইব, কিন্তু অধুনা দেখিতেছি যে, ভবৎশিষ্য একলব্য ধনুর্ব্বিদ্যায় আমা অপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। দ্রোণ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, পরিস্ফুটরূপে কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না। তখন তিনি অর্জ্জুন-সমভিব্যাহারে অরণ্য-প্রদেশে গমন করিয়া, জটাচীরধারী একলব্যকে অস্ত্রবিদ্যার অনুশীলনে রত দেখিলেন। গুরুদেব দ্রোণকে সহসা সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, একলব্য, তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিলেন;—এবং নিজেকে তাঁহার 'শিষ্য' বলিয়া পরিচয় দিয়া, আদ্যোপান্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। তখন দ্রোণ কহিলেন, 'তুমি যদি যথার্থই আমার শিষ্য হইয়া থাক, তবে আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর।' একলব্য প্রীতমনে কহিলেন, 'আজ্ঞা করুন, কি দক্ষিণা প্রদান করিব? গুরুকে অদেয় কিছুই নাই।' এই বাক্য শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য কহিলেন 'তুমি দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া আমাকে দান কর।' এই নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্যব্রত গুরুভক্ত একলব্য অবিচলিত-চিত্তে ও প্রীতমনে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া, তাহা দ্রোণকে গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ প্রদান করিলেন! তৎপরে একলব্য অপর অঙ্গুলিদ্বারা শরক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বাপেক্ষা শরের লঘুতা হ্রাস হইয়াছে। অর্জ্জুনের আশঙ্কা দূর হইল। দ্রোণের প্রতিজ্ঞাও রক্ষা পাইল। দ্রোণের এই নিষ্ঠুর-কার্য্য কিরূপ করিয়া সমর্থন করিব! তিনি একবার শিক্ষার্থী একলব্যকে নীচজাতি দোষে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার বিনাদোষে তাহার অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করাইলেন। নিরপরাধ ব্যক্তির এইরূপ ভয়ানক অনিষ্ট করা, মহাত্মা দ্রোণের পক্ষে নিতান্ত নীচ-কার্য্য হইয়াছে।

বীর একলব্যের চরিত্রে অধ্যবসায়, একাগ্রতা, গুরুভক্তি, সত্যপরায়ণতা ও ব্রহ্মচর্য্য সকলের শিক্ষণীয়। সাধনার দ্বারা যে জগতে অদ্ভুত কর্ম্মের সম্পাদন হয় এবং কিরূপ করিয়া সাধনা করিতে হয়, তাহা তিনি জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। পুরাতন ভারতবর্ষের আর্য্যবৃন্দ এই সাধনার দ্বারা জগতে অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন। ঋষি বিশ্বামিত্রের তপস্যায় দেবেন্দ্র ইন্দ্র পর্য্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন; বালক ধ্রুব তপস্যার দ্বারা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন; চিরকুমার ভীষ্মের জীবনবৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন। হায়! যে ব্রহ্মচর্য্য ও সাধনাদ্বারা তাঁহারা এত উন্নত ছিলেন, আমরা তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছি! কবে আবার সেদিন আসিবে, যেদিন আবার আমরা ব্রহ্মচর্য্যের সেবা করিব, আবার সাধনা করিব; কবে সে সৌভাগ্য হইবে, কবে ভারতের অমানিশার প্রভাত হইবে!

শ্রীকুমারবিক্রম মজুমদার।

কাল-পুরুষ।

(নক্ষত্র-মণ্ডল)

"কহিছে পৌলোমী কোথা ব্রহ্মলোক,
দেখিতে কিরূপ, কিরূপ আলোক
প্রকাশে সেখানে ; কিরূপ উজ্জ্বল
কনক-নির্ম্মিত ব্রহ্মার কমল,
সতত চঞ্চল কারণ-জলে !

কিবা অদভুত সে রেণু সমুদ্র ;
বীচিমালা তায় কি বিপুল ক্ষুদ্র ;
কত অপরূপ সৃজনের লীলা
প্রকাশ তাহাতে ; কিরূপ চঞ্চলা
পরমাণুময়ী মহী সে জলে॥"
হেমচন্দ্র।

কালপুরুষ নামক নক্ষত্রপুঞ্জ নভোমণ্ডলে একটী নয়নাভিরাম দৃশ্যপট। ছায়াপথের পশ্চিমে অবস্থিত একটী চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের মাঝে অগ্নি ও বায়ু কোণে বিন্যস্ত তিনটী তারকা বিদ্যমান আছে; উহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে নৈঋত ও ঈশান কোণে বিন্যস্ত আরও তিনটী তারকায় কাল-পুরুষ-মণ্ডল গঠিত। কাল-পুরুষ-মণ্ডল রাশিচক্রে বৃষ ও মিথুন রাশির সংযোগ স্থলের কিছু দক্ষিণে অবস্থিত এবং বিষুব-বৃত্তের দ্বারা সমদ্বিখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। বিষুববৃত্ত ৭ মৃগস্য (mintaka) নামক তারাটীকে স্পর্শ করিয়াছে। কাল-পুরুষমণ্ডলে হিন্দুজ্যোতিষের ২৭ নক্ষত্রের মধ্যে দুইটী নক্ষত্র বিদ্যমান আছে। চতুর্ভুজ-ক্ষেত্রের উত্তরপূর্ব্ব দিকের প্রথম শ্রেণীর তারাটী (২ মৃগস্য, Betelquex) আর্দ্রা নক্ষত্র, উহার নাম বিশাখ, আর্দ্রার পশ্চিমে স্থিত দ্বিতীয় শ্রেণীর তারাটির নাম কার্ত্তিকেয়, (৪ মৃগস্য Belatrix)। আর্দ্রা ও কার্ত্তিকেয় তারাদ্বয়ের সংযোগ-রেখার মধ্যবিন্দু হইতে কিছু উত্তরে তিনটী তারকায় একটী স্তবক গঠিত আছে, উহা মৃগশিরা নামক নক্ষত্রপুঞ্জ; এই তারাস্তবকের ১১শ মৃগস্য (Heka) নামক তারাটী মৃগশিরা-নক্ষত্রের যোগতারা। চতুর্ভুজ-ক্ষেত্রের দক্ষিণের উজ্জ্বল তারা দুইটীর পূর্ব্বদিকের তারাটী ২য় শ্রেণীর, নাম কার্ত্তবীর্য্য (৬ মৃগস্য) এবং পশ্চিমের তারাটী ১ম শ্রেণীর, নাম বাণরাজ

কাল-পুরুষমণ্ডল আমাদের দেশে অনেকেরই নিকট পরিচিত। যাঁহারা জ্যোতিষ জানেন না, এমন অনেকে কাল-পুরুষমণ্ডল অবগত আছেন। কাল-পুরুষমণ্ডল আষাঢ় মাসে উষাকালে এবং পৌষমাসের প্রথমাংশে প্রদোষকালে পূর্ব্বদিগ্বলয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। পৌষ মাসের প্রথমাংশে নিশীথকালে কাল-পুরুষমণ্ডল দর্শকের মস্তকোপরি ও উষাকালে পশ্চিমগগনে অস্তমিত হয়। চৈত্র মাসের প্রথমাংশে প্রদোষকালে দর্শকের মস্তকোপরি ও নিশীথকালে পশ্চিমাকাশে দেখিতে পাওয়া যায়।

দুরবীক্ষণ-যোগে কালপুরুষমণ্ডলে অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হয়। চতুর্ভুজ-ক্ষেত্রের চারি কোণের তারাচতুষ্টয় ও মধ্যের তারাগুলির প্রত্যেকটীকে আমরা একটী মাত্র তারা দেখিতে পাই, কিন্তু উহাদের প্রত্যেকেই ২, ৩ বা ততোধিক তারার সংহতি,—বহুদূরবর্ত্তী বলিয়া আমাদের নয়ন সমক্ষে একটী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহারা সাধারণতঃ যুগল-নক্ষত্র নামে পরিচিত। ঐ সকল যুগল-নক্ষত্রের একে বা দুয়ে অপরের ভারকেন্দ্র অবলম্বন করিয়া ঘুরিতেছে, কেহ কেহ পরস্পর

পরস্পরের ভারকেন্দ্র অবলম্বনে মহাকাশে ঘুর্ণিত হইয়া বিশ্বনিয়ন্তার লীলাবৈচিত্র্য প্রদর্শন করিতেছে! ১ম মৃগশু (বাণরাজ Regel) তারাটির চতুর্দ্দিকে ৯ম শ্রেণীর আর একটী তারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, বাণরাজ হইতে ঐ তারাটীর দুরত্ব •—৯" অংশ; বাণরাজ অত্যুজ্জ্বল ও প্রথম্ শ্রেণীর নক্ষত্র বলিয়া উহার নিকটের ছোট তারাটি সাধারণ দূরবীক্ষণে ধরা পড়ে না,—অন্ততঃ ৩ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত দূরবীক্ষণ হইলে উহাকে দেখা যায়। চতুর্ভূজ ক্ষেত্রের মধ্যে অগ্নি ও বায়ু কোণে বিন্যস্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর যে তারাত্রয় দেখা যায়, উহারা "ইষুত্রিকাণ্ড" নামে অভিহিত। উহাদের মধ্যে বায়ু কোণের তারাটী (৭ মৃগশু Mintaka) যুগল-তারা, উহার সহচর অর্থাৎ ২য় তারাটি ৭ম শ্রেণীর,—দুরত্ব •—৫৩" অংশ। অগ্নি-কোণের তারাটির (ঊষা Alnitak) দুইটি সহচর আছে, উহার একটী ৬ষ্ঠ ও অপরটি ০ম শ্রেণীর তারা। সহচর দুইটির মধ্যে একটির দূরত্বের অল্পতা ও অপরটির ক্ষুদ্রতার জন্য ৩ ইঞ্চি ব্যাস যুক্ত দূরবীক্ষণেও দেখা যায় না। মৃগশিরা নক্ষত্র-পুঞ্জের মধ্যে ১১ মৃগশু (Heka) তারাও যুগল, উহার একটী ৪র্থ ও অপরটী ৬ষ্ঠ শ্রেণীর। ৫ মৃগশু তারার দক্ষিণে, নৈঋতে ও ঈশানে বিন্যস্ত যে তারাত্রয় আছে, উহার ঈশান কোণের অতিক্ষুদ্র (১৩ মৃগশু) তারাটির দুইটী সহচর আছে, কেহ কেহ বলেন তিনটি আছে, অর্থাৎ ১৩ মৃগশু তারাটি দ্বিযুগল বা ৪টি তারা সংহতি। ইহাদের মধ্যে সাধারণতঃ তিনটি তারাই দেখা যায়, হয় ত অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবীক্ষণে ৪র্থ তারাটীও দেখা যাইতে পারে। সাধারণ দূরবীক্ষণে ১৩ মৃগশু তারাটী ও উহার নীচের অপর দুইটী তারার প্রত্যেকটীই যুগল দেখা যায়। সর্ব্বনিম্নের তারাটীকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিশালী লোক চর্ম্মচক্ষেই যুগল দেখিতে পাইবেন। ঐ তারাটীর দক্ষিণে জগতের অত্যাশ্চর্য্যতম নীহারিকা পুঞ্জ ও মহাবাষ্পস্তবক বিদ্যমান আছে। বাষ্পস্তবক হইতে নীহারিকা এবং কালবশে নীহারিকা হইতে জগতের (গ্রহ ও উপগ্রহাদি) সৃষ্টি হয়। আমাদের পৃথিবী ও তাহার উপগ্রহ চন্দ্র—এই প্রকারেই জন্ম লাভ করিয়াছে।

পুরাণে বর্ণিত আছে, "সৃষ্টির আদিকালে বিশ্ব জলময় ছিল; উহা 'কারণ-সমুদ্র' নামে অভিহিত, ঐ কারণসমুদ্রে পরমাণুময়ী মহী ভাসমানা ছিল"। তখনও পৃথিবীর গঠন হয় নাই! অনাদিদেব, ভগবান্ বিষ্ণু, অনন্ত-শয়নে নিদ্রিত ছিলেন,—ইনি পুরুষ, আর প্রকৃতি বা শক্তিরূপা লক্ষ্মীদেবী তাঁহার পদ-সেবায় নিযুক্তা ছিলেন। বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মার উৎপত্তির পরেই বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভব মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয় ব্রহ্মাকে হনন করিতে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মা, মহামায়ার আরাধনা করেন। মহামায়ার প্রভাবে বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ হয়। তৎপরে অসুরদ্বয়ের সহিত বিষ্ণুর পঞ্চসহস্র বৎসর যুদ্ধ হয়। বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে মধু ও কৈটভ সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুকে বর গ্রহণ করিতে বলে, তদনুসারে বিষ্ণু "তোমরা আমার বধ্য হও" বলিয়া বর প্রার্থনা করিলে, দৈত্যদ্বয় উপায়ান্তর না দেখিয়া বিষ্ণুকে বর দেন যে, "আমরা তোমার বধ্য হইলাম; আমাদিগকে কোন 'স্থলে' স্থাপন পূর্ব্বক বধ কর"। ... অতঃপর

বিষ্ণু মহীর সৃজন করিয়া তদুপরি দৈত্যদ্বয়কে বধ করেন। মধু ও কৈটভের মেদে প্লাবিত হওয়ায় মহীর নাম 'মেদিনী' হইল। পুরাণের এই আখ্যায়িকায় কারণসমুদ্র-রূপ মহাকাশে পরমাণুময় বাষ্পস্তবক ও সময়ক্রমে নীহারিকা হইতে পৃথিবীর উৎপত্তির কথাই সূচিত হইতেছে। পাঁচ হাজার বৎসর বিষ্ণুর সহিত মধু ও কৈটভের যুদ্ধ—উহা কারণসমুদ্রে ভাসমান পরমাণুর একত্র সংযোগের কাল বলিয়া অনুমান হয়। মধু ও কৈটভ—শক্তির বিকাশ মাত্র। যে শক্তির বলে জগদ্ ব্রহ্মাণ্ড নিয়মিত হইতেছে, যে শক্তির বলে পরমাণু প্রতি পরমাণুকে আকর্ষণ করিতেছে, সেই মহাকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণই মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয় বলিয়া অনুমিত হয়। ব্রহ্মার কার্য্য ইহার পর—অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টি হইলে প্রকৃতি-পুরুষের মিলন ঘটাইয়া ব্রহ্মা, জীব ও জঙ্গম সৃজন করিলেন। প্রাথমিক জীবের আবির্ভাব সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতভেদ আছে; বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা আপনিই উদ্ভূত হইয়াছিলেন, মানবপিতা মনুও ব্রহ্মার মানসপুত্র,—ইহা হইতে বুঝা যায়, বাষ্প ও নীহারিকার মধ্যে যেমন পৃথিবীর উপাদান নিহিত ছিল, প্রাথমিক জীবের বা জঙ্গমের বীজও জগতের আদিকারণ বাষ্প ও নীহারিকার মধ্যেই পরমাণু রূপে নিহিত ছিল। পৃথিবীর গঠনের পরে উহারা আপনিই ক্রমশঃ বিকশিত হইতে আরম্ভ করে, ইহাই ব্রহ্মার সৃজনের কাল। আমাদের পৃথিবী যেরূপে জন্মলাভ করিয়াছে, আকাশে প্রতি-নিয়ত এইরূপ কত পৃথিবীর উৎপত্তি ও লয় হইতেছে, কে তাহার সংবাদ রাখে? আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিতেছেন, এবং নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির আবিষ্ক্রিয়ার সহিত নিত্য নূতন তথ্যাবিষ্কার দ্বারায় জগৎকে চমৎকৃত করিতেছেন, কিন্তু আমাদের ত্রিকালজ্ঞ ঋষি-গণ বহু পূর্ব্বেই পৃথিবীর উৎপত্তি ও লয় সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছিলেন এবং অনন্ত আকাশে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সূচনা উপলব্ধি করিয়া, বিশ্বময়ের বিশ্বরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, কোন বৈজ্ঞানিকই আজিও তাহার অতিরিক্ত কিছুই করিতে পারেন নাই।

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র।

যোগের কথা।

প্রাণায়াম-প্রশ্ন।

একদা যোগীশ্বর ঘেরণ্ডের নিকট বিবিধ বিনয়-সহকারে চণ্ডকাপালি প্রাণা-য়াম-সাধনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আচার্য্য অন্তেবাসীর ভক্তিপ্রাচুর্য্য ও সাধন-চাতুর্য্য চিন্তা করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে প্রত্যুত্তর দিলেন।

ঘেরণ্ড বলিলেন—'বৎস! প্রাণায়াম-সাধন অত্যন্ত দুরূহ। যথারীতি প্রাণা-য়াম-সাধনে পারগ হইলে, মানব দেবতুল্য হইতে পারে, কিন্তু মনে রাখিবে, যে সে ভাবে থাকিয়া, যে সে খাদ্য খাইয়া, যখন তখন বায়ু ধারণের চেষ্টা করিলেই প্রাণায়াম-সাধন হয় না। প্রাণায়াম-সাধনের নির্দ্দিষ্ট স্থান চাই, উপযুক্ত সময়

চাই, সঙ্গত আহার চাই, নাড়ী
চাই,—তবেই প্রাণায়াম-সাধনের প্রত্যাশা, নচেৎ অনুপযুক্ত স্থানে, অনুচিত কালে, অখাদ্য-কুখাদ্য-সেবা-সহকারে অবিশুদ্ধ নাড়ীতে প্রাণায়াম-শিক্ষা করিতে গেলে কেবল রোগভোগই লাভ হইবে, যোগ-সাধন হইবে না।"

আচার্য্যের কথা শুনিয়া ভক্তিবিনম্রমূর্ত্তি চণ্ড বলিলেন "প্রভো! অনুগ্রহপূর্ব্বক কি আমাকে প্রাণায়াম-সাধনের যোগ্য দেশ, কাল প্রভৃতির উপদেশ প্রদান করিবেন?" আচার্য্য বলিলেন, "চণ্ড! তোমার নিকট অবক্তব্য কিছুই নাই। আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। দেখ বৎস! নিরুপদ্রব স্থানই সাধনার অনুকূল। যোগ-সাধনের জন্য নদ, নদী, প্রান্তর অতিক্রম করিয়া, বহুদূরদেশে যাওয়ায় প্রয়োজন নাই; হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল জন-সমাগমশূন্য অন্ধকারময় অরণ্যানীমধ্যে উপস্থিত হওয়াও নিষ্প্রয়োজন। ইহাতে নিজের আকস্মিক বিপৎপাতের প্রতীকার করা কঠিন হইয়া পড়ে, সুতরাং রক্ষকশূন্য বিশ্বাসবিহীন স্থলে যোগসাধন সুকঠিন। আবার ইহাও মনে রাখা উচিত, বহুজনাকীর্ণ রাজধানী-বক্ষে লোক-সমাগম-মুখরিত কোলাহলাকুল প্রদেশে যোগসাধন সম্ভবপর নহে, কারণ উক্তস্থানে চিত্তবিক্ষেপকর ব্যাপার-পরম্পরার সমাবেশ না হইয়া পারেনা। প্রকৃতপ্রস্তাবে নিভৃত নিরুপদ্রব স্থানই যোগসাধনের অনুকূল।

যে দেশের রাজা ধার্ম্মিক ও প্রজারঞ্জক, যে দেশে দুর্ভিক্ষ-প্রকোপ নাই, যে দেশ উপদ্রবশূন্য, সেই দেশে একটী প্রাচীর-পরিবেষ্টিতস্থানে এক নাতিবৃহৎ কুটীর নির্ম্মাণ করিবে। ঐ কুটীরের নিকটেই যেন জলাশয় থাকে, কুটীর খানি যেন খুব উন্নতও না হয়, আবার নিতান্ত নিম্নশীর্ষ না হয়, ঐ কুটীর যেন কীটপরিপূর্ণ না হয়, ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। ঐ ক্ষুদ্র কুটীর গোময়লিপ্ত হওয়া চাই; কুটীরের পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান ও ফলবৃক্ষের সমাবেশ হওয়াও বাঞ্ছনীয়। ঐ কুটীর প্রাণায়াম-সাধনের উপযুক্ত স্থান।

হেমন্ত, শিশির গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই চারি ঋতুতে যোগারম্ভ হিতকর নহে, ঐ সময়ে আরব্ধ যোগ রোগ আনয়ন করে। বসন্তকাল অথবা শরৎকালে যোগ আরম্ভ করিলে, সাধক রোগহীন হইয়া ক্রমশঃ সিদ্ধিমার্গে অগ্রসর হইতে পারিবেন। ঋতুগণনায় অনেকে ভ্রমে পতিত হন, এজন্য কোন্ মাস কোন্ ঋতুর অন্তর্গত, তাহা বলিতেছি, বিশেষ-রূপে স্মরণ রাখিবে। চৈত্র ও বৈশাখ দুই মাস বসন্ত, আর আশ্বিন ও কার্ত্তিক দুইমাস শরৎ ঋতু। প্রত্যেক ঋতু দুই দুই মাসে হইয়া থাকে, কিন্তু চারি চারিমাসে এক এক ঋতুর অনুভব হয়, এই অনুভবই ভ্রমের কারণ। মাঘ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত বসন্তের ভাব অনুভূত হয়, চৈত্র হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত গ্রীষ্মের অনুভব হয়, আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত বর্ষার অনুভব হয়, ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত শরতের ভাব অনুভূত হইয়া থাকে, কার্ত্তিক হইতে মাঘ পর্য্যন্ত হিমানুভব, অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত শীতের অনুভব

হইয়া থাকে। অনুভব মাস চতুষ্টয়ব্যাপী হইলেও পূর্ব্বোক্ত দুই দুই মাসেই এক এক ঋতু হইয়া থাকে। যোগশিক্ষার্থী বসন্ত বা শরতে আরম্ভ করিবেন, অন্যকালে করিবেন না।

শুধু স্থান ও কাল ঠিক্ হইলেই হইল না। যোগশিক্ষার্থীর মিতাহার চাই। আহার-নিয়ম পালন না করিলে, নানারোগ ভোগ করিতে হয়, শেষে যোগ স্বয়ংই বিয়োগ লাভ করেন। সাধক ভক্ষ্যদ্রব্যদ্বারা উদরের অর্দ্ধভাগ পূরণ করিবেন, সিকি-ভাগ জলদ্বারায় পূরণ করিবেন, আর সিকি-ভাগ পবন-প্রচারের জন্য খালি রাখিবেন; তাহা হইলেই তাৎপর্য্য হইল এই যে, যোগশিক্ষার্থী আধ্‌পেটা খাইবেন,—ইহারই নাম মিতাহার। আহার্য্য দ্রব্যগুলি শুদ্ধ, সুরস, স্নিগ্ধ ও মধুর হওয়া চাই। সাধক ক্ষুব্ধচিত্তে ভক্ষণ করিবেন না, সন্তুষ্টচিত্তে ভোজন করিবেন। সাধক স্বেচ্ছামত যে কোনও দ্রব্য খাইবেন না। সাধক শালি-তণ্ডুলের অন্ন, যবচূর্ণ, গোধমচূর্ণ (আটা ময়দা প্রভৃতি) মুদ্গ (মুগের ডাইল) মাস-কলায়, চণক (ছোলা) প্রভৃতি শস্যের শুভ্র ও তুষরহিত সার ভোজন করিবেন। পটোল, মানকচু, ডুমুর, কাঁকুড়, কাঁচাকলা, ঠঁটেকলা, মূলা, বেগুণ, থোঁড়, করঞ্জা, পল্‌তা, বেতোশাক, কালশাক, বেলেশাক ও হিঞ্চাশাক ভক্ষণ করিতে পারেন। অত্যন্ত কটুরস, (যেমন লঙ্কাঝাল) অত্যন্ত অম্ল, (যেমন কামরঙ্গ) অত্যন্ত লবণ ও অত্যন্ত তিক্ত দ্রব্য সাধকের পক্ষে উপকারী নহে, অপকারক। ভাঁজাপোড়া (চিঁড়েমুড়ি প্রভৃতি) যোগশিক্ষার্থীর অনিষ্টকর, দধি, ঘোল সাধকের অহিতকারী। তাল, পাকা-কাঁটাল, মুসুরকলায়, কুল্‌থকলায়, কুষ্মাণ্ড, শাকের ডাঁটা, লাউ, কুল, কদ্‌বেল, কদম্ব, বাতাবিলেবু, তেলাকুচা, লকুচ (ডহুয়া) রশুন, মৃণাল, পিয়াল, গাব, হিঙ্গ, নিন্দিত শাক—এসব যোগশিক্ষার্থী খাইবেন না। সাধক কদাচ সুরাপান করিবেন না। যোগী ব্যক্তি নবনীত, ঘৃত, ক্ষীর, গুঁড়, চিনি, পাকাকলা, নারিকেল, দাড়িম্ব, কিস্‌মিশ, আমলকী প্রভৃতি খাইবেন না। এলাচ জায়ফল, লবঙ্গ, তেজোবর্দ্ধক বস্তু, জাম, হরিতকী ও খেজুর যোগার্থীর হিতকর খাদ্য। খাদ্যগুলি যাহাতে সহজে পরি-পাক পায়, ও ধাতু পোষণ করে, সেইরূপ হওয়া দরকার। কঠিন দ্রব্য, দুর্গন্ধ দ্রব্য, অতিশীতল ও অত্যুষ্ণ দ্রব্য, পর্য্যুষিত দ্রব্য, উগ্ররস দ্রব্য ও পাপজনক দ্রব্য যোগার্থীর আহার্য্য-তালিকার স্থান পাইবে না। যোগশিক্ষার্থী প্রাতঃস্নান করিবেন না, উপ-বাস করিবেননা, শরীরকে ক্লেশ দিবেননা, কদাচ একাহার করিবেননা, এক প্রহরের অধিককাল অনাহারে থাকিবেন না, সুবি-ধানুসারে কিঞ্চিৎ ভোজন করিবেন। প্রাণা-য়াম শিক্ষার পূর্ব্বে যোগশিক্ষার্থী ব্যক্তি প্রত্যহ ক্ষীর ও ঘৃত সেবন করিতে পারেন, এবং মধ্যাহ্নে একবার ও সায়ংকালের পরে একবার আহার করিতে পারেন। এই সকল নিয়ম অবলম্বন করিয়া তবে প্রাণায়ামের পথে অগ্রসর হইতে হয়।

কুশাসন, মৃগচর্ম্ম, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, অথবা কম্বলে উত্তরমুখ বা পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন

করিয়া নাড়ীশুদ্ধি সাধন পূর্ব্বক প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়।

চণ্ডকাপালি বলিলেন, প্রভো! নাড়ীশুদ্ধি কি প্রকার, উহার ফলই বা কিরূপ, জানাইলে কৃতার্থ হই। যোগাচার্য্য ঘেরণ্ডদেব প্রত্যুত্তর দিলেন, বৎস! নাড়ীশোধন না হইলে নাড়ীসকল মলদুষ্ট থাকে, সেই সকল নাড়ী-পথে বায়ুর গত্যাগতি হয়না, সুতরাং প্রাণায়ামসাধনে বাধা পড়ে; এইজন্য অগ্রে নাড়ীশুদ্ধি, পরে প্রাণায়াম-সিদ্ধি। নাড়ীশোধন দুই প্রকার, সমনু ও নির্ম্মনু। বীজমন্ত্রদ্বারা যে নাড়ীশুদ্ধি সম্পাদিত হয় তাহার নাম সমনু-শোধন, আর ধৌতিকর্ম্মদ্বারা যে নাড়ীশোধন ঘটে, তাহার নাম নির্ম্মনু শোধন। পূর্ব্বে তোমার কাছে যে ধৌতিকর্ম্ম বলিয়াছি, তাহাদ্বারাই নির্ম্মনু নাড়ীশোধন হইয়া থাকে। সম্প্রতি তোমাকে সমনু-নাড়ীশোধন বলিব। সাধক প্রথমে পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া, গুর্ব্বাদিন্যাস সমাপ্ত করিবে, পরে ধূম্রবর্ণ তেজোময় বায়ুবীজ (অর্থাৎ 'যং'বীজ) ধ্যান করিয়া ঐ 'যং'বীজের যোড়শবার জপ-সহকারে বাম নাসিকায় বায়ুপূরণ করিবে, পরে ৬৪বার জপদ্বারা কুম্ভক বা বায়ুধারণ করিয়া ৩২বার জপ-সহকারে দক্ষিণ-নাসাপথে বায়ু রেচন বা ত্যাগ করিবে। অনন্তর অগ্নিস্থান নাভিমূল হইতে অগ্নিতত্ত্বকে উত্থাপিত করিয়া পৃথ্বীতত্ত্ব ও তেজস্তত্ত্বের সম্মিলন চিন্তাকরিয়া 'রং' এই অগ্নি-বীজের যোড়শবার-জপদ্বারা দক্ষিণ নাসিকায় বায়ুপূরণ করিবে, পরে ৬৪ বার জপে বায়ুধারণরূপ কুম্ভক করিয়া ৩২বার জপ সহকারে বাম-নাসাপথে বায়ু রেচন করিবে, তৎপরে নাসিকার অগ্রভাগে জ্যোৎস্নাসমন্বিত চন্দ্রবিম্বের ধ্যান করিয়া, 'ঠং'বীজের যোড়শবার-জপদ্বারা বাম-নাসিকায় বায়ুপূরণ করিবে, তদনন্তর 'বং'-বীজের ৬৪বার জপসহযোগে সুষুম্না-নাড়ীতে কুম্ভকযোগে বায়ু ধারণ করিবে। পরে চিন্তাকরিবে যে, নাসাগ্রস্থ চন্দ্রবিম্ব হইতে সুধাধারা বিগলিত হইয়া শরীরস্থ যাবতীয় নাড়ী ধৌত করিতেছে। ধ্যানের পরে 'লং'বীজের ৩২বার জপদ্বারা দক্ষিণ-নাসিকাপথে গৃহীত ও ধৃত বায়ু রেচন করিবে। এইরূপ করিলে ক্রমে নাড়ীদোষ অন্তর্হিত হইবে, বায়ু-প্রচারের পথ পরিষ্কৃত হইবে, নাড়ীশুদ্ধি উপস্থিত হইবে। ইহার পর প্রাণায়ামের আরম্ভ।

প্রাণায়াম ত্রিবিধ; রেচক, কুম্ভক, পূরক। ইহার মধ্যে কুম্ভকই প্রকৃত প্রাণায়াম। বায়ুধারণই কুম্ভক। ধারণ করিতে হইলে 'গ্রহণ' চাই, এজন্য পূরকের সেবা করিতে হয়, আবার বিধৃত বায়ুর চিরনিরোধ অসম্ভব, কাজেই রেচকের অবতারণা; ফলকথা ইহারা কুম্ভকেরই পূর্ব্বাপরভাব মাত্র। কুম্ভকই ফলপ্রদ, পূরক-রেচকের স্বতন্ত্র ফল নাই। কুম্ভক অষ্টবিধ। সহিত-কুম্ভক, সূর্য্যভেদ-কুম্ভক, উজ্জায়ী-কুম্ভক, শীতলীকুম্ভক, ভস্ত্রিকাকুম্ভক, ভ্রামরী-কুম্ভক, মূর্চ্ছাকুম্ভক, কেবলীকুম্ভক।

সহিতকুম্ভক দ্বিবিধ, সগর্ভ ও নির্গর্ভ। যে কুম্ভক বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সাধন করিতে হয়, তাহাই সগর্ভ কুম্ভক, আর

যে কুম্ভক বীজমন্ত্রবর্জ্জিত, তাহাকে নির্গর্ভ কুম্ভক বলে। সগর্ভ প্রাণায়ামে বা কুম্ভকে কেবল প্রণবমন্ত্রেরই সাধনা। সাধক আসনে বসিয়া, অকাররূপী রক্তবর্ণ ব্রহ্মা বা সৃষ্টিশক্তিরূপ রজোমূর্ত্তির ধ্যান করিবে, অনন্তর 'অং' বীজের ষোড়শমাত্রক-জপ-সহকারে বামনাসায় বায়ু পূরণ করিবে; বায়ু পূরণের পর কুম্ভকারম্ভের পূর্ব্বে উড্ডীয়ান-বন্ধ আচরণ করিবে; পরে সত্ত্বমূর্ত্তি 'উ'কাররূপ কৃষ্ণবর্ণ হরির ধ্যানপূর্ব্বক 'উং' বীজের ৬৪মাত্রক-জপ যোগে কুম্ভক বা বায়ুধারণ করিবে, তৎপরে তমোগুণাত্মক 'ম'কাররূপী শ্বেতবর্ণ শিবকে ধ্যান করিয়া 'মং' বীজের ৩২মাত্রক-জপ-সহকারে দক্ষিণ-নাসাপথে বায়ু পরিত্যাগ করিবে। পুনরায় উক্তবীজের ধ্যান ও জপ-যোগে প্রথমে বায়ুপূরণ ও কুম্ভক করিয়া বাম-নাসাপথে পরিত্যাগ করিবে। একবার দক্ষিণ নাসায় আরম্ভ, বাম নাসায় শেষ, আবার বাম নাসায় আরম্ভ, দক্ষিণ নাসায় শেষ—এই প্রকার অনুলোম-বিলোম-ক্রমে পুনঃপুনঃ প্রাণায়াম করিতে হয়। বায়ু-পূরণের শেষ হইতে কুম্ভকের অবসান পর্য্যন্ত কনিষ্ঠা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ—এই অঙ্গুলীত্রয় দ্বারা নাসাপুট ধারণ করিতে হইবে অর্থাৎ কুম্ভককালে কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা বাম নাসিকা এবং কেবল অঙ্গুষ্ঠদ্বারায় দক্ষিণ নাসিকা ধরিতে হইবে। ইহাকে সগর্ভ প্রাণায়াম বলে।

নির্গর্ভ প্রাণায়ামে বীজ জপ করিতে হয় না, কেবল মাত্রানুসারে সময় নির্ণয় করিয়া পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিতে হয়। একটী ছোটিকা বা তুড়ি দিতে যত সময় লাগে, তাহার নাম একমাত্রক কাল। মাত্রার আরও বিশেষ আছে, তাহা এখানে গ্রাহ্য নহে। উত্তম, মধ্যম ও অধম ত্রিবিধ নির্গর্ভ প্রাণায়াম। পূরকে ২০মাত্রা, কুম্ভকে ৮০মাত্রা, এবং রেচকে ৪০মাত্রা কাল লইয়া যে প্রাণায়াম হয় অর্থাৎ বায়ু-পূরণ, ধারণ ও রেচন হয়, তাহাকে উত্তম-প্রাণায়াম বলে, আর পূরকে ১৬মাত্রা, কুম্ভকে ৬৪মাত্রা, রেচকে ৩২মাত্রা লইয়া, যে প্রাণায়াম নিষ্পাদিত হয়, তাহার নাম মধ্যম-প্রাণায়াম। আবার পূরকে ১২মাত্রা, কুম্ভকে ৪৮মাত্রা, রেচকে ২৪মাত্রা লইয়া, যে প্রাণায়াম সম্পন্ন হয়, সে প্রাণায়াম অধম। অধম প্রাণায়াম সুদীর্ঘকাল অভ্যাস করিলে, দেহে স্বেদাগম (ঘর্ম্ম-জল-প্রকাশ) হয়, মধ্যম প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে মেরুকম্প অর্থাৎ মেরুদণ্ডমধ্যস্থ গুহ্যাবধি ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সমুত্থিত নাড়ীর কম্পন উপস্থিত হয়; আর উত্তম প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে শূন্যগতি জন্মে, এই তিনটীই ত্রিবিধ প্রাণায়াম-সিদ্ধির লক্ষণ। এক একটী লক্ষণ আবির্ভূত হইলে সেই সেই প্রাণায়াম পরিত্যাগ করিয়া, উচ্চতর প্রাণায়াম অবলম্বন করিতে হইবে। প্রাণায়াম-প্রভাবে গগনচারিত্ব জন্মে, সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হয়, মনোন্মনী সিদ্ধি করগত হয়, শক্তির প্রবোধ উপস্থিত হয়, আনন্দের আবির্ভাব হয়। অন্যান্য কুম্ভক সম্বন্ধে পরে বিশেষরূপে বলা যাইবে—এই বলিয়া আচার্য্য নিত্যকর্ম্মে গমন করিলেন, আমরাও বিশ্রাম লইলাম।

শ্রী——ভারতী,
প্রতাপকাটী, যশোহর।

যোগদর্শন-ভাষ্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৫) মন্ত্রযোগঃ—হঠযোগে অনধিকারী ব্যক্তি মন্ত্রযোগ সাধন করিবে। সর্ব্বযোগের মধ্যে মন্ত্রযোগ অধম বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা—

মন্ত্রযোগশ্চ যঃ প্রোক্তো যোগানামধমঃ স্মৃতঃ।
অল্পবুদ্ধিরিমং যোগং সেবতে সাধকাধমঃ॥

(দত্তাত্রেয়।)

"সমস্ত যোগের মধ্যে মন্ত্রযোগ অতি অধম; অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিই মন্ত্রযোগ সাধন করিয়া থাকে।"

এক ত মন্ত্রযোগের উপযুক্ত গুরু অতি বিরল, তাহার পর বহু জন্ম না খাটিলে মন্ত্রযোগে সিদ্ধি লাভ করা যায় না। অন্যান্য যোগ অপেক্ষা ইহাতে অনেক বিলম্বে ফললাভ হয়। যাহা হউক্ মন্ত্রযোগ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কথিত হইতেছে। মন্ত্রের সাধনা দ্বারা মনোলয় হইয়া সমাধি হইলে, পরে সেই সমাধির পরিপাকে চিত্তবৃত্তি-রোধ ঘটিয়া যে যোগ বা নির্ব্বাণ লাভ হয়, তাহার নাম মন্ত্রযোগ। এই যোগে মন্ত্রই প্রধান অবলম্বন। এই সম্বন্ধে অনেক বলিবার আছে, ইহাতে সন্দেহও বিস্তর, কিন্তু সে সমস্ত কথার আলোচনা করিতে হইলে, আমরা প্রকৃত প্রস্তাব হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িব, সেইজন্য অতি সংক্ষেপে এই যোগের কথা শেষ করিতে হইবে। মন্ত্রযোগ সম্বন্ধে এই কয়েকটা কথা জানা একান্ত আবশ্যকঃ—যথাঃ—

(১) শব্দ বা স্বর (Sound) :—শব্দ চারি প্রকার—অর্থাৎ প্রতিশব্দ চারিভাগে বিভক্ত, যথা—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী। শব্দের পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা—সাধারণ মানবের গোচরীভূত নহে, কেবল বৈখরী অবস্থাই মানবের বোধগম্য হয়। পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমাকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে এবং বৈখরীকে বর্ণাত্মক বলে।

সমস্ত শব্দ এবং সমস্ত মন্ত্রই মূলাধারবাসিনী কুলকুণ্ডলিনীর শরীরে মালার ন্যায় গ্রথিত, এই কুলকুণ্ডলিনী হইতেই শব্দের উৎপত্তি। কুণ্ডলিনী হইতে শব্দ উৎপন্ন হইয়া যখন মূলাধারে প্রকাশিত হয়, শব্দের এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থাকে 'পরা' বলে, পরে পরা যখন মূলাধার ভেদ করিয়া মণিপুরে প্রবেশ করেন, তখন পরা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ স্থূলা হন—এই অবস্থাকে 'পশ্যন্তী' বলে (এই মণিপুরে প্রতি শব্দের—প্রতিমন্ত্রের রূপ দর্শন করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে যাঁহারা সাধন দ্বারা 'মন্ত্র' দর্শন করিতে পারিতেন, তাঁহারই 'ঋষি' এই আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন, সেইজন্য ঋষিগণকে 'মন্ত্রদ্রষ্টা' বলে।) পরে শব্দ যখন আরও স্থূলতর হইয়া অনাহত পদ্মে প্রবেশ করে, তখন তাহাকে মধ্যমা বলে। মধ্যমাই সমস্ত শব্দের উচ্চারণের কারণ। ইহার পরই শব্দ গলিয়া যাইয়া স্থূলতর রূপে নির্গত হয়—এই অবস্থায় শব্দকে আমরা কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারি—ইহারই নাম বৈখরী। শরীরের মধ্যে যে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশ বায়ু আছে, তাহাদের ঘাত-প্রতিঘাতে এই বৈখরী স্থূলতররূপে প্রকাশিত হয়।

আদি শব্দই ওঁকার। আমরা যখন যে কোন

শব্দ উচ্চারণ করি, প্রথমে আমাদের হৃদয়ে ওঁকার শব্দ হয়। সর্ব্বদা এই ওঁকার-ধ্বনি আমাদের মধ্যে হইতেছে। সাধনমার্গে উন্নতি-সহকারে ইহা শ্রুতি-গোচর হয়।

(২) অক্ষরঃ—অধ্যাত্মবিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে (উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত) কতকগুলি অক্ষর বা শব্দের মিলনই মন্ত্র,—ইহা সমাধি-হৃদয়েই প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মে যে স্বতঃসিদ্ধ চলন তাহাই প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ব; মহত্তত্ব হইতে অহংতত্ত্ব; অহংতত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত। সমস্ত অক্ষরগুলি পাঁচভাগে বিভক্ত। অক্ষর সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চাশটা। যে যে ভূতের যে যে অক্ষর, তাহা কথিত হইতেছে;—

পৃথিবী—ট ঠ ড ঢ ণ উ ঊ ঌ য ল।

জল—ত থ দ ধ ন এ ঃ স ঐ।

অগ্নি—চ ছ জ ঝ ঞ ই ঈ ৠ ক্ষ র।

বায়ু—ক খ গ ঘ ঙ অ আ ঋ অঃ শ ব।

আকাশ—প ফ ব ভ ম ও ঔ ং ঃ।

পঞ্চ-ভূতের বর্ণ বর্ণিত হইতেছে।

পঞ্চভূতের নাম।	বর্ণ।
ক্ষিতি	পীতবর্ণ
জল	শ্বেতবর্ণ
তেজঃ	রক্তবর্ণ
বায়ু	নীলমেঘবর্ণ
আকাশ	নানাবর্ণ

সাধনদ্বারা পঞ্চতত্ত্বের আকার ও বর্ণ প্রত্যক্ষ হয়।

(৩) মন্ত্রের বিভাগাদিঃ—মন্ত্র-সকল তিন জাতীয়, যথা—

(ক) পুং—যে সকল মন্ত্রের শেষে 'হুঁ' ও 'ফট্' এই শব্দ আছে, সেই সকল মন্ত্র পুং-মন্ত্র।

(খ) যে সকল মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' এই শব্দ আছে তাহারা স্ত্রী-মন্ত্র।

(গ) যে সকল মন্ত্রের শেষে 'বৌষট্' ও 'নমঃ' এই শব্দ আছে, তাহারা ক্লীব।

এইরূপ বিভাগ হওয়ার কারণ কম্পনের তারতম্য।

মন্ত্র সকল দুই ভাগে বিভক্ত যথা—

(ক) সৌম্যমন্ত্র (খ) আগ্নেয়মন্ত্র।

মন্ত্রের সংজ্ঞা—একাক্ষর মন্ত্রের সংজ্ঞা কর্ত্তরী; দ্ব্যক্ষর মন্ত্রের সংজ্ঞা মুষল, পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের ক্ষুর, ষড়ক্ষর মন্ত্রের শৃঙ্খল, সপ্তাক্ষর মন্ত্রের ক্রকচ, অষ্টাক্ষর মন্ত্রের শূল, নবাক্ষর মন্ত্রের বজ্র, দশাক্ষর মন্ত্রের শক্তি, একাদশাক্ষর মন্ত্রের পরশু, দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের চক্র, ত্রয়োদশাক্ষর মন্ত্রের কুলিশ, চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্রের নারাচ, পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্রের ভূষণ্ডী, এবং ষোড়শাক্ষর মন্ত্রের সংজ্ঞা পদ্ম। এইরূপ সংজ্ঞাভেদে কার্য্য-বিশেষে ইহাদের প্রয়োগ হয়।

(৪) মন্ত্রের সংস্কারাদিঃ—মন্ত্রের ভ্রম-সংশোধনকে মন্ত্রের সংস্কার বলে। সংস্কার দশবিধ, যথা—জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গোপন; এই সমস্ত ক্রিয়ার দ্বারা মন্ত্র শুদ্ধ হয়।

(৫) মন্ত্রগ্রহণাদিঃ—যে সে মন্ত্র গ্রহণ করিলেই ফল হইবে না। চক্রাদির বিচার পূর্ব্বক কোন্ মন্ত্র উপযোগী তাহা ঠিক্ করিয়া, তবে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মানুসারে সাধক কোন্ মন্ত্রগ্রহণের উপযোগী, তাহা চক্রাদির বিচার দ্বারা নিরূপণ করিতে পারা যায়।

ছয় চক্রের বিচার দ্বারা কে কোন্ মন্ত্রের অধিকারী, তাহা ঠিক্ করিতে পারা যায়। ছয় চক্র যথা—(১) কুলাকুলচক্র (২) রাশিচক্র (৩) নক্ষত্রচক্র (৪) অকথহ-চক্র (৫) অকডমচক্র (৬) ঋণিধনিচক্র।

আরও কাহার কোন দেবতা উপযোগী, তাহা ঠিক্ করিতে হইবে। আমার যাহা ভাল লাগিবে, তাহা বলিলে চলিবেনা। মূল দেবতা পাঁচটী। ইহা হইতেই পঞ্চ উপাসক-দলের সৃষ্টি। পঞ্চ দেবতা যথা—

(১) বিষ্ণু (২) সূর্য্য (৩) শক্তি (৪) গণেশ (৫) শিব।

কাহার কোন্ দেবতা উপযোগী, স্থূলতঃ তাহার বিচার এইরূপ;—

যে তত্ত্বপ্রধান সাধক যে দেবতা গ্রহণ করিবে তাহা—

আকাশতত্ত্ব—বিষ্ণু	একই সগুণ ব্রহ্ম পঞ্চবিধ-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত।
বায়ুতত্ত্ব———সূর্য্য	
অগ্নিতত্ত্ব——শক্তি	
জলতত্ত্ব——গণেশ	
পৃথিবীতত্ত্ব——শিব	

শ্রীগুরু নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, কাহার কোন্ তত্ত্ব প্রবল।

(৬) মন্ত্রের magnetic vibration (ম্যাগ্নেটিক—ভাইব্রেষন্ :—প্রতি শব্দই যখন উচ্চারণ করা যায়, তখনই magnetic vibration উৎপন্ন হয়। magnetic vibration কি? তাহা এক প্রকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তি-তরঙ্গের কম্পন। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তি সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। যখনই কোন চিন্তার উদয় হয়, যখনই কোন চলন-ভাব হয়, তখনই এই শক্তি কম্পিত হইয়া সাগরতরঙ্গের ন্যায় নানাদিকে প্রসারিত হয়। আমরা সর্ব্বদা যে সমস্ত শব্দ উচ্চারণ করিতেছি, কেবল শব্দ কেন, যে কোন চিন্তা-তরঙ্গ আমাদের মধ্যে উঠিতেছে, তাহাতেই এই শক্তি তরঙ্গায়িত ভাবে নানাদিকে প্রসারিত হইতেছে, কিন্তু এই কম্পনগুলিকে নানাদিকে প্রসারিত হইতে না দিয়া একই দিকে (উদ্দেশ্যানুযায়ী) প্রসারিত করিতে হয়। সেই জন্য বিশেষভাবে (গুরূপদেশ অনুসারে) মন্ত্রের vibration উৎপন্ন করিতে হয়। সেই কম্পন বিশেষভাবে শক্তিমান্ হইয়া অভীষ্ট দেবতার নিকট উপস্থিত হয়, এবং উহা সাধকের অভীষ্টানুযায়ী ফলপ্রসূ হয়। এই magnetic vibration অনুভব করিবার শক্তি কেবল যোগীদিগেরই আছে। আর এক কথা, আজকাল অনেকের মত (আনিবেশান্ট প্রভৃতি) ইহাদের ভাইব্রেষনে মন্ত্র ফলপ্রসূ হয়, তাহা একেবারেই সত্য নহে। এখন সে সমস্ত বিচার করিবার সময় নহে বলিয়া তাহা হইতে ক্ষান্ত হইলাম। (গূঢ় তত্ত্ব গুরুবক্ত্রগম্য)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী।

শক্তি-পূজা।

আবার এসেছ চিরানন্দময়ি!
শরত-আগমে নিরানন্দ ঘরে,
তাই আজ প্রেম উৎসব-রব
মুখরিয়া উঠে এতদিন পরে!
পাষাণ-আলয়ে ওই এসেছে পাষাণী,
তাই প্রবাহিত সুখ বর্ষা নন্দিনী!

"এস—এস" বলি' মধুর সঙ্গীতে
বিপিনে বিহঙ্গ অধীর ডাকিয়া,
মর্ম্মর রবে আগমনী গীতি
বন-বীথি মাঝে উঠিছে ধ্বনিয়া,
বর্ষ-শেষে বিশ্ব-প্রাণ তুলিছে রাগিণী,—
এস মা গো, মহাশক্তি দুর্গতিনাশিনি !
মেঘমুক্ত শশী হাসিছে আকাশে,
অনিল বহিছে সুরভি মাখিয়া,
সমল তটিনী অমল পরাণে
ধায় পারাবারে হরষে নাচিয়া,—
তব প্রতীক্ষণ করি' বিশ্ববাসি প্রাণী
ডাকে 'এস কোথা গো মা আনন্দদায়িনি !'
বরষা-পীড়নে শিথিল বসনে
বিবশা প্রকৃতি ছিল শূন্যপ্রাণে,
আঁধারের আলো—নিরাশার জ্যোতিঃ
হ'য়েছে প্রভাত ভারত-গগনে,
নবভাবে প্রবাহিত নবীন রাগিণী—
এস আদ্যাশক্তি-মূর্ত্তি দনুজ-দলনি !
শিব-শক্তি-সাথে এসেছে ফিরিয়া—
কমল আবাসে কমল-বাসিনী,
মহাসিদ্ধিদাতা, চির শৌর্য্যধর
মোহ-বিনাশিনী বিবেকদায়িনী,
শক্তিপুঞ্জ সাথে এস, শক্তি-প্রসবিনি,
মৃত্যুঞ্জয়চিরবাঞ্ছা জগত জননি !
তোমার অনন্ত শক্তি বিশ্ব চরাচরে
সমভাবে সর্ব্বব্যাপী অসংখ্য-প্রবাহে,
ক্ষুদ্রতম পঞ্চভূত রহস্য-মিলনে
বরণীয় চিরন্তন মহাশক্তি রহে—
বচন-অতীত সেই জ্যোতি হিরণ্ময়
এক বহুসম্মিলিত—বহু একময় !
আজি গো জননি, বড় শুভদিন—
আপনি এলি মা ঈশানি, বঙ্গে,
ছুটিছে আনন্দ জীব বৃন্দ-প্রাণে
মধুর নিক্কণে বিপুল রঙ্গে।
এস মা গো শক্তিময়ি ! হৃদয়ে হৃদয়ে,
তোমা' তরে সিংহাসন চিরশূন্য রহে।
অসীম দুর্গতি, যাও দেশে মতি,
জগত অধীর পাপাগ্নি-শিখায়,
তোমার প্রতিমা, তোমার গরিমা,
হায় ! মা অকালে বিলুপ্ত প্রায় !
শ্মশানের ভস্ম মাঝে বিশ্ববিমোহিনী
দাও বল, দাও শক্তি,—মৃতসঞ্জীবনি !
রাবণের চিতা চির প্রজ্বলিতা
র'য়েছে ভরিয়া ভারত-ভবনে ;
মায়ার ছলনা জীবনে মরণে
শত ফণা ধরি' সহস্র গর্জ্জনে
ব্যাপিয়া রেখেছে আজ নিবন দাহনে ;
দাও বল, দাও শক্তি, ও পদ অর্পণে !
নিত্য নিরঞ্জন চিন্ময় জ্যোতিঃ
ঘন ঘন কম্পনে আগ্নেয় ভাতি,
চিদানন্দরূপিণী, বহুবর্ণধারিণী,
চিত্ত-সুনির্ম্মল গরীয়সী দ্যুতি,—
ত্রিদিব-বাসবরক্ষা দানবনাশিনী
সৃজন পালন লয়ে কালস্বরূপিণী।
ভৈরবী ভবানী, দৈত্য বিনাশিনী,
রুদ্রাণী দশপ্রহরণ-ধারিণী,
চণ্ড-বিঘাতিনী, মুণ্ড-নিপাতিনী,
মস্তক-মালিনী, মহিষমর্দ্দিনী,—
উর দেবি, মহাশক্তি, উর জ্যোতির্ম্ময়ি,
কদাচার-বিনাশিনী ভারতে চিন্ময়ি !
ওই মূর্ত্তি ধ্যানে রাঘব দুর্দ্দিনে
অকূলে পড়িয়া ডাকিল তোমারে
রিপু-বিনাশিতে সাগরের কূলে
পূজিল যতনে মানস-মন্দিরে,

পুরিল মানস, দুঃখ রহিলনা তার,
এস মা অভয়ে হর দীন দুঃখভার।
কৌরব-সমরে গাণ্ডীবধারী
পার্থ ম্রিয়মাণ রথের উপরে,
জনার্দ্দন-বাণী করিয়া স্মরণ
করিল সাধনা সেদিনে তোমারে,—
কুরুক্ষেত্র প্রজ্জ্বলিত অনল-শিখায়
দেখা দিলা মহাশক্তি বিদ্যুৎ-প্রভায়!
ডাক একবার আজি এ দুর্দ্দিন,
জীবনে মরণে সবে একপ্রাণে,
নবীন জীবন আসিবে ফিরিয়া—
ভাতিবে নবীন তপন গগনে!
মৃণ্ময়ী রূপ ত্যজি' কত দিনে আর
চিন্ময়ী রূপে দেখা দিবে, মা আমার?
ভারতের আজ শুভ-মহাষ্টমী
সিক্ত রক্তজবা লইয়া সকলে,
মান, অভিমান দিয়া বিসর্জ্জন
চল গিয়া পূজি নয়ন-সলিলে;
ডাকিলে 'জননি' বলি যাবে কোথা আর!
রোমাঞ্চ উঠিবে তবে জগতে আবার!

শ্রীফণীন্দ্রমোহন ঘোষ।

দেবতার মুখ।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শিষ্য ভক্ত ও অনুচর পার্ষদবর্গের মধ্যে শ্রীরূপ গোস্বামীর নাম অগ্রগণ্য। তাঁহার কর্ম্মজ্ঞান, ত্যাগ-স্বীকার, দীনতা ও অনুসন্ধিৎসা এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য বৈষ্ণব-জগতে সুপরিচিত, এমন কি আদর্শস্থানীয়। তৎ-রচিত পুস্তক সকল ভক্তিশাস্ত্রের মধ্যে প্রামাণিক গ্রন্থরূপে পরিগণনীয়। রূপ ও তদীয় সহোদর এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এই তিন জন রূপ সনাতন ও জীব গোস্বামী নামে পরিচিত রূপের পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তা অলৌকিক হইলেও তিনি নিরন্তর প্রেম-প্রবাহে পরিপ্লুত হইতেন এবং ভক্তিরসের অমৃত ধারায় তাঁহার হৃদয় সতত‌ই পরিষিক্ত হইয়া থাকিত। দর্শনের শুষ্ক তর্ক বা নীরস ভাব তাহার প্রেমপূর্ণ ও ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে স্থান পাইতনা। বৈষ্ণব-সাহিত্যের অন্যতম লেখক প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকার রচক শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর এইজন্যই শ্রীরূপ গোস্বামীকে "প্রেমভক্তি রসকূপ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বেদান্তদর্শন লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যদিগের মধ্যে বিচার-বিতর্ক বরাবর শুনিতে পাওয়া যায়। পরিব্রাজক শ্রেষ্ঠ পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া, ভক্তিশাস্ত্রের অনুমোদিত, প্রেমের অনুগত বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ দ্বৈতবাদ প্রভৃতির মত ও তদনুযায়ী ব্যাখ্যা ভাষ্য প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্বয়ং প্রবোধানন্দ সরস্বতীর সহিত বিচারে বৈদান্তিক মতের অর্থ ও ব্যাখ্যা—তৎকাল-প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে ও অভিনব ভাবেই করিয়াছিলেন বলিয়া, শ্রীচৈতন্যদেবের অনুমোদিত বেদান্ত-ভাষ্য অদ্বৈত বাদের বিরোধী। রামানুজের মত তৎসম্প্রদায়ি-দিগের মধ্যে যেরূপ প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত, বেদান্তের গোবিন্দভাষ্যও তেমনই বৈষ্ণব-পণ্ডিতগণের নিকট সমাদৃত ও পরিগৃহীত হইয়া থাকে; এই ভাষ্য শ্রীবৃন্দাবনের

অধিষ্ঠাতৃদেব শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের আদেশে বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রণয়ন ও সংকলন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহা গোবিন্দভাষ্য নামে খ্যাত। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ের অনুগত এই ভাষ্যের অনুরূপ মতেই বেদান্তদর্শন বুঝিতেন ও বুঝাইতেন। অদ্বৈতবাদে তাঁহাদের মনের আশা ও প্রাণের পিপাসা মিটিত না। শ্রীবৃন্দাবন-ধামে অবস্থান সময়ে একদা এক প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদী বেদান্তবিৎ পণ্ডিতের সহিত রূপগোস্বামীর বিচার ও বার্ত্তালাপ হয়; বার্ত্তালাপ-সময়ে শ্রীরূপ গোস্বামী স্বীয় উপাস্য যুগলরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তির ধ্যান ও গুণলীলা প্রভৃতির অদ্ভুত আলোচনা ও বিস্তৃত বর্ণনা করেন। তাঁহার নিত্যালোচ্য শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানের সমর্থনে তাঁহার মধুরভাব—প্রেমময়ী মূর্ত্তি ও ঐশ্বর্য্য-তত্ত্ব প্রকটিত করিয়া ফেলেন। শুদ্ধচৈতন্য-বাদী বৈদান্তিক পণ্ডিত নির্গুণভাবে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীর বুদ্ধিমত্তা, তর্কশক্তি, বিচার-ক্ষমতা, এবং যুক্তিপ্রয়োগ ও পাণ্ডিত্য পরিদর্শনে অতীব বিস্মিত ও সম্প্রীত হইয়া বলিলেন— "আপনার মত তত্ত্বজ্ঞানী সুদূরদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি নির্ব্বিকার নিরাকার ও চিন্ময় ব্রহ্মের উপাসক না হইয়া, যে সাকার দেবের উপাসনায় এবং শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে রত ও তৃপ্ত রহিয়াছেন, এইটী বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়" !

বৈদান্তিক পণ্ডিত মহাশয়ের বিস্ময়-বোধক ও সংশয়-সূচক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরূপ গোস্বামী নিম্নলিখিত শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিলেন—

ধ্যানাতীতং কিমপি পরমং যে তু জানন্তি তত্ত্বং।
তেষামাস্তাং হৃদয়কুহরে শুদ্ধচিন্মাত্র আত্মা।
অস্মাকন্তু প্রকৃতি-মধুর-স্মের বক্ত্রারবিন্দো।
মেঘশ্যামঃ কনক-পরিধিঃ পঙ্কজাক্ষোঽয়মাত্মা।

অনুবাদ।

যাঁহারা ধ্যানাতীত বাঙ্মনের অগোচর (অনির্দেয় অনির্দ্দেশ্য) পরমতত্ত্ব জানেন, তাঁহাদের হৃদয়-বিবরে শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র আত্মা অবস্থিত হউন, কিন্তু আমাদিগের হৃদয়ে প্রকৃতিমধুর (স্বভাবসুন্দর) ঈষৎ-হাস্যান্বিত প্রসন্নমুখকমল ঘনশ্যাম পীতাম্বর কমলনয়ন এই আত্মাই অবস্থান করুন।

শ্লোকটীর সহজ ও সরলার্থ মাত্র অনুবাদে প্রদত্ত হইল, কিন্তু 'কিমপি' 'হৃদয়কুহরে' 'শুদ্ধচিন্মাত্র' 'প্রকৃতিমধুর' 'কনকপরিধি' প্রভৃতি পদে যে সকল গূঢ় ভাব ও শ্লিষ্টার্থ সংসূচিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা এস্থানে অনাবশ্যক ও অসম্ভব। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ অনুসন্ধানে কৌতূহল চরিতার্থ করিবেন ও সংস্কৃত ভাষার ভাবগাম্ভীর্য্য গ্রহণে কৃতার্থ হইবেন। শ্রীরূপ গোস্বামী এই শ্লোকের ভাবে জানাইলেন "আমাদিগের মত মূর্খগণের পক্ষে শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র আত্মা উপাস্য নহে। আমরা ধ্যানাতীত বিভূত নিরাকার দেব-রূপ ভাবিতে ও জানিতে অসমর্থ। আমাদের ঠাকুর প্রকৃতিমধুর মহাস্যবদন ও কমললোচন হওয়া প্রয়োজন।" বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীরূপ গোস্বামীর পাণ্ডিত্য,

সারল্য ও ঔদার্য্য দর্শনে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও আহ্লাদিত হইলেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী দেব-মূর্ত্তির সুপ্রসন্ন কমলবদনে যে মৃদুহাস্যের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই আমাদের এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। দেবদেবীর মুখে নিত্য হাস্য বিরাজিত। সাধক, ভক্ত, উপাসক ও পূজক মাত্রেই অবগত আছেন, উপাস্য দেবতার মুখ নিত্যস্মিতযুক্ত।

সাধকদিগের হিতের জন্য নির্গুণ অপ্রমেয় ও চিন্ময় ব্রহ্মের যত প্রকার রূপ কল্পিত হইয়াছে এবং দেবদেবীর যতরূপ মূর্ত্তি প্রচলিত রহিয়াছে—সকল রূপেই, সকল মূর্ত্তিতেই মুখকমল স্নিগ্ধহাস্যে পরিপূর্ণ। এই 'কমল' শব্দে কোমল ভাব ও বিমল রূপ সূচনা করাই উদ্দেশ্য। সুহাস্যের যে রহস্যময় ও অনির্ব্বচনীয় ভাবের প্রভাবে দেবদেবীর আস্য-মণ্ডল নিয়ত উজ্জ্বল ও পূর্ণপ্রভাযুক্ত হইয়া আছে, এবং যে হাসির অনুপম গুণরাশিতে মুখমণ্ডল, সাধক ভক্তের চিত্তাকর্ষক, প্রীতিপ্রদায়ক ও সন্তাপহারক হইয়া রহিয়াছে, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব। ধ্যান দ্বারা আমরা যে সকল দেবদেবীর মূর্ত্তির বিষয় ভাবিয়া থাকি, তাহাতে অনন্ত রূপের অসংখ্য ভাবের অসীম মূর্ত্তি-সমূহের নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি মাত্রেই সম্প্রদায়-ভেদে ঐ সকল মূর্ত্তির কোন না কোন রূপের তত্ত্ব ভাবনা ও আলোচনা করিয়া থাকেন। সাধক পূজকগণও মনোমত মূর্ত্তির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া, পূজারাধনার ও সেবা-পরিচর্য্যায় মনের সাধ মিটাইয়া কৃতার্থ হন। মূর্ত্তি-ভেদ ভাবনা করা, রূপান্তর চিন্তা করা বা তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা, এক প্রকার অসাধ্য অনাবশ্যক ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয়। এক বিষ্ণুরই কত মূর্ত্তি, এক শক্তিরই কত রূপ আছে, তাহা কে গণিয়া বা বলিয়া শেষ করিতে পারে? কিন্তু আকার-গঠনগত ভেদ যতই থাকুক না কেন, সকল মূর্ত্তিতেই একটী বিষয়ে সমতা বা সাদৃশ্য নিয়ত বিদ্যমান। এই সমতার নির্ণায়ক এবং সাদৃশ্যের পরিচায়ক প্রসন্ন মুখমণ্ডল, ও সুমধুর মৃদুহাস্যে সেই বদন-কমল সতত সমুজ্জ্বল। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকেই যে কেবল শ্রীরূপ গোস্বামী "স্মেরবক্ত্রারবিন্দের" উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নয়, সকল দেবদেবীর মূর্ত্তিতেই সহাস্য বদনের বিকাশ ও ধ্যানে তাহার বর্ণনা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা নিম্নে কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ সুপরিচিত ও পূজনীয় দেবদেবীর ধ্যান হইতে সহাস্য-বদনের ভাগটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সমস্ত ধ্যানগুলি সম্পূর্ণরূপে সঙ্কলিত হইলে বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। বাহুল্য-ভয়ে এবং প্রয়োজনবশতঃ কেবল মুখ মাত্রের বর্ণনীয় অংশটুকু সংগৃহীত ও উদ্ধৃত হইল। অনুসন্ধিৎসু কৌতুহল-পরায়ণ পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে ধ্যানগুলির সমস্ত অংশের সবিশেষ আলোচনা করিয়া তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিবেন এবং আমাদের বক্তব্য বিষয়ের মর্ম্ম গ্রহণ করিতেও সমর্থ হইবেন।

গণেশের ধ্যানে—

'চতুর্ভুজং মহাকায়ং দ্বিদন্তং সস্মিতাননং'

সূর্য্যের ধ্যানে—

'ত্রিনয়নবিলসদ্বেদবক্ত্রাভিরামম্।'

অন্য প্রকার—

'কিরিটিকুণ্ডলোদ্ভাজ প্রসন্নমুখপঙ্কজম্।'

শিবের ধ্যানে—

'শশিশকলধরং স্মেরবক্ত্রং।'

অন্য প্রকার—

'ভালোদ্যন্নেত্রমীশং স্মিতমুখকমলম্।'

অন্য প্রকার—

'চন্দ্রার্কাগ্নিবিলোচনং স্মিতমুখং।'

কালীর ধ্যানে—

'সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্।'

অন্যপ্রকার—

'মুক্তকেশীং স্মিতাননাম্—'

অন্যপ্রকার—

'হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ—'

অন্যপ্রকার—

'ললজ্জিহ্বাং ঘোরদংষ্ট্রাং কোটরাক্ষীং হসন্মুখীম্—'

তারার ধ্যানে—

'স্বাবেশস্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কারবিভূষিতাম্—'

অন্যপ্রকার—

'স্মেরবদনা· স্মেরমৌক্তিকভূষণাম্—'

ষোড়শীর ধ্যানে—

'স্মিতমাধুর্য্য বিজিতমাধুর্য্যরস সাগরাম্।'

ভুবনেশ্বরীর ধ্যানে—

'স্মিতমুখীমাপীনবক্ষোরুহাম্।'

স্মেরমুখীং ইত্যাদি—

ভৈরবীর ধ্যানে—

'নয়নত্রয়-শোভাঢ্যাং পূর্ণেন্দুবদনান্বিতাম্—'

অন্যপ্রকার—

'স্মিতপ্রভিন্নবদনাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং—

সরস্বতীর ধ্যানে—

'বাগ্দেবতাং সস্মিতাং'

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর ধ্যানেঃ—

'স্মেরাভিরম্যাননম্।'

অদ্বৈত মহাপ্রভুর ধ্যানে—

'স্মেরাননং সুন্দরম্।'

শ্রীগুরুর ধ্যানে—

'স্মেরাননং সুপ্রসন্নম্।'

অন্যপ্রকার—

'প্রসন্নবদনং শান্তম্'

শ্রীধর বিষ্ণুর ধ্যানে—

'প্রসন্নবদনং সৌম্যম্'

মনসার ধ্যানে—

'স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং'

শীতলার ধ্যানে—

'উরুহাস-সুন্দরমুখীম্'

গঙ্গার ধ্যানে—

'সুপ্রসন্নাং সুবদনাম্'

সীতার ধ্যানে—

'শরদিন্দু-সুন্দরমুখীম্'

'বিস্মেরবিম্বাধরাম্।'

লক্ষ্মণের ধ্যানে—

'পদ্মনিভেক্ষণঃ—'

ষষ্ঠীর ধ্যানে—

'শরচ্চন্দ্রনিভাননাম্।'

বাসুদেবের ধ্যানে—

'সুস্মিত সুভগ-মাস্যম্।'

দুর্গার ধ্যানে—

'পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্।'

রামের ধ্যানে—

'নবকমলদল-স্পর্দ্ধিনেত্রং প্রসন্নম্।'

রঘুনাথের ধ্যানে—

'শ্যামং প্রসন্নবদনম্।'

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে—

'ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনম্।'

অন্য প্রকার—

'হসন্তং প্রিয়য়াসার্দ্ধং হাসয়ন্তঞ্চতাং মুহুঃ॥'

শ্রীরাধিকার ধ্যানে—

'স্মিতমুখীং বিম্বাধরাম্।'

বলদেবের ধ্যানে—

'রক্তাম্বুজদলেক্ষণম্।'

রেবতীর ধ্যানে—

'বিশদস্মিতচারুবদনাম্।'

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ধ্যানে—

'সুস্মেরচন্দ্রাননম্।'

কাত্যায়নীর ধ্যানে—

'সুপ্রসন্নাং সুবদনাম্।'

ষষ্ঠীর ধ্যানে—

'নৌমি ষষ্ঠীং সহাসাম্।'

দেবদেবীর ধ্যানের যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহাতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, সুমধুর নিত্যহাস্য দেবতা-মূর্ত্তির আস্যের প্রধান ভাব ও অপরিহার্য্য ভূষণ। আমরা এখন অন্য দেবদেবীর ধ্যানের বা হাস্যের সমালোচনা না করিয়া, করালবদনা কালীর মুখের বিষয় একটু বুঝিতে বা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সকলেই জানেন, কালীর ধ্যানের প্রথমেই আছে, "করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্"। পূজাকরিতে বসিয়া ভক্ত পূজক বা সাধক যে মূর্ত্তি ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার মুখ করাল বা ভীষণ বলিয়া চিন্তার বিষয় হইল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, মূর্ত্তির অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অবস্থান, অবয়ব ও ভাবভঙ্গী প্রভৃতি ভাবনা করার পর, সাধক যখন ধ্যান শেষ করিলেন, তখন সেই বিকট-দশনা বিলোলরসনা ও করালবদনার মুখ-মণ্ডল অপূর্ব্বভাবে পরিবর্ত্তিত ও অনির্ব্বচনীয় মধুরিমায় পরিণত! সেই সময় ঐ করালবদনা কালীর মুখ খানি একবার ধ্যান-বর্ণিত অপূর্ব্বভাবে দর্শন ও ভাবনা করিলেই পাঠক আমাদের বাক্যের সার্থকতা অনুভব করিতে পারিবেন;—ধ্যানের শেষে আছেঃ—

সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরানন-সরোরুহাম্।

আর বিকটদশনার মুখের বিকৃতভঙ্গী বা বিরূপভাব নাই। তিনি এখন সুখ-প্রসন্নবদনা অর্থাৎ তাঁহার মুখ এখন সুখ-প্রসাদে বিমল; দেবীর অন্তরস্থিত সুখ-রাশির বাহ্য-প্রকাশ-নিমিত্ত ও ভক্ত পূজকগণের প্রতি প্রসাদ-প্রদর্শন-জন্য মুখমণ্ডলের বিমল ভাব সংসূচিত হইতেছে। কেবল মুখখানি সুখপ্রসন্ন হয় নাই। বিকট-বদনার স্মেরানন সরোরুহবৎ প্রফুল্ল হইয়াছে। জগজ্জননী সাধক সন্তানের নিকট এখন সুমধুর মৃদুহাস্যে আপন বিকটাস্যের ভীমভাব পরিহার করিয়া, পরিমলময় প্রফুল্ল কমলের অপূর্ব্ব কোমল মাধুর্য্যপূর্ণ-ভাব পরিগ্রহ করিয়াছেন। মায়ের সুধারাশি-মাখা, হাসিরাশি-ঢাকা কমলবদন দেখিয়া ভক্ত সাধক এখন সকল সন্তাপ ভুলিয়া গিয়া, সকল জ্বালাযন্ত্রণা দূরে ফেলিয়া, সাধক-জীবন সার্থক করিয়া; জীবন্মুক্তিলাভের

পথে অগ্রসর হইতেছেন। ভাবুকের ভাবনা—সাধকের সাধনা—উপাসকের উপাসনা—পূজকের অর্চনা—এখন সার্থক ও সফল হইয়াছে!

দেবদেবীর মুখে হাসি ত আছে, কিন্তু, এ হাসি কেন? সকল সময়েই এ হাস্য আছে, কখনই হাসির বিরাম হয় না! আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের একটী স্থানের আলোচনা করিয়া এই কথা বুঝাইব। রাসক্রীড়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে গোপীগণের গর্ব্বচূর্ণ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে তাঁহারা নানাস্থানে নানাভাবে তাঁহার অন্বেষণ করিয়া, তাঁহার দর্শনলাভে বিফল-মনোরথ হইয়া যমুনা-পুলিনে সকলে সমবেত হইয়া নিজ নিজ মনের ভাব, প্রাণের আবেগ, হৃদয়ের চাঞ্চল্য, আত্মার বিহ্বলতা জানাইবার ও প্রকাশ করিবার উদ্দেশে সম্মিলিত হইয়া উচৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন। এ গীত কি গান কি রোদন, কি বিলাপ, কি প্রার্থনা—তাহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। এই অপূর্ব্ব গীতিই "গোপীগীতিকা" নামে অভিহিত। গোপীগীতের ভাবগাম্ভীর্য্য যাহাই হউক্ এই গীতের অপূর্ব্ব আকর্ষণে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের দর্শনপথে আবির্ভূত হইলেন! গোপীগণ কৃষ্ণদর্শনে যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীগণকে দর্শন দিলেন, সেই সময় তাঁহার মূর্ত্তি-বর্ণনা প্রসঙ্গে শুকদেব বলিয়াছেন;—

তাসামাবিরভূৎসৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃস্রগ্বী সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ ৩২ অধ্যায়।

ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণান্বেষণে অত্যন্ত কাতর ও বিহ্বল—একবারে শ্রান্ত ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া ছিলেন, আপন আপন মনোবেদনা ও অন্তর্যাতনা বিজ্ঞাপন করিবার জন্যই গীতচ্ছলে রোদন বা বিলাপ করিয়াছেন, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে! এক্ষণে যাঁহার জন্য তাঁহাদের ঐরূপ বিহ্বলদশা ও সর্ব্বাঙ্গীন কাতরতা, তাঁহার অবস্থা একবার দেখা উচিত। তিনি সাক্ষাৎ মদনমোহন। মদন অনঙ্গ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই অনঙ্গবিমোহন প্রত্যক্ষ রূপ ধারণ করিয়া সেই গোপীদিগের সম্মুখে উপস্থিত! সেই মদনমোহন রূপের বিশেষত্ব এই, মুখে সুমধুর হাস্য বিরাজমান, "স্ময়মানমুখাম্বুজ"। এখন একটা কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে শ্রীকৃষ্ণের জন্য গোপীগণ মৃতপ্রায়, বিরহ-বেদনার অসহ্য দংশনে অনন্তভাবে জর্জ্জরিত, যাঁহার বিচ্ছেদে তাঁহাদের প্রাণ একবারে প্রয়াণোন্মুখ—হায়! সেই শ্রীকৃষ্ণ কেমন করিয়া হাসিতে হাসিতে হাসিভরা মুখে তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন! লোক-লজ্জার খাঁতিরে লোকাচার রক্ষা করিবার জন্য, অন্ততঃ গোপীদিগের ব্যথার 'ব্যথী'—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্তও তাঁহাকে শুষ্ক, বিবর্ণ, বিরসবদনে এবং অশ্রুপূর্ণ-লোচনে তাঁহাদের কাছে আসা উচিত ছিল। কেন এরূপ বিপরীত ভাব? কেন এই বৈষম্য? একটু অনুসন্ধান করিলেই এ রহস্যময়ী প্রহেলিকার উত্তর পাওয়া যাইবে। যে মুখে নিয়ত নিত্য হাস্য বিরাজমান, সে মুখের সে হাসি লুকাইবার বা ঢাকিবার উপায় নাই। সে হাসি ঢাকিতে বা লুকাইতে গেলে, প্রকৃতি-বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্য প্রকৃত ভক্ত শুকদেব নিজ উপাস্য-দেব শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল 'হাসিমাখা' করিয়াই গোপীগণের সম্মুখে আনিয়া দিয়াছেন।

দেবমূর্ত্তির মুখে এই মৃদুমধুর হাস্য কেন? আমরা তাহার একরূপ সমালোচনা

ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম; এখন আর একটী স্থল দেখাইয়া আমরা আলোচ্য বিষয়ের বিশদতা সম্পাদন পূর্ব্বক প্রবন্ধের সম্পূর্ণতা সাধন করিব। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ২৮ অধ্যায়ে কপিলদেব নিজ জননীর (দেবহূতির) প্রার্থনানুসারে তাঁহারই জ্ঞান-বিধান ও বিবেকোৎপাদন-নিমিত্ত ভগবানের ধ্যান বর্ণনা করিয়াছেন। সেই অদ্ভুত ধ্যানের মধ্যেই আছে—

"তস্যাবলোকমধিকং কৃপয়াতিঘোর—
তাপত্রয়োপশমনায় নিসৃষ্টমক্ষ্ণোঃ।
স্নিগ্ধস্মিতানুগুণিতং বিপুলপ্রসাদং
ধ্যায়েচ্চিরং বিপুলভাবনয়া গুহায়াম্॥
হাসং হরেরবনতাখিললোকতীব্র—
শোকাশ্রু-সাগর-বিশোষণমত্যুদারম্॥"

কপিলদেব ধ্যানের প্রথমে ভগবানের পদারবিন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমিক উর্দ্ধভাবে অন্যান্য অবয়বের বর্ণনা করিয়া, মুখের ধ্যানানন্তর কৃপাদৃষ্টির ও মৃদুহাস্যের ধ্যানের জন্য নিজ মাতাকে বলিতেছেন—

মা, এইরূপে ভগবানের মুখ চিন্তা করিয়া তাঁহার কৃপাবলোকনের ধ্যান করিবে।

ভগবানের কৃপাবলোকন স্নিগ্ধ ও হাস্য-যুক্ত হওয়াতে অতি মনোহর হইয়াছে। এই কৃপাদৃষ্টি—ধ্যানকারী ভক্তের প্রতি পতিত হইলেই তাঁহার তাপত্রয়ের উপশম হইয়া যায়। ইহা বিপুল প্রসাদ গুণের পরিজ্ঞাপক। আবার তাঁহার হাস্যের কি অপূর্ব্ব ক্ষমতা! প্রণত লোকসকলের তীব্র-শোক-জনিত প্রবহমান অশ্রুসাগরের বিশোষণকারী হাস্য। ভক্ত আর কি চায়? ভক্তগণের, সাধক সম্প্রদায়ের, উপাসক বা পূজক-সমূহের এবং মানব-সাধারণের আর কি প্রার্থনীয়, কি বাঞ্ছনীয় হইতে পারে? আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ তাপের তাড়নায় দেহ ও মন অবিরত দগ্ধ, ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। বিবিধ ভাবে বিবিধ অবস্থায় সংসার-সাগরের স্রোতে পড়িয়া অথবা শোকের অবিরত ঘাতপ্রতিঘাতে মন-প্রাণ-সমন্বিত শরীর শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। অদ্বিতীয় দার্শনিক সাংখ্য-দর্শনকর্ত্তা কপিলমুনিকে এই ত্রিতাপের অত্যন্তনিবৃত্তি নিমিত্তই ব্যাকুল হইয়া জ্ঞান পিপাসায় কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এখন কপিলদেব সুস্পষ্টভাবে বিশদরূপে বলিতেছেন, উপাস্যদেবের হাস্য-মাখা করুণদৃষ্টিযুক্ত মুখকমল ধ্যান করিলেই সকল জ্বালা, সকল যন্ত্রণা, পাপ-তাপ, দুঃখ দারিদ্র, রোগ শোক তিরোহিত ও বিদূরিত হইয়া যাইবে।

উপাস্য-দেবতা যেন সাধক ও পূজককে ডাকিয়া বলিতেছেন "যে যে ভাবে যেখানে থাকিস্ না কেন, একবার আমার কাছে আয়, একবার আমার হাসিভরা মুখ, প্রেমমাখা কটাক্ষ দেখিয়া যা! তোদের সমস্ত অমঙ্গল নাশ ও সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা দূর করিয়া দিব। আমার প্রফুল্লমুখ, করুণদৃষ্টি, মধুরহাস্য বিলোকন করিয়া, তোরাও আবার সংসারের সুখসাগরে ভাসবি।" এইজন্য গোপীগণ বলিয়াছেন—

"তোমাতে ভুলিনি শ্যাম ভুলেছি বাঁশিতে,
ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা আর মধুর হাসিতে।"

সত্যকথা! মুখের হাসি এবং চোকের হাসিতেই জগৎ বিমোহিত। মুখের হাসি সময়ে ঈষৎ প্রচ্ছন্ন থাকিলেও চোকের হাসি আপনা-আপনি প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

এস ভাই সাধকগণ! এস সাধিকা ভগিনীগণ! আমরাও যেন উপাসনার কালে, পূজার সময়, ধ্যানের আসরে আমাদের অভীষ্টদেবতার হাসিভরা মুখ দেখিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে পরিতৃপ্ত ও পুলকিত হইতে পারি এবং সংসারের ত্রিতাপ-তাড়নার হাত হইতে নিস্তার পাই, তাঁহার স্বরূপ জানিয়া কৃতার্থ হইতে শিখি, এমনই ভাবে ধ্যান করিবার জন্য নিয়ত কায়-মনোবাক্যে অবহিত থাকি।

শ্রীদুর্গাদাস রায়।

এস মা !

গতবর্ষে শূন্যমনে ভগ্নপ্রাণে অশ্রুপূর্ণনয়নে কাতরবচনে যখন তোমাকে অনিচ্ছায় বিদায় দিয়াছিলাম, তখন বলিয়াছিলাম, "সম্বৎসর-ব্যতীতেতু পুনরাগমনায়চ"; তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু আবার একবৎসর পরে তুমি আসিবে—এইরূপ কথা স্থির করিয়াই তোমায় ছাড়িয়া দিয়াছিলাম! দিনের পর দিন, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস, অয়নের পর অয়ন কাটিয়া গিয়াছে। আবার সেই সুমধুর শরৎসময় সমাগত, আবার ঝিলে বিলে, পুকুরে পল্বলে, কমলকুমুদের হাসিরাশির স্রোত বহিতেছে, আবার মেঘ-মুক্ত শশী আকাশের মাঝে হাসিতেছে, আবার কুন্দধবল বিমল জ্যোৎস্না প্রকৃতির গায় রূপালী ওড়নার মত চক্‌চক্ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, আবার দূর্ব্বাদলে শিশিরবিন্দু-সকল মুক্তামালার ন্যায় শোভা পাইতেছে—আবার সুখময় শারদ দেবীপক্ষ আসিয়াছে,—আবার তোমার আসিবার সময় আসিয়াছে, তাই কাতরভাবে ডাকিতেছি— 'এস মা!'

ডাকিতেছি বটে, আসিবেও সত্য, কিন্তু মনে যেন কেমন গোল থাকিয়া যাইতেছে। তোমার আগমনে পাপতাপ যায় কৈ, শান্তি পাই কৈ, ইন্দ্রিয়জয় হয় কৈ ?

সে অনেক দিনের কথা—যখন দেবগণ রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন, মান, বল বুদ্ধি হারাইয়া তোমাকে প্রাণপণে ডাকিয়া ছিলেন, তুমি আসিয়া কামরূপী মহিষাসুরের নিধনসাধন করিয়া, তাঁহাদিগকে শান্তি স্বাস্থ্য প্রদান করিয়া-ছিলে, সে দিন তোমার আবির্ভাব শান্তিময় হইয়াছিল; সে দিন তোমার দুর্গতিহারিণী অসুরনাশিনী নামের সার্থকতা ঘটিয়াছিল। তার পর সেও অনেক দিন হইল, 'মণিহারা' ফণীর ন্যায় 'সীতাহারা' রামচন্দ্র কুপ্রবৃত্তি-নিকেতন দশাননকে বধ করিবার জন্য তোমাকে ডাকিয়াছিলেন—শুধু ডাকা নয়, তোমার পূজায় কমলের অনটন হওয়ায়, কমললোচন রাম স্বীয় লোচন-কমল উৎপাটন করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সে দিনও তুমি আসিয়া রাবণের বিনাশ ও সীতার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিয়াছিলে—সে দিনও তোমার আবির্ভাব মধুময় হইয়াছিল, তোমার "শরণাগতপালিনী" নাম যথার্থ হইয়াছিল। দেবতারা সুখস্বাস্থ্য পাইয়া-ছিলেন, রামচন্দ্র সীতা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা শান্তি পাইনা কেন মা? আমাদের স্বাস্থ্যলাভ হয় না কেন বুঝিনা! হ'ক্ বা না হ'ক্, তোমাকে না দেখিলে আমরা বাঁচিনা, তুমি আমাদের মৃতদেহে সঞ্জীবনীশক্তি, তুমি আমাদের বেদনার প্রলেপ, তুমি আমাদের দুঃখময় জীবনের সুখস্মৃতি! তাই বলি 'এস মা!'

যদি বল, "দেবতারা অসুর ভয়ে ভীত হইয়া ডাকিয়াছিলেন, রামচন্দ্র রাক্ষসশঙ্কায় কাতর হইয়া ডাকিয়াছিলেন, তোমাদের ত কোনও ভয় দেখিতেছি না, তবে কাতর হও কেন?" মাগো! তুমি সবই জান! আমাদের হৃদয়রাজ্য যে পাপরূপ মহাসুর কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, তাহার সন্ধান কি তুমি রাখনা? মহিষাসুর কামরূপী ছিল, সে কখনও বীরবেশে আবি-র্ভূত হইত, কখনও বা মহাকায় হস্তীরূপে, কখনও বা বিষাণধারী মহিষরূপে প্রকাশ পাইত। পাপ ও কি বহুরূপী নয় মা? পাপ কখনও ধর্ম্মের বেশে আসে, কখনও পরোপকার, দয়া, ক্ষমা, প্রভৃতির রূপ ধারণ করিয়া আসে, কখনও বা প্রভু, স্বজন, মিত্র ইত্যাদির আকার গ্রহণ করিয়া মানবের সর্ব্বনাশ করে! মহিষাসুর প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইত, পাপ—অসুর আমাদেরই হৃদয়দুর্গের নিভৃত-কোণে অবস্থান করে, অথচ আমরা শত চেষ্টায়ও তাহাকে ধরিতে পারি না! মাগো! এ অসুর কি তোমার বধ্য নয়? শুধু এই নয়, আরও আছে! দশানন রামচন্দ্রের সহিত শত্রুতাই করিয়াছিল; কখনও মিত্রভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদান করে নাই,—আমাদের মধ্যে যে দশানন বা দুষ্ট দশ—ইন্দ্রিয় বিরাজমান, তাহারা সর্ব্বদা আমাদিগকে

নানারূপ মনোরম ভোগ্য বিষয় প্রদান করিয়া বিমুগ্ধ করিতেছে,—আমরা ঐ কুটিলস্বভাব শত্রুগণের ভীষণ শত্রুতা বুঝিতে না পারিয়া, অকাতরে প্রীতিভরে তাহাদিগের ব্যবহারে অনুমোদন করিতেছি। ওদিকে তাহারা অলক্ষ্যে আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে! এই মিত্ররূপী শত্রু কি তোমার চক্ষে পড়ে না? রাবণ অপেক্ষা বিভীষণ বোধ হয় ইচ্ছা করিলে রামচন্দ্রের অধিক অনিষ্ট করিতে পারিত। এ ক্ষেত্রে আমরা যে ইন্দ্রিয়রূপী বিভীষণ শত্রুর কবলে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, সে রাবণের অপেক্ষা বহুগুণে দুর্নিবার, তুমি কি তাহাকে চিরদিনই উপেক্ষার চক্ষে দেখিবে? জানিনা, এই সব পরম-শত্রুগণ সুখে আমাদের বুকের রক্ত পান করিতেছে, আমরা ধর্ম্মহীন, কর্ম্মহীন ও জ্ঞানহীন হইয়া ক্রমে নরকের দিকে অগ্রসর হইতেছি, আর তুমি আসিয়া হাসিয়া ও হাসাইয়া চলিয়া যাইতেছ; এ তোমার কিরূপ আগমন? এ কিরূপ খেলা? যাহা হউক্ এবার তোমায় ছাড়িব না। যদি এই পাপ ও অসদিন্দ্রিয়গণ তোমার প্রীতিপাত্র হয়, তবে তোমাকে আমরা তাহাদের অধিকৃত আমাদের হৃদয়রাজ্যেই রাখিয়া দিব তুমি যাহাদের কৃপা কর, তাহাদের কাছেই স্থান পাইবে, দেখিব তুমি কি কর? এবার তোমার সঙ্গে পাপের সন্ধি হয় কিনা, দেখিবার জন্যই ডাকিতেছি—"এস মা!"

তুমি বলিতে পার, "তোমাদের পূজার উপকরণ—আয়োজন নাই, কাজেই তোমাদের ফললাভ ঘটেনা" এত মা 'ছেলে ভুলান' কথা! মনে করি, তোমাকে সর্ব্বস্ব দিব, কিন্তু মা! তোমার জিনিষ তোমাকে দিয়া লাভ কি? তোমার ইঙ্গিতে অপাঙ্গভঙ্গীতে বিশ্বসংসার নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে. তোমার ইচ্ছায় গ্রীষ্মদগ্ধ মরা গাছে বর্ষার ধারা পড়িয়া তাহাকে বাঁচাইয়া ফুল ফুটাইতেছে, আর আমাদের উপরই তোমার এত অকৃপা? তুমি ইচ্ছাময়ী ইচ্ছা হইলে সবই করিতে পার। তবে তোমার ইচ্ছা কেন হয়, কেন বা সময় সময় হয় না, তাহার কারণ তুমিই জান। "তুমি জানাও যারে সে-ই জানে!"

যা'ক ও কথা; জানিতে চাইনা, বুঝিতেও চাইনা, ভাবিতেও আর পারিনা! থা'ক পাপ, থা'ক্ রিপু থা'ক্ দুষ্ট ইন্দ্রিয়, তাহারা অনন্তকাল আছে, তোমার ইচ্ছা হয়, আরও অনন্তকাল তাহাদিগকে আমাদের হৃদয়ে রাখ। রাখিয়া বা মারিয়া যাহাতে সুখ পাও, তাহাই কর, তোমার ইচ্ছার জয় হউক্; তা বলিয়া তোমাকে আর বিরক্ত করিব না। কিন্তু একটী কথা বলিতেছি তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে, এইমাত্র তোমার চরণে ভিক্ষা। সে আর কিছু নয়—সেই পুরাতন কথা 'এস মা!' যুগযুগান্তরের জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া জীবনস্রোত বহিতে থাক্—যত বেদনা, যত লাঞ্ছনা, যত পাপ, যত তাপ, যত রিপুবিড়ম্বনা, যত ইন্দ্রিয়পীড়ন ভোগ করিতে হয়, করিতে থাকি, আপত্তি করিব না, 'আহা-উহুঃ' ও করিব না; নীরবে নিশ্চেষ্টভাবে সকল পীড়ন তাড়ন সহ্য করিব! কিন্তু প্রতিবর্ষেই যেন তোমার ঐ মাতৃমূর্ত্তি—ঐ দুর্গতিহারিণীমূর্ত্তি—ঐ শৌর্য্যবীর্য্য-ধনধান্য-ঋদ্ধিবৃদ্ধি মঙ্গল বিধাতৃমূর্ত্তি—বিশ্বমাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি, আর এই ভাবে আবেগ-ভরে প্রাণ ভ'রে ডাকিতে পারি "এস মা!" ওঁ শান্তিঃ—

শ্রীকেদারনাথ ভারতী।

মহামতি গোখেলে ও সাধারণ শিক্ষা।

বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম, 'বিদ্যাহীন মনুষ্য পশুর সমান।' বার্দ্ধক্যেও সর্ব্বদাই এই কথার সার্থকতা অনুভব করিয়া থাকি। ব্যক্তি-বিশেষ সম্বন্ধে যে কথা, সমগ্রজাতি সম্বন্ধেও সেই কথা। যে দেশ বা প্রদেশ-বাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত, তাহারা পশুরই সমান,

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। পশ্বাদির সাধারণ লক্ষণ আহার নিদ্রা, মৈথুন ইত্যাদি, মনুষ্যের মধ্যেও পশ্বাদির এই সাধারণ ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়. কেবল জ্ঞানই মনুষ্যকে পশু হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়। পশু চিরকালই পশু থাকিয়া যায়, যতই কেন চেষ্টা করনা, তাহার পশুত্ব কিছুতেই যাইবেনা, কিন্তু মনুষ্য সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। পশুসদৃশ মনুষ্য ক্রমে জ্ঞান-বিকাশের সহিত উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়া থাকে। এই জ্ঞান-বিকাশের ক্রমোন্নতি অপরের সাহায্য ব্যতীত আপনা আপনিও হইতে পারে। কিন্তু বাহিরের সাহায্য প্রাপ্ত হইলে, ইহা শীঘ্রই হইয়া থাকে। এই বাহিরের সাহায্য স্বীয় সমাজস্থ জ্ঞানি ব্যক্তির নিকটে পাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সমাজে যাঁহারা উন্নত ও জ্ঞানী, তাঁহারা অনেকেই স্বার্থান্ধ হইয়া, অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উন্নতি-কল্পে কোনরূপ চেষ্টাই করেন না। তাঁহারা সাধারণের নিকটে জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহাদিগকে যথার্থ 'জ্ঞানী' বলা যায় না। যাঁহাদের যথার্থ জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহারা বিশ্বস্থ তাবৎ মনুষ্যের একত্ব অনুভব করিয়া থাকেন। তবে অবস্থানুসারে সমস্ত মনুষ্যজাতির উন্নতিকল্পে তাঁহাদের কোনও চেষ্টা করা সম্ভবপর না হওয়ায় স্বীয় স্বীয় সমাজের জন্যই তাঁহাদের প্রযত্ন প্রযুক্ত হয়। এই সমুদয় ব্যক্তি সমাজের যথার্থ উপকারী এবং মানবসমাজে তাঁহারাই চিরস্মরণীয় হইয়া থাকেন।

মহারাষ্ট্র-প্রদেশবাসী মহামতি গোখেলে এই শ্রেণীর লোক। যাঁহারা তাঁহার কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন, যে, ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য তাঁহার প্রাণে কত ব্যাকুলতা! তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, যে, সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার না হইলে ভারতবর্ষ চিরকালই অনুন্নত অবস্থায় থাকিবে। দেশের মধ্যে ২।৪ জন উচ্চবর্ণস্থ ব্যক্তি শিক্ষিত হইলে, সে দেশকে 'শিক্ষিত' বলা যায় না। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে যে সকল উন্নত দেশ পরিদৃষ্ট হয়, সে সমুদয় দেশেই শতকরা ৯০।৯৫ জন লোক শিক্ষিত। ইংলণ্ড, জর্ম্মাণি. ফ্রান্স. আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশের শতকরা ৯০।৯৫ জন লোকই শিক্ষিত। মুটে, মুজুর, শকটচালক প্রভৃতিরা, এমন কি মলগ্রাহী পর্য্যন্তও শিক্ষিত। কেবল পুরুষ নয়, স্ত্রীলোকেরাও শিক্ষিতা। কিন্তু আমাদের দেশে স্ত্রীলোক মাত্রেই অশিক্ষিতা. পুরুষের মধ্যে শতকরা ৯।১০ লোকের অক্ষর-পরিচয় আছে। ২।৪ জন স্ত্রীলোক যে লেখাপড়া জানে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। যে দেশে শতকরা ৯।১০ জন লোক শিক্ষিত, সে দেশকে শিক্ষিত বলা যায় না। আজ যে আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে ভারতবাসিদের এত দুর্গতি, তাহার কারণ শিক্ষার অভাব। শিক্ষিত লোককে কেহ কখনও উপেক্ষা করিতে পারে না। অশিক্ষিত দেশে কোনও রূপ উন্নতির চেষ্টা অনুর্ব্বর ভূমিতে বীজ-রোপণের ন্যায়। জমিতে সার দিলে যে কোনও ফসল তাহাতে লাগান যায়, তাহা যেমন সুন্দরভাবে ফলে, শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও দেশহিতকল্পে যে কোনও আয়োজন করা যায়, তাহার সুফল ফলে। অশিক্ষিত ব্যক্তিরা সদুপদেশ আদৌ গ্রহণ করিতে পারেনা। সম্প্রতি সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য মহামতি গোখেলে একটী আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়কে বাধ্য করিয়া শিক্ষা দেওয়া। বালক বা অজ্ঞ লোকদিগকে যেমন বাধ্য করিয়া ঔষধ খাওয়াইতে হয়, সেইরূপ অজ্ঞলোকদেরও বাধ্য না করিলে, তাহারা সহজে

শিক্ষাগ্রহণে প্রস্তুত হয় না। সমগ্র দেশের উপর রাজার ভিন্ন অপরের ক্ষমতা নাই, সুতরাং রাজব্যবস্থা, ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ে সমগ্র দেশের লোককে বাধ্য করিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় না,—তা'ই তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব করিয়াছেন যে, সমস্ত পুরুষ লোককে শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করা হউক্। কিন্তু শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করিলেই হয় না, শিক্ষার ব্যবস্থা করা চাই। সুতরাং বর্ত্তমানে শিক্ষার জন্য যেরূপ ব্যয় হয়, তাহার দশগুণ ব্যয় করার জন্য ধনী ও শিক্ষিত লোকের প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট প্রজার নিকট হইতে বর্ত্তমানে যে কর গ্রহণ করেন, তাহার দ্বারা ইহার ব্যয় সঙ্কুলন হওয়া সম্ভব হয় না, এজন্য সমাজের সকল ধনি-ব্যক্তিরই এবিষয়ে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। দরিদ্র-লোকেরা পুত্রাদির শিক্ষার জন্য ব্যয় বহন করিতে অসমর্থ। ধনী ব্যক্তিদের সাহায্য ভিন্ন এরূপ বহুব্যয়সাপেক্ষ কার্য্য কখনও সম্পন্ন হইতে পারে না। শিক্ষিত ধনি ব্যক্তিরা নিজের আত্মীয় স্বজনের শিক্ষার জন্য যেরূপ ব্যয় করিয়া থাকেন, একটু আমিত্বের প্রসার করিয়া যদি তাঁহারা দরিদ্রদিগের পুত্রাদির শিক্ষার জন্যও ঐরূপ ব্যয় করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে গোখেলের সদুদ্দেশ্য অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টও বর্ত্তমানে শিক্ষার জন্য যে ব্যয় করিতেছেন, তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় করিতে প্রস্তুত না হইলে, এই কার্য্য সাধু প্রস্তাব কতদূর কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহা বলা যায় না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট চিরকালই শিক্ষার পক্ষপাতী; বৃটিশ শাসন সময়ে ভারতে শিক্ষার প্রচুর প্রচার হইয়াছে। কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট নহে, শিক্ষাসম্বন্ধে ভারতবর্ষ নিতান্ত পশ্চাৎপদ, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট ও দেশের ধনিগণের সম্মিলিত চেষ্টা দ্বারাই এই সাধুপ্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্ভাবিত।

জল ও বায়ু যেরূপ সুলভ, জ্ঞানও তদ্রূপ সুলভ হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে, দরিদ্রগণের শিক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই ব্যয়ভার দেশের ধনি-লোকদিগেরই বহন করিতে হইবে। তাঁহারা যদি প্রস্তুত না হন, তাহা হইলে এদেশ চিরকালই অনুন্নত থাকিয়া যাইবে। আমরা আশা করি, গোখেলে যে আইনের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে ব্যবস্থাপক-সভায় গৃহীত হইবে এবং ভারতবর্ষের সাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা—কার্য্যে পরিণত হইয়া একটী যুগান্তর আনয়ন করিবে। ভগবান্ মহামতি গোখেলেকে ভারতের উন্নতিকল্পে দীর্ঘজীবী করুন।

সংবাদ।

সতীত্বের মাহাত্ম্য। নারায়ণগঞ্জ-'মাসডল'-বাসিনী সুশীলাসুন্দরী দাসী দুর্ব্বৃত্তের আক্রমণ হইতে স্বীয় সতীত্বরত্ন রক্ষা করিবার জন্য নরহত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই ব্যাপারে অভিযুক্তা সুশীলার বিচার হয়— একজন ন্যায়বান্ সাহেব জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেরের কাছে। বিচারক মহাশয় সুশীলাকে মুক্তি দিয়া সতীত্বের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন। যে সকল কামকিঙ্কর মাতৃগণের সর্ব্বস্ব-স্বরূপ সতীত্বের নাশার্থে উদ্যত হয়, সে সকল নরপশু এ সংসারের যোগ্য নয়, তাহারা নরকের কীট হইবার যোগ্যপাত্র।

মহাবীরের রোদন। আগ্রা অঞ্চলে এক মহাবীরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। মূর্ত্তি প্রস্তরময়ী; সংবাদপত্রে পাঠ করা যায়, মহাবীরের নয়ন হইতে অবিরলধারায় জল গলিতেছে। এক ব্রাহ্মণ মহাবীরের নয়নবারি মুছাইয়া দিতেছেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার যেমন তেমনি। ঐ অঞ্চলের সাধারণের বিশ্বাস, ইহা ভাবী অমঙ্গলের সূচক। সাহেবী কাগজ

ইংলিশম্যান্ বলিতেছেন, 'ইহা কুসংস্কারের এক অধ্যায়।' হিন্দুশাস্ত্রে অমঙ্গলসূচনার পরিচায়করূপে দেব-প্রতিমার মুখ মালিন্য বা কাঁদ-কাঁদ ভাবের কথা আছে। এক্ষেত্রে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর বাক্যব্যয়—কেবল 'গড়া' ডিঙ্গাইবার চেষ্টা, সুতরাং বৃথা!

তনুত্যাগ। বর্দ্ধমান জেলার ধবনী-গ্রাম-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তন গায়ক ও সুবিখ্যাত পদাবলীগীতি রচয়িতা নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ঝুলনযাত্রার দিনে ত্রিবেণীতীর্থে তনুত্যাগ করিয়াছেন। নীলকণ্ঠের সঙ্গীতগুলি বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে শুনা যায়। ভাবুকতায় ও সরস পদ-বিন্যাসে এই 'কণ্ঠ' (নীলকণ্ঠ) কবির অসাধারণত্ব পরিলক্ষিত হয়। কণ্ঠসঙ্গীতে ও ইঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি বঙ্গব্যাপিনী। নীলকণ্ঠ গেলেন, সেস্থান পূরণ করিবার কি কেহ আছেন?

প্রতিবাদ। বোম্বাইয়ের পারসী-সম্প্রদায় মাননীয় ভূপেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবিত 'ম্যারেজ বিলের' প্রতিবাদ করিয়াছেন। পারসী সম্প্রদায় গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, 'যদি ম্যারেজবিল্ আইনে পরিণত হয়, তবে যেন পারসী-সম্প্রদায়কে এই আইনের অধিকার হইতে বাদ দেওয়া হয়'—হেতু?

সংক্ষিপ্তসমালোচনা।

জাতি-বিকাশ। শ্রীযুক্ত পীতাম্বর সরকার কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। সচ্চাষী সম্প্রদায়ের বৈশ্যত্ব-বিষয়ক প্রস্তাব। উৎকৃষ্ট কাগজে—মনোরম মুদ্রণ। বঙ্গের সচ্চাষী বা হলবৈ সম্প্রদায় যে বিশুদ্ধ বৈশ্যবর্ণ, এ গ্রন্থে গ্রন্থকার নিপুণভাবে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। গ্রন্থকার বর্ণবিচার বিষয়ে যে সকল কথার অবতারণা করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই পূর্ব্বপূর্ব্ব বর্ষের হিন্দুপত্রিকায় আলোচিত হইয়াছে, তথাপি গ্রন্থরচয়িতার সঙ্কলন-চাতুর্য্য প্রশংসনীয়ই বলিতে হইবে। গ্রন্থ ভাল—আমরা ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিব, কিন্তু স্থলে স্থলে বর্ণগুরু ব্রাহ্মণগণের উপর, শাস্ত্রকৃৎ ঋষিগণের উপর; এমন কি প্রাচীন হিন্দুরাজ বিধানের উপরও কটাক্ষ করা হইয়াছে, ইহা আমরা কদাচ সমর্থন করিব না। আশা-করি, পীতাম্বর বাবু ভবিষ্যতে ঐ সকল কটাক্ষ-ক্ষেপ পরিত্যাগ করিতে প্রয়াস পাইবেন। তাঁহার পুস্তক নবোন্নতিকামী বঙ্গীয় বৈশ্য-সম্প্রদায়ে আদৃত হইলে, বিশেষ আহ্লাদের কথা। বগুড়া সহরে গ্রন্থকারের নিকট এই গ্রন্থ পাওয়া যায়।

শ্রী। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী স্মৃতি-সাঙ্খ্য-মীমাংসাতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক বিবৃত্ত। মূল্য চারি আনা। ঋগ্বেদের শ্রীসূক্ত অবলম্বনে পণ্ডিত ভারতী মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বেদসূক্তের এরূপ সুন্দর বিশ্লেষণ—একাধারে কাব্যরস ও অধ্যাত্মতত্ত্বের এরূপ সমাবেশ দুর্ল্লভ। ভারতীমহাশয়ের ব্যাখ্যা-কৌশল ও পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় আমরা প্রীত। হিন্দুগৃহস্থ 'শ্রী'র সমাদর করিলে, সুখী হইব।

হিন্দুজীবন। উক্ত গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বিবৃত। মূল্য এক টাকা। কাগজ ও ছাপা ভাল। এই পুস্তকে হিন্দুশিক্ষার ও হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। হিন্দুর আশ্রমচতুষ্টয় সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে নিরামিষভোজন, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতির রহস্য বিবৃত হইয়াছে। বিস্তৃত সমালোচনার স্থান না থাকায় সংক্ষেপে বলিতেছি যে, গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা-মূলক যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা তাহার মধ্যে উৎকৃষ্ট পুস্তক। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বজনীনতা জানিতে চান, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করুন্। প্রত্যেক হিন্দুরই ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য। এই পুস্তক ও পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ যশোহরে 'লোন্ অপিষ পাড়ায়' শ্রীনরেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরীর নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।



১৮শ বর্ষ, ১৮শ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা। | কার্ত্তিক। | ১৩১৮ সাল, ১৮৩৩ শকাব্দাঃ।

অথর্ব্ববেদীয়া

যোগতত্ত্বোপনিষৎ।

ওঁ যোগতত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি যোগিনাং হিত-কাময়া।

যচ্ছ্রুত্বাচ পঠিত্বাচ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।১

এই শ্লোকে উপনিষদের বক্তা, স্বীয় প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করিতেছেন, বলিতেছেন,—যে যোগতত্ত্বকথা শ্রবণ করিলে ও যে যোগ-বিবরণ পাঠ করিলে, মানব সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে, আমি সেই যোগতত্ত্ব, যোগি-গণের মঙ্গলার্থে বলিব। ১

বিষ্ণুর্নাম মহাযোগী মহাকায়ো মহাতপাঃ।

তত্ত্বমার্গে যথাদীপো দৃশ্যতে পুরুষোত্তমঃ। ২

ভগবান্ বিষ্ণু মহাযোগী, বিরাটরূপী ও মহাতপা; তিনি পুরুষোত্তম এবং তত্ত্ব-পথে প্রদীপবৎ প্রকাশমান। (সেই ভগবান্ বিষ্ণুই যোগের আদি উপদেষ্টা, সেই জ্ঞানাকর হইতেই সকল বিদ্যারত্ন-কণিকার উদ্ভব। ভগবান্ই সর্ব্বজ্ঞান-প্রসূতি। তিনি যোগ-নিদ্রা অবলম্বন করিয়া জগতের যোগসাধক-গণের একমাত্র দৃষ্টান্ত স্বরূপে বিরাজ করেন; তিনি পুরুষোত্তম, গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়া-ছেন—"অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।" যোগোপদেশের প্রথমেই সেই পরমযোগীর নাম স্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ অনুষ্ঠিত হইতেছে।)২

যঃ স্তন্যং পূর্ব্বং পীত্বাপি নিষ্পীড্য চ পয়োধরান্।

যস্মিন্ জাতো ভগে পূর্ব্বং তস্মিন্নেব ভগে রমেৎ।৩

(যোগসাধনের জন্য বৈরাগ্য চাই, তাই প্রথমে সংসারের অসারতা ও সংসার-ব্যবহারের বীভৎসতা প্রতিপাদনের জন্য উহার দোষ প্রদর্শিত হইতেছে।) মানব বাল্যকালে মাতৃ-স্তন্য-পান-সময়ে পয়োধর পীড়ন করে, যৌবনে পত্নীসমাগম-সময়ে সেই মাতৃস্তনের সজাতীয় পত্নী-স্তনই নিপীড়িত করে, যে মাতৃযোনিতে নিজে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, পরে তৎ সজাতীয় পত্নী-যোনিতেই অকুণ্ঠিত ভাবে রমণ করে!

(ইহাপেক্ষা বিসদৃশ ব্যাপার আর কি হইতে পারে? এই বীভৎস সংসারের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বপ্রযত্নে যোগতত্ত্বের অনুশীলন পূর্ব্বক অগ্রসর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।)৩

যা মাতা সা পুনর্ভার্য্যা যা ভার্য্যা জননী হি সা।
যঃ পিতা সপুনঃ পুত্রো যঃ পুত্রঃ স পুনঃ পিতা ৪

(মনে হইতে পারে, মাতার প্রতি ভক্তি-ভাব ও পত্নীর প্রতি কামভাবই ন্যায্য, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার অন্যায় নহে, কিন্তু মনে করা উচিত) যিনি একজন্মে মাতৃত্ব গ্রহণ করিয়া স্নেহধারায় হৃদয় স্নিগ্ধ করিয়াছেন, তিনিই পরজন্মে পত্নীত্ব গ্রহণ করিয়া কাম-প্রেম-প্রদানে প্রীতিসাধন করিতে পারেন। যিনি একজন্মে পিতা, তিনিই অন্য জন্মে পুত্র হইতে পারেন। (সুতরাং সাংসারিক সম্বন্ধ ক্ষণভঙ্গুর, তত্ত্বদৃষ্টিতে সবই সমান। অতএব যে ব্যবহার পত্নীর প্রতি প্রযুক্ত বলিয়া সঙ্গত মনে করি, তাহা ভাবিতে গেলে জন্মান্তরের মাতার প্রতিই প্রযুক্ত হইতেছে, মনে করা অসম্ভব নহে।)৪

এবং সংসারচক্রেণ কূপচক্র-ঘটাইব।
ভ্রমন্তোযানি জন্মানি শ্রুত্বা লোকান্ সমশ্নুতে ৫

কূপ হইতে জল উত্তোলনের জন্য যে চক্র ব্যবহৃত হয়, সেই চক্রে সূত্রদ্বারা বদ্ধ ঘটী যেমন একবার কূপতলে গমন করে এবং আরবার দণ্ডসমীপে উপনীত হয়, সেইরূপ একবার পত্নী, আবার জননী, একবার পুত্র, আবার পিতা, এই যে উর্দ্ধাধোগতিরূপ নানাজন্ম-লাভ, জীব, যোগতত্ত্ব-শ্রবণে ইহা হইতে অনায়াসে বিমুক্তি লাভ করিয়া, উর্দ্ধতর লোকে যাইতে পারে।৫

ত্রয়ো লোকা স্ত্রয়ো বেদা স্ত্রয়ঃ সন্ধ্যাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
ত্রয়ঃ সুরাঃ গুণাস্ত্রীণি স্থিতাঃ সর্ব্বে ত্রয়াক্ষরে।৬
ত্রয়াণামক্ষরে প্রান্তে যোঽধীতেঽপ্যর্দ্ধমক্ষরম্।
তেন সর্ব্বমিদং প্রাপ্তং লব্ধং তৎপরমং পদম্ ৭

(জরামরণসঙ্কুল বীভৎস-ব্যাপার-শত-সমাকুল এই সংসার হইতে চিরতরে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে, ত্রিতত্ত্ব-সমবায় স্বরূপ প্রণবের পঠন, চিন্তন প্রভৃতি করাই প্রথম কর্ত্তব্য। ৬—৭ দুই শ্লোকে ঋষি সেই প্রণব-তত্ত্বের বিবরণ প্রকাশ করিতেছেন।) প্রণবের বিভাগ সাধারণতঃ ত্রিধা, 'অ'কার, 'উ'কার, 'ম'কার, এই তিন অংশে বা অক্ষরে তিন লোক (পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং দ্যৌঃ) তিন বেদ (ঋক্, যজুঃ, সাম) তিন সন্ধ্যা (প্রাতে ব্রহ্মাণী, মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবী ও সায়াহ্নে রুদ্রাণী) তিন দেব (ব্রহ্মা বিষ্ণু, রুদ্র) তিন অগ্নি (গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি) এবং তিন গুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) বিদ্যমান। তাৎপর্য্যতঃ প্রণব সর্ব্বলোকময়, সর্ব্বজ্ঞানময়, সর্ব্বশক্তিময়, সর্ব্বদেবময়, সর্ব্বজ্যোতির্ম্ময়, সর্ব্বগুণময়। প্রণবের ত্রিবর্ণের প্রান্তস্বরূপ 'ম'কার অধ্যয়নের পর, যাহারা অর্দ্ধমাত্রাত্মক শক্তিতত্ত্ব পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়—(তাৎপর্য্যতঃ প্রণব-প্রতিপাদ্য পরম পদার্থ অবগত হয়) তাহারা সেই পরমপদ বা মোক্ষ-নামক পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬—৭

পুষ্পমধ্যে যথা গন্ধং পয়োমধ্যেঽস্তি সর্পির্বৎ।
তিলমধ্যে যথা তৈলং পাষাণেষ্বিব কাঞ্চনম্।৮

(সন্দেহ হইতে পারে, সেই পরমপদ কোথায়? প্রত্যুত্তরে বলা হইতেছে।) পুষ্পের মধ্যে যেমন গন্ধ, দুগ্ধ মধ্যে যেমন ঘৃত, তিলের ভিতর যেমন তৈল, পাষাণময় খনিস্থানে

যেমন স্বর্ণ বাস করে, সেইরূপ পরমপদ সর্বত্র অনুস্যূত। (পুষ্পের গন্ধ গ্রহণ করিতে যেমন নাসাসংযোগ প্রয়োজন, দুগ্ধ হইতে ঘৃত তুলিতে যেমন মন্থন-প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ প্রয়োজন, তিল হইতে তৈল সংগ্রহ করিতে যেমন পীড়ন-পেষণ আবশ্যক, খনি হইতে স্বর্ণ তুলিতে যেমন খননাদি প্রক্রিয়ার দরকার, সেইরূপ সর্বত্রাবস্থিত পরমপদ প্রাপ্ত হইতেও যোগসাধন-প্রক্রিয়ার শরণাপন্ন হওয়ার অপেক্ষা আছে।) ৮

হৃদি স্থানে স্থিতং পদ্মং তচ্চ পদ্মমধোমুখম্।
ঊর্দ্ধনালমধোবিন্দুং তস্য মধ্যে স্থিতং মনঃ। ৯

(সর্ব্বব্যাপী পরমপদেরও বিশেষ স্থানে ধ্যান করিতে হয়, হৃৎপদ্মই সেই ধ্যান-স্থান, এ শ্লোকে হৃৎপদ্মের বর্ণনা রহিয়াছে।) হৃদয়-স্থানে পদ্ম অবস্থিত, সেই পদ্ম অধোমুখ ও ঊর্দ্ধনাল, পদ্মের বিন্দু সকল অধোমুখে অবস্থিত, ঐ হৃৎপদ্মের অভ্যন্তরে মন বিরাজিত আছে ৯

অকারে শোচিতং পদ্মং উকারেণৈব ভিদ্যতে।
মকারে লভতে নাদমর্দ্ধমাত্রা তু নিশ্চলা। ১০

(পদ্ম প্রস্ফুটিত না হইলে মানবের অধঃস্রোত রুদ্ধ হয় না। নীচভাব—প্রবৃত্তি-সেবা অন্তর্হিত হয় না, ঊর্দ্ধস্রোত বর্দ্ধিত হয় না—প্রজ্ঞা-প্রবাহ খরভাব গ্রহণ করে না। সেজন্য হৃৎপদ্মের পরিবর্ত্তন-সাধন একান্ত প্রয়োজন, এ শ্লোকে সেই তত্ত্বই ইঙ্গিতে কথিত হইতেছে।) প্রণবের প্রথমাংশ 'অ'কার-তত্ত্বের অনুশীলনে পদ্ম চলনোচিত দ্রবভাব লাভ করে, 'উ'কার তত্ত্বের সেবায় পদ্ম বিকসিত হয়, 'ম'কার তত্ত্বের অনুষ্ঠানে নাদ বা অব্যক্ত শব্দ গ্রহণের যোগ্যতা উপস্থিত হয়, অর্দ্ধমাত্রাত্মিকা শক্তির অনুশরণে হৃৎপদ্মে ধীর স্থির ভাবের আবির্ভাব হয়,—চিত্তস্থৈর্য্য উপস্থিত হয়। ১০

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং কিঞ্চিৎসূর্য্যমরীচিবৎ।
লভতে যোগযুক্তাত্মা পুরুষোত্তম-তৎপরঃ। ১১

যে পুরুষোত্তম-পরায়ণ সাধক অষ্টাঙ্গযোগ-সেবার দ্বারা চিত্তস্থির করিয়াছেন, তিনি হৃৎপদ্মে শুদ্ধ স্ফটিকনির্ম্মল সৌরকরবৎ তেজোময় পরমধ্যেয়-তত্ত্ব সাক্ষাৎ করেন। (সগুণধ্যানের ফলে পরিণামে নির্গুণ-ধ্যান উপস্থিত হয়, শুদ্ধ চিৎস্বরূপ পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভের পূর্ব্বাভাস দেখা যায়।) ১১

কূর্ম্মবৎ পাণিপাদাভ্যাং শিরস্যাত্মনি ধারয়েৎ।
এবং সর্ব্বেষু দ্বারেষু বায়ুঃ পূরস্ত পূরত। ১২

কচ্ছপ যেমন নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজদেহ-মধ্যেই সংযত করিয়া রাখে, যোগী সেইরূপ পাণিপাদ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় শক্তি সমূহকে মস্তকস্থ সহস্রদল-কমলস্থিত আত্মায় উপসংহৃত করিবে। ইন্দ্রিয় শক্তি ও মনঃ শক্তি সমূহ নিরুদ্ধ হইলে, নবদ্বার রোধ করিয়া, হে যোগিগণ! তোমরা সর্ব্বশরীর বায়ুপূর্ণ করিবে। (এখানে প্রত্যাহার, ধারণা ও কুম্ভক-সাধনের কথা বলা হইতেছে। সর্ব্বপ্রথম ইন্দ্রিয়গণ ও মনকে বাহ্যজগৎ হইতে আকর্ষণ করিয়া অন্তর্জ্জগতে স্থাপন ইহা প্রত্যাহার, তৎপরে মস্তকস্থ পদ্মে আত্মচিন্তায় নিয়োগ—ইহা ধারণা, পরে নবদ্বার রোধ পূর্ব্বক বায়ুস্তম্ভন-সাধন ইহা কুম্ভক। এখানে উচ্চযোগের অনুষ্ঠান বিরাজমান। কর্ণরন্ধ্রদ্বয় চক্ষুরন্ধ্রদ্বয়, নাসারন্ধ্রদ্বয়, মুখবিবর, মলদ্বার, মূত্রমার্গ, এই নয়টি দ্বার দেহে আছে। ইহাদিগের রোধমূলক যে বায়ুধারণ করিতে হয়, তাহা "কেবল-কুম্ভক" নামে পরিচিত। এই মন্ত্রের 'শিরসি

আত্মনি'র অর্থ ব্যাখ্যাকার 'মস্তকস্থ মনে' বুঝিয়াছেন। তাঁহার বাক্য এই—'শিরসি সংস্রদলে স্থিতে আত্মনি মনসি।" মনের স্থান মস্তকস্থ সহস্রদলপদ্ম বা মস্তিষ্কযন্ত্র—এই কথা ব্যাখ্যাকার বলিতেছেন, কিন্তু শাস্ত্রে সর্ব্বত্র হৃৎপদ্মে মনের স্থান বলা আছে। হৃৎপদ্ম কি তবে মস্তিষ্কস্থান? মস্তিষ্ককে জ্ঞানশক্তির কেন্দ্র বলিয়া আধুনিক বিজ্ঞান ঘোষণা করিয়াছেন। নব্যবিজ্ঞান বক্ষোদেশের মধ্যে স্থিত হৃদয়স্থানকে জ্ঞানকেন্দ্র বলেন না। যদি মস্তিষ্কই মনের অবস্থানস্থান হয়, তবে তাহাই যে প্রজ্ঞাকেন্দ্র হইবে, তাহাতে সংশয় থাকিতে পারেনা। এ সকল বিবেচনা করিয়া, একজন পণ্ডিত বলেন 'হৃৎপুণ্ডরীক' অর্থ—সহস্রদলপদ্ম—মস্তিষ্কযন্ত্র। আর একজন বলেন, মস্তিষ্ক চেতনাকেন্দ্র আত্মস্থান, কিন্তু হৃদয়ও (বক্ষোমধ্যে) শক্তিস্থান, তাহাতে সংশয় নাই, সেই শক্তিস্থানই মনের অধিষ্ঠান। মন অচেতন, মনের স্থানই চেতনাকেন্দ্র হইবে, ইহার কোনও কারণ নাই। মন অনাহত পদ্মে বিরাজমান, মস্তিষ্কে শিবরূপী আত্মার অধিষ্ঠান। দুই স্থলেই প্রজ্ঞার দুইকেন্দ্র। সাধক বলিয়াছেন, "একস্থান মূলাধারে আর স্থান সহস্রারে, আর স্থান আছে মাগো মণিপুরোপরে।" মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির বাস, মেরুমজ্জার উহাই মূল। ঐ স্থান জ্ঞানবহস্রোতঃসমূহের একপ্রান্ত, সহস্রার জ্ঞানবহস্রোতঃসমূহের চরমস্থান। মণিপুরের উপরস্থান অর্থাৎ নাভিমূল হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত অনাহতপদ্মের ক্ষেত্র, যাহাকে সাধারণতঃ 'হৃদয়' বলা যায়, সেইস্থানও মনের আবাস বলিয়া জ্ঞানের পূর্ব্বরূপ সংকল্পবিকল্প সাধন করিয়া, জ্ঞানকেন্দ্ররূপে গণ্য হইতে পারে। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ চিন্তা করিবেন, আমরা বলিয়াই নিষ্কৃতি পাইলাম। এই মন্ত্রের 'আত্ম' শব্দে যাঁহারা আত্মাই বুঝেন, তাঁহাদের এই শেষোক্ত পক্ষ, বলা বাহুল্যমাত্র।) ১২

নিরুদ্ধেতু নবদ্বারে উচ্ছ্বসন্ নিশ্বসংস্তথা।
ঘট মধ্যে যথা দীপং নির্ব্বাণং কুম্ভকং বিদুঃ ॥ ১৩

নবদ্বার নিরুদ্ধ করিয়া অভ্যন্তরেই উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস সাধন পূর্ব্বক আপনার ভাবে আপনি অবস্থান করিবে। যেমন ঘটের মধ্যস্থ প্রদীপ আপনার আলোকে আপনিই ভাসমান হয়, ইহাও তদ্রূপ। এই ভাবকে যোগীগণ নির্ব্বাণ-কুম্ভক বলেন। ১৩

পদ্মপত্রমিব চ্ছিন্নমূর্দ্ধবায়ুবিমোক্ষণে।
ভ্রুবোর্ল্ললাটমধ্যস্থং তজ্জ্যোতিঃ চ নিরঞ্জনম্। ১৪

নবদ্বার নিরুদ্ধ থাকায় ঊর্দ্ধচালিত বায়ুর বিমোক্ষণ-কালে পদ্মপত্র যেমন ছিন্ন হয় অর্থাৎ ছিঁড়িয়া যায় তদ্রূপ ভ্রূযুগল ও ললাট-মধ্যস্থ ব্রহ্মরন্ধ্রার্গল ভিন্ন হইয়া যাইবে। তখনই নিরঞ্জন পরমতত্ত্বধ্যানবলে স্বরূপ সাক্ষাৎকার ঘটিবে। (এখানে যোগস্থ সাধকের প্রাণমোচন ও ঊর্দ্ধগতি-প্রকার প্রদর্শিত হইতেছে। প্রাণায়াম-কৌশলে বায়ু ঊর্দ্ধে চালিত করিয়া ভ্রূমধ্যস্থ ললাটরন্ধ্রযোগে ঊর্দ্ধে প্রেরণ করিবে, সেই ব্রহ্মরন্ধ্র-বিবরে পরম তত্ত্ব ধ্যান-সহকারে পরমশিব সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, আরও উপরে প্রাণবায়ু প্রেরণ করিবে। বায়ুবলে চালিত পদ্মপত্রের ন্যায় ব্রহ্মরন্ধ্র ছিন্ন হইয়া যাইবে, সাধকের প্রাণ জ্যোতির্ম্ময় মার্গ আশ্রয় করিয়া জরামরণ-ভীতির হাত এড়াইবে। সাধক এইরূপ মৃত্যুই কামনা করেন। সাধক রামপ্রসাদ

গাহিয়াছেন, "প্রাণ যাবার বেলায় এই ক'রো মা! যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেঁটে।" যোগীরা এইভাবেই তনুত্যাগ করেন।

নিষিদ্ধে নতু নির্ব্বাতে নির্জ্জনে নিরুপদ্রবে। নিশ্চিন্তঞ্চাত্মভূতানাং অরিষ্টং যোগসেবয়া. অরিষ্টং যোগসেবয়া ইতি। ১৫

যোগসাধন নিষিদ্ধ দূষিত স্থানে হয় না। যে স্থান বাত্যাবিরহিত নির্জ্জন ও নিরুপদ্রব, যে স্থান আত্মবিদ্‌গণের অনুমোদিত, সেইস্থানে যোগসেবাদ্বারায় ইষ্টবস্তু লাভের চেষ্টা করিবে। (ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।) 'অরিষ্টং যোগসেবয়া' এই অংশের দ্বিরুক্তির দ্বারায় জানা যায়, এইমন্ত্রে উপনিষৎ সমাপ্তা হইল।) ১৫

অথর্ব্ববেদীয়া
যোগতত্ত্বোপনিষৎ সমাপ্তা।
যোগতত্ত্বোপনিষদের শ্রী—ভারতীকৃতা
বঙ্গব্যাখ্যা সমাপ্তা।

যোগদর্শন-ভাষ্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

মন্ত্র জপের নিয়মাদিঃ—

জপরহস্য ও জপসমর্পণ ব্যতীত মন্ত্রের ফল পাওয়া যায় না, সেইজন্য সংক্ষেপে সেইগুলি বলা গেল; যথা—

জপরহস্যঃ—

(১) আচমনাদি (২) কপাটভঞ্জন (৩) কামিনীতত্ত্ব (৪) প্রফুল্ল (৫) প্রাণায়ামাদি (৬) ডাকিন্যাদি মন্ত্রন্যাস (৭) মন্ত্রশিক্ষা (৮) মন্ত্রচৈতন্য (৯) মন্ত্রার্থভাবনা (১০) নিদ্রাভঙ্গ (১১) কল্লুকা (১২) মহাসেতু (১৩) সেতু (১৪) মুখশোধন (১৫) জিহ্বাশুদ্ধি (১৬) করশোধন (১৭) যোনিমুদ্রা (১৮) নির্ব্বাণ (১৯) প্রাণতত্ত্ব বা মন্ত্রশুদ্ধি (২০) প্রাণযোগ (২১) দীপনী (২২) অশৌচভুক্ (২৩) অমৃতযোগ (২৪) সপ্তচ্ছদা (২৫) মন্ত্রস্থানে মন্ত্রচিন্তা ও কলাতীত স্থানে মন্ত্রধ্যান (২৬) উৎকীলন (২৭) দৃষ্টিসেতু (২৮) সহস্রারে গুরুধ্যানাদি। ইহার পরে কামকলাধ্যান। এই ২৮ প্রকার জপরহস্য সম্পাদন করিয়া, বিধিপূর্ব্বক জপসমর্পণ করিতে হইবে, নতুবা জপজনিত তেজ কিছুই থাকিবে না।

জপসমর্পণ বিধিঃ—

জপসমাপ্তি হইলে পূর্ব্বোক্ত কল্লুকাদি ও প্রাণায়াম করিয়া, কামিনী ধ্যান করিবে। পরে কামিনীকে 'রং' বীজরূপা ভাবনা করিবে। পরে গুরুদত্ত বীজ-মন্ত্রের মধ্যে যে কয়টা বর্ণ থাকিবে, তাহা ঐ রং বীজের গর্ভ-মধ্যে আছে, ভাবনা করিয়া সেই বীজের প্রত্যেক বর্ণে চন্দ্রবিন্দু অনুলোম-বিলোম ক্রমে দশবার জপ করিবে। পরে ঐ কামিনীরূপ কং বীজের গর্ভেই জ্যোতিস্তত্ত্ব মন্ত্র জপ করিয়া, ঐ কামিনী ও জ্যোতিস্তত্ত্ব একীভূত হইয়াছে ভাবনা করিবে। ঐ জ্যোতিস্তত্ত্ব জীবাত্মা হইতে পৃথক্ নহে। পরে ঐ একীভূত জ্যোতিঃস্বরূপা কামিনীকে স্থাপন পূর্ব্বক গুহ্যাতিগুহ্য-মন্ত্রে জপ সমাপন করিবে। শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলেই পূর্ব্বোক্ত প্রকার জপরহস্য ও সমর্পণ করিবেন—ভভিন্ন কখনই মন্ত্রযোগে সিদ্ধিলাভ হইবে না।

বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রজপ করিতে করিতে ক্রমে সাধক সমাধির উপযুক্ত হইবেন। পরে জপ ত্যাগ করিয়া, সমাধি অভ্যাস করিতে করিতে মনোনিবৃত্তি হইবে। (গূঢ় তত্ত্ব গুরুবক্ত্রগম্য)

মূল পঞ্চবিধ যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলা হইল। শ্রীসদাশিব পঞ্চ ম্নায়ে দশবিধ-যোগের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন ; যথা—

মন্ত্রস্যোপাসনা দেবি পূর্ব্বমুখে সমোদিতা।
প্রেমভক্তি লয়াদিশ্চঃ দক্ষিণে প্রকটীকৃতঃ॥
ধ্যান-পূজা-দান-যজ্ঞ-জপ-হোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ক্রিয়াযুক্তিরিয়ং দেবি পশ্চিমাম্নায় ঈরিতা॥
জ্ঞানোপদেশবিধিশ্চ কথিতশ্চ তথোত্তরে।
সন্ন্যাসং বিরজং দেবি উর্দ্ধাম্নায়ে উদীরিতং।
সর্ব্বদীক্ষাত্মিকা দেবি যোগদীক্ষা অধোমুখে॥
(ষড়াম্নায়তন্ত্র)

তৎপুরুষ-নামক পূর্ব্বাম্নায়ে—মন্ত্রযোগ ও হঠযোগ। অঘোর-নামক দক্ষিণাম্নায়ে—ভক্তিযোগ, লয়যোগ। সদ্যোজাত নামক পশ্চিমাম্নায়ে—লক্ষ্যযোগ, ক্রিয়াযোগ বামদেব-নামক উত্তরাম্নায়ে—উরযোগ (রাজযোগ), জ্ঞানযোগ। ঈশান নামক উর্দ্ধাম্নায়ে বাসনাযোগ ও পরযোগ (সমাধি-যোগ)।

যে কয়টী যোগের নামের নিম্নে দাগ দেওয়া হইল, উহারা পূর্ব্বোক্ত মূল পঞ্চবিধ যোগেরই অন্তর্গত। তবে ঐ গুলি বিশেষ আবশ্যকীয় বলিয়া, পৃথক্ রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে চাহি না। এই মূল পঞ্চবিধ যোগই চলিত। কিন্তু এই পঞ্চবিধ যোগ ব্যতীত আর এক প্রকার যোগ-সাধনা আছে। তাহার সাধন প্রণালী সাধারণ্যে প্রকাশ নাই। সেই যোগ স্বয়ং যোগেশ্বরগণ সাধনা করেন। তাহা কিম্পুরুষবর্ষেই—বিশেষ চলিত। ইহা শারীরিক বা মানসিক প্রক্রিয়া নহে। সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক প্রণালী। পরমাত্মাকে এবং যে আত্মশক্তি দেহের অভ্যন্তরে বৃত্তাকারে অবরোহণ ও আরোহণ করিতেছে, সেইশক্তিকে অনুসন্ধান করিয়া ক্রিয়া করা যায়। এই যোগ-সাধনার নাম—

নিষ্কাম ব্রহ্মজ্ঞান—ভাবনা—উপাসনা
বা
শিবরাজ যোগ—সাধনা।

তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্॥ ৩

ব্যাখ্যাঃ—নির্ব্বিকল্প সমাধিকালে চিত্ত, গুণশক্তিবর্জ্জিত হওয়ায়, উহার সর্ব্ববৃত্তির নিরোধ হইলে, শরীরত্যাগে যখন নির্ব্বাণ-লাভ হয়, তখনই আত্মার স্বস্বরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান হয়—অর্থাৎ ব্রহ্মই আছেন আর কিছুই নাই, কিন্তু মায়াতে আমি অজ্ঞমত হইয়াছি 'স্বয়মজ্ঞইবোল্লসন্' এই যে ভাণ তাহাতে নিবেধ-কল্পে জাগিয়াছিল, তাহা আর থাকে না ; তখন সে ব্রহ্ম ছিলেন তাহাই থাকেন। তখন, কে বলে! কেই বা দেখে! ইনি স্বস্বরূপে আছেন। মনই সমস্ত অনর্থের মূল, উহার স্পন্দন হইতেই ক্রমে ক্রমে সমস্ত অসৎ সদ্রূপে ভাসিয়াছে। প্রথমে উহার স্পন্দন রোধ করিতে হইবে। তাহা হইলে বুদ্ধিও অবিচলিত হইবে, এবং চিত্তবৃত্তিও উদিত হইবে না। নির্ব্বিকল্প সমাধিতেই মন বুদ্ধি ও চিত্ত নিষ্পন্দভাব ধারণ করে।

এই নিস্পন্দভাব স্থায়ী হইলেই শরীরস্থিতি পর্য্যন্ত ব্রাহ্মীস্থিতি এবং শরীরনাশে নির্ব্বাণ পদ লাভ হয়। সমাধিতে প্রথমে অহং ভাব নষ্ট হইবে, পরে মন নিশ্চল হইবে, মন নিশ্চল হইলেই বুদ্ধি নিশ্চলা হইবে, বুদ্ধি নিশ্চলা হইলেই চিত্তবৃত্তি আর হইবে না, এইরূপ কোন প্রকার বৃত্তি না হওয়ায় অবস্থাই নির্ব্বিকল্প সমাধিতে স্থিতি। এই অবস্থা-কেই গীতোপনিষদে শ্রীভগবান্ সাম্যাবস্থা বা অব্যক্ত অবস্থা বলিয়াছেন, ইহার পরই শরীরনাশে নির্ব্বাণ। ইহাই শেষ। এই অবস্থায় এক ব্রহ্মই ছিলেন, তিনিই থাকিবেন, তিনি আছেন বলিবারও কেহ নাই ; ইহা দ্বৈত অবস্থা ও নয় অদ্বৈত অবস্থাও নয়, কিন্তু উভয়ের অতীত অবস্থা। ইহা দ্বৈত অবস্থা নয়, এইজন্য যে, যখন দুই নাই এক ব্রহ্মই আছেন, তখন আবার দ্বৈতাবস্থা কি ? অদ্বৈতাবস্থাও নয়, কারণ দুই থাকিলে তবেত এক বলা যায়, দুই না থাকিবে আবার একের সংখ্যা করে কে ? কতকগুলি হইতে পৃথক্ করিবার জন্যই ত 'এক' এই সংখ্যা ব্যবহৃত হয়, এখানে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, তবে আবার—এক কি ? আর এক বলেই বা কে ! সেইজন্য বলা হইল এই নির্ব্বা-ণের অবস্থা (অবস্থাও বলা যায় না, তবে জীবভাবকে বুঝাইবার জন্য) সম্পূর্ণ দ্বৈত ও অদ্বৈতের অতীত অবস্থা। ভগবান্ শ্রীবশিষ্ঠদেব শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রকেও এই উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহাই আত্মার স্বরূপে অবস্থান। যখন "অহং বহুস্যাং" এর প্রকাশ হয়—সেই সময় মহত্তত্ত্বের পর শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত দ্বৈত অবস্থা, তবে যে অনেক সময় ব্রহ্মকে 'অদ্বৈত' এই-রূপ আখ্যায় আখ্যাত করা হইয়াছে—তাহা জীবভাবকে বুঝাইবার জন্য—জীবের দ্বৈতভাব বিনাশ করিয়া অদ্বৈতভাবের—অবস্থায়—উপনীত করাইবার জন্য।

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র ॥ ৪

নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় যখন সর্ব্ব-বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয়—তখন আত্মার স্বরূপে অবস্থান হয়, শরীর ত্যাগে নির্ব্বাণ লাভেই চিরতরে ঐ আত্মার স্বস্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়। কিন্তু অন্যান্য সময় অর্থাৎ চিত্তের নিরোধ অবস্থা ব্যতীত যখন উহা (চিত্ত) মায়া-রচিত গুণশক্তিবর্জ্জিত হয় নাই, তখন স্রোতের ন্যায় কেবলই চিত্তবৃত্তি উঠিতেছে, সেই সময় আত্মা চিত্তবৃত্তির সহিত একীভূতের ন্যায় প্রকাশিত হন, এইরূপ প্রতীয়মান হয়, এই সময় তাঁহার স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে। যেমন আপনার কোন প্রতিবিম্ব পড়িলে তাহা একীভূতের ন্যায় প্রকাশিত হয়, অথচ প্রকৃত পক্ষে তাহা সেইরূপ নয়।

বৃত্তয়ঃপঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাঃ ॥৫

বৃত্তি পাঁচ প্রকার অর্থাৎ পাঁচপ্রকার অবস্থাতে বৃত্তি উদিত হয়। বৃত্তিসকল দুইভাগে বিভক্ত ক্লিষ্টা ও অক্লিষ্টা। ক্লিষ্টা বৃত্তিকে প্রবৃত্তিমার্গ ও অক্লিষ্টা বৃত্তিকে নিবৃত্তিমার্গ কহে। প্রবৃত্তি মার্গ বন্ধনের হেতু এবং নিবৃত্তিমার্গ মুক্তির হেতু।

পাঁচ প্রকার অবস্থা কি কি ? কথিত হইতেছে।

প্রমাণবিপর্য্যয়-বিকল্প নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ। ৬

প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, এবং স্মৃতি এই পঞ্চ অবস্থাতে বৃত্তি সকল উদিত হয়।

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি। ৭

প্রমাণ তিন প্রকার যথা।—প্রত্যক্ষ অনুমান এবং আগম (শাস্ত্রবাক্যাদি)

বিপর্য্যয়োমিথ্যা জ্ঞানমতদ্রূপ প্রতিষ্ঠম্ ৮

বিপর্য্যয় অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান। বস্তু এক, কিন্তু চিত্তবৃত্তি (অনুভব) অন্যপ্রকার, যথা—রজ্জুতে সর্পভ্রম।

শব্দজ্ঞানানুপাতীবস্তুশূন্যো বিকল্পঃ ৯

বস্তু নাই অথচ শব্দের জন্য যে এক প্রকার চিত্তবৃত্তি জন্মে, তাহাকে বিকল্প কহে। যথা—আকাশকুসুম, সোনার পাথরের বাটী।

অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা। ১০

নিদ্রা অর্থাৎ সমুদয় চিত্তবৃত্তি লীন থাকিয়া কেবল মাত্র অজ্ঞান অবলম্বন করিয়া যে বৃত্তি উদিত হয়, তাহার নাম নিদ্রা। চিত্ত জাগ্রৎ কালে ত্বক্ ইন্দ্রিয়ে, স্বপ্নকালে মেধ্যা নাড়ীতে এবং সুষুপ্তি-কালে (নিদ্রাকালে) পুরীতৎ নাড়ীতে অবস্থিত থাকে।

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ। ১১

স্মৃতি অর্থাৎ কোন বস্তু একবার অনুভূত হইলে সংস্কার রূপে চিত্তে থাকিয়া যায়—সেই থাকাকে স্মৃতি কহে। কোন উদ্বোধক কারণ উপস্থিত হইলে তাহা পুনরুদিত হয়। এই প্রকার চিত্তবৃত্তির নাম স্মৃতি।

উপরি-উক্ত পঞ্চ অবস্থায় যে সমস্ত চিত্তবৃত্তি উদিত হয়। ঐ সমস্তের সম্যক্ নিরোধ করা ব্যতীত যোগলাভের উপায় নাই। উহার নিরোধের উপায় কি? পরে ব্যক্ত হইতেছে।

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাম্ তন্নিরোধঃ। ১২

চিত্তবৃত্তিরোধের উপায় ক্রিয়াভ্যাস এবং তদুৎপন্ন বৈরাগ্য।

তত্রস্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ। ১৩

আত্মার স্বস্বরূপে অবস্থানের নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক পুরুষার্থ সহকারে শ্রীগুরুর উপ-দেশানুসারে যে ক্রিয়ানুষ্ঠান, তাহাকে অভ্যাস কহে।

সতুদীর্ঘকালাদরনৈরন্তর্য্যসৎকারসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ। ১৪

ঐ ক্রিয়ানুষ্ঠান দীর্ঘকাল ধরিয়া নিয়ম-মত সম্যক্ উপায় সহকারে এবং গাঢ় শ্রদ্ধার সহিত যদি সম্পন্ন করা হয়, তাহা হইলে তাহা দৃঢ় অর্থাৎ অবিচলিত হয়।

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্। ১৫

পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে করিতে প্রথমে যতমান, তৎপরে ব্যতিরেক, তৎ পরে একেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বশেষে বশীকার নামক বৈরাগ্য, (যাহাতে লৌকিক সর্ব্বপ্রকার ভোগবাসনা এবং পারলৌকিক সর্ব্বপ্রকার ভোগবাসনা এমন কি ব্রহ্ম-লোকে পর্য্যন্ত বিতৃষ্ণা জন্মে) উৎপন্ন হয়।

১। যতমান—বিষয় বৈরাগ্যের (বিতৃ-ষ্ণার) সূচনা

২। ব্যতিরেক—কতকগুলি বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য হইয়াছে এবং কতকগুলির প্রতি হয় নাই। যে গুলির প্রতি হয়

নাই, তাহাদিগের প্রতি বৈরাগ্য উৎপাদনের চেষ্টা।

৩। একেন্দ্রিয়—সকল বিষয়ে অনুরাগ নষ্ট হইয়াছে, তবু কখনও কখনও চিত্তের ক্ষণিক অল্পমাত্র বিচলিত অবস্থা।

বশীকার—যখন পূর্ব্বোক্ত ঔৎসুক্যটুকুও নষ্ট হইয়া, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সমস্ত বিষয়েই উৎকট বিরাগ জন্মে, সেই অবস্থার নাম বশীকার।

তৎপরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণ বৈতৃষ্ণ্যম্। ১৬

পুরুষবিষয়ে জ্ঞান অর্থাৎ আত্ম-সাক্ষাৎকার হইতে বশীকার নামক বৈরাগ্যলাভ হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কেননা, উহা সাধককে প্রকৃতির গুণ হইতে মুক্ত করিয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে স্থাপন করে।

বৈরাগ্য বলপূর্ব্বক সম্পাদিত হয়না, যোগসাধনদ্বারা স্বভাবতই উদিত হইয়া থাকে (পর-সূত্রে সমাধির বিষয় বর্ণিত হইতেছে)

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ। ১৭

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চারিভাগে বিভক্ত, যথা—সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত।

ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইরূপ—

সমাধি দুই প্রকার, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিই অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি-লাভের উপায়। যে সমাধিতে ধ্যেয় বস্তুর যথার্থ স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়, তাহার নাম সম্প্রজ্ঞাতসমাধি। ইহা যথার্থ বস্তুকে প্রকাশ করে, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ নামক ক্লেশসকলকে ক্ষীণ করে, কর্ম্মবন্ধনকে শিথিল করে। গ্রাহ্য, গ্রহণ এবং গৃহীতৃ, এই তিন বিষয় অবলম্বন করিয়া এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি উদিত হয়।

১। গ্রাহ্যনিষ্ঠ—

গ্রাহ্য অর্থাৎ যাহা গ্রহণযোগ্য। তাহা কি? পঞ্চ স্থূল মহাভূত এবং পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত। (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ এই পঞ্চ মহাভূত।) যখন স্থূল পঞ্চ মহাভূতে সমাধি হয়, তখন তাহাকে বিতর্কানুগত সমাধি বলে। ইহা দুইভাগে বিভক্ত যথা—সবিতর্ক ও নির্ব্বিতর্ক।

সবিতর্ক:—পূর্ব্বাপশ্চাৎ অনুসন্ধান দ্বারা, শব্দ ও অর্থ উল্লেখের সহিত স্থূল পঞ্চ মহাভূতে যে সমাধি হয়, তাহাকে সবিতর্ক বলে।

নির্ব্বিতর্ক:—

শব্দ ও অর্থ উল্লেখ ব্যতিরেকে কেবল সত্তামাত্র বা জ্ঞানমাত্র উদ্ভাসিত করিয়া স্থূল পঞ্চমহাভূতে যে সমাধি হয়, তাহার নাম নির্ব্বিতর্ক।

সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতে যে সমাধি লাভ হয়, তাহাকে বিচারানুগত সমাধি বলে। ইহাও দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—সবিচার ও নির্ব্বিচার।

সবিচার—

দেশ কাল ও ধর্ম্ম—অবচ্ছেদের সহিত সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতে সমাধি হইলে, তাহাকে সবিচার বলে।

নির্ব্বিচার—

দেশ কাল ও ধর্ম্ম—শূন্য হইয়া সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূতে যে সমাধি লাভ হয়, তাহাকে নির্ব্বিচার বলে।

২। গ্রহণনিষ্ঠ—

গ্রহণ অর্থাৎ যাহা দ্বারা গ্রহণ করা হয়। কাহার দ্বারা? ইন্দ্রিয় এবং অহংকার দ্বারা। ইন্দ্রিয় এবং অহংকারে যে সমাধি হয়, তাহাতে চিত্তের রজস্তমের লেশমাত্র থাকে এবং সত্ত্বগুণ প্রকাশ পায়, সেই প্রকাশে বড় আনন্দের উদয় হয়, তাই ইহার নাম আনন্দানুগত সমাধি। ইহাতে মুক্তি হয় না, অহংভাব পর্য্যন্ত নাশ হয়।

৩। গৃহীতৃনিষ্ঠ—

গৃহীতৃ অর্থাৎ যে গ্রহণ করে। কে গ্রহণ করে? অহংকারযুক্ত আত্মা। অহংকারযুক্ত আত্মাতে যে সমাধি লাভ হয়, তাহাতে রজস্তমের লেশমাত্র থাকে না, কেবল সত্ত্বগুণের স্ফুরণ হয়। ইহারই নাম অস্মিতানুগত সমাধি।

উক্ত চারি প্রকার সমাধি দ্বারা মুক্তি হয় না; কারণ যতক্ষণ চিত্ত নির্ব্বিষয় বা বৃত্তিশূন্য না হইতেছে, ততক্ষণ মুক্তি হইবে না। পরবৈরাগ্য দ্বারা চিত্ত নির্ব্বিষয় হইয়া যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়, তাহার দ্বারাই মুক্তি বা সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি চিরতরে হয়। তাহার কথা পরসূত্রে বর্ণিত হইতেছে—

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ। ১৮

পূর্ব্বকথিত ক্রিয়াভ্যাস এবং তদুৎপন্ন পরবৈরাগ্য দ্বারা সর্ব্বপ্রকার চিত্তবৃত্তি রুদ্ধ হয়। তৎকালে চিত্ত সংস্কারমাত্রে অর্থাৎ সত্ত্বমাত্রে প্রতিষ্ঠিত। (নিরালম্বরূপে অবস্থিত) হয়। ইহারই নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

ক্রিয়া অভ্যাস করিতে করিতে পরবৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। পরবৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে সর্ব্বপ্রকার চিত্তবৃত্তি রুদ্ধ হয়। কারণ বৃত্তি উদিত হইলেই উহা পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইবে। তাহাই বন্ধন। অতএব সর্ব্ববৃত্তিরোধ হইলেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। এই অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা অনেকটা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে।

ভবপ্রত্যয়োবিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্ ১৯

বিদেহলয়ী এবং প্রকৃতিলয়ী—ইহাদের সমাধি (সম্প্রজ্ঞাত) অজ্ঞানমূলক, অতএব উহা মুক্তির কারণ নহে।

বিদেহলয়ী—যাঁহারা মহাভূতে কিংবা ইন্দ্রিয়াদিতে সমাধি করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা।

প্রকৃতিলয়ী—যাঁহারা প্রকৃতি কিংবা মহৎ অহঙ্কারাদিতে সমাধি করিয়াছেন তাঁহারা।

শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্। ২০

শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা, এই পঞ্চ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা এতদ্বিধ উপায়ে সমাধিলাভ করেন।

১। শ্রদ্ধা—আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য প্রবল ইচ্ছা জন্মিলে যে চিত্তের প্রসন্নতা হয়, তাহাকে শ্রদ্ধা কহে।

২। বীর্য্য—উপযোক্ত শ্রদ্ধাশীল সাধকের বীর্য্য অর্থাৎ সাধনায় জন্য এক প্রকার শক্তিবিশেষ জন্মে, তাহার নাম বীর্য্য।

৩। স্মৃতি—উক্ত শক্তি সহকারে সাধন করিতে করিতে শীঘ্রই ধ্যানশক্তি জন্মে, (যাহাতে তত্ত্বস্মরণ হয়।)

৪। সমাধি—তাহা হইতেই সমাধি (সম্প্রজ্ঞাত) লাভ হয়।

৫। প্রজ্ঞা—উক্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে প্রজ্ঞা—নামক সত্যপ্রকাশক ও বস্তুর যথার্থস্বরূপপ্রকাশক জ্ঞানবিশেষ জন্মে। ইহার পরেই স্থায়ী ভাবে পর-বৈরাগ্যের উদয় হয়, এবং তাহা হইতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়।

তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ। ২১

সংবেগ যাহার যত অধিক, তাহার সমাধি-লাভ তত শীঘ্র হইবে। সংবেগ—(কোন) কার্য্য করিবার মূলীভূত সংস্কার বা শক্তিবিশেষ।

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাত্ততোঽপি বিশেষঃ।২২

মৃদু মধ্য ও অধিমাত্র প্রভৃতি ভেদ থাকায় সিদ্ধিকালের তারতম্য হয়।

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা। ২৩

ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি দৃঢ় হয়। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা—

প্রথমে প্রাণায়াম, পরে প্রত্যাহার, তৎপর সম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভ হয়। ইহা-রই নাম আত্মসংযোগ। এই অবস্থায় ঈশ্বর অর্থাৎ কূটস্থ সাক্ষাৎকার হয়। তখন অনু-রাগে ভজন পূজন আরম্ভ হয়। ইহাই ভক্তিযোগের অবস্থা। এই অবস্থায় সাধকের সর্ব্বদা চিত্তাকাশবাস হয়। শ্রীমদ্ভাগ-বতের ১০ম স্কন্ধে যে সমস্ত ব্যাপার উল্লিখিত আছে, তাহা ভক্তিযোগের অতি নিগূঢ় ভাব। বলা বাহুল্য যে, সম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভের পূর্ব্বে এইরূপ অবস্থা হয় না। উহা সম্পূর্ণ চিত্তাকাশের ব্যাপার। তবে আজকা'ল অনেকে ঐ সমস্ত নিগূঢ় ভাবকে মহাকাশের ঘটনা ধরিয়া লইয়া মহাভ্রমে পতিত হইতেছেন। আরও ভক্তিযোগের সাধনপ্রণালী ও নিগূঢ়তত্ত্ব শ্রীভগবান্ গীতোপনিষদের ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ এই কয় অধ্যায়ে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। যখন ভক্তিযোগের ঐ সমস্ত ভাবের উদয় হয়, তখন সাধকের দেহ স্থির নিশ্চল আসনবদ্ধ থাকে, কারণ উহা সমাধির অবস্থা। ভক্তিযোগের পরই নির্ব্বি-কল্প সমাধি। তখন চিদাকাশে স্থিতি। এখন ভক্তিযোগ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। ভক্তিযোগের উদ্দেশ্য কি? বেদ বলেন "রসোবৈসঃ" অর্থাৎ আত্মা রসস্বরূপ। জীব ত আত্মা! কিন্তু 'আমিই ব্রহ্ম' এই জ্ঞান ত শীঘ্র উপস্থিত হয় না। আমি যাহা, তাহার স্বরূপ পূর্ব্বে জানা চাই, নচেৎ কিরূপে আমি তাহা হইতে পারিব? সেই জন্য আমার বা ব্রহ্মের বা আত্মার স্বরূপ যে রস, তাহা অগ্রে ভক্তিযোগে উপলব্ধি করিতে হইবে। যে ক্রিয়ার দ্বারা সম্পূর্ণ রসের অনুভব হয়, তাহাই রাস। রাসের নিগূঢ়তত্ত্ব গুরুবক্ত্রগম্য। রাসের পর ভক্তিযোগ শেষ হয়, ইহার পরই পর-বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। তৎপর নির্ব্বিকল্প সমাধি। ভক্তিযোগে ব্রহ্মই যে রস-স্বরূপ ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া পরে আমিই সেই ব্রহ্ম—নির্ব্বিকল্প সমাধিতে এই জ্ঞান হইবে। এই নির্ব্বিকল্প সমাধি দৃঢ় করিবার জন্য তত্ত্বমস্যাদি-মহাবাক্য-বিচার।

দেখা যাক্ 'ভক্তি' কাহাকে বলে? ঈশ্বর-চেতন এবং জীব-চেতনে এক প্রকার সম্বন্ধ সদা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার এক কারণ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ বিরাট্ দেহে যাহা যাহা বর্ত্তমান রহিয়াছে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে বা মানবদেহে সে সমস্তই রহিয়াছে। এখন জীব ঈশ্বরে যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ ধরিয়া সম্প্রজ্ঞাত বৃত্তি দ্বারা আমরা যদি সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, প্রকৃতির সমস্ত আলোড়ন করিয়া, ঈশ্বর-চেতনকে বিচলিত করিতে পারি, তবে তাহারই নাম ভক্তি। এই ভক্তির বেগ ঈশ্বর-চেতনে পৌছিবার অনেক বাধা। সম্পূর্ণরূপে জিতেন্দ্রিয় ও জিতপ্রাণ না হইলে ঐ সম্প্রজ্ঞাত-বৃত্তি কখনও ঈশ্বর-চেতন বিচলিত করিতে পারিবে না। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে এই যোগজপ্রজ্ঞা ঈশ্বর-চেতন বিচলিত করিবে এবং তৎপরে সাধককে ক্রমে ক্রমে উন্নতি সহকারে আত্মার বা ব্রহ্মের স্বরূপ অনুভব করাইবে। অনুভূতির চরম অবস্থাই রাস। ইহার পর নির্ব্বিকল্প সমাধিতে 'সোহহং' সাধনা। তাহা হইলেই কথা হইতেছে—প্রথমে আত্মসংযোগ (প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, সম্প্রজ্ঞাত সমাধি) দ্বিতীয় ভক্তিযোগ (ভক্তি-যোগ দ্বারাই আত্মসংযোগ দৃঢ় বা অবিচলিত হয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যে অত্যুৎকৃষ্ট যোগজপ্রজ্ঞা উদিত হয়, তাহা দ্বারা আত্মা বা ব্রহ্মের স্বরূপ অনুভব করাই ভক্তি-যোগের উদ্দেশ্য;) তৃতীয় নির্ব্বিকল্প সমাধি। (ভক্তিযোগে যখন ব্রহ্মের স্বরূপ অনুভূত হইবে, তখন আমিই সেই ব্রহ্ম—এইরূপ অদ্বৈত জ্ঞান জন্মিবে। এই সোহহং ভাব দৃঢ় করিবার জন্যই তত্ত্বমস্যাদি-মহাবাক্য-বিচার) বলা বাহুল্য সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ব্যতীত কখনও ভক্তিযোগ হইতে পারে না। এইটি না বুঝিয়া অনেকে অধঃপাতে যাইতেছে। আবার অনেকের ধারণা, ভক্তিযোগ বুঝি একটা স্বতন্ত্র 'যোগ'। যাহা হউক্ এসম্বন্ধে আর অধিক বলিতে চাহি না। [নিগূঢ়তত্ত্ব গুরুবক্ত্রগম্য।]

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী।

ঋষিকেশ ও লছ্‌মন্-ঝুলা।

"হরিদ্বার" প্রবন্ধে আমি পাঠকগণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া রহিয়াছি যে, ঋষিকেশ ও লছমনঝুলার কথা বলিব। হরিদ্বার হইতে ঋষিকেশ হাটাপথে ২২ মাইল। সম্প্রতি রেল হইয়াছে; ঋষিকেশ রেলষ্টেসন হইতে ঋষিকেশ তিন মাইল জঙ্গল পথে। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন রেল হয় নাই, সুতরাং হাটাপথেই যাওয়া সাব্যস্ত করিয়া একটা ঘোড়া ও একখানি এক্কা ভাড়া করিয়া আনিলাম। ঘোড়ার ভাড়া একটা লোকসমেত দৈনিক ।৵০ আনা, আর এক্কার ভাড়া একটা লোক লইয়া ।৵০ আনা। আমি ঘোড়া বিদায় দিয়া এক্কা রাখিলাম। আর একরকম যান তথায় পাওয়া যায়, তাহার নাম ঝাপ্পান্, উহা চারিজন মানুষে কাঁধে করিয়া লয়, বাঁশের একটা দোলা বিশেষ।

আমরা একদিন প্রাতে এক্কায় আরোহণ

করিয়া ঋষিকেশ যাত্রা করিলাম। পর্ব্বত-পথ বন্ধুর, কেবলই পর্ব্বতময় ভূমি—জঙ্গল-সমাকীর্ণ। প্রাতে রওনা হইলাম। যদিও আমি একায় গিয়াছি, তথাপি নিতান্ত কষ্ট বোধ করিতে লাগিলাম। কেবলই প্রস্তর-ময় বন্ধুর পথ। মাঝে মাঝে ঝরণাগুলি পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া স্রোতোবেগে চলিতেছে। আহা কি পরিষ্কার—ফটিক জল! জঙ্গল প্রদেশ দিয়া যাইতে যাইতে দূরবর্ত্তী স্থানে জনহীন প্রদেশেও কুকুরের শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমার সঙ্গী পার্ব্বত্য লোকটা কহিল, উহা জঙ্গলী ও গৃহপালিত কুকুরের শব্দ। এই জঙ্গলেও মাঝে মাঝে মানুষের বসতি আছে। স্থানে স্থানে জঙ্গলী ও পালিত কুকুটের শব্দও শুনিতে পাইলাম।

বেলা যখন ১২ টা, তখন আমরা সত্য-নারায়ণ-মন্দিরে পঁহুছিয়াছি। এখানে যাত্রী-গণকে আহারাদি দেওয়া হয়, এটা একটা মহাজনের মন্দির। আমি খাইবনা, আপত্তি করিলাম, পয়সা লইলে খাইতে পারি, বলিলাম, কিন্তু একজন ভদ্রলোকের আদর-আপ্যায়নে আর পারিলাম না, আমিও সকলের সঙ্গে আহারপ্রার্থী হইলাম। আমার জন্য স্বতন্ত্র লুচি, মোহনভোগ হইল। আর সকলে আটা, তরকারী লইল। একটার সময় আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিয়া, ২ টায় আবার রওনা হইলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ঋষিকেশ পঁহুছিলাম। আমি ঋষিকেশ হইতে লছমনঝুলায় সেই সঙ্গেই অপর যাত্রীসহ রওনা হইলাম। তথায় আমার একটু বিলম্ব হইল। ভরতজীর মন্দিরের মোহান্তের নিকট হইতে ঘোড়া চাহিয়া লইলাম, সেখানে এক্কা চলেনা। সূর্য্যও ডুবিতে লাগিল, আমরাও তার সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলাম। একস্থানে বিশাল প্রশস্ত একটা নদীর চিহ্ন পাইলাম। উহা বর্ষাকালে জলপ্লাবিত হয়, অন্য সময় কিছু নয়। এমন খর স্রোত হয় যে, আর মানুষের পার হওয়ার সাধ্য থাকেনা। যদিও গলাজল হয় বা কমও থাকে, কিন্তু স্রোত এত অধিক যে কোন বলশালী সন্তরণপটু মানুষও পার হইতে পারেনা। আমরা ঠিক সন্ধ্যার সময়ে লছমনঝুলা লছমনজীর মন্দিরের মোহান্তের গৃহে অতিথি হইলাম। রাত্রে লুচি, মোহনভোগ খাইয়া সে স্থানের পার্ব্বত্য লোকটাকে (ঘোড়ার সহিস) লইয়া শয্যা লইলাম। আমার খাটিয়ার নীচে তাহার বিছানা দিলাম। গঙ্গার উপরেই একটা দোতালা গৃহে রাত্রিযাপন করিলাম।

আহারান্তে যখন শয়ন করিয়াছি তখন শুনি ভীষণ গর্জ্জন! আমরা ভীত হইলাম, পরে বুঝিতে পারিলাম, এটা গঙ্গার গর্জ্জন! গঙ্গা দুর্জ্জয় শব্দে নিম্নাভিমুখী হইতেছেন! রাত্রে মোটেই নিদ্রা হইল না। চারিদিকে পার্ব্বত্য অরণ্য হইতে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হস্তী ময়ূর প্রভৃতির চীৎকার আমার নিদ্রাল্পতা ঘটাইয়াছিল! অতি প্রাতে উঠিলাম, কিন্তু গৃহকর্ত্তা মোহান্ত মহারাজ কহিলেন "আপনার বাহিরে যাইতে হইবে না, ভিতরের পায়খানায় যান। এত প্রত্যূষে বাহিরে ব্যাঘ্র, শূকরাদি বিচরণ করে, উহারা মানুষ পাইলেও ছাড়ে না। উহারা রাত্রে শিকার করিয়া প্রাতে ঘরে ফিরিয়া যাইতেছে।" আমি আর বাহিরে গেলাম না, একটু রৌদ্র

উঠিলে বাহির হইলাম। সেই পার্ব্বত্য লোক-টাকে সঙ্গে লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। উদ্দেশ্য সাধুদর্শন। সাধু কমই পাইলাম, গৃহস্থ পাইয়াছি। সাধুরা এই সময় বদরি-কাশ্রম প্রভৃতি উচ্চতর স্থান হইতে নামিয়া আসেন। উচ্চ প্রদেশের বরফের জন্য পশু-পক্ষীরাও পলাইয়া আসে।

আজ মধ্যাহ্নে আহার করিলাম বাঁশমতি চাউলের অন্ন; সুখাদ্য আহার হইল। ঘি, দুধ প্রচুর। আমি আগ্রহ করিয়া একটী টাকা মোহান্তজীকে দিলাম। তিনি লইলেন না, সুতরাং আমি তাহা লছমনজির মন্দিরে দিলাম, তখন তাঁহার পুত্র আসিয়া তুলিয়া লইল। বেলা ২ টার সময় লছমন্‌ঝুলা হইতে রওনা হইলাম। এটার নাম লছমন্‌ঝুলা কেন হইল? লছমনজির মন্দিরের নামে হইয়াছে। এ মন্দিরে লক্ষ্মণের মূর্ত্তি। আর কারো মূর্ত্তি নাই। পথে যাইতে যাইতে দেখি গঙ্গায় কাঠ ভাসিয়া যাইতেছে। এ সকল পার্ব্বত্য সেগুণ বা বাহাদুরী শিশু প্রভৃতি, অসংখ্য কাঠ গঙ্গাগর্ভে। প্রায় সব গুলিই করাতে কাটা, বন বিভাগের কাঠ। কাঠে মার্কা মারা তা'ই কেহ চুরি করে না। ঘোড়াটা বড় শিক্ষিত, টক্ টক্ করিয়া পর্ব্বত চড়াই করে। আমার ভয় হয়। এক পা পিছলাইলেই হয়ত গভীর গহ্বরে বা গঙ্গাগর্ভে অত্যুচ্চ পাহাড় হইতে পড়িয়া মারা যাইব। কিন্তু ঘোড়া বড় সাবধানে সে যাত্রার মত আমার প্রাণটা বাঁচাইয়া লইয়া আসিয়াছে। ঋষিকেশ আসিতে পথে এক সন্ন্যাসীর আশ্রম পাইলাম। দেখিলাম সহ-স্রাধিক সন্ন্যাসী, এই ধনী সন্ন্যাসীর নিকট হইতে আহার লইয়া যাইতেছে। সকলেই কয়েক খানা রুটী আর একহাতা দাল ও চিনি পাইতেছে। বস্ত্রে বাঁধিয়া তাহা লইয়া যাইতেছে। বহুতর গেরুয়াপরা ধর্ম্মের সিপাহী এখান হইতে আহার লইয়া গেলেন। যাহারা আশ্রম ত্যাগ করে না, তাহাদের আহার লোক দিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এখানে নানাশাস্ত্র অধ্যাপনা হয়; কয়েক জন অধ্যাপক আছেন। কয়েক-খানা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহও আছে। এই সাধুর নাম ধনরাজ গিরি। কাজেও তিনি ধন-রাজই বটেন। ইহার আশ্রমের যত সব লোক ভৃত্যাদি পর্য্যন্তও সাধুর বেশে গেরুয়া-বস্ত্র-পরিহিত। ধনরাজগিরির সঙ্গে দেখা হইল। একটী গৃহে আটটা লোহার সিন্দুক দেখিলাম। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার এই ব্যয় চালায়। এই চতুষ্পাঠীতে সাধু ছাত্রই দেখিলাম, অশীতি-বর্ষবয়স্ক ছাত্রও আছে। আহা! আমরণ জ্ঞানের পিপাসা! এখানেও অনেকগুলি সাধু সন্ন্যাসী বাস করেন। যাঁহারা আহার লইতে আসেন, তাঁহারা আসিলে কুটীরে বাস করেন। ইহাদের এখানে বহু কুটীর। এই সকল কুটীর গ্রামবাসী বা অন্য ধনী বা মহাজনেরা পুণ্যার্থী হইয়া তাহাদের বাসের জন্য নির্ম্মাণ করে। সাধুরা যেটা খালিপায়, সেটাই দখল করিয়া বসে। এখানে সীমানা-সহরদ্দি লইয়া গোল নাই। নির্জ্জনে তাহারা নির্ব্বাক্ হইয়াই বাস করে।

আমরা ঠিক সন্ধ্যার প্রাক্কালে আবার ঋষিকেশ আসিলাম। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, লছমন্‌ঝুলার কথা কিছুই বলি নাই। এখানে একটী বৃহৎ সেতু বা ঝুলা ছিল, উহা

খড়ের দ্বারা নির্ম্মিত, ঐ খড়ের রাশি ধরিয়া মানুষ পার হইত। এখন সে ঝুলা আর নাই। এখন গঙ্গার উপর দোলায়মান একটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা প্রশস্তে একগজ। ইহা দোলায়মান সেতু। ধনের সদ্ব্যবহারই হইয়াছে। এখন আর এই সেতুর উপর দিয়া মানুষ, গরু, ঘোড়া পার হইতে ভয়ের কথা নাই। সেতুর উপর হইতে গঙ্গার জল প্রায় সহস্র হস্ত নীচে। এখান হইতে পড়িলে বুঝি আর রক্ষা নাই।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ঋষিকেশ পঁহুছিলাম, সর্ব্বাগ্রে ভরতজীর মন্দিরের মোহান্তের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতে গেলাম। এই সকল মন্দির কাশ্মীররাজার। কাশ্মীররাজার জায়গীর বা দেবোত্তর সম্পত্তি দিয়া খরচা চলে। আমি কাশ্মীররাজার একজন উচ্চ কর্ম্মচারীর পত্র লইয়া এখানে আসিয়াছি, সুতরাং আমার যত্ন ত হইবেই। ঘোড়াটাও সেই সূত্রে পাইয়াছিলাম। মোহান্তজী আমাকে সেই স্থানেই রাত্রিযাপনের অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমি লছমনঝুলা যাইবার দিন শ্রীনাথজীর মন্দিরের প্রধান অমাত্যের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে, ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার মন্দিরে উঠিব। একথা শুনিয়া তিনি সেখানে আমার ব্যবস্থান্তর হইয়াছে বলিয়া তত্ত্ব পাঠাইয়াছেন। আমি অস্বীকার করিয়া চলিয়া আসি। আমার নিকট শ্রীনাথজীর মন্দিরের কর্ম্মচারীর নিকট হরিদ্বারের বিদ্যার্থী সন্ন্যাসী পশুপতিনাথের পত্র ছিল। তাহা দিয়া আমি যথেষ্ট আপ্যায়িত হইলাম। রাত্রে আমার জন্য যথেষ্ট পায়স ও লুচি-মিঠাইর বন্দোবস্ত হইল। প্রচুর আহার পাইয়া নিদ্রার উদ্যোগ করিলাম। এখানে ভারতের বহু প্রদেশের লোক অতিথিরূপে অবস্থিতি করিতেছে দেখিলাম। অনেকের সঙ্গেই আলাপ হইল। একজন সৌখিন লোক পাইলাম, তিনিও অতিথি; রাত্রে তাঁহারা গীত-বাদ্যের আয়োজন করিয়াছিলেন। আমিও সেই সভায় "হংসমধ্যে বকো যথা" বসিয়া গেলাম। রাত্রে আমি কিছু নিয়া পড়া শুনা করিব মনস্থ করিয়া একটু তৈল চাহিলাম একজন ভৃত্য আসিয়া এক সেরের এক বোতল জ্বালানী তৈল দিয়া গেল। আমি কহিলাম "এত কেন?" "যা থাকে পড়িয়া থাকিবে" কহিয়া লোক চলিয়া গেল। শীতমর্দ্দক অনেক গুলি বস্ত্র দিয়া গেল। এই পান্থশালায় অনেকগুলি কোটা ঘর। এক একটা ঘরে সপরিবারে একজন বাস করিতে পারে।

প্রাতে উঠিয়া দেয়ালের বাহিরে মলমূত্র-ত্যাগের উদ্দেশ্যে গেলাম, কিন্তু দলে দলে শূকর দেখিয়া চলিয়া আসিলাম। তখন কর্ম্ম-কর্ত্তা দেখিয়া সতর্ক করিয়া বলিলেন যে, এ বন্য শূকরে অনেক সময় মানুষ ধরে। একটা বেলা হইলে কেহ ঘরের বাহির হয় না। মাঝে মাঝে বাঘের উপদ্রবও এমন সময় হয়। প্রাতে আর ঋষিকেশ ত্যাগ করিলাম না। একজন বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী—তিনি গভীর বনে থাকেন, তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। বনমধ্যে ইষ্টককুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তিনি সেখানে বাস করিতেছেন। আমি গিয়া দেখি, সাধুর গৃহে হ্যাট্‌কোট ট্রাঙ্ক, বুট ইত্যাদি সাহেবী সরঞ্জাম। আমার মনটা দোলায়মান হইয়া উঠিল। কিছুকাল পর

একটী ফিট্ ফাট্ বাবু আসিলেন। ষ্টেট্স্‌ম্যান কাগজের মোড়ক পড়িয়া তাহার নাম জানিলাম। তিনি বি এ, স্কুলের হেড্‌মাষ্টার। তাহার সঙ্গে অনেক কথা হইল। পরে জানিলাম, তিনি পর্ব্বত-ভ্রমণে আসিয়াছেন, এই ব্রহ্মচারী তাঁহার পরিচিত। আমরা বেলা ৯ টার পর ঋষিকেশ রওনা হইলাম।

শ্রীনাথজীর মন্দিরে আসিয়া দেখি, শত শত সন্ন্যাসী ভোজনপাত্র হস্তে করিয়া আহার্য্য লইয়া যাইতেছেন। সন্ন্যাসী এখান হইতে পায়স, রুটী, দাল পান। এক একজনের উপযুক্ত আহারই দেওয়া হয়। সহস্রাধিক সন্ন্যাসী এখানে আহার পান! তা ছাড়া অতিথি যত হউক্। এখানে রাম, লক্ষণ, সীতা, হনুমান্, ভরত, শত্রুঘ্ন প্রভৃতির মন্দির ও মূর্ত্তি আছে, তাঁদের পূজা হয়। এখানে একটা স্থান দেখিলাম, বড় ভীষণ। নানাজাতীয় সর্প আছে, অথচ পুকুরে মানুষ স্নান করিতেছে, কাহাকেও হিংসা করে না। আর একটা উষ্ণজলের পুকুর দেখিলাম, নেকড়া বেঁধে চা'ল দিলে সিদ্ধ হয়।

আমি এখানে নানা প্রকার চর্ব্ব্য চোষ্যাদি ভোজন করিয়া, সামান্য বিশ্রামান্তে একায় চলিলাম। বেলা প্রায় দুইটায় রওনা হইয়া সন্ধ্যার সময় হরিদ্বার আসিলাম। এখানে বড় শীত কিন্তু আমাদের দেশে যেমন কুয়াশায় পৃথিবী অন্ধকার হয়, এখানে তেমন কিছু নাই। মোটেই কুয়াশা নাই, কিন্তু শীতের প্রাবল্য খুব বেশী। পথে যাইতে যাইতে অনেক স্থানেই বহু কুষ্ঠরোগী দেখিতে পাইলাম। কুষ্ঠরোগীরা গ্রাম্য বাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। রাজবিধি অনুসারে উহারা গঙ্গাতীরে কুঁড়ে বেঁধে বাস করে। প্রায় সকলেই ভিক্ষা করে।

এখানে একটী থানা ও একটী পোষ্টাফিস্ আছে। এই থানা দিয়া শাসনের সব কার্য্য হয়। এখানকার পোষ্টাফিস্ হইতে গ্রাম্য লোকেরা একমাসেও পত্র পায় না। পিয়ন মহাশয় ব্যারিং পত্র পাইলেই কদাচিৎ গ্রামে যান, তজ্জন্য এসকল প্রদেশে ব্যারিং চিঠিরই আমদানী রপ্তানী।

আমি আর বদরিকাশ্রমে যাইতে পারিলামনা। বরফে সব পথ বন্ধ। শীত কাটাইয়া যখন জ্যৈষ্ঠের গরম পড়িল, তখন আসিয়া বদরিকাশ্রমে গেলাম। সে কথা আর একদিন কহিব। *

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার।

মায়া।

পিতা ধরে পুত্র-তনু জননী জঠরে,
শিব ধরে জীবরূপ মায়ার ভিতরে॥
মাতৃ গর্ভ-বাস হেতু ভিন্ন পিতা সুত,
মায়ার বিকাশ বশে ভেদ ব্রহ্ম ভূত।
যেই স্তন জনকের জাগায় মদন,
সেই স্তন তনয়ের সুধা-প্রস্রবণ;
যে মায়া অবিদ্যারূপে ব্রহ্মের বিকার,
বিদ্যা-রূপে করে তাহা জীবের উদ্ধার॥
জনক বিটপি বটে, মাতা তার ছায়া,
পুরুষের পদ বেড়ি' আছে মহামায়া॥
তরু যদি সত্য হয়, ছায়া মিথ্যা নয়,
মোক্ষ ফল একে, অন্যে জুড়ায় হৃদয়॥
মা না দিলে পরিচয় জনকে না জানে,
ব্রহ্ম পদ মিলে তার—মায়ারে যে মানে॥

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

---

* লেখক 'ঋষিকেশ' লিখিয়াছেন, কিন্তু স্থানের নাম বেদনামানুসারে 'হৃষীকেশ' হওয়াই সঙ্গত। হিঃ পঃ সঃ।

সদাশিব।

পূর্ব্বকালে শিবস্থাপন জলাশয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সৎকার্য্য, সঙ্গতিপন্ন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। আসাম-রাজাদের সেরূপ কীর্ত্তিকলাপ আজিও বহুস্থানে অতীতের সাক্ষী স্বরূপ বিরাজমান। বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত ৺শ্রীশ্রীসদাশিব তাহারই অন্যতম কীর্ত্তি। ইহা শিবসাগর জিলার গোলাঘাট সব্‌ডিবিশনের অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণতীরস্থ নিগ্রিটিং শৈলোপরি প্রতিষ্ঠিত। এই লিঙ্গ সম্বন্ধে আজিও বৃদ্ধদের মুখে এইরূপ কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই লিঙ্গ পূর্ব্বে ঔর্ব্ব নামা কোন মুনি কর্ত্তৃক ব্রহ্মপুত্র-কূলে উপাসিত হইতেন। সম্ভবতঃ উক্ত মুনিই এই লিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা। দীর্ঘকাল উপাসনার পর মুনিবর অন্তর্ধান করেন এবং শিবলিঙ্গ স্বভাবজাত অরণ্যে লুক্কায়িত হন। ইহার পর বহুদিন গত হইলে নিকটবর্ত্তী গ্রামে কোন ব্রাহ্মণের একটী কপিলা গাভী প্রসূতা হয়। সেই গাভী প্রত্যহ মধ্যাহ্ন-সময়ে বৎস ফেলিয়া কোথায় চলিয়া যাইত, কেহ সন্ধান পাইত না। এইভাবে কিছুদিন গত হইলে ভগবদিচ্ছায় ব্রাহ্মণের মনে সন্দেহ জন্মে। একদিন গাভীর অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মণ দেখিলেন, গাভীটী ঘর হইতে বাহির হইয়াই সোজাসুজি ব্রহ্মপুত্র-কূলের অরণ্যে প্রবেশ করিল। সেস্থান গোচারণের উপযুক্ত না হওয়ায় ব্রাহ্মণের সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল; তিনি গাভীর পশ্চাদনুসরণ ত্যাগ করিলেন না; কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন, গাভীটী স্থল-বিশেষে দণ্ডায়মানা হইয়া দুগ্ধ ত্যাগ করিতেছে। ব্রাহ্মণ বিস্ময়াকুল চিত্তে তথায় উপস্থিত হইয়া বুঝিলেন, কপিলা এক শিবলিঙ্গের উপর দুগ্ধ ত্যাগ করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ লিঙ্গের চতুর্দ্দিক্ পরিষ্কার করতঃ যথাসাধ্য পূজা করিতে লাগিলেন এবং এই আশ্চর্য্য ঘটনা সকলের নিকট ব্যক্ত করিলেন। এই সংবাদ ক্রমে রাজা শিবসিংহের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি, সকল তথ্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক লিঙ্গের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত আখ্যানুযায়ী 'সদাশিব' নাম প্রদান করিয়া, পূজার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সদাশিবের পূজার জন্য একখানা গ্রাম প্রদত্ত হয়। দেবোদ্দেশে দান করা হয় বলিয়া ইহার 'দেবগ্রাম' আখ্যা হয়। ক্রমে 'দেবর গ্রাম' হইয়া বর্ত্তমানে 'দেরগাঁও' নামে পরিণত হইয়াছে এবং ইহার নামে গোলাঘাটের একটী মৌজার * নামকরণ হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের অনতিদূরে 'গোলাবিল' নামক ব্রহ্মপুত্রের ক্ষুদ্র শাখার তীরে মন্দির প্রস্তুত করতঃ রাজা শিবসিংহ সদাশিবের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে কাল-প্রভাবে নদী কর্ত্তৃক শিবমন্দির নষ্ট হইবার উপক্রম হওয়াতে রাজা রাজেশ্বরসিংহ নিগ্রিটিং শৈলোপরি বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সদাশিবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন; এবং বাণেশ্বর ঠাকুর নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে 'বড়ুয়া' উপাধি দিয়া, তাঁহার উপর তত্ত্বাবধানের এবং তাহার ভ্রাতা দেবরাম ঠাকুরের উপর পূজার ভার প্রদান করেন।

---

* মৌজা—গবর্ণমেণ্টের বিভাগ বিশেষ। আসামের খাস মহলে অনেকগুলি গ্রামের সমষ্টি নিয়া একটী 'মৌজা' গঠিত হয়।

দেবরাজের বংশধরেরা আজিও 'বড়ঠাকুরের' (প্রধান পূজকের) পদে অধিষ্ঠিত।

সদাশিবের প্রচার সম্বন্ধে আর একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তাহা এই যে, একদিন বজালকাটা † ব্রাহ্মণ জঙ্গলের মধ্যে পূজান্তে ঘণ্টা বাদ্য করিতেছিলেন, এমন সময় রাজা শিবসিংহ যুদ্ধার্থ ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া যাইতেছিলেন; হঠাৎ নিবিড়বন-মধ্যে ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া অনুসন্ধানে ক্রমে শিবপূজার সংবাদ প্রাপ্ত হন। জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রাহ্মণ, 'সদাশিব' আরাধনা করিতেছেন বলিয়া, শিবের মহিমা কীর্ত্তন করেন। তখন মহারাজ যুদ্ধে জয়লাভ করিলে শিবোত্তর দান করতঃ সদাশিবের প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া 'মানস' করেন। শিবের কৃপায় 'লতাকাটার' যুদ্ধে মহারাজের জয় হয়। তখন তিনি গোলাবিলের তীরে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণ ভূধর আগমাচার্য্যকে 'বড়ঠাকুর' উপাধি দিয়া, প্রধান পূজক এবং শাস্ত্রজ্ঞানহীন বজালকাটা ব্রাহ্মণকে পরিচারক নিযুক্ত করেন। উক্ত ভূধর আগমাচার্য্যের বংশধর বাণেশ্বর ঠাকুর ও দেবরাজ ঠাকুরকেই রাজা রাজেশ্বরসিংহ তত্ত্বাবধায়ক ও প্রধান পূজক নিযুক্ত করেন।

রাজা রাজেশ্বরসিংহ ১৬৮৭ শকে সদাশিবের বর্ত্তমান মন্দির আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী দুই তিন বৎসরে সম্পন্ন করেন। সমগ্র দেবালয় ক্ষুদ্র বৃহৎ পাঁচটী মন্দিরের সমষ্টি। মধ্যস্থলে সদাশিবের প্রকাণ্ড মন্দির এবং ইহার গাত্রসংলগ্ন চারিকোণে § সূর্য্য, গণেশ, দুর্গা ও বিষ্ণুর চারিটী ক্ষুদ্র মন্দির বর্ত্তমান। পাঁচটী মন্দিরের মূলদেশের পরিধি ১৭৫ হাত এবং শিবমন্দিরের উচ্চতা ৬০ হাত।

ক্ষুদ্র শৈলের উপরিস্থ ১১ বিঘা ভূমিই দেবাধিকৃত। স্থানটীর চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোহর। মন্দিরের চারিদিক্ নানাবিধ ফল-পুষ্পের বৃক্ষে পরিপূর্ণ। শৈলের চতুর্দ্দিকে 'ব্রহ্মপুত্র-টী কোম্পানী'র সমৃদ্ধিশালী 'চা বাগান' এবং অদূরে প্রশান্তকায় ব্রহ্মপুত্র বিরাজমান। বর্ষাকালে শৈলের পাদদেশ বাহিয়া ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হয়, কিন্তু শীতকালে কিছু দূরে সরিয়া পড়ে।

স্থানটী অতি মনোহর হইলেও দেবালয়ের আর সে শ্রী নাই। চারিকোণের মন্দির চারিটীই ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত। গণেশের মন্দির ব্যতীত অন্য তিনটী ক্ষুদ্র মন্দিরই ব্যবহারের অযোগ্য হইয়াছে, সুতরাং সেই মন্দিরের বিগ্রহগণ মহাদেবের মন্দিরে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন মূল মন্দিরের অবস্থাও শোচনীয়। ইহার উপর বহুবিধ গাছ পালা জন্মিয়াছে, নানাস্থান ফাটিয়াছে, কোন স্থান বা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং চামচিকা বাদুড়াদির আবাস-স্থান হইয়াছে। মন্দিরের ভিতরের অবস্থাও সেইরূপ। প্রাচীনকালের ইমারতের কাজ বলিয়া প্রায় ১৫০ বৎসরের দেবালয়টী এখনও টিকিয়া আছে, নতুবা এতদিনে অযত্নে কোন্ কালে ভূমিসাৎ হইয়া যাইত। দেবালয়ের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড নাটমন্দির ছিল, এখন তাহার অস্তিত্ব নাই। বড় ঠাকুরেরা

† কপিলার পশ্চাদনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মণ 'বজাল' নামক ক্ষুদ্র বাঁশ কাটিয়া শিবলিঙ্গের আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি 'বজাল্-কাটা' ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ।

§ অগ্নিকোণে সূর্য্য, নৈঋতে গণেশ, বায়ুকোণে দুর্গা এবং ঈশানে বিষ্ণুর মন্দির।

ইহার স্থলে একটী ছোট টীনের চালা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই যাত্রীরা বিশ্রাম লাভ করে। শৈলের উপরিভাগ বেষ্টন করিয়া একটী পাকা দেওয়াল ছিল, তাহারও অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। নির্ম্মাণ-পারিপাট্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝা যায়, দেবালয়টী পূর্ব্বে বড়ই প্রশান্ত ও শান্তিময় ছিল, কিন্তু এখন দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে! এখন দালান প্রাচীর সকলই ভগ্ন! গাছ পালা শ্রীহীন! যেন সকল শ্মশানে পরিণত এবং সদাশিব বস্তুতঃই শ্মশানবাসী!

আসাম-রাজাদের সময়ে এবং তৎপর বহুদিন পর্য্যন্ত শিবরাত্রি, দোলযাত্রা, গণেশ-চতুর্থী, জন্মাষ্টমী ও দুর্গোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত, এবং অনেক দূরদেশ হইতে বহুযাত্রীর সমাবেশ হইত। কিন্তু আ'জকা'ল সে সব উৎসব কিছুই নাই। শিবচতুর্দ্দশীর সময় স্থানীয় অনেক লোকের সমাগম হয়। সামান্য ভাবে সকল বিগ্রহেরই নিত্যপূজা হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে যাত্রীরা দুর্গার নিকট বলিপ্রদানও করে। আ'জকা'ল যাত্রীদের অধিকাংশই নিকটবর্ত্তী চা-বাগানের কুলী। স্থানীয় লোকেরও সদাশিবের প্রতি বিশেষ ভক্তি আছে। কোনও বিপদ্ বা ক্ষতির সূচনা হইলে, অনেকেই সদাশিবের কাছে 'মানস' করিয়া থাকে। বহুস্থলে মানস ফলিয়াও থাকে। কিন্তু আর পূর্ব্বের মত কিছুই নাই। পরে যাহা থাকুক্, শৃঙ্খলার অভাবই দুরবস্থার প্রধান কারণ। বড়ঠাকুরদের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাগের সংখ্যা বাড়িয়াছে; তাহার উপর নিজ নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই সকলে ব্যস্ত। সদাশিবের নিত্য-নিয়মিত সেবা কি মন্দির রক্ষণের প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই বলিলেও চলে। সেবায়তদের অমনোযোগিতায় শিবমন্দিরের ভিতর দেববাসের অযোগ্য হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আসামের অন্যান্য দেবমন্দিরের ন্যায় সদাশিবের মন্দিরের ভিতরও অন্ধকারময়; তাহাতে আলোর বন্দোবস্ত নাই বলিলেই চলে। নিত্যপূজার ফুল বেলপাতা মন্দিরের ভিতরেই ক্রমে স্তূপীকৃত হইয়া পচিতে থাকে। তাহাতে চামচিকা প্রভৃতির বিষ্ঠা মিলিত হইয়া, সামান্য ধূপের গন্ধ পরাজিত করতঃ পূতিগন্ধ বিস্তার করিয়া থাকে। সেবায়তদের শ্রদ্ধাহীনতাই ইহার একমাত্র কারণ!

সদাশিবের মন্দিরের সম্মুখে শৈলের পাদদেশে একটী নাতিবৃহৎ পুষ্করিণী আছে; পূর্ব্বে ইহারই বিশুদ্ধ নির্ম্মল জলে পূজা ও অন্যান্য কার্য্য হইত; কিন্তু এখন ইহার জল ব্যবহারের অযোগ্য; পুষ্করিণী নানাপ্রকার আবর্জ্জনা ও আগাছায় পরিপূর্ণ। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পুকুরটী এখন 'ব্রহ্মপুত্র-টি-কোম্পানী'র বন্দোবস্তীয় ভূমির অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং ইহার উপর সদাশিবের আর অধিকার নাই!

কথিত আছে যে, প্রায় ১০০ বর্গ মাইল ভূমি ও বিভিন্ন জাতীয় ৬০০ ঘর সেবায়ত সদাশিবের জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি ১১২ বিঘা নিষ্কিখেরাজ ভূমি ব্যতীত অন্য কোন শিবোত্তর সম্পত্তি নাই। শৈলোপরি যে এগার বিঘা ভূখণ্ডে দেবালয় অধিষ্ঠিত, তাহার জন্য ও বড়ঠাকুরদিগের গবর্ণমেণ্টকে খাজনা দিতে হয়।

সদাশিবের শিবোত্তর-লোপ সম্বন্ধে;

বিভিন্ন প্রকার কিম্বদন্তী আছে। প্রথমতঃ—ভুগেশ্বর শর্ম্মা সভাপণ্ডিতের সময় ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে শিবসাগর জিলার প্রথম বন্দোবস্ত হয়। তিনি তখন মাটির পরিবর্ত্তে দাস-দাসী প্রার্থনা করায় সমস্ত ভূমি ইংরাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ—যখন আসাম-রাজাদের রাজ্যচ্যুতি ঘটে, তখন ইংরাজগণ শীঘ্রই চলিয়া যাইবেন, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, শিবোত্তর-রক্ষার কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। কাজেই শিবমন্দিরের স্থানসহ সমস্ত ভূমিই গবর্ণমেণ্টে বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। আবার ইহাতে উক্ত হয় যে, ১০০বর্গমাইল ভূমি শিবের উদ্দেশে অর্পিত হইলেও, ইহা পৃথগ্‌ভাবে শিবোত্তর করিয়া দেওয়া হয় নাই, রাজার খাস তহসিলেই ছিল। এই ভূমির আয় দ্বারা সদাশিবের উৎসবাদি কার্য্য সম্পন্ন হইত। হঠাৎ রাজার রাজ্যচ্যুতি হওয়ায় সমস্তই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের খাস হইয়া যায়। গুরযোগনীয়া নামক মৌজায় সদাশিবের একটী ভাণ্ডার এবং তৎসংলগ্ন ১১২ বিঘা ভূমি পৃথগ্‌ভাবে শিবোত্তর নির্দ্দিষ্ট থাকায়, আজিও সেই ১১২ বিঘা ভূমিই শিবোত্তরভাবে আছে। কথিত আছে, পূর্ব্বোক্ত দমালকাটা ব্রাহ্মণ সদাশিবের পূজার ভার না পাইয়া বিষণ্নমনে দেবরগ্রাম ত্যাগ করতঃ গুরযোগনীয়ার সদাশিবের ভাণ্ডারের প্রাঙ্গণে কতকগুলি পাষাণখণ্ড সংগ্রহ করতঃ আপন মনে সদাশিবের আরাধনা করিতে থাকেন। নিকটবর্ত্তী বহুলোকে আজিও সদাশিবের উদ্দেশে সেখানে পূজা দিয়া থাকে।

দেবালয়ের বর্ত্তমান অবস্থায় শীঘ্রই ইহার সংস্কার করা একান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু ইহার সর্ব্বাঙ্গীন সংস্কার ও সর্ব্ববিষয় সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করা বহু আয়াসসাধ্য ও বহুব্যয়-সাপেক্ষ ব্যাপার। প্রাচীন-কীর্ত্তি সংরক্ষণ-বিষয়ক আইনানুসারে ইহার সংস্কারের চেষ্টা করা হইয়াছিল, চেষ্টা এখনও ফলবতী হয় নাই। স্থানীয় লোকে অর্দ্ধেক ব্যয়ভার বহন করিলে, গবর্ণমেণ্ট বাকি ব্যয় দিবেন বলিয়াছেন। ইহাও কতক আশার কথা। বর্ত্তমান পড়ঠাকুর শ্রীযুক্ত পুণ্যেশ্বর শর্ম্মা এই বিষয়ে একটু বিশেষ উদ্যোগী হইয়া স্থানীয় চাঁদা সংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়াছেন। সদাশয় সম্পত্তিপন্ন ব্যক্তিগণের দৃষ্টি পতিত না হইলে, এই মহদনুষ্ঠান পূর্ণ হইবার আশা খুব কম। সদাশিব স্বীয় কীর্ত্তি স্বয়ং রক্ষা করুন—এই প্রার্থনা।

শ্রীদ্বারকানাথ চৌধুরী।

বেদ ও বেদভাষ্য।

IV.

অশ্বিদ্বয়।

নিরুক্তশাস্ত্রে ঋষি যাস্ক বলেন, যে, কেহ বলেন অশ্বিদ্বয় সূর্য্য ও চন্দ্রমা, কেহ বলেন উহারা দ্যৌ ও পৃথিবী এবং কেহ বলেন উহারা অহঃ ও রাত্রি। ঐতিহাসিকগণের মতে উহারা দুই অশ্বারোহী পুণ্যকৃত রাজদ্বয়। (১)

(১) "The Asvins seem to have been a puzzle even to the oldest Indian commentators." Dr. Muir.

পাশ্চাত্য-বেদাধ্যায়ীগণের মতে নিরুক্ত-শাস্ত্রের এই তালিকা চূড়ান্ত নহে। তাঁহারা বলেন যে, মিত্রাবরুণ ইন্দ্রাগ্নি আদি দেব-যুগলও অশ্বিদ্বয় নামে বেদে গীত হইয়াছেন।

অধ্যাপক বেন্‌ফির মতে প্রভাতী তারা-দ্বয় এবং সান্ধ্য তারাদ্বয়ও অশ্বিদ্বয় নামে অর্চ্চিত হইয়াছে।

বেন্‌ফির মতের প্রতিবাদে মহামতি মোক্ষমূলার বলেন যে, সেই প্রাচীন কালে প্রভাতী ও সান্ধ্য তারার একত্ব যে প্রাচ্য তারাদর্শকগণের সুপরিজ্ঞাত ছিল, এ কথা মানিয়া না লইলে সুদূরস্থ তারাগণ অশ্বি-যুগলে যোজিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা কঠিন।

প্রভাতী ও সান্ধ্য তারার স্বরূপ-নির্ণয়ে পাশ্চাত্যসমাজে বহুকাল মহাভ্রম ছিল। সেই কারণে মহামতি মোক্ষমূলার প্রাচ্য তারাদর্শকের পর্য্যবেক্ষণের প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই,—এ কথা সহজেই বোধগম্য হয়। কিন্তু ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রে প্রাচ্য তারাদর্শকের পর্য্যবেক্ষণের যে ফল প্রকটিত আছে, তাহাতে নিঃসন্দেহ-রূপে প্রতিপন্ন হয় যে, সত্যের আলোক-প্রভাবে সেই মহাভ্রম প্রাচ্য হইতে অচি-রাৎ বিতাড়িত হইয়াছিল। যথা,—

ঋক্ ২। ১১। ৬

হে ইন্দ্র! সূর্য্যের কেতুদ্বয়ই তোমার হরি-নামক অশ্বদ্বয়, তাহাদিগকে স্তব করি। (২)

ঋক্ ৪। ৪৫। ৬

হে অশ্বিদ্বয়! সূর্য্য অশ্ব যোজনা করিয়া বিশ্বভ্রমণে যাত্রা করিলেন। তোমরা শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার পথ প্রদর্শন কর। (৩)

ঋক্ ১। ১১২। ১৩

হে অশ্বিদ্বয়! যে পালন দ্বারা দূরদেশে তোমরা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ কর—সেই পালন সহ আমাদিগের নিকটে আইস। (৪)

প্রাচীন হিন্দু জানিতেন যে, বুধ ও শুক্র গ্রহদ্বয় সতত সূর্য্যের সহবাসী। (৫) এবং তাহারা কখনও প্রভাতী তারা, কখনও বা সান্ধ্য তারা হয়। প্রভাতে তাহারা সূর্য্যের অগ্রে উদিত হয় এবং সন্ধ্যাকালে তাহারা সূর্য্যের পশ্চাৎ অনুগমন করে। প্রভাতে তাহারা উদিত হইয়া উদয় সূর্য্যকে অভ্য-র্থনা করে। যথা:—

ঋক্ ১। ১৩। ৮

সেই সুবক্তা হোতা দেবতা কবিদ্বয়কে আহ্বান করি। তাঁহারা এই যজ্ঞ সম্পন্ন করুন। (৬)

ঋক্ ১। ১৮৮। ৭

প্রথমতঃ সুবক্তা হোতা দেবতা কবিদ্বয় আমাদিগের এই যজ্ঞ সম্পন্ন করুন। (৭)

---

(২) স্তব হরী সূর্য্যস্য কেতূ।

(৩) সূরশ্চিৎ অশ্বান্ যুযুজান ঈয়তে বিশ্বান্ অনু স্বধয়া চেতথঃ পথঃ।

(৪) যাভিঃ সূর্য্যম্ পরিযাথঃ পরাবতি...। ...তাভি উষু উতিভিঃ অশ্বিনা আগতম্॥

(৫) যাবপানা বিবস্বতি... .....।

ঋক্ ১। ৪৬। ১৩

(৬) তা সুজিহ্বৌ উপহ্বয়ে হোতারা দৈব্যাকবী।

যজ্ঞম্ নঃ যক্ষতাম্ ইমম্

তু। Hermes (Mercury) was behined to have been the inventor of sacrifices.

(৭) প্রথমা হি সুবচনা হোতারা দৈব্যা-কবী।

যজ্ঞম্ নঃ যক্ষতাম্ ইমম্॥

ঋক্ ২। ৩। ৭

প্রথমতঃ দেবতা হোতা স্ত্রীনীতর সুন্দর-রূপ—মন্ত্র পাঠে আহুতি প্রদান করুন। (৮)

হোতা বা স্তোতা হইতে বৈদিক ইতিহে বুধগ্রহ 'বন্দন' নাম এবং শুক্রগ্রহ 'রেভ' নাম গ্রহণ করিয়াছেন। (৯)

অধ্যাপক ওয়েবার্ সাহেবের মতে প্রাচীন "পুনর্ব্বসু" নক্ষত্রের তারাদ্বয় (বিষ্ণু ও সোম তারা Castor and Pollux) অশ্বিদ্বয় নামে পূজিত হইয়াছে।

আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা বুঝিতেছি যে, প্রাচীন বিচৃত নক্ষত্রের (১০) (বর্ত্তমান মূলা নক্ষত্রের) শ্যাম ও শবল নামক তারাদ্বয় মৃত্যুদেবের কুক্কুরদ্বয় বলিয়া বৈদিক মন্ত্রে সুপরিচিত আছে এবং তারা-জগতে তাহারা বিবস্বৎ পুত্র অশ্বিদ্বয়ের (১১) প্রতিমা বলিয়া বেদমন্ত্রে প্রতিভাত আছে।

বৈদিক ইতিহে অশ্বিদ্বয়ের প্রতিমা বিষ্ণু ও সোম তারা-যুগল এবং শ্যাম ও শবল তারা-যুগল অতীব উচ্চ আসন গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু প্রথমোক্ত তারা-যুগলের পারিপার্শ্বিক তারা-চিত্র পর্য্যবেক্ষণে, শ্যাম ও শবল তারাদ্বয়ের স্বরূপ-নির্ণয়ে অবহেলা করিয়া, ভাষ্যকারগণকে অপার সমুদ্র-তরঙ্গে ভাসিতে হইয়াছে। কেহই অশ্বিসূক্ত-নিচয়ের সদর্থ করিতে পারেন নাই।

বেদে প্রথমোক্ত অশ্বিদ্বয় বিষ্ণু ও সোম-তারা, অশ্বিদ্বয়ের রথ, রাসভ, মধুমতী কশা, ও তাহাদের পত্নী সূর্য্যার সুবিমল চিত্র বহুস্থল রঞ্জিত করিয়াছে।

পাঠক একবার কর্কটরাশির (Cancer) প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত করিলেই দেখিবেন যে, বিষ্ণু ও সোম তারার (castor and Pollux) অদূরে মধুচক্র-নামক তারাস্তবক বিরাজিত আছে। এই তারাস্তবক বিলাতে Beehive নামে সর্ব্বজন-বিদিত আছে। এই তারা-স্তবক অশ্বিদ্বয়ের রথ। উহা দেখিতে শরতের মেঘ-খণ্ড-সদৃশ এবং উহা মধু বর্ষণ করে। (১২)

আবার এই মধুচক্র রথের অতি সন্নিহিত যে খর ও গর্দ্দভ তারাদ্বয় (The Aselli) বর্ত্তমান আছে, তাহারাই অশ্বিদ্বয়ের মধুচক্র রথ বহন করে। যথা—

যুঞ্জাথাম্ রাসভম্ রথে……।

ঋক্ ৮। ৭৪। ৭

নিরুক্ত-শাস্ত্রমতে রাসভম্ পদে রাসভৌ—বুঝিতে হইবে।

(১। ১৫। ৪)

(৮) দৈব্যা হোতারা প্রথমা বিদুঃতরা ঋজু যক্ষতঃ সম্ ঋচা বপুঃতরা।

(৯) "রেভতে স্তৌতি ইতি রেভঃ" (সায়নঃ)

দ্রঃ। Hebrew Erebh = the Evening. Greek Erebos = the Gloom after the Sun-set.

Phoenician Erebh = the beautiful

রেভকৃত স্তুতিবাণী 'রৈভী' নাম ধারণ করে (ঋক্ ১০। ৮৫। ৬)

(১০) অমী যে সুভগে দিবি বিচৃতৌ নাম তারকে।

(১১) দিব্যৌ শ্বানৌ শ্যামশবলৌ বৈবস্বতকুলোদ্ভবৌ।

(সায়ণাচার্য্যধৃত প্রাচীনবচনম্)

(১২) প্রবাম্ শরদ্বান্ বৃষভঃ ন নিষবাট্ পূর্ব্বীঃ ইষঃ চরতি মধ্বঃ ইষ্ণন্।

ঋক্ ১। ১৮১। ৬

কেন? পাঠিক উত্তর দিবেন। (১৩) বিষ্ণু ও সোম তারার পৃষ্ঠোপরে যে উজ্জ্বল কশা শোভা পাইতেছে, ঐ কশার (The Milky way) নাম অমৃতবর্ষী সোমধারা, তাই অশ্বিদ্বয় মধুমতী কশা দ্বারা যজ্ঞ অভিষিক্ত করেন। (১৪)

আবার মধুস্রাবী রথস্থিত অশ্বিদ্বয়ের পৃষ্ঠোপরে যে সোমধারা বিরাজ করে, ঐ সোমধারা সূর্য্যার (উষার) নাক্ষত্রিক প্রতিমা। এবং ঐ সূর্য্যা অশ্বিদ্বয়ের প্রণয়িনী বলিয়া তাহাদের মধুস্রাবী রথে আরোহণ করেন। যথাঃ—হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের সদা শীঘ্রগামী রথে সূর্য্যা যখন আরোহণ করেন। (১৫)

অশ্বিদ্বয়ের রথ।

ঋগ্বেদের বহুমন্ত্রে অশ্বিদ্বয়ের রথের কথা—আছে।

ঋক্ ১।২২।২

হে অশ্বিদ্বয়! সুরথ রথীতম এবং দ্যুলোক-নিবাসী তাহাদিগকে অহ্বান করি। (১৬)

ঋক্ ১।১৫৭।১

অশ্বিদ্বয় গমনার্থে রথ যোজনা করিলেন। (১৭)

ঋক্ ১।১৫৭।৩

ত্রিচক্রযুক্ত মধুবাহী শীঘ্রগামী অশ্বযুক্ত অশ্বিদ্বয়ের রথ আমাদিগের অভিমুখে আসুক্। (১৮)

ঋক্ ৭।৬৭।৩

হে অশ্বিদ্বয়! পূর্ব্ব পরিচিত পথে স্বর্গগামী প্রভাশালী রথে আগমন কর। (১৯)

ঋক্ ৭।৬৯।৩

হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের রথ তোমাদের পত্নীসহ চলিয়া চক্রদ্বারা স্বর্গের পর্য্যন্ত প্রদেশ—নিপীড়িত করিতেছে। (২০)

ঋক্ ৮।৫।১৯

হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের রথের মধ্যস্থলে যে মধুপূর্ণ মটকী স্থাপিত আছে, তাহা হইতে মধুপান কর। (২১)

ঋক্ ৮।৫।২৮

হে অশ্বিযুগল! যে রথে হিরণ্ময় সারথি-স্থান, হিরণ্ময় প্রগ্রহ এবং যে রথ গগনস্পর্শী, সেই রথে তোমরা চড়। (২২)

ঋক্ ১০।৩৯।১

হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের দ্রুতগামী বিশ্বপরিভ্রমণকারী রথকে সকল উপাসকগণ সকালে ও সন্ধ্যাকালে ডাকিতে থাকে।

---

(১৩) পাশ্চাত্যে Aselli the Asses তারাদ্বয়ের খুব জাগ্রত নাম আছে, কিন্তু তাহাদের কোন কার্য্যকারিতা নাই।

(১৪) যা বাম্ কশা মধুমতী অশ্বিনা-সুনৃতাবতী।
তয়া যজ্ঞম্ মিমিক্ষতম্॥
ঋক্ ১।২২।৩

(১৫) আ যৎ বাম্ সূর্য্যারথং তিষ্ঠৎ রঘুষ্যাদম্ সদা।

(১৬) যা সুরথা রথীতমা উভা দেবা দিবিস্পৃশা অশ্বিনা তা হবামহে।

(১৭) অযুক্তাতাম্ অশ্বিনা যাতবে রথম্...॥

(১৮) অর্বাঙ ত্রিচক্রঃ মধুবাহনঃ রথঃ জীরাশ্বঃ অশ্বিনোঃ যাতু সু-স্তুতঃ।

(১৯) পূর্ব্বীভিঃ যাতম্ পথ্যাভিঃ অর্বাক্ স্বঃ বিদা বসুমতা রথেন॥

(২০) বি বাম্ রথঃ বধ্বা যাদমানঃ অন্তান্ দিবঃ বাধতে বর্ত্তনিভ্যাম্॥

(২১) যঃ হ বাম্ মধুনঃ দৃতিঃ আহিতাঃ রথচর্ষণে।
ততঃ পিবতঃ অশ্বিনা॥

(২২) রথম্ হিরণ্যবন্ধুরম্ হিরণ্যাভী-শুম্ অশ্বিনা।
আহি স্থাথঃ দিবিস্পৃশম্॥

ঋক্ ১০। ৪১। ৮

হে অশ্বিদ্বয়! অতি প্রত্যূষে তোমাদের পূজার্হ জগৎপরিভ্রামক রথকে আমরা স্তব দ্বারা আহ্বান করি।

এই অনুপম তারারথের স্বামী বলিয়া অশ্বিদ্বয় রথীতম উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। (২৩)

এবং রথীতম বলিয়াই অশ্বিদ্বয় পূষন্ উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। (২৪)

তারা মধুচক্র রথের অধিপতি অশ্বিদ্বয়ের রথের মধুকে সঞ্চয় করে।

ঋক্ ১০। ৪০। ৬

মধুমক্ষিকা অশ্বিদ্বয়ের মধু মুখে বহন করে।

অশ্বিদ্বয়ের রাসভদ্বয়।

ঋক্ ১। ৩৪। ৯

হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের ত্রিগুণ রথের ত্রিচক্র কোথা? সেই রথে যোজিত সারথি-স্থানত্রয় কোথা? কখন রাসভ অশ্ব রথে যোজনা করিবে? যে রথে তোমরা যজ্ঞে আসিবে। (২৫)

ঋক্ ১। ১১৬। ২

হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের রাসভ বলবৎ উৎপতন ও শীঘ্রগমন দ্বারা দেবগণের প্ররোচনায়—প্রেরিত হইয়া যমের ধনপূর্ণ বাজিতে সহস্র জয় করিয়াছিল। (২৬)

ঋক্ ১। ১৬২। ২১

হে অশ্বমেধের অশ্ব! তুমি অশ্বিদ্বয়ের রাসভ অশ্বের ধুরে আবদ্ধ হইয়াছ। (২৭)

ঋক্ ৮। ৭৪। ৭

হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের সুদৃঢ় রথে তোমাদের বাহন রাসভ যোজনা কর এবং এখানে আসিয়া সোম পান কর।

অশ্বিদ্বয়ের মধুমতী কশা।

ঋক্ ১। ১৫৭। ৪

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদিগের অন্ন তোয় আনয়ন কর এবং মধুমতী কশা দ্বারা আমাদিগকে অভিষিক্ত কর। (২৮)

অশ্বিদ্বয়ের এই—মধুমতী কশা অথর্ব্ব-বেদে—(৯। ১) মধুকশা নাম ধারণ করিয়াছে। অথর্ব্ববেদ—মতে অশ্বিদ্বয়ের মধুকশা অমৃতের আধার, মরুৎ গণের দুহিতা এবং আদিত্য-গণের মাতা। (২৯)

অশ্বিদ্বয়ের পত্নী সূর্য্যা।

ঋক্ ১। ১১৯। ৫

হে অশ্বিদ্বয়! আজি দানবের পরাজয়। যোষা (সূর্য্যা) তোমাদিগের সখ্য-লাভ-জন্য আসিয়া এই বলিয়া তোমাদিগকে পতিত্বে বরণ করিল যে "তোমরাই আমার পতি হইবে;" (৩০)

---

(২৩) ... দস্রা দংসিষ্ঠা রথ্যা রথীতমা।

(২৪) প্রিয়ে পূষন্ ইব কৃত্বা ইব দেবাঃ নাসত্যা বহতুম্ সূর্য্যায়াঃ।

(২৫) ক্ব ত্রিচক্রা ত্রিবৃতো রথস্য ক্ব ত্রয়ঃ বন্ধুরঃ যে সনীড়াঃ। কদা যোগঃ বাজিনঃ রাসভস্য যেন যজ্ঞম্ নাসত্যা উপযাথঃ॥

(২৬) বীড়ুপৎমভিঃ আশুহেমভিঃ বা দেবানাম্ বা জুতিভিঃ শাশদানা। তৎ রাসভঃ নাসত্যা সহস্রম্ আজা যমস্য প্রধনে জিগায়॥

(২৭) উপ অস্থাৎ বাজী ধুরি রাসভস্য॥

(২৮) আ নঃ ঊর্জম্ বহতম্ অশ্বিনা যুবম্ মধুমত্যা নঃ কশয়া মিমিক্ষতম্।

(২৯) অদিতির (সোমধারা বা আকাশ-গঙ্গার) সন্তানগণ আদিত্য নাম ধারণ করে; সুতরাং মধুকশা অদিতি-দেবীর নামান্তর মাত্র।

তু। অদিতি ও দিতি এবং মধুকশা ও নিকষা।

(৩০) সা বাম্ পতিত্বম্ সখ্যায় জগ্মুষী যোষা অবৃণীত জেন্যা যুবাম্ পতী॥

ঋক্‌ ৪। ৪৩। ৬

হে অশ্বিদ্বয়! সিন্ধু (সোমধারা) তোমাদের অশ্বকে (রাসভদ্বয়কে) সোমরসে অভিষিক্ত করুক্। দীপ্তিদ্বারা আরোচমান পক্ষী—পরিভ্রমণ করুক্। তোমাদের রথ বেগ—চেনা যায়, যে রথের সাহায্যে তোমরা সূর্য্যার পতি হইয়াছিলে। (৩১)

ঋক্‌ ৭। ৬৯। ৩

হে অশ্বিদ্বয়! সূর্য্যাসহ গমামান তোমাদের রথের চক্রযুগল বিমানের পর্য্যন্তযুগল পীড়ন করে। (৩২)

ঋক্‌ ১। ১১৭। ১৩

হে অশ্বিদ্বয়! শ্রীদেবীর (৩৩) সহিত সূর্য্যা তোমাদিগের রথে আরোহণ করিয়াছিলেন। (৩৪)

ঋক্‌ ১। ১১৬। ২৭

হে অশ্বিদ্বয়! আজিতে লক্ষ্য কাষ্ঠ—সর্ব্বাগ্রে শীঘ্র প্রাপণের ন্যায় জয়ন্তী সূর্য্যা তোমাদিগের রথে—আরোহণ করিলেন। দেবগণ মনে মনে জানিলেন যে, অশ্বিদ্বয়—জয়শ্রীর সহিত মিলিত হইলেন। (৩৫)

বেদে— (১। ১৮২। ১) অশ্বিদ্বয় "আকাশ-পুত্র" খ্যাতি ধারণ করে, এই অশ্বিদ্বয়—বিষ্ণু ও সোমতারা বলিয়া বোধ হয়। (৩৬)

অশ্বিদ্বয়—শ্যাম ও শবলতারা।

বেদমতে (১০। ১৪। ১০) যমের চতুরক্ষ কুক্কুরদ্বয়ের নাম শ্যাম ও শবল তারা। (৩৭)

শ্যাম ও শবল অর্থে অহঃ ও রাত্রি। (কাণ্ব ব্রাহ্মণ)

এই শ্যাম ও শবল (অশ্বিদ্বয়) বিচৃত-নক্ষত্রের তারাদ্বয়ে অধিষ্ঠিত আছে। এই অশ্বিদ্বয় আকাশসরস্বতীর বা আকাশ-সিন্ধুর (The Milky way) মধ্যে অবস্থিত, এজন্য উহারা "সিন্ধুমাতরৌ" নাম ধারণ করে, এবং উহাদিগের অদূরে সোম পবমানের (The Milky way) যে হ্রদ বিদ্যমান আছে, ঐ হ্রদের নাম শৈশব হ্রদ। (৩৮)

প্রাচীনকালে সুমেরুবাসী তারাদর্শক দেখিতেন যে, বিষ্ণু ও সোম তারার অদূরে বৃষরাশিস্থিত বৃষরক্ষে (মহাবিষুপ-বিন্দুতে) (৩৯) সূর্য্যাদি গ্রহগণের উদয়

(৩১) ···যেন পতী ভবথঃ সূর্য্যায়াঃ॥

(৩২) বি বাম্ রথঃ বধ্বা যাদমানঃ অন্তান্ দিবঃ বাধতে বর্ত্তনিভ্যাম্॥

(৩৩) স্ত্রীগ্রহ শুক্র।

(৩৪) যুবঃ রথম্ দুহিতা সূর্য্যাস্যসহ-শ্রিয়া নাসত্যা অবৃণীত॥

(৩৫) আ বাম্ রথম্ দুহিতা সূর্য্যাস্য কার্ষ্মেব অতিষ্ঠৎ অর্বতা জয়ন্তী। বিশ্বে দেবাঃ অনু অমন্যন্ত, হৃদ্ভিঃ সম্ শ্রিয়া নাসত্যা সচেথে॥

(৩৬) "দিবঃ নপাতা"।

(৩৭) যোতে শ্বানৌ যম। রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ······
(ঋক্ ১০। ১৪। ১১)

অতিদ্রব সারমেয়ৌ শ্বানৌ চতুরক্ষৌ শবলৌ সাধুনাপথা।
(ঋক্ ১০। ১৪। ১০)

(৩৮) বেদ-মতে (৯। ৩৩ ৫) সোম-পবমান "দিবঃ শিশুঃ" নাম ধারণ করে। এই শিশুর হ্রদ 'শৈশব' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

(৩৯) উক্ষঃ ররুম্। ঋক্ ৮। ৭। ২৬

হইত। এজন্য বৃষরজ্জু 'দ্বারদেবী' নামে বেদে গীত হয়। (৪০)

শ্যাম ও শবল তারাযুগলের অদূরে বৃশ্চিক-রাশিস্থিত ত্রিতের গুহায় (জল-বিষুব বিন্দুতে) সূর্য্যাদি গ্রহগণ অস্তগমন করিত। সায়ংকালে ত্রিতের গুহা (৪১) ঊর্দ্ধানলে (Zodiacal Light) জ্বলন্ত হইত। এই জ্বলন্ত অনলময় গুহায় পতিত হইয়া, সূর্য্যাদি গ্রহগণ ও জ্যোতিষ্কগণ পারাবারের অতল বারিতে বা ঘোর তিমিরে নিমগ্ন হইত, এবং সুদীর্ঘ অস্তের পর দ্বার-দেবীতে তাহারা উপস্থিত হইয়া পুনঃ উদিত হইত ও অতল বারি বা ঘোর তিমির হইতে মুক্ত হইত।

বেদোক্ত জ্যোতিষিক ইতিহ মতে গ্রহগণের ঐ জ্বলন্ত গুহায় অস্তগমনে ও দ্বার-দেবীতে উদয়নে এই যুগল অশ্বিদ্বয় তাহাদিগকে সতত পালন ও রক্ষণ করে।

ঋক্ ৮।৮।২৩

অশ্বিদ্বয়ের স্থানত্রয় গুহার উপরে প্রকাশমান আছে। (৪২)

ঋক্ ১।১১২।৬

হে অশ্বিদ্বয়! অগাধ (পারাবারের) জলে অবসন্ন অন্তককে (৪৩) (মৃত্যুদেব মঙ্গলগ্রহকে) যে পালন দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলে, সেই পালনসহ আমাদিগের নিকটে আইস। (৪৪)

ঋক্ ১ ১১২। ৭

হে অশ্বিদ্বয়! যে পালন দ্বারা অত্রির (৪৫) হিতার্থে তোমরা তপ্ত ঘর্ম্ম আরামময় করিয়াছিলে, সেই পালনসহ তোমরা আমাদিগের নিকটে আইস। (৪৬)

ঋক্ ১। ১১৯। ৬

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অত্রির হিতার্থে পরিতপ্ত ঘর্ম্মে শীত সুক্ষালন করিয়াছিলে। (৪৭)

ঋক্ ১।১৮০।৪

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা শরণাগত অত্রির হিতার্থে পরিতপ্ত ঘর্ম্ম জলস্রোতের ন্যায় মধুময় করিয়াছিলে। (৪৮)

ঋক্ ৫।৭৭।৬

হে অশ্বিদ্বয়! অত্রি হৃষ্টমনে তোমাদিগকে স্মরণ করেন, কারণ সৎস্তুতি-বলে তোমরা ঘর্ম্ম অক্লেশকর করিয়াছিলে। (৪৯)

(৪০) বিশ্রয়ন্তাম্ ঋতবৃধঃ দ্বারঃ দেবী অসশ্চতঃ অথ নূনম্ চ যষ্টবে॥ ঋক্ ১।১৩।৬

(৪১)...গুহা...ত্রিতস্য...। ঋক্ ১০ ২

(৪২) ত্রীণি পদানি অশ্বিনোঃ আবিঃ সন্তি গুহাপরঃ

(৪৩) অন্তকঃ যমঃ চৈব সর্ব্বরোগাপহারকঃ। ইতি পাদ্মে

(৪৪) যাভিঃ অন্তকম্ জসমানম্ আরণে।...তাভিঃ উসুউতিভিঃ অশ্বিনা আগতম্।

(৪৫) অত্রি বা অত্রিসন্তান চন্দ্রমা। এবং উক্তঃ, তদা অত্রিঃ বৈতমোনুৎ অভবৎ শশী। মহা ১৩।১৫৬

ভৃ। ভৃগুপুত্র শুক্রকে ভৃগু বলা হয়।

(৪৬) যাভিঃ...তপ্তম্ ঘর্ম্মম্ ওম্যাবন্তম্। অত্রয়ে।

...তাভিঃউসু উতিভিঃ অশ্বিনা আগতম্॥

(৪৭) যুবম্...হিমেন ঘর্ম্মম্ পরিতপ্তম্ অত্রয়ে।

(৪৮) যুবম্ ঘর্ম্মম্ মধুমন্তম্ অত্রয়ে অপঃ ন ক্ষোদঃ অবৃণীত এষে।

(৪৯) যুবঃ অত্রি চিকেততি নরা সুম্নেন চেতসা ঘর্ম্মম্ যৎসাম্ অরেপসম্ নাসত্যা ভুরণ্যতি।

ঋক্ ১।১১২।৫

হে অশ্বিদ্বয়! অত্রিকে অগ্নি ও অন্ধকার হইতে ত্রাণ করিয়াছিলে। (৫০)

ঋক্ ১০।১১৭।৩

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা পাঞ্চজন্য ঋষি অত্রিকে সদলবলে পাপময় ঋবীস হইতে রক্ষা করিয়াছিলে। এবং তদর্থে অমঙ্গলময় দস্যুর (দৈত্যদের) মায়া আনুপূর্ব্বিক নিবারণ করিয়াছিলে। (৫১)

ঋক্ ১।১১৬।৮

হে অশ্বিদ্বয়! হিমদ্বারা জ্বলন্ত অগ্নি নিবারণ করিলে, পুষ্টিকর খাদ্য তাহাকে দিলে এবং ঋবীসে পতিত অত্রিকে সদলবলে রক্ষা করিলে। (৫২)

ঋক্ ৫।৭৮।৪

হে অশ্বিদ্বয়! ঋবীসে পতনশীল অত্রি, বিপন্না নারীর ন্যায় যখন তোমাদের স্তব করিল, তখন তোমরা মঙ্গলময় নবীন শ্যেনবেগে উপস্থিত হইলে। (৫৩)

ঋক্ ১০।৩৯।৯

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সপ্তবধ্রি অত্রির জন্য তপ্ত ঋবীস ওমবত্ত করিয়াছিলে। (৫৪)

সায়নাচার্য্য বলেন—

অন্তক অর্থে শত্রুগণের অন্তকর এতন্নামক রাজর্ষি-বিশেষ, (৫৫) এবং অত্রি অর্থে—মহর্ষি বিশেষ ও ঘর্ম্ম এবং ঋবীস অর্থে দীপ্ত তুষাগ্নি।

পাশ্চাত্য ভাষ্যকারগণের মতে অন্তক অর্থে মৃত্যুদেব, অত্রি অর্থে—ঋষিবিশেষ এবং ঘর্ম্ম ও ঋবীস অর্থে গর্ত্ত।

ডাক্তার কুহন্ ও অধ্যাপক মুলার সাহেবের মতানুবর্ত্তী হইয়া অধ্যাপক বেন্‌ফী বলেন যে, অশ্বিদ্বয়ের এই সকল দুঃখমোচনের ব্যাপার তাহাদিগের সংসৃষ্ট নৈসর্গিক ঘটনা মাত্র।

কিন্তু ডাক্তার মুইর্ বলেন—এই সকল ব্যাপারের অর্থবাদ ব্যাখ্যা করা ঠিক্ নহে; কারণ ঘটনাগুলি নানা নামে ও নানা রূপে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং ইহাই সম্ভাপর যে, বেদমন্ত্রে অশ্বিদ্বয়ের কৃত মানবের দুঃখ-মোচনের কতকগুলি পৌরাণিকী কথার উল্লেখ আছে। (৫৬)

---

(৫০) নিঃ অংহসঃ তমসঃ স্পর্তম্ অত্রিম্... ॥

(৫১) ঋষিম্ নরৌ অংহসঃ পাঞ্চজন্যম্ ঋবীসাৎ অত্রিম্ মুঞ্চথঃ গণেন।
মিনন্তা দস্যোঃ অশিবস্য মায়া অনুপূর্ব্বম্ বৃষণা চোদয়ন্তা ॥

(৫২) হিমেন অগ্নিম্ ঘ্রংসম্ অবারয়েথাম্ পিতুমতীম্ ঊর্জম্ অস্মৈ অধত্তম্
ঋবীসে অত্রিম্ অশ্বিনৌ অবনীতম্ উৎ নিন্যথুঃ সর্ব্বগণম্ স্বস্তি ॥

(৫৩) অত্রিঃ যৎ বাম্ অবরোহন্ ঋবীসম্ অজোহবীৎ নাধমানা ইব যোষা।
শ্যেনস্য চিৎ জবসা নূতনেন আ অগচ্ছতম্ অশ্বিনা শন্তমেন ॥

(৫৪) যুবম্ ঋবীসম্ উত তপ্তম্ অত্রয়ে ওমন্বন্তম্ চক্রথুঃ সপ্তবধ্রয়ে।

(৫৫) "শত্রূনাম্ অন্তকরম্ এতৎসংজ্ঞকম্ রাজর্ষিম্ ॥

(৫৬) The deliverances of Rebha Vandana and others are explained by Professor Benfey (following Dr. Kuhn and Professor Muller)...as referring to certain physical phenomena with which

বিচক্ষণ পাঠক, বিচার করিয়া দেখিবেন যে, বেদোক্ত এই সকল ব্যাপার আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। নিরুক্তকারগণ অশ্বিদ্বয়ের যে ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে, এই সকল ব্যাপার আধিভৌতিক বলিয়া কোনও ক্রমেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না, এবং এই সকল ব্যাপার আধিদৈবিক বলিয়া গ্রহণ করিলে অর্থবাদ ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না।

মূলে অত্র ত্রিভুবনের অন্তর্গত সোম-পবমান (The Milky way (৫৭) হইতেছে এবং শশী (চন্দ্রমা) সোম পবমানের ক্ষুদ্রনাক্ষত্রিক প্রতিমা হইতেছে। (৫৮)

the Asvins are supposed by these scholars to be connected. But this alligorical method of interpretation seems unlikely to be correct, as it is difficult to suppose that the phenomena inguistion should have been alluded under such a variety of names and circumstances. It appears therefore to be more probable that the Rishis merely refer to certain Legends which were popularly current.

(৫৭) অয়ম্ বিশ্বানি তিষ্ঠতি পুনানঃ ভুবনা উপরি।
সোমঃ দেবঃ ন সূর্য্যঃ॥
ঋক্ ৯। ৫৪। ৩

(৫৮) কথম্ রক্ষামি ভবতঃ, তে শরণম্ …… চন্দ্রমা ভব।
এবং উক্তঃ তদা অত্রেঃ বৈ তমোঘ্নং অভবৎ শশী॥
মহা ১৩। ১৫৬। ১৮

প্রাচীনকালে সোম-পবমানের পূর্ব্বশাখা মধ্যে অশ্রুবিন্দু অবস্থিত ছিল। ঐতিহিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, অত্রি ঘর্ম্ম বা পারীষ মধ্যে পতিত হইয়াছিল।

অমাতিথিতে চন্দ্রমা এই ঘর্ম্মে বা পারীষে সূর্য্যের সহিত পতিত হয় এবং শুক্লপ্রতিপৎ তিথিতে চন্দ্র এই ঘর্ম্ম বা পারীষ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না বলিয়া অদৃশ্য থাকে।

তারাদর্শক।

দর্শনচ্ছায়া

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

শি। যাক, দিক্ সম্বন্ধে মোটামুটি একটু জ্ঞান হইলে, এখন আত্মা দ্রব্য কি, তাহাই জানিবার জন্য ইচ্ছা বলবতী।

উ। বেশ! মৃত্তিকা, জল, বায়ু, তেজঃ এবং আকাশ এই পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমবায়ে একটি মূর্ত্তি প্রস্তুত করিলে এবং তাহাতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চবিধ জ্ঞানসাধনীভূত ইন্দ্রিয়মণ্ডলও যথাস্থানে ন্যস্ত করিলে, এখন উহা দেখিতে ঠিক মনুষ্যাকৃতি প্রাপ্ত হইল। বাহিরে জড়-জগতের দ্বারও অবশ্য নির্ব্বিশেষে ঐ মূর্ত্তির সম্মুখে উন্মুক্ত

তু। বেদমতে (৯। ৪২। ৪) সোম-পবমান দেবের অশ্রুবিন্দু সকল হইতে দেবগণের উদ্ভব হইয়াছিল "ক্রন্দন দেবান্ অজীজনৎ" পুরাণমতে অত্রির (সোম-পবমানের) অশ্রুবিন্দু হইতে চন্দ্রের জন্ম হয়।

মহাভারত এক সোপান বেশী উঠিলেন।

রহিয়াছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা এই যে, ঐ মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট মূর্ত্তি কি বাহিরের বিষয়াদি-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ? কখনই নহে। ইহাতেই বুঝা গেল যে, বিষয়াদি-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে এই ভৌতিক শরীর এবং ইন্দ্রিয়মণ্ডলাতিরিক্ত আরও কাহারও আবশ্যক। এখন এই 'আরও কেহ' কে হইবে? পৃথিব্যাদি ভূতপঞ্চক কিম্বা ইন্দ্রিয়মণ্ডলের কেহ যে সে 'কেহ' নহে, ইহা ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে। কাল কিম্বা দিক্ ও ইহা হইতে পারেনা, যেহেতু তাহাদের সংযোগ ত সাধারণতঃ সর্ব্বমূর্ত্তেই সদা বিদ্যমান; তোমাতেও যেইরূপ, ঐ গঠিত মূর্ত্তিতেও ঠিক্ তদ্রূপ। এখন এই সাধারণ-সংযোগ থাকা সত্ত্বেও যখন দেখিতেছি কোন অবয়বে সেই বিষয় সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান বিকাশ পাইতেছে, আর কোন অবয়বে অর্থাৎ ঐ মূর্ত্তিতে তাহা বিকাশ পাইতেছে না, তখন এই জ্ঞানের আশ্রয় যে ঐ দ্রব্যদ্বয়ের মধ্যে কেহই নহে ইহ স্থির। তাহা হইলেই দেখিলে, নয়টি দ্রব্যের মধ্যে উল্লিখিত সাতটির কেহই উহা নহে! এখন বাকি কেবল দুটি যথা মন এবং আত্মা। মনও ঐ জ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেনা; কেননা মন যখন ইন্দ্রিয় নিচয়ে গ্রথিত, তখন মন ও ইন্দ্রিয়ে প্রভেদ কি? অতএব মনকেও ইন্দ্রিয়বিশেষ বলিতে হইবে। ইন্দ্রিয় লইয়াই আবার দেহ, দেহ জড় সুতরাং মনও জড়। আর ব্যবহার-স্থলেও এই মনোবৃত্তির যে স্বাধীনতা আছে এরূপ বোধ হয়না বরং ইহার বিপরীতই বোধ হয়। দেখ, যখন তুমি কোন দূরগত চিন্তায় নিবিষ্ট, অর্থাৎ তোমার মন (কাহারও প্রেরণায়) দূরগত কোন বিষয়-বিশেষ গ্রহণে নিয়োজিত, তখন তোমার ইন্দ্রিয় সমক্ষে কোন অসাময়িক ব্যাপার সংঘটন হইলেও তাহা তোমার প্রত্যক্ষগোচর হয় না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, তখন তোমার মননশক্তি কোন দূরস্থ বিষয় বিশেষে ঘনীভূত হইয়া অবস্থান করিতেছে! কিন্তু ক্রিয়ী যে তুমি প্রেরক অর্থাৎ 'আমি'—সে পূর্ব্বেও যেখানে, এখনও সেইখানে অবস্থান করিতেছে। ইহাতে মানসিক বৃত্তির স্বাবলম্বন ভাব কোথায় রহিল? অতএব যখন প্রতিপন্ন হইল যে মনের স্বাবলম্বন ভাব নাই, তখন বিষয়-সাক্ষাৎকার রূপ জ্ঞানের আশ্রয়, ইহা হইবে কিরূপে? আবারও দেখ, একই স্থানে তুমি ও আমি উভয়ই বর্ত্তমান; তুমি শুনিতেছ কোকিলের কূজন, আর আমি দেখিতেছি জীর্ণ পিঞ্জর হইতে পক্ষীর পলায়ন। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সেই সাক্ষাৎকার-রূপ জ্ঞানের গ্রহণ স্ব স্ব অর্থাৎ সেই 'আমির' অভিমত বিষয় সম্বন্ধে নিষ্পন্ন হইতেছে, মন কেবল আজ্ঞানুবর্ত্তী ভৃত্যবৎ করণস্থানীয় মাত্র। এরূপ স্থলে এই বস্তু-গ্রহণ কার্য্যের স্বাধীনবৃত্তিত্ব বলিবে কাহার, মনের না সেই 'আমি'র? এই 'আমি'ই নিখিল জীবের অন্তরে সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া এই জাগতিক ভোগ্যবস্তু পরম্পরা উপভোগ করিতেছেন। কর্ত্তৃ ও ভোক্তৃস্থানীয় এই 'আমি'কেই আপাততঃ তুমি 'আত্মা' বলিয়া জানিবে এখন, বোধ করি, একটু আভাস পাইলে আত্মা দ্রব্য কি?

প্র। হঁা! আভাসে বুঝিলাম বিষয়-গ্রহণরূপ জ্ঞানের আশ্রয় তিনিই, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের কি তবে কিছুই ব্যবহার নাই?

উ। আছে বৈকি, বিনা অভিপ্রায়ে অখণ্ডের কোন বস্তু সৃষ্ট হয় নাই; কেননা, পরে জানিবে, এই নিখিল সংসার সমস্তই ইন্দ্রিয়-গঠিত বাসনানুযায়ী ভাবনায় প্রতিবিম্ব মাত্র। ইতিপূর্ব্বেই আভাস পাইয়াছ ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ যাহা দ্বারা ইন্দ্র—শিবদৃষ্টি সাধিত হয়) জ্ঞান সাধনীভূত করণ মাত্র। মনে কর তোমার আকাশ ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা হইল, তখন তুমি কি করিবে? তখন অবশ্য তোমার ব্যোমযান চালক ভৃত্যের উপর প্রথমতঃ আদেশ প্রদান করিতে হইবে এবং সে ঐ যন্ত্রারূঢ় হইয়া চালন কার্য্যে তৎপর হইলে, তবে তোমার সেই ভ্রমণ ইচ্ছা সম্পন্ন হইবে, নতুবা নয়। পৃথিবী ভ্রমণরূপ কক্ষপথেও সেইরূপ তোমার শকট চালক ভৃত্য মন এবং ঐ শকট (দেহ) যুগপৎ উভয়েরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। এখন দেখ দেখি, এই ভ্রমণরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তা কে, আর কাহার সাহায্যেই বা কর্ত্তার সেই ইচ্ছা সম্পন্ন হইতেছে? সেইরূপ এই বিষয়-সাক্ষাৎকার রূপ জ্ঞান-গ্রহণের পূর্ব্বে অবশ্য ঐ ইচ্ছা কনৈক গ্রাহককে আরোপিত রাখিতে হইবে। তৎপরে ঐ ইচ্ছার বেগ সন্নিকর্ষ বশতঃ ভৃত্যস্থানীয় মনের নিকট পৌঁছিবামাত্র মন স্পন্দিত হইয়া ইন্দ্রিয়-যন্ত্রে আরোহণ করতঃ স্বকীয় দেহফলকে ইচ্ছানুরূপ, ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিস্তারের ন্যায় বিষয়ের প্রতিবিম্ব সৃজন করিলে অর্থাৎ মন সেই কাল্পনিক বিষয়ে ঘনীভূত হইয়া তদাকারে পরিণত হইলে, তখন সেই গ্রাহক ঐ বিষয়-সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান গ্রহণ করিয়া থাকেন। দর্শন স্পর্শনাদি যাবতীয় ক্রিয়া এইরূপ ইন্দ্রিয় ও মন গুণীভূত হইয়া সর্ব্বদা সম্পাদন করিতেছে; কিন্তু কখনই তাহারা সেই ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া ইহা সম্পাদন করিতে সক্ষম নয়। এখন দেখ, এই ইন্দ্রিয় কি কেবল তোমার সেই যন্ত্রস্থানীয় মাত্র হইতেছে না?

প্র। আভাস পাইলাম, ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার কি; কিন্তু জ্ঞান যে কেবল আত্মারই গুণ, মনের নহে, ইহার প্রমাণ কি?

উ। আচ্ছা, মনে কর, তুমি প্রযত্ন সহকারে বিদ্যাভ্যাস করিতেছ; এখন এই বিদ্যাভ্যাসরূপ অনুষ্ঠানের গুণভাগী হইবে কে, তুমি না আমি? অবশ্য তুমিই হইবে, কেননা ঐ গুণের মূলীভূত কারণ প্রযত্ন তোমার। আর লোকতঃ ও দেখা যাইতেছে যে তুমি বিদ্বান্, তোমার মতি অতি নির্ম্মলা, তুমি সত্যবাদী এবং সমদর্শী। আরও দেখিতেছি, জীবের একমাত্র সুহৃদ্ জ্ঞান এবং ভক্তি—হরগৌরীর ন্যায় তোমাতে শোভা পাইতেছে। এখন এই যে বিশুদ্ধ গুণাবলী, ইহা তোমার প্রযত্ন ছিল বলিয়াই প্রাপ্ত হইয়াছ বলিতে হইবে। তাহা হইলেই দেখিলে গুণ প্রযত্ন সাপেক্ষ, অর্থাৎ যাহাতে প্রযত্ন বিদ্যমান, গুণ তাহারই লব্ধ হয়, অন্যের হয় না। জ্ঞানও গুণবিশেষ, সুতরাং জ্ঞানও প্রযত্ন সাপেক্ষ। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে যে, মন ইন্দ্রিয়বিশেষ, অর্থাৎ জড়-বস্তু, সুতরাং প্রযত্ন অর্থাৎ উদ্দেশ্য মূলীভূত অনুষ্ঠানের স্বতঃপ্রবৃত্তি উহাতে আরোপ করিবে কিরূপে? অতএব জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে জড়ভাবাপন্ন এই মনের গুণ কিছুতেই হইতে পারেনা, তবে এই আত্ম প্রযত্ন-সংযোগ বশতঃই অয়স্কান্ত মণি সংযোগে লৌহের

স্নায়ু তদন্তর্গত বস্তুর আকারে স্ফুরিত হইয়া, মন, কার্যকরী অবস্থা প্রাপ্ত হয় মাত্র।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নীতি-সার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

তপঃ স্ত্রীকৃষিসেবাস্বুপভোগো নাপি ভক্ষণে।
হিতঃ প্রতিনিধির্ণিত্যং কার্য্যেঽন্যেষু তং নিযো-
জয়েৎ॥ ২৫২

নির্জ্জনত্বং মধুরভুগ জারশ্চোরঃ সদেচ্ছতি।
সাহায্যন্তু বলিষ্ঠো সেব্যা ধনিকমিত্রতাম্॥ ২৫৩

কুনৃপশ্চ ছলং নিত্যং স্বামিদ্রব্যং কুসেবকঃ।
তপস্তু জ্ঞানবান্ দম্ভং তপোঽগ্নিং দেবজীবকঃ॥ ২৫৪

যোগ্যা কান্তং চ কুলটা জারং বৈদ্যং চ ব্যাধিতঃ।
সুতপণ্যো মহার্ঘত্বং দাতাথিস্তু যাচকঃ।
রক্ষিতারং মৃগয়ন্তে ভীতশ্ছিদ্রন্তু দুর্জ্জনঃ॥ ২৫৫

চণ্ডায়তে বিবদতে স্বপিত্যশ্নাতি মাদকং।
করোতি নিষ্ফলং কর্ম্ম মূর্খো বা স্বেষ্টনাশকম্॥ ২৫৬

তমোগুণাধিকং ক্ষাত্রং ব্রাহ্মং সত্ত্বগুণাধিকম্।
অন্যদ্রজোধিকং তেজস্তেষু সত্ত্বাধিকং বরম্॥ ২৫৭

সর্ব্বাধিকো ব্রাহ্মণস্তু জায়তে হি স্বকর্ম্মণা।
তত্তেজসোঽণুতেজাংসি সন্তি চ ক্ষত্রিয়াদিষু॥ ২৫৮

স্বধর্ম্মস্থং ব্রাহ্মণং হি দৃষ্ট্বা বিভ্যতি চেতরে।
ক্ষত্রিয়াদ্যা নান্যথা স্বং ধর্ম্মঞ্চাতঃ সমাচরেৎ॥ ২৫৯

তপস্যা, স্ত্রী, কৃষিকার্য্য ও সেবা এই সকল কার্য্যের উপভোগ ও ভক্ষণ বিষয়ে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া করিবেনা, কিন্তু অন্যান্য কার্য্য প্রতিনিধি দ্বারা করাইতে পারা যায়। ২৫২

মিষ্টান্নভোজী, পরস্ত্রী-কামুক, ও চোর সর্ব্বদা নির্জ্জনত্ব অন্বেষণ করে; প্রবল শত্রু সাহায্য ও বেশ্যা ধনশালী ব্যক্তির সহিত মিত্রতা ইচ্ছা করে। ২৫৩

দুঃশীল রাজা ছলনা, কুভৃত্য নিত্য প্রভুর দ্রব্য, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি তপ ও দেব-সেবক দম্ভ, তপ ও অগ্নি ইচ্ছা করে। ২৫৪

সমর্থা কুলবধূ পতি, কুলটা জার, পীড়িত ব্যক্তি বৈদ্য, পণ্যবিক্রয়ী মহামূল্যতা, যাচক দাতা, ভীতব্যক্তি রক্ষক ও দুর্জ্জন ব্যক্তি ছিদ্র অন্বেষণ করে। ২৫৫

মূর্খব্যক্তি কলহ আচরণ করে, বিবাদ করে, নিদ্রা যায়, মাদক দ্রব্য ভোজন করে, নিষ্ফল কর্ম্ম করে কিম্বা নিজের অমঙ্গল-জনক কার্য্য করে। ২৫৬

ক্ষত্রিয় সম্বন্ধীয় তেজে তমোগুণাধিক্য, ব্রাহ্মণে সত্ত্বগুণাধিক্য অন্য বৈশ্যাদিতে রজোগুণাধিক্য; এ সকল মধ্যে সত্ত্বাদিগুণ প্রধান। ২৫৭

ব্রাহ্মণ স্বকর্ম্মদ্বারা অর্থাৎ অধ্যাপনাদি ষট্ কর্ম্মের দ্বারা সর্ব্ববর্ণ-শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন, ক্ষত্রিয়াদিতে সেই ব্রাহ্মণের তেজের অণু-পরিমাণ থাকে। ২৫৮

স্বধর্ম্মস্থ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া অন্যান্য বর্ণ ভীত হইয়া থাকেন, কিন্তু স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে তাঁহারা ভীত হন না, তজ্জন্য ব্রাহ্মণের স্বধর্ম আচরণ করা কর্ত্তব্য। ২৫৯

নগ্যাৎ স্বধর্ম্মাগনিস্তু যয়া বৃত্ত্যা চ সা বরা।
সদেশঃ প্রবরো যত্র কুটুম্বপরিপোষণম্ ॥ ২৬০
কৃষিস্তু চোত্তমা বৃত্তির্যা সরিন্মাতৃকা মতা।
মধ্যমা বৈশ্যবৃত্তিশ্চ শূদ্রবৃত্তিস্তু চাধমা ॥ ২৬১
যাচ্ঞাধমতরা বৃত্তির্যুত্তমা সা তপস্বিষু।
ক্বচিৎ সেবোত্তমা বৃত্তিঃ ধর্ম্মশীলনৃপস্য চ ॥ ২৬২
রাজসেবাং বিনাদ্রব্যং বিপুলং নৈব জায়তে।
রাজসেবাতিগহনা বুদ্ধিমদ্ভির্বিনা ন সা।
কর্ত্তুং শক্যা চেতরেণ হ্যসিধারেব সা সদা ॥ ২৬৩
আদৌ বরং নির্দ্ধনত্বং ধনিকত্বমনন্তরম্
তথাদৌ পাদগমনং যানগত্বমনন্তরম্।
সুখায় কল্পতে নিত্যং দুঃখায় বিপরীতকম্ ॥ ২৬৪

যে বৃত্তি দ্বারা নিজের ধর্ম্মহানি না হয়, সেইরূপ জীবিকা শ্রেষ্ঠ, যে দেশে লোকে পোষ্যবর্গকে প্রতিপালন করে, সেই দেশ শ্রেষ্ঠ। ২৬০

যে কৃষি নদীমাতৃক উহা উত্তম কৃষি-বৃত্তি। বৈশ্যবৃত্তি মধ্যম ও শূদ্রবৃত্তি অর্থাৎ সেবাবৃত্তি অধম। ২৬১

ভিক্ষা অধমবৃত্তি কিন্তু উহা তপস্বীর নিকট হইলে উত্তম; কোথাও ধর্ম্মশীল রাজার সেবাবৃত্তি উত্তম। ২৬২

রাজসেবা বিনা বিপুল ধন হয় না, কিন্তু সেই রাজসেবা দুঃসম্পাদনীয়া অর্থাৎ সুচতুর ভিন্ন তাহা করিতে সক্ষম হয় না; অজ্ঞব্যক্তির নিকট অসিধারার ন্যায় উহা অত্যন্ত ভয়ানক। ২৬৩

প্রথমে নির্দ্ধন ও পরে ধনী হওয়া ভাল; প্রথমে পায়ে চলিয়া পরে যানাদি দ্বারা গমন ভাল, তাহা হইলে সুখকর হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার বিপরীত হইলে দুঃখজনক হইয়া থাকে। ২৬৪

বরং হি ত্বনপত্যত্বং মৃতাপত্যত্বতঃ সদা।
দুষ্টযানাৎ পাদগমো হৌদাসীন্যং বিরোধতঃ ॥ ২৬৫
বরং দেশাচ্ছাদনতশ্চর্ম্মণা পাদগূহনম্।
অজ্ঞানবল-দৌর্বিদগ্ধ্যাদজ্ঞতা প্রবরা মতা ॥ ৬৬
পরগৃহনিবাসাদ্ধ্যরণ্যে নিবসনং বরম্।
প্রদুষ্টভার্য্যা-গার্হস্থ্যাদ্ভৈক্ষ্যং বা মরণং বরম্ ॥ ২৬৭
খমৈথুনমৃণং গর্ভাধানং স্বামিত্বমেব চ।
খলসখ্যমপথ্যন্তু প্রাক্ সুখং দুঃখনির্গমম্ ॥ ২৬৮
কুমন্ত্রিভির্নৃপো রোগী কুবৈদ্যৈঃ কুনৃপৈঃ প্রজা
কুসন্তত্যা কুলং চাত্মা কুবুদ্ধ্যা হীয়তেহনিশম্ ॥ ২৬৯

মৃতপুত্র হইতে পুত্র না হওয়া ভাল, অশ্বাদি দুষ্টযান অপেক্ষা পদদ্বারা চলিয়া যাওয়া ভাল; বিরোধ অপেক্ষা ঔদাসীন্য শ্রেষ্ঠ; সমুদায় দেশ আচ্ছাদন অপেক্ষা, চর্ম্মদ্বারা পদদ্বয়কে আবরণ করা ভাল; অল্পজ্ঞান-চাতুর্য্য অপেক্ষা মূর্খতা ভাল, পরগৃহে বাস অপেক্ষা অরণ্যে বাস শ্রেষ্ঠ; দুষ্টা ভার্য্যার সহিত গৃহস্থধর্ম্ম অপেক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি বা মরণ ভাল। ২৬৫। ২৬৬। ২৬৭

কুক্কুরের মৈথুন, ঋণ, গর্ভাধান, গৃহস্বামিত্ব, খলের সহিত সখ্য ও কুপথ্য এই কার্য্য-গুলি প্রথমে সুখকর, কিন্তু পরিণামে দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। ২৬৮

কুমন্ত্রী দ্বারা রাজা, কুবৈদ্য দ্বারা রোগী, দুশ্চরিত্র রাজার দ্বারা প্রজা, কুপুত্র দ্বারা কুল ও দুর্ব্বুদ্ধি দ্বারা আত্মা সর্ব্বদা হীন হইতে থাকে। ২৬৯

স্যাজ্জয়োঽবসরোক্ত্যা সদ্বসনৈঃ সুপ্রসিদ্ধতা।
সভায়াং বিদ্যয়া মানস্ত্রিতয়ং ত্বধিকারতঃ॥ ২৭০

সুভার্য্যা শস্তুতাপত্যং সুবিদ্যা সুধনং সুহৃৎ
সুদাসদাস্যৌ সদ্দেহঃ সদ্বেশ্ম সুনৃপঃ সদা
গৃহিণাং হি সুখায়ালং দশৈতানি নচান্যথা। ২৭১

কালংনিয়ম্য কার্য্যাণিহ্যাচরেন্নান্যথা ক্বচিৎ।
গবাদিষ্বাত্মবজ্জ্ঞানমাত্মানং চার্থধর্ম্ময়োঃ।
নিযুঞ্জীতান্নসংসিদ্ধৌ মাতরং শিক্ষণে গুরুম্। ২৭২
গচ্ছেদনিয়মেনৈব সদৈবান্তঃ পুরং নরঃ॥ ২৭৩

ভার্য্যানপত্যা সদ্যানং ভারবাহী সুরক্ষকঃ।
পরদুঃখহরা বিদ্যা সেবকশ্চ নিরালসঃ।
যড়েতানি সুখায়ালং প্রবাসেতু নৃণাং সদা॥ ২৭৪

মার্গং নিরুধ্য ন স্থেয়ং সমর্থেনাপি কর্হিচিৎ।
সদ্যানেনাপি গচ্ছেন্ন হট্টমার্গে নৃপোঽপিচ॥ ২৭৫

সসহায়ঃ সদাচ স্যাদধ্বগো নান্যথা ক্বচিৎ।
সমীপসন্মার্গ-জলাভয় গ্রামেঽধ্বগোবসেৎ॥
অতাদৃশে ন বিরমেন্ন মার্গে বিপিনেঽপি॥ ২৭৭

অত্যাটনং চানশনমতিমৈথুনমেবচ।
অত্যায়াসশ্চ সর্ব্বেষাং দ্রাগ্জরাকারণং মহৎ॥ ২৭৮

অত্যায়াসোহি বিদ্যাসু জরাকারী কলাসুচ॥ ২৭৯

দুর্গুণং তু গুণীকৃত্য কীর্ত্তয়েৎ সপ্রিয়োভবেৎ।
গুণাধিক্যং কীর্ত্তয়তি যঃ কিং স্যান্নপুনঃ সখা। ২৮০

সময়ে কথা কহিলে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে; উত্তম বস্ত্র দ্বারা সুখ্যাতি লাভ করা যায়; সভামধ্যে বিদ্যাদ্বারা সম্মান হইয়া থাকে, কিন্তু কর্ত্তৃত্ব থাকিলে এই তিনটিই হইয়া থাকে। ২৭০

গুণবতী ভার্য্যা, গুণবান্ পুত্র, সুবিদ্যা, উত্তম ধন, সুহৃৎ, উত্তম দাস-দাসী, নিরোগ দেহ, উত্তম গৃহ, সুবিচারক রাজা—এই দশটি গৃহিদিগের সুখের আকর হইয়া থাকে; তাহা না হইলে দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। ২৭১

কালের নিয়ম করিয়া কার্য্য করিবে কিন্তু সময়ের অনিয়মে কোন কার্য্য করিবেনা; গবাদিকে আপনার ন্যায় জ্ঞান করিবে; ধর্ম্ম ও অর্থ জন্য আপনাকে, ভোজন-কার্য্য-সম্পাদন জন্য মাতাকে ও শিক্ষাজন্য গুরুকে নিযুক্ত করিবে। সর্ব্বদা অনিয়মে অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিবে ২৭২। ২৭৩

অনপত্যা ভার্য্যা, উত্তম বাহন, ভারবাহী রক্ষক, অন্যের দুঃখহারিণী বিদ্যা, আলস্য-শূন্য সেবক এই ছয়টি প্রবাসে মনুষ্যগণের সর্ব্বদা সুখের কারণ হইয়া থাকে। ২৭৪

ক্ষমতা থাকিলেও কখনও পথরোধ করিয়া থাকিবে না; নৃপতিও হট্টমার্গে উত্তম যান-দ্বারা যাইবেন না। ২৭৫

পথিক সর্ব্বদা সসহায় হইয়া যাইবে, কখন ও সহায়হীন হইয়া যাইবে না। পথিক উত্তম পথ ও জলের সন্নিহিত হইয়া ভয়শূন্য গ্রামে বাস করিবে, অতাদৃশ পথে এমন কি বিপিনেও বাস করিবে না। ২৭৬। ২৭৭

অত্যন্ত ভ্রমণ, অনাহার, অত্যন্ত মৈথুন ও অত্যন্ত পরিশ্রম সমুদায় লোকের শীঘ্র অত্যন্ত জরার কারণ হইয়া থাকে। ২৭৮ সমুদায় বিদ্যার মধ্যে শিল্প বিদ্যায় অত্যন্ত পরিশ্রম জরার কারণ হইয়া থাকে। ২৭৯

যে ব্যক্তি লোকের দোষ-সমুদয়কে গুণ বলিয়া বর্ণনা করেন, তিনি লোকের প্রিয় হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কেবল গুণ সমুদয়ই বর্ণনা করেন, তিনি কি সখা নহেন? ২৮০

দুর্গুণং বক্তি সত্যেন প্রিয়োঽপি সোঽপ্রিয়ো ভবেৎ
গুণংহি দুর্গুণীকৃত্য বক্তি যঃ স্যাৎ কথংপ্রিয়ঃ। ২৮১
স্তুত্যা বশং যান্তি দেবাহাশুনা কিং পুনর্নরাঃ।
প্রত্যক্ষং দুর্গুণান্ নৈব বক্তুং শক্নোতি কোঽপ্যতঃ॥ ২৮২
স্বদুর্গুণান্ স্বয়ং চাতো বিমৃশেল্লোকশাস্ত্রতঃ॥ ২৮৩
স্বদুর্গুণশ্রবণতো যস্তুষ্যতি ন ক্রুধ্যতি।
স্বদোষস্য প্রবিজ্ঞানে যতন্তে ত্যজতি শ্রুতে।
স্বগুণশ্রবণান্নিত্যং সমস্তিষ্ঠতি নাধিকঃ। ২৮৪
দুর্গুণানাং খনিরহং গুণাধানং কথং ময়ি।
ময্যেব চাজ্ঞতাপ্যস্তি মন্যতে সোঽধিকোঽখিলাৎ॥
সসাধুস্তস্য দেবাহি কলালেশং লভন্তি ন॥ ২৮৫
সদাল্পমপ্যুপকৃতং মহৎ সাধুষু জায়তে।
মন্যতে সর্ষপাদল্পং মহচ্চোপকৃতং খলঃ॥ ২৮৬
ক্ষমিণং বলিনং সাধু মন্যতে দুর্জ্জনোঽন্যথা।
দুরুক্তমপ্যতঃ সাধোঃ ক্ষময়েদ্ দুর্জ্জনস্য ন॥ ২৮৭
তথান ক্রীড়য়েৎ কৈশ্চিৎ কলহায় ভবেৎ যথা।
বিনোদেঽপি বদেন্নৈবং তে ভার্য্যা কুলটাস্তি-কিম্॥ ২৮৮
অপশব্দাশ্চ নো বাচ্যা মিত্রভাবাচ্চ কেষ্বপি।
গোপ্যং ন গোপয়ন্মিত্রে তদ্‌গোপ্যং ন প্রকাশয়েৎ॥ ২৮৯
বৈরীভূতোঽপি পশ্চাৎ প্রাক্‌কথিতং বাপি সর্ব্বদা।
বিজ্ঞাতমপি যদ্ দৌর্গ্যং দর্শয়েৎ তন্ন কর্হিচিৎ॥ ২৯০।

যে ব্যক্তি যাথার্থ দোষ বর্ণনা করেন, তিনি প্রিয় হইলেও অপ্রিয় হন, যে ব্যক্তি গুণকে দোষ বলিয়া বর্ণনা করেন, তিনি কি প্রকারে প্রিয় হইবেন? ২৮১

দেবতা-সকলও স্তবদ্বারা শীঘ্র বশীভূত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে মনুষ্য সকলও যে বশীভূত হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এজন্য প্রত্যক্ষ দোষ সকল কেহই বলিতে সক্ষম হন না, তজ্জন্য মনুষ্যের লোকতঃ ও শাস্ত্রতঃ নিজের দোষ সকল বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ২৮২। ২৮৩

যিনি নিজের দোষ সকল শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হন ও ক্রুদ্ধ হন না; নিজের দোষ জানিবার জন্য যত্ন করেন ও নিজের দোষ শ্রবণ করিয়া পরিত্যাগ করিতে যত্ন করেন; যিনি নিজের গুণ প্রতিদিন শ্রবণ করিয়া অবিকৃত থাকেন ও আনন্দলাভ করেন না; যিনি বিবেচনা করেন যে, আমি দোষের আকর, আমাতে গুণ কি প্রকারে থাকিবে; আর আমাতেও অজ্ঞতা আছে, তিনি সংসারের সকল লোক অপেক্ষা মহৎ ও সাধু; দেবতা-সকলও তাঁহার কণামাত্রও লাভ করিতে পারেন না। ২৮৪। ২৮৫

সাধুর নিকট অল্প উপকারও অধিক বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্তু খলের নিকট অধিক উপকারও সর্ষপ হইতেও অল্প বিবেচিত হইয়া থাকে। ২৮৬

সাধুব্যক্তি ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে বলবান্ বিবেচনা করেন, কিন্তু দুর্জ্জন ব্যক্তি তাঁহাকে দুর্ব্বল বিবেচনা করে, তজ্জন্য সাধু ব্যক্তির দুর্ব্বাক্যও ক্ষমা করিবে, কিন্তু দুর্জ্জন ব্যক্তির করিবে না। ২৮৭

কোন ব্যক্তি এরূপ ক্রীড়া করিবে না, যাহাতে বিবাদের কারণ হয়; কখন আমোদ করিয়াও বলিবেনা যে "তোমার স্ত্রী কি কুলটা?" ২৮৮

কোন ব্যক্তিকে মিত্রভাবেও দুর্ব্বাক্য বলিবে না; মিত্রের নিকট কোন কথা গোপন রাখিবে না এবং মিত্র যদি কোন গোপনীয় কথা বলেন, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। ২৮৯

মিত্রের সহিত যদি কোন কারণ বশতঃ

প্রতিকর্ত্তুং যত্নেতৈব গুপ্তঃ কুর্য্যাৎ প্রতি-
ক্রিয়াম॥ ২৯১

যথার্থমপি ন ব্রূয়াদ্‌ বলবদ্‌ বিপরীতকম্‌।
দৃষ্টং স্বদৃষ্টবৎ কুর্য্যাচ্ছ্রুত মপ্যশ্রুতং ক্বচিৎ॥
২৯২

বদেদ্‌ বৃদ্ধানুকূলং যন্ন বালসদৃশং ক্বচিৎ।
পরবেশ্মগতস্তৎস্ত্রীবীক্ষণং ন চ কারয়েৎ॥
২৯৩

অধর্ম্মনিরতো যস্তু নীতিহীনশ্চলান্তরঃ।
সর্ব্বকোহতিদণ্ডী তদ্‌ গ্রামং ত্যক্ত্বান্যতো
বসেৎ॥ ২৯৪

পারতন্ত্র্যাৎপরং দুঃখং ন স্বাতন্ত্র্যাৎ পরং
সুখং।
অপ্রবাসী গৃহীনিত্যং স্বতন্ত্রঃ সুখমেধতে॥
সম্পূর্ণম্‌।　　　২৯৫

পশ্চাৎ শত্রুভাব হয়, তাহা হইলে মিত্রের প্রণয়-কালের কথিত কোন বাক্য কিম্বা তাঁহার দোষ জানিতে পারিলেও কখন তাহা প্রকাশ করিবে না। ২৯০

নিজে সুরক্ষিত হইয়া শত্রুর প্রতিকার করিতে যত্ন করিবে। ২৯১

বলবান্‌ ব্যক্তির কোন কুৎসা-জনিত বাক্য সত্য হইলেও বলিবে না; কোথাও দোষ দৃষ্ট হইলেও অদৃষ্টের ন্যায় কিম্বা দোষ শ্রবণ করিলেও অশ্রুতের ন্যায় আচরণ করিবে। ২৯২

বৃদ্ধের অনুকূল বাক্য বলিবে; কখনও বালকের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিবে না। অন্যের গৃহে গমন করিয়া কখনও তাঁহার স্ত্রী দর্শন করিবে না। ২৯৩

যিনি অধর্ম্মাশক্ত, যিনি দুর্নীতি সম্পন্ন, যিনি অব্যবস্থিতচিত্ত, অর্থ-শোষক, যিনি অত্যন্ত দণ্ড প্রদান করেন, তাঁহার গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিবে। ২৯৪

পরাধীনতা অপেক্ষা দুঃখ নাই ও স্বাধীনতা অপেক্ষা সুখ নাই। অপ্রবাসী স্বাধীন গৃহী সর্ব্বদা সুখ লাভ করিয়া থাকেন। ২৯৫

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

মিলন।

(১)

যায় চ'লে নিশি জীবনের মত
　　ঝিমলিন শশী বুঝি বা নিভিল,—
দূর—অতিদূর পূরবের গায়
　　মৃদুল বিভায় সিন্দুর রঞ্জিল।

(২)

অই শুনা যায় ত্রিদিবের দ্বারে—,
　　স্বর্ণ ঘণ্টা-রব দেব-কণ্ঠে গান,
ত্রিলোক-রাণীর প্রভাতী-আরতি
　　সুরবালা-কণ্ঠে মৃদুল সুতান।

(৩)

ব্রজের নিকুঞ্জ কাননে কাননে
　　অই যে উঠিল বিহগকূজন
অই যে বহিছে ভুবন ব্যাপিয়া
　　প্রভাত মলয়-মন্দ-সমীরণ।

(৪)

অই যে অদূরে তপন-তনয়া
　　তরঙ্গের রবে বহিয়া যায়;
অই ভগ্নকণ্ঠ পিক, পিক বধূ
　　ব্রজের বিষাদ সঙ্গীত গা'য়।

(৫)

তবে কি ত্রিযামা! অমনি চলিলে?
　　ব'লে দিয়ে যাও ওগো বিভাবরি!
তব ছায়া তলে কোথা লুকাইয়া—
　　র'য়েছে রাধার হৃদয়বিহারী!

(৬)

নিমিষে নিমিষে যুগ যুগান্তর
　　দিয়াছি কাটায়ে আমি অভাগিনী—
নিশা অবসানে, জীবনের শেষে—
　　বারেক হেরিতে সে বদন খানি!

(৭)
কেন অকস্মাৎ কেন অসময়ে—
প্রীতি-প্রস্রবণ প্রাণে উথলিল—
নীল জ্যোতি রাশি বিমল বিভায়
কেনরে রাধার হৃদয় পুরিল ?

(৮)
কেনরে শ্রবণ কেবলি শুনিছে—
সে পদ-নূপুর-মধুর-নিক্কণ !
অদূরেই যেন—অই যে বাজিছে
মোহন মুরলী প্রাণ-বিমোহন !

(৯)
তবে কি আসিলে ওহে প্রাণকান্ত !
তবে কি অভয়া দিলা মোরে বর,
তবে কি আরও পাইব দেখিতে
হৃদয়ের ছবি ওমুখ সুন্দর !

(১০)
তবে দেখা দাও, থেকোনা আড়ালে,
দেখিগো তোমারে নয়ন ভরিয়া,—
আমি বিরহিণী চাতকী তৃষিতা
আমার পিপাসা দাও মিটাইয়া।

(১১)
অই যে জাগিছে তব রূপরাশি
ব্রহ্মাণ্ডের আলো আঁধার ভরিয়া,
এই যে আমার পরাণ-নয়নে
হৃদয়-শোণিতে যাইছে মিশিয়া !

(১২)
অই বিশ্বরূপ অসীম অখণ্ড
এক্ষুদ্র হৃদয়ে কেমনে ধরি ?
পারে কি পল্লল করিতে ধারণ
অনন্ত অতল সাগর বারি ?

(১৩)
নহি অসামান্যা, ব্রজনারী আমি
ব্রহ্মাণ্ড দেখিব কি শক্তি আমার ?
করিয়াছি এক রাখালের ধ্যান
সেই নর বেশ দেখিব তাঁহার।

(১৪)
জানি না দেবতা কে কোথায় আছে
কখনো সাক্ষাৎ পাইনি কাহার—
তোমারেই দেখে দেখেছি দেবতা,
ভুলেছি আপনা—ভুলেছি সংসার !

(১৫)
দেখিব তোমারে যমুনা-পুলিনে
নিকুঞ্জ কাননে তমালের তলে—
তব বংশীরবে উজান প্রবাহ
মৃদুল তরঙ্গ যমুনার জলে।

(১৬)
ধরা-বিভাসিত নীল জ্যোতির্জাল
তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিবে আকাশে,
সে মাধুরী হেরে ময়ূর-ময়ূরী
ব্রজের কাননে নাচিবে উল্লাসে।

(১৭)
সাজাব তোমারে কানন-কুসুমে
দোলাব তোমার গলে ফুলহার,
নয়নের জলে ধোয়াব চরণ
কুন্তলে মুছাব চরণ তোমার।

(১৮)
আর' কত সাধ—কত শত আশা
রেখেছি লুকায়ে হৃদয়েতে আমি,
না পারি কথায় করিতে প্রকাশ
সকলি ত জান তুমি অন্তর্য্যামি !

(১৯)
যদি গো দাসীরে এতই করুণা—
করুণা-প্রবাহে ভাসালে রাধায়,
তবে এস নাথ ! দাঁড়াও বারেক
বিরহ শয়নে র'য়েছি যথায়।

(২০)

তোমা-ধনে ধনী ছিল যে রাধিকা—
তোমা হারাইয়া যে দশা তাহার—
দেখহে কটাক্ষে হে নিঠুর প্রাণ!
ফেল একবিন্দু নয়ন-আসার।

(২১)

না না না! নিঠুর কেন তোমা বলি!
তোমার দয়ায় বঞ্চিত কে কোথা?
করুণা-সলিলে ভাসে তব আঁখি
অনন্ত দয়ার তুমিই বিধাতা।

(২২)

তবে কৃপা করি কৃষ্ণ প্রাণসখা!
অই চিরারাধ্য কমল চরণ
নিত্য নিরন্তর তুষানলে দগ্ধ
এ পাপ-হৃদয়ে করহে স্থাপন।

(২৩)

যদি ভয় কর এ অনল-তাপে
হইবে তাপিত রাজীব-চরণ
কাজ নাই মোরে চরণে পরশি
দূর হ'তে তোমা করি নিরীক্ষণ।

(২৪)

না না না, সে ভয় নাহিগো তোমার,
যে চরণ-স্পর্শে ব্রহ্মাণ্ড শীতল
তাহার পরশে অবশ্য নিভিবে
রাধার জ্বলন্ত হৃদয়-অনল।

(২৫)

না দিয়া চরণ দিলে আলিঙ্গন
না মিটায়ে আশা বাড়ালে আমার,
কাঙ্গালের আশা মুষ্টি-ভিক্ষা ছিল
তাহা নাহি দিয়া দিলে রত্ন-হার।

(২৬)

কেন অভাগীরে এতই বাড়ালে?
এত সুখ সে কি পারে সহিবারে!
তাতেই আকুল অবোধ পরাণ
স্বর্গ হ'তে তারা পড়ে বা পাথারে!

(২৭)

কেন ভেবে মরি, তুমিই যাহার—
ভাবনার সার হৃদয়-রঞ্জন
তোমা হৃদে ধ'রি দিবাবিভাবরী
কেবলি দেখিব সোণার স্বপন।

(২৮)

জিজ্ঞাসি তোমারে, বল মোরে নাথ!
কেমনে হইলে এ যমুনা পার,
যে যমুনা ছিল কূলে কূলে ভরা
লভিয়া রাধার নয়ন আসার!

(২৯)

রাধার হিয়ার অনল পরশে
জ্ব'লে ছিল বনে বনে দাবানল,
কি কৌশলে নাথ! বল হে আমারে
হইলে উত্তীর্ণ সে বন সকল?

(৩০)

এত ভালবাসা, এত অনুরাগ—
কেমনে বুঝিব আমিরে অবলা!
পাষাণীর ছায়া জলে ভব ভালে
কেমনে বুঝিবে পাষাণের মালা!

(৩১)

ল'য়োনা ল'য়োনা অভাগীর দোষ
ক্ষমণীয় সদা অবলা সরলা,
অনন্তের অন্ত কে ক'বে বুঝেছে—
আমি ত অজ্ঞান অন্ধ ব্রজবালা!

(৩২)

তোমার চরণে বিকায়েছি প্রাণ
গিয়াছি মিশিয়া পদরেণু-সঙ্গে
তোমারই প্রেম-অনন্ত-প্রবাহে
চ'লেছি ভাসিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে।

(৩৩)

নাহি চাই কূল এ প্রেম অকূলে
যেন ভেসে ফিরি তোমা নেহারিয়া,
যদি ডুবাইতে বাসনা তোমার
সে অতল তলে দাও ডুবাইয়া।

(৩৪)

যাহা ইচ্ছা কর রাধারে লইয়া
তার গতি তুমি অগতির গতি!
কি ভয় তাহার গতির লাগিয়া
গতির নিয়ন্তা যার হৃদি-পতি!

(৩৫)

এই ভিক্ষা মাত্র ও রাজীব পদে
আঁখি অন্তরাল হ'য়োনাকো আর,
সরে যা'ক্ যুগ জীবন-প্রদীপ
অনিমেষ আঁখি রহিবে আমার।

(৩৬)

এই আশা মনে, রাখিব তোমাবে
নয়নের মণি! নয়নে ভরিয়া,
ভুলে যাব নিদ্রা-তন্দ্রা স্বপ্ন ভয়—
যোগ-ধ্যান-ক্লেশ যাইব ভুলিয়া!

(৩৭)

একি স্বার্থময়ী বাসনা আমার!
কেন অকস্মাৎ মোহনীরে ভাসি,
আমার মতন কত পাগলিনী
তোমার লাগিয়া জাগিতেছে নিশি!

(৩৮)

দয়াময় হরি! তোমারে চাহিয়া
না পুরেছে কবে কাহারি বা আশা?
নিশ্চয় সকলে পাইবে তোমারে
মিটিবে সবার প্রাণের পিয়াসা।

(৩৯)

ব্রহ্মাণ্ডের রাজা তুমি নারায়ণ!
হব রাজরাণী এ আশা না করি;
থাকহে আমারে কাঙ্গালিনী সাজে
সাজায়ে তোমার-রূপের ভিখারী!

দত্ত।

৺ বিজয়া।

নবমীর রজনী পোহাইল। আজ বিজয়া-দশমী। মা চলিয়া যাইবেন। পাখীরা প্রভাত-কাকলীচ্ছলে বিষাদের গান গাহিতে লাগিল। সানা'য়ের সুরে যেন দুঃখ-ক্ষোভের রাগিণী বাজিয়া উঠিল। মায়ের হাসিমাখা মুখে বিদায়দুঃখমালিন্য প্রকাশ পাইল। মায়ের ছলছল চক্ষু দেখিয়া প্রবীণ ভক্তগণের চক্ষে জল আসিল। পুরোহিত বিষাদভগ্নস্বরে মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। সমস্ত সংসার যেন বিষাদে ঢাকা—বিষাদে মাখা বোধ হইতে লাগিল। প্রকৃতি যেন চারিদিকে বিষাদ-চিহ্ন সাজাইয়া রাখিয়া নিজেও বিষাদগাম্ভীর-ভাবে আত্মপ্রকাশ করিল! নেত্রজলোচ্ছ্বাস, দীর্ঘ-শ্বাস, হা হুতাশের মধ্যে বিসর্জ্জন—বিজয়াদশমী-কৃত্য অনুষ্ঠিত হইল!

এ বিসর্জ্জন সাধারণ নয়। মায়ের বিস-র্জ্জন! মঙ্গলদেবতা গণপতির বিসর্জ্জন! শৌর্য্যদেবতা কুমারের বিসর্জ্জন! ঋদ্ধিদেবতা কমলার বিসর্জ্জন! বিদ্যাদেবতা ভারতীর বিসর্জ্জন! এ বিসর্জ্জনে যদি না কাঁদিব, তবে আর কাঁদিব কখন? কিন্তু বিসর্জ্জনে শুধু ক্রন্দনের সাধনা নয়। ইহার পরে আছে বিজয়োৎসব! পঞ্জিকায় লেখে "শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব" বিষম সমস্যা! যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জনের পরে আবার কিসের 'বিজয়োৎসব'? শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয়োৎসব কি? মা'কে বিসর্জ্জন দিয়া কি সেই রামানুচর কপিকুলের বিজয়-বিহ্বলতার অনুস্মরণ করিতে আগ্রহ হয়? তা বুঝি স্বাভাবিক নয়! তবে কি ইহা সমাজ-প্রচলিত বিজয়াসেবন-জনিত বিবেক-সঙ্কোচক আমোদ-প্রমোদ? তাও নয়। আধ্যা-ত্মিক ধর্ম্মক্ষেত্রে তামস সিদ্ধিসেবার স্থান কোথায়? তবে এ উৎসব কিসের?

বহির্জ্জগতের রামায়ণের উৎসব এ নয়। এ উৎসব অধ্যাত্মক্ষেত্রের রামায়ণের। সর্ব্বস্ব-বিসর্জ্জনের পরেই এ উৎসবে অধিকার জন্মে।

এ রামায়ণের রাম 'আত্মারাম'। 'চিত্ত'

এখানকার লক্ষণ। 'সংসার' এখানকার বন। 'বিদ্যা' এখানকার 'সীতা।' 'অবিবেক' এখানকার রাবণ। সুগ্রীব এখানে 'শাস্ত্র'। দৈন্য এখানে 'বালী।' 'মদন জলনিধি' এখানে সমুদ্র। 'ধৈর্য্য' এখানকার সেতু। আত্মরাম, চিত্তসংসর্গ লাভ করিয়া, সংসার-অরণ্যে প্রবেশ করেন। সেখানে অবিবেক-দশানন তাঁহার বিদ্যা-সীতাকে অপহরণ করে। আত্মরাম বিদ্যা-বিয়োগ-শোক-দুঃখে অধীর হইয়া, সীতা-লাভ-প্রত্যাশায় শাস্ত্ররূপ সুগ্রীবের সহিত সখ্য স্থাপন করেন। দৈন্য-বালীকে বিনাশ করিয়া সুগ্রীবের সাহায্যে মদনসাগরে ধৈর্য্যসেতু বাঁধিয়া, অবিবেক-রাবণ ও লঙ্কাপুরী জয় করিয়া, আত্মবিদ্যারূপা সীতাকে উদ্ধার করিয়া যথার্থ আত্মরাম হন। এ বিজয় উৎসবময়। এখানে পরমানন্দ চিরবিরাজিত। এখানে 'ভূমার' রাজত্ব। বহির্জ্জগতের লঙ্কাজয়ের আনন্দ অচিরস্থায়ী, কিন্তু এ ভূমানন্দের বিনাশ নাই, তাই এ উৎসব অমর। সিদ্ধগণ এই কথাই বলেন—

> বিদ্যাসীতাবিয়োগক্ষয়িতনিজসুখঃ শোক-মোহাভিপন্নঃ
> চেতঃসৌমিত্রিমিত্রো ভবগহনগতঃ শাস্ত্র-সুগ্রীবসখ্যঃ।
> হত্বাস্তে দৈন্য বালিং মদনজলনিধৌ ধৈর্য্য-সেতুং প্রবধ্য
> প্রধ্বস্তাবোধরক্ষঃপতিরধিগতচিজ্জানকিস্ত্বা-ত্মরামঃ।

এই আত্মরামের বিদ্যাসীতা-লাভের উৎসব যথার্থই মহামায়ার বিসর্জ্জনের পরের কার্য্য। শৌর্য্য-বীর্য্য, লৌকিক মঙ্গল অমঙ্গল, ঋদ্ধি-বৃদ্ধি, লৌকিক বিদ্যা বা অপরা বিদ্যা, আর সর্ব্বোপরি কালরাত্রি মহারাত্রি-মোহরাত্রি-রূপা মহামায়া—এ সকল বিসর্জ্জন না দিলে ত আত্মবিদ্যা-লাভ ঘটিবে না! ইহার সমূল উৎপাটনের পর আত্মবিদ্যার সহিত আত্মরামের মিলন হইবে। এই নিগূঢ় অধ্যাত্মতত্ত্ব বিসর্জ্জন ও বিজয়ার মধ্যে নিহিত। বাহ্যজগতে ইহার স্থান নয়, অন্তর্জ্জগতে ইহার অধিষ্ঠান। ইহা বাহ্য রাজ্যজয়ের উৎসব নয়, অধ্যাত্ম-রাজ্যজয়ের মহামহোৎসব। লৌকিক জীবনে মায়ের বিসর্জ্জনের পর আর উৎসব থাকিতে পারা সম্ভব নয়। যাঁ'কে বিসর্জ্জন দিলে সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ববিধ লৌকিক কল্যাণও বিসর্জ্জিত হয়। বাহ্যপূজার অভ্যন্তরে আধ্যাত্মিক সাধনার এই অমূল্য ইঙ্গিত বিদ্যমান রহিয়াছে। চিন্তাশীল সাধক! আগে বিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হও—বৈরাগ্য-সম্পন্ন হও, তবে তোমার বিজয়োৎসবের মর্ম্ম বুঝিবার অধিকার হইবে। শৌর্য্য বীর্য্য, ধন-ধান্য, বিদ্যা-বুদ্ধির অভিমান থাকিতে আত্মবিদ্যা-লাভের অধিকার হইবে না, তোমার বিজয়োৎসব বা ব্রহ্মবিদ্যালাভোৎসবের অধিকার জন্মিবে না। ত্যাগের রাজ্যে চল, বৈরাগ্যের শরণাগত হও, তবে ভূমানন্দোৎসব করিতে পারিবে, তবেই তোমার আধ্যাত্মিক বিজয়োৎসব সফল হইবে। ওঁ শান্তিঃ।

বিজয়াদশমী } দীন—
প্রতাপকাটী } শ্রীকেদারনাথ ভারতী।

সংবাদ ও মন্তব্য।

শুদ্ধিশাস্ত্রার্থ। "ধর্ম্মপ্রচারক" প্রচার করিয়াছেন, বিজনোর চলদোয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়দেব শর্ম্মা আর্য্যসমাজকে "শুদ্ধি" বিষয়ে বিচার করিবার জন্য আহ্বান করেন, কিন্তু আর্য্যসমাজের কেহই বিচারার্থী হইয়া উপস্থিত হন নাই। সংবাদে বিস্মিত হইলাম। স্বামী দয়ানন্দের সম্প্রদায় কি নিজের পায়ে দাঁড়াইতেও অসমর্থ? দয়ানন্দজী যে একাই এক সহস্র ছিলেন!

সাহিত্যসাধনা। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বারাণসীশাখার বিগত অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের সভাপতিত্বে অধিবেশন গৌরবান্বিত হইয়াছে। 'প্রাচ্য ও উদীচ্য' 'কপিলাশ্

বা উৎকলে কৈলাস' 'উপনিষদের শিক্ষা' 'রঘুনন্দন ও নব্যস্মৃতি' প্রভৃতি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। প্রবাসী বঙ্গবাসীর শাস্ত্রসাহিত্য-সেবা-সংবাদ সুখকরই বটে।

প্রতিবাদ। ভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি মহাশয় গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবিত অসবর্ণ বিবাহ-বিষয়ক বিধানের প্রতিবাদ করিয়াছেন। পদোচিত কার্য্যই হইয়াছে।

ত্র্যহস্পর্শ। অহোরাত্রে তিনতিথি মিলিলেই তাহাকে বলে "ত্র্যহস্পর্শ"। ত্র্যহস্পর্শে যাত্রাদি শুভকার্য্য নিষিদ্ধ, কিন্তু স্নান-দানে বাধা নাই। হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়েও ত্র্যহস্পর্শ লাগিয়াছে। এক হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রিবেণী-সঙ্গমের আভাস পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিত শ্রীমান্ মদনমোহন মালবীয়ের এক হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়, পণ্ডিতা শ্রীমতী আনি বাসন্তীর অপর হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের তৃতীয় হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়। মদনমোহন ও বাসন্তীর বিশ্ববিদ্যালয় এক হইতে গিয়াও হইতেছে না। পণ্ডিতজীর বিশ্ববিদ্যা ও তত্ত্ববিদ্যা-সভার বিশ্ববিদ্যার মধ্যে কিছু ফাঁক্ থাকিয়া যাইতেছে! মহামণ্ডলের "মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থা।" মহামণ্ডলের বিশ্ববিদ্যা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুকূলে বিতরিত হইবে। হিন্দু-সমাজ! তুমি কি চাও? যাহা ইচ্ছা, লইতে অগ্রসর হও। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ত্র্যহস্পর্শে "যাত্রা নাস্তি" তবে "স্নান-দানে বাধা নাই।" আপাততঃ এইটুকুই বলা গেল।

নিবেদিতা। 'ভগিনী নিবেদিতা' আভিজাত্যের অভিমান ভাসাইয়া দিয়া, স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা হইয়া, ভারতে আসিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের শীতলচ্ছায়ায় জীবন-যাপন তাঁহার লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্য রক্ষা করিয়াই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৩ অক্টোবর দার্জ্জিলিঙে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। নিবেদিতা, হিন্দুপত্রিকা-সম্পাদক-সম্পাদিত ইংরেজী "ব্রহ্মচারিণ" পত্রে জাতিভেদের অনুকূলে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি একেবারেই অকৃত্রিম রূপে হিন্দু-ভাবাপন্না হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

গৌরবের কথা। হিন্দুপত্রিকা সম্পাদক-প্রণীত "আমিত্বের প্রসার" পুস্তকের 'ক্যানারিজ' ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করিবার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ লেখক অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে এই পুস্তক 'তেলেগু' ভাষায় অনুবাদ করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে। ইংরেজী ভাষায় ইহার অনুবাদ পূর্ব্বেই হইয়াছে। বাঙ্গালা পুস্তকের পক্ষে ইহা নিশ্চয়ই গৌরবের কথা।

বিতরণ। আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, কাশীযোগাশ্রম হইতে শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর জন্মোৎসব উপলক্ষে 'ভক্তি ও উপাসনা' এবং "হিন্দী-শিক্ষা-সোপান" নামক পুস্তকদ্বয় বিতরিত হইতেছে। প্রার্থীগণ দুই পয়সার ষ্ট্যাম্প পাঠাইলেই পাইবেন।

'পালটা দান'। মিঃ হাসন ইমাম্ হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পঞ্চসহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন, অপরদিকে অনারেবল সচ্চিদানন্দ সিংহ মুসলমান্-বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দুইসহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। লোকে 'পাল্টা দান' করিলে আপত্তি কি?

ধর্ম্মানুসারে লোকসংখ্যা। ভারতবর্ষের বিগত লোকগণনায় দেখাগিয়াছে, হিন্দুর সংখ্যা ২০ কোটী ৭০ লক্ষ, বৌদ্ধ ও জৈন ১ কোটি, মুসলমান্ ৬ কোটি ২০ লক্ষ, খ্রীষ্টান ৩০ লক্ষ। এখনও সংখ্যাশক্তির প্রতি দৃক্পাত করার সময় আছে। রোগ নিতান্ত অসাধ্য হয় নাই।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍রেজেষ্টরীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা



১৮শ বর্ষ, ১৮শ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ। | ১৩১৮ সাল, ১৮৩৩ শকাব্দাঃ।

বৈদিক বস্তুতত্ত্ব।

আমরা জানি, হিন্দুশাস্ত্রে ক্ষিত্যপ্তেজো-মরুদ্ব্যোম—পঞ্চভূত সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, সে ভূতের মৃত্যু হইয়াছে, এখন অনেক ভূত সৃষ্ট হইয়াছে; কারণ ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতির বিশ্লেষণে অন্য পৃথক্ পৃথক্ মূলভূত আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এসব গোলের কারণ এই যে, আমরা শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া অন্য অর্থ করি।

মনুষ্যের পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, যথা কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা। ঐ ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা পাঁচরূপ জ্ঞান জন্মে, যথা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধ। এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান পাঁচ রূপ হইবে, অধিক হইবেনা। আর, এই পাঁচ প্রকার জ্ঞান, পাঁচ প্রকার জগৎপ্রপঞ্চ ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম হইতে হইয়া থাকে। এই ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোমকেই ইংরাজিতে Solid, Liquid, Energy (heat, light and electricity), Gas এবং Ether বলা হয়। হিন্দুদর্শনে বর্ণিত আছে যে, ব্যোম হইতে পর্য্যায়ক্রমে মরুৎ, তেজ, অপ্, ক্ষিতি সৃষ্ট হইয়াছে, যথা আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী ইত্যাদি তৈত্তিরীয়োপনিষদ্। অর্থাৎ Ether হইতে ক্রমান্বয়ে matter এবং energy প্রকাশিত হইয়াছে।

এখন দেখা যাউক্, ঋগ্বেদে এ সম্বন্ধে কি আছে।

ঋক্ অর্থে পদার্থ নিচয়ের স্বরূপ, গুণ, ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি—অর্থাৎ ঋগ্বেদে ভৌতিক ও মানসিক বিষয় সমূহের গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে।

অনেকের ধারণা, ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি নানা দেবদেবীর গাথা স্তোত্রসমূহ মাত্র।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চভূত সম্বন্ধে এবং মৃত ভূত সম্বন্ধে ঋষিদের কিরূপ জ্ঞান ছিল, সম্প্রতি তাহা পর্য্যালোচনা করা যাউক।

প্রথমতঃ অদ্য জল সম্বন্ধে তাঁহাদের কিরূপ জ্ঞান ছিল, তাহার আলোচনাই করা যাউক্।

ঋগ্বেদের একটী মন্ত্র আলোচনা করিয়া আমরা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিব

মন্ত্র যথা,—

মিত্রং হুব পুতদক্ষং বরুণংচ ঋষাদসম্।
ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা॥

ঋ॥ সূ ২। ম ৭।

এই মন্ত্রে তরল পদার্থ সমূহের মধ্যে জল পদার্থটীর প্রস্তুতপ্রণালী বর্ণনা করা হইতেছে। 'সাধন্তা' পদটী দ্বিবচনান্ত, সুতরাং ইহাদ্বারা ঘৃতাচী-ধী সাধনকারী দুইটী বস্তুর কথা বলা হইতেছে। যে দুইটী বস্তুর যোজনায় জল উৎপন্ন হইতে পারে, সেই দুইটী—মিত্র এবং বরুণ।

মিত্র শব্দ মি ধাতুর উত্তর উণাদি-গণীয় ক্ত প্রত্যয়ে সিদ্ধ – সূত্র যথা "অমিচিমিসশিভ্যঃ ক্তঃ" মিনোতি মানং করোতি। মি ধাতুর অর্থ পরিমাণ করা, মিত্র অর্থে পরিমাপক সঙ্গী।

মিত্র নাম হইতে বোঝা যায়, ইহা দ্বারা অন্য পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা যায়। যেরূপ hydrogen দ্বারা অন্যান্য পদার্থের গুরুত্ব মাপা হয়। hydrogen কে standard substance ধরিয়া লইয়া, ইহার গুরুত্ব ১ লওয়া হয় এবং তদনুযায়ী অন্য পদার্থের গুরুত্ব নির্ণয় করা হয়। এই 'মিত্র' দ্বারাও তাহা হয়।

মিত্র অর্থ সঙ্গী অর্থাৎ বরুণের সঙ্গী। মিত্রের বরুণের জন্য অত্যন্ত অগ্রহ আছে, অন্য পক্ষে hydrogen-এর oxygen-এর জন্য অত্যন্ত affinity আছে।

মিত্র এবং উদান শব্দ একার্থবাচক। উদান অর্থে যে অন্যকে উত্তোলন করিতে পারে, অত্যন্ত হাল্কা। অন্যপক্ষে hydrogen সর্ব্বাপেক্ষা লঘু। একরূপভাবে hydrogen এবং 'মিত্র' অভিন্ন বস্তু সিদ্ধ হইতে পারে। আরও কারণ আছে। বরুণ=বৃ+উণন্। সূত্র যথা,—বৃকদারিভ্য উণন্। বৃ ধাতুর অর্থ—বরণ করা—গ্রহণ করা অর্থাৎ আমরা প্রাণধারণ জন্য যাহাকে গ্রহণ করি সে 'বরুণ'।

ঋষাদ অর্থাৎ অপরকে ক্ষয় করে, দাহ করে, রক্তের মলকে নষ্ট করে, ধাতুপ্রভৃতিতে সংযুক্ত হইয়া নষ্ট করে। অন্যপক্ষে oxygen-এরও এই সমস্ত গুণ।

পুত—পুত অর্থে পবিত্র—শুদ্ধ—মল হইতে মুক্ত।

দক্ষ—অর্থে শক্তিযুক্ত—তেজঃসম্পন্ন।

পুতদক্ষ—অর্থে শুদ্ধ. ব্যক্ততেজোবিশিষ্ট অর্থাৎ kinetic energy-বিশিষ্ট।

যাঁহারা kinetic Theory অবগত আছেন, তাঁহারা পুতদক্ষ অর্থে উত্তপ্ত বাষ্পের kinetic energy জানেন।

মিত্রং হুব পুতদক্ষং বরুণং চ ঋষাদসম্
ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা॥

শ্লোকের ভাবার্থ—

যিনি জল প্রস্তুত করিতে ইচ্ছুক, তিনি (পুতদক্ষং মিত্রং) kinetic energy-বিশিষ্ট উত্তপ্ত hydrogenকে (ঋষাদসম্ বরুণং) oxydise করিবার ক্ষমতা-বিশিষ্ট oxygen গ্যাসের সহিত যোজনা করিবেন, তাহা হইলে জল উৎপন্ন হইবে।

ইহাতে বোধ হয়, Cavendish-এর বহুপূর্ব্বে বৈদিক-যুগে হিন্দুরা hydrogen এবং oxygen হইতে জল প্রস্তুত করিতে জানিতেন।

জনৈক বিদ্যার্থী—

হরিদাস।

হিন্দুধর্ম্মের আকাশ ঘোর তমিস্রাপূর্ণ। আকাশে চন্দ্র নাই, নক্ষত্র নাই, এক ঘোর অন্ধকার দশদিক্ আবৃত করিয়া রহিয়াছে। সেই ঘোর তিমিরময়ী নিশীথিনীর কথা মনে করিলে কি আ'জ গাত্র শিহরিয়া উঠে না? যখন বিধর্ম্মীর অত্যাচারে হিন্দুধর্ম্ম প্রপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতেছিল, নানা প্রকার চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক, যখন দুর্দ্ধর্ষ বিধর্ম্মিগণ হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব লোপ করিবার চেষ্টা পাইতেছিল, যখন দলে দলে নীচজাতীয় হিন্দুগণ এই ধর্ম্মের অনন্ত মহিমা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, অন্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছিল, যখন ধর্ম্মপ্রাণ নিঃসহায় জনমণ্ডলীর অবিরল অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন আবার সেই ঘোর তমিস্রা দূর করিতে, জগৎকে মধুর জ্যোৎস্নাময় করিতে, মহাপ্রভু গৌরচন্দ্রের ও কতকগুলি তেজঃপুঞ্জ নক্ষত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। হরিদাস সেই নক্ষত্রসমূহের অন্যতম।

যে যশোহর জেলায় একদিন মহাবীর প্রতাপ মধ্যাহ্নমিহিরতেজা সম্রাট্কে উপেক্ষা করিয়া রণডঙ্কা বাজাইয়াছিলেন, যে যশোহর জেলায় একদিন বীরবর সীতারাম হিন্দুর অসামান্য বাহুবলের পরিচয় দিয়া বিশাল মোগলবাহিনীকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, সেই যশোহর জেলায়ই বনগ্রামের অদূরবর্ত্তী 'বূঢ়ন' নামে এক ক্ষুদ্র নিভৃত পল্লীতে হরিদাস আবির্ভূত হইয়া ভগবদ্ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। বূঢ়ন গ্রামের বিষয় আমরা বিশেষ জানিনা, কিন্তু বৈষ্ণব কবি বলিতেছেন—

"বূঢ়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস
সেভাগ্যে সে সব দেশে কীর্ত্তন প্রকাশ।"

হরিদাস যবনবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কে তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিল বা কে তাঁহাকে "হরি" বলিতে শিখাইয়াছিল, বৈষ্ণবকবি এ সব কথা কিছুই বলেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহারা তাঁহার পূত চরিত্রের মহিমা অনুভব করিয়াই মুগ্ধ হইয়াছেন! সে চরিত্র এবং সে ভক্তি কিরূপে বিকশিত হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করেন নাই। যখন প্রস্ফুটিত কমল, শোভা ও সৌরভ বিস্তার করিতে থাকে, তখন সকলেই তাহার নয়ন-তৃপ্তিকর সৌন্দর্য্য দেখিয়াই মুগ্ধ হয়! কে তাহার উৎপত্তি স্বচ্ছসলিলে কি মহাপঙ্কে, ইহার অনুসন্ধান করিতে যাইয়াথাকে?

যে বয়সে অতি নির্ম্মল মনেও সময়ে সময়ে কলঙ্ক স্পর্শে, যে বয়সে মানব ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকেই অনন্তসুখের আকর মনে করিয়া থাকে সেই নবীন বয়সেই হরিদাসের হৃদয় ভগবদ্ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়াছিল। সেই বয়সেই হরিদাস বেনাপোলের বনভূমির মধ্যে এক বিজন কুটীরে হরিনামরূপ সুধাপানে তাঁহার পিপাসা শান্তি করিতেছিলেন। তিনি কখনও যশের ভিখারী ছিলেন না। লোকে তাঁহাকে একজন মহাভক্ত বলিয়া মনে করুক, এ বাসনা তাঁহার মনোমধ্যে কদাপি স্থান পায় নাই, তাই তিনি জন-কোলাহলময়ী ধরণীর এক প্রান্তে নিভৃতে আপনার মনে আপন কর্ত্তব্য সাধন করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন।

কিন্তু, যখন পুষ্প বিকশিত হয়, তখন কি সে ভ্রমরকে আহ্বান করিয়া থাকে? আপনি মকরন্দলোভী ভৃঙ্গকুল পুষ্পসমীপে আইসে। হরিদাসের হৃদয়েও মধু ছিল, সুতরাং ভৃঙ্গকুলের মত মানবকুল তাঁহার সেই নিভৃত কুটীরে যাতায়াত করিতে লাগিল।

হরিদাস তাঁহার কুটীরের নিকটে একটী তুলসীবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিয়া তুলসী-মূলে জল দিতেন, ও পরে সেই কুটীরে জপে নিমগ্ন হইতেন। তিনি প্রত্যহ পরিস্ফুট স্বরে তিনলক্ষ নাম জপ করিতেন। লোকে তাহা শুনিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া বসিয়া থাকিত। সেই নাম করিয়া, হরিদাস যেরূপ অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহারাও সেইরূপ সেই মধুমাখা নাম শ্রবণে কিছুকালের জন্য যেন নরলোকের ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করিত, আর হরিদাসের সেই প্রশান্ত মুখমণ্ডলে এক দেবোচিত সৌন্দর্য্য প্রতিভাত দেখিয়া বিস্ময় বিমুগ্ধ হইত।

ভগবান্ ভক্তেরই, কিন্তু তিনি, যে তাঁহাকে ডাকিতেছে, সে অন্তরের সহিত ডাকিতেছে কিনা, সে প্রকৃত ভক্ত কিনা, তাহা জানিবার নিমিত্ত তাহাকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করেন। সুবর্ণ যেরূপ পুনঃ পুনঃ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া কিছুমাত্র বিবর্ণ হয়না, পরন্তু তাহাতে তাহার ঔজ্জ্বল্য আরও বৃদ্ধি পায়, সেই পরীক্ষাগুলিও ভক্তকে নিরাশ-চিত্ত না করিয়া তাহার অন্তরের সৌন্দর্য্য অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া তুলে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই ধ্রুব তাঁহার চির-বাঞ্ছিত পদ্মপলাশলোচনকে পাইয়াছিলেন, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই প্রহ্লাদ তাঁহার প্রাণের ধন হরির দেখা পাইয়াছিলেন। হরিদাসেরও এই পরীক্ষার দিন আসিল।

বেনাপোলের তদানীন্তন ভূম্যধিকারী ছিলেন রামচন্দ্রখান্। সর্ব্বদা চাটুকার-পরিবেষ্টিত থাকায় তিনি আপন শক্তি অপরিমেয় মনে করিতেন। একদিনের জন্যও পুণ্যের আলোক তাঁহার ঘোর অন্ধকারময় হৃদয়ের একটী কোণও আলোকিত করে নাই। তাই তিনি, কোথাকার কে আসিয়া এতগুলি লোককে আকৃষ্ট করিয়াছে শুনিয়া, ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু হরিদাসের রসনায় বোধ হয় ভগবান্ অনন্ত মধু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাই একবার তাঁহার মুখ নিঃসৃত বাক্য শ্রবণ করিলেই জনমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া যাইত। রামচন্দ্র যাহাই বলুন না কেন, লোকে হরিদাসের প্রতি উত্তরোত্তর অধিক আকৃষ্ট হইয়া উঠিল।

রামচন্দ্রের অধীনে কতকগুলি বেশ্যা বাস করিত। তিনি উহাদের একজনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও হরিদাসের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার ব্রতভঙ্গ করিতে কহিলেন। সেও তাহাতে স্বীকৃতা হইল। বেশ্যা হরিদাসকে ধর্ম্ম-পথচ্যুত করিতে তিনদিনের সময় চাহিল। হরিদাসের পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

জ্যোৎস্নাময় রজনী। আকাশে শশধর হাসিতে হাসিতে নিখিল বিশ্বে আপন রজত-কিরণ মালা বর্ষণ করিতেছিলেন, চতুর্দ্দিকে অনন্ত তারকারাজি গগনরূপ বিশাল তড়াগে কুমুদিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। এই সময়ে বেশ্যা, হরিদাসের কুটীর-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল।

কুটীরের চারিদিকে তরুরাজির পত্রের

উপর শিশিরবিন্দু টল টল করিতেছিল, তাহার উপর চাঁদের অমল-ধবল-কিরণ নাচিতেছিল। কোথাও বল্লীলতাকুঞ্জের মধ্য দিয়া চাঁদের কিরণ উঁকি দিতেছিল। আর সেই কুঞ্জে আঁধার আলোক মিশিয়া বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। পৃথিবী কৌমুদী-পরিমণ্ডিত হইয়া হাসিতেছিলেন। আর কুটীর মধ্যে হরিদাস তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মধুমাখা স্বরে মধুময় হরিনাম গান করিতেছিলেন। অদূরে দুই একটী পাখীও যেন তাহা শুনিয়া ক্ষণান্তরে মুগ্ধ হইতেছিল। হরিদাস যখন 'হরি' বলিতেছিলেন, তখন তাহারা নীরব হইতেছিল, আর হরিদাস নীরব হইলে, তাহারাও যেন "হরি" বলিতে প্রয়াস পাইতেছিল। এ দৃশ্য দেখিয়া বেশ্যারও হৃদয় কেমন হইয়া গেল। তাহার আঁধারভরা হৃদয় কম্পিত হইল। হরিদাস তাহাকে বলিলেন "তুমি ঐ স্থানে উপবেশন কর। আমি নামজপ করিয়া লই, পরে তোমার সহিত কথাবার্তা বলিব।" হরিদাস নাম-গানে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে প্রভাত হইয়া গেল। অপ্রতিভ অবলা আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যখন রামচন্দ্র শুনিলেন, তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই, তখন তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইলেন। পরদিন সেই বেশ্যাকে দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত করিয়া পাঠাইলেন। দ্বিতীয় রজনীও ঐভাবে কাটিয়া গেল। তৃতীয় রাত্রি আসিল। বেশ্যাও আসিল, কিন্তু তাহার সে হৃদয় লইয়া আসিল না। তাহার হৃদয় যেন চিত্তসন্তাপহর হরিনামে একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। আ'জও হরিদাস তাহাকে ঐরূপ ভাবে বসিতে বলিয়া জপে নিমগ্ন হইলেন। আ'জ বেশ্যাও দুই একবার হরিনাম করিল একবার করিতেই সে তাহার পূর্ণ যৌবনে নানারূপ পার্থিবসুখ উপভোগ করিয়া, যে আনন্দ পায় নাই, তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক সুখ পাইল। আর একবার বলিল। বলিতে বলিতে রাত্রি শেষ হইয়া গেল।

প্রভাত আসিল। নিশার অন্ধকার একটু একটু করিয়া বিলীন হইতেছিল, আর প্রভাতের আলোক একটু একটু করিয়া দশদিক্ উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল। বেশ্যার হৃদয়েও সেদিন এক মহাপ্রভাত হইল। তাহার হৃদয় হইতেও ঐরূপ পাপতিমির দূরীভূত হইতেছিল আর পুণ্যপ্রভায় তাহা উজ্জ্বল হইতেছিল। আজ সে আঁধারের রাজ্য হইতে আলোকের দেশে প্রবেশ করিল। গত জীবনের কথা স্মরণ করিয়া বেশ্যা বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুমোচন করিল। সে মনে করিল, সেই রজনীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পাপজীবনও শেষ হইল। সেইদিন হইতে সে আর এক জগতে—যেখানে চিরসুখ বিরাজমান—যেখানে আলোক আছে কিন্তু আঁধার নাই—সেখানে হাসি আছে কিন্তু কান্না নাই, সেই রাজ্যে প্রবেশ করিল। হরিদাস উঠিলে সে তাঁহার পদে লুণ্ঠিতা হইল ও আপন কাহিনী বিবৃত করিয়া ক্ষমা চাহিল।

হরিদাস বলিলেন 'হরি বল'। বেশ্যা যুক্তকরে আকাশ পানে তাকাইয়া বলিল "হরি।" একবার নয়—দুইবার নয়, শতবার বলিল, সহস্রবার বলিল; বলিয়া আর তৃপ্তি হইল না। প্রতিবারেই সে অনুপম সুখানুভব করিতে লাগিল। বেশ্যা শুনিতে লাগিল, যেন প্রভাতে বিহঙ্গগণ কাকলীর দ্বারা সেই হরিরই

মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। হাস্যমুখ বালারুণ, লোহিতবর্ণ প্রাচ্যগগন, সর্ব্ব পদার্থেই সে যেন সহস্র 'হরি'নাম উজ্জ্বলাক্ষরে লিখিত দেখিল। সকলেই যেন সেই মধুর হইতেও মধুরতর হরিনাম করিতেছিল, শুধু সে-ই এতকাল আঁধারে পতিতা ছিল। বেশ্যা ক্ষণকালের তরে সকলি ভুলিল—জগত-সংসার ভুলিল, রূপ ভুলিল, যৌবন ভুলিল! ভুলিলনা শুধু হরিনাম। বেশ্যা দেখিল, অখিল-ব্রহ্মাণ্ড যেন শুধু হরিময়। এ বিশ্বে আর কিছুই নাই, আছেন শুধু সেই বিশ্বনিয়ন্তা পরমকারুণিক হরি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাখালচন্দ্র সেন।

অথর্ব্ববেদীয়া

নাদবিন্দূপনিষৎ।

ওঁ অকারো দক্ষিণঃ পক্ষ উকারস্তূত্তরঃ স্মৃতঃ।
মকারস্তস্য পুচ্ছং বা অর্দ্ধমাত্রা শিরস্তথা। ১

পাদৌ রজস্তমস্তস্য শরীরং সত্ত্বমুচ্যতে।
ধর্ম্মশ্চ দক্ষিণং চক্ষুরধর্ম্মশ্চোত্তরং স্মৃতম্। ২

ভূর্লোকঃ পাদয়োস্তস্য ভুবর্লোকস্তু জানুনোঃ।
স্বর্লোকঃ কটিদেশেতু নাভিদেশে মহর্জ্জগৎ। ৩

জনলোকস্তু হৃদয়ে কণ্ঠদেশে তপস্ততঃ।
ভ্রুবোর্ল্ললাটমধ্যেতু সত্যলোকো ব্যবস্থিতঃ। ৪

সহস্রাহ্ন্যমিতি চাত্র মন্ত্র এব প্রদর্শিতঃ।
এবমেনং সমারূঢ়ো হংসং যোগবিচক্ষণঃ। ৫
ন বধ্যতেহকর্ম্মচারী পাপকোটি-শতৈরপি ॥৬

অনুবাদ। প্রণবরূপী হংসের দক্ষিণ পক্ষ 'অ'কার, উহার বাম পক্ষ 'উ'কার, 'ম'কার উহার পুচ্ছ এবং অর্দ্ধমাত্রা উহার মস্তক-স্বরূপে বিরাজিতা। রজোগুণ ও তমোগুণ ঐ হংসের দক্ষিণচরণ ও বামচরণ, ঐ হংসের শরীর সত্ত্বগুণময়, ধর্ম্ম উহার দক্ষিণ-চক্ষু ও অধর্ম্ম বামচক্ষু। হংসের পদযুগলে 'ভূ'লোক অবস্থিত, 'ভুব'লোক উহার জানুদ্বয়ে অধিষ্ঠিত, 'স্বঃ'লোক হংসের কটিদেশে বিরাজিত, উহার নাভিদেশে 'মহঃ'লোক সংস্থিত। হংসের হৃদয়দেশে 'জন'লোকের অবস্থান, কণ্ঠদেশে 'তপো'লোকের সংস্থান এবং উহার ভ্রূযুগল ও ললাটের মধ্যভাগে 'সত্য'লোকের অধিষ্ঠান। হংসের স্বরূপ-বর্ণনা প্রসঙ্গে এস্থলে সহস্রাহ্ন্য মন্ত্রই প্রদর্শিত হইল। যোগপারগ ব্যক্তিগণ এই প্রণবস্বরূপ হংসে আরোহণ করিলেই সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া পরমপদে উপনীত হইতে পারেন। শত পাপ, সহস্র দোষ, কোটি কুকর্ম্মও তাঁহাদের বন্ধসাধন করিতে সমর্থ হয় না; তখন তাঁহারা হংসকৃপায় বিরজ ব্রহ্মলোক লাভ করেন। ১-৬

মন্তব্য। প্রণবতত্ত্বের সাধনাই বেদের গৌরবস্বরূপ। বেদসমূহের সার গায়ত্রী, তাহার সার প্রণব। প্রণবের মধ্যেই ব্রহ্মতত্ত্ব নিহিত, সৃষ্টিস্থিতিলয়-শক্তি অধিষ্ঠিত। প্রণবের পঞ্চমাত্রা যথা—অকার, উকার, মকার, বিন্দু ও নাদ। এই পঞ্চাত্মক প্রণবতত্ত্বের উপাসনাই সর্ব্বোপাসনার অভ্যন্তরে বিরাজ করে। প্রণবের 'অ'কার সৃষ্টিশক্তি, 'উ'কার স্থিতিশক্তি এবং 'ম'কার সংহারশক্তি। এই ত্রিশক্তির সমাবেশ-স্বরূপ প্রণবে সুতরাং উৎপত্তি-স্থিতি-সংহৃতি-শীল সমস্ত সংসারই সন্নিবিষ্ট। এই

সর্ব্বাত্মক প্রণবকে হংসরূপে বর্ণনা করিয়া, ঐ হংসের শরীরে সমস্তগুণ, সমস্তশক্তি ও সমস্তলোকের সংস্থান নির্দ্ধারণ করিয়া, উপনিষদের ঋষি যে বিরাট্ মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, তাহা বিশ্বরূপদর্শকের কাছে অমূল্য! উপনিষদের এই বিরাট্ হংসই যে সর্ব্বলোকময় পুরুষ, তাহা পুরাণকার স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অকার ও উকার—সৃজন ও রক্ষণশক্তি হংসের পদদ্বয়; সংসারের পরম্পরা এই দুই শক্তিদ্বারাই রক্ষিত হয়, এজন্য ইহাকেই 'পক্ষ' বলা হইয়াছে। কেননা, পক্ষীর গমন-সাধনই 'পক্ষ'। 'ম'কার বা সংহারশক্তি, সৃষ্টিস্থিতির সামঞ্জস্য রক্ষা করে। সংহার না থাকিলে সৃষ্টিস্থিতির গতি যথোচিত পথে চলিতে পারে না, এজন্য উহা পুচ্ছ। বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, পক্ষীর শুধু পক্ষদ্বয় থাকিলেই চলেনা, পুচ্ছও চাই। পক্ষদ্বয় যেন নৌকার দাঁড়, পুচ্ছ কর্ণ বা হা'ল। দাঁড় টান, চলিবে, কিন্তু হা'ল না ধরিলে, গতি ঠিক্ থাকিবেনা, সামঞ্জস্য থাকিবেনা, এখানেও তাই। সংহারশক্তি সেই হা'লের কার্য্য করে, সৃষ্টিস্থিতির গতি ঠিক্ পথে চালায়, এজন্য উহাই পুচ্ছ। শরীর সত্ত্বময়, কারণ সত্ত্বই প্রকাশ। রজ ও তমঃ চরণ, কারণ উহা অধঃস্রোতের অন্তর্নিবিষ্ট। অর্দ্ধমাত্রা মহাশক্তিস্বরূপা, উহাই হংসের শির। ত্রিগুণতত্ত্বের জীবনমরণ সেই মহাশক্তিরই হাতে, কাজেই উহা হংসের সর্ব্বাঙ্গরক্ষক মস্তকস্বরূপে বর্ণিত। 'ভূ'লোক তমোবহুল, এজন্য চরণ-দ্বয়ে কল্পিত। ক্রমে ক্রমে রজোবহুল এবং সত্ত্ববহুল শ্রেষ্ঠ লোক সকল হংসদেহের ঊর্দ্ধভাগেই বিরাজিত, দেখা যায়। ইহাতে স্বাভাবিক সামঞ্জস্যের বাধা হয় নাই। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হংসের চক্ষু যুগল। শরীর, মস্তক, পক্ষ, পুচ্ছ, চরণ—সবই থাকিল, কিন্তু চক্ষু না থাকিলে অন্ধ পক্ষীর গন্তব্য স্থান স্থির করা কঠিন হইবে, এমন কি আত্মরক্ষারও সুবিধা হইবে না, সুতরাং চক্ষু চাই-ই। সংসারের সৃষ্টিস্থিতিনাশ ধর্ম্মাধর্ম্ম-নিমিত্তকই হয়। সমস্ত কর্ম্মই দুইভাগে বিভক্ত, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম। কর্ম্মই উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহৃতির হেতু। কর্ম্ম নইলে যেমন জগৎ চলেনা, চক্ষু বিনাও তেমনি পাখী আত্মরক্ষা করিতে পারে না, সুতরাং কর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্মই চক্ষুরূপে বর্ণিত হইতেছে। এই সর্ব্বাত্মক-প্রণব-প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরস্বরূপ হংসকে উপাসনা-বলে আয়ত্ত করিলে, সাধক যে পাপভয় দূরে নিঃক্ষেপ করিতে পারিবেন, তাহাতে সংশয় কি? ঋষি বলিতেছেন, এস্থলে সহস্রাহ্ন্য-মন্ত্র প্রদর্শিত-হইতেছে। সহস্রাহ্ন্যমন্ত্র এই—"সহস্রাহ্ন্যং বিয়তাবস্য পক্ষৌ, হরের্হংসস্য পততঃ স্বর্গং, সদেবান্ উরস্যুপদধ্য সাক্ষী, সম্পশ্যন্ যাতি ভুবনানি বিশ্বা।" সহস্রকিরণ-সমাকুল দ্যুলোকে গমনকারী পাপহারী প্রণবরূপ হংসের 'অ'কার 'উ'কাররূপ পক্ষদ্বয় বিরাজমান। সেই প্রণব-হংস সমস্ত দেব-শক্তিকে হৃদয়ে নিহিত রাখিয়া, চরাচর সমস্ত সংসার যথাযথরূপে অবলোকন করিয়া, শাশ্বতপদে প্রয়াণ করে, তদাশ্রিত উপাসকও সেই সঙ্গে পরমপদ প্রাপ্ত হন। প্রকৃত প্রস্তাবে এখানে সহস্রাহ্ন্যমন্ত্রই বিস্তৃতরূপে বিবৃত। ১-৩

আগ্নেয়ী প্রথমা মাত্রা বায়ব্যেষা বশানুগা।
ভানুমণ্ডলসঙ্কাশা ভবেন্মাত্রা তথোত্তরা। ৭
পরমা চার্দ্ধমাত্রাচ বারুণীং তাং বিদুর্ব্বুধাঃ।
কলাত্রয়ান্বিতা বাপি তাসাং মাত্রা প্রতিষ্ঠিতা।
৮
এষ ওঙ্কার আখ্যাতো ধারণাভির্নিবোধত। ৯

অনুবাদ। প্রণবের প্রথমমাত্রা আগ্নেয়ী অগ্নিদেবতাকা, মধ্যম-মাত্রা বায়ুদেবত্যা ও প্রথম এবং তৃতীয় মাত্রার মধ্যগত বিধায় উভয়ের বশবর্ত্তিনী, উত্তর মাত্রা সূর্য্যমণ্ডল-সঙ্কাশা সূর্য্যদেবতাকা, অর্দ্ধমাত্রা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, উহা বরুণদেবত্যা—ইহা বুধগণ বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত চারি মাত্রারই আবার তিনটী করিয়া মাত্রা আছে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত—এই ত্রিধা বিভাগ প্রত্যেক মাত্রারই আছে। এই মাত্রাময় ওঙ্কার ধারণাদ্বারা অবগত হও।

মন্তব্য। 'অ'কার, 'উ'কার, 'ম'কার ও অর্দ্ধমাত্রা, এই চারিটীর প্রত্যেকেই উদাত্তাদিভেদে ত্রিবিধ হওয়ায় প্রণবের ত্রিমাত্রাত্মক দেহে দ্বাদশ মাত্রার সংস্থান স্থিরীকৃত হয়। এই মাত্রাতত্ত্ব স্থূলজ্ঞানের গোচর নয়, সাধনাদ্বারায় সদ্গুরুকৃপায় ইহার অনুভূতি হয়। ৭-৯

ঘোষিণী প্রথমামাত্রা বিদ্যুন্মালা তথাপরা।
পতঙ্গীচ তৃতীয়াস্যাৎ চতুর্থী বায়ুবেগিনী। ১০
পঞ্চমী নামধেয়াচ ষষ্ঠীচৈন্দ্রী বিধীয়তে।
সপ্তমী বৈষ্ণবীনাম শাঙ্করীচ তথাষ্টমী। ১১
নবমী মহতীনাম ধ্রুবেতি দশমী মতা।
একাদশী ভবেন্মৌনী ব্রাহ্মীতি দ্বাদশী মতা।
১২

প্রথমায়াস্তু মাত্রায়াং যদি প্রাণৈর্বিযুজ্যতে।
স রাজা ভারতে বর্ষে সার্ব্বভৌমঃ প্রজায়তে।
১৩
দ্বিতীয়ায়াং সমুৎক্রান্তো ভবেদ্ যক্ষোমহাত্মবান্।
বিদ্যাধরস্তৃতীয়ায়াং গন্ধর্ব্বস্তু চতুর্থিকাম্। ১৪
পঞ্চম্যামথ মাত্রায়াং যদি প্রাণৈর্বিযুজ্যতে।
উষিতঃ সহদেবত্বং সোমলোকে মহীয়তে।
১৫
ষষ্ঠ্যামিন্দ্রস্য সাযুজ্যং সপ্তম্যাং বৈষ্ণবং পদম্।
অষ্টম্যাং ব্রজতে রুদ্রং পশূনাঞ্চ পতিস্তথা। ১৬
নবম্যাঞ্চ মহর্লোকং দশম্যাঞ্চ ধ্রুবংব্রজেৎ।
একাদশ্যাং তপোলোকং দ্বাদশ্যাং ব্রহ্ম শাশ্বতম্। ১৭

অনুবাদ। প্রণবের চতুরক্ষরের দ্বাদশ মাত্রার মধ্যে প্রথমামাত্রা ঘোষিণী, দ্বিতীয়া বিদ্যুন্মালা, তৃতীয়া পতঙ্গী, চতুর্থী বায়ুবেগিনী, পঞ্চমী নামধেয়া, ষষ্ঠী ঐন্দ্রী, সপ্তমী বৈষ্ণবী, অষ্টমী শাঙ্করী, নবমী মহতী, দশমী ধ্রুবা, একাদশী মৌনী ও দ্বাদশী মাত্রা ব্রাহ্মী নামে আখ্যাত হয়। যদি প্রণবের চতুরক্ষরের দ্বাদশ মাত্রার মধ্যে প্রথমা মাত্রায় চিত্ত-ধারণ সময়ে সাধকের দেহপাত হয়, তবে ঐ সাধক ভারতে সার্ব্বভৌম রাজা হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন ঐরূপ দ্বিতীয় মাত্রায় চিত্ত-নিবেশ-কালে মরণ হইলে, সাধক যক্ষরূপ প্রাপ্ত হইবেন। তৃতীয় মাত্রায় চিত্তধারণকালে মৃত সাধক বিদ্যাধর ও চতুর্থমাত্রা-চিন্তন-সময়ে দেহত্যাগকারী সাধক গন্ধর্ব্ব হইবেন। পঞ্চমমাত্রায় চিত্তসংযোগ-সময়ে সাধকের দেহপাত হইলে তিনি দেবত্ব লাভ করিয়া চন্দ্রলোকে পূজিত হইবেন। ষষ্ঠমাত্রায় মনোনিবেশকালে

মরণ হইলে ইন্দ্র-সাযুজ্য লাভ হইবে। সপ্তম-মাত্রার চিত্তাভিনিবেশপূর্ব্বক দেহনাশ ঘটিলে বৈষ্ণবপদ-প্রাপ্ত হইবে। অষ্টম-মাত্রায় মনোনিবেশকালে যে সাধকের প্রাণ-বিয়োগ ঘটিবে, তিনি পশুপতির সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবেন। একাদশ মাত্রায় চিত্ত-ধারণ-সময়ে প্রাণপাত হইলে সাধক তপোলোকে গমন করিবেন এবং দ্বাদশ-মাত্রায় চিত্ত-সংস্থাপন-সময়ে দেহ-পাত ঘটিলে ব্রহ্মপদ-প্রাপ্তি ঘটিবে।

মন্তব্য। ধারণার পার্থক্য অনুসারে ফল-পার্থক্য ঘটিতে পারে। এ তত্ত্ব মানুষ-বুদ্ধির গোচর, কিন্তু কোন্ সাধনায় ব্রহ্ম-লোক আর কোন্ সাধনায় চন্দ্রলোক-লাভ হইবে, তাহা মানুষের অজ্ঞেয়, একমাত্র শাস্ত্রগম্য।

ততঃ পরতরং শুদ্ধং ব্যাপকং নিষ্কলং শিবম্।
সদোদিতং পরং ব্রহ্ম জ্যোতিষামুদয়োযতঃ।

অনুবাদ। (প্রণবের শেষাক্ষরের চিন্তা বা ধারণার ফল কথিত হইতেছে।) দ্বাদশমাত্রাতীত শুদ্ধ ব্যাপক নিষ্কল মঙ্গলময় সদাবিরাজমান সর্ব্বজ্যোতিঃ-প্রকাশক পর-ব্রহ্ম-লাভই নাদ-ধারণার চরম ফল।

মন্তব্য। নির্গুণ নিরঞ্জন-প্রাপ্তি কোনও ক্রিয়া-বিশেষের ফল হইতে পারেনা, সুতরাং এই ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তির কারণ-স্বরূপ ধারণা জ্ঞানাত্মিকা। নাদ-ধারণা সর্ব্বাতীত-তত্ত্ব-প্রকাশরূপা প্রজ্ঞা ব্যতীত অন্য কিছু হইলেই গোল ঘটে। সুতরাং এখানকার ধারণা প্রজ্ঞা-প্রতিমা। ১৮

অতীন্দ্রিয়ং গুণাতীতং মনোলীনং যদাভবেৎ।
অনৌপম্যমভাবঞ্চ যোগযুক্তং তদাবিশেৎ। ১৯

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়াতীত ত্রিগুণাতীত উপমারহিত ভাবপ্রকার-পরিশূন্য পরতত্ত্ব সেই সময়েই প্রকাশ পাইবে, যখন যোগযুক্ত মন তাহাতে বিলীন হইয়া যাইবে।

মন্তব্য। কাষ্ঠে প্রবৃত্ত বহ্নি যেমন কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া স্বয়ংও উপশান্ত হয়, সেইরূপ নাদ-ধারণায় প্রবৃত্ত চিত্ত, নাদ-বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংও বিলীন হইবে। চিত্ত বিলীন হইলে আত্মার উপাধিরূপ অবচ্ছেদক না থাকায় আত্মা স্বয়ম্প্রকাশ গুণাতীত সর্ব্বাতীত স্বরূপে প্রকাশমান হইয়া, আপন আলোকে আপনি প্রকাশ পাইতে থাকিবেন। এই সূক্ষ্মতত্ত্ব টুকু না ভাবিলে ব্রহ্মভাব লাভ অসম্ভব বোধ হইবে। ১৯

তদ্ভক্তস্তৎ-সমাসক্তঃ শনৈর্মুঞ্চেৎ কলেবরম্।
সুস্থিতো যোগচারেণ সর্ব্ব-সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ। ২০

অনুবাদ। যিনি সেই পরমতত্ত্বের ভক্ত, সেই পরমপদার্থেই যাঁহার চিত্ত সমাসক্ত, যিনি সকল সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন, যোগচর্য্যায় সুন্দররূপে ধীরস্থির ভাবে অবস্থিত আছেন, সেই পরম ভক্ত জ্ঞানী—যোগী অচিরে দেহপাশমুক্ত হন।

মন্তব্য। প্রারব্ধ-কর্ম্মবলে যতদিন দেহ বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন সাধক দৃঢ়ভাবে যোগে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রাহ্মীস্থিতি ভোগ করিবেন; অনন্তর যথাকালে প্রারব্ধ-কর্ম্মক্ষয় হইলে এই নশ্বর শরীরকে কাষ্ঠলোষ্ট্রবৎ অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া, বিদেহ-নির্ব্বাণ লাভ করিবেন, আর তাঁহাকে শরীর গ্রহণ করিতে হইবেনা।

ততো বিলীনপাশোঽসৌ বিমলঃ কেবলঃ

প্রভুঃ। স্বেনৈব ব্রহ্মভাবেন পরমানন্দমশ্নুতে পরমানন্দমশ্নুতে। ওঁ শান্তিঃ।

অনুবাদ। মনোলয়ের পরে আত্মাবভাস সম্পন্ন হইলে এই সাধক কর্ম্মপাশ ও দেহপাশ হইতে মুক্ত হন, বিমল কেবল স্বরাট্ ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া পরমানন্দ ভোগ করেন—কৃতকৃত্য হন।

মন্তব্য। এই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, চিরবিকার-স্বরূপ বৈষয়িক সুখ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। ইহা ইন্দ্রিয় বা মনের দ্বারা অনুভূত হয় না, ইহা সুখদুঃখের অতীত এক অনির্ব্বাচ্যরাজ্যের সামগ্রী। ইহা স্বয়ম্প্রকাশ চিদানন্দ, ইহা কোনও বৃত্তিবিশেষ নহে, ইহাই আত্মার স্বরূপপ্রকাশ, ইহাই একমাত্র পরমপুরুষার্থ। ইহা পাইলেই 'ন স পুনরাবর্ত্ততে'।

ওঁ শান্তিঃ।

অথর্ব্ববেদীয়া নাদবিন্দুপনিষৎ
ও
নাদবিন্দুপনিষদ্ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

শ্রীকেদারনাথ ভারতী।

আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক-পদাবলী।

(অধিকাংশতঃ উপনিষৎ অবলম্বন পূর্ব্বক কয়েকটী পদাবলী বিরচিত হইল। আত্মতত্ত্বলাভেচ্ছু সাধু, এ গুলির পাঠ ও তাৎপর্য্যানুশীলন দ্বারা আত্মজ্ঞান-সাধনে অল্প অল্প সাহায্য পাইতে পারেন। বিশেষতঃ তদ্দ্বারা উপনিষৎ ও ভগবদ্গীতার অনেক গুহ্য তত্ত্বও বোধগম্য হইতে পারিবে। এ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক বিচার আমাদিগের প্রয়োজনীয় নহে। জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মতত্ত্বের আবির্ভাব অনুভবার্থ শ্রুতি-প্রতিপাদ্য জ্ঞানের আবৃত্তি করা এবং সাধুসঙ্গে বাস করা সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য বিধায় ইহা প্রকাশিত হইল।)

(১)

নির্গুণব্রহ্ম উপাস্য কি না ?

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। কেঃ উঃ॥ ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ মুঃ ২খঃ। ৮॥ তদ্ধতদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং। স য এতদেবং বেদাহভি হৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি॥ কেঃ উঃ॥

কিঞ্চ তৎ ব্রহ্ম হ কিল তদ্বনং তস্য বনং তস্য তস্য প্রাণিজাতস্য প্রত্যগাত্মভূতত্বাৎ বননীয়ং সম্ভজনীয়ং অতঃ তদ্বনং নাম প্রখ্যাতং। ইতি অনেনৈব গুণাভিধানেন তদ্বনং উপাসিতব্যং চিন্তনীয়ং। সঃ যঃ কশ্চিৎ এতং যথোক্তং ব্রহ্ম (নির্গুণং অপরিচ্ছিন্নং নিরঞ্জনং) এবং যথোক্তগুণং (প্রত্যগাত্মভূতং) বেদ উপাস্তে এবং উপাসকং সর্ব্বাণি ভূতানি অভিসংবাঞ্ছন্তি প্রতিপার্থয়ন্তি॥ শাঙ্করভাষ্যে ৩১ শ্রুতি। তথাচ 'নেদং যদিদমুপাসতে' উপাস্তিক্রিয়াকর্ম্মত্ব-প্রতিষেধোহপি ভবতি। (শারীরকভাষ্যে ১।১।৪)

বাক্য দ্বারা প্রকাশিত যিনি কভু নন।
যাঁহার আশ্রয়ে ফুটে নরের বচন॥

নির্গুণাখ্য ব্রহ্ম বলি তাঁহারে জানিবে।
কি সাধ্য তাঁহারে উপাসনা প্রকাশিবে॥
মন যাঁরে নাহি পারে করিতে মনন।
যাঁর দ্বারা দীপ্তি পায় মনের চেতন॥
তিনি ব্রহ্ম নির্গুণ কহেন ইহা জ্ঞানী।
লোকে যাঁরে উপাসে নির্গুণ নন তিনি॥
ক্রিয়াধর্ম্মী উপাসনা মানস-ব্যাপার।
অহং-তত্ত্ব-আবরণ সদাসঙ্গী তার॥
বাক্য মন চক্ষু শ্রোত্র তাহার যোগান।
ঐহিকে পরত্রে ভোগ্য-ফলের সন্ধান॥
তাহাতে আবৃত হ'য়ে ব্রহ্ম নিরঞ্জন।
উপাস্তি-ক্রিয়াতে কভু দৃষ্ট নাহি হন॥
অতএব লোকে যাঁরে যতনে উপাসে।
নির্গুণ নহেন তিনি বেদে ইহা ভাষে॥
এই হেতু উপাস্তিক্রিয়ার প্রতিষেধ।
ক্রিয়াহীন উপাসনা নহেক নিষেধ॥
ব্রহ্মজ্ঞান চিন্তা মাত্র তাহার লক্ষণ।
লক্ষ্যমাত্র তাহে এক ব্রহ্মনিরঞ্জন॥
জ্ঞানমাত্র রূপ যাঁর মোক্ষ অধিকারে।
উপাসনাক্রিয়া তথা যাবে কি প্রকারে॥
জ্ঞান আর উপাসনে অনেক প্রভেদ।
ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানজ্যোতি কহে ইহা বেদ॥
না থাকিবে যবে হৃদয়ের আবরণ।
তখনি দেখিবে তাঁর আত্মাতে আসন॥
দর্শনে বর্ষিবে জ্ঞান অবিরল ধারে।
নির্গুণ নিষ্ক্রিয় উপাসনা বলি তারে॥
ক্রিয়াধর্ম্মী উপাসনা অহংতত্ত্ব সনে।
প্রভাহীন হবে তদা ব্রহ্ম-দরশনে॥
দৃষ্টমাত্রে সেই পরব্রহ্ম পরাবরে।
না রহে হৃদয়-গ্রন্থি সাধক-অন্তরে॥
সদা হয় তাঁর সর্ব্ব সংশয়ভঞ্জন।
ক্ষয় হয় পূর্ব্বাপর কর্ম্মের বন্ধন॥
অতিক্রমি কর্ম্মকাণ্ড সাধন-ব্যাপার।
নিরঞ্জন জ্ঞান-স্বরূপের অধিকার॥
শ্রুতিসিদ্ধ আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের ধারণা।
তাহাই কেবল হয় ব্রহ্ম-উপাসনা॥
তাহে নাহি জপ তপ ব্রত হোম ধ্যান।
সর্ব্ব উপচার তার একমাত্র জ্ঞান॥
অতএব প্রত্যগাত্মজ্ঞানের আশ্রয়ে।
পূজনীয় হন তিনি জ্ঞানীর হৃদয়ে॥
'তদ্বনং' সম্ভজনীয় নাম খ্যাত তাঁর।
প্রত্যগাত্মা অন্তরাত্মা প্রত্যেক আত্মার॥
জ্ঞানীর উপাস্য সেই গুণ-অভিধানে।
তাহা জানি যিনি তাঁরে পূজেন সজ্ঞানে॥
সেই উপাসকে সদা বাঞ্ছে সর্ব্বভূত।
সমদর্শী সাধু সেই আত্মজ্ঞান-যুত॥
প্রত্যগাত্ম-গুণযোগে ব্রহ্ম নিরঞ্জনে।
পূজেন নিষ্ক্রিয় ভাবে বেদের বিধানে॥
ক্রিয়াধর্ম্মী উপাসনা প্রথমে নিষেধি।
শেষে দিলা নির্গুণের উপাসনা-বিধি॥
নহে তাহা ক্রিয়ারূপী মানস-প্রভাব।
কেবল ব্রহ্মেতে দৃঢ় নির্ভরের ভাব॥
আদি-মধ্য-অন্তে তাহা অপারমহিম।
স্রবে জ্ঞান অবিরল তৈলধারা সম॥
প্রত্যগাত্মজ্ঞান ইহা ব্রহ্ম-উপাসন।
আত্মপ্রীতি আত্মরতি ইহার লক্ষণ॥

(২)

কেবল জ্ঞানের আবৃত্তিই ব্রহ্মোপাসনা।

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে। আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতং॥ ইহচেদবেদীদথ সত্যমস্তি নচেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ। প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ কেনোপনিষৎ ১২। ১৩॥

কেমনে জানিব সেই ব্রহ্ম নিরঞ্জনে।
ধরা নাহি যান যিনি মানবের মনে॥
জানা বা অজানা জ্ঞান যে আছে সংসারে।
ব্রহ্মজ্ঞান তিষ্ঠে তা' সবার পরপারে॥
জানা যান যেরূপে সে ব্রহ্মপরাৎপর।
বেদের সে উপদেশ শুন অতঃপর॥
প্রত্যেক বোধের যিনি প্রত্যগাত্ম জ্ঞাতা।
প্রত্যেক প্রত্যয়ে যিনি জাগ্রত বিধাতা॥
সেভাবে সাধক তাঁরে জানিবেন যদা।
সম্যগ্দর্শন জ্ঞান লভিবেন তদা॥
দীপ্ত পাবে ব্রহ্মবিদ্যা আত্মার যতনে।
উপাজিবে অমৃতত্ব মানব জীবনে॥
যদি জীব এখানে সে আত্মার আত্মারে।
জানিতে সক্ষম হন হৃদয়-মাঝারে,
তাহ'লে নিশ্চয় হবে সফল জীবন।
নতুবা সংসার-গতি কে করে বারণ॥
অতএব বিচারিয়া এই দোষ গুণ।
সর্ব্বভূতবাসী ব্রহ্মে চিন্তিবে নিপুণ॥
যে দেবতা সর্ব্বভূতে স্থাবর-জঙ্গমে।
ধীরগণ সবা চিন্তি সেই অনুপমে॥
সাক্ষাৎ লভেন সেই আত্মার আত্মারে।
অমৃত হয়েন ত্যজি মর্ত্ত্য কলেবরে॥
তাঁদের না হয় আর জনন-মরণ।
লাভ হয় মোক্ষরূপ ব্রহ্ম নিরঞ্জন॥
এই নিষ্ঠা এই চিন্তা এই জ্ঞান সার।
শ্রুতির আবৃত্তি, নিত্যানিত্যের বিচার॥
আচার্য্য-সেবন, বেদান্তার্থের ধারণা।
নাম ধরে আত্মচিন্তা—ব্রহ্ম-উপাসনা॥
অন্যথা যে উপাসনা মানস-বিকৃতি।
ব্রহ্ম-উপাসনা নহে কহে ইহা শ্রুতি॥

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

কে বড় ?

শর্ম্মিষ্ঠা বড় না দেবযানী বড় ? শর্ম্মিষ্ঠা দানবপতি বৃষপর্ব্বার কন্যা, আর দেবযানী দানবগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা। দেবযানী পিতার আদরের মেয়ে, রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠাও অনাদরের নয়। দেবযানী সুরূপা, শর্ম্মিষ্ঠাও অনিন্দ্যরূপা। শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানী পরস্পরের সখী। উভয়েই একত্র ভ্রমণ, অবস্থান, ক্রীড়া-কৌতুক স্নান-পানাদি করে। উভয়েই তেজস্বিনী। উভয়েই বালচাপল্যবশতঃ কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভস্বভাবা।

দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা উপবনে ক্রীড়া করিতেছে। সহচরীরাও ক্রীড়ায় যোগদান করিয়াছে। পুষ্পচয়ন, লতাপাতন মাল্যবিরচন কত কি খেলা হইয়া গেল। শেষে জলক্রীড়ার আরম্ভ হইল। উপবনে মনোরম সরোবর, বিচিত্র তীর্থস্থান, প্রফুল্ল জলজ পুষ্প, জলে তরঙ্গের পর তরঙ্গ—ফুলের হাবুডুবু খাওয়া, জলচর পক্ষীর সানন্দ বিচরণ,—এ মনোরম দৃশ্য দর্শনে শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানীর খেলার আগ্রহ বাড়িয়া উঠিল। বালিকাদ্বয় সরোবরের তীরে কাপড় খুলিয়া রাখিয়া নগ্নাবস্থায় জলে নাবিল। বহুক্ষণ পরে শ্রান্তি বোধ হইলে জল ছাড়িয়া স্থলে আসিল ও ব্যস্তভাবে বস্ত্র পরিতে লাগিল। শর্ম্মিষ্ঠা ভ্রমক্রমে দেবযানীর কাপড় পরিয়া ফেলিল। অমনি প্রগল্‌ভা দেবযানী ঈষৎ ক্রোধভরে চ'খ রাঙাইয়া ঠোঁট কাঁপাইয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ্ শর্ম্মিষ্ঠা! তুই একটুও ভদ্রতা জানিস না; তুই শিষ্যা হইয়া আমার কাপড় পরিলি কেন? দানবি! তোর ভাল

হইবে না।” শর্ম্মিষ্ঠার চরিত্রেও বাল-চাপল্যের অল্পতা ছিলনা। একে রাজার কন্যা, তার পর আবার তিরস্কার—সে আবার যা'র তা'র নয়, সখীর তিরস্কার! শর্ম্মিষ্ঠার হৃদয়ের তারে অভিমানের সুর বাজিয়া উঠিল! শর্ম্মিষ্ঠা কোপে ক্ষোভে অভিমানে আত্মহারা হইল। শর্ম্মিষ্ঠা ভাবিল,—'দেবযানী ও দেবযানীর পিতা, আমাদের আশ্রিত। আশ্রয়দাতার কন্যা হইয়া আশ্রিতের কন্যার কটূত্তর সহ্য করিব কেন?' শর্ম্মিষ্ঠা সুর একটু চড়াইয়া বলিল—'তুই ভিক্ষুকের কন্যা। তোর পিতা সর্ব্বদা আমার পিতার স্তব করে, তুই রাগই কর্‌রিস্ আর চীৎকারই করিস্ আমি তোকে সমকক্ষ বলিয়া মনে করিনা।' ক্রমে মুখোমুখি ছাড়িয়া হাতাহাতি আরম্ভ হইল। শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীকে ধাক্কা মারিয়া এক কূপে ফেলাইয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। দেবযানী কূপে থাকিয়া রাগে গর্‌গর্ করিতে লাগিল, কিন্তু উপায় নাই। কেহ না উঠাইলে নিজে উঠিবার সাধ্য নাই। দুঃখিতা দেবযানী ধৈর্য্য সহকারে উদ্ধার-কর্ত্তার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ঘটনাচক্রে মৃগয়াশ্রান্ত পিপাসার্ত্ত যযাতি রাজা সেই কূপে জলান্বেষণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা জল খুঁজিতে-ছিলেন, সহসা সেই কূপে পতিতা অতুলরূপা দেবযানীকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রাজার পিপাসা পলায়ন করিল! একে ক্ষত্রিয়হৃদয় বিপন্নের প্রতি চির সদয়, তাহার পর আবার দেবযানী দেবীমূর্ত্তি! রাজা কোমল-মধুর-বচনে সাদরে কহিলেন "কে তুমি সুন্দরি! এই কূপের মধ্যে কিরূপেই বা পড়িয়াছ? তুমি উদাসমনে সজল-নয়নে অত ভাবিতেছ কেন? তুমি কাহার কন্যা?" রাজাকে দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া, দেবযানীর হৃদয় আশ্বস্ত হইল। দেবযানী মৃদুস্বরে বলিল—"মহাশয়! আমার পিতা শুক্রাচার্য্য, তিনি সঞ্জীবনী-বিদ্যাবলে মৃতকে জীবিত করিতে পারেন, কিন্তু হায়! আমি যে এখানে পড়িয়া গিয়াছি, তাহা তিনি আদৌ জানেন না। আপনি যদি দয়া করিয়া আমার এই ডা'ন্ হাতখানি ধরিয়া উপরে তোলেন, আমার জীবন রক্ষা হয়।" রাজা তাহাই করিলেন। দেবযানী ব্রাহ্মণের কন্যা, সুতরাং রাজা তাঁহাকে সম্মান সহকারে সম্ভাষণ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

দেবযানীর হৃদয়ে অপমানের প্রবল আগুণ জ্বলিতেছিল। দেবযানী বৈরনির্য্যাতনে প্রতিজ্ঞা করিল। একজন পরিচারিকা দূর হইতে দেবযানীকে দেখিতে পাইয়া কাছে আসিল এবং পুরে যাইবার কথা বলিল। দেবযানীর প্রতিজ্ঞা কঠোর! দেবযানী স্থির করিল, এ অপমানের প্রতি-শোধ না দিয়া একপদও অগ্রসর হইবেনা। দেবযানী দৃঢ়তার সহিত পরিচারিকাকে বলিল, 'তুমি যাও, পিতাকে বলিও, শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে কূপে ফেলিয়া দিয়াছে!' পরিচা-রিকা দ্রুতপদে শুক্রাচার্য্যকে সংবাদ দিল। প্রাণোপমা কন্যার বিপত্তির কথা শুনিয়া, শুক্রাচার্য্য, ব্যস্ত সমস্ত-ভাবে দেবযানীর কাছে উপস্থিত হইলেন। কন্যাকে বুকের মধ্যে

টানিয়া লইয়া দুঃখিত ভাবে বলিলেন "বৎসে! লোকে নিজকর্ম্মদোষেই কষ্ট পায়, আমার মনে হয়, তুমি কোনও কুকর্ম্ম করিয়াছিলে, তাহাতেই এরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াছ। যাহা হউক্, তুমি যে উদ্ধার পাইয়াছ, ইহাই আমার আনন্দ।" দেবযানী ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—'পিতঃ! আমার উদ্ধার না পাওয়াই ভাল ছিল। ভাল জিজ্ঞাসা করি, শর্ম্মিষ্ঠা যে আমাকে বলিল 'তুই স্তুতিপাঠকের কন্যা' তাহাকি সত্য? যদি সত্যই আপনি দানবগণের স্তুতিগায়ক হন, তবে আমি যেরূপে হউক্ শর্ম্মিষ্ঠাকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিব।' এই বলিয়া দেবযানী কাঁদিতে লাগিল। শুক্রাচার্য্য গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "দেবযানি! তুমি ভিক্ষুক বা স্তুতিপাঠকের কন্যা নও, আমি অসুরগণের সেবক নই। আমি তপোবলে অলৌকিক শক্তির অধীশ্বর, অসুরেশ্বর বৃষপর্ব্বা এবং সুরেশ্বর ইন্দ্র আমার শক্তিসামর্থ্য অবগত আছেন। বৎসে! তুমি বৃথা দুঃখ করিওনা। বুঝিতেছি, তুমি ক্রোধবশে শর্ম্মিষ্ঠার বাক্য অসহ্য মনে করিয়াছ। ক্রোধ পরিত্যাগ কর, ক্রোধ নিন্দনীয়, ক্ষমার তুলনা নাই। যাহারা সংযম বা ক্ষমাবলে ক্রোধ রোধ করিতে পারে, তাহারা প্রশংসার পাত্র, আর যাহারা ক্রোধবশে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞানশূন্য হইয়া, অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দেয়, তাহারা নিন্দা-ভাজন হয়। বৎসে! ক্রোধ ত্যাগকর।" পিতার নীতিকথা শুনিয়া দেবযানী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আব্দারের সুরে বলিল, "বাবা" আমি বালিকা হইলেও এ সকল নীতিকথা জানি, অশেষ-নীতিবেত্তা আপনি (শুক্র) আমার জনক, কিন্তু বাবা! যেখানে শিষ্য, গুরুর অপমান করে, যেখানে বংশগৌরব ও গুণগৌরবের আদর নাই, মঙ্গলকামী লোক সেখানে বাস করেন না। শর্ম্মিষ্ঠার গর্ব্বময় অবজ্ঞাসূচক বাক্য আমার হৃদয়ে শেলের মত বিঁধিতেছে। আমি এই গর্ব্বিত শত্রুর আশ্রয়ে থাকা অপেক্ষা মরণও মঙ্গলকর মনে করি। ইহার প্রতীকার না হইলে আমি প্রাণ ত্যাগ করিব।" দেবযানীর সংকল্প দৃঢ়। শুক্রাচার্য্য নীতিধর্ম্মের দোহাই দিয়া কন্যাকে প্রতিজ্ঞা হইতে একপদও টলাইতে পারিলেন না। বরঞ্চ বারম্বার কন্যার উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, নিজেই উত্তেজিত হইলেন। দেখিলেন— দেবযানীর সন্তোষসাধন ব্যতীত আর কোনও মতে শান্তির প্রত্যাশা নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়া অসুররাজের প্রতি কোপের অভিনয় করা কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। শুক্রাচার্য্য দেবযানীকে সেই অবস্থায় রাখিয়া, ক্রোধ-প্রদর্শনার্থে অসুররাজ বৃষপর্ব্বার কাছে গিয়া বলিলেন 'রাজন্! আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি, তুমি অধর্ম্মের প্রশ্রয়দাতা। নিজের দোষ সংশোধন করনা, অথচ প্রকারান্তরে আমার অপমান কর! দেখ, একবার নয়, বহুবার পাপ করিয়াছ, আজ তাহার ফল ফলিবে। বৃহস্পতির পুত্র কচকে তোমার অনুচরগণ পুনঃপুনঃ বিনাশ করিয়াছিল, আমি বিদ্যাবলে তাহাকে বাঁচাইয়াছিলাম। সেই

নিষ্পাপ ব্রহ্মচারী কচের হিংসা করা কি ধর্ম্মসঙ্গত হইয়াছিল? আজ আবার তোমার কন্যা আমার কন্যাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। দৈবক্রমে তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছে। রাজন্! ইহা কোন্ ধর্ম্ম-নীতির অনুমোদিত? তুমি অধর্ম্মের ফল ভোগ কর, আমি চলিলাম।”

শুক্রাচার্য্যের বাক্যাবলী শুনিয়া বৃষপর্ব্বা চ’খে অন্ধকার দেখিলেন! তাঁহার নিকট বোধ হইল—অকস্মাৎ যেন সমস্ত সংসার ঘূর্ণায়মান হইতেছে! নক্ষত্রমালা কুহেলিকা-সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছে! গ্রহগণ কক্ষভ্রষ্ট হইয়া পরস্পর সংঘর্ষে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে চলিয়াছে! অন্ধকার যেন বিশ্ব গ্রাস করিতেছে! সকল আলোক নিবিয়া যাইতেছে! বৃষপর্ব্বার মাথা ঘুরিয়া গেল! কি সর্ব্বনাশ! গুরু চলিয়া যাইবেন! উপায় কি? অসুরগণের একমাত্র সম্বল শুক্রনীতি ও শুক্রবিদিত সঞ্জীবনী বিদ্যা! কেবল এইমাত্র বলেই অসুরগণ দেববলকে অবহেলা করিয়া থাকে। কিন্তু হায়! অসুরের সে গৌরব বুঝি যায়! রাজা বৃষপর্ব্বা কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া, ম্লানমুখে ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, ‘আচার্য্য! আমি স্বপ্নেও আপনার অপমান চিন্তা করি না। আপনিই আমার ভাগ্যনিয়ন্তা ভগবান্। দোষ করিয়া থাকি, ক্ষমা করুন্। আমাকে ত্যাগ করিবেন না। আর যদি একান্তই আপনি আমাকে পরিত্যাগ করেন, আমি সেই মুহূর্ত্তেই সমুদ্রে ডুবিয়া মরিব।” শিষ্যের আগ্রহা-তিশয্য ও ভক্তিপ্রাচুর্য্য আলোচনা করিয়া অপেক্ষাকৃত অকঠোর স্বরে শুক্রাচার্য্য বলিলেন। রাজন্! তুমি জলেই ডুবিয়া মর, আর যেদিকে ইচ্ছা হয় সেই দিকেই চলিয়া যাও, যাহা ভাল বোধ হয় কর। আমার কন্যার অপমান আমি কদাচ সহ্য করিব না। তবে হাঁ, তোমাকে পরিত্যাগ করিব না, যদি তুমি আমার কন্যা দেবযানীর সন্তোষ-সাধন করিতে পার। দেবযানীর প্রীতি-সাধন ব্যতীত অসুরকুলের মঙ্গল-সংঘটন কল্পনারও অতীত। রাজা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন ‘দেব! আপনি আমার প্রভু, আর আমার যে কিছু ধনরত্ন বিত্তবিভব, তাহারও আপনিই একমাত্র স্বামী। আপনার আদেশে, যেরূপেই হউক্ দেব-যানীর তৃপ্তিসাধন করিবই।’ এইরূপ কথো-পকথনের পর শুক্রাচার্য্য ও বৃষপর্ব্বা দেব-যানীর কাছে উপনীত হইলেন। বৃষপর্ব্বা বিনীতবচনে বলিলেন “দেবযানি! তোমার পিতা আমার ও আমার যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র প্রভু, তাঁহার আদেশে আমি তোমার সন্তোষ-সাধন করিতে আসিয়াছি। তুমি যাহা চাও, তাহাই দিব, যাহা বল, তাহাই করিব, তুমি প্রসন্না হও। দেব-যানি! তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই প্রার্থনা কর, তোমার প্রীতির জন্য আমি অসাধ্য সাধন করিব।” দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার ব্যবহার ও তাহার প্রতীকারার্থে নিজের প্রতিজ্ঞা একবার আলোচনা করিয়া লইল। দেব-যানী ধনরত্ন চায় না, বসন-ভূষণ চায় না, চায় বৈরনির্য্যাতন! চায় প্রতিশোধ! দেব-যানী একটু চিন্তা করিয়াই বলিল “দাসীং কন্যাসহস্রেণ শর্ম্মিষ্ঠামভিকাময়ে। অনু মাং তত্র গচ্ছেৎ সা যত্র দাস্যতি মে পিতা।”

সহস্রকন্যা-পরিবৃতা শর্ম্মিষ্ঠা আমার দাসী হইবে, আর আমি যখন স্বামিগৃহে যাইব, তখন শর্ম্মিষ্ঠা সহচরীগণ লইয়া দাসীভাবে আমার অনুগমন করিবে।' দেবযানীর কি কঠোর কামনা! শুধু শর্ম্মিষ্ঠা দাসী হইলেই চলিবেনা। শর্ম্মিষ্ঠা রমণী-জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইবে! দেবযানীর বিবাহ হইবে, স্বামী মিলিবে, কিন্তু হায়! শর্ম্মিষ্ঠার দাসীজীবনে তাহার অবকাশ নাই! রমণীহৃদয় কোমলতার বাসস্থান, কিন্তু দেবযানীর হৃদয় কি কঠোর! তাহাতে কি নারীজীবনের প্রতি সামান্য সহানুভূতিও নাই? এক্ষেত্রে মানবী দেবযানী দানবী শর্ম্মিষ্ঠাকে অতিক্রম করিয়াছে! প্রতিশোধ কি তীব্র!

দেবযানীর কথা শুনিয়া দৃঢ়চিত্ত বৃষপর্ব্বা ধাত্রীকে ডাকিয়া অম্লানমুখে বলিলেন, 'যাও, শর্ম্মিষ্ঠাকে ডাকিয়া আন, সে দেবযানীর প্রার্থনা পূরণ করুক্।' ধাত্রী অন্তঃপুরে গিয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে সমস্ত সমাচার শুনাইল। শর্ম্মিষ্ঠা বিন্দুমাত্র বিচলিতা হইল না। ধীর-স্থির-ভাবে বলিল, 'আচ্ছা চল, যাইতেছি। দেবযানীর যাহা প্রার্থনা, আমি তাহাতেই রাজী আছি। আমার অপরাধে যেন গুরু শুক্রাচার্য্য এবং গুরুকন্যা দেবযানী পিতাকে পরিত্যাগ না করেন! আমি আনন্দের সহিত পিতার মঙ্গলার্থে আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিব।' এইকথা বলিয়া শর্ম্মিষ্ঠা সহস্র সহচরী সঙ্গে লইয়া দেবযানীর কাছে উপস্থিত হইল। সসম্ভ্রমে দেবযানীকে বলিল 'দেবযানি! আমি এই সহস্র সহচরী সঙ্গে এখন হইতে তোমার দাসী হইলাম, তোমার স্বামিগৃহেও তোমার সঙ্গে যাইব। আমি চিরজীবনের জন্য তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম। সন্তুষ্টা হইয়াছ ত?' শর্ম্মিষ্ঠার গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে! শর্ম্মিষ্ঠা আ'জ রাজকন্যা হইয়াও দেবযানীর দাসী! দেবযানী বিদ্রূপের সুরে উপহাস-ভরে বলিল, "তুমি রাজকন্যা, তুমি ভিক্ষুকের কন্যার দাসী হইবে কেন?" শর্ম্মিষ্ঠা কমলদল তুল্য লোচন যুগল বিস্ফারিত করিয়া, গ্রীবাদেশ ঈষৎ বক্র করিয়া, পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরে প্রত্যুত্তর দিল—"যেন কেনচিদার্ত্তানাং জ্ঞাতীনাং সুখমাবহেৎ। অতস্ত্বামনুযাস্যামি যত্র দাস্যতি তেপিতা। বিপন্ন স্বজনগণের সুখের জন্যই আমি আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিলাম, তোমার দাসী হইলাম।" শর্ম্মিষ্ঠার আয়ত নেত্রদ্বয় ও বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গী তাহার মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। শর্ম্মিষ্ঠা যেন বলিতেছে 'দেবযানি! ভোগে শান্তি নাই, ত্যাগেই শান্তি! আবাহনে শান্তি নাই, বিসর্জ্জনে শান্তি। গ্রহণে শান্তি নাই, দানে শান্তি। আত্মম্ভরিতায় শান্তি নাই, আত্মবিসর্জ্জনে শান্তি।

আ'জ শর্ম্মিষ্ঠা যেন নূতন আলোক দেখিয়াছে, নূতন মন্ত্র শিখিয়াছে, নূতন আদেশ পাইয়াছে! আ'জ আর সে দেবযানীর প্রতি হিংসা প্রকাশ করেনা! আ'জ আর তা'র ক্ষোভ নাই, দুঃখ নাই, দীর্ঘশ্বাস নাই, দৈন্য নাই। আ'জ তা'র গুরুত্ব ফুটিয়া পড়িয়াছে, আ'জ তার ভীরুত্ব টুটিয়া গিয়াছে। আ'জ সে এক নবজাগরণের রাজ্যে উপনীত হইয়াছে। আর দেবযানী—তাহারও আনন্দের সীমা

নাই। সে আজ হৃদয়ের শেল তুলিয়া ফেলিয়াছে, প্রতিশোধ কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া দিয়াছে! পিতার কলঙ্ক—নিজের অপমান—সমস্ত আজ সুদ সমেত পরিশোধ করিয়াছে! তাহার ত আনন্দ হইবারই কথা! কিন্তু বিষম সমস্যা! কে বেশী সুখ লাভ করিল? দু'য়ের মধ্যে কে বড়? যে স্বজনের—সমাজের—স্বজাতির সুখের জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন দেয়, সে বড়, না যে পরের সুখের পথে কাঁটা দিয়া নিজের পিপাসা পূরণ করে, সে বড়? ত্যাগী বড়, না ভোগী বড়? যে সর্ব্বস্ব দান করিয়া সম্বলশূন্য হয়, সে বড়, না যে পরের সর্ব্বস্ব সংগ্রহ করিয়া নিজস্ব বৃদ্ধি করে, সে বড়? সন্ন্যাসী বড়, না সঞ্চয়ী বড়?

সংসারে ত্যাগীর মহত্ত্বের প্রশংসা আছে, কিন্তু সে মহত্ত্বে ভোগ নাই বলিয়া সকলে তাহার সেবা করিতে চায়না। ভোগীর সর্ব্ব-গ্রাসি-পিপাসা প্রশংসার জিনিষ নয়, কিন্তু মুগ্ধ জগৎ তাহারই অনুসরণ করে। যতদিন বিবেকের বাণী কর্ণকুহরে না পৌঁছিবে, কর্ত্তব্যের আহ্বান উপস্থিত না হইবে, ততদিন শতচেষ্টায়ও বুঝা যাইবে না, ত্যাগী বড় না ভোগী বড়! শর্ম্মিষ্ঠা বড় না দেবযানী বড়? এ সমস্যা—সমস্যাই থাকিয়া যাইবে। সংসারের পিপাসার কুয়াসা সরিয়া গেলে, চক্ষু ফুটিবে, তখন দেখা যাইবে কে বড়?

শ্রী——ভারতী
শ্রীভাপিকাটী যশোহর।

গীতায় ভক্তিযোগ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যোগ শাস্ত্র হইলেও তাহাতে উপনিষদের বিশ্বজনীন উদারতা আছে এবং উপনিষদের উপদেশাবলী সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রথিত আছে, তজ্জন্য ইহার অপর নাম গীতোপনিষৎ। গীতামাহাত্ম্যকার বলেন, উপনিষদ্ গাভীতুল্য এবং গীতা দুগ্ধামৃত। স্বয়ং গোপাল নন্দন শ্রীকৃষ্ণ পরম ভক্ত পার্থকে বৎস-রূপে অবলম্বন পূর্ব্বক সুধীজনের পানার্থ এই গীতামৃত দোহন করিয়াছিলেন। এই গীতামৃত-পানে ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলেরই অধিকার আছে। ইহা সংসারী বা উদাসীন—জিজ্ঞাসু বা যোগারূঢ় সকলেরই জন্য প্রযুক্ত। ইহাতে যাঁহার যেমন রুচি ও অধিকার, তাঁহার প্রতি তদনুরূপ শিক্ষা ও উপদেশ বিধান পূর্ব্বক পরিশেষে ভগবৎপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শিত হইয়াছে।

গীতায় চিত্তসংযম ও যোগাভ্যাসানুকূল প্রাণায়ামাদির উপদেশ সর্ব্বত্র ওতপ্রোতরূপে গ্রথিত থাকিলেও বেদান্তের মহাবাক্য 'তত্ত্বমসি' সুস্পষ্ট প্রকটিত রহিয়াছে। ইহার প্রথম ছয় অধ্যায়ে "ত্বং" পদের লক্ষ্যস্বরূপ জ্ঞেয় পদার্থ এবং দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে "তৎ" পদ দ্বারা সেই জ্ঞেয় পদার্থের বিশেষত্ব এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে এই "তৎ" ও "ত্বং" পদদ্বয়ের লক্ষ্যস্বরূপ জ্ঞেয় পদার্থের অভেদ-ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে; এইজন্য গীতার আঠার অধ্যায় প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক ভাগ "ষট্‌ক" নামে অভিহিত।

প্রথম ষট্‌কের প্রথম অধ্যায়ে অর্জ্জুনের বিষাদ-যোগের সূত্রপাত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ, তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ, চতুর্থ অধ্যায়ে কর্ম্ম-সন্ন্যাস যোগ, পঞ্চম অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যান বা অভ্যাস-যোগ দ্বারা আত্মার অবিনাশিত্ব ও নিত্যত্ব এবং তাঁহার যথার্থ জ্ঞান বর্ণনাদি দ্বারা 'ত্বং' পদের লক্ষ্য-স্বরূপ জ্ঞেয় পদার্থ প্রতিপন্ন করেন এবং তদ্দ্বারা জীবহত্যাশঙ্কায় আতঙ্কিত অর্জ্জুনের বিষাদ ও আক্ষেপ অপনোদন করেন।

দ্বিতীয় ষট্‌কের সপ্তম অধ্যায়ে বিজ্ঞানযোগ, অষ্টম অধ্যায়ে তারকব্রহ্মযোগ, নবম অধ্যায়ে রাজগুহ্য-যোগ, দশম অধ্যায়ে বিভূতি-যোগ, একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন-যোগ, এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ দ্বারা পরমাত্মার স্বরূপ-জ্ঞান ও মাহাত্ম্য তথা ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ভূত ভক্তিযোগ বর্ণনা পূর্ব্বক "তৎ"পদের লক্ষ্য-স্বরূপ জ্ঞেয় পদার্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

তৃতীয় ষট্‌কের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রকৃতি-পুরুষ-যোগ, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ, পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তমযোগ, ষোড়শ অধ্যায়ে দেবাসুরসম্পদ্বিভাগ যোগ, সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ, এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে মোক্ষযোগ দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ এবং এতদুভয়ের সংযোগ হইতে সৃষ্টি বা প্রপঞ্চের উৎপত্তি—সত্বরজস্তমোগুণের স্বরূপ ও কর্ম্ম, কর্ম্মের প্রভাব এবং ধর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির যথার্থ স্বরূপ এবং তাহার উপাদানের বিভিন্ন রীতি ইত্যাদি নিরূপণ দ্বারা "তৎ" এবং 'ত্বং' এই দুই পদের অভেদ-ভাব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে দ্বৈতভাব-ধারণা—করিলে নানাবিধ ভ্রম বিকার ইত্যাদি বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই—এবং জন্মমরণাদি অনাদি কর্ম্মপাশ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

মুক্তি বা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সংসার পরিত্যাগ করিতে হয়না। সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ও বহুপুত্রকলত্রসম্পন্ন হইয়াও যদি কোন মহাত্মা মায়া-মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি সংসার-পাশে বদ্ধ হয়েন না, কিন্তু কেহ যদি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়াও বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সংসার-জালে বিজড়িত হইতে হয়। বিষয়-বাসনাই বন্ধন-কারণ। বাসনা চিত্ত হইতে সমুদ্ভূত হয়। সুতরাং নিত্য-চঞ্চল বিক্ষিপ্ত চিত্তকে নিরোধ করিতে পারিলেই—চিত্তের একাগ্রতা উৎপন্ন হয়। চিত্তের একাগ্রতা হইতে আত্মজ্ঞান জন্মে। আত্মজ্ঞান হইলে অনাত্মাতে আত্মবোধ তিরোহিত হয়। আত্মাতে আত্মবোধ না করা এবং অনাত্মাতে আত্মবোধ করা—ইহাই অজ্ঞান বা ভ্রমজ্ঞান। আত্মজ্ঞানালোক দ্বারাই অজ্ঞানান্ধকার বিলুপ্ত হয়। এই অজ্ঞান বিদূরিত হইলে 'অয়মহং' অর্থাৎ আমিই এই ব্রহ্মস্বরূপ অথবা 'অহংব্রহ্মাস্মি' অর্থাৎ আমিই ব্রহ্মস্বরূপ অথবা 'অহমস্মি' অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক আত্মাই আমি ইত্যাকার জ্ঞান হইলে, সংসার-জ্বালা ও নানাবিধ দুঃখ-যন্ত্রণা কর্ত্তৃক জীবকে অভিভূত হইতে হয় না।

যাহারা সর্ব্বদা বিষয় চিন্তাতে ব্যাপৃত, তাহারা কখনও আত্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ

নহে। যাহারা বহুবিধ ফলদায়ক ও মধুর বেদবাক্যে অনুরক্ত এবং নানাবিধ ভোগৈশ্বর্য্য জন্য লালায়িত এবং স্বর্গই যাহাদের পুরুষার্থ, তাহাদের চিত্ত নিয়ত ভোগ ও ঐশ্বর্য্য প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় চিত্তে নানাবিধ-কামনার উদ্ভব ও তত্তৎ কামনোপযোগী ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সুতরাং তাহারা আত্মজ্ঞান-লাভে অসমর্থ হইয়া, স্বর্গ-ভোগান্তে পুনরায় মনুষ্য-যোনি বা তাহা হইতেও অধম যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে (মুণ্ডকোপনিষৎ ও গীতা উভয় দ্রষ্টব্য)।

শ্রীভগবান্ গীতাতে কর্ম্মযোগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন; এবং কর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে অর্জ্জুনকে সর্ব্বত্র অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গীতোক্ত কর্ম্ম—সকাম কর্ম্ম নহে। বেদেও কর্ম্মের যথেষ্ট প্রশংসাবাদ দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহা সকাম. সুতরাং বেদোক্ত কর্ম্ম—ও গীতোক্ত কর্ম্ম—সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তজ্জন্য তিনি "ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" ইত্যাদি শ্লোকে সকাম বৈদিক কর্ম্ম—পরিহারপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অর্জ্জুনকে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়াছিলেন। নিষ্কাম হইতে না পারিলে জীবের নিত্য-সন্নিবিবর্ত্তিনী—অনাদি-কামনাময়ী প্রকৃতির হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা নাই! তজ্জন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কামনা নাশের উপায়ীভূত নির্গুণ (প্রকৃতিমুক্ত) ও সগুণ ব্রহ্মোপাসনার প্রণালী বর্ণনা করিয়াছিলেন।

এই অদ্বৈত, অব্যক্ত, অক্ষর ও নিরাকার ব্রহ্মের "তত্ত্বমসি" বা "অহং ব্রহ্মাস্মি" ভাব বুঝাইবার জন্য তিনি নানাস্থানে "মৎ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সকল বাক্যে পরব্রহ্মের অবিকারিতা, অবৈষম্য, অসঙ্গত্ব, ঔদাসীন্য ইত্যাদি লক্ষণ; নির্গুণ নিরাকার. সচ্চিদানন্দ ইত্যাদি উপাধি; এবং তাঁহার বিশ্ব-সৃষ্ট্যাদির কর্তৃত্ব, বিশ্বনিয়ন্তৃত্ব, শুভাশুভ-কর্ম্মকারয়িতৃত্ব, বন্ধমোক্ষাদি-বিচিত্র-ফল-দাতৃত্ব ইত্যাদি মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অবশেষে দশম অধ্যায়ে তাঁহার বিভূতি এবং তাহার উপসংহারে "অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৪২॥" ইত্যাদি অবগত হইয়া অর্জ্জুন শ্রীভগবানের স্বরূপ-দর্শনে অভিলাষী হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে তাঁহার "বিশ্বরূপ" প্রদর্শন করেন।

শ্রীভগবান্ এই 'বিশ্বরূপ-দর্শন অধ্যায়ে' সাকারমূর্ত্তি প্রদর্শনকালে পুনঃপুনঃ "মৎ" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। অপিচ জ্ঞান-কর্ম্ম-ন্যাস-যোগ এবং বিজ্ঞান-যোগ প্রসঙ্গে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে অর্জ্জুনের এই ধারণা হইয়াছিল যে, অন্যান্য উপাসকগণ মধ্যে জ্ঞানীই (নিরাকার ব্রহ্মোপাসক) শ্রেষ্ঠতম এবং তৎ প্রসঙ্গে যে "মৎ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাদ্বারা নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছিল। তজ্জন্য একাদশ অধ্যায়ের উপসংহারে 'মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।" ইত্যাদি বাক্যশ্রবণে তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, এই "মৎ" শব্দ দ্বারা নিরাকার ব্রহ্ম লক্ষ্য করা হইয়াছে অথবা সাকার মূর্ত্তি উদ্দিষ্ট হইয়াছে; অথবা শ্রীভগবান্ অব্যক্ত ও অক্ষর

ব্রহ্মোপাসককে প্রশংসা করিতেছেন কিম্বা সগুণ ও সাকারোপাসকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন! পরমভক্ত অর্জ্জুনের এই সন্দেহ নিরাকরণ জন্য দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তি-যোগের অবতারণা।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন যে—

"এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ ১

এইরূপে সতত তদ্গত-চিত্তে যে সকল ভক্ত তোমার সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বৈশ্বর্য্য সম্পন্ন বিশ্বরূপ আরাধনা করেন, আর যাঁহারা কেবল অক্ষর ও অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ কে?

তদুত্তরে শ্রীভগবান্ কহিলেন যে—

"ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২

আমার মতে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ বিশিষ্ট পরমেশ্বরে সমাহিত ও তদ্গতচিত্ত হইয়া, যে সকল ভক্ত, শ্রদ্ধা সহকারে আমার উপাসনা করেন তাঁহারাই যুক্ততম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম যোগী।

শ্রীভগবান্ একাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকেও বলিয়াছিলেন—মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরম ইত্যাদি। "মদর্থং কর্ম্ম করোতীতি মৎকর্ম্মকৃৎ অহমেব পরমঃ পুরুষার্থো যস্য স, মমৈব ভক্ত আশ্রিতঃ পুত্রাদিষু সঙ্গবর্জ্জিতঃ নির্ব্বৈরশ্চ সর্ব্বভূতেষু এবম্ভূতো যঃ স মাং প্রাপ্নোতি নান্য ইতি স্বামী। অর্থাৎ যে ভক্ত আমার কর্ম্ম করেন, যাঁহার আমিই—পরম পুরুষার্থ—যিনি আমারই ভক্ত ও পুত্রাদিতে অনাসক্ত এবং যাঁহার কাহারও সহিত বিবাদ নাই ও যিনি সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, সেই ভক্ত আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'তাঁহার কর্ম্ম কি?' "আত্মকর্ম্ম অর্থাৎ প্রাণকর্ম্মই ভগবানের কর্ম্ম—যাহা সদ্গুরু ব্যতীত অন্যের নিকট—পাওয়া যায় না। ঐ কর্ম্মের দ্বারা যে অনন্য-ভক্তি হয়, তাহাই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। সাধকের যখন ঐরূপ—ভক্তির অবস্থা হয়, তখনই তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে সঙ্গবর্জ্জিত, সকলভূতে সমদর্শী নিত্যযুক্ত ইত্যাদি হইতে পারেন, নতুবা অন্য অবস্থায় ঐরূপ হওয়া যায় না। এই আত্ম-কর্ম্মই আত্মযোগ এবং ইহারই প্রভাবে অর্জ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন।" আর্য্য-মিশন্ ইনষ্টিটিউশন্ হইতে প্রকাশিত গীতা।)

অর্জ্জুন এই চর্ম্মচক্ষুতে সেই বিশ্বরূপ দর্শন করেন নাই। মহাযোগেশ্বর হরির যোগমায়াবৃত বিশ্বরূপ অর্জ্জুনের জ্ঞান চক্ষু-সম্মুখে প্রকটিত হইয়াছিল। অঘটন ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ায় আচ্ছন্ন সেই অত্যাশ্চর্য্য বিরাটরূপ সূক্ষ্ম দিব্যদৃষ্টি ভিন্ন এই প্রত্যক্ষীভূত চর্ম্মচক্ষুর গোচরীভূত নহে। এই দিব্যদৃষ্টি সদ্গুরু-প্রসাদে লাভ হয় এবং প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি কর্ত্তৃক সেই বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষীভূত হয়।

শ্রীভগবানের বিরাট্‌রূপ—দর্শনে অর্জ্জুন আতঙ্কিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন:—

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিত-মাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্॥ ৪৭

অর্থাৎ "হে অর্জ্জুন, তব আত্মযোগাৎ (আত্মনো যোগবলেন হেতুনা) প্রসন্নেন ময়া ইদং তেজোময়ং বিশ্বং (বিশ্বাত্মকং)

অনন্তম্ আদ্যঞ্চ মে পরং রূপং দর্শিতম্ যৎ (মম রূপং) ত্বদন্যেন (ত্বৎসদৃশাৎ ভক্তাদন্যেন) ন দৃষ্টপূর্ব্বম্॥ ৪৭

"হে অর্জ্জুন, আমি তোমার যোগবল-প্রভাবে প্রসন্ন হইয়া আমার এই তেজোময় বিশ্বাত্মক অনন্ত বা আদ্য পরমরূপ দেখাইলাম, যাহা তোমার ন্যায় ভক্ত ব্যতীত অপর কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই।"

(আর্য্য, মিঃ ইঃ কর্ত্তৃক প্রকাশিত গীতা)

শ্রীভগবান্ ইতিপূর্ব্বেও যোগাভ্যাস প্রসঙ্গে উক্ত যুক্ততম যোগীরই প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং অর্জ্জুনকে যোগাভ্যাস করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। যোগাভ্যাসানুকূল আসন, উপবেশন, আহার, বিহার, নিদ্রা ইত্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া "যোগারূঢ়" পুরুষের প্রকৃতি ও অবস্থা এবং যোগের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়াছিলেন। উন্মত্ত মর্কটবৎ চঞ্চলস্বভাব মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করে, সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ পূর্ব্বক আত্মার বশীভূত করা অতীব দুঃসাধ্য বোধে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হে কৃষ্ণ! যদি কেহ প্রথমে অতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যোগাভ্যাস আরম্ভ পূর্ব্বক বিষয়প্রবণ ও মমতাকৃষ্ট চিত্তকে যথোপযুক্ত রূপে সংযত করিতে না পারে এবং তজ্জন্য যোগসিদ্ধি-লাভ করিতে না পারে, তবে তাহার পরিণাম কি হইবে? বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া স্বর্গলাভেও অসমর্থ—অপিচ যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া তোমার স্বারূপ্য রূপ মোক্ষ প্রধান শান্তিলাভেও অসমর্থ হইবে। হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় হইতেছে যে, যেমন এক মেঘ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এবং মেঘান্তর প্রাপ্ত না হইয়া ছিন্ন মেঘ বিনষ্ট হয়, সেইরূপ উক্ত যোগভ্রষ্ট পুরুষ কি নিরাশ্রয় ও ব্রহ্মলাভে অসমর্থ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় না? তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যোগভ্রষ্ট পুরুষের পুরুষার্থের অপূর্ব্বতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন যে, যোগভ্রষ্ট পুরুষই মুক্তিলাভ বিষয়ে পূর্ব্বজন্মের অভ্যাস-বশতঃ অধিকতর যত্ন করিয়া থাকেন এবং কোন অন্তরায় বা বিঘ্ন বশতঃ ইচ্ছা না করিলেও পূর্ব্বজন্মকৃত অভ্যাসই তাঁহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করে এবং তিনিও যোগ জিজ্ঞাসু হইয়া বেদোক্ত কর্ম্মফল উপেক্ষা করিয়া উৎকৃষ্ট যোগফললাভের প্রযত্ন করেন। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হইতে প্রযত্ন কর। কারণ যোগী, তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যত প্রকার যোগী আছেন, তন্মধ্যে যিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন আমাতে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে ভজন পরায়ণ হন, তিনিই আমার মতে সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। *

* "তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
"কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥ ৪৮"
(ষষ্ঠ অধ্যায়)

'যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ'॥ ৪৭

"মদগতেন মধ্যাসক্তেনান্তরাত্মনা মনসা যো মাং পরমেশ্বরং শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্ ভজতে স যোগযুক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠো মম সম্মতঃ অতো মদ্ভক্তো ভবেতি ভাবঃ।"

'আত্ম যোগমবোচদ্ যো ভক্তিযোগ-শিরোমণিং।
তং বন্দে পরমানন্দং মাধবং ভক্ত-সেবধিং'॥ ৪৭
(শ্রীধরস্বামী) ।

ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ইতিপূর্ব্বেও যোগীরই প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে দ্বাদশ-অধ্যায়োক্ত ভক্তিযোগের দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ তাহাই—কহিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ দে।

যোগ-দর্শন ভাষ্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ-বিশেষ ঈশ্বরঃ॥ ২৪

ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, আশয়, যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা এমন যে আত্মারাম-প্রভু তিনিই ঈশ্বর।

১। ক্লেশ—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ—এই পঞ্চ নামে খ্যাত। ইহার বিষয় পরে বিবৃত হইবে।

২। কর্ম্ম—(ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ) নানাপ্রকার কর্ম্ম—যাহা জীব নিয়তই করিতেছে।

৩। বিপাক—উক্ত কর্ম্মের ফল (যাহা সুখ দুঃখ নামে অভিহিত।)

৪। আশয়—সংস্কার অর্থাৎ কর্ম্ম করার পর চিত্তে সেই কর্ম্মের সূক্ষ্মভাব অঙ্কিত হয় ছাপ লাগার ন্যায়) তাহাই আবার জীবকে ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক কর্ম্মে প্রেরণ করে।

অন্য লক্ষণ কথিত হইতেছে—

তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্। ২৫

তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞতার অনুমাপক পরিপূর্ণ জ্ঞানশক্তি বিদ্যমান আছে—অর্থাৎ তিনি জ্ঞানানন্দঘন।

অন্যলক্ষণ যথা—

স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। ২৬

তিনিই পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টিকর্ত্তাদিগের গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা। (তাঁহা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে) তিনি কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন অর্থাৎ সকল কালেই তাঁহার অস্তিত্ব।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ॥ ২৭

ওঁকার (ওঁ) ঈশ্বরের প্রকাশক। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইরূপ;—একমাত্র সচ্চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মই আছেন; আর কিছুই নাই। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিলেন "অহং বহুস্যাম্" আমি বহু হইব। ইহাই আদি-ভাবনা। আদি ভাবনাই আদি স্পন্দন; এই আদি স্পন্দনই ওঁকার। ইহাই প্রকৃতি। যেমন শান্ত সাগর হইতে আদি বা প্রথম তরঙ্গ উঠে, ইহাও সেইরূপ। ইহাই ওঁকার। এই ওঁকারই আদি প্রকৃতি। প্রকৃতি ত্রিগুণান্বিতা (বা ব্রহ্মের বহু হইবার ইচ্ছা) সত্ত্ব-প্রধান-প্রকৃতিই (ইচ্ছা) মায়া, আর রজস্তমঃ-প্রধান প্রকৃতিই অবিদ্যা। মায়া স্বচ্ছ-দর্পণ স্থানীয় এবং অবিদ্যা অস্বচ্ছ এবং বহুখণ্ডে বিভক্ত ভগ্ন দর্পণ স্থানীয়। ব্রহ্ম এই দুই প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হইলেন। মায়াতে ব্রহ্মের যে প্রতিবিম্ব হইল, তাহা যেমন স্বচ্ছ, অভগ্ন দর্পণে প্রতিবিম্ব পড়িলে নির্ম্মল এক প্রতিবিম্ব পড়ে, সেইরূপ এক নির্ম্মল প্রতিবিম্ব। এই মায়া-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের নামই ঈশ্বর। আর যেমন অনির্ম্মল ও ভগ্ন দর্পণে কাহারও প্রতিবিম্ব পড়িলে অনির্ম্মল ও বহু খণ্ডে বিভক্ত দেখায় সেইরূপ অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া একই ব্রহ্মচৈতন্য বহু প্রাজ্ঞ সাজিলেন। এই অবিদ্যায়

প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের নাম প্রাজ্ঞ। প্রাজ্ঞ বহু হইলেন। ইহার পর আদি স্পন্দন বা ওঁকারই (পুনঃপুনঃ স্পন্দিত হইয়া, অর্থাৎ স্থূল হইয়া) সূক্ষ্মভূত ও পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট বহু লিঙ্গ শরীরের আকার ধারণ করিলেন। এক একটা লিঙ্গশরীরে অহং অভিমান করিয়া প্রাজ্ঞ তৈজস নামে অভিহিত হইলেন। আর সমষ্টি লিঙ্গশরীরে অহং অভিমান করিয়া ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত হইলেন। পুনরায় ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে তৈজসের ভোগের জন্য ওঁকারই আরও স্থূলরূপে স্পন্দিত হইয়া স্থূল পঞ্চ মহাভূতে, বহু স্থূল শরীর এবং জগদাদি ও অন্নাদিরূপে পরিণত হইলেন। এক একটা স্থূল শরীরে অহং অভিমান করিয়া তৈজস বিশ্বনামে অভিহিত হইলেন এবং সমষ্টি স্থূল দেহ বা ব্রহ্মাণ্ডে অহং অভিমান করিয়া হিরণ্যগর্ভ 'বৈশ্বানর' নামে অভিহিত হইলেন। ঈশ্বরের তিন অবস্থা এবং প্রাজ্ঞের তিন অবস্থা—ক্রমে ক্রমে স্থূল হইতে স্থূলতর। প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরও প্রাজ্ঞে কোন ভেদ নাই, এক ব্রহ্ম-চৈতন্যই। কিন্তু মায়া ও অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহু এবং ভিন্নমত (প্রকৃত নয়, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম সেইরূপ) হইলেন। কেন হইলেন? বেদ বলেন "স্বয়মন্য ইবোল্লসন্" আমি অন্যমত হইয়াছি—এই এক উল্লাস।

জীবের যতক্ষণ স্থূলদেহে অহং অভিমান থাকিবে, ততক্ষণ বিশ্ব অবস্থা। সেই অবস্থায় পঞ্চাগ্নিবিদ্যাদ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিলে স্থূলদেহের অহং যাইবে। তখন সূক্ষ্ম দেহে অহং থাকিবে। জীবের এই অবস্থার নাম তৈজস। দহর-বিদ্যাদ্বারা তৈজস অবস্থা অতিক্রম করিয়া প্রাজ্ঞ অবস্থায় যাইতে হইবে। এই অবস্থায় কেবলমাত্র এক অবিদ্যার আবরণ ভাসিবে। সেই সময় গুরু-মুখে 'তত্ত্বমস্যাদি-মহাবাক্য" বিচাররূপ জ্ঞান-সাধনা দ্বারা তাহা হইতে উদ্ধার পাইতে হইবে, ইহাই আধ্যাত্ম-সাধনা।

তাহা হইলে কথা হইতেছে, মায়া প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মের নামই ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম। ওঁকারই ইঁহার প্রকাশক। কারণ 'অহং বহুস্যাম্' রূপ আদি-ভাবনা হইতেই তিনি ঈশ্বর-রূপে প্রতীয়মান হইলেন। সেইজন্য বলা হইয়াছে ওঁকার হইতেই তাঁহার প্রকাশ হইল। কারণ যখন 'বহুস্যাম্' রূপ স্পন্দন (ইহাই ওঁকার) উঠে নাই, তখন একমাত্র পরম শান্ত ব্রহ্মই ছিলেন। কিছুই প্রকাশ ছিল না। তখন বলেই বা কে, দেখেই বা কে। কিন্তু তাঁহার আদি-স্পন্দন হইতে এই সব হইল। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা—নিগূঢ় তাৎপর্য্য সদ্গুরু-বক্ত্রগম্য। ঈশ্বরাদি তিন অবস্থা ব্যাপক, এইজন্য সমধিক শক্তিশালী, আর প্রাজ্ঞাদি তিন অবস্থা ব্যাপ্য, সেইজন্য অল্পশক্তিবিশিষ্ট। এই জন্যই ঈশ্বরাদি তিন অবস্থা পূজনীয় (বা আরাধনার যোগ্য) এবং প্রাজ্ঞাদি তিন অবস্থা পূজক বা আরাধক। সেই জন্যই মহর্ষি পতঞ্জলি বলিতেছেন যে, ঈশ্বর-প্রণিধান করিতে হইবে। এই সম্বন্ধে আরও একটু জ্ঞাতব্য আছে। ঈশ্বর বলিতে তাঁহার তিন অবস্থাই বুঝিতে হইবে। জীবের যখন যে অবস্থা থাকিবে, সেই অবস্থার উপযোগী আরাধনা তাহাকে করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ—জীবের বিশ্বাবস্থায় উপাস্য

বৈশ্বানর। এইরূপ অন্য দুই অবস্থাতেও। ঋষি সংক্ষেপে তাহাই বলিলেন। এখন তাহার উপায় কি? পর সূত্রে তাহাই বলা হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী।

দুর্গাপদে 'দুর্গাদাস!' *

পদ্মগাছের হৃদয় মাঝে
ফুটে ছিল পদ্ম ফুল,
কাল-করী তা উৎপাটিল
কেঁপে আকুল পত্রকুল,
কাল-করী নয় ধর্ম্মরাজা
যতনে তুলিয়ে ধীরে,
মাতৃর্গার পাদ-পদ্মে
অর্ঘ্য দিল পদ্মটিরে!
পূর্ব্ব হ'তে সর্ব্বমতে
এবে সে গৌরবে রবে,
চির-শোভা-সৌরভেতে
অনন্ত অম্লান রবে!
অতুলের তুল্য ফুলে—
উপমার উপহাস!
স্বরূপে রূপক খুলে—
দুর্গা-পদে 'দুর্গাদাস!'

* 'হিন্দু-পত্রিকার' ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরদিন্দু মিত্র মহাশয়ের তিন-বর্ষ-বয়স্ক 'দুর্গাদাস' নামক একটি অতি সুন্দর শিশু সংপ্রতি কাল-কবলিত হওয়ায়, সুকবি শরদিন্দু বাবু তাহার স্মৃতি-সত্তাটিকে এই কবিতা-বিন্দুরূপে হিন্দুপত্রিকার ক্রোড়ে স্থাপন করিয়াছেন, (হিঃ পঃ সঃ)

অতুলের তুল্য নেই,
রূপকে স্বরূপাভাস;
মাতৃর্গার ইচ্ছাতেই
দুর্গা পদে 'দুর্গাদাস'

আদিম যুগের জীব জন্তু।

(সঙ্কলিত)

অধুনা পৃথিবীতে, কল্পনার অতীত বিভিন্ন আকৃতির অসংখ্য জীব ও উদ্ভিদ্ বিদ্যমান আছে সত্য, তথাপি অতীত কালের, বিলুপ্ত জীবগণের ভূগর্ভস্থ প্রস্তরী-ভূত কঙ্কাল দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তৎকালে যে সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ্ জগতে বিদ্যমান ছিল, বর্ত্তমান কালের প্রাণী বা উদ্ভিদের সহিত তাহাদের কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। পৃথিবীতে ঐতিহাসিক যুগের বহু পূর্ব্বে যে সমস্ত আশ্চর্য্য বিকটাকার জীব বিদ্যমান ছিল, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর কঙ্কাল জার্ম্মানীর হাম্বর্গ নগরের সন্নিকটে "প্রলয়-কালিক জীবশালা" নামক রমণীয় উদ্যানে, চার্ল্স্ হেগেনবেক্ Charls Hagenbeck) নামক জনৈক প্রত্ন-তত্ত্ব-বিদ্ সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ সকল কঙ্কাল ভূগর্ভে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল বন্য বৃহদাকার জন্তু লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যখন এই পৃথিবীতে বিচরণ করিত, তখন পৃথিবীর অবস্থা কোমল ছিল, উদ্যানটি সেই আদর্শে

হইয়াছে। এই উদ্যানে ভ্রমণ-কালে মনে হয়, আমরা যেন স্মরণাতীত কালের পৃথিবীতে স্বপ্নে ভ্রমণ করিতেছি। কঙ্কালগুলি ভূগর্ভে যেরূপ স্তরে পাওয়া গিয়াছে, সেই ভূস্তর এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রস্তরীভূত উদ্ভিজ্জাদি এই উদ্যানে কঙ্কালগুলির চারিদিকে রাখা হইয়াছে।

আর এক স্থানে সুদক্ষ ভাস্কর জে প্যালেন্‌বার্গ (J. Pallenberg) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এই সমস্ত অদ্ভুত জীবের কৃত্রিম আদর্শ একটী তৃণগুল্মাদি-সমাচ্ছন্ন সুন্দর হ্রদের তীরে এরূপ ভাবে সজ্জিত আছে যে, সহজেই দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এই সমস্ত প্রতিমূর্ত্তির কতকগুলি জলের ধারে লতাগুল্মাদির মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আর কোন্ স্থানে অতিকায় কুম্ভীর এবং এই শ্রেণীর অন্যবিধ অদ্ভুত জন্তুগুলি জলের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিতেছে। দুই একটী দ্বন্দ-যুদ্ধ রত ভীষণ জন্তুর প্রতিমূর্ত্তি এরূপ দক্ষতার সহিত নির্ম্মিত হইয়াছে, যে, দেখিলে সজীব বলিয়া ভ্রম হয়।

পুরাকালীন জন্তুর যে সকল হাড় বা প্রস্তরীভূত কঙ্কাল, পূর্ব্বোক্ত জীবশালা এবং আমেরিকার Museum of Natural History তে স্থাপিত আছে, তাহাদের প্রত্যেকটী, প্রাচীন ভূস্তর-তত্ত্ববিদ্যা-বিশারদগণ বিশেষ যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়া, তাহাদের সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহারা এই সকল কঙ্কালের যে যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক মনে করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপ পরিবর্ত্তিত অবস্থায় শেষোক্ত হ্রদ-তীরবর্ত্তী উদ্যানের কৃত্রিম আদর্শ সকল নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই হ্রদের একটী সেতুর নিকট দুইটী দ্বন্দযুদ্ধরত ভয়ঙ্কর জন্তুর প্রতিমূর্ত্তি প্রথমেই দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করে। Cerato saurus নামক একটী কুম্ভীর-জাতীয় জন্তু, stegosaurus নামক সরীসৃপ-জাতীয় অপর একটী জন্তুকে কামড়াইয়া ধরিয়াছে। কুম্ভীর-জাতীয় জন্তুটীর পশ্চাতের পদদ্বয় কাঙ্গারুর ন্যায় দীর্ঘ ও সম্মুখের পদদ্বয় এবং পুচ্ছ ক্ষুদ্র, আর সরীসৃপ-জাতীয় জন্তুটীর ঘাড়ের নিকট হইতে লেজ পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডের উপর দিয়া একগজ পরিমিত দীর্ঘ দুইসারি মৎস্যের ডানার ন্যায় কণ্টকিত ডানা বা পাখনা আছে। তাহার লেজটী যবের শীর্ষের ন্যায় কণ্টকিত থাকায় তাহাকে এত কদর্য্য ও অকর্ম্মণ্য করিয়াছে যে, সে তাহার অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র আক্রমণকারিকে বাধা দিতে পারিতেছেনা।

একটু দূরে Brontosaurus নামক একটী জন্তু জীবন-সংগ্রামে গত-প্রাণ হইয়া পতিত রহিয়াছে। এই জন্তুটী আকারে বৃহৎ হইলেও প্রতিদ্বন্দ্বিকে পরাভব করিবার উপযুক্ত সামর্থ্য তাহার ছিলনা। Allosaurus (এলসারস্) নামধারী আর একটী গোধাজাতীয় বিকটাকার জীব উক্ত মৃতদেহ ঔদরিকবৎ ভোজনে রত রহিয়াছে। এই বিজয়-উল্লাস-যুক্ত জন্তুটীর প্রকাণ্ড মস্তক, দীর্ঘ ও সূচীমুখ দন্ত দেখিয়া বোধ হয়, ইহারাই তৎকালে হিংস্র জন্তুগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিল। জন্তুটীর সম্মুখ পদদ্বয়ের-তীক্ষ্ণ-নখর-জালিক (থাবা), [illegible]

ব্যাঘ্র প্রভৃতির ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিকে সহজেই ছিন্নভিন্ন করার উপযুক্ত এবং পশ্চাতের পদদ্বয় লম্ফ প্রদানের উপযুক্ত শক্তি-বিশিষ্ট। এই সকল জন্তু সাধারণতঃ স্থলচারী এবং ইহাদের মস্তকের গঠন দেখিয়া বুঝা যায় যে, ইহারা স্তন্যপায়ী অথচ পতঙ্গভোজী জীবের মাঝামাঝি এক শ্রেণীর জীব।

Iguanodon (ইগুয়ানোডোন্) নামধারী আর এক প্রকার জীবের উচ্চতা তদানীন্তন কালের বৃক্ষাদি অপেক্ষা অধিক ছিল। যখন তাহারা উঁচু হইয়া দাঁড়াইত তখন তাহাদের মস্তক ভূমি হইতে ২৫ ফিট্ উচ্চ হইত। Sussex (সাছেক্স) এর বনভূমিতে ইহাদিগের ৩০ ইঞ্চি দীর্ঘ ৪৫ ফিট্ অন্তর যে সকল পদচিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল, তাহা দেখিয়া জানা যায় যে, উহারা পক্ষীর ন্যায় পশ্চাতের পদদ্বয়ে ভরদিয়া ভ্রমণ করিত। ইহারা অতিস্থূল লাঙ্গুলের সাহায্যে খাড়া হইয়া দাঁড়াইত ও পক্ষীর ন্যায় দুই পায়ে ভরদিয়া চলিতে পারিত। ইহাদের দেহের পরিমাণের সহিত ঘাড়ের দীর্ঘতার সামঞ্জস্য ছিল, কিন্তু হাত দুইখানি বা সম্মুখের পদদ্বয় ছোট এবং বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলি অপর তিনটী অঙ্গুলির সহিত সমকোণে গঠিত ছিল। যাহা হউক্ অতি ক্ষুদ্র মস্তক ও মস্তিষ্কের বিধান যে ইহাদিগের জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষার অনুকূল নহে, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

Deplodocus (ডিপ্লোডোকাস্) নামধারী আর এক প্রকার অতিকায় কৃকলাশজাতীয় জন্তু ছিল, ইহারা পূর্ব্বোক্ত Iguanodon (ইগুয়ানোডন্) নামক জীবের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট, কিন্তু আকারে আরও বৃহৎ। ইহারা আমেরিকার Wyoming (আইওমিঙ্গ) Montana (মনটানা) Colorodo (কলোরাদো) New Mixico (নবমেক্সিকো) এবং Dokota (দাকোতা) নামক স্থান সমূহে বাস করিত। তখন এই সকল দেশের জলবায়ু গ্রীষ্ম-মণ্ডলের ন্যায়, এবং বহু লবণাক্ত হ্রদ এই সকল দেশে বিদ্যমান ছিল। ঐ সকল হ্রদ কাল-বশে মজিয়া গিয়াছে। Stellingen Park এ, Diplodocus এর ৬০ ফিট্ দীর্ঘ যে প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, উহা এই জাতীয় জন্তুর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কঙ্কাল হইতে প্রস্তুত নহে, তবে উহা যে সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদের লেজ Iguanodon এর লেজ হইতে দীর্ঘ, কিন্তু পশ্চাতের পদদ্বয় সম্মুখের পদদ্বয় হইতে ছোট নহে, তজ্জন্য ইহারা চারিপায়ে সমান ভরদিয়া ভ্রমণ করিতে পারিত। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ইহাদেরও ঘাড় অতি দীর্ঘ ও মস্তক অতি ক্ষুদ্র ছিল।

যে স্থানে Iguanodon (ইগুয়ানোডোন) এর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে এবং যেস্থানে Deplodocus (ডিপ্লোডোকাস) এর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, তাহার মধ্যবর্ত্তী স্থানে Rhinoceros Saurians নামক এক প্রকার জন্তু তাহার শাবকাদি সহিত হ্রদের মধ্যে জলবিহার করিতে আসিয়াছে; শাবকগুলির পিতা যেন এইমাত্র জলের মধ্য হইতে উত্থিত হইয়াছে এবং মাতা, শাবকগণকে লইয়া জলের তীরে অবস্থান করিতেছে। ইহাদের লেজ সরীসৃপ-জাতীয়

জীবের ন্যায়। অবয়বের গঠন—বিশেষতঃ মুখের আকৃতি দৃষ্টে ইহাদিগকে বর্ত্তমান-কালের গণ্ডার-জাতীয় জীবের পর্যায় ভুক্ত করা হইয়াছে। গণ্ডারের ন্যায় ইহাদের তিনটী খোচ বা খড়্গ, পাখীর ন্যায় চঞ্চু এবং সিংহের ন্যায় ঘাড়ে কেশর আছে।

PlesioSaurus নামক আর এক প্রকার জন্তুর আদর্শ স্থাপিত আছে। উহারা দেখিতে কতকটা শীল মৎস্যের ন্যায়, কিন্তু লেজটী সুদীর্ঘ এবং মাংসল, ঘাড় লম্বা এবং মস্তকটী অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তিমি মৎস্যের ন্যায় ইহাদের ডানা আছে, ঐ ডানার অগ্রভাগ অঙ্গুলির-ন্যায়। কতকটা এইরূপ আকৃতি বিশিষ্ট আর এক প্রকার জন্তু মৎস্য-পর্য্যায়-ভুক্ত হইলেও, বর্ত্তমানকালে তিমি মৎস্য যেরূপ মৎস্য-পর্য্যায়ভুক্ত অথচ স্তন্যপায়ী, সেইরূপ মাংসভুক্ সরীসৃপ-জাতীয় মৎস্যের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিল। ইহাদের ঘাড় ছোট এবং মাংসল, শুঁড় ও লেজ অনেকটা বড় এবং স্ফূর্ত্তি-যুক্ত ভঙ্গিমা-বিশিষ্ট। দেহের গঠন ক্ষুদ্র হইলেও ইহারা অত্যন্ত সন্তরণপটু।

বর্ত্তমান কালে উরগ-জাতীয় জীবের মধ্যে প্রাচীন কালের উরগের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। বাদুড় ও চামচিকার ন্যায় পক্ষি জাতীয় স্তন্যপায়ী এক প্রকার আদি যুগের জীবের প্রতিমূর্ত্তি Stellingen Park এ স্থাপিত আছে। উহারা Pteranodons নামে অভিহিত। ইহারা বাদুড় অপেক্ষাও আকারে বৃহৎ, পুচ্ছ ক্ষুদ্র, সারস পক্ষীর ন্যায় চঞ্চু আছে এবং মস্তকের পশ্চাদ্ ভাগ নাতিদীর্ঘ শিখা-বিশিষ্ট।

মৎস্যপর্য্যায়ভুক্ত সরীসৃপ-জাতীয় জীবের মধ্যেও বর্ত্তমান কালের কুম্ভীরের ন্যায় এক প্রকার জন্তু আদি যুগে বিদ্যমান ছিল; উহাদের শুণ্ড বৃহৎ ও স্থূল এবং পৃষ্ঠদেশের উপর তালপাতার পাখার ন্যায় পাখনা ছিল। কচ্ছপ-জাতীয় আর এক প্রকারের জীবের লেজ ও ঘাড় উপাস্থিময় এবং কর্ণের উপর পার্শ্বে দুইটী অর্ব্বুদ ছিল। আর এক প্রকার পক্ষি-জাতীয় সরীসৃপের নিদর্শন ঐ উদ্যানে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের লেজ সুদীর্ঘ, পুচ্ছ দণ্ডের উভয় পার্শ্বে পেনের ন্যায় কিঞ্জল্ক-বিশিষ্ট; উহাদের ডানার অগ্রভাগে তিনটী অঙ্গুলি আছে এবং চঞ্চু দন্তযুক্ত।

আদি যুগের প্রাণীগণকে জীবন-ধারণের জন্য বর্ত্তমান-যুগের প্রাণীগণ অপেক্ষাও অধিক যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হইত। সময়ে সময়ে ঐ সমস্ত জীবের মধ্যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম সংঘটিত হইত। এই শ্রেণীর দুইটী ভীষণ জন্তুর দ্বন্দ-যুদ্ধ-রত প্রতিমূর্ত্তি Stellingen Park এ স্থাপিত আছে। উহাদের আকৃতি যেরূপ ভীষণ, যুদ্ধও তদনুরূপ ভয়ঙ্কর। কিন্তু উহাদের আকৃতি দেখিয়া জানা যায় যে, প্রকৃতিদেবী উহাদের শারীরিক যে সকল অস্ত্র-শস্ত্র দিয়াছিলেন তাহা জীবন-ধারণের উপযোগী না হওয়ায় এবং কালধর্ম্মে শীতাতপের বৈষম্য ঘটায় তাহাদের অস্তিত্ব এ জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কারণ-সমুদ্রে পৃথিবীর জন্ম-গ্রহণের পর প্রথমে যে সকল জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল, পরবর্ত্তী যুগেও কিছুকাল পর্য্যন্ত

তাহাদের বংশধরগণের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। উহারাই কালক্রমে পক্ষী হইতে সরীসৃপ এবং মৎস্য হইতে স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী-বিভাগে আশ্চর্য্যরূপে ক্রম-পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। এইরূপ ক্রম-পরিবর্ত্তনের মধ্যদিয়াই যে জীব-জগতের অভিব্যক্তি, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ডারউইনের মতবাদ সম্পূর্ণ স্বীকার না করিলেও বলিতে হয়, সৃষ্টির আদি যুগে যে সকল প্রাণী সৃজিত হইয়াছিল, তাহাদেরই বংশধরগণ কালধর্ম্মে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য-দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে। বর্ত্তমান মানবসমাজও একেবারেই সৃজিত বা গঠিত হয় নাই। ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ব-বেত্তাগণ এ বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়াছেন। পৌরাণিক গ্রন্থ-প্রণেতা ঋষিগণের স্থানও এ সম্বন্ধে অনেক উচ্চে। দশাবতারের মূর্ত্তি-কল্পনার মধ্যে, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরে রাম অবতার পর্য্যন্ত অবতার কয়টীতে কালের পরিবর্ত্তনের সহিত; জীবের ক্রমোন্নতি সূচিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে কবিবর স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন যাহা বলিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

* * * * * যুগ উপযোগী
চরম-উন্নতি-অবতারণ যখন
ঘটিয়াছে, সে যুগের সেই অবতার।
প্রথম সলিলে মৎস্য। এই নীতিবলে
সলিল পঙ্কিল যবে, কূর্ম্ম অবতার।
পঙ্ক দৃঢ়তর যবে, আচ্ছন্ন উদ্ভিদে,
হইল বরাহ সৃষ্টি। প্রাণীর শৃঙ্খল
ক্রমশঃ উন্নতিচক্রে হ'য়ে দীর্ঘতর
নরসিংহ অবতার। বিস্ময়-মূরতি!
অর্দ্ধপশু অর্দ্ধনর! ক্রমে পশুভাগ
তিল তিল যুগে যুগে হইয়া অন্তর
বিকৃত মানবমূর্ত্তি জন্মিল বামন।
তিন পদ; ভূমি নাই মিলিল তাহার।
জগৎ অরণ্যময়, হিংস্রজন্তু-বাস।
ঘুরিল উন্নতি চক্র—সকুঠার কর
আসিলা পরশুরাম। বাধিল সমর
বন বনচর সহ; নাহি শরীরেতে
পশুভাগ, পশুবৃত্তি হৃদয়ে প্রবল,
পশু-নির্ব্বিশেষে নর! সেই পশু-ভাব
সেদিন হইতে হ্রাস হইতে লাগিল,
সেই দিন জগতের যুগ বর্ত্তমান।
হইল সঞ্চার। সেই দিন মহাদিন।
প্রকৃত মানব-জন্ম হইল সেদিন।
অশ্রান্ত উন্নতি পক্ষে আসিল কৈশোর,
কৈশোরের রামচন্দ্র প্রীতি-অবতার—
ত্রেতার চরমোন্নতি! * * * *"

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র।

বেদান্তসূত্র
বা
ব্রহ্মসূত্র।*

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম পাদ।

১।" স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্য-স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ।

২। ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ।

১। যদি বলা যায় যে, স্মৃতির (সাংখ্য-দর্শনের) অনবকাশ-দোষ সংঘটিত হইতেছে, তাহা সঙ্গত নয়, কারণ তাহা হইলে অন্য

* প্রথম অধ্যায় পূর্ব্বে হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, এইক্ষণে ২য় অধ্যায়ের প্রকাশ আরম্ভ হইল।

স্মৃতির (মন্বাদিস্মৃতির) অনবকাশ-দোষ ঘটিবে।

২। অন্ত সকলের (সাঙ্খ্য-দর্শন-বর্ণিত মহত্তত্ত্বাদির) অনুপলব্ধিহেতুও উক্ত আপত্তি অগ্রাহ্য।

১ম ও ২য় সূত্র লইয়া একটী অধিকরণ।

প্রথমাধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বরই জগতের উৎপত্তি-কারণ। তিনি যে কেবল নিমিত্ত-কারণ তাহা নয়, উপাদানকারণও বটেন। মৃত্তিকা যেমন ঘটাদির এবং স্বর্ণ যেমন কুণ্ডল প্রভৃতির উপাদান, তিনিও তদ্রূপ এই জগতের উপাদান। উক্ত অধ্যায়ে ইহাও ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, তিনি কেবল জগতের উৎপত্তি-কারণ নহেন, স্থিতিকারণও বটেন। তিনি যেমন উৎপত্তিকারণ ও স্থিতিকারণ, তেমনি এই বিশ্বের লয়কারণ। স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, জরায়ুজ এই চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম যেমন পৃথ্বীতে বিলীন হয়, সেইরূপ সেই পরমেশ্বরেও এই বিশ্ব বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রথম অধ্যায়ে ইহাও প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, সমস্ত বেদান্তবাক্যের সমন্বয়ে প্রতীত হয়, তিনিই এই বিশ্বের আত্মা। এই বিশ্বের কারণ যে সাংখ্যোক্ত প্রধানাদি নয়, তাহাও বেদান্ত-বচন দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

ব্রহ্মই যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যুক্তি ও স্মৃতিমূলক তর্ক-সমূহের নিরসনই দ্বিতীয়াধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

স্মৃতিবাদীরা বলেন, যে, স্মৃতি যখন একটা প্রমাণ, তখন ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, কতকগুলি স্মৃতির অনবকাশ দোষ ঘটে অর্থাৎ কতকগুলি স্মৃতি ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলে না, সুতরাং ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিলে সেই সকল স্মৃতিকে উপেক্ষা করা হয়।

ইঁহাদের মূল কথা এই যে, সাঙ্খ্যশাস্ত্র, যাহা স্মৃতির মধ্যে পরিগণিত, তাহাতে অচেতন 'প্রধান'কেই জগতের কারণ বলা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিলে সাঙ্খ্যস্মৃতির সহিত বিরোধ ঘটে।

সাঙ্খ্যস্মৃতিকে 'তন্ত্র'ও বলা যায়। কপিল ঋষি সাঙ্খ্যশাস্ত্রের প্রণেতা। আসুরি পঞ্চশিখ প্রভৃতি সাঙ্খ্যশাস্ত্রের পরবর্ত্তী আচার্য্য। এইরূপ যদি বলা যায়, যে, ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিয়া মানিলে সাঙ্খ্য-স্মৃতির স্থান থাকেনা, তদুত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মকে জগতের কারণ না বলিলে মন্বাদি স্মৃতিরও স্থান থাকেনা। মন্বাদিস্মৃতির প্রয়োজন দৃষ্ট হয়, কেননা মন্বাদি স্মৃতিতে চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের কর্ত্তব্যাকর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু সাঙ্খ্য-স্মৃতিতে সে সব কিছু নাই, উহাতে কেবল মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধে শ্রুতির বলবত্তা। শাস্ত্র বলেন—শ্রুতিস্মৃতিবিরোধেতু শ্রুতিরেব গরীয়সী। সুতরাং এ বিষয়ে শ্রুতির প্রামাণ্যই অধিক, অতএব শ্রুতিবিরুদ্ধ সাঙ্খ্য-স্মৃতির মোক্ষোপায়োপদেশ অপ্রমাণ। মন্বাদিস্মৃতি, শ্রুতির অবিরোধি এবং উহা মানবের বিভিন্ন কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করিয়াছে বলিয়া তাহার প্রয়োজন আছে, কিন্তু সাঙ্খ্যশাস্ত্রের এরূপ কোনও প্রয়োজনই

নাই। সুতরাং মন্বাদি স্মৃতি যখন শ্রুতির অনুসরণ করে এবং যখন সাংখ্যস্মৃতির অনুগমন করিলে সেই মন্বাদি স্মৃতিরও অনবকাশ ঘটে, তখন ব্রহ্মের জগৎ কারণত্বের বিরুদ্ধে সাংখ্য-স্মৃতিমূলক তর্ক আদৌ সমীচীন নহে।

সাংখ্যবাদীরা বলেন, যে, শ্রুতিতেই কপিলকে উচ্চাসনে দেওয়া হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ (৫-২) বলেন যে—

ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ—অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বয়ংই প্রসূত কপিল ঋষিকে অগ্রে জ্ঞানের দ্বারা ধারণ করিয়া ছিলেন এবং প্রথমেই তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন।

প্রত্যুত্তরে বলা যায়—এই কপিল যে সাংখ্য শাস্ত্র-প্রণেতা, তাহার কোনও প্রমাণ নাই, অপিচ ঐ শ্রুতিতেই প্রকারান্তরে ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। আবার দেখা যায়, শ্রুতিতে সকল স্মৃতি অপেক্ষা মনুরই প্রাধান্য ঘোষিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (২।২।১০।২) দৃষ্ট হয় "যদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্‌ভেষজম্' মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহাই ভেষজ অর্থাৎ ঔষধের ন্যায় মানবের হিতকর। মনু স্বয়ংই বলিয়াছেন, সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সমং পশ্যন্ আত্মযাজী স্বারাজ্য মধিগচ্ছতি। অর্থাৎ যিনি সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন এবং আত্মায় সর্ব্বভূত দর্শন করেন, তিনিই আত্মযাজী, তিনিই স্বারাজ্য প্রাপ্ত হয়েন—ব্রহ্মত্বে উপনীত হন। মনু ইহা দ্বারা কপিলোক্ত বহু-পুরুষবাদের নিন্দাই করিয়াছেন। সাংখ্য-প্রণেতা কপিল পরমপুরুষ ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, প্রধানকেই জগতের কারণরূপে নির্দ্দেশ করেন এবং বহুপুরুষবাদ স্বীকার করেন। বেদান্তমত তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বেদান্তমতে এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় আত্মার অস্তিত্ব নাই, মন্বাদিস্মৃতি এবং মহাভারত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থসমূহের দ্বারাও বেদান্তের পূর্ব্বোক্ত মত সমর্থিত হয়। মহাভারত—

বহূনাং পুরুষানাং হি যথৈকা যোনিরুচ্যতে।
তথা তং পুরুষং বিশ্বমাখ্যাস্যামি গুণাধিকং।

এইরূপ উপক্রম করিয়া তৎপরে বলিতেছেন যে—

মমান্তরাত্মা তবচ যেচান্যে দেহিসংস্থিতাঃ
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোহসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ।
বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ।
একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরচারী যথাসুখম্।

বহুপুরুষের উৎপত্তি-স্থান যেমন একই পৃথিবী, সেইরূপ সেই বিশ্বব্যাপী গুণাতীত পুরুষের কথা বলিব। এইরূপে আরম্ভ করিয়া শেষে বলিতেছেন যে,—তিনি আমার তোমার এবং সমুদয় দেহীর অন্তরাত্মা ও সাক্ষীস্বরূপ, তিনি কাহারও গ্রাহ্য নহেন, তিনি বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্ববাহু, বিশ্বপাদ বিশ্বনেত্র, বিশ্বঘ্রাণ। তিনি একাকীই সর্ব্বভূতে সুখে বিরাজ করেন। শ্রুতি ও বলিয়াছেন—

যস্মিন্ সর্ব্বানি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কোমোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।
ঈশোপনিষৎ ৭।৮

যে ব্যক্তির সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান হইয়াছে, সেইরূপ একত্বদর্শনকারী ব্যক্তির শোকই বা কি মোহই বা কি?

বেদ স্বতঃ প্রমাণ, সুতরাং বেদবিরুদ্ধ সাঙ্খ্যস্মৃতির অপ্রামাণ্য দোষাবহ নহে।

দ্বিতীয় সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, বেদে কোনও স্থলে প্রধান-পরিণাম মহত্তত্ত্বাদির উল্লেখ দেখা যায় না, অথবা মানব ঐ সকল পদার্থ উপলব্ধিও করে না, অতএব সাঙ্খ্য-স্মৃতির অনবকাশ-দোষ দোষই নহে। বেদে কদাচিৎ প্রধানের উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু তাহা সাঙ্খ্যবর্ণিত প্রধান নহে, সেখানে প্রধান শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র। ২ (১ম অধ্যায়ে ৪র্থ পাদের ১ম সূত্র দ্রষ্টব্য।)

৩। এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ।

এতদ্দ্বারা যোগশাস্ত্রের মতও প্রত্যাখ্যাত হইল।

এই একটি সূত্রে ২য় অধিকরণ রচিত।

সাঙ্খ্যশাস্ত্রপ্রণেতা কপিল, যোগশাস্ত্র-প্রণেতা পতঞ্জলি, উভয়েই প্রধানকে জগতের কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং উভয়েই বহুপুরুষবাদী, তবে প্রভেদ এই যে, পতঞ্জলি বহুপুরুষ স্বীকার করিয়াও ঈশ্বর-নামধেয় আর একটী শ্রেষ্ঠপুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং ঐ শ্রেষ্ঠপুরুষের—লক্ষণ তিনি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ—অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক বা কর্ম্মফল ও আশয়ের দ্বারা অপরামৃষ্ট শ্রেষ্ঠ পুরুষই ঈশ্বর। আর এই ঈশ্বরে সর্ব্বজ্ঞত্ব বিরাজমান বলিয়া পতঞ্জলি প্রচার করিয়াছেন যথা—তত্র 'নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম' অর্থাৎ সেই পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞবীজ বিদ্যমান।

বেদান্তমতে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—অর্থাৎ এই বিশ্বই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই বিশ্বের এক-মাত্র কারণ। বর্ত্তমান সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বাধিকরণের দ্বারা যেরূপ সাঙ্খ্যশাস্ত্র নিরস্ত হইয়াছে, যোগশাস্ত্রও তদ্রূপেই নিরস্ত হইয়াছে, তজ্জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন নাই।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে স্বতন্ত্র সূত্র অবতারণার প্রয়োজন কি ? প্রত্যুত্তরে বলা যায়, প্রয়োজন এই যে—শ্রুতিতে যোগ উপদিষ্ট হইয়াছে, যথা—বৃহদারণ্যকশ্রুতি (২। ৪। ৫) আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো-নিদিধ্যাসিতব্য ইতি। অর্থাৎ আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গযোগের মধ্যে নিদিধ্যাসন-পদবাচ্য 'ধ্যান'ই এই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। ঐ প্রকার শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে (২। ৮) আসনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। যথা, ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং"। ঐ প্রকার কঠোপ-নিষদে (২। ৬। ১১) প্রত্যাহারের বিষয়ে কথিত হইয়াছে—তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্"। তৎপরে ঐ শ্রুতিতেই বলা হইয়াছে—বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্—অর্থাৎ সমস্ত বিদ্যা ও যোগবিধি প্রাপ্ত হইয়া। এই সমস্ত শ্রুতিদ্বারা যোগ-বিধির বৈদিক প্রামাণ্য স্থিরীকৃত হইতেছে। সুতরাং এরূপ তর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে, যেমন স্মৃতিতে 'অষ্টকা'র উল্লেখ আছে, বেদেও আছে, এ অবস্থায় বেদের সহিত সমন্বিত হওয়ায় স্মৃতির প্রামা

হয়, তদ্রূপ যোগশাস্ত্রে যোগের কথা আছে শ্রুতিতেও আছে, সুতরাং শ্রুতির সহিত সমন্বয় হওয়ায় যোগশাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়। এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, যোগশাস্ত্রে প্রধানকে জগৎকারণ বলা হইয়াছে বলিয়া, তাহা শ্রুতিরও অনুমোদিত মনে করিতে হয়। সূত্রকার এই সন্দেহ-নিরসনের জন্যই তৃতীয় সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, স্মৃতি যদি শ্রুতির বিরোধী হয়, তবে তাহা অপ্রমাণ, আর শ্রুতিসম্মত স্মৃতি প্রমাণ, কারণ ঐ স্মৃতি শ্রুতি-মূলক। তবে যদি কোনও স্মৃতির কোনও অংশ বেদ-বিরুদ্ধ ও অপর অংশ বেদসম্মত হয়, তবে উহার বেদসম্মত অংশেরই প্রামাণ্য এবং শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশের অপ্রামাণ্য হইবে। যোগশাস্ত্র শ্রুতিসম্মত আসন ধ্যানাদির যে বর্ণনা আছে তাহা গ্রাহ্য এবং উহাতে শ্রুতিবিরুদ্ধ প্রধানের জগৎকারণত্বের যে প্রসঙ্গ আছে, তাহা ত্যাজ্য। সম্প্রতি যোগবাদিরা ইহাতেও নিরস্ত না হইয়া নূতন তর্ক তুলিতে পারেন যে, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে (৬। ১৩) স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে তৎকারণং সাঙ্খ্যযোগাভিপন্নম্, জ্ঞাত্বাদেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ। অর্থাৎ যিনি সাঙ্খ্য-যোগাধিগম্য দেবকে জানিয়াছেন, তিনি সর্ব্বপাশ হইতে বিমুক্ত হন, সুতরাং সাঙ্খ্য-যোগ দ্বারাই যে মুক্তিলাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার উত্তর এই যে, শ্রুত্যুক্ত 'সাঙ্খ্য' ও 'যোগ' বলিতে যে কপিল প্রণীত সাঙ্খ্য ও পতঞ্জলিকৃত যোগশাস্ত্র বুঝিতে হইবে, তাহার কোনও প্রমাণ নাই; বস্তুতঃ এখানে সাঙ্খ্য অর্থ জ্ঞান, এবং যোগ অর্থ কর্ম্ম। বিশেষতঃ শ্রুতিতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়, অর্থাৎ আত্মাই যে একমাত্র সত্যবস্তু এই জ্ঞান ব্যতীত মুক্তির অন্য কোনও পন্থা নাই। কিন্তু সাঙ্খ্য ও যোগ উভয়েই বহুপুরুষবাদী এবং ঐ মত সম্পূর্ণ শ্রুতিবিরুদ্ধ।

এতদ্দ্বারা যে শুধু সাঙ্খ্য-যোগের নিরাস করা হইল তাহা নয়, তর্কমূলক ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতি সমস্ত স্মৃতিই নিরস্ত হইল। গোতমকৃত ন্যায় ও কণাদকৃত বৈশেষিক শাস্ত্রে কয়েকটী পদার্থকে নিত্য বলা হইয়াছে যথা, দিক্ কাল জাতি, সমবায় পরমাণু আকাশ আত্মা প্রভৃতি। কিন্তু শ্রুতির অনুগামী বেদান্ত-মতে এক ব্রহ্মই নিত্য পদার্থ, অপর সমস্ত অনিত্য। এই সমুদয় মত ও শ্রুতিবিরুদ্ধ বিধায় অগ্রাহ্য। তবে যদি একথা বলা যায় যে, এই সমস্ত তর্ক-শাস্ত্র, তর্ক ও উপপত্তি দ্বারা জ্ঞানের সাহায্য করে, তদুত্তরে বক্তব্য—বেদান্তবিৎ তাহা স্বীকার করিয়াও বলেন যে, তত্ত্বজ্ঞান কেবল বেদান্তবাক্য দ্বারাই জন্মিতে পারে। তৈত্তি-রীয় ব্রাহ্মণ (১২। ৩। ৯। ৭) স্পষ্টই বলিয়া-ছেন—নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং, যে ব্যক্তি অবেদবিৎ সে কখনও তাঁহাকে জানিতে পারেনা। বৃহদারণ্যকশ্রুতি (৩। ৯ ২৬) বলি-য়াছেন—তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি— অর্থাৎ আমি সেই উপনিষদুক্ত পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করি। এইরূপ আরও বহুশ্রুতিতে উল্লিখিত আছে। এতাবতা স্থিরীকৃত হয় যে, শ্রুতির শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য। (ক্রমশঃ

সম্রাটের অভিষেক উপলক্ষে।

রাজরাজ,
বসিয়াছ সিংহাসনে ভূষিয়া ভূষণে
দেহ সংসর্গে তোমার। এ রত্ন আসনে
পুণ্যস্মৃতি পিতা তব বসিয়া দু'দিন
পালিয়াছে প্রজাকুল, তারি শোকক্ষীণ
অনন্ত মার্ত্তণ্ডরাজ্য করে হাহাকার ;—
মূর্ত্তিমান্ কর্ম্মযোগ, কর্ত্তব্য সাকার
লুকায়েছে চিরতরে। মূর্ত্তিমতী দয়া
পিতামহী পূতকীর্ত্তি রাণী ভিক্টোরিয়া
(যাদের কাতরে স্মরি আজিও ভারত,
নহেরে ভারত শুধু সমস্ত জগৎ
অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি দেয় ভকতি চন্দনে।)
এই সিংহাসনে বসি সস্নেহ পালনে
তুষিয়াছে প্রজাকুল। সুদীরঘ কাল
ছিল সুখসুপ্তিমগ্ন এ রাজ্য বিশাল
শান্তির কোমল-কোলে। তোমার ধমনী
সেই গঙ্গোত্রীর ধারা দিবস-রজনী
বহিতেছে, যোগাইয়া হৃদিতটে তব
পবিত্র জ্ঞান-সম্ভার। ভারতের শব—
আশার তাড়িতে তাই সঞ্জীবিত আজি।
কঙ্কাল শরীর তার দাঁড়ায়েছে সাজি
লইয়া প্রীতির অর্ঘ্য ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি।
উৎফুল্ল আনন্দে আজ কোটি কণ্ঠ মিলি
গাহিছে তোমার জয়। একান্ত অন্তরে
সেই বিশ্বরাজ পাশে সদা জোড় করে
যাচিছে ভারত সদা শান্তি-সমুজ্জ্বল
দীরঘ জীবন তব, পুণ্যেতে বিমল।

শ্রীসুদর্শন চক্রবর্ত্তী।

ন্যায়দর্শন।

সূত্র। প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন--দৃষ্টান্ত--সিদ্ধান্তাবয়ব---তর্ক-বাদজল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।১

ব্যাখ্যা। প্রমাণাদীনাং ষোড়শপদার্থানাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ (বিশিষ্টজ্ঞানাৎ) নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ (মোক্ষলাভঃ) স্যাদিতি শেষঃ।

তাৎপর্য্যানুবাদ। প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান, এই ষোলটী পদার্থের বিশেষজ্ঞান মোক্ষলাভের উপায়।

মন্তব্য। জীবমাত্রেরই দুঃখনিবৃত্তির জন্য চেষ্টা স্বাভাবিক। দুঃখ কাহারও ভাল লাগেনা। বাস্তব হউক, অবাস্তব হউক, দুঃখ বলিয়া একটা কিছু না থাকিলে তাহার সহিত অনাদিকাল হইতে জীবকুলের কখনই এত সংগ্রাম চলিত না। চিরকালই স্বস্বশক্ত্যনুসারে সকলেই ঐ দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য সদা বদ্ধপরিকর। কিন্তু কত দৃষ্ট উপায়, ও কত যাগযজ্ঞাদি অদৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়াও এপর্য্যন্ত কেহ ঐ দুঃখের হস্ত হইতে একেবারে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই ও পারিতেছেন না। মূলের খবর লইলে কাহারও প্রাণে শান্তি নাই। নিদান বা বীজ নষ্ট না হইলে রোগের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইবে কেন? ঋষিগণ ইহা বুঝিয়াছিলেন। আমরা দুঃখ-ভোগের মূল

তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়াছিল—তাই তাঁহারা বহুতপস্যা-লব্ধ শ্রুতির অভয়বাণী প্রচার করিলেন "তরতি শোকমাত্মবিৎ।" আত্ম-সাক্ষাৎকার হইলেই চিরকালের জন্য এই দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়। আত্ম-সাক্ষাৎকারের অভাব বশতঃই জীবের জন্মের পর জন্ম—দুঃখের পর দুঃখ—অনাদিকাল হইতে—চলিয়া আসিতেছে। অবিদ্যার ভীষণ রাজ্যে এক মুহূর্ত্তও কাহারও শান্তি নাই, থাকিতেও পারেনা।

কেমন করিয়া এই অবিদ্যার অন্ধকারময় রাজ্য ছাড়িয়া শান্তির আলোকময় রাজ্যে যাওয়া যায়, কোন উপায়ে ঐ আত্ম-সাক্ষাৎকার হইবে? বিষম সমস্যা! ঋষিগণ আবার সেই ঐশবাণীর সঙ্গে সুর মিশাইয়া গাহিলেন—

"শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"

আত্মদর্শন করিতে হইলে যথাক্রমে—আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। অন্যত্র পরিষ্কার করিয়া বলিলেন—

"শ্রোতব্যঃশ্রুতিবাক্যেভ্যোমন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বাচ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ।"

প্রথমতঃ মোক্ষশাস্ত্র হইতে আত্মার স্বরূপটী জানিতে হইবে, পরে ঐ জ্ঞানে দৃঢ় বিশ্বাসী হইবার জন্য যুক্তির দ্বারা আত্মার ঐ স্বরূপটী বেশ করিয়া বুঝিতে হইবে, পরে ঐরূপে আত্মার সতত ধ্যান করিতে হইবে। এই শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন—আত্মসাক্ষাৎকারের কারণ। শ্রবণের জন্য মোক্ষশাস্ত্র চির বিদ্যমান। শ্রুতি বলিয়াছেন, কিন্তু মননের উপায় কি? যুক্তির দ্বারা অবধারণই—মনন! ("মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।" যুক্তি বলিয়া স্বতন্ত্র কোন প্রমাণ নাই। অনুমান প্রমাণের প্রচলিত নামই যুক্তি। ঐ অনুমানের দ্বারা শ্রুতিসিদ্ধ আত্মস্বরূপের অবধারণই শ্রুতি-সিদ্ধ আত্মমনন। উহা মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া মুমুক্ষুর পরম কর্ত্তব্য উপাসনা। ঐ উপাসনার উপায় ও প্রণালীর কীর্ত্তন করা ঋষিগণের পরম কর্ত্তব্য। তাই পরম-কারুণিক মহর্ষি গোতমের ন্যায়দর্শনারম্ভ। তা'ই ন্যায়দর্শন মননশাস্ত্র। শ্রবণের পরেই মননের বিধান, তাই মননকে 'অন্বীক্ষা-বলে। (অনু পশ্চাৎ শ্রবণানন্তরং) ঈক্ষা (জ্ঞানং মননাত্মকং) এই অন্বীক্ষা বা মননের নির্ব্বাহক বলিয়া ন্যায়দর্শনকে "আন্বীক্ষিকী" বলে। শ্রুতির "মন্তব্যঃ"—এই অংশে ভিত্তিস্থাপন করিয়াই ন্যায়দর্শনের সৃষ্টি। নিদিধ্যাসনের পূর্ব্ব সোপানে উপনীত হইবার জন্যই এই ন্যায়দর্শনের প্রয়োজনীয়তা। পরে ইহা আরও পরিস্ফুট হইবে।

এখন সূত্রকার মহর্ষির অভিপ্রায় এই যে, মুক্তিলাভ করিতে হইলে আত্মদর্শন আবশ্যক। আত্মদর্শন করিতে হইলে আত্মমনন আবশ্যক। আত্মমনন করিতে হইলে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের বিশেষ-জ্ঞান—সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় নিতান্ত আবশ্যক। নচেৎ আত্মমনন হইতেই পারে না। কেন পারেনা, তাহা পরে বিশদরূপে প্রকাশ করিব। সুতরাং প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের বিশেষজ্ঞান মুক্তিলাভের সাক্ষাৎ-কারণ না হইলেও প্রয়োজক অর্থাৎ উপায়।

উহা অপেক্ষার জিনিষ নহে। উহার আবশ্যকতা আছে। তবে অনাদি জন্ম-প্রবাহের যে কোন জন্মের শ্রবণ—মনন, সংস্কাররূপে ইহজন্মেও যাহার নিকটে বিদ্যমান; যিনি মোক্ষমন্দিরের তৃতীয় সোপান নিদিধ্যাসনে সমাসীন হইয়া, অন্তরঙ্গ যোগাঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন, তাঁহার আর ইহজন্মে উহার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু তাঁহাকেও একদিন উহার জন্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। অভ্রান্ত বেদ আত্মসাক্ষাৎকারে—যে মননের নিতান্ত আবশ্যকতা ঘোষণা করিয়াছেন, ঐ মনন ও তদুপায় পদার্থ-জ্ঞানাদির কোন জন্মে সেবা না করিয়া, কোন দিন কেহ মুক্তি-লাভ করিতে পারে নাই। শ্রবণ-মননাদি মুক্তিলাভের উপায়—বেদেরই আবিষ্কৃত, মুক্ত ঋষিগণের পরীক্ষিত। বেদবিজ্ঞান-ব্যতীত কোন বিজ্ঞানই ঐ তত্ত্ব আবিষ্কারে সমর্থ নহে। ইহকাল সর্বস্ব আমরা জন্মান্তরের কথাটা ভুলিয়া যাই। তাই অনেক-জন্ম-সংসিদ্ধ কোন কোন মহাত্মার জীবনী পাঠ করিয়া, শ্রবণ-মননের পণ্ডশ্রমে বিরক্ত হই। সিদ্ধান্ত ভুলিয়া দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা করি। মুক্তিলাভে মননের আবশ্যকতা চিরদিনই আছে ও থাকিবে। মহর্ষি গোতমের জন্মের পূর্ব্বেও মুমুক্ষুশিষ্য, ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর উপদেশে ঐ মনন ও তদুপায় পদার্থ-জ্ঞানাদি করিয়াছেন। প্রমাণাদি ষোড়শ-পদার্থ, মহর্ষি অক্ষপাদের সৃষ্ট নহে। কোন সংজ্ঞা বা পরিভাষা তাঁহার স্বেচ্ছা-কৃত হইলেও মূলপদার্থগুলি প্রাকৃতিক কার্য্য-কারণ-ভাবের নিয়মানুসারে কতক তাঁহার বহু পূর্ব্ব হইতেই সৃষ্ট, ও কতকগুলি নিত্য। যে সত্য, প্রাচীন ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুবর্গের (যে ভাবেই হউক্) সকলেরই পরিজ্ঞাত ছিল, তাহাই চিরস্থায়ী করিবার জন্ত মহর্ষি গোতম এক অপূর্ব্ব কৌশলে অপূর্ব্বভাবে সুদৃঢ় সূত্রে গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। ইহা তার্কিকের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্ত সৃষ্ট হয় নাই। কুতর্ক-শিক্ষা-প্রচারের জন্ত আবির্ভূত হয় নাই। ইহা বৃথা বাগজাল-নির্ম্মাণের সূত্র নহে। ইহার মূল বেদ। ইহা বেদের উপাঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত। আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি বা নির্ব্বাণই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। সকল আর্যদর্শনেরই ঐ এক মহান্ উদ্দেশ্য। বুদ্ধি-বিকাশ ও কৌতূহল-নিবৃত্তিই উহাদের উদ্দেশ্য নহে, তা'ই উহাতে অধিকার অনধিকারের ব্যবস্থা।

কেহ কেহ বলেন (আত্মা ইতরভিন্নঃ) আত্মা তদিতর সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন, এই ভাবে আত্মাতে দেহাদি সকল পদার্থের ভেদ প্রত্যক্ষ করাই আত্মসাক্ষাৎ-কার। উহাই ন্যায়দর্শন-সম্মত মোক্ষকারণ। ঐ আত্মসাক্ষাৎকার করিতে আত্মা ও তদিতর সমস্ত পদার্থেরই যে কোনরূপ জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক। রাম ও শ্যামের সহিত কিছুমাত্র পরিচয় না থাকিলে, রামে শ্যামের ভেদ কোন মতেই প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাই মহর্ষি গোতম জগতের সমস্ত পদার্থকে ষোলভাগে বিভক্ত করিয়া বলিলেন—এই ষোড়শ পদার্থের বিশেষ জ্ঞান মুক্তিলাভের উপায়। "আত্মা ইতরভিন্নঃ"

আত্মসাক্ষাৎকারে—আত্মা ও তদিতর সমস্ত পদার্থের যে জ্ঞান আবশ্যক, উহাই ষোড়শ-পদার্থ-জ্ঞান। উহা আত্ম-সাক্ষাৎকারের কারণ বলিয়া মোক্ষলাভের উপায়। সূত্রের এইরূপ তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা অনেকের অভিমত, ও অনেক স্থানে প্রচলিত। কোন কোন প্রাসিদ্ধ টীকাকারেরও গ্রন্থান্তরে এই ভাবের চিন্তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কিন্তু সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে, জগতের সমস্ত পদার্থই ঐ ষোড়শ পদার্থের মধ্যে আছে কিনা? সূক্ষ্মদর্শী দেখিতেছেন, উহার মধ্যে অনেক পদার্থই নাই; প্রতিপক্ষ বলিবেন, কেন থাকিবেনা? সূক্ষ্মদৃষ্টিতে যে সমস্ত পদার্থ নাই বলিয়া বুঝিতেছ, তাহা সমস্তই "দৃষ্টান্ত," সিদ্ধান্ত, ও "প্রয়োজনের" মধ্যে আছে। অনেকগুলি দশম-প্রমেয় "ফলের" মধ্যে আছে। ঈশ্বর, ন্যায়দর্শনের সিদ্ধান্ত, সুতরাং ঈশ্বরও উহার মধ্যে আছেন। অভাব, ন্যায়দর্শনের সিদ্ধান্ত। প্রমেয়-মধ্য-পাতী অপবর্গ অভাবপদার্থ, সুতরাং গোতমোক্ত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে অভাবেরও অভাব নাই। এখন কথা হইতেছে যে, পদার্থ অসংখ্য। প্রত্যেক পদার্থের সেই সেই ব্যক্তিস্বরূপে জ্ঞান, ন্যায়দর্শন পড়িয়া হইতে পারেনা। নৈয়ায়িকগণ সর্ব্বজ্ঞ নহেন। তবে সংক্ষেপে পদার্থগুলিকে বিভক্ত করিয়া, বিভাজক-ধর্ম্মরূপে সকল পদার্থের পরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে। সেই উদ্দেশ্যেই নবীন সংগ্রহকারগণ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, জাতি, বিশেষ, সমবায়, অভাব, এই সপ্তপ্রকারে সমস্ত পদার্থকে বিভক্ত করিয়াছেন। ঐভাবে সকল পদার্থের যে জ্ঞান, উহাই আত্মা ও তদিতর পদার্থ-সমূহের জ্ঞান। আত্ম-সাক্ষাৎকারে সকল-পদার্থ-জ্ঞান প্রয়োজন হইলে, উহাই তাহা নির্ব্বাহ করিবে। কিন্তু মহর্ষি গোতম এইরূপ বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া সংশয়, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান নামে কতিপয় পদার্থের উল্লেখ করিয়া ষোড়শ পদার্থ বিভাগ করিতে গিয়াছেন এবং উহার বিশেষজ্ঞান মুক্তিলাভে আবশ্যক বলিয়াছেন, ইহার কি কোন গূঢ় রহস্য নাই? ইহা কি কোন বিশেষ অভিসন্ধি-পূর্ব্বক নহে? "অবয়ব," "তর্ক," "হেত্বাভাস," প্রভৃতির বিশেষজ্ঞান কি কেবল অনুমানেরই উপযোগী নহে? মোক্ষশাস্ত্র-শ্রুত আত্মতত্ত্বের মনন (অনুমান) করিতে যে সমস্ত পদার্থের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, মহর্ষি গোতম তাহারই উল্লেখ করিবেন। তাহাতেই প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ষোড়শ পদার্থের মধ্যে সকল পদার্থ থাকুক আর নাই থাকুক, মনন-শাস্ত্রারম্ভ করিয়া গোতম, মননের উপযোগী পদার্থগুলিই বলিয়াছেন। "সিদ্ধান্তের" মধ্যে সকল পদার্থই আছে—বুঝিলে "প্রমাণ" "প্রমেয়" প্রভৃতির পৃথক্ উল্লেখ কেন? "প্রমেয়ের" মধ্যে, জ্ঞান-পদার্থের উল্লেখ করিয়াও আবার "সংশয়" "তর্ক" "নির্ণয়" প্রভৃতি জ্ঞান-বিশেষের পৃথক্ উল্লেখ কেন? ইহার উত্তর এই যে, বিচারের জন্যই ঐ সমস্ত পদার্থের বিশেষজ্ঞান আবশ্যক। যতদিন বিচার আছে, ততদিন—প্রমাণের প্রেয়া-

হইবে। স্বপক্ষ দৃঢ় করিবার জন্য পরপক্ষ নিরাস করিতে হইবে। জল্প, বিতণ্ডা, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থানেরও আশ্রয় লইতে হইবে। শ্রুতিবাক্য আত্মজ্ঞানের দৃঢ়তা-সম্পাদনের জন্যই তাহার মননের আদেশ। বিপক্ষের বিরুদ্ধবাদে ঐ দৃঢ়তা নষ্ট হইয়া থাকে, ইহার প্রমাণও প্রচুর। সুতরাং স্বপক্ষ দৃঢ়ীকরণের জন্যই পরপক্ষ-নিরাসের আবশ্যকতা আছে। তাই জল্প, বিতণ্ডা প্রভৃতিও একেবারে নিরর্থক নহে। পাণ্ডিত্য-প্রকাশের জন্য অথবা ব্যক্তিগত বিদ্বেষাদি বশতঃ উহা আশ্রয়ণীয় নহে, পরন্তু সত্য-প্রতিষ্ঠার জন্য। শুষ্কতর্ক, মহাপাপ। স্বপক্ষদৃঢ়ীকরণের জন্য পরপক্ষ-নিরাসের কোন দোষ নাই, বরং উহার কর্ত্তব্যতাই আছে—তাই ব্রহ্মসূত্রেও তর্কপাদের আরম্ভ হইয়াছে। ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, ও ভামতীকার বাচস্পতি-পাদেরও সেখানে এই মীমাংসা। ব্রহ্মবিচার বাদ বিচার, সেখানেও পরপক্ষ-নিরাস রহিয়াছে। তাহাতে ঐ ব্রহ্মবিচারের বাদত্ব-ব্যাঘাত ঘটে নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জন্মান্তরীণ-সংস্কারে যে ভাগ্যবান্ সাধকের মনন-সিদ্ধি হইয়াছে—তাহার আর আত্মবিচার নাই। সুতরাং প্রমাণাদি-ষোড়শ-পদার্থ জ্ঞানেরও প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহারা নিয়মাধিকারী, বেদের আজ্ঞায় যাহারা মননের আসনে উপবিষ্ট, তাহাদের মননের উপায় ও প্রণালী সবই জানিতে হইবে। অবশ্য গোতমোক্ত ষোড়শ পদার্থে বিশেষ বিজ্ঞ হইয়া অনুমান করিলে, সব অনুমানই অভ্রান্ত হইবে, ইহা সত্য নহে। শ্রুতির অবিরুদ্ধ অনুমানই অভ্রান্ত। শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমান অগ্রাহ্য। তাই প্রথমতঃ শ্রবণেরই বিধি।

ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন—

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।"

অবিরোধী তর্কের দ্বারা শাস্ত্রোপদেশ বুঝিতে চেষ্টা করিলেই সত্য-নির্ণয় করা যায়। তর্কদ্বারা কিছুরই নির্ণয় হয়না, এ কথায় সত্য নাই। কারণ, ঐ কথার প্রতিপাদ্যও তর্কদ্বারা নির্ণয় করিতে হয়। বেদে যুক্তির দ্বারা আত্মতত্ত্বাবধারণ বিহিত হওয়ায়, তর্কের আবশ্যকতাও উপদিষ্ট হইয়াছে। "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" এই কঠশ্রুতি, তর্কের অকিঞ্চিৎকরত্ব ঘোষণা করেন নাই। শ্রুতি-বিরুদ্ধ স্ববুদ্ধিমাত্র-কল্পিত কুতর্কের দ্বারা আত্মজ্ঞানলাভ হয় না, ইহাই ঘোষণা করিয়াছেন। ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যেরও ইহাই মীমাংসা। মোক্ষলাভের সহায় ন্যায়দর্শন ঐ অকিঞ্চিৎকর কুতর্কের শিক্ষা দেন নাই। উদ্দেশ্য ভুলিয়া বাজে কথা বলিলে, অসম্বদ্ধ প্রলাপ হয়। মহর্ষি গোতম অসম্বদ্ধ প্রলাপের অবতারণা করেন নাই। আত্মা অনাদি নিত্য,—দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ প্রভৃতি হইতে ভিন্ন, যুক্তির দ্বারা এই বেদ-সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সমর্থনই ন্যায়দর্শনের মুখ্য লক্ষ্য। আত্মার ঐ স্বরূপের মননের জন্য ন্যায়দর্শনে যাহা কিছু অভিহিত হইয়াছে, তাহার সমস্তই কেহ সাক্ষাৎ, কেহ পরম্পরায়, কেহ অতিপরম্পরায় ঐ আত্মমননেরই উপযোগী।

যথাস্থানে তাহা বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিব। ঘটাদি বস্তু উৎপন্ন হইলেও তাহার লাভের জন্য পৃথক্ প্রযত্ন আবশ্যক হয়। কিন্তু মুক্তি জন্মিলেই তাহার লাভ হয়, তাহার লাভের জন্য আর পৃথক্ কোন যত্ন করিতে হয় না,—ইহাই সূচনা করিবার জন্য "নিঃশ্রেয়সং" না বলিয়া মহর্ষি "নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ" বলিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে বিঘ্ন-বিনাশের জন্য মঙ্গলাচরণ একটী অনিন্দিত শিষ্টাচার, সুতরাং উহা শাস্ত্রসিদ্ধ। মহর্ষির বিঘ্নের আশঙ্কা না থাকিলেও শিষ্য-শিক্ষার্থ ঐ শিষ্টাচারের অনুষ্ঠান করা উচিত। কর্ত্তব্য হইলে মহর্ষি কেন তাহা করেন নাই? এই প্রশ্ন নিরুত্তর নহে। প্রথমতঃ প্রমাণ শব্দোচ্চারণেই মহর্ষির মঙ্গলাচরণ হইয়াছে। "প্রমাণ" ভগবান্ বিষ্ণুর অন্যতম নাম। বিষ্ণুর সহস্র-নাম-স্তোত্রে রহিয়াছে "প্রমাণং প্রাণনিলয়ঃ।' অন্যান্য কথা—ষোড়শ পদার্থের স্বরূপ-নির্ণয়ের পরে বিবৃত হইবে।১

(ক্রমশঃ)

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

পাবনা, দর্শন চতুষ্পাঠী।

সংবাদ।

একেশ্বরবাদিদিগের সম্মিলন। সংবাদপত্রে প্রকাশ, কলিকাতা মহানগরীতে আগামি কংগ্রেসের সময়ে একেশ্বরবাদি-গণের সম্মিলন হইবে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইবেন। ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম না। একেশ্বরবাদী নয় কে? দুই বা বহু ঈশ্বর স্বীকার করে, এমন ও দল আছে নাকি? যাহারা বহুদেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহারাও একই ঈশ্বর মানিয়া থাকে। আর তাহারা ইহাও স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করে যে, বহু দেবতাও 'একস্যৈব সা বিসৃষ্টিঃ'—একই পরমদেবতা পরমেশ্বরের বিভিন্ন বিকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সুতরাং সংবাদের রহস্যটা আদৌ বুঝিলাম না। কেহ বুঝাইবেন কি?

মাদক-নিবারিণী সভা। কলিকাতায় কংগ্রেসের সময়ে, মাদক-নিবারিণী সভারও অধিবেশন হইবে। মাননীয় এন্ সুব্বারাও পাণ্টুলু সভাপতি হইবেন। মাদক-সেবন ধর্ম্মবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানের বিরুদ্ধ, উহার প্রসার-বৃদ্ধি অভিপ্রেত নহে। সভার কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি হউক্।

বেহার হিন্দুসভা। গত ৮ই নভেম্বর "বেহার হিন্দুসভা"র অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি মাননীয় কুমার কীর্ত্ত্যানন্দ সিংহ মহাশয় ইংলণ্ডের সহিত ভারতের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রক্ষা করিতে ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। হিন্দুসমাজের কাছে কথাটা নূতন নয়, খুব পুরাতন। রাজভক্তি হিন্দুর প্রাণের জিনিষ, অত বুঝাইয়া হিন্দুকে ওকথা বুঝাইতে হয় না। সম্প্রদায়-বিশেষের উপর বিদ্বেষ ত দূরের কথা, হিন্দুশাস্ত্র, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি বিদ্বেষশূন্য হইতে বলেন। তবে মূল কথা এই যে, আদর্শ উৎকৃষ্ট হইলেও সকলে তাহার অনুসরণ করে না। উপায় কি?

রাম-রাবণের গোলমাল। কলিকাতায় রামকুমার রক্ষিতের লেনে ২১ অক্টোবর যাত্রাগান হইতেছিল। বঙ্কুবিহারী নামক একজন অভিনেতা লেনের অপর পার্শ্বস্থ সাজঘর হইতে বীরসাজে সজ্জিত হইয়া অভিনয় স্থানে যাইতে পথিমধ্যে লেনের উপর অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার হস্তে তরবারি ছিল বলিয়া পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে, ফলে মোকর্দ্দমায় তাহার ৩ টাকা অর্থদণ্ড হয়। ব্যাপারখানা এই! তবে সংবাদপত্র-পরিচালকদের মধ্যে রাম-রাবণের গোলমাল ঘটিয়াছে। আনন্দবাজার বলেন, "বঙ্কুবিহারী রাবণ সাজিয়াছিলেন।" সঞ্জীবনী বলেন "বঙ্কুবিহারী রায় রাম সাজে।" এ গোলমালে আমরা ঠিক্ করিতে পারিতেছি না, রাম ও রাবণ উভয়ের মধ্যে কে শান্তি-রক্ষকের কবলে পড়িয়াছিলেন!

পুনর্নিয়োগ। মাননীয় বিচারপতি নারায়ণ চন্দ্রবরকর পুনরায় বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন। যোগ্য ব্যক্তির প্রতিষ্ঠায় সকলেরই আনন্দ!

বিল। গোখেলের শিক্ষাবিল, ভূপেন্দ্রনাথের ম্যারেজবিল ও মিঃ জিনার ওয়াকফ্ বিল সম্বন্ধে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহের মন্তব্য, ভারত গবর্ণমেন্টের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। সবগুলির গতি একরূপ হইবে কিনা, ভগবান্ জানেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ধর্ম্মপ্রচারক। সিংহ (ভাদ্র) সংখ্যা। 'ধর্ম্ম-প্রচারক' ভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলের বঙ্গভাষার মুখপত্র। বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, মাসিক পত্রের যথেষ্ট উন্নতি করা হইয়াছে, সম্পাদক নিযুক্ত করা হইয়াছে ইত্যাদি। পত্র পাঠ করিয়া ইহার বিপরীত ধারণা হইল। একটী প্রবন্ধ 'অশ্বত্থামা'। কেহ 'সম্পাদক' থাকিলে, বোধ হয় তিনি ইহার প্রকাশে আপত্তি করিতেন। প্রবন্ধের ভাবে, ভাষায়, উপাখ্যানে সর্ব্বত্র ভ্রম। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কাব্য-সাংখ্যতীর্থ মহাশয় 'পৌরাণিক সভ্যতা' প্রবন্ধে দক্ষযজ্ঞের রূপক ব্যাখ্যায় ভুল করিয়াছেন। প্রবন্ধের শিরোনাম কিন্তু "পৌরাণিক সভ্যতা"! সভ্যতা বলিতে লেখক কি বুঝেন, জানি না, তবে এই মাত্র জানি, অলৌকিক-দৃষ্টি ব্যতীত পুরাণোক্ত ঘটনাবলীর সভ্যতা উপলব্ধি করা সাহসিকতার বিড়ম্বণ। 'শাস্ত্রালাপ' শীর্ষক প্রবন্ধে রসিক বাবু, ডাক্তার বাবু, পাঁড়েজী প্রভৃতির ধারণার সম্মান করা হইয়াছে, কিন্তু তর্কবাগীশ মহাশয়ের ন্যায়-শাস্ত্রকে একটু উপেক্ষা করা হইয়াছে। ঘোষাল মহাশয় বলেন "জীব-ব্রহ্মের মিলনই মুক্তি", তর্কবাগীশ দ্বৈতবাদের সেবক, তিনি বলিলেন 'জীব ব্রহ্মে মিলন অসম্ভব। মুক্তি অর্থ, জীবের ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি' এ কথাটাকে কেহই আদর করিলেন না। অধিকন্ত শেষে ব্যাখ্যাতা মহাশয় স্বয়ং বলিলেন, "ঘোষাল মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, (অর্থাৎ জীব ব্রহ্মে মিশিয়া গেলে তাহার

নাম মুক্তি) হিন্দুমাত্রেরই সেই কথা।" ইনি কি মনে করেন শঙ্কর-সম্প্রদায় ছাড়া ভারতে আর হিন্দু নাই? হিন্দু-সমাজের দুই একটী ছাড়া প্রায় সকল সম্প্রদায়ই গোস্বামী মহাশয়ের বিরুদ্ধবাদী, তাহা কি উপদেষ্টা জানেন না? এ প্রবন্ধের 'শাস্ত্রালাপ' নাম হওয়া অশোভন। ধর্ম্মপ্রচারকের কর্ত্তৃপক্ষ কি এইরূপেই ইহার উন্নতি করিতেছেন? আমরা জানিতাম, একজন পণ্ডিত "ধর্ম্মপ্রচারকে"র "সম্পাদক" হইয়াছেন। ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাঁহার সম্পাদকতা থাকিলেও স্বতন্ত্রতা নাই। ধর্ম্মপ্রচারকের যথার্থ উন্নতি হইলে আনন্দিত হইব।

গোধূলি। কবিতাপুস্তক। শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম্ এ বি এল্ কর্ত্তৃক প্রণীত। আ'জকা'ল কবিতার গুরুতর বিষয়ের অবতারণা অল্পই দেখা যায়। তরল কবিতায় বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সদ্ভাবোদ্দীপক গম্ভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ কবিতার বাহুল্য নাই। গোধূলি সৎকবিতার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। কবিতার ভিতর দিয়া অনাবিল সৌন্দর্য্য, নির্দ্দোষ ধর্ম্মভাব, সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতত্ত্ব এবং দেবরাজ্যের ভাবসম্পৎ বঙ্গবাসীকে উপহার দিবার জন্য ভুজঙ্গধর বাবুর 'গোধূলির' অবতারণা। লেখক যে বহুলাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে সংশয় নাই। স্থানে স্থানে বড়ই সুন্দর ও মধুর হইয়াছে। তবে সকল ক্ষেত্রে কবির ভাষা, সুন্দররূপে ভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারে নাই। হাতড়াইয়া ভাবোদ্ধার করিতে হয়। মোটের উপর গ্রন্থখানি সুন্দরই হইয়াছে। ভুজঙ্গধর বাবু এ কার্য্যে নূতন ব্রতী নহেন। তাঁহার 'মঞ্জীর' সাহিত্য-সংসারে সমাদৃত। 'গোধূলি'রও সমাদর হইবেনা। ১৬৮ পৃষ্ঠায় পুস্তক সমাপ্ত হইয়াছে। ছাপা কাগজ মন্দ নয়, মূল্য ৸৹ আনা। বসিরহাট গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

জ্যোতি। শ্রীজীবনবালা দেবী প্রণীত কবিতা-পুস্তক। এণ্টিক কাগজে সুন্দর মুদ্রণ। ১৪৯ পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত। গ্রন্থরচয়িত্রী শ্রীমতী জীবনবালা, তাঁহার পরলোকগতা বালিকা কন্যা 'জ্যোতির্ব্বালার' নামানুসারে এই পুস্তকের নাম রাখিয়াছেন। প্রকাশক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত পুস্তকে একটী 'প্রস্তাবনা' লিখিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ যে, শ্রীমতী জীবনবালার একাদশ বর্ষ বয়সে, কবিত্ব শক্তি "অঙ্কুরিত হয়"। ইঁহার চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সের কবিতা পাঠ করিয়া, বঙ্গবিদুষী স্বর্ণকুমারী দেবী উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি এই (তৎকালের) বালিকা-কবিকে "ভারতের রবি" বলিয়াছেন। এমন একদিন ছিল, যখন রমণীরচনা হইলেই প্রশংসিত হইত, সেদিন গিয়াছে। এখন ভালমন্দ বিচার করার সময় আসিয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী, দুঃখে, শোকে, ক্ষোভে, সান্ত্বনায় হৃদয়ের ভাববিবর্ত্তন দেখাইতে যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা মধ্যে আন্তরিকতার বড় অভাব নাই। কিন্তু সর্ব্বত্র ভাষা ও ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া মনে করা দুষ্কর। তবে ইহা অসঙ্কোচে বলা যায় যে, উচ্চশ্রেণীর কবিতা না হইলেও শ্রীমতী জীবন-বালার কবিতা 'কবিতা' বটে। তাঁহার কবিতার অনেক স্থান হৃদয় স্পর্শ করে। তাই বলিয়া "ভারতের রবি" বলিলে অত্যুক্তি হয় না এমন নয়। মোটের উপর পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। আশা আছে, কালে ইনি স্ত্রীকবি-সমাজে যোগ্য আসন লাভ করিবেন। পুস্তকের মূল্য এক টাকা। কলিকাতা কলেজ-স্কোয়ারের সাম্য-প্রেসে মুদ্রিত ও বীরভূম হইতে প্রকাশিত।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১৮শ বর্ষ, ১৮শ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। পৌষ। ১৩১৮ সাল, ১৮৩৩ শকাব্দাঃ।

মহাভারতের মণিপুর।

মহাগ্রন্থ মহাভারতে ভারতীয় নরনারীর কর্ত্তব্য বিষয় নিচয়ের যেরূপ সুন্দর বিবরণ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ভারতীয় দেশ-প্রদেশ নদ-নদী প্রভৃতির জ্ঞাতব্য তত্ত্বও মনোরঞ্জনরূপে সঙ্কলিত দেখা যায়। মহাভারত একাধারে ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও ইতিহাস। এই জন্যই ভারত সন্তানের বিশ্বাস—"যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে।" অর্থাৎ পুণ্যগ্রন্থ মহাভারতে ভারতের একটী জ্ঞাতব্য বিষয়ও উপেক্ষিত হয় নাই, সবগুলিই সমাদৃত হইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় তথ্যনিকরের অগাধভাণ্ডার স্বরূপ ঐই মহাভারতে প্রাচীন মণিপুর রাজ্যের অবস্থান-নির্ণয়ের আভাসও পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

আমরা মহাভারতের আদিপর্ব্বে দেখিতে পাই যে, দুর্দ্দান্ত দস্যু কর্ত্তৃক উপক্রত জনৈক ব্রাহ্মণ, মহাবীর অর্জ্জুনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। দস্যুগণ ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিয়া লইতেছে। আর ব্রাহ্মণ, পাণ্ডবের নিকট তাহার প্রতীকার প্রার্থনা করিতেছেন। ব্রাহ্মণের রোদনে বীরবর পার্থের করুণ অন্তর বিচলিত হইল; তিনি আর্ত্তত্রাণ মহাব্রত-সাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল, অস্ত্র-শস্ত্র যে গৃহে আছে, সেখানে রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত অবস্থান করিতেছেন; কিরূপে সেখানে যাইয়া অস্ত্রসংগ্রহ করা যায়! অর্জ্জুন উভয়সঙ্কটে পতিত হইলেন। একদিকে ব্রাহ্মণের ক্রন্দন, অপর দিকে "দ্রৌপদ্যা নঃ সাহসীনমন্যোহন্যং যোঽভিদর্শয়েৎ। স নৌ দ্বাদশবর্ষাণি ব্রহ্মচারী বনে বসেৎ। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যে কেহ, দ্রৌপদীসমন্বিত অন্যের গোচরে উপস্থিত হইবে, সে ব্রহ্মচারী হইয়া, দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিবে; এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা! পার্থ ক্ষণকাল বিবেকের তুলাদণ্ডে উভয়ের পরিমাণ করিলেন। এদিকে

ব্রাহ্মণ অধিকতর ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিলেন—"যে রাজ্যে ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব তস্করে লইয়া যায়, রাজা প্রতীকারে অগ্রসর হন না, সে রাজ্যের রাজা ধর্ম্মরক্ষক নহেন, করগ্রাহী মাত্র।" ব্রাহ্মণের বাক্যে অর্জ্জুনের মোহ ভাঙ্গিল। তিনি মনে মনে বনবাস স্বীকার করিয়াই যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদীর গৃহ হইতে অস্ত্র আনিয়া দস্যুদলের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। অচিরকাল মধ্যে অর্জ্জুনের অস্ত্রতেজে দস্যুদল পরাজিত হইল। ব্রাহ্মণ, হৃত গোধন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। আর অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা-পালনার্থে দ্বাদশবর্ষের জন্ত গৃহ ত্যাগ করিলেন।

এই সুদীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ কাল অর্জ্জুন, সমস্ত ভারতের পুণ্যতীর্থ সমূহ দর্শন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তিনি নানাস্থান ভ্রমণের পর অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশের তীর্থ সকল দর্শন করেন। কলিঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া, মহেন্দ্রপর্ব্বত দেখিয়া, সমুদ্রতীরস্থ মণিপুর রাজ্যে গমন করেন। মহাভারতে ইহাই বর্ণিত আছে যথা—

স কলিঙ্গানতিক্রম্য দেশানায়তনানিচ।
হর্ম্ম্যাণি রমণীয়ানি প্রেক্ষমাণো যযৌ প্রভুঃ।
মহেন্দ্রপর্ব্বতং দৃষ্ট্বা তাপসৈরুপসেবিতং
সমুদ্রতীরেণ শনৈর্ম্মণিপুরং জগামহ।

অর্থাৎ অর্জ্জুন কলিঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া দেশ, আয়তন, রম্য হর্ম্ম্যাদি দেখিতে দেখিতে চলিলেন; তাপস-সেবিত মহেন্দ্রপর্ব্বত দেখিয়া, ক্রমে সমুদ্রতীরস্থ মণিপুর রাজ্যে উপনীত হইলেন।

এই বর্ণনানুসারে মণিপুরের স্থান উৎকল-সীমায় স্থির করিতে হয়। কলিঙ্গদেশের নিকটে সমুদ্রতীরে অবস্থিত এই মণিপুর-রাজ্য, বঙ্গের ঈশানকোণে বিদ্যমান থাকিতে পারে না। 'উৎকল' নাম যে (কলিঙ্গের সমীপবর্ত্তী) 'উৎকলিঙ্গ' শব্দের পরিবর্ত্তিত রূপ, তাহাতে সন্দেহের লেশও পরিলক্ষিত হয় না। কারণ, কলিঙ্গদেশ যে বঙ্গ, অঙ্গ ও উৎকলিঙ্গের পরবর্ত্তী পশ্চিমদিগ্‌ভাগস্থ দেশ, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। বঙ্গের ঈশানকোণে কলিঙ্গের অবস্থানও জানা যায় না, সুতরাং মণিপুরের স্থানও স্থির করা যায় না।

অশ্বমেধপর্ব্বের বর্ণনাও ইহার অনুকূলে গৃহীত হইতে পারে। অশ্বমেধপর্ব্বে ৭৭ ও ৭৮ অধ্যায়ে মহাবীর অর্জ্জুনের অশ্বানুগমনে সিন্ধুদেশগমন ও সিন্ধুদেশবাসি বীরগণের সঙ্গে সমরের কথা আছে। তার পরই মণিপুরদেশে গমনের বিবরণ লিপীবদ্ধ দৃষ্ট হয়। অশ্বমেধপর্ব্বের ৭৮ অধ্যায়ে আছে,—

এবং নির্জ্জিত্য তান্ বীরান্ সৈন্ধবান্ স ধনঞ্জয়ঃ।
অন্বধাবত ধাবন্তং তং হয়ং কামচারিণম্।
• • • ক্রমেণ চ হয়স্ত্বেবং বিচরন্ পুরুষর্ষভ।
মণিপুরপতের্দ্দেশং উপায়াৎ সহ পাণ্ডবঃ।

অর্থাৎ পার্থ সিন্ধুদেশীয় বীরগণকে পরাস্ত করিয়া সেই যজ্ঞাশ্বের অনুসরণ করিলেন। ঐ অশ্ব, কতিপয় দেশ অতিক্রম করিয়া মণিপুররাজের দেশে উপনীত হইল। এখানে মনে করা যাইতে পারে, সিন্ধুদেশের নাতিদূরবর্ত্তী মণিপুর কলিঙ্গ-সন্নিহিত উৎকল-সন্নিবিষ্ট সমুদ্রতীরস্থ মণিপুরই বটে। বঙ্গের ঈশানকোণস্থ পার্ব্বত্য মণিপুর কখনই নহে।

এতক্ষণ আমরা কলিঙ্গ-মণিপুরের প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিলাম। অতঃপর আমরা মহাভারতের বর্ণনা হইতেই দেখাইব, এই কলিঙ্গ-মণিপুরই বভ্রুবাহন-নৃপতির মণিপুর রাজ্য।

অনেকের ধারণা, বঙ্গের ঈশান-কোণস্থ বর্ত্তমান মণিপুর (শূরচন্দ্র কুলচন্দ্র টিকেন্দ্রজিতের মণিপুর) রাজ্যই বভ্রুবাহন নৃপতির রাজ্য এবং উক্ত মণিপুরের রাজবংশই বভ্রুবাহনের বংশ। জনপ্রবাদই প্রধানতঃ এই ভ্রান্ত মতের ভিত্তিভূমি। শুনা যায়, বর্ত্তমান মণিপুরের রাজবংশীয়েরাও নাকি বভ্রুবাহনের উত্তর-পুরুষত্বের দাবী করেন। ইহাতে বিস্ময়ের কারণ না থাকিতে পারে, কিন্তু সম্ভাবনার সংস্রব সুদূরপরাহত।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে অর্জ্জুনের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে কলিঙ্গ-মণিপুরে গমনের যে প্রসঙ্গ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার পরেই বর্ণিত হইয়াছে যে, ঐ মণিপুরেই চিত্রসেন রাজা ছিলেন। অর্জ্জুন, চিত্রসেন-কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন ও রাজার নিকট চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করেন। রাজা অর্জ্জুনের পরিচয় পাইয়া, চিত্রাঙ্গদা দান করেন। অর্জ্জুন সেখানে ৩ বৎসর বাস করেন এবং বভ্রুবাহন জন্মগ্রহণ করিলে পরে পুনরায় তীর্থ যাত্রা করেন। এই ঘটনা আদিপর্ব্বের ২১৭ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। পূর্ব্বে যে "স কলিঙ্গান্ অতিক্রম্য হইতে মণিপুরং জগামহ" (১২-১৩ শ্লোক) পর্য্যন্ত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরেই দেখা যায়—

তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানিচ।
অভিগম্য মহাবাহুরভ্যগচ্ছন্মহীপতিম্।
মণিপুরেশ্বরং রাজন্ ধর্ম্মজ্ঞং চিত্রবাহনম্।
তস্য চিত্রাঙ্গদা নাম দুহিতা চারুদর্শনা।
তাং দদর্শ পুরে তস্মিন্ বিচরন্তীং যদৃচ্ছয়া।
দৃষ্ট্বৈব তাং বরারোহাং চকমে চৈত্রবাহনীম্।
অভিগম্য চ রাজানমবদৎ স্বং প্রয়োজনম্।
দেহিমে খল্বিমাং রাজন্ ক্ষত্রিয়ায় মহাত্মনে।
১৪-১৭

• • • • •

স তথেতি প্রতিজ্ঞায় তাং কন্যাং প্রতিগৃহ্য চ। উবাস নগরে তস্মিন্ তিস্রঃ কুন্তীসুতঃ সমাঃ। তস্যাং সুতে সমুৎপন্নে পরিষজ্য বরাঙ্গনাম্। আমন্ত্র্য নৃপতিং তস্মিন্ জগাম পরিবর্ত্তিতুম্। ২৩-২৭

উদ্ধৃতাংশের ভাবার্থ এই যে, অর্জ্জুন, মণিপুরের রাজা চিত্রবাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া বিবাহেচ্ছু হইয়া রাজাকে জানান। রাজা বলেন, "এই কন্যার যে পুত্র হইবে, সে আমার রাজ্যাধিপতি হইবে। আমি তোমার পুত্রকে বিবাহের শুল্কস্বরূপ আমাকে দিবার অঙ্গীকারে, কন্যা দান করিতে পারি। পার্থ, স্বীকার করিয়া বিবাহ করিলেন। ৩ বৎসর পরে পুত্র জন্মিলে রাজা ও চিত্রাঙ্গদার নিকট বিদায় লইয়া ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। এখানে বোধ হয় আর কাহারও সংশয় হইতে পারেনা যে, এই কলিঙ্গ-মণিপুরই চিত্রাঙ্গদার পিতৃরাজ্য, চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহন ঐ রাজ্যেই রাজত্ব করেন।

অশ্বমেধপর্ব্বেও এইরূপ কথার আভাস আছে। অশ্বমেধপর্ব্বের ৭৯ অধ্যায়ের

আমরা দেখিয়াছি যে, ধনঞ্জয় সিন্ধুদেশ অতিক্রম করিয়া কতিপয় দেশ এড়াইয়া মণিপুরে উপনীত হইলেন। উহার অব্যবহিত পরে (অর্থাৎ ঐ বিবরণ ৭৮ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে আছে। উহার পরে ৭৯ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে) বৈশম্পায়ন বলিতেছেন—

শ্রুত্বাতু নৃপতিঃ প্রাপ্তং পিতরং বভ্রুবাহনঃ।
নির্য্যযৌ বিনয়েনাথ ব্রাহ্মণার্থ-পুরঃসরং।

অর্থাৎ অর্জ্জুন মণিপুরে গেলে, মণিপুররাজ বভ্রুবাহন "পিতা আসিয়াছেন" শুনিয়া, ব্রাহ্মণ সঙ্গে লইয়া বিনয়পূর্ব্বক সম্বর্দ্ধনার্থ বহির্গত হইলেন। তাহার পর অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বভ্রুবাহনের অপমান, উভয়ের সংগ্রাম, অর্জ্জুনের মৃত্যু ও চিত্রাঙ্গদার বিলাপ এবং পরে অর্জ্জুনের পুনর্জ্জীবন লাভ প্রভৃতি বিবরণ লিপীবদ্ধ আছে। এখানেও আমরা সেই মণিপুর, সেই চিত্রাঙ্গদা ও সেই বভ্রুবাহনকে পাইলাম। সুতরাং ইহা যে আদিপর্ব্ব বর্ণিত কলিঙ্গ-মণিপুর ভিন্ন অন্য মণিপুর হইতেই পারেনা, তাহা বলা বাহুল্য। এই সকল বর্ণনা নিপুণ-ভাবে আলোচনা করিলে, কেহই কলিঙ্গ-মণিপুর ও বভ্রুবাহনের মণিপুরকে পৃথক্ বলিতে পারেন না। অথচ সম্প্রতি কল্যাণাস্পদ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু 'অশোক' নামক নবপ্রকাশিত গ্রন্থে, কলিঙ্গ-মণিপুর বভ্রুবাহনের মণিপুর নহে, বলিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইঁহার একটীও প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি মহাভারতের এই সকল স্থান পাঠ করিলে মত পরিবর্ত্তন করিবেন।

এখন একটী কথা এই যে, বর্ত্তমান মণিপুরকে বভ্রুবাহনের মণিপুর বলিয়া সকলে বলে কেন? ইহার দুইটী কারণ হইতে পারে। প্রথম অনুমান এই যে, কলিঙ্গ-মণিপুর রাজ্যের পতনের পর, হয়ত বভ্রুবাহনবংশীয়েরা কোনও অজ্ঞেয় সুযোগে বর্ত্তমান মণিপুর রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। বিস্মৃত কলিঙ্গ-মণিপুরের স্মৃতি, এই নব মণিপুরের সহিত মিলিয়া গিয়া, কালে ইহাকেই প্রাচীন মণিপুর করিয়া তুলিয়াছে। দ্বিতীয় অনুমান এই যে, কলিঙ্গ-মণিপুর ধ্বংসের পর লোক তাহাকে বিস্মৃতি-সাগরে ভাসাইয়া দেয়। পরে যখন নবীন মণিপুরের অভ্যুদয় হয়, তখন লোকে তাহাকেই বভ্রুবাহনের মণিপুর বলিয়া মনে করে। ক্রমশঃ শক্তিশালী রাজারা নিজেদের পূর্ব্বপুরুষরূপে কোনও প্রসিদ্ধ বীর বা দেবতার নাম উল্লেখ করেন। ক্রমে সেই ধারণা বদ্ধমূল হওয়ায় বংশধরগণ উহাকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে অভ্যস্ত হন, ফলে দাবি-দাওয়ার কথা প্রচারিত হয়। এ সকল ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র যে ঐতিহাসিক সত্য বিদ্যমান থাকেনা, তাহার দৃষ্টান্ত মধ্যভারত। অর্জ্জুনের অন্যতমা পত্নী উলূপী নাগকন্যা। আমরা অশ্বমেধপর্ব্বে দেখিয়াছি, উলূপী মণিপুরে মৃত অর্জ্জুনকে মণিস্পর্শে বাঁচাইতেছেন। উলূপী যে মণিপুরেই ছিলেন, তাহা বভ্রুবাহন নিজেও বলিয়াছেন; যথা—

মম ত্বনুগ্রহার্থায় প্রবিশস্ব পুরং স্বকম্।
ভার্য্যাভ্যাং বস ধর্ম্মজ্ঞ মাতৃভেহত্র বিচারণা।

অর্থাৎ আপনি আমার প্রতি কৃপা

করিয়া এই আপনারই পুরীতে প্রবেশ করিয়া, আপনার পত্নীদ্বয়ের (চিত্রাঙ্গদা ও উলূপীর) সঙ্গে বাস করুন, এ বিষয়ে বিচারণা করিবেন না।" যে রূপেই হউক্ চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে উলূপীর ঘনিষ্ঠতা প্রমাণিত হয়। উলূপী নাগকন্যা। নাগ যদি অনার্য্যবংশীয় লোক হয়, তবে মণিপুরীদের মোঙ্গোলীয় ভাবের মূর্ত্তির রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে। কলিঙ্গ-মণিপুরের সহিত যে এই পার্ব্বত্য মণিপুরের বিশেষ গূঢ় সম্বন্ধ ছিল, চিত্রাঙ্গদা ও উলূপীর সপত্নীত্ব তাহার এক রহস্যময় আভাস, মনে করা যাইতে পারে। যাহা হউক্, কলিঙ্গ মণিপুর যে বভ্রুবাহনের জন্মস্থান ও কর্ম্মস্থান, তাহা মহাভারতে সুব্যক্ত।

শ্রী————ভারতী
প্রতাপকাটি যশোহর।

গীতায় ভক্তিযোগ।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

অব্যক্ত-নিরাকার-ব্রহ্মোপাসক সম্বন্ধে তাহার পর বলিতেছেন:—

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥ ৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৪

অর্থাৎ যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূত-হিতকারী ও সর্ব্বত্র সমদর্শী থাকিয়া নিত্য, অচল, অচিন্তনীয়, সর্ব্বব্যাপী, স্বরূপ, কূটস্থ, অক্ষর ও অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারাও আমাকে প্রাপ্ত হন। শ্রীভগবানের এইরূপ উক্তিতে আমরা কি ইহাই বুঝিব যে তাঁহার অব্যক্ত ভাব (unmanifested form) বিশ্বরূপ (manifested form) অপেক্ষা ইতর বা কোন অংশে নিকৃষ্ট? তাহাই বা কিরূপে বুঝিব। কারণ এই অব্যক্ত ভাব বুঝাইবার জন্য তিনি গীতার নানাস্থানে অব্যক্ত অক্ষর ইত্যাদি পদ ব্যবহার করিয়া তাঁহার উৎকৃষ্ট স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন।

তিনি সপ্তম অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরংভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ ২৪

এই শ্লোকে তিনি 'অব্যক্ত' পদ দ্বারা তাঁহাকে প্রপঞ্চাতীত বলিয়াছেন। যে সকল মানব তাঁহাকে মনুষ্য, মীন ও কূর্ম্মাদি ভাবাপন্ন মনে করে, তাহারা তাঁহার পরম উৎকৃষ্ট স্বরূপ জানিতে পারেনা। (১)

অন্যত্র নবম অধ্যায়ে—

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ৪

এই শ্লোকে "অব্যক্ত-মূর্ত্তি" পদ প্রয়োগেও নিজে অতীন্দ্রিয় স্বরূপে নিরাকার ভাবে (unmanifested form এ) সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত আছেন—অর্থাৎ স্থিরপ্রাণে সর্ব্বভূতে বিরাজমান, ইহাই প্রকাশ করিতেছেন। (২)

---

(১) অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং মাং ব্যক্তিং মনুষ্য-মৎস্য-কূর্ম্মাদিভাবং প্রাপ্তং মন্দবুদ্ধয়ো মন্যন্তে, তত্র হেতুঃ মম পরং ভাবং স্বরূপমজানন্তঃ ॥ ● (স্বামী)

(২) অব্যক্তা অতীন্দ্রিয়া মূর্ত্তিঃ স্বরূপং

অন্যত্র অষ্টম অধ্যায়ে—

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয় সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥১৮

এস্থলে অব্যক্ত স্থিরভাব। সাংখ্য মতে মুল প্রকৃতি, যাহা হইতে এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। (৩)

অন্যত্র উক্ত অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে—

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০

এই শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত চরাচর বিশ্বের কারণীভূত "অব্যক্ত" বা "মূলপ্রকৃতি" হইতেও তাঁহার আর একটী অব্যক্ত ভাব আছে তাহাই উক্ত হইতেছে। তাহা সনাতন, সমস্ত ভূত বিনষ্ট হইলেও তাহা কদাচ বিনষ্ট হয় না।

উক্ত অধ্যায়ে পরবর্ত্তী শ্লোকে—

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ননিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ২১

এই স্থানে পরম পুরুষার্থ বা তাঁহার পরম-ধাম স্বরূপ অতীন্দ্রিয় ও অক্ষর ভাবকেই অব্যক্ত ও অক্ষর কহিয়াছেন। ইহা পাইলে জীবের আর পুনরাবৃত্তি হয় না। (৪)

যস্য তাদৃশেন ময়া কারণভূতেন সর্ব্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তম্ * * (স্বামী)

(৩) "কার্য্যাত্মাব্যক্তরূপং কারণাত্মকং. তস্মাদব্যক্তাৎ কারণরূপাৎ ব্যক্তয় ইতি ব্যক্তয়শ্চরাণি ভূতানি প্রাদুর্ভবন্তি * * (স্বামী)

(৪) শ্রুতি বলিতেছেনঃ—
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা স পরাগতিঃ॥ ১১ (কঠোপনিষৎ)

অর্থাৎ জগতের বীজভূত অব্যাকৃত ও সর্ব্বকার্য্য-কারণ-শক্তি সম্পন্ন অব্যক্ত হইতে

সুতরাং তাঁহার অব্যক্ত ভাব যে কোন অংশে ইতর, তাহা কুত্রাপি বর্ণিত হয় নাই, বরং অব্যক্ত অক্ষর-ব্রহ্মোপাসকের প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব অনেক স্থানেই বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ সপ্তম অধ্যায়ে বলিয়াছেন "হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! আর্ত্ত (ভবরোগাদিতে অভিভূত, আত্মজ্ঞানেচ্ছু, অর্থার্থী (ইহলোক-পরলোক সাধনভূত অর্থপ্রাপ্তির ইচ্ছু) এবং আত্মজ্ঞানী এই চারি প্রকার সুকৃতি-শালী ব্যক্তিরা আমাকে ভজনা করেন (১৬) তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বদা আমাতে নিষ্ঠাবান্ ও একমাত্র আমাতে ভক্তি-বিশিষ্ট জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ; আমি জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয়, আর তিনিও আমার প্রিয় (১৭) ইহাদের সকলই মহান্; কিন্তু জ্ঞানী আত্মার স্বরূপ, এই আমার মত; যেহেতু মদেকচিত্ত সেই জ্ঞানী সর্ব্বোত্তমা গতি আমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন (১৮) বহুজন্মের পর জ্ঞানবান্ "এই চরাচর বিশ্বই বাসুদেব" এইজ্ঞানে আমাকে প্রাপ্ত হন; তেমন মহাত্মা সুদুর্ল্লভ। ১৯।" (আর্য্যমিশন্ ইঃ হইতে প্রকাশিত গীতা)

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করিলাম, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গীতাতে কোন স্থানে নিরাকার-ব্রহ্মোপাসকের, তথা কোন স্থানে সাকার-ব্রহ্মোপাসকের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং উহার দ্বারা আমরা কি ইহাই বুঝিব যে, পুরাণাদির ন্যায় গীতাও

পরম পুরুষ পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ। তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। ইনি সমস্তের পর্য্যবসান, মহৎ ও সূক্ষ্মের পরিসমাপ্তি এবং গন্তৃগণের গন্তব্যস্থল। ইহা প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না।

অলঙ্কার ও অর্থবাদ সন্দুষ্ট অথবা "অতি-শয়োক্তি দোষযুক্ত।" গীতার বক্তা স্বয়ং শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। গীতাতেই তিনি বলিয়াছেন যে, সাধুগণের স্বধর্ম্ম রক্ষণার্থ ও দুরাত্মগণের অত্যাচার-নিবারণার্থ—শ্রীভগবান্ যুগে যুগে (আবশ্যকানুসারে) অবতীর্ণ—হইয়াছিলেন। তিনি কাল ও ক্ষেত্রানুসারে যখন যে আকার ধারণের প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন, তখন সেই আকারেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি কখন জীবাকারে, কখন পুরুষ, কখন বা প্রকৃতিরূপে অবতীর্ণ হন। তিনি পরমদয়ালু, শত্রুদমনে তাঁহার যথেষ্ট দয়া, শাস্ত্রকারগণ কীর্ত্তন করেন।

"এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে,
কুর্ব্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু,
মত্বাতু নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি। ১৮
দৃষ্টৈব কিন্ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম,
সর্ব্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতা,
ইত্থং মতির্ভবতি তেষপি তেঽতি সাধ্বী। ১৯

(শ্রীশ্রীচণ্ডী, দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুরবধ)

(দেবগণ বলিতেছেন) "হে দেবি! এই সকল অসুরগণের বধ হইলে জগতে শান্তি স্থাপিত হইবে, কিন্তু যাহাতে ইহারা অধিকতর পাপ সঞ্চয় করিয়া নরকভাগী না হয়, তজ্জন্য তুমি ইহাদিগকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়া, তাহাদের মহোপকার সাধন করিলে। কারণ যুদ্ধে ইহারা তোমার হস্তে বিনষ্ট হইয়া অচিরাৎ স্বর্গগামী হইবে। দেবি! তুমি ব্যতীত প্রাণীগণের এইরূপ সর্ব্ববিধ উপকার হেতু কাহার চিত্ত দয়ার্দ্র হইতে পারে? তুমি ইচ্ছা করিলে অথবা সামান্য কটাক্ষপাত করিলে ইহারা সকলেই ভস্মীভূত হইতে পারিত, কিন্তু তোমার অস্ত্রাঘাতে ইহারা পবিত্র হইয়া স্বর্গধামে গমন করিবে বলিয়াই তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, অস্ত্র-শস্ত্র-প্রয়োগে ইহাদিগকে নিহত করিয়াছ। শত্রুর সম্বন্ধেও এতাদৃশ দয়া, দেবি! তুমি ভিন্ন আর কাহার হইতে পারে? তোমার ইচ্ছা অতীব মঙ্গলময়ী।"

যদি শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিতে কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকে সেই আপত্তির খণ্ডন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু তাঁহাকে অবতার স্বীকার না করিলেও তিনি যে জগদ্‌গুরু ও আদর্শ মানব, তাহা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। তাঁহার কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যাহা করিতেন, তাহাই তিনি বলিতেন; অথবা তিনি যাহা বলিতেন, তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতেন। মানব-জীবনে যে অবস্থায় যাহা করিলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনপ্রিয় হয়, তাঁহার জীবনে তাহা যেরূপ পরিস্ফুটিত হইয়াছে, অপর কোন মহাপুরুষের জীবনীতে তাহা শ্রুতিগোচর হয়না। গোকুলে গোপালয়ে,—বৃন্দাবনের লীলা-খেলায়—মথুরার রাজ্যাভিষেকে—দ্বারকার রাজ-সম্পদে—কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে—যেখানেই দেখিবে, সেই খানেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য

গোকুলে গোপালগণ মধ্যে গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোপাল রাজা। গোপাল শ্রান্ত ও গমনে অপটু, শ্রীকৃষ্ণ তাহার বাহক। কোন গোপাল ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসাতুর, নন্দনন্দন

তাহার জন্য সদাচিন্তিত ও ব্যতিব্যস্ত। কোন গোপাল পীড়িত, শ্রীকৃষ্ণ তাহার চিকিৎসক। যেখানে যাহার কোন বিপদ্ উপস্থিত, শ্রীকৃষ্ণ সেই খানেই—তাহার উদ্ধারকর্ত্তা। নিজকে ক্ষুদ্র বোধ না করিলে মহৎ হওয়া যায় না, এবং নিজের স্বার্থত্যাগ না করিলে প্রকৃতপক্ষে পরের উপকার করিতে পারা যায় না। তাঁহার উদারতা, পরোপচিকীর্ষা ও করুণ-ব্যবহারে গোপালগণ তাঁহার প্রতি এতাদৃশ আকৃষ্ট ও অনুরক্ত ছিল যে, তিলেকের অদর্শনে তাহারা প্রাণ শূন্য মনে করিত।

নানা ফল-পুষ্প-শোভিত সুমধুর বৃন্দাবনে তাঁহার সুললিত বংশী ধ্বনিতে আপশুপক্ষী বিমোহিত হইত। তাঁহার বিশ্ববিমোহন সৌন্দর্য্য মধুর ব্যবহার, এবং বিশ্বজনীন প্রেম ও উদারতায় বৃন্দাবনের গোপ, গোপী, এমন কি বৃন্দাবনের প্রত্যেক নরনারী আকৃষ্ট ও আত্মহারা হইয়াছিল। শৈশবে যেরূপ চপলতা ও ক্রীড়াশীলতা দেখাইলে পিতা মাতা, ও আত্মীয় স্বজনের আনন্দ বর্দ্ধন হয়, তিনি তাহারই আদর্শ ছিলেন। বাল্যকালে যেরূপ সরল, উদার ও প্রেমিক হইলে সমবয়স্ক ও অন্যান্য লোকের প্রিয় হওয়া যায়, তাহাই তিনি কার্য্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে বাহুবল ও গোপালগণ-রক্ষণ কৌশল প্রকাশে যেমন সকলই চমকিত, কৈশোরে তেমনই তাঁহার রসিকতায়, সার্ব্বভৌম প্রেমে, উদারতায় ও তাঁহার সঙ্গীতবিদ্যায়, অলৌকিক-শক্তি-বিকাশে সকলে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার প্রেম অনুপম, কিন্তু উহা সকাম নহে। পুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ ইত্যাদি তাঁহার এই বিশ্বজনীন প্রেমকে কলঙ্কিত করিলেও বৈষ্ণব-গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট সদ্বিচার পরিলক্ষিত হয়। (১)

তাঁহার কোন কর্ম্মই সকাম বা স্বার্থপরতাবিজৃম্ভিত জানিতে পারা যায় না। মথুরায় রাজ্যাভিষেকে তাহা সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। বিজেতা শত্রুনাশ করিয়া শত্রুপুরী অধিকার ও স্বরাজ্য স্থাপন করিয়া থাকেন, কিন্তু নিষ্কাম ও স্বার্থত্যাগী কৃষ্ণ তাহা করেন নাই। ঘোর অত্যাচার নিবারণ ও ধর্ম্মসংরক্ষণ জন্য তিনি কংসকে বধ করিয়াছিলেন; এবং কংসের পিতা উগ্রসেনকেই রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। দেশপূজ্য স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

"এখানে ঘোর অত্যাচারী কংসের বধে সমস্ত যাদবগণের হিতসাধন হয়, এইজন্য তিনি কংসকে বধ করিয়াছিলেন—ধর্ম্মার্থমাত্র; বধ করিয়া করুণ হৃদয় আদর্শ পুরুষ কংসের জন্য বিলাপ করিয়াছিলেন, এমন কথাও গ্রন্থে লিখিত আছে। এই কংস-বধে আমরা প্রথমে প্রকৃত ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাই এবং এই কংসবধেই দেখিবে, কৃষ্ণ পরম বলশালী, পরম কার্য্যদক্ষ, পরম ন্যায়পর, পরম ধর্ম্মাত্মা, পরহিতে রত, এবং পরের জন্য কাতর। এইখান

---

(১) গোপীদিগের প্রেম ইন্দ্রিয়-জনিত কাম নহে, তাহা বিশুদ্ধ প্রেম; ভাবসাম্যে প্রাকৃত প্রেমের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে মাত্র।
"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়- প্রীতি-ইচ্ছা, ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ-সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেমেতে প্রবল॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥
(কবিরাজ গোস্বামী কৃত চৈতন্য চরিতামৃত)

হইতে দেখিতে পাই—যে তিনি আদর্শ পুরুষ।" (কৃষ্ণচরিত্র)

তিনি পূর্ণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। রাজনীতিজ্ঞ হইলে "কুচক্রী" হয় না। স্বার্থ বা স্বাভিলাষ-সিদ্ধি-অনুকূলে কুচক্র বা ষড়যন্ত্র করিলেই—কুচক্রী বলা যাইতে পারে। এতৎসম্বন্ধে "কৃষ্ণচরিত্র" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। "ইয়ুরোপীয়দিগের বিশ্বাস, কৃষ্ণ কেবল পরস্ত্রীলুব্ধ পাপিষ্ঠ গোপ; এদেশের লোকের কাহারও বা সেইরূপ বিশ্বাস, কাহারও বিশ্বাস যে, তিনি মনুষ্য-হত্যার জন্য অবতীর্ণ, কাহারও বিশ্বাস তিনি "চক্রী" অর্থাৎ স্বাভিলাষ সিদ্ধি জন্য কুচক্র উপস্থিত করেন। তিনি যে এ সকল নহেন, তিনি যে তৎপরিবর্ত্তে লোক হিতৈষীর শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মোপদেষ্টার শ্রেষ্ঠ,—আদর্শ মনুষ্য—ইহাই বুঝাইবার জন্য এই সকল উদ্ধৃত করিতেছি। * * *

"তখন কৃষ্ণ, যাহা সমস্ত পৃথিবীর রাজনীতির মূলমন্ত্র, তদনুসারে কার্য্য করিতে ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন। রাজশাসনের মূলমন্ত্র এই যে, প্রজা-রক্ষার্থ দুষ্কৃতকারীকে দণ্ডিত করিবে। অর্থাৎ অনেকের হিতার্থ একের দণ্ড বিধেয়। সমাজের রক্ষার্থ—হত্যাকারীর দণ্ড বিহিত। যাহাকে আবদ্ধ না করিলে তাহার পাপাচরণে বহুসহস্র প্রাণীর প্রাণসংহার হইবে, তাহাকে আবদ্ধ করাই জ্ঞানীর উপদেশ। ইয়ুরোপীয় সমস্ত রাজা ও রাজমন্ত্রী পরামর্শ করিয়া এইজন্য খ্রীঃ ১৮১৫ অব্দে নেপোলিয়নকে যাবজ্জীবন আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এইজন্য মহানীতিজ্ঞ কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন যে, দুর্য্যোধনকে বাঁধিয়া রাখিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করুন। তিনি নিজে সমস্ত যদুবংশের রক্ষার্থ, কংস মাতুল হইলেও, তাহাকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" (কৃষ্ণচরিত্র)

উক্ত মনীষী কৃষ্ণের দেহত্যাগের চারিটী কারণ নির্দ্দেশ করেন। তিনি তাহার "কৃষ্ণচরিত্র" গ্রন্থে—কহিয়াছেন—

"প্রথম, টালবয়স্ হুইলরি সম্প্রদায় বলিতে পারেন, কৃষ্ণ, জুলিয়স কাইসরের মত, দ্বেষবিশিষ্ট বন্ধুগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। এরূপ কথা কোন গ্রন্থেই নাই।

দ্বিতীয়, তিনি যোগাবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের শিষ্যগণ, যোগাবলম্বনে দেহত্যাগের কথাটায় বিশ্বাস করিবেন না। আমি নিজে অবিশ্বাসের কারণ দেখিনা। যাঁহারা যোগাভ্যাস কালে নিশ্বাস অবরুদ্ধ করা অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্বাস অবরুদ্ধ করিয়া আপনার মৃত্যু সম্পাদন করিতে পারেন না, এমন কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারিনা। এরূপ ঘটনা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনাও গিয়া থাকে। অন্যে বলিতে পারেন, ইহা আত্মহত্যা সুতরাং পাপ, সুতরাং আদর্শমানবের অনাচরণীয়। আমি ঠিক্ তাহা বলিতে পারিনা। প্রাচীন বয়সে, জীবনের কার্য্য সমস্ত সম্পন্ন হইলে পরে, ঈশ্বরে লীন হইবার জন্য মনোমধ্যে তন্ময় হইয়া, শ্বাসরোধকে আত্মহত্যা বলিব, না "ঈশ্বর প্রাপ্তি" বলিব? সেটা বিচারস্থল। আত্মহত্যা মহাপাপ স্বীকার করি, জীবন শেষে যোগবলে প্রাণত্যাগ ও কি তাই?

তৃতীয়, জরাব্যাধের শরাঘাত।

চতুর্থ, এই সময়ে কৃষ্ণের বয়স শতবর্ষের অধিক হইয়াছিল, বলিয়া বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে। এ জরা ব্যাধ, জরাব্যাধি নয়ত?

যাঁহারা কৃষ্ণকে মনুষ্য মাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা এই চারিটী মতের কোনটী গ্রহণ করিতে পারেন। আমি কৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করি। অতএব আমি বলি, কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণ। আমার মত ইহা যে, জগতে মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচার তাঁহার ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছা-পূরণ জন্য তিনি মানুষী শক্তিদ্বারা সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু তাহা বলিলেও ঈশ্বরাবতারের জন্ম-মৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন মাত্র বলিতে হইবে। অতএব আমি বলি, কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহ ত্যাগের একমাত্র কারণ।"

এজগতে যোগী কে? সুখীই বা কে? অর্জ্জুনের এবম্বিধ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, এই দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইলে পর প্রিয়তমা পত্নীর প্রেমালিঙ্গনে ও প্রাণাধিক পুত্র-কন্যার মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে প্রাণশূন্য দেহ যেমন স্থির ও অচল থাকে, মৃত্যুর পূর্ব্বে যদি কেহ সেইরূপ প্রেমালিঙ্গনে বা হৃদয় বিদারক চীৎকারে স্থির ও অচল ভাব ধারণ করিতে পারেন, তবে তিনিই যোগী ও সুখী।

এই স্থির ও অচল ভাব ধারণ সহজ কথা নহে। এক অক্ষয় ও অব্যক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী অথবা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ যোগী ভিন্ন অপরের সম্ভব নহে। আমরা যখন শত্রুসঙ্কুল মথুরাপুরীতে—রাগ-দ্বেষ-পরিপূরিত যুদ্ধোন্মত্ত অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনামধ্যে—স্বকীয় অগ্রজের শিষ্য ও ভাগিনেয় অভিমন্যু বধ-জন্য শোকাকুলিত পরিবারবর্গ মধ্যে এবং স্বকীয়বংশ-ধ্বংস-ব্যাপারে তাঁহার অলৌকিক ধৈর্য্য ও ঔদাসীন্য অবলোকন করি, তখন তাঁহাকে মহাজ্ঞানী বা মহাযোগী না বলিয়া থাকিতে পারি না। সেইজন্যই বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, তিনি যাহা বলিতেন, তাহাই করিতেন; অথবা যাহা করিতেন, তাহাই উপদেশ দিতেন। শারীরিক বলে তিনি অদ্বিতীয় ও আদর্শ। অস্ত্র শস্ত্র বিদ্যায় তিনি আদর্শ। সঙ্গীত ও চিকিৎসা শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ও আদর্শ-স্থানীয়। বিশ্বজনীন প্রেম ও রসিকতায় তিনি আদর্শ। স্বার্থত্যাগ ও সমাজের হিতসাধন যদি ধর্ম্ম হয়, তবে তিনি ধার্ম্মিকগণের আদর্শ ও শীর্ষ স্থানীয়। সর্ব্বভূতে সমদর্শন—সর্ব্বজীবে দয়াবিতরণ—নিষ্কামভাবে সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন যদি জ্ঞানী ও যোগীর লক্ষণ হয়, তবে তিনি মহাজ্ঞানী ও মহাযোগী। সুতরাং এ হেন মহাপুরুষের কোন কথাই অতিরঞ্জিত বা অর্থবাদসন্দুষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ দে

মনের মহত্ত্ব ও ধনের সদ্ব্যবহার।

(সত্য ঘটনা।)

সংসারে উৎপীড়িত হইয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করতঃ এক বৈশ্য কাশীবাসী হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের যেরূপ অবাধে ভিক্ষা মিলে, অপরের সেরূপ মিলেনা বলিয়া, কাশীতে থাকা তাহার পক্ষে ভার হইয়া উঠিল; সুতরাং

উপায়শূন্য হইয়া সে ফল বিক্রয় দ্বারায় জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিল। ভাগ্যক্রমে তাহার তাহাতে যথেষ্ঠ লাভ হইতে লাগিল। ক্রমে সে আপনার ব্যবসায় বিস্তারিত করিয়া তুলিল, এবং অল্পদিনের মধ্যেই ধনবান্ মহাজন বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিল। ২। ৪ টাকা হইতে শত সহস্র টাকার অধিপতি হইয়া পরে লক্ষপতি হইল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্তন হইল না। সে যে সামান্য গৃহে ভাঁড়া দিয়া থাকিত, তাহাতেই অবস্থিতি করিয়া শাকান্নে দিনপাত করিতে লাগিল।

প্রচুর ধন উপার্জ্জিত হইলে, সে কাশীর পশ্চিম প্রান্তে (শিগ্‌রা পল্লীতে) একটী সুবৃহৎ উদ্যান প্রস্তুত করিল। তন্মধ্যে এক সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া "দাউজীর" (বলদেবের) এক প্রতিমূর্ত্তি বহুমূল্য রত্নে সুসজ্জিত করিয়া প্রতিষ্ঠা করিল। সেবার জন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিল ও প্রতিদিন শত শত দীনহীন লোকদিগকে অন্নদান করিতে লাগিল। একশত ব্রাহ্মণ-বালকদিগের পাঠার্থ মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে ছাত্রাশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দিল। অভ্যাগত ব্রাহ্মণ এবং ব্রহ্মচারীদিগের বাসের জন্য সুন্দর সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিল। অন্যান্য জাতির জন্য স্বতন্ত্র ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা করিল। মাঠের মধ্যে মধ্যে 'ভাণ্ডারা' করিয়া সর্ব্বসাধারণকে প্রচুর পরিমাণে লুচি মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাওয়াইতে লাগিল। কিন্তু আপনি সেই শাকান্নেই পরিতুষ্ট রহিল।

একদিন তাহার শরীর অসুস্থ দেখিয়া, এক অভ্যাগত সাধু কহিলেন যে—"তোমার অন্তিমকাল উপস্থিত, আজি হইতে ৫০ দিনের মধ্যে তোমাকে মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইবে"। তাহা শুনিয়া সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, এবং পরক্ষণেই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকাইয়া কহিল,—"আমার অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে তাহার জন্য চিকিৎসা করিতে হইবে, তাহার আয়োজন কর।" শুনিয়া অনুজ বিষণ্ণ হইয়া কহিল—'যেরূপ চিকিৎসার প্রয়োজন, আজ্ঞা করুন, সেইমত চিকিৎসক আনাইয়া ঔষধ পথ্যের আয়োজন করিতেছি'। তখন জ্যেষ্ঠ কহিল—'এ রোগের চিকিৎসার জন্য ১ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে, এখনি সংগ্রহ করিয়া দরিদ্র এবং ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবার জন্য প্রতিদিন ৫১ টী 'ভাণ্ডারা'র আয়োজন কর। অনুজ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সেইমত আয়োজন করিল। ঘৃত, ময়দা, দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন, ভারে ভারে আসিতে লাগিল, দীয়তাং ভুজ্যতাং রবে কাশীর আকাশ পূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপে ৫০ দিন গত হইলে মহাজন মহানন্দে ভগবানের নাম করিতে করিতে মানবলীলা সম্বরণ করিল।

মৃত্যুকালে তাহার বিপুল সম্পত্তি সঞ্চিত হইয়াছিল, দেশ-দেশান্তরে ব্যবসায় বাণিজ্য বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছিল। মহাজন তাহাই দেখাইয়া বলিয়া গিয়াছিল যে, 'চিরকাল যেন দাউজীর এইরূপ সেবা বর্ত্তমান থাকে।" কতদিন হইল সে মহাজন অমরধামে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার ভ্রাতারা অদ্যাপি সেই নিয়মে সেই ধর্ম্মশালার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। হিন্দুর ধন এইরূপই ব্যয়িত হয়।

শ্রীহরিদাসী দেবী।

হরি-লহরী।

(গীতিকা) *

হরি বল মন-রসনা॥
(ও মন) ধর হরি, স্মর হরি, কর হরির
উপাসনা॥
হরেকৃষ্ণ হরেরাম রসনায় কর
ঘোষণা॥
(সদা) হরিলীলা আস্বাদিয়ে,
হরিগুন গাইয়ে,
হরিরূপ ধ্যানে ধরিয়ে,
হরিনাম জপে বস'না॥
(মন তোর) হরিপদে নাইরে মতি,
হরি-রসে নাই রতি এক রতি,
পরিণামে কি হবে গতি,
হরিনাম ভাল বাসনা॥
(এই) হরিনামে ব্রহ্মা তপস্বী,
হরিনামে শিব শ্মশানবাসী,
হরিনামে গৌরহরি সন্ন্যাসী,
(হ'ল) হরিনাম-রসে রসনা॥
(এই) হরিনাম মহৌষধি,
হরিবে এ ভব-ব্যাধি,
তরিবে এ ভবনদী,
পূরিবে মন-বাসনা॥
(সদা) হরিভক্ত-সহবাসে,
রহ হরির ব্রজবাসে,
কহ হরি ভাবাবেশে,
হরিনাম-রসে ভাসনা॥
(ওমন) হরিনাম স্মর নিত্য,
হরিনামে হর চিত্ত,
হরিনামে হ'য়ে মত্ত,
নাচ গাও কাঁদ হঁসনা॥

শ্রীপঃ—

* সুরতাল-সংযোগে গেয়। সম্ভবতঃ তজ্জন্যেই রচিত হওয়ায় বর্ণসংখ্যার যে কমিবেশী হইয়াছে, তাহাও একটু চড়ার কায়দায় পাঠ করিলেই সুছন্দোবদ্ধ পদ্যের ন্যায় সুখপাঠ্য হইতে পারে। [হিঃ পঃ সঃ]

প্রাণতত্ত্ব

সমষ্টি ও ব্যষ্টি সৃষ্টির উপষ্টম্ভক রূপে যে প্রাণের অপূর্ব্ব মহিমা শ্রুতিতে গীত হইয়াছে, "অগ্নিসোমময়ং জগৎ" ইত্যাদি বচনের দ্বারা যে প্রাণ-শক্তির লীলা, বিশ্ব-বিধান বিষয়ে শ্রুতিতে উত্তম রূপে বর্ণিত আছে, "অরাইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্" ইত্যাদি বচনের দ্বারা যে প্রাণের সর্ব্বাধারকত্ব সর্ব্বথা আমার সিদ্ধ, সেই প্রাণের তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছি। বৃহদারণ্যকোপনিষদে যে প্রাণতত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে, পাশ্চাত্য দর্শন-সমূহে শক্তি-(Force or energy) রূপে যাহার কথঞ্চিৎ আভাস উপলব্ধি হয়, সোম, রয়ি বা অন্ন রূপে জড় বস্তুকে অভিহিত করিয়া তদন্তর্নিহিত শক্তি রূপে শ্রুতিতে যে প্রাণের বর্ণনা আছে, এবং Matter রূপে জড় বস্তুকে অভিহিত করিয়া, তদন্তর্নিহিত Potential ও Kinetic শক্তি-(Energy) রূপে যে প্রাণের আভাস পাশ্চাত্য দর্শনে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই প্রাণের স্বরূপ বর্ণন করিতেছি।

শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যকোপনিষদ্-ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"সর্ব্ব এব হি প্রকারঃ, অতঃ প্রাণ উপষ্টম্ভঃ পুংসোহি

স্তম্ভাদিলক্ষণঃ প্রকাশকোঽমৃতঃ। বাহ্যশ্চ কার্য্যালক্ষণোঽপ্রকাশক উপজনাপায়ধর্ম্মক-স্তৃণকুশমৃত্তিকাসমো গৃহস্যেব শক্তি-শব্দ বাচ্যো মর্ত্ত্যঃ। তেনামৃতশব্দবাচ্যঃ প্রাণশ্ছন্ন ইতি চোপসংহৃতঃ। স এব চ প্রাণো বাহ্যাধারভেদেষু অনেকধা বিবৃতঃ।" অর্থাৎ বিশ্বজগতের যাবতীয় পদার্থ দ্বিধা বিভক্ত, অন্তরাংশ এবং বাহ্যাংশ। অন্তরাংশ প্রাণ এবং বাহ্যাংশ জড়। প্রাণাংশ প্রকাশক, স্থায়ী অমৃত; বাহ্যাংশ অপ্রকাশক, ক্ষয়বৃদ্ধিশীল, পরিণামী। এই বাহ্যাংশ দ্বারা প্রত্যেক পদার্থের প্রাণাংশ সমাচ্ছন্ন থাকে। প্রাণ করণাত্মক এবং বাহ্যাংশ কার্য্যাত্মক। শ্রুতির ভাষায় বাহ্যাংশকে রয়ি বা অন্ন এবং প্রাণকে অন্নাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। অন্ন হইতে প্রাণের পোষণ হয়, এজন্ত প্রাণ অন্নাদ; কেননা স্থূলজগতের সহিত সূক্ষ্মের সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্থূলের পুষ্টি দ্বারা সূক্ষ্মেরও পুষ্টি হয়। "ইদং সর্ব্বং যদয়ং তৎ প্রাণেনৈবাপ্তুতে" ইত্যাদি ভাষ্য দ্বারা এই বিজ্ঞানের পুষ্টি হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লীতে যে "অন্ন অন্নাদে প্রতিষ্ঠিত এবং অন্নাদ অন্নে প্রতিষ্ঠিত" এইরূপ মন্ত্র দৃষ্ট হয়, উহা হইতে সোমাগ্নির অন্যোন্যাপেক্ষিকত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যেমন অন্ন হইতে প্রাণের প্রতিষ্ঠা হয়, তেমনই প্রাণ হইতে অন্নের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। এই প্রকারে পদার্থ এবং শক্তির অন্যোন্য সাপেক্ষত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শনে Force এবং matter এই উভয়ের এইরূপ সম্বন্ধাভাস কথঞ্চিৎ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

উল্লিখিত Force, প্রত্যেক matter এর ভিতর বিদ্যমান আছে। প্রত্যেক বাহ্যবস্তু এই শক্তি ও পদার্থের দ্বারা গঠিত। এই Force এর আবির্ভাব-তিরোভাব বা বিকাশের তারতম্যানুসারে পদার্থ সমূহের আণবিক সন্নিবেশ বা পদার্থ সমূহে তত্ত্ব-শক্তির প্রাধান্য হইয়া থাকে। ভগবান্ শঙ্কর বৃহদারণ্যকভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"কার্য্যাত্মকে নামরূপে শরীরস্থে ক্রিয়াত্মকস্তু প্রাণস্তয়োরুপষ্টম্ভকঃ" প্রাণশক্তি স্পন্দনাত্মিকা। এই স্পন্দনই বেগ এবং গতির তারতম্যানুসারে আত্ম প্রকাশ করে এবং ভূতাংশ বা জড়াংশও তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনুসারে যে পরমাণু সংঘাত হইতে সৃষ্টি এবং তাহাদের বিচ্ছেদ হইতে মূর্ত্ত পদার্থের বিলয় হওয়া সুসিদ্ধ হইয়াছে, তাহা এই অন্তর্নিহিত শক্তিরই আবির্ভাব এবং তিরোভাবের ফল। সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত Herbert Spencer এই শক্তির দুইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। এক বাধাক্রিয়াজনকরূপ বা জড়রূপ এবং ঐ জড়াবস্থার আশ্রয়ে যে নানা প্রকার ক্রিয়া হয় উহাই উক্ত শক্তির দ্বিতীয় রূপ। তাঁহার সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করা হইল যথা—

"The Forms of our experience oblige us to distinguish between two modes of force. The force by which matter demonstrates itself to us as existing and the force by which it demonstrates itself to us as acting. The one

not the worker of change and the other as the worker of change—actual and potential. Matter in all its properties is the unknown cease of all sensations it produces in us of which the one remains when all the others are absent is resistence to our effort. In imagining a unit of matter we may not ignore the symbol by which alone a unit of matter can be figured in thought as an existence—by which it is distinguished from empty space. The force by which matter exists is passive but independent which the force by which it moves is active but dependent on its past and present relations to other atoms."

এখন বিচার করিতে হইবে যে, জড়-বস্তুর সহিত এই দ্বিবিধ অবস্থাপন্ন শক্তির কি সম্বন্ধ। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-গণের মধ্যে অনেকেই বলেন যে এই জড়-বাহ্যবস্তু সূক্ষ্ম শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। স্পন্দনাত্মিকা শক্তি স্পন্দিত হইতে হইতে ঘনীভাব ধারণ করত স্থূলতাপ্রাপ্ত হয়। "Concrete motion arises by the integration of diffused matter and concrete matter arises by the aggregation of diffused matter." Lord Kelbin প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, পরমাণুসমূহ সর্ব্বগত তরল পদার্থ ইথারের আবর্ত্ত মাত্র এবং বিজ্ঞানের প্রতি আরও সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা Herbert Spencer, Stall প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত-গণ ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দৃষ্টির অগোচর এই শক্তিই স্থূলাবস্থায় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অমূর্ত্ত অবস্থায় যে শক্তি কেবল ক্রিয়াত্মকরূপে প্রকাশিত হয়, উহাই মূর্ত্ত অবস্থায় ক্রিয়াত্মক এবং জড়াত্মক এই দুইভাবে উপলব্ধ হইয়া থাকে। ইহা ঘনীভাবের ফল মাত্র। আমরা স্থূলবস্তুকেই করণাত্মক এবং কার্য্যাত্মক উভয় প্রকারে মিলিত দেখিতে পাই। সূর্য্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ আদি স্থূলপদার্থে ক্রিয়াত্মক অংশের প্রাধান্য এবং জলীয় ও পার্থিব পদার্থে জড়াত্মক অংশের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূলাবস্থায় উপস্থিত হইবার সময় শক্তি এবং শক্তির আধার জড়াংশের ঘনীভাব আবশ্যক। এইজন্যই প্রত্যক্ষী-ভূত শক্তির জড়োপাদানের আশ্রয়েই কার্য্য-কারণের অনুভূতি হইয়া থাকে। পরন্তু যাহাকে জড়োপাদান বলা হয়, তাহা শক্তিরই আকার ভেদ মাত্র। পণ্ডিত টাণ্ডোর মত এই:—

In truth modern science teaches that diversity and change in the phenomena of nature are possible only in conditions that energy of motion is capable of being stored as the energy of position. The relatively permanent concretion of material forms, chemical

action and reaction, crystallization the revolution of vegetable and animal organism all depend upon the locking up of Kinetic action in the form of latent energy. এই শক্তিকেও কোন কোন পাশ্চাত্য দর্শনে 'দিব্যাগ্নি' বলিয়া বর্ণন করিয়া উহা হইতেই স্থূল জগতের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। Uberweg এর History of Philosophyতে জগতের উৎপত্তি বিষয়ে বর্ণিত আছে :—"The formation of the world takes place by the transformation of the divine fire into air and water. The two denser elements earth and water are mainly passive ; the two finer ones—air and fire are mainly active."

পণ্ডিত Weber লিখিয়াছেন :—'Matter is essentially resistance and resistance means activity. Behind the state there is the act which constantly produces it and revews it. What seems to inertia is in reality more intense action, a more considerable effort. Now force constitutes the essence of matter ; hence matter is in reality immaterial in its essence."

নৈহারিকী অবস্থা হইতে পাশ্চাত্যদর্শনে জগদুৎপত্তির যে বর্ণন করা হইয়াছে, তাহাতেও যে স্পন্দনাত্মিকা শক্তির ক্রিয়া দ্বারা পরিদৃশ্যমান জগৎ, নৈহারিকী অবস্থা হইতে অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা যে প্রাণশক্তিরই বিবিধ বিকাশের ফল মাত্র, ইহাতে সন্দেহ নাই। অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় উপস্থিত হইবার সময় আণবিক সন্নিবেশ এবং পূর্ব্বকল্পানুসারে— সৌরজগদন্তর্গত বিবিধ গ্রহনক্ষত্রাদির নিজ নিজ কক্ষ ভ্রমণ বিষয় নির্দ্ধারণ এই স্পন্দনাত্মিকা শক্তিরই স্পন্দন তারতম্যদ্যোতক। এখন দেখা যাউক যে, নৈহারিক বিজ্ঞানের দ্বারা সৃষ্টিবিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞানানুসারে পরিদৃশ্যমান জগতের আদ্যাবস্থায় সূর্য্য অথবা অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রাদি কিছুই ছিল না। সমস্ত জগৎ সমস্তাৎ পরিব্যাপ্ত বাষ্পাকারে বিদ্যমান ছিল। যে element হইতে গ্রহাদির অভিব্যক্তি হইয়াছে, উহা বিশ্বব্যাপী এক অবিশেষ পদার্থের বিকার মাত্র। ঐ অবিশেষ পদার্থই কোন কারণে, কোন অভিজ্ঞাত প্রক্রিয়া নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পুনর্ব্বার বিভক্ত হইয়াছে। ঐ সকল বিচ্ছিন্ন খণ্ড সমূহ হইতে সূর্য্যমণ্ডল এবং সৌরজগতের অভিব্যক্তি হইয়াছে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, পরমাণুর এই দ্বিবিধ শক্তি আছে। আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে পরমাণু সমূহ কেন্দ্রাভিমুখে চালিত এবং বিকর্ষণ শক্তির প্রভাবে পরমাণুসমূহ কেন্দ্র হইতে অপসারিত হয়। পরমাণুর উৎপত্তিবিষয়ে পাশ্চাত্য দর্শনকারগণ এখনও কিছু স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। ঈথারের আবর্ত্ত হইতে পরমাণুর অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, আধুনিক কোন কোন দর্শনকার

এই মতের পক্ষপাতী। জড় বিজ্ঞান গতিকে সরল এবং বক্র এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সরল গতি স্বাভাবিক। বিরুদ্ধ শক্তি দ্বারা বাধিত না হইলে গতির বক্রতা হয় না। গতির যে দিক্ পরিবর্ত্তন হয়, সরল গতি যে বক্র হয়, বিরুদ্ধ শক্তির বাধাই তাহার কারণ। জগতের সৃষ্টির সময় আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে পরমাণু পুঞ্জ যেমনই ক্রমশঃ কেন্দ্রাভিমুখে চালিত হইতে লাগিল, তেমনই বিপ্রকর্ষণ শক্তির প্রভাবে উহারা কেন্দ্র হইতে দূরে নীত হইতে লাগিল। গণিতশাস্ত্রানুসারে এই দুই বিরুদ্ধ গতি পরস্পর নিরন্তর প্রতিহত হইয়া চক্রাবর্ত্তে পরিণত হইয়াছে। ইহা সকলেই জানেন যে প্রায় সমস্ত পদার্থ শীতল হইবার সময় আকুঞ্চিত হয়। যখন কোন আবর্ত্তনশীল বস্তু আকুঞ্চিত হয় তখন তাহার গতিও বর্দ্ধিত হয়। এবং বেগ যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তখন কেন্দ্রাপসারিণী শক্তিও বর্দ্ধিত হয়। তড়িৎ চক্রগতিতে পরিভ্রমণশীল নীহার সংঘাতের বেগ শেষে এত বর্দ্ধিত হইল যে কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি কৈন্দ্রিক আকর্ষণী শক্তিকে অভিভূত করিল। এই অবস্থায় নীহার সংঘাত হইতে অঙ্গুরীয়াকার প্রকাণ্ড এক খণ্ড বিশ্লিষ্ট হইবে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব। আকুঞ্চন ক্রিয়ার বিরাম নাই সুতরাং বেগের বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী। অতএব পুনরপি যে অঙ্গুরীয়াকার আর এক খণ্ড বিচ্ছিন্ন হইবে ইহাও অসম্ভব নয়। এইরূপে বিশ্লিষ্ট অঙ্গুরীয়াকার খণ্ড সমূহ পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারেনা। ইহারা গোলাকার পিণ্ডরূপে পরিণত হইবে। যে নীহার সঙ্ঘাত হইতে এই সকল গোলাকার পিণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহা যে পথে যে গতিতে আবর্ত্তিত হইতেছে, এই সকল বিচ্ছিন্ন পিণ্ডও সেই পথে সেই চক্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আবর্ত্তন করিতে থাকিবে। অর্থাৎ উল্লিখিত নীহার সংঘাত যে অক্ষরেখার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে এই সকল বিচ্ছিন্ন গোলকও উক্ত অক্ষরেখায় সমান্তর রেখায় চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে থাকিবে। বিশ্লিষ্ট গোলাকার খণ্ড সমূহের মধ্যে যে খণ্ডটী বৃহত্তম তাহাই যে কেন্দ্রস্থানীয় হইবে ইহাও সুখবোধ্য। অতএব ইহা সিদ্ধ হইল যে বৃহত্তম অঙ্গুরীয়ক, সৌরজগতের কেন্দ্রস্বরূপ সূর্য্য এবং অন্যান্য খণ্ড সমূহ ভিন্ন ভিন্ন গ্রহোপগ্রহ। নৈহারিক সিদ্ধান্ত অনুসারে বিশ্বজগতের সৃষ্টি এইরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এখন ইহাই বিচার্য্য যে, সৃষ্টি সম্বন্ধীয় বৈদিক দর্শন সিদ্ধান্ত নৈহারিক সিদ্ধান্তের ঠিক অনুকূল না হইলেও অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় প্রকাশিত হওয়া ইত্যাদি সৎকার্য্যবাদ-সিদ্ধান্ত পক্ষে অবশ্যই ইহার একতা আছে। যে স্পন্দনাত্মিকা শক্তির প্রভাবে নৈহারিক-দশাগত অব্যক্ত পদার্থ ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সৌরজগৎ সৃষ্টির উপাদানতা প্রাপ্ত হয় সেই স্পন্দনাত্মিকা শক্তি (energy or force) প্রাণ শক্তিরই সমজাতীয়। বিচার দ্বারা এ সামঞ্জস্য প্রতিপাদিত হইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত Holman এর সিদ্ধান্ত অনুসারে সমষ্টি ও ব্যষ্টি জগতে যত প্রকার কার্য্যকারিণী শক্তি দৃষ্ট হয় তৎসমস্তই

এক মূল শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। উঁহার মতানুসারে ক্রিয়মান প্রবৃত্তিশক্তি, মাধ্যাকর্ষণ প্রবৃত্তিশক্তি, স্থিতিস্থাপকতা প্রবৃত্তিশক্তি, আণবিক আকর্ষণ প্রবৃত্তিশক্তি, রাসায়নিক প্রবৃত্তিশক্তি, তাড়িত প্রবৃত্তিশক্তি, চৌম্বকাকর্ষণ প্রবৃত্তিশক্তি, সমন্তাৎ প্রসারণশীল প্রবৃত্তিশক্তি এই সমস্তই স্পন্দনাত্মিকা শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ-বিশেষ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত Herbert Spencer কার্য্যকারিণী ও সুপ্তা শক্তির ভেদ-বর্ণন-প্রসঙ্গে এই শক্তির অনুভবগম্যত্ব বর্ণন করিয়া, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ইন্দ্রিয়াতীত যে সূক্ষ্মশক্তির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমাদের বৈদিক প্রাণশক্তিরই সমজাতীয়। Professor Berthez ও স্থূল রাসায়নিক এবং শারীরিক (chemical and physical) শক্তি হইতে এই সূক্ষ্মশক্তির ভেদবর্ণন করার সময় H. spencer কর্তৃক আবিষ্কৃত বিজ্ঞানেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন যথা—

H. Spencer says "Nevertheless the forms of our experience oblige us to distinguish between two modes of force—the one not a worker of change and the other a worker of change— actual and potential. But now what is the force of which we predicate existence ? It is not the force we are immediately conscious of in our own masculer efforts. But this does not persist. Hence the force of which we assert persistence is that absolute force of which we are indeginitely conscious as the necessare correlate of the force we know. By the persistence of force we really mean the persistence of some cause which transcends our knowledge and conception. In asserting it we assert an unconditioned reality without beginning or end" পুনঃ—

"Leading biologists also have maintained a duality of matter and life known as vitalism. Berthez termed it the vital principle or vital force to distinguish it from the physical and chemical forces which govern inorganic matter. Bicot lodged it in the animal tissues under the name of the vital properties. Baffor endeavoured to discriminate between organic and inorganic molecules, the former composing dead or lifeless matter and the latter animate or living matter. Lionel Bach still adheres to similer opinions in his speculations upon protoplasm or the matter of life."

এই প্রকারে শক্তির বিবিধ রূপ ও উপযোগিতা বর্ণন করিয়া, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু—পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত শক্তিবিচারকার্য্যে সূক্ষ্মদৃষ্টি দ্বারা গবেষণা

এবং আস্তিকতার উত্তম পরিচয় দিয়াছেন। এই সমস্ত গবেষণাপূর্ণ বিচার নিরীক্ষণ করিলে, নিরপেক্ষ ব্যক্তি, তাঁহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। পুরুষার্থ-শক্তি এবং দ্রব্যশক্তি যেখানে নিয়ত কার্য্য করিতেছে, সেখানে ভগবানের কৃপা হইবে এবং জ্ঞানশক্তিরও স্বাধিকারানুসার বিকাশ হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি আছে? করুণাময় ভগবানের অপার করুণা লঘু-গুরু নির্ব্বিশেষে সূর্য্যকিরণের মত সকল স্থানেই পরিব্যাপ্ত আছে। যে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির অন্তঃকরণ অন্তর্মুখীন হয়, তিনিই সেই অনন্ত কৃপা-সিন্ধুর সুশীতল ধারা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হন। পরম আস্তিক পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত Wallace জগদ্ধারিণী নিখিল শক্তির কারণানুসন্ধান করিতে করিতে বিশ্বজগতের মূলে যে ভগবানের ইচ্ছাশক্তিই কার্য্যকারিণী, এই সিদ্ধান্তের নিরূপণ করিয়াছেন। পণ্ডিত Wallace বলেন—It we are satisfied that force and forces are all that exist in a material universe. We are next led to enquire what is force. We are acquainted with two radically distinct and apparently distinct kinds of force—the first consists of the primary forces of nature such as gravitation, electricity &c ; the second is of our own will-force. Many persons will at once deny that the latter exists. If therefore we have traced one force however minute to an origin in our own will where we have no knowledge of any other primary cause of force. It does not seem an improbable conclusion that all force may be will force and thus that the whole universe is not depended on but actually is the Will of higher Intelligences or of Supreme Intelligence."

স্থূল ব্যষ্টিজগতে প্রকাশমান সামান্য শক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া, জীবনীশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদি রূপে শক্তির বিষয় পাশ্চাত্যদর্শনে যাহা কিছু বর্ণিত হইয়াছে তাহা দেখান হইল। এখন এই প্রাণশক্তি-বিষয়ে আর্য্য-শাস্ত্র সমূহের সিদ্ধান্ত কি, তাহা দেখান যাউক। শ্রুতি বলেন—তানি হ বৈতানি সঙ্কল্পৈকায়নানি সঙ্কল্পাত্মকানি সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি সমকৢপতাং দ্যাবাপৃথিবী সমকল্পেতাং বায়ুশ্চাকাশশ্চ সমকল্পন্তাপশ্চ তেজশ্চ তেষাং সংকৢপ্ত্যৈ বর্ষং সঙ্কল্পতে বর্ষস্য সংকৢপ্ত্যা অন্নং সঙ্কল্পতেঽন্নস্য সংকৢপ্ত্যৈ প্রাণাঃ সঙ্কল্পন্তে প্রাণানাং সংকৢপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ সঙ্কল্পন্তে মন্ত্রাণাং সংকৢপ্ত্যৈ কর্ম্মাণি সঙ্কল্পন্তে কর্ম্মণাং সংকৢপ্ত্যৈ লোকঃ সঙ্কল্পতে লোকস্য সংকৢপ্ত্যৈ সর্ব্বং সঙ্কল্পতে স এষ সংকল্পঃ সংকল্পমুপাস্স্বেতি। (ছান্দোগ্যোপনিষৎ) এই সকল বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বরকে আশ্রয় করে। এই ইচ্ছা বিশ্ববীজ অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বে, সমভাবাপন্ন শান্তভাবাপন্ন প্রকৃতি-মহাসমুদ্রে সৃষ্টিবীচিমালা-বিস্তারের পূর্ব্বে, ইন্দ্রিয়াতীত ইন্দ্রিয়বিহীন তথাপি ঈক্ষণশীল,

আপ্তকাম তথাপি সঙ্কল্পপরায়ণ, মনোধর্ম্ম-বিহীন তথাপি ইচ্ছাপরায়ণ, জ্ঞানস্বরূপ তথাপি প্রকৃতি-বিলাসপরায়ণ ঈশ্বরের মধ্যে আবির্ভূত হয়। এ সঙ্কল্প সামান্য সঙ্কল্প নয়, এ ইচ্ছা মনুষ্য-সাধারণ ইচ্ছা নয়, এ ঈক্ষণ স্থূল ইন্দ্রিয়-বিজৃম্ভণ নয়। আপ্তকাম ভগবানে এরূপ হওয়া সম্ভব নহে। নতুবা জীবত্বাপত্তি হইবে। পরন্তু এ ইচ্ছা, ইচ্ছানিচ্ছারূপ ইচ্ছা। এ Will force ; এ সঙ্কল্প প্রকৃতি-গর্ভে লীন জীব-সমূহের সমষ্টি-প্রারব্ধানুসার স্বতঃসঙ্কল্প। ব্রহ্মার আয়ুর অবসানে যে ব্রহ্মাণ্ড-প্রকৃতি স্বগর্ভনিবাসশীল জীবকুলের সঙ্গে মহাপ্রকৃতিতে লীন হইয়াছিল, সেই ব্রহ্মাণ্ডপ্রকৃতির পুনর্বিকাশ-কালে জড়-প্রকৃতির মধ্যে স্বতঃকার্য্যকারিণী শক্তি না থাকায়, তজ্জন্য ঈশ্বরের ঈক্ষণের আবশ্যকতা হয়। সুতরাং যে সঙ্কল্পের স্বতঃপ্রেরণা হইতে সিসৃক্ষা উৎপন্ন হওয়ায় ঈশ্বর প্রকৃতির উপর ঈক্ষণ করেন, ঐ ঈক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইলেই পতিপরায়ণা স্ত্রীর ন্যায় গুণময়ী প্রকৃতিমাতা আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন এবং পতির ভোগের নিমিত্ত সৃষ্টিবৈভব বিস্তার করিতে থাকেন। এই সঙ্কল্পই সৃষ্টিনিদানভূত সঙ্কল্পরূপে শ্রুতি-শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এখন এই সঙ্কল্প—যাহাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বুঝিতে না পারিয়া Will force বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, ঐ সঙ্কল্প হইতে কি হইয়া থাকে তাহাই বর্ণন করা হইবে। শ্রুতি বলেন—"সোঽকাময়ত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়েতি" "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধিমনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ" "আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়" এই সকল শ্রুতিতে ভগবানের সিসৃক্ষার বর্ণন করা হইয়াছে। ভগবান্ এক হইতে বহু হইতে চান, ভগবান্ প্রজোৎপত্তি করিতে চান,—এ সকল প্রলয়বিলীন সমষ্টি-জীবের প্রারব্ধানুসারে ভগবানের মধ্যে বিকশিত স্বতঃসঙ্কল্প। এখন যখন সঙ্কল্প হইল, তখন কার্য্য হওয়া আবশ্যক। কি কার্য্য হইবে? তাহাও শ্রুতিতে বর্ণিত আছে "স ঈক্ষাঞ্চক্রে কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামি ইতি স প্রাণমসৃজৎ" এই ভাব শ্রুতিতে পুনরপি বর্ণিত হইয়াছে যথা—"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্॥" ব্রহ্মের এই তপ কি? ইহা দ্বারা যে প্রাণ উৎপন্ন হয় তাহাই বা কি? এই সকল বিস্তৃত রূপে মুণ্ডক উপনিষৎ ও তদীয় শাঙ্করভাষ্যে বর্ণিত হইয়াছে যথা—"স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইহার ভাষ্য—তপসা জ্ঞানেনোৎপত্তিবিধিজ্ঞতয়া ভূতযোন্যক্ষরং ব্রহ্ম চীয়তে উপচীয়তে উৎপিপাদয়িষদেদং জগদঙ্কুরমিব বীজমুচ্ছূনতাং গচ্ছতি পুত্রমিব পিতা হর্ষেণ। এবং সর্ব্বজ্ঞতয়া সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারশক্তিবিজ্ঞানবত্তয়োপচিতাত্ততো ব্রহ্মণোঽন্নমব্যাকৃতং সাধারণসংসারিণাং ব্যাচিকীর্ষিতাবস্থারূপেণাভিজায়তে উৎপদ্যতে। ততশ্চাব্যাকৃতাদ্ব্যাচিকীর্ষিতাবস্থাতোঽন্নাৎ প্রাণো হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মণো জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যধিষ্ঠিতজগৎসাধারণোঽবিদ্যাকামকর্ম্মভূতসমুদায়বীজাঙ্কুরো জগদাত্মা-

ভিজায়তে ইত্যনুষঙ্গঃ। তস্মাচ্চ প্রাণাৎ মনআখ্যং সঙ্কল্প-বিকল্প-সংশয়-নির্ণয়াত্মা-ত্মকমভিজায়তে। ততোঽপি সঙ্কল্পাত্ম-কান্মনসঃ সত্যং সত্যাখ্যমাকাশাদিভূতপঞ্চ-কমভিজায়তে। তস্মাৎ সত্যাখ্যাদ্ভূতপঞ্চকাৎ ক্রমেণ সপ্ত লোকা ভূরাদয়স্তেষু মনুষ্যাদি-প্রাণী বর্ণাশ্রমক্রমেণ কর্ম্মাণি কর্ম্মসু চ নিমিত্তভূতেষমৃতং কর্ম্মজং ফলম্।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীদয়ানন্দ স্বামী।

ভারতে ভারতেশ্বর।

[প্রজাধন্যাঃ কৃতার্থাশ্চ সফলং রাজসেবনম্।
আগতোঽসি যতো রাজন্ ভারতে ভারতেশ্বর॥]

ভগবান্ কৃপাবান্ ভারতের ভাগ্যে আ'জ,
ঘটনা অভূতপূর্ব্ব ভারতে ভারতরাজ!
যে হ'তে ইংরাজরাজ ভারত-রাজাধিরাজ,
সে হ'তে অভূতপূর্ব্ব ভারতে ভারতরাজ।
কখনো ভাবিনি যাহা,
আশায় আসেনি আহা!
স্বপনে নহে দৃষ্ট,
নহে কল্পনায় সৃষ্ট,
কখনো হয়নি যাহা,
ঈশেচ্ছায় আজি তাহা,
অদৃষ্ট—অদৃষ্টচর—
ভারতে ভারতেশ্বর!
দুরাশায় দুরারাধ্য অসাধ্য-সাধন প্রায়
সুসিদ্ধ ভারতে অদ্য হেরি শ্রীহরি-কৃপায়।
তাই প্রজা-প্রীতি-লক্ষ্যে,
অভিষেক—উপলক্ষ্যে
প্রত্যক্ষ ভারত-বক্ষে আজি শ্রীভারতরায়!
সাত সিন্ধু তের নদী,
দুস্তর দুস্তর অতি,
তবু সে কৃপা-কুতূহলে,
মঙ্গল-মিলন রঙ্গে,
আলিঙ্গন অঙ্গে অঙ্গে ইণ্ডিয়া ইংলণ্ডে আ'জ!
(তাই —
আগত স্বগণ-সঙ্গে ভারতে ভারতরাজ!
ত্যজ্য করি হীর রাজ্য,
অন্তে নাহি যান সূর্য্য
(সেই)—
বিংশ শতাব্দীর জ্যোতি,
বৃটিশ-গৌরব-গতি,
আসমুদ্রপৃথিবীপতি শুভ বিরাজিত আ'জ,
রাজভক্তি-সিংহাসনে ভারত-হৃদয় মাঝ।
ভারতাশ্রু মুছাইতে,
ভারতার্ত্তি ঘুচাইতে,
শ্বেত-কৃষ্ণে মিলাইতে,
ভ্রাতৃ-প্রেম বিলাইতে।
পূরব-পশ্চিমে মিলিত—পশ্চিম-পূরব-পর
ভ্রান্তি ভাঙ্গি ...কুদিতে ভারতে ভারতেশ্বর!
নরাণাঞ্চ নরাধিপং
ইতিশ্রীগীতি-গীতা,
রাজবংশ অবতংস ঈশ্বরাংশ তাই হেতা।
রাজদণ্ড সুপ্রচণ্ড সর্ব্বদেব-শস্ত্র-সারে,
রাজশক্তি রূপে তাই দেবশক্তি নরাকারে।
তাই রাজসমাগম আ'জ এই হিন্দুস্থানে—
দেবসমাগম সম সমাদৃত বহুমানে।
ইহা ভিন্ন অন্য বিচারণে,
রাজনীতি সূক্ষ্ম-নিরীক্ষণে,
হেন রাজা-প্রজা-সম্মিলন—
নিদ্রিত ভারত সুস্বপন,
সার্দ্ধ শতবর্ষ পরে,
হেরি আজি হর্ষভরে,

বিধাতার কৃপা বরে,
ভারতের ঘরে ঘরে,
নিদ্রাভঙ্গে অতৃপ্তের নব জাগরণ
সত্যে পরিণত সেই স্বপন মোহন!
এই রাজসূয়যজ্ঞে
সেই ভারতের ভাগ্যে,
দিতে মনমত বর,
স্বয়ম্ শ্রীরাজেশ্বর,
সশরীরে অবতীর্ণ পূর্ণআকৃতিতে আ'জ
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে রঙ্গে ভারতে ভারতরাজ!
ভারতের অভিনব ইতিহাস-অলঙ্কার—
এ নব ভারত-পর্ব্ব অপূর্ব্ব সুসমাচার!"
(তবে)—
বাজাও বিজয়-ঢক্কা উঠাও জয়নিশান,
শত বজ্র-গর্জ্জনে ছুটাও কোটীকামান!
বাজুক আতসবাজি,
ভাসুক আলোকরাজি,
পুলক-ঝলকে এই ভারতভূলোক-মাঝ—
ভাসুক আনন্দে লোক লোকপালে পেয়ে আ'জ!
(তাই)—
ঘুরিতে উৎসব-রঙ্গ বাজুক বিগল্ ড্রাম,
ভূষিতে ভারত-অঙ্গ সাজুক নগর গ্রাম
রাজেন্দ্র উৎসবে দিল্লী নব ইন্দ্রপ্রস্থ আ'জ,
ধরুক পুরেন্দ্র-শোভা ইন্দ্রপুরে দিয়ে লাজ!
(তবে)—
পরুক প্রমোদে দেশ,
পরুক সবে সুবেশ,
করুক এ শুভযাত্রা রাজ-দরশনে আ'জ
হেরুক নয়ন ভরি ভারতে ভারতরাজ!
(সবে)—
হাস-খেল-নাচ-গাও মাত' মহোৎসবে
ভারতের ভূপেন্দ্রের রাজশ্রী-গৌরবে

(তথা)—
প্রজা-প্রীতি-পরিমল—
পূর্ণ হৃদি-শতদল—
সমুত্থিত সুবিমল সুযশঃসৌরভে।
(আহা)—
প্রজার্থ এ রাজস্বার্থে কৃতার্থ ভারত আ'জ,
চাক্ষু হেরে-বক্ষে ধরে আদরে ভারতরাজ।
(তবে)—
কর শুভ শঙ্খরব
ঘোষি মহামহোৎসব
দেও শুভ উলুধ্বনি
ভারত-পুররমণী!
পরাও কুসুমমালা
ঘুরাও বরণডালা
বরেন্দ্র নরেন্দ্রে বরি বসাও স্বগণ-সনে—
প্রজা-হৃদি-রাজপুরে রাজপ্রীতি-রত্নাসনে।
(তবে)—
আর্য্য-দ্বিজরাজগণ!
করি বেদ উচ্চারণ,
করি শুভ দূর্ব্বাধান,
শুভাশীষ কর দান,—
হউন সুদীর্ঘজীবী নতুন ভারতরাজ
পিতামহী পিতার প্রসাদী রাজাসনে আ'জ।
পিতামহী-সম দয়াবান,
পিতাসম ন্যায়ের নিধান,
পিতামহ জিনি কান্তি অগ্রজ-অধিক
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাধার উদারনৈতিক
ভারত-সৌভাগ্য-ভোগ্য যুক্ত যোগ্যগুণগণে
আলোকরি ভারত বসুন রাজসিংহাসনে।
বামে রাজরাজেন্দ্রাণী মেরী রূপবতী সতী,
নব বৃটিশের যেন রাজলক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী!
(কিবা)—
প্রতীচ্য-গৌরব-রবি প্রভাবে প্রতাপে আ'জ—
উচ্চ প্রাচ্য-ভাগ্যাকাশে বিভাসে ভায়ে বিরাজ।

(কিম্বা)—
খগণ-তারক-মাঝ রাজরূপী দ্বিজরাজ
বিরাজে ভারত-ভাগ্য-অম্বর-গগনে আ'জ !
চিররাজধানী-নব পুর রাজেন্দ্রাণী আ'জ
দিল্লী উল্লাসিতা রঙ্গে পরি অঙ্গে পরীসাজ !
(তাহে)—
ক্রমাগত ট্রেণ কত
উগারিছে অবিরত
লোক শত-সহস্রতঃ—লক্ষাতীত অগণিত ;
নরঝিল্লী-রবে দিল্লী দিবারাত্র মুখরিত !
(আহা)—
এবার দরবার অপূর্ব্ব ব্যাপার,
বর্ণনে তাহার হারে বর্ণহার !
যে ক'রেছে প্রত্যক্ষ স্বচক্ষে,
বুঝাইতে না পারুক
বুঝেছে নিজে যা'টুক্,
অবাক্ বর্ণনা তারি সাজে তারি পক্ষে,
চক্ষু অগ্রে শ্রবণের বিষয় অর্জ্জন,
অই শোন ঘন ঘন তোপের গর্জ্জন ;
কামান বন্দুকে বিমান কম্পিত
তৎসমে বোমে ব্যোম বিদারিত ;
অশ্ব-পদশব্দ—হস্তির বৃংহিত,
রথের ঘর্ঘর ঘোর নিনাদিত,
অগণ্য মানব-অরণ্য-উত্থিত,
মহা কোলাহলে মহা মুখরিত ;
সৈন্যকলরব—অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা,
হ্রেষা-হোররাব—বিবিধ বাজনা ;
বিশাল বিমিশ্র শব্দসমুদ্র-গর্জ্জনে
দূর-দিল্লী-দিগঙ্গনা শিহরে সঘনে !
নাদ-ধ্বনি-রব-রবি-শব্দ-সুর-স্বরে,
দিল্লী-ব্যোম-বায়ুস্তর কম্পে থরথরে !
পরে নয়নের পালা সে যে কি অদ্ভুত,
তার তুল্য সেই যেন ন ভবিষ্য-ভূত !

(কিবা)—
ময়দানে মহাদৃশ্য সাদৃশ্য অদৃশ্য যার
বুঝি ময়দানবের
জিনি সেই দ্বাপরের
চমৎকার শিল্পসার রাজসূয়-সভাগার !
(কিবা)—
বিচিত্র বিস্তৃত সেই বস্ত্রমহাপুরী !
লজ্জা পায় সুরপুর-সজ্জার মাধুরী।
(কিবা)—
বসি হারি সারি সারি
নানাদ্বারী নানাকারী
চিত্তহারি চমৎকারী নানা নিকেতন,
মণ্ডপ-তোরণ-তাম্বু-গম্বুজ-কেতন !
তাহে দরবার-গৃহ কি দিব উপমা !
নর ছার, শোভা তার সুর-মনোরমা !
তাহে দরবার-সভা কি প্রভা ! কি শোভা !
দর্শক অচল ছবি,
বর্ণিতে বিহ্বল কবি,
লেখক বিকল-হস্ত, বক্তা তার বোবা ;
তাহে সভাসদ সবে
মহামহীয়ান্ ভবে—
নর শিরোমণির মণ্ডল ;
মাঝে সিংহাসনোপর
রাজে রাজরাজেশ্বর !
দেবের মণ্ডলে যথা শোভে আখণ্ডল !
বিরাজ করুন রাজেন্দ্রাণী বামে,
শচী-ইন্দ্র যেন সে সুরেন্দ্রধামে।
(তবে)—
এস সবে রাজদর্শনের তরে
সমগ্র ভারতবর্ষ হর্ষভরে
স্বদেশী বিদেশী এস সর্ব্বদেশী !
হের নবপর্ব্ব ভারতে প্রবেশি ;

মজুর-মজুর-নবীন প্রবীণ,
কোটীশ্বর হ'তে কপর্দ্দকহীন,
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ সর্ব্বভেদ নির্ব্বিশেষে
এস সবে এ উৎসবে রাজভক্তি-রসে ভেসে।
এস রাজকর্ম্মচারী
উচ্চানুচ্চাপদধারী
লাট জঙ্গীলাট—
সঙ্গী সৈন্য ঠাট,
জাঁকাও জনতা বিশাল বিরাট!
দরবার-মহাযজ্ঞ যথাযোগ্য সুবিধানে
এস তূর্ণ কর পূর্ণ সবে পূর্ণাহুতি-দানে।
(তবে)—
রাজা-মহারাজা নবাব-আমীর,
সামন্ত-সর্দ্দার-মিত্র-ক্ষত্রবীর,
সহ সহচর ওমরা-উজীর
দরবারে দ্রুত হও হে হাজির।
চন্দ্র-সূর্য্য-বংশ-মোগল-পাঠান,
হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-মোসলেম্-খৃষ্টান,
ইহুদি-ইরাণী-শিখ-পারসিক,
সর্ব্বজাতি সর্ব্বধর্ম্মী সর্ব্বদিক্
ভরিয়া উচ্ছ্বাসে, ভারত মাতাও
ভারতেশ্বরের জয়গীতি গাও
গাও সবে উচ্চরবে ভারতভুবনময়—
জয় শ্রীভারতরাজ পঞ্চম জর্জ্জের জয়!
হিমগিরি-মরুপরি সঞ্চারি ভারতময়—
গাওরে পঞ্চমরে পঞ্চম জর্জ্জের জয়!
অবশেষে প্রেমাবেশে প্রণামি পরমেশ্বর,
হেরি যাঁর সুপ্রসাদে,
অবাধে মনের সাধে—
ভারতেশ্বরীর সাথে
ভারতে ভারতেশ্বর॥

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

ন্যায়দর্শন।

২। সূত্র। "দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।"

ব্যাখ্যা। দুঃখং (প্রতিকূলবেদনীয়ং বাধা, পীড়া তাপ ইত্যনেকবিধং) জন্ম (বিশিষ্টশরীরসম্বন্ধঃ) প্রবৃত্তিঃ (প্রবর্ত্ততে অনয়া ইতি ব্যুৎপত্ত্যা প্রবৃত্তিসাধনধর্ম্মাধর্ম্মৌ) দোষঃ (বক্ষ্যমাণলক্ষণা রাগ-দ্বেষাদয়ঃ) মিথ্যাজ্ঞানং (অনাত্মন্যাত্মবুদ্ধ্যাদিরূপা অবিদ্যা) তেষাং মধ্যে যৎ "উত্তরোত্তরং" (পাঠক্রমাৎ পরপরবর্ত্তি) তস্য "অপায়ে" (অত্যন্তবিনাশে সতি) "তদনন্তরস্য" (তৎকারণস্য তৎপূর্ব্বপূর্ব্বস্য ইতি যাবৎ) "অপায়াৎ" (অত্যন্তবিনাশাৎ) "অপবর্গঃ" (নির্ব্বাণং) ভবতীতিশেষঃ।

তাৎপর্য্যানুবাদ।

দুঃখ, জন্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম, রাগ দ্বেষ মোহ, দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি প্রভৃতি অবিদ্যা, এই কয়েকটী পদার্থের শেষটী হইতে ক্রমশঃ বিনাশ হইয়া যখন দুঃখের অত্যন্ত বিনাশ হইবে, তখন ঐ দুঃখের অত্যন্ত নাশই মুক্তি—অথবা ঐ ভাবে দুঃখ নাশ হইলেই মুক্ত বলা যায়।

মন্তব্য। প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান শ্রুতিসিদ্ধ আত্মমননের উপায়, এবং শ্রুতিযুক্তিসিদ্ধ আত্মতত্ত্ব-বিশ্বাসের সংরক্ষক, তাই পূর্ব্বসূত্রে মহর্ষি উহাকে মুক্তিলাভের প্রয়োজক বলিয়াছেন। পূর্ব্বসূত্রে "তত্ত্বজ্ঞানাৎ" এইস্থলে পঞ্চমী বিভক্তির

অর্থ—প্রয়োজকত্ব। যেমন "কাশী-মরণান্মুক্তিঃ।" কাশীমরণ, মুক্তিলাভের সাক্ষাৎ কারণ নহে," প্রয়োজক। "কাশীমরণাৎ" এইস্থলের পঞ্চমী বিভক্তি দেখিয়া উহাকে মুক্তিলাভের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে না। শাস্ত্রোক্ত কত কত কার্য্য কেহ চিত্তশুদ্ধির দ্বারা সাক্ষাৎ, কেহবা পরম্পরায়, কেহবা অতিপরম্পরায় মুক্তিলাভের সহায়তা করে বলিয়া, 'অমুক কার্য্য করিলে আর জন-নীজঠরে আসিতে হয়না," 'অমুক কার্য্য করিলে আর ভবদর্শন হয় না' এইরূপ কথা লিখিতে ব্রহ্মবাদী মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নও বিরত হন নাই। অনেক স্থানে পঞ্চমী বিভক্তি ও অসংকোচে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ সমস্ত কার্য্য মুক্তিলাভের চরম কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবেনা। আত্মসাক্ষাৎকারই— মুক্তিলাভের চরম কারণ, তাহার উপায়গুলি মুক্তিলাভের প্রয়োজক। এ সকল কথার খবর না রাখিয়া কেহ ষোড়শ-পদার্থ-তত্ত্বজ্ঞানকেই মুক্তিলাভের চরম কারণ বলিয়া বুঝিতে পারেন। কেহ ষোড়শপদার্থ-তত্ত্বজ্ঞ নৈয়ায়িক হইয়া নিজেকে কৃতকৃত্য, জীবন্মুক্ত ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মনে করিতে পারেন, কারণ ষোড়শ পদার্থের পরোক্ষজ্ঞান তাঁহারও হইয়াছে। ষোড়শ-পদার্থ-সাক্ষাৎকারের কোন প্রয়োজন নাই। কারণ মহর্ষি গোতম তাহা বলেন নাই। তাহাই বক্তব্য হইলে, এক আত্মসাক্ষাৎকারের কথাই বলিতেন। ষোড়শ-পদার্থ-সাক্ষাৎকার তাঁহার স্থায়দর্শনের সাধ্যও নহে। উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা ষোড়শপদার্থের পরোক্ষজ্ঞানই তাঁহার স্থায়দর্শনের সাধ্য। তাহাই মুক্তিলাভের চরম কারণ হইলে নৈয়ায়িকগণ কৃতকৃত্যতা ও সর্ব্বজ্ঞতার অভিমান কেন করিবেন না? আবার বেদবিৎ সাধক মহর্ষি গোতমের প্রথম সূত্র পড়িয়া উহা বেদ-বিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য করিবেন। তাই মহর্ষির দ্বিতীয়-সূত্রারম্ভ।

মহর্ষি বলিবেন, আমি ষোড়শ-পদার্থ-তত্ত্বজ্ঞানকে মুক্তিলাভের চরম কারণ বলিনাই। উহা মুক্তিলাভের প্রয়োজক মাত্র। আত্মসাক্ষাৎকারই মুক্তিলাভের শ্রুতিযুক্তি-সিদ্ধ চরম কারণ। পরন্তু মুক্তি দ্বিবিধ। পরা ও অপরা। জীবন্মুক্তি—অপরামুক্তি। আত্মদর্শী হইয়াও জীবন্মুক্ত প্রারব্ধ কর্ম্মভোগের জন্য সশরীরে ইহলোক বিদ্যমান্ থাকেন। ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় নাই। অনাসক্ত হইলেও রাগ, দ্বেষ তাঁহাকে একেবারে ছাড়িয়া যায় নাই। লোকশিক্ষার জন্য তাঁহার ইহলোকে অবস্থান ভগবানের অভিপ্রেত। এই জীবন্মুক্তই প্রকৃত তত্ত্বের উপদেশক। যথাস্থানে জীবন্মুক্ত-কথা বিবৃত হইবে। পরামুক্তি নির্ব্বাণ, উহাই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি। উহারই নাম কৈবল্য উহা ক্রমে হয়। ঐ পরামুক্তির ক্রম প্রদর্শনের জন্যও মহর্ষির দ্বিতীয়সূত্রারম্ভ। নচেৎ "আত্মসাক্ষাৎকারাদপবর্গঃ" এইরূপ সূত্র করিলেও তাহার প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। মহর্ষির হৃদয়-নিহিত এই উভয় উদ্দেশ্যই তাঁহার সূত্রে ব্যক্ত।

এই সূত্রোক্ত দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ,

মিথ্যাজ্ঞান, এই কয়েকটী পদার্থের অবিচ্ছিন্ন-প্রবাহই সংসার। ঐ প্রবাহ অনাদি। মুক্তিলাভ না হইলে আর উহার নাশ নাই। মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা থাকিলেই দোষ (রাগদ্বেষাদি) জন্মে। রাগদ্বেষ থাকিলেই কর্ম্মদ্বারা প্রবৃত্তি (ধর্ম্মাধর্ম্ম) উৎপন্ন হয়। ধর্ম্মাধর্ম্মবশতঃই জন্মলাভ হয়। জন্ম হইলেই দুঃখ অনিবার্য্য। এইরূপে দুঃখের কারণ জন্ম, জন্মের কারণ প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির কারণ দোষ, দোষের কারণ মিথ্যাজ্ঞান। এই কার্য্য-কারণভাবও অনাদি। কারণের অত্যন্ত বিনাশ হইলে কার্য্য আর কখনই হইতে পারে না। ব্যাধির নিদান চিরকালের জন্য উচ্ছিন্ন হইলে আর সে ব্যাধি কখনও হয় না। আত্মসাক্ষাৎকার হইলে মিথ্যাজ্ঞান একেবারে বিনষ্ট হইল। যখন মিথ্যাজ্ঞান-জন্য কুসংস্কারের লেশ মাত্রও থাকিল না—তখন তাঁহার কার্য্য রাগ ও দ্বেষ আর কখনও হইতে পারিল না। আত্মসাক্ষাৎকারের মহিমায় পূর্ব্বতন ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্তই বিলুপ্ত হইল। "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে"। রাগদ্বেষ না থাকায় আর কখনও ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতেও পারিল না। যিনি মিথ্যাজ্ঞানী—সুতরাং যাঁহার রাগদ্বেষ আছে, কর্ম্ম করিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম তাঁহারই হইয়া থাকে। তাঁহারই জন্য শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ। চিত্তশুদ্ধির জন্য বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও নিষিদ্ধ-কর্ম্মবর্জ্জন তাঁহারই প্রয়োজন। যিনি কৃতকৃত্য, তাঁহার আর প্রয়োজন কি? তিনি কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মে তাঁহার আসক্তি নাই। শাস্ত্র তাঁহাকে বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে বলেন নাই। বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম মিথ্যাজ্ঞানীর ন্যায় তাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারে না। সুতরাং রাগদ্বেষ না থাকায় ধর্ম্মাধর্ম্মও আর তাঁহার হইতে পারিল না। ধর্ম্মাধর্ম্মের একান্ত অভাবে তাঁহার আর জন্মও হইতে পারিল না। ধর্ম্মাধর্ম্ম-বশতঃই জীব জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; ধর্ম্মাধর্ম্ম না থাকিলে কিসের ফলভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করিবে? কর্ম্মফলভোগের জন্যই বাধ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। জন্ম না হইলে আর দুঃখ কখনই হইতে পারিল না, তখন দুঃখ চিরকালের জন্য তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। দেহই দুঃখভোগের আশ্রয়। যাঁহার দেহ নাই এবং আর কখনও তাহা হইবে না, তাঁহার দুঃখের সম্ভাবনাই নাই। ইহারই নাম আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি। সাময়িক দুঃখনিবৃত্তি অনেক কারণেই হইতে পারে, কিন্তু আত্মসাক্ষাৎকার ব্যতীত ইহা আর কোন কারণেই হইতে পারে না। ইহারই নাম পরামুক্তি বা নির্ব্বাণ; ইহারই নাম কৈবল্য।

মিথ্যাজ্ঞান সংসারের নিদান। জীবাত্মা যতদিন তাঁহার স্বরূপ-বিষয়ে মূঢ় থাকিবেন, ততদিন তাঁহার রাগদ্বেষ, এবং অন্যান্য বহুবিধ মোহ হইবেই; ততদিন তিনি বিধি-নিষেধের অধীন। পূর্ব্বতন ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভোগের সহিত বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানে ধর্ম্মাধর্ম্ম তাঁহার জন্মিবেই। ধর্ম্মাধর্ম্ম-বশতঃ জন্মপ্রবাহ ও দুঃখপ্রবাহ তাঁহার চলিতেই থাকিবে। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞানই সংসারের নিদান। এই মিথ্যাজ্ঞানের

একেবারে উচ্ছেদ হইলেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুঃখের একেবারে উচ্ছেদ হইতে পারে। জীবাত্ম-বিষয়ে এই মিথ্যাজ্ঞান বহুবিধ। প্রথমতঃ আত্মা নাই, থাকিলেও তাহা দেহ বই আর কিছুই নহে, আত্মা অনিত্য, আত্মা পরিবর্ত্তনশীল, আত্মা ক্ষণিক, আত্মা ইন্দ্রিয়, আত্মা মনঃ; আমি স্থূল, আমি গৌর, ইত্যাদি বহুবিধ ভ্রম জ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞান। আত্মার শ্রুতিযুক্তিসিদ্ধ স্বরূপের বিপরীতভাবে যত কিছু জ্ঞান হইতে পারে, সবই আত্মবিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান। অবশ্য আমার আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানবশতঃই আমি সংসারী। আমার আত্মসাক্ষাৎকারেই উহার নিবৃত্তি হইবে। অন্যের আত্মসাক্ষাৎকারে আমার মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইতে পারে না।

আমি আমার প্রকৃত স্বরূপটী যখন প্রত্যক্ষ করিব, তখন আমার আত্মবিষয়ে কোন ভ্রমই থাকিতে পারেনা। আলোক আসিলে অন্ধকার কেমন করিয়া থাকিবে? তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের চিরবিরোধী। মহর্ষি যখন এই আত্মবিষয়ক বিপরীত-জ্ঞানের একেবারে উচ্ছেদ হইলেই ক্রমে পরামুক্তি লাভ হয় বলিয়াছেন, তখন আত্মসাক্ষাৎকারই মুক্তিলাভের চরম কারণ, ইহা তাঁহার দ্বিতীয় সূত্রে সুব্যক্ত হইয়াছে।

আত্মন্ শব্দ জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পরমাত্মাও আত্মা। উপনিষদেও ঐ দুই অর্থে আত্মন্ শব্দের প্রয়োগ প্রচুর। আত্মসাক্ষাৎকার বলিলে জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়ের অথবা যে কোন একটীর সাক্ষাৎকার বুঝিতে পারা যায়। শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঔপাধিক ভেদ থাকিলেও বাস্তব ভেদ নাই, কিন্তু দ্বৈতবাদী গোতমের মতে জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা বস্তুতঃই ভিন্ন। সূক্ষ্মদর্শী জিজ্ঞাসা করিবেন, কোন্ আত্মসাক্ষাৎকার মুক্তিলাভের কারণ? এ কথার বক্তব্য এই যে, শ্রুতি, পরমাত্মসাক্ষাৎকারও মুক্তিলাভের কারণ বলিয়াছেন। যথা "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" "ব্রহ্মবিদাপ্নোতিপরং।" আবার জীবাত্মসাক্ষাৎকারও মুক্তিলাভের কারণ বলিয়াছেন যথা—"যদাত্মানং বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ" ইত্যাদি।

(বৃহদারণ্যক)

"দ্বেব্রহ্মণী বেদিতব্যে পরঞ্চাপরমেবচ" এইশ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়ের সাক্ষাৎকারই মুক্তিলাভের কারণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। জীবাত্মা পরমাত্মার ন্যায় বৃহৎ (বিভু বিশ্বব্যাপী) তাই তিনিও ঐ শ্রুতিতে ব্রহ্মশব্দে অভিহিত। পরব্রহ্ম দুইটী নাই।

"আত্মাবাঽরে দ্রষ্টব্যঃ" এই শ্রুতির প্রথমে জীবাত্মারই প্রসঙ্গ—আবার শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ পুনঃ পুনঃ পরমাত্মসাক্ষাৎকারই মোক্ষলাভের কারণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বলিতে বলিতে সর্ব্বশেষে উপসংহার করিয়াছেন—

"যদাচর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তিমানবাঃ।
তদাদেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি"

শ্রুতির সবদিক্ দেখিলে বুঝা যায়, জীবাত্মা পরমাত্মা—উভয়ের সাক্ষাৎকারই মোক্ষলাভের কারণ এবং জীবাত্মসাক্ষাৎ

হইলেও "আত্মাবাহরে দ্রষ্টব্যঃ" এই স্থলের আত্মন্ শব্দটী আত্মস্বরূপে জীবাত্মা পরমাত্মা উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। তবে জীবাত্মবিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানই সংসারের নিদান। জীবাত্মসাক্ষাৎকারই তাহার উচ্ছেদে সমর্থ। এক বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান, অন্য বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট করিতে পারেনা, পারিলেও সেই মিথ্যা জ্ঞাত বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়াই পারে। সুতরাং পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার জীবাত্মসাক্ষাৎকার জন্মাইয়াই তদ্গত মিথ্যাজ্ঞানের নাশক হয়, তাই—তাহা মুক্তিলাভের করণ কারণ। জীবাত্মসাক্ষাৎকারই মুক্তিলাভের চরম কারণ। এইরূপ পরমাত্মার শ্রবণ-মননাদিও জীবাত্মসাক্ষাৎকারের কারণ বলিয়া মুক্তিলাভের কারণ। তাই ন্যায়শাস্ত্রে ঈশ্বরানুমানের ব্যাপার। ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারের মুক্তিলাভে আবশ্যকতা থাকিলে, তাহার শ্রবণ-মননাদিরও আবশ্যকতা আছে। তাই শ্রুতিসিদ্ধ ঈশ্বর-মনন মুমুক্ষুর উপাসনা। পরে এসব কথা আরও পরিস্ফুট হইবে। সূত্রস্থ "দোষ" শব্দের ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার বলেন—

"নিবৃত্তে রাগ-দ্বেষাত্মকে দোষে"

মনের ভাব,—গোতমের মতে রাগ, দ্বেষ, মোহ, এই তিনটীর নাম দোষ। উহারা আবার বহুবিধ। রাগ শব্দের অর্থ অনুরাগ। মোহের নামান্তর মিথ্যাজ্ঞান, কিন্তু এখানে মিথ্যাজ্ঞানের পৃথক্ উল্লেখ থাকায় দোষ শব্দে রাগ ও দ্বেষ এই দুইটীই গ্রাহ্য।

কেহ বলেন, আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানই সূত্রে কথিত। উহা ছাড়া আরও মিথ্যাজ্ঞান আছে। আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের নাশে সেগুলিও নষ্ট হয়, সুতরাং সূত্রস্থ 'দোষ' শব্দে সেগুলিও গ্রাহ্য। শারীরকভাষ্যের টীকা 'রত্নপ্রভা'য় এইভাব সমুজ্জ্বল। পক্ষিল স্বামী কিন্তু এখানে বিপরীত জ্ঞানমাত্রই মিথ্যাজ্ঞান পদে বুঝিয়াছেন এবং ঐ মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান বলিয়াছেন এবং দ্বিতীয় সূত্রের মিথ্যাজ্ঞানকে প্রথমসূত্রের তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই বধ করিতে যেন বদ্ধপরিকর। বস্তুতঃ আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানই সংসারের নিদান। তাহার নাশেই মুক্তিলাভের আশা। মনে হয়, এই জন্যই মহর্ষি স্বল্পাক্ষর মোহশব্দ ত্যাগ করিয়া এইসূত্রে মিথ্যাজ্ঞান শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। দোষ-পদার্থের বিচারকালে মোহশব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন।

কেহ বলেন, স্থল বিশেষে কর্ম্মে রাগ, দ্বেষ, না থাকিলেও কর্ম্মশক্তিতে ধর্ম্মাধর্ম্ম হয়। রাগ, দ্বেষ, ধর্ম্মাধর্ম্মের কারণ নহে। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞান-জন্য সংস্কারই এখানে সূত্রস্থ দোষ শব্দে বুঝিতে হইবে।

কিন্তু মহর্ষির পরিভাষানুসারে দোষশব্দে মিথ্যাজ্ঞান-জন্য সংস্কার বুঝায় না। মিথ্যাজ্ঞানের নাশে তজ্জন্য সংস্কারের নাশও যুক্তিযুক্ত নহে। জ্ঞানের নাশ হইলেও তজ্জন্য সংস্কার থাকে, সুতরাং কারণনাশ-ক্রমে কার্য্যনাশের কথা অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। যাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতেছে, মিথ্যাজ্ঞান থাকায় রাগ, দ্বেষ, তাহার আছেই। তিনি "নাস্তিমমতি ন দ্বেষ্টি" এমন নহে। তাই তিনি কর্ম্মে আসক্ত। যে-দোষ কর্ম্মে আসক্ত করে, সেই দোষই

এই সূত্রে দোষশব্দে অভিহিত, তাহাই ধর্ম্মাধর্ম্মের কারণ। মিথ্যাজ্ঞানের নাশে তাহারই নাশ হয়। জীবন্মুক্তের সেই আসক্তিজনক উৎকট দোষ থাকেনা, তাই তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্মও হয়না।

এই সূত্রে দুঃখ প্রভৃতি শব্দ যে ক্রমে পঠিত, তদনুসারে দুঃখই সর্ব্বপ্রথম। জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ, মিথ্যাজ্ঞান, এই চারিটী উত্তর। ফলে ঐ চারিটী কারণ। উহাদিগের প্রত্যেকের পূর্ব্বটী পত্যেকের কার্য্য। "উত্তরোত্তরাপায়ে" অর্থাৎ কারণগুলির অপায়ে। "তদনন্তরাপায়াৎ" অর্থাৎ তাহাদের কার্য্যগুলির অপায়বশতঃ। কারণের পূর্ব্বে কার্য্য হয় না, কারণের অনন্তরই কার্য্য হয়, তাই অনন্তর শব্দের অর্থ কার্য্য। সূত্রের পাঠ ক্রমানুসারে ঐ কার্য্যগুলি পূর্ব্ব। তাই "তদনন্তরাপায়াৎ" ইহার প্রতিশব্দ, "তৎপূর্ব্বপূর্ব্বস্যাপায়াৎ"। এখন দেখুন—

(পূর্ব্ব) দুঃখ (উত্তর) জন্ম
(পূর্ব্ব) জন্ম (উত্তর) প্রবৃত্তি
(পূর্ব্ব) প্রবৃত্তি (উত্তর) দোষ
(পূর্ব্ব) দোষ (উত্তর) মিথ্যাজ্ঞান।

ইহার এক একটী উত্তরের অপায়ে তৎপূর্ব্বটীর অপায় হইয়া থাকে।

"উত্তরোপায়ে" বলিলে সর্ব্বোত্তর মিথ্যাজ্ঞানটী লইয়া তাহার অপায়ে তৎপূর্ব্ব দোষের অপায়েই মুক্তি বুঝিতে পারিতাম, তাহাতে মহর্ষির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। পরামুক্তির ক্রমপ্রদর্শন মহর্ষির একটী প্রধান উদ্দেশ্য। তাই "উত্তরোত্তরাপায়ে" বলিয়াছেন। "উহার মধ্যে যে কয়েকটী উত্তর" আছে, তাহার সবগুলির অপায় হইলে তৎপূর্ব্বপূর্ব্বের অপায়বশতঃ পরামুক্তি হয়—ইহাই তাহাতে বুঝা গেল। আবার কারণনাশক্রমে কার্য্য-নাশ হইয়া শেষে দুঃখ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইলেই পরামুক্তি হয়, ইহাই প্রকটিত করিবার জন্য "তদনন্তরাপায়াৎ" এই কথাটীও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ "তদনন্তরস্য তৎসন্নিহিতস্য পূর্ব্বপূর্ব্বস্যাপায়াদপবর্গঃ" একথা লিখিয়াছেন। 'পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ প্রযোজকত্ব বা প্রযোজ্যত্ব', অর্থাৎ ঐ ভাবে পূর্ব্বপূর্ব্বের অপায়টী অপবর্গের প্রযোজক, ইহাও লিখিয়াছেন, কিন্তু শেষে বলিয়া বসিয়াছেন, পঞ্চমীর অর্থ অভেদ। কারণ, দুঃখের অপায়ই অপবর্গ। উহা হইতে অপবর্গ বলিয়া আর পৃথক্ কোন পদার্থ জন্মে না, দুঃখের অপায়বশতঃ অপবর্গ হয়, একথা লাগে না, তাই পঞ্চমী লইয়া গোলযোগ। পঞ্চমী বিভক্তির অভেদ অর্থ কোথায়ও দেখা যায় না, তাই আবার বলিয়াছেন—"অপবর্গপদং বা তদ্ব্যবহারপরং"। মনের ভাব,—দুঃখের অপায় অপবর্গ হইলেও অপবর্গ-ব্যবহারে তাহা প্রযোজক হইতে পারে অর্থাৎ দুঃখের অপায় হইলে তাহাকে মুক্ত বলা যায়, ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্য। পাঠ লাগিল বটে, কিন্তু "অপবর্গ" শব্দের "অপবর্গ-ব্যবহার" অর্থও কোথায়ও দেখা যায় না। মহর্ষির সূত্রে এইরূপ আধুনিক লক্ষণা কেমন-কেমন বোধ হয়। কি ভাবে অপবর্গ হয় তাহাই এ সূত্রের বক্তব্য, অপবর্গ-ব্যবহারের কোন প্রসঙ্গও নাই। মনে হয়, এই পঞ্চমী বিভক্তির গোলযোগ মনে করিয়াই

"ভাষ্যরত্নপ্রভায়" শ্রীগোবিন্দ বলিয়াছেন—"তস্যা প্রবৃত্তিরূপহেতোরনন্তরস্য জন্মনোঽপায়াৎ দুঃখধ্বংসরূপোঽপবর্গোভবতীত্যর্থঃ।" অর্থাৎ তৎপদে প্রবৃত্তি ধরিয়া "তদনন্তর" অর্থাৎ সেই প্রবৃত্তিরূপ কারণের কার্য্য যে জন্ম, তাহার অপায়বশতঃ দুঃখধ্বংস রূপ অপবর্গ হয়। "তদনন্তরাপায়াৎ" ইহার এক-কথায় প্রতিশব্দ হইল—"জন্মাপায়াৎ" সুতরাং পঞ্চমী বিভক্তি লইয়া আর কোন গোলযোগে পড়িতে হইল না। কিন্তু এক-যোগ-নির্দ্দিষ্ট জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ, মিথ্যাজ্ঞান, এই চারিটীই "উত্তরোত্তর" শব্দের প্রতিপাদ্য। ঐ চারিটীই "তৎ শব্দের" গ্রাহ্য হওয়া উচিত। উহার মধ্যে একমাত্র প্রবৃত্তিই "তৎ শব্দের" গ্রাহ্য কিনা এবং তাহাই গ্রাহ্য হওয়া উচিত কিনা এবং তাহাই মহর্ষির বুদ্ধিস্থ কি না, এ গোলযোগ থাকিয়াই গেল।

আসল কথা—"তদনন্তরাপায়" শব্দের প্রতিপাদ্য কেবল দুঃখের অপায়ই নহে। দোষের অপায়, প্রবৃত্তির অপায় ও জন্মের অপায়, এই তিনটীও উহার প্রতিপাদ্য। দুঃখের অপায় স্বয়ং অপবর্গ হইলেও শেষোক্ত তিনটী অপায়, অপবর্গের প্রযোজক। উহাদিগের প্রযোজকত্ব, পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারাই প্রকাশ করিতে হইবে। অথচ দুঃখাপায়ের কথাটাও উহার মধ্যে বলিতে হইবে। কারণ-নাশক্রমে কার্য্যনাশ হইয়া শেষে দুঃখ পর্য্যন্ত নষ্ট হইলেই পরামুক্তি হয়—এই ক্রমপ্রদর্শনও হওয়া চাই। "তদনন্তর" পদে দুঃখটীও ধরা পড়িয়া গিয়াছে। ঐ 'দুঃখাপায়' স্বয়ং অপবর্গ, তাই উহার বেলায় পঞ্চমী বিভক্তি খাটিবেনা। একের বেলায় না খাটিলেও বহুর অনুরোধে সব জড়াইয়া এক ব্যবস্থা ঋষিদিগেরই ব্যবস্থা। একের অনুরোধ অপেক্ষায় বহুর অনুরোধের মূল্য বেশী। তাই মহর্ষি, বহুর অনুরোধে একেবারে "তদনন্তরাপায়াৎ" এই পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। এক কথায় চারিটী অপায়ই প্রকাশ করিয়াছেন। "দুঃখাপায়াদপবর্গঃ" এইরূপ প্রয়োগ সাধু না হইলেও "তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ" এই প্রয়োগের সাধুতা বিষয়ে তাঁহার কোন সংশয় ঘটে নাই, ইহাই যেন প্রকৃত কথা।

মনে রাখিতে হইবে, এই সূত্রটী অপবর্গের লক্ষণ-প্রদর্শক নহে। অপবর্গ কাহাকে বলে, সে কথা পরে বলিবেন। ইহা পরামুক্তির ক্রমপ্রদর্শক এবং আত্মসাক্ষাৎকারই মোক্ষলাভের চরম কারণ, এই অভ্রান্ত বৈদিক-সিদ্ধান্তের সমর্থক। তাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার শারীরক-ভাষ্যে ("তত্তু সমন্বয়াৎ") স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য ইহার সাহায্য লইয়াছেন। ভগবান্ শঙ্কর, মহর্ষি গোতমের নাম বলেন নাই। কিন্তু সূত্রটীকে বলিয়াছেন—"আচার্য্য-প্রণীতং ন্যায়োপবৃংহিতং সূত্রং"। জানিনা, আর কোনও মহর্ষি ভগবান্ শঙ্করের নিকটে এরূপ সম্মান পাইয়াছেন কি না? শঙ্করের মতে আত্মা ও ব্রহ্মের অভেদ-সাক্ষাৎকারই আত্মসাক্ষাৎকার। উহাই মিথ্যাজ্ঞান-নিবর্ত্তক তত্ত্বজ্ঞান। সে বিষয়ে মহর্ষি গোতমের কথা পরে বিবৃত হইবে। এখন ইহাও একবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, ভগবান্

শঙ্কর স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য মহর্ষি গোতমের প্রথম সূত্রটী উদ্ধৃত করেন নাই। তত্ত্ব-জ্ঞান হইতে মুক্তি-লাভের কথা প্রথম সূত্রেই স্পষ্ট, সুতরাং বুঝাযায়, প্রথম সূত্রের ষোড়শ-পদার্থ-তত্ত্বজ্ঞান মুক্তি-লাভের সাক্ষাৎ কারণ নহে। উহা মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ত্তক নহে, ইহা শঙ্করও বুঝিয়া গিয়াছেন। প্রথম সূত্রটি তাঁহার মতে নিতান্ত অসংগত অযৌক্তিক হইবে আর দ্বিতীয় সূত্রটী "আচার্য্য-প্রণীত" হইবে, একথা কিছুতেই হইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি-লাভ অসম্ভব। কারণ মিথ্যাজ্ঞান আর কিছুতেই যায় না, এই সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্যই শঙ্কর, গোতমের দ্বিতীয় সূত্রের উদ্ধার করিয়াছেন। প্রথম সূত্রে সে কথা নাই, যাহা আছে, তাহা অন্যদিকের কথা। তাই তিনি প্রথম সূত্রের উদ্ধার করেন নাই।

ঋষিদিগের সূত্র-তন্ত্র বড়ই দুষ্প্রবেশ। ব্যাখ্যাকারদিগের স্বাধীন চিন্তার প্রবল প্রতাপ, অনেক উদ্ধার করিয়াছে। কিন্তু আমাদিগের ন্যায় নির্ব্বোধ লোকের স্বাধীন চিন্তা, কেবল সংশয় প্রসব করিয়াই দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছে। এখন ইহার একটা দৃষ্টান্ত দিব।

মহর্ষি প্রথম সূত্রে বলিলেন—"নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ" দ্বিতীয় সূত্রে যাইয়া বলিলেন—"অপবর্গঃ"। যেখানে যেখানে মুক্তির কথা, সেখানেই তাঁহার 'অপবর্গ' শব্দ প্রয়োগ। 'নিঃশ্রেয়স' শব্দ, গোতমসূত্রে আর কোথায়ও নাই। প্রথম সূত্রের ন্যায় দ্বিতীয় সূত্রে "অধিগম" শব্দেরও প্রয়োগ করেন নাই। "অপবর্গ" বিচার-কালেও কোন সূত্রে "অপবর্গাধিগম" শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। সর্ব্বত্রই কেবল অপবর্গ শব্দ। ইহার মধ্যে মহর্ষির কি কোন গূঢ় অভিসন্ধি নাই? মুক্তির ন্যায় মঙ্গলও "নিঃশ্রেয়স' শব্দের প্রসিদ্ধার্থ। প্রাপ্তির ন্যায় জ্ঞানও "অধিগম" শব্দের প্রসিদ্ধার্থ। "নিঃশ্রেয়সাধিগম" বলিলে মঙ্গললাভ, মঙ্গলজ্ঞান, মুক্তিলাভ, মুক্তিজ্ঞান, এই চারিটী অর্থ নির্ব্বিবাদেই বুঝা যায়। কিন্তু প্রথম সূত্রে "নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ" বলিয়া দ্বিতীয় সূত্রেই সেই কথা বলিতে যাইয়া 'অপবর্গঃ' বলিয়া বসিলে, উহা যেন মনটাকে একটু অন্যপথে লইয়া যায়। প্রমাণাদি ষোড়শ-পদার্থের প্রকৃত জ্ঞান হইলে মানুষের অজ্ঞতা অশ্রদ্ধা ও সংশয় অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হয়, সুতরাং উহা হইতে অনেক মঙ্গল লাভ হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"

আবার বিচারশক্তিদ্বারা মানুষ নিজের মঙ্গলটী—চিনিয়া লইতে পারে। এই যে—মানুষ চিরকাল হইতে তর্কযুক্তির দ্বারা বিচার করিয়া নিজের ভালমন্দ স্থির করিতেছে, বিচার করিয়া এ দেশের ওদেশের ভাল মন্দ উপদেশ করিতেছে, কত "প্রমাণ" দিতেছে, কত "প্রমেয়" বুঝাইতেছে, "সংশয়" হওয়ার বিচারের "প্রয়োজন" বুঝিতেছে, "দৃষ্টান্ত" দ্বারা "সিদ্ধান্ত" বুঝিতেছে, "প্রতিজ্ঞা" "হেতুর" (অবয়ব) নাম না জানিয়াও যে কোন ভাষায় প্রতিজ্ঞা ও হেতু দেখাইতেছে, "তর্ক" করিয়া "নির্ণয়" করিতেছে, বাদুড়ে, জল্পে,

মুখে "বাদ" 'জল্প' "বিতণ্ডা"র ছড়াছড়ি করিতেছে, এযুক্তি যুক্তিই নহে, এযুক্তি বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি, এ যুক্তি দুর্ব্বল— ইত্যাদি রূপে, কত, "হেত্বাভাসের" প্রকাশ করিতেছে, প্রকৃত কথা বাহির করিবার জন্য কত "ছল" করিতেছে, কত অসদুত্তর ("জাতি") করিতেছে, অসদুত্তর বুঝিয়া তাহা উপেক্ষা করিতেছে, বিচারে কত "নিগ্রহ" করিতেছে, নিগ্রহের দ্বারা সিদ্ধান্তের বলাবল বুঝিতেছে, গণিতের দ্বারা কত কত তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছে, এসব কি গোতমের ষোড়শপদার্থের প্রকাণ্ড গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়াই হইতেছেনা? কেবল দেশের নৈয়ায়িক-নামধারী দুর্ব্বল জীব গুলাই কি, অগত্যা ঐ গণ্ডীর ভিতরে পড়িয়া আছে? পক্ষান্তরে মানুষের ঐ তর্ক-বিচারাদি কি নিজের বা সমাজের কিছুই মঙ্গলসাধন করিতেছেনা? যদি তাহাই হয়, তবে ঐ ষোড়শ পদার্থজ্ঞানের উপকারিতাও স্বীকার করিতে হইবে। যথাসম্ভব ঐ জ্ঞানের পূর্ণতা ও অভ্রান্ততা সম্পাদনের জন্য গোতমের ন্যায়দর্শনেরও আবশ্যকতা স্বীকার করিতে হইবে।

আবার অন্যদিকে যাঁহারা যুক্তিপ্রাণ সন্দেহবান্, নিজের মঙ্গল বুঝিতে পারিতেছেন না। বেদের দোহাই যাঁহাদিগকে কিছু বুঝাইতে পারিতেছেনা, কখন পারিবেওনা; তাঁহাদিগকে বেদ ছাড়িয়া যুক্তি দিয়াই বুঝাইতে হইবে। যে ভাবেই হউক, তাঁহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারগুলি আস্তিকের পথে আনিতে হইবে। উপনিষদের উচ্চতত্ত্ব যাঁহাদের নিকটে প্রকাশ পাইবেন না, ইহা উপনিষদেই প্রকাশ। ষোড়শপদার্থের বিশেষজ্ঞান, তাঁহাদের মঙ্গলজ্ঞানে ও মঙ্গললাভে পরম সহায়।

বেদের রক্ষক বলিয়া মীমাংসার ন্যায়, "ন্যায়তর্ক"ও বেদের উপাঙ্গ বলিয়া পুরাণে কীর্ত্তিত। যাহারা নাস্তিক, বেদবিধ্বংসে বদ্ধপরিকর, ষোড়শ পদার্থের বিশেষ জ্ঞান তাহাদিগের দৌরাত্ম্যনিবারণে অগ্রসর হয়।

মহর্ষি কি প্রথম সূত্রে "নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ" বলিয়া প্রথমতঃ তাঁহার গ্রন্থের এই সমস্ত প্রয়োজনের সূচনা করিয়াছেন? পরে পরম্পরায় পরম প্রয়োজন, অপবর্গই ইহার চরম ফল, ইহাই দেখাইবার জন্য দ্বিতীয় সূত্র রচনা করিয়াছেন। ঐ অপবর্গ অসম্ভব নহে, উহার জন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু আছেন, অধ্যাত্মশাস্ত্র আছেন, যোগশাস্ত্র আছেন। তাঁহাদের নিকটেই যাইতে হইবে, ইহা মহর্ষি পরে বলিয়াছেন। সে সব কথা তাঁহার প্রধান প্রতিপাদ্য নহে। এক কথায় তিনি উচ্চাধিকারীর জন্য ব্যতিব্যস্ত নহেন। (স তরতি নিরুপদ্রবৈঃ"।

শেষ কথা, আমরা প্রাচীন ব্যাখ্যাকারবর্গের পদাশ্রিত হইয়াও তাঁহাদিগের অমতে মহর্ষির ঐ "নিঃশ্রেয়সাধিগম" শব্দের মঙ্গললাভ, মঙ্গলজ্ঞান, প্রভৃতি অর্থ বুঝিলে অপরাধী হইব কি?

জানিনা, ইহার প্রকৃত ব্যবস্থা কোন গুহায় নিহিত আছে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

বেদান্তসূত্র
বা
ব্রহ্মসূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

৪। ন বিলক্ষণত্বাৎ অস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ।

৫। অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্।

৬। দৃশ্যতে তু।

৭। অসদিতিচেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ।

৮। অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্।

৯। ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ।

১০। স্বপক্ষদোষাচ্চ।

১১। তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গাৎ।

৪। ব্রহ্মের সহিত জগতের বিলক্ষণত্ব অর্থাৎ বিভিন্নতা হেতুক ব্রহ্ম, জগতের কারণ হইতে পারেন না। ব্রহ্ম যে জগৎ হইতে বিলক্ষণ, তাহা শ্রুতিতে প্রমাণিত হইয়াছে।

৫। পার্থক্য ও সম্বন্ধ হেতু দেবতাদের অভিমানিত্বের ব্যপদেশ হয়।

৬। পক্ষান্তরে এরূপ দৃষ্ট হয়।

৭। এরূপ যদি বলা হয় যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ অর্থাৎ অস্তিত্বশূন্য ছিল, তদুত্তরে বলিব, উহা উদ্দেশ্যবিহীন নিষেধমাত্র, বলিয়া স্বীকার্য্য নহে।

৮। প্রলয় সময়ে কার্য্য কারণে লীন হওয়ায় ব্রহ্মে কার্য্যের ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হওয়ায় অসামঞ্জস্য ঘটে।

৯। এরূপ হয় না, ইহার দৃষ্টান্তও আছে।

১০। বিরুদ্ধবাদী নিজে যে তর্ক উপস্থিত করেন, তাহাতে তাঁহার নিজপক্ষেও দোষ ঘটে।

১১। যদি একথা বলা যায়, যে, তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হেতু আমরা অন্যরূপ অনুমান করিব, তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তাহা হইলেও অবিমোক্ষ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে অর্থাৎ মুক্তির অভাব হইবে।

৪র্থ হইতে ১১শ সূত্র একটী অধিকরণ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের তৃতীয় সূত্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মের জগৎকারণত্বের বিরুদ্ধে স্মৃতিমূলক তর্কের নিরাস করা হইয়াছে—বর্ত্তমান অধিকরণে (চতুর্থ সূত্র ও পরবর্ত্তী সূত্রসমূহে) যুক্তিমূলক তর্কের নিরাস করা হইতেছে। যুক্তিবাদিরা প্রথমেই এই তর্ক উপস্থিত করিলেন যে, এই বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ, সুতরাং ব্রহ্ম ইহার কারণ হইতে পারেন না। শ্রুতি যখন স্বয়ংই বিশ্ব হইতে ব্রহ্মের বিলক্ষণতা ঘোষণা করিতেছেন, তখন ব্রহ্মকে বিশ্বকারণ বলা যায়না। এটী পূর্ব্বপক্ষসূত্র।

শ্রুতিবাদী সর্ব্বপ্রথম যুক্তিবাদীর বিরুদ্ধে এই কথা বলেন যে, শ্রুতিই যখন ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব ঘোষণা করিতেছেন, তখন যুক্তির অবকাশ কোথায়? যুক্তি কখনও শ্রুতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেনা। ইহার পর যুক্তিবাদী বলিতে পারেন যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ অকাট্য, কেননা শ্রুতিই ধর্ম্মের মূল। অনুষ্ঠেয় সাধ্যধর্ম্ম যজ্ঞাদির বিষয় একমাত্র শ্রুতিবাক্যদ্বারাই মানবের জ্ঞানগম্য হয়, অর্থাৎ এবম্বিধ অনুষ্ঠান করিলে এরূপ ফললাভ হইবে—এই জ্ঞান অন্য কোনও উপায়ে আমাদের আয়ত্তাধীন হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু ব্রহ্ম যখন পরিনিষ্পন্ন সিদ্ধ বস্তু অর্থাৎ পৃথিব্যাদির ন্যায় তাঁহার সত্তা বা অস্তিত্ব ধর্ম্মের ন্যায় কোনও ক্রিয়াসাপেক্ষ নয়,

তখন তদ্বিষয়ক জ্ঞানের জন্য কেবল শ্রুতির পর কেন নির্ভর করিতে হইবে? অন্যান্য পরিনিষ্পন্ন বস্তুর আলোচনায় যেমন যুক্তির অবতারণা ন্যায্য, তদ্রূপ ব্রহ্মবিষয়ক পর্য্যালোচনায়ও যুক্তির অবতারণা একান্ত সঙ্গত, মনে করিতে হইবে। যে সমুদয় বিষয়ে আমরা শ্রুতির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য, সে সমুদয় বিষয়ে শ্রুতিবাক্যের বিরোধ থাকিলে আমাদের যেরূপ সামঞ্জস্য করিতে হয়, তদ্রূপ যে সমুদয় বিষয়ে আমরা শ্রুতির অতিরিক্ত প্রমাণ পাই, সে সকল বিষয়ে সেইরূপ শ্রুতির অতিরিক্ত প্রমাণ অর্থাৎ যুক্তির সহিত শ্রুতির সামঞ্জস্য করা দরকার। যুক্তি কি? কতকগুলি দৃষ্ট পদার্থে সমধর্ম্ম অবলোকনে তজ্জাতীয় অদৃষ্ট পদার্থে সমধর্ম্ম আরোপ করার নাম যুক্তি। যত কাক দৃষ্ট হয়, সবই কৃষ্ণবর্ণ, কখনও শ্বেত বা রক্তবর্ণ কাক দৃষ্টিগোচর হয় না, এই দৃষ্ট কাকসকলে যে কৃষ্ণবর্ণ সমধর্ম্ম দেখিলাম, ইহাই অদৃষ্ট কাক-নিচয়ে আরোপ করা অর্থাৎ যে কাকগুলিকে দেখি নাই তাহারাও কাক, সুতরাং কৃষ্ণবর্ণ, এইরূপ স্থির করার নামই যুক্তি। শ্রুতি কেবল চিরপ্রসিদ্ধ কথার ন্যায় স্বীয় অর্থ প্রকাশ করে, আর যুক্তি ব্যক্তিগত অনুভবের বিষয় হয়, সুতরাং পরিনিষ্পন্ন ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনায় যুক্তিকে অবশ্যই শ্রুতি অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

যুক্তিবাদী এইখানে শ্রান্ত হইলেন না। তিনি আরও বলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান অবিদ্যার নিবর্ত্তক; এবং মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়, আর ইহার পরিসমাপ্তি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে, সুতরাং এটী ধর্ম্মের ন্যায় অদৃষ্ট নহে। শ্রুতি নিজেই বলিয়াছেন—"শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" এখানে মননের কথা বলায় যুক্তি যে ব্রহ্মবিষয়ে প্রযোজ্য, একথা শ্রুতিই স্বয়ং ঘোষণা করিতেছেন।

এতাবতা শ্রুতি যখন নিজেই ব্রহ্মবিচারে যুক্তির আবশ্যকতা প্রচার করেন, তখন যুক্তিমূলক তর্ক অকিঞ্চিৎকর মনে করা যাইতে পারেনা, অতএব যুক্তিমূলক আপত্তি সঙ্গত।

যুক্তিবাদী তা'ই চতুর্থসূত্রের অবতারণা করিতেছেন। যুক্তিবাদীর কথা এই যে, শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম শুদ্ধ ও চেতন কিন্তু এই বিশ্ব অশুদ্ধ ও অচেতন। বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বস্তুর মধ্যে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ হইতে পারেনা। যেমন মৃত্তিকা হইতে কখনও সুবর্ণালঙ্কার গঠিত হয় না, কিম্বা মৃৎশরাবাদি সুবর্ণ হইতে উৎপন্ন হয়না, স্বর্ণ হইতেই স্বর্ণালঙ্কার গঠিত হয়, এবং মৃত্তিকা হইতেই মৃৎশরাব জন্মে। ইহা আমরা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছি। সুতরাং অচেতন ও সুখদুঃখ-মোহাত্মক জগতের কারণ—চেতন সুখদুঃখ-মোহাতীত ব্রহ্ম হইতে পারেনা। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, জগৎকে অচেতন বলি কেন? উত্তরে বলা যায়, যে চেতনের উপকরণ সেই অচেতন, জগৎও চেতনের উপকরণ স্বরূপ, সুতরাং অচেতন। সমধর্ম্মাবলম্বী পদার্থের মধ্যে কোনও একটীকে অপরের অধীন বলা যায়না; যেমন দুটী প্রদীপের মধ্যে একটীকে অপরটীর অধীন বলা যায় না। যদি একথা বলা যায় যে, ভৃত্য এবং স্বামী উভয়েই চেতন হইলেও ভৃত্য স্বামীর অধীন, তদুত্তরে যুক্তিবাদী এই বলেন যে, 'স্বামিভৃত্যন্যায়' এখানে প্রযোজ্য

নয়। কেননা ভৃত্যের অচেতন ভাগ স্বামীর চেতন-ভাগের অধীন হয়, সুতরাং স্বামিভৃত্য-স্থায় দ্বারা চেতন যে চেতনের অধীন, ইহা প্রমাণিত হয় না। সাঙ্খ্যদর্শন-মতে চেতন পুরুষ ক্রিয়াশূন্য, সুতরাং অচেতনই কার্য্য করিতে সক্ষম। কাষ্ঠ বা মৃত্তিকা প্রভৃতি যে চেতন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই, বরং চেতন অচেতনের যে প্রভেদ, তাহা চিরপ্রসিদ্ধ। সুতরাং এই অচেতন জগতের উপাদান কারণ চেতন ব্রহ্ম হইতে পারেন না।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, যখন শ্রুতি বলেন যে জগৎ চেতন হইতে উদ্ভূত, তখন সমস্ত জগৎকে চেতন বলিব। যদি বলা যায় যে, তবে অচেতন চেতনের পার্থক্য কি? তদুত্তরে বলিব, উভয়ত্র চৈতন্য অন্তঃস্থিত আছেন, কিন্তু মনুষ্যাদিতে চৈতন্যের বিকাশ আছে, কাষ্ঠলোষ্ট্রাদিতে বিকাশ নাই, এইমাত্র প্রভেদ, সুতরাং চেতন অচেতনের যে লৌকিক প্রভেদ, তাহাদ্বারা ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্বের কোনও বাধা হয় না।

বিরুদ্ধবাদী বলেন যে, তর্কস্থলে যদি সমস্ত সংসার 'চেতন' স্বীকার করাও যায়, তথাপি ব্রহ্মের বিশুদ্ধতা ও জগতের অশুদ্ধতা বশতঃ যে বৈলক্ষণ্য, তাহার নিরাস এ তর্কদ্বারা হয় না। বিরুদ্ধ পক্ষ আরও বলেন যে, এ তর্ক আদৌ সমীচীন নহে, কারণ জগৎ যে ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ, ইহা শ্রুতিদ্বারা ঘোষিত, সমস্ত জগৎ যে চেতন, ইহা যুক্তি বা অনুভব কিছুর দ্বারাই স্থিরীকৃত হয় না। যদি শ্রুতির পথই নির্ভর করা যায়, তবে সে শ্রুতিও বলেন যে, ব্রহ্ম হইতে জগৎ প্রকৃতিবিলক্ষণ। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ (২ । ৬) বলেন 'বিজ্ঞানঞ্চ অবিজ্ঞানঞ্চ ইতি'। ব্রহ্মই বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান-স্বরূপ। এতাবতা স্থিরীকৃত হইল যে, চেতন ব্রহ্ম—তিনি চেতন ও অচেতন দুইই হন। তবে যদি এরূপ বলা যায় যে, শ্রুতিতে দেখা যায় 'মৃৎ অব্রবীৎ আপোঽব্রুবন্'; শতপথ ব্রাহ্মণ (৬ । ১ । ৩ । ২ । ৪); "তত্তেজ ঐক্ষত তা আপ ঐক্ষন্ত" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৬ ২ ৩ ৪) ইত্যাদি। তদুত্তরে পূর্ব্ববাদী পঞ্চম সূত্রের অবতারণা করেন।

সূত্রের 'তু' অর্থাৎ 'কিন্তু' শব্দ দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ যে সন্দেহ উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার নিরাস করা হইল।

মন্ত্র, অর্থবাদ, ইতিহাস, পুরাণাদি সকলেই সমস্বরে ঘোষণা করে যে, সর্ব্বপদার্থের সহিতই দেবতাদের অনুগতি অর্থাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। কৌষিতকী উপনিষৎ যখন প্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় বর্ণনা করেন, তখন প্রাণাদিকে দেবতা বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন যথা কৌষিতকী উপনিষৎ (২ । ১৪) "এতা বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ" এই সকল দেবতারা (ইন্দ্রিয়াণি) তাঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, ইহা লইয়া বিবাদ করিয়াছিলেন। কৌষিতকী উপনিষদে (২ । ১৪) আরও দেখা যায়—"তা বা এতাঃ সর্ব্বা দেবাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা" অর্থাৎ এই সকল দেবতা (ইন্দ্রিয়গণ) প্রাণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিয়া; ঐতরেয় আরণ্যক (২।৪।২।৪) বলেন, 'অগ্নির্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ' অর্থাৎ অগ্নি বাক্য-রূপে মুখে প্রবেশ করিলেন। এইরূপ বহুস্থলে শ্রুতিতেও সর্ব্বত্র দেবতাদের সম্বন্ধ ঘোষিত হইয়াছে। আর জগৎ যে ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ (বিশেষ) তাহাও শ্রুতি ঘোষণা করেন,

সুতরাং এই অনুগতি বা সম্বন্ধ ও বিশেষ বা বৈলক্ষণ্যের সামঞ্জস্য-সংস্থাপনার্থে দেবতাদের অভিমানিত্বের ব্যপদেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যেস্থানে বলিল 'তত্তেজ ঐক্ষত' অর্থাৎ তেজ চিন্তা করিয়াছিলেন, সেস্থানে জড় তেজকে চেতন চিন্তাকারী মনে করিব না, কিন্তু তেজের অধিষ্ঠাত্রী পরা দেবতারই চিন্তা বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুতরাং ইহা অবধারিত হইল যে, যখন জগৎ ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ, সুতরাংই ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন না।

৬ সূত্র। এই ষষ্ঠসূত্র স্বপক্ষসূত্র। ইহাদ্বারা পূর্ব্বপক্ষীয় (৫ম সূত্রের) সিদ্ধান্তের নিরাস করা হইতেছে। ব্রহ্মকারণবাদী ৫ম সূত্রের বিরুদ্ধে এই বলেন যে, চেতন হইতে যে অচেতনের উৎপত্তি হয়, তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন চেতন পুরুষ হইতে অচেতন নখকেশাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে, অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিক জন্মিয়া থাকে। এস্থানে এরূপ পূর্ব্বপক্ষ করা যায় যে, পুরুষ হইতে যে কেশনখাদির উৎপত্তি হয়, উহা পুরুষের অচেতন অংশ হইতেই হইয়া থাকে। ব্রহ্মকারণবাদী ইহার উত্তরে এই কথা বলেন যে, যদি তর্ক স্থলে স্বীকৃত হয়, অচেতন হইতেই অচেতনের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলেও বলাযায়, এখানে কার্য্য-কারণের বিলক্ষণত্ব দৃষ্ট হয়। কার্য্য কারণের সমত্ব সংস্থাপিত হইলে, একটী কারণ ও অপরটী কার্য্য হইতে পারে না। কারণ ও কার্য্য যদি একই প্রকার হইল, তবে তাহার একটী 'কার্য্য' ও অপরটী 'কারণ' হয় কিরূপে? কার্য্য-কারণের মধ্যে বিলক্ষণত্ব থাকিবেই। তবে যদি পূর্ব্বপক্ষ হইতে এই আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, কার্য্য কারণের বৈলক্ষণ্য থাকিলেও তাহাদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকিবেই, যেমন বৃশ্চিক ও গোময় উভয়ের পার্থিবত্ব সাদৃশ্য আছে, তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যেও ঐরূপ সাদৃশ্য আছে, সে সাদৃশ্য সত্তালক্ষণ স্বভাব। যে আপত্তিকারী গুণবৈষম্য হেতুক ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব অস্বীকার করিতে প্রস্তুত, তাঁহার পক্ষে হয় বলিতে হইবে যে, 'ব্রহ্মের গুণসমষ্টি জগতে দৃষ্ট হয় না, কিম্বা তাঁহার কোনও গুণ জগতে দৃষ্ট হয় না, কিম্বা চৈতন্য গুণ দৃষ্ট হয় না।' যদি বলা যায়, ব্রহ্মের গুণসমষ্টি জগতে দৃষ্ট হয় না, এজন্য ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন না। তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, তাহা হইলে কার্য্য ও কারণের পার্থক্য থাকে না, কার্য্য কারণ একই হইয়া যায়। সুতরাং এরূপ বলা যায় না। ব্রহ্মের কোনও গুণ জগতে দৃষ্ট হয় না, এই তর্ক পূর্ব্বেই খণ্ডিত হইয়াছে; কারণ জগতে ব্রহ্মধর্ম্ম সত্তা আছে। তৃতীয় আপত্তি অর্থাৎ জগতে ব্রহ্মের চৈতন্যগুণ দৃষ্ট হয় না, ইহার উত্তরে ব্রহ্মকারণবাদীরা বলেন যে, বিপক্ষ এখানে কি প্রমাণ উপস্থিত করেন যে, তাহা দ্বারা তিনি স্থির করিতে চাহেন যে, চৈতন্যবিরহিত পদার্থ ব্রহ্মের কার্য্য হইতে পারেনা। বিশেষতঃ শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মই জগতের কারণ। বিরুদ্ধ-বাদী যে বলেন, ব্রহ্ম সিদ্ধ বস্তু, সুতরাং তাঁহার জগৎকারণত্ব-বিষয়ে যুক্তি প্রযোজ্য, এ তর্কের উত্তরে আমরা বলি, যে, ইহাও তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত তর্ক। কারণ ব্রহ্ম যখন রূপাদিবিহীন, তখন তিনি প্রত্যক্ষের গোচর নহেন, আর তাঁহার নির্দ্দার্য্য

কোনও লিঙ্গ নাই অর্থাৎ যেমন ধূমরূপ লিঙ্গ হইতে বহ্নির অনুমান করা যায়, ব্রহ্মে তদ্রূপ কোনও অনুমাপক লিঙ্গের অস্তিত্ব বুঝা যায় না। সুতরাং তৎসম্বন্ধে অনুমানাদি প্রযোজ্য নহে। কিন্তু ধর্ম্মের ন্যায় শ্রুতিই তাঁহার সম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ। কঠশ্রুতি (১।২।৯) বলেন, নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া, প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ!

তর্কমূলে ব্রহ্মজ্ঞান থাকে বহুদূরে।
শ্রুতি-উপদেশ শুধু সুভাত অন্তরে।

ঋগ্বেদসংহিতায় (১০।১২৯।৬) দৃষ্ট হয়—'কো অদ্ধাবেদ কইহ প্রাবোচৎ ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব।'

কে জানে তাঁহাকে কে পারে ঘোষিতে,
এই বিশ্ব সৃষ্ট হয় যাহা হ'তে।

এতদ্দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, শক্তিশালি-পুরুষেরাও জগৎকারণের বিষয় বিশেষ অবগত নহেন। ভগবদ্গীতা (১০।২) 'অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোয়মুচ্যতে।' অব্যক্ত অচিন্ত্য আর বিকারবিহীন। আরও দেখা যায়, নমে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ। অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ।

দেবঋষি সকলের আমি জন্মদাতা।
কিরূপে জানিবে তারা মম জন্মকথা!

তবে যদি বলা যায় যে, ব্রহ্ম-বিষয়ে শ্রুতিতেই যুক্তির স্থান আছে বলিয়া পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তদুত্তরে এই বলা যায়, স্থান আছে সত্য, কিন্তু সেস্থান শ্রুতির নিম্নে। যুক্তি শ্রুতিবিরুদ্ধ হইলে তাহা আদৌ গ্রাহ্য নহে। কেবল-তর্কের অসারতা পরে (এই পাদের ১১ সূত্রে) দেখান যাইবে।

এস্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাঙ্খ্যবাদীরা বলেন যে, অচেতন প্রধান হইতে জগতের উৎপত্তি হয়, কিন্তু যদি চেতন হইতে অচেতন না জন্মে, তবে অচেতন হইতে চেতন জন্মিবেই বা কিরূপে?

সপ্তমসূত্রে বলা যাইতেছে যে, একথা যদি বলা হয় যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের কোনও অস্তিত্ব নাই, তদুত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, এটী একটী উদ্দেশ্যবিহীন প্রতিষেধ বা নিষেধবাক্য মাত্র। যদি শুদ্ধ শব্দাদি-বিহীন চেতন ব্রহ্ম, তদ্বিপরীত অর্থাৎ অবিশুদ্ধ শব্দাদিযুক্ত অচেতন কার্য্যের কারণ হন, তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের কোনও অস্তিত্ব ছিল না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এটী বেদান্তবাদীর পক্ষে স্বীকার্য্য হইতে পারেনা, কারণ তাঁহাদের মতে কার্য্য সর্ব্বদাই কারণে বর্ত্তমান থাকে।

বেদান্তবাদী এতদুত্তরে বলেন যে, তোমার তর্ক দ্বারা বেদান্তমতের কোনও অনিষ্ট নাই। কারণ, এটী প্রতিষেধ মাত্র বা নিষেধবাক্য মাত্র। কেননা, যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার না কর, তাহা হইলে তোমার সেই অস্বীকার বা প্রতিষেধ একটী উদ্দেশ্য-বিহীন নিষেধবাক্য ভিন্ন অন্য কিছুই হয় না। উৎপত্তির পূর্ব্বে অনস্তিত্ব—বাচক তর্ক উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য হইতে পারেনা; কারণ মনে করিতে হইবে যে, কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে ও পরে সকল সময়ে কারণ-রূপে বিদ্যমান আছে। বৃহদারণ্যক শ্রুতি (৪।৬) বলেন—"সর্ব্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্র আত্মনঃ সর্ব্বং বেদ," যিনি আত্মার বাহিরে কিছু দৃষ্টি করেন, তিনি আমাদ্বারা পরিত্যক্ত হয়েন।

কারণরূপে যখন কার্য্য বিদ্যমান থাকে, তখন কার্য্যের সত্তা—পূর্ব্ব ও পরে একই রূপ বলিতে হইবে। তবে যদি তুমি বল, গুণাদি বর্জ্জিত ব্রহ্ম ত এই গুণসম্পন্ন জগতের কারণ! তদুত্তরে বলা যায়, সত্য বটে, কিন্তু যে কার্য্য সগুণ, তাহা কারণাত্মভাবে এখন বা উৎপত্তির পূর্ব্বে কখনও থাকিতে পারেনা। অতএব বলা যাইতে পারে না যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অস্তিত্ব নাই। এবিষয়ে আরও বিশদরূপে পরে বিবৃত হইবে।

৮ম সূত্র। পূর্ব্বপক্ষ ইহাতেও নিরস্ত হইলেন না। তিনি বলেন যে, যদি স্থৌল্য সাবয়বত্ব, অচেতনত্ব, পরিচ্ছিন্নত্ব অশুদ্ধত্ব আদি ধর্ম্মবিশিষ্ট কার্য্য, তদ্বিপরীত গুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রলয় কালে যখন কার্য্য কারণে লীন হইবে, তখন কার্য্য তাহার স্বীয় ধর্ম্ম দ্বারা কারণকে দূষিত করিবে। সুতরাং বেদান্তমতে নির্গুণ শুদ্ধ ব্রহ্ম, সগুণ অবিশুদ্ধ কার্য্যের কারণ হইতে পারেন না, যেহেতু শ্রুতিবাক্য স্পষ্টই বলেন যে, ব্রহ্ম কোনও গুণদ্বারা দূষিত হননা।

পূর্ব্বপক্ষ আর একটী আপত্তি উপস্থাপিত করেন যে, প্রলয় কালে যদি কার্য্য কারণে লীন হইল, তবে পুনরুৎপত্তি সময়ে ভোক্তৃভোগ্যের স্বতন্ত্রতা থাকিতে পারেনা; কিন্তু জগতে আমরা স্বাতন্ত্র্য দর্শন করি, সুতরাং এতদ্দ্বারাও বেদান্তমত দুষ্ট বলিতে হয়। পূর্ব্বপক্ষ তৃতীয় আপত্তি এই করেন যে, যদি ভোক্তৃদের সকল কর্ম্মের ধ্বংসের পর একটী নূতন বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে মনে করা যায়, তাহা হইলে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, মহাপুরুষদিগেরও পুনর্ব্বার উৎপত্তি হইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষ আরও বলেন যে, বেদান্তবাদী যদি বলেন যে, জগৎ ব্রহ্ম হইতে (প্রলয়কালে) স্বতন্ত্র থাকে, তদুত্তরে বক্তব্য এই, তাহা হইলে আর প্রলয় হইল না। আর কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যেরও কখনও সম্ভব হয়না। এই সকল কারণে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, বেদান্তমতে সামঞ্জস্য নাই।

৯ম সূত্র—এই সূত্রদ্বারা বেদান্তবাদী পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। বেদান্তবাদী বলেন, পূর্ব্বপক্ষ হইতে যে আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে যে, প্রলয়কালে কারণ কার্য্যদ্বারা দূষিত হইবে, ইহা সমীচীন নহে; কারণ আমরা দেখিতে পাই, কার্য্য কখনও স্বীয় ধর্ম্মদ্বারা কারণকে দূষিত করেনা। শরাবাদি মৃত্তিকার কার্য্য, তাহাদের ধ্বংসের পরে তাহারা মৃত্তিকায় পরিণত হয়, তখন শরাবাদি ধর্ম্মদ্বারা মৃত্তিকাকে দূষিত করেনা। ঐ প্রকার অলঙ্কারাদি সুবর্ণের বিকার, কিন্তু তাহারা সুবর্ণে লীন হইয়া, নিজ ধর্ম্মদ্বারা সুবর্ণকে সংসৃষ্ট করেনা। বেদান্তবাদী বলেন— আমি দেখাইতে পারি যে, কার্য্য কারণকে স্বীয় ধর্ম্মদ্বারা দূষিত করেনা, অথচ পূর্ব্বপক্ষবাদী ইহার বিরুদ্ধপক্ষ দেখাইতে পারেননা। পূর্ব্বপক্ষের একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, কার্য্য যখন কারণে প্রবেশ করে, তখন যদি স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে কারণে কার্য্যের লয় হইল, তাই আদৌ বলা যায় না। কার্য্য-কারণের অবিলক্ষণত্ব সত্ত্বেও কার্য্য কারণাত্মক, কিন্তু কারণ কার্য্যাত্মক নহে। এই বিষয়টী ২য় অধ্যায়ের

১ ম পাদের ১৪ সূত্রে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইবে। প্রলয়কালে কার্য্য স্বীয় ধর্ম্মদ্বারা কারণকে দূষিত করিবে, এই আপত্তি অতি সঙ্কোচভাবে করা হইয়াছে। কারণ, স্থিতি-কালেও কার্য্য, ঐরূপে কারণকে দূষিত করিতে পারে। ব্রহ্ম ও জগতের অনন্যত্ব স্বীকার করিলে সর্ব্বকালেই ঐ আপত্তি হইতে পারে। ব্রহ্ম যে জগৎ, সে বিষয়ে শ্রুতিতে পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক (২।৪।৬) বলেন, 'ইদংসর্ব্বং যদয়মাত্মা' ছান্দোগ্য (৭ ২৫ ২) বলেন "আত্মৈবেদংসর্ব্বম্।" মুণ্ডক (২ ২ ১১) বলেন "সর্ব্বংব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ" ছান্দোগ্য (৩।১৪।১) বলেন 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' সুতরাং সর্ব্বশ্রুতিতেই জগৎ ও ব্রহ্মের অনন্যত্ব ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু অবিদ্যাজনিত অধ্যাসদ্বারা আমরা কার্য্য-কারণের পৃথকত্ব কল্পনা করি। কার্য্যকারণের পৃথকত্ব না থাকিলে কার্য্যদ্বারা কারণের দূষণ সম্ভাবিত নহে। মায়াবী যেমন স্বকৃত মায়াদ্বারা সংস্পৃষ্ট হয়েন না, পরমাত্মাও তদ্রূপ সংসার-মায়াদ্বারা সংস্পৃষ্ট হন না। যতক্ষণ মায়া, ততক্ষণ সংসার। সংসারের অপগমে মায়াও নাই, জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বও নাই। স্বপ্নদর্শক যেমন জাগ্রত বা সুষুপ্ত অবস্থার স্বপ্ন দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয়েন না, সেইরূপ সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়ের একমাত্র সাক্ষী পরমাত্মা পরস্পর অসংস্পৃষ্ট অবস্থাত্রয় দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয়েন না। এই অবস্থাত্রয়ের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ মায়ামাত্র, এবং সে কিরূপ না যেমন আলোকের অভাবে রজ্জু সর্পবৎ প্রতীয়মান হয়। আলোকে রজ্জু যেমন রজ্জুই প্রতীয়মান হয়, জীবের হৃদয়ে জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হইলে, তেমনি সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় দৃষ্ট হয়। এবিষয়ে বেদান্ত-বাদিগণ বলিয়া থাকেন—

অনাদিমায়য়া সুপ্তোযদাজীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা।

গৌড়পাদকারিকা।১

অনাদি মায়ার কোলে সুপ্তজীব জাগে যদা।
নিদ্রাজন্মস্বপ্নদ্বৈতহীন ব্রহ্মে জানে তদা।

তৎপরে এই আপত্তি হইতে পারে যে, প্রলয়কালে যদি কার্য্য-কারণের বিভাগ না থাকে, তাহা হইলে এই বিভাগাত্মক জগতের পুনরুৎপত্তির হেতু থাকেনা। তদুত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, সুষুপ্তি এবং সমাধি-কালে জীব-ব্রহ্মের অবিভাগ সংঘটিত হয়, কিন্তু মিথ্যাজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হওয়ায় সুষুপ্তি বা সমাধি ভঙ্গ হইলেই পুনর্ব্বার ভেদজ্ঞান উপস্থিত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষৎ (৬ ৯।২।৩) বলেন, 'ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে, তইহ ব্যাঘ্রোবা সিংহোবা বৃকোবা বরাহোবা কীটোবা পতঙ্গোবা দংশোবা মশকোবা যদ্ যদ্ ভবন্তি তত্তদাভবন্তি।'

জানেনা সে তত্ত্ব জীব ব্রহ্মে যদা করে বাস।
সিংহ ব্যাঘ্র বৃক কীট বরাহ পতঙ্গ ডাঁশ
মশকাদি জীব যত ব্রহ্মেতে পাইয়া লয়,
প্রলয়ান্তে পুন তারা পূর্ব্বদশা প্রাপ্ত হয়।

পরমাত্মা ভেদশূন্য হইলেও স্থিতিকালে যেরূপ মিথ্যাজ্ঞান-হেতুই ব্যবহারিক জগতের বহুত্ব ও বিভিন্নত্বের সত্তা অনুভূত হয় এবং উহা স্বপ্নবৎ অব্যাহত থাকিয়া যায়। তদ্রূপ প্রলয়কালেও ঐ মিথ্যাজ্ঞানহেতুই শক্তিবীজ থাকিয়া যায়। তবে যদি আপত্তি করা যায় যে, তাহা হইলে মুক্ত পুরুষদিগেরও

পুনরুৎপত্তি হইতে পারে, তদুত্তরে এই বলা যায় যে, মুক্তপুরুষদিগের পক্ষে পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা আদৌ নাই, কারণ তাঁহাদের মিথ্যা-জ্ঞানের লেশমাত্রও থাকেনা। সুতরাং প্রলয়-কালেও যে ব্রহ্ম জগৎ হইতে অভিন্ন থাকেন, বেদান্তের এই মতে কোনও অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না।

১০ সূত্র। এই সূত্রে বেদান্তবাদী বলিতে চাহেন যে, সাঙ্খ্যবাদীগণ বেদান্তমতের বিরুদ্ধে যে তর্ক উত্থাপিত করেন, তাহা তাঁহাদের স্বীয় মতের বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। সাঙ্খ্যবাদীরা এই আপত্তি করেন যে, কার্য্য-কারণের বৈলক্ষণ্যহেতুক এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলা যাইতে পারেনা। তাঁহাদের এই আপত্তি তাঁহাদের স্বীয় মতের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য। যেহেতু তাঁহারা যে প্রধানকে জগতের কারণ বলেন, সেই প্রধান, শব্দাদি-গুণ বিরহিত। সেইরূপ কারণ হইতে শব্দাদি-গুণযুক্ত জগতের কিরূপে উৎপত্তি হইতে পারে? সুতরাং সাঙ্খ্যবাদীর বাধ্য হইয়া উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অনস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহাদিগকে অসৎ-কার্য্যবাদ স্বীকার করিতে হইবে। সাঙ্খ্যবাদীরা স্বীকার করেন যে, প্রলয়কালে কার্য্য-কারণের অভেদ সংঘটিত হয় এবং তাহা স্বীকার করিলে বেদান্তমতের সঙ্গে তাঁহাদের কোনও পার্থক্য থাকেনা। যদি ইহা বলা যায় যে, প্রলয়কালে সর্ব্বপ্রকার বিশেষ বিকারের ধ্বংস হয় এবং তাহারা একটী সাধারণ অবিভাগ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে প্রলয়ের পূর্ব্বে প্রতিপুরুষের বিভিন্ন সংসার-গতির যে বিশেষ বিশেষ অবস্থা ছিল, তাহা, নব সৃষ্টিকালে কারণ অভাবে পৃথগ্‌ভাবে উৎপন্ন হইতে পারেনা। আর যদি বল যে, বিনাকারণেও তাহাদের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা হইলে মুক্তপুরুষদিগেরও পুনর্ব্বার সংসার-বন্ধন ঘটিতে পারে। যেহেতু মুক্ত ও বদ্ধ উভয়বিধ পুরুষের পক্ষেই কারণ-অভাব সমান রহিয়াছে। তবে যদি একথা বলা যায়, যে, কেহ কেহ একরূপ অবিভাগ প্রাপ্ত হয়, আবার কেহ হয়ও না, তাহা হইলে যাহারা অবিভাগ প্রাপ্ত হয় না, তাহারা প্রধানের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেনা; সুতরাং সাঙ্খ্যবাদীদের যে সমুদয় তর্ক, তাহা বেদান্ত ও সাঙ্খ্য উভয়-মতেই সমান প্রযোজ্য। কিন্তু বেদান্তমত সম্বন্ধে তাঁহারা যে তর্ক উত্থাপন করেন, তাহা পূর্ব্বেই খণ্ডিত হইয়াছে।

১১ সূত্র। আগম বা শ্রুতি হইতে যে সমুদয় বিষয় জ্ঞাত হইতে হইবে, সে সমুদয় বিষয়ে কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করা যাইতে পারেনা। আগমবিরোধী পুরুষবুদ্ধি-কল্পিত তর্কের প্রতিষ্ঠা বা দৃঢ়ভিত্তি নাই। যেহেতু পুরুষের কল্পনা নিরঙ্কুশা অর্থাৎ অসংযতা। আজ একজন বুদ্ধিমান লোক যত্ন-সহকারে যে সকল তর্ক উপস্থিত করিলেন, কল্য আর একজন বুদ্ধিমত্তম লোক ঐ সকল যুক্তি খণ্ডন করিলেন। হয়ত এই ব্যক্তির তর্কও ততোধিক সুবুদ্ধি ব্যক্তির দ্বারা নিরাকৃত হয়। সুতরাং মনুষ্যবুদ্ধির বৈষম্য—হেতুক কোনও তর্কেরই প্রতিষ্ঠা আছে বলা যায় না। তবে যদি এরূপ বলা যায়, কপিলের ন্যায় মহাত্মাদের তর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহাও অসঙ্গত, কারণ, কপিলের তুল্য মহাত্মাদিগের মধ্যে* অর্থাৎ

কণাদ প্রভৃতি দার্শনিকদিগের মধ্যেও মত-দ্বৈধ্য দৃষ্ট হয়।

এস্থলে যুক্তিবাদী এই কথা বলিতে পারেন যে, তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই একথা স্বীকার করা যায় না। কারণ তর্কের যে প্রতিষ্ঠা নাই, এই তত্ত্বও তর্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত; আর যদি তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই একথা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জাগতিক সমুদয় কার্য্যেরই অবসান হইবে। অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের সাম্য দৃষ্টি করিয়াই মানুষ ভবিষ্যতের দুঃখ পরীহার ও সুখ প্রাপ্তির জন্য প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ যে কার্য্যগুলির ফল অতীতে দুঃখময় ছিল, বর্ত্তমানেও তাহা দুঃখময় দৃষ্ট হয়, অনুমিত হয়, ভবিষ্যতেও দুঃখময় হইবে। সুখ সম্বন্ধেও ঐরূপ; সুতরাং ব্যবহারিক জগতে যুক্তি বা তর্ক পরিত্যাগ করা অসম্ভব। শ্রুতির মধ্যে মতদ্বৈধ হইলে শ্রুতির যথার্থ মর্ম্ম কি, তাহা বুঝিতে হইলে, তর্কের অবতারণা করিতে হয়। মনু (১২। ১০৫ ১০৬) বলেন,

প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমং।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা।
আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা,
যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে সধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।
প্রত্যক্ষ ও অনুমান, শ্রুতিগামী শাস্ত্র আর
এ তিনে জানিবে সেই ধর্ম্মশুদ্ধি ইচ্ছা যার।
বেদশাস্ত্র-অবিরোধি আর্ষধর্ম্মহিতবাণী
যুক্তিমূলে জানে যেই সেই হয় ধর্ম্মজ্ঞানী।

আর তর্কের অপ্রতিষ্ঠারূপ যে যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাই তর্কের অলঙ্কার-স্বরূপ হইয়াছে; কেননা তাহা দ্বারাই নিন্দনীয় তর্ক পরিত্যাগ করিয়া আমরা অনিন্দনীয় তর্ক প্রাপ্ত হই। এতদুত্তরে বেদান্তবাদী বলেন, যে, তাহা হইলে, অবিমোক্ষ-প্রসঙ্গ অর্থাৎ মুক্তির অভাব ঘটিবে। যদ্যপি কোনও কোনও ব্যাপারে তর্কের প্রতিষ্ঠা দৃষ্ট হয়, কিন্তু বক্ষ্যমাণ বিষয়ে তর্কের প্রতিষ্ঠা স্বীকার করা যায় না। কেননা, জগতের কারণের জ্ঞান হইতেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, এই বিষয়টী এত গভীর যে, আগম-সাহায্য ব্যতীত মানুষের তাহা ধারণা করিবার শক্তি নাই। রূপাদিবিহীন হওয়াতে ইহা প্রত্যক্ষের গোচর নয়, লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক হেত্বাদির অভাববশতঃ ইহা অনুমানেরও অধীন নয়, পরন্তু ইহা কেবলমাত্র শাস্ত্রগম্য। মোক্ষবাদিরা বলেন, যে, সম্যক্ জ্ঞান হইতেই মোক্ষ উপস্থিত হয়। যাহাকে সম্যগ্‌জ্ঞান বলে, তাহার মধ্যে কোনও ভেদ থাকিতে পারেনা অর্থাৎ সম্যগ্‌জ্ঞান সর্ব্বাবস্থায় একরূপই হইবে। কেননা, এই সম্যগ্‌জ্ঞান বস্তুতন্ত্র অর্থাৎ বস্তু হইতে নিষ্পন্ন হয়। যে বস্তুটী একরূপে অবস্থিত থাকে, তাহাকেই পরমার্থ বা পরমবস্তু বলা যায়, এবং সেই বিষয়ের যে জ্ঞান তাহাকেই সম্যগ্‌জ্ঞান বলা হয়। যেমন অগ্নি উষ্ণ। এই সিদ্ধান্তদ্বারা যে জ্ঞানের উদয় হইতেছে, ইহার প্রকার-ভেদ নাই। সর্ব্বাবস্থায় সকলেই অগ্নিকে উষ্ণ বলিয়া অনুভব করে। সুতরাং সম্যগ্‌জ্ঞান সম্বন্ধে মতদ্বৈধ অসম্ভব। কিন্তু যে সমুদয় জ্ঞান তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে সম্যগ্‌জ্ঞান বলা যায় না। কারণ তর্কের পর প্রতিষ্ঠিত যে সকল জ্ঞান, তাহারা সাধারণতই পরস্পর-বিরোধী। একজন তার্কিক তর্কদ্বারা যাহাকে সত্যজ্ঞান বলিয়া স্থির করিলেন। দ্বিতীয়

তার্কিক তাহাকে ভ্রান্তজ্ঞান বলিয়া প্রমাণ করিলেন, আবার তৃতীয় তার্কিক তাহা খণ্ডন করিলেন, সুতরাং ইহার কোনওটী সম্যগজ্ঞান হইতে পারেনা। আর প্রধানবাদী যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তার্কিক, এবং তাহার সিদ্ধান্ত যে সকলে গ্রহণ করে, তাহাও বলা যায় না। তজ্জন্য তাঁহার মত ও সম্যগজ্ঞান নহে! এক সময়ে একস্থানে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কালের সমস্ত তার্কিক সংগ্রহ করিয়া তাহাদের কোনও একবিষয়ক মতের সামঞ্জস্য করিয়া তাহাকে সম্যগজ্ঞান বলিয়া স্থির করিয়া লওয়া অসম্ভব। বেদ কিন্তু নিত্য, এবং জ্ঞানের কারণ। অতএব বেদকে অতিক্রম করিয়া যুক্তিতর্কের সাহায্যে দুজ্ঞেয় বিশ্ব-কারণের সন্ধান লওয়ার আশা দুরাশা।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য।

রাজপ্রসাদ। অর্দ্ধপৃথিবীর অধীশ্বর রাজরাজেশ্বর ভারতসম্রাট্ মহামহিম পঞ্চমজর্জ্জ মহোদয় মহিষী সমভিব্যাহারে দরবার উপলক্ষে ভারতে পদার্পণ করিয়া অনুরক্ত ভক্ত ভারতীয় প্রজামণ্ডলীর প্রতি যে প্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন, তাহা ভারতের ইতিহাসে এবং ভারতবাসীর হৃদয়মধ্যে অমর অক্ষরে লিখিত থাকিবে। হিন্দুশাস্ত্রে আছে, রাজা ঈশ্বরের মূর্ত্তি, সুতরাং ধর্ম্মপ্রাণ রাজভক্ত হিন্দুসন্তান রাজ-প্রসাদকে দেবতার দান-রূপে—ঈশ্বরের মঙ্গলাশীর্ব্বাদ-স্বরূপে নতমস্তকে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। মহনীয়কীর্ত্তি সম্রাট্ মহোদয় চন্দ্রবংশের—তথা মোগলকুলের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ-ধামে ভারতের রাজধানী প্রতিষ্ঠার ভিত্তিস্থাপন করিয়া, উভয়বঙ্গের পুনঃ সম্মিলনের আদেশ করিয়া, শিক্ষাপ্রচার-পুণ্যব্রতে অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়া, মহামহোপাধ্যায় এবং সামসুল-উলেমাগণের বৃত্তিদানবার্ত্তা [illegible] করিয়া, বিশেষ স্থলে "নজরাণা" দিবার প্রথা উঠাইয়া দিয়া, বহু সৌভাগ্যশালী লোককে উপাধিভূষণে ভূষিত করিয়া, ঋণদায়ে কারারুদ্ধ দুর্ভাগাগণের ঋণমোচন ও মুক্তিদানের অনুমতি দিয়া, তথা অপরাধীর দণ্ডহ্রাস ও কতকগুলির মুক্তি দিয়া এবং সর্ব্বোপরি ভারতবাসীর প্রতি তাঁহার করুণহৃদয়ের অসীম স্নেহ ও কৃপার পরিচয়-স্বরূপ ভারতে আগমন করিয়া, ভারতসন্তানগণকে চরিতার্থ করিয়াছেন। ভগবান্ মহানুভব আদর্শ-সম্রাট্ মহোদয়কে এবং সম্রাটমহিষী মহিমান্বিতা মেরী মহোদয়াকে দীর্ঘজীবন দান করুন।

শোকবার্ত্তা। সংসারে পাশাপাশি সুখ-দুঃখের রাজত্ব, ইহাই সংসারের বিশেষত্ব। একদিকে সম্রাটের আগমনে যেমন আমরা আনন্দিত, তেমনি নেপালাধিপতির লোকান্তর-গমনে আমরা দুঃখিত। দুঃখ শিক্ষার স্থল, এও তাঁহার অন্যতম কৃপা। ভগবানের ইচ্ছার জয় হউক্।

কাশীলাভ। বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্মার্ত্ত নানাশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বহু শাস্ত্রগ্রন্থের টীকাকার পূজ্যপাদ পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহোদয় বিগত ২৮শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ৺কাশীলাভ করিয়াছেন। পণ্ডিত সমাজে ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের শূন্য আসনে কে বসিবেন জানিনা, তবে আমরা ইহা জানি, যে, সে আসন অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় প্রতিষ্ঠিত।

যুক্তবঙ্গ হিন্দুশিক্ষাসম্মিলন ও কমিশন। আগামী শীতঋতুর অবসানে কলিকাতায় এই সম্মিলন ও কমিশন বসিবে। আমরা ইহার অনুষ্ঠান পত্র পাইলাম। হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে প্রকৃতভাবে চেষ্টা করাই এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য। হিন্দুসমাজের সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়া, হিন্দুসমাজে শিক্ষাবিস্তার ও সমাজের সর্ব্বসম্প্রদায়ের

উন্নয়নকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া সম্মিলিত-চেষ্টা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে যে যথেষ্ট সুফল-লাভের আশা আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুজাতির মধ্যে বহুসম্প্রদায় স্বতন্ত্রভাবে স্বীয় স্বীয় উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। এই সকলের এক কেন্দ্রীকরণ ব্যতীত পরস্পরের সাহায্য ও বলবুদ্ধির সুগম উপায় নাই। এক সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও সামঞ্জস্যের মন্ত্র লইয়া, একক্ষেত্রে উপনীত হইলেই সকলের মঙ্গল হইবে, নচেৎ ভেদ-ভাব তীব্রতা লাভ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আশাকরি, সকল সম্প্রদায় এই হিন্দুশিক্ষা-সম্মিলনে স্বীয় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন। সম্মিলনের কর্তৃপক্ষ আশা করেন, জমিদার সম্প্রদায়, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ, শিক্ষিতবর্গ ও জনসাধারণ এই চারি শ্রেণীর প্রতিনিধি পাইবেন বস্তুতঃ এই কয় সম্প্রদায় না মিলিলেও জাতির ভদ্রস্থতা নাই। সম্মিলনের উদ্যোক্তৃগণ দেশমান্য মনীষী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শরদিন্দু-নারায়ণরায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ইহার উদ্যোগী। আমরা সম্মিলনে সুফলের আশাকরি।

যশোহরে দরবার উৎসব।—যশোহরে মহামহিম সম্রাটের অভিষেক-দরবার-উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্নহইয়া-গিয়াছে। এই উপলক্ষে যশোহরে ১৫ দিন ব্যাপী প্রদর্শনী বসিয়াছিল। থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদ প্রচুর পরিমাণেই হইয়াছে। ছাত্রভোজন, দরিদ্র-ভোজন, আলোকসজ্জা, আতসবাজী কিছুরই ত্রুটী হয় নাই। দরবার-উৎসব-কামটির সুযোগ্য সম্পাদকদ্বয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত বাবু সুশীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং উকীল, শ্রীযুক্ত কেশবলাল রায় চৌধুরী অক্লান্ত শ্রমে সকল কার্য্যের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সর্ব্বাধ্যক্ষ মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বাহাদুরও এজন্য বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। সুব্যবস্থা ও সৌষ্ঠব-সম্পাদনের জন্য ইঁহারা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র আমরা সংক্ষেপে দরবার-দিবসের কার্য্যাবলীর উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমে প্রত্যূষে কালেক্টরীর সম্মুখে পুলিশের প্যারেড্। ঐ সময় বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও রাজকর্ম্মচারিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ইহার পরে জেলে 'কয়েদীমিলন' হয়। মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুরের ইচ্ছাক্রমে সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার, রায় বাহাদুর কালিকাচরণ দত্ত, বাবু বিজয়গোপাল বসু উকীল, ডাঃ মেজর ম্যাগগিল কাইট এম্ ডি মহাশয় ও অন্যান্য ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যশোহর জেলের ৫০ জন অপরাধী কারাবাস হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। কতকগুলি অপরাধীর কারাবাসকাল বার্ষিক ১ মাস হিসাবে কমিয়া গিয়াছে। যাহাদের কারাবাসকাল হ্রাস পাইয়াছে তাহাদের মধ্যে কতকগুলির দণ্ডকাল ৫ দিন কমিয়া গিয়াছে। কারামোচন উপলক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে, রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার কয়েদীদিগকে লক্ষ্য করিয়া এক বক্তৃতা করেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ—"রাজা প্রজার পিতৃস্থানীয়, সকল প্রজাই তাঁহার পুত্রস্বরূপ। পিতা যেমন অপরাধী পুত্রের মঙ্গলার্থে তাহার দোষ-সংশোধনের আশায় দণ্ডদান করেন, রাজাও সেইরূপ আমাদের হিতের জন্যই দণ্ড-ব্যবস্থা করিয়াছেন। আবার পিতা যেমন সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রের দণ্ড হ্রাস করেন বা ক্ষমা করেন, রাজাও অভিষেক-ব্যাপারে প্রজাপ্রীতির পরিচয় জানাইবার জন্য, কতক অপরাধী প্রজার দণ্ড হ্রাস, কতকগুলিকে বা ক্ষমা করিয়াই নিষ্কৃতি দিতেছেন।

প্রজা পাপ না করে, সংযত শান্ত হয়, ইহাই রাজার ইচ্ছা, ইহাতেই রাজার আনন্দ। রাজা তোমাদিগকে কৃপা করিয়া মুক্তিদান করিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা, তোমরা আর কুকর্ম্ম করিও না; অপরকেও কুকর্ম্ম করিতে নিষেধ করিও। রাজার প্রতি ভক্তি করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু মনে রাখিও, রাজার প্রতি ভক্তি করিতে হইলে তাঁহার বিধান পালন করিতে হয়। তাহা হইলে আর পাপ বা কুকর্ম্ম করা যায় না। আশা করি, তোমরা রাজার অনুগ্রহ স্মরণ রাখিবে, আর পাপ করিবে না ইত্যাদি।"

ইহার পর বেলা ৯॥০ টার সময় কালেক্টরী কাছারি হইতে বিরাট্ শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বহুক্ষণ পরে পুনরায় সেই স্থানেই প্রত্যাগত হয়। শোভাযাত্রার প্রথমে গো শকটের উপর দেশীয় বাদ্যভাণ্ড, তৎপরে ৩টী হস্তী, ১ম হস্তীর আরোহী স্বয়ং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর, ২য় হস্তীতে এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর, ৩য় হস্তীপৃষ্ঠে রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর। হস্তীযাত্রার পশ্চাৎ জেলাস্কুল, সম্মিলনীস্কুল ও অন্যান্য স্কুলের ছাত্রবৃন্দ পতাকাহস্তে গমন করিতে থাকে। তৎপশ্চাতে পদব্রজে নাগরিকবৃন্দ, তৎপশ্চাতে অশ্বশকটে সম্ভ্রান্ত ভদ্রবৃন্দ গমন করিতেছিলেন। শোভাযাত্রা যখন রেলষ্টেশনের সমীপে উপস্থিত হয়, তখন ট্রেণের হুইশেল্ শুনিয়া এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত লোভিয়ান্ মহোদয়ের হস্তীটী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে; হস্তী জঙ্গলে প্রবেশ করে। শ্রীযুক্ত লোভিয়ান্ মহাশয় সাহসসহকারে হস্তীপৃষ্ঠ হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া আত্মরক্ষা করেন। রায় বাহাদুর যে হস্তীতে ছিলেন, সেটীও চঞ্চল হইয়াছিল, কিন্তু অচিরেই শান্তভাব ধারণ করে। শোভাযাত্রা ফিরিয়া আসিলে, পরে, বেলা ১২ টার সময় পত্রপুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত তোরণালঙ্কৃত মনোরম দরবার-মণ্ডপে নিমন্ত্রিত রাজা,জমিদার,উকীল, মোক্তার,রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন। প্রথম ১০১ তোপধ্বনি হইয়া দরবার আরম্ভ হয়। দরবারের সভাপতি সুযোগ্য ডিষ্ট্রীক্ট জজ মিঃ লিডেল মহোদয় রাজকীয় ঘোষণাপত্র পাঠ করেন, পরে 'সার্টিফিকেট্ অব অনার' বিতরিত হয়। বাবু নগেন্দ্রনাথ সেন জমিদার কালিয়া যশোহর, রেবতীকান্ত সরকার উকীল মাগুরা, বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল বনগ্রাম, মহাশয়গণ রাজভক্তি ও সাধারণ-হিতকর কার্য্যের জন্য 'সার্টিফিকেট্ অব অনার' লাভ করেন। পরে সভাপতি মহোদয়ের আদেশক্রমে রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার ছাত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া যে উপদেশ দেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে—'ছাত্রজীবনের মূল্য অনেক অধিক। আ'জ যে ছাত্র, কা'ল সে অধ্যাপক হইবে। আ'জ শিক্ষা করিতেছে, কা'ল শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইবে। সুতরাং সমাজের ভবিষ্যৎ মঙ্গল প্রধানতঃ ছাত্রদিগের হস্তেই ন্যস্ত। সেই জন্য ছাত্রগণকে কয়টী কথা বলিতে চাই। আ'জ ভারতের শুভদিন আজ মহামহিম ভারতসম্রাট্ তাঁহার মঙ্গলাভিষেক ঘোষণা করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়া, ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর প্রতি যে প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভারতবাসী আর কখনও অনুভব করে নাই। এ উপলক্ষে ভারতবাসীর স্বাভাবিক রাজভক্তি স্বতই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ইহার উচ্ছ্বাস স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন। কারণ রাজভক্তিই প্রজার মঙ্গলের নিদান। রাজভক্তি তোষামোদ নহে, ইহা মনে রাখা উচিত। রাজকর্ম্মচারী বা রাজার তোষামোদ করা রাজভক্তি হইতে স্বতন্ত্র বস্তু। আপানে 'রাজভক্তি' বলিলে মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণসমূহ বুঝায়। দেশের ও দশের মঙ্গলকর কার্য্য করিলেই রাজভক্তির ভিত্তি দৃঢ় হয়। সুতরাং যাহাতে রাজাপ্রজা উভয়ের কল্যাণ হয়, তদ্রূপ দেশ-হিতকর জন-হিতকর

কার্য্য করাই প্রকৃত রাজভক্তির উৎস। রাজপ্রিয়কার্য্য দেশের হিতকরই হইয়া থাকে। কোনও রাজা প্রজার অকল্যাণ চাহেন না। সকল পিতা ইচ্ছা করেন, পুত্র কুশলে থাকে। ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যত্ন করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য জগতে কোনও গবর্ণমেণ্ট দোষশূন্য নয়, বৃটিশগবর্ণমেণ্টেরও দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু বৃটিশগবর্ণমেণ্ট যে আমাদের অশেষ কল্যাণের নিদান, এসম্বন্ধে যে সন্দেহ করে, সে নিশ্চয়ই মূঢ়। সৎকর্ম্মদ্বারা জীবন পুণ্যময় করিতে সকলেরই অগ্রসর হওয়া উচিত। রাজভক্তি, ঈশ্বরভক্তি ও দেশভক্তিতে বিরোধ নাই, বরঞ্চ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, ইহা মনে রাখিয়াই রাজভক্তির স্থায়িত্ব সাধনে বদ্ধপরিকর হওয়া কর্ত্তব্য। দেশের উন্নতি উহার উপরই নির্ভর করিতেছে ইত্যাদি।' এই প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর যদুনাথ প্রস্তাব করেন যে, 'এই অভিষেক স্মরণার্থ যশোহরে স্থায়ী কার্য্য করা দরকার। যশোহরের শ্রেষ্ঠশত্রু ম্যালেরিয়া,—ইহার কৃপায় যশোহর প্রায় শ্মশানে পরিণত। অতএব এই শুভ সংযোগে আমি 'করোনেশন এণ্টিম্যালেরিয়া সোসাইটী' স্থাপনের প্রস্তাব করি। রায় বাহাদুর রাধিকাচরণ দত্ত এই প্রস্তাবে অনুমোদন করেন। সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব আদৃত হয়। রায় বাহাদুর যদুনাথ এই সমিতিতে ১০০ টাকা দান করেন। পরে প্রসিদ্ধ কলাবিৎ শ্রীযুক্ত মহব আহম্মদ খাঁ, রায় বাহাদুর যদুনাথবিরচিত রাজভক্তি-গীতি গান করেন। গানটী এই—

ধ্রুবপদ।
রাগিণী—তিলক-কামোদ
ঝাঁপ তাল।

জয় জয় জর্জ্জ রাজ-রাজেশ্বর।
জয় জয় মেরী রাজরাজেশ্বরী॥
শুভদিন আ'জ ভারতবরষে।
তুঁহা আগমনে সকলে হরষে॥
জয় জয় জর্জ্জ রাজরাজেশ্বর।
জয় জয় মেরী রাজ রাজেশ্বরী॥
হিন্দু ইসলাম বৌদ্ধ বা খৃষ্টান
করে সমস্বরে সবে গুণ গান॥
দীন যদুনাথ করয়ে মিনতি।
জগদীশ রক্ষ নৃপতি-দম্পতি॥
জয় জয় জর্জ্জ রাজরাজেশ্বর।
জয় জয় মেরী রাজরাজেশ্বরী॥

গানের পর বীণাবাদন হয়। তৎপরে পান আতর বিতরণ হইয়া দরবার ভঙ্গ হয়।

বেলা ২ টার সময় সম্মিলনীস্কুল ও জেলাস্কুলে ছাত্রভোজন সম্পন্ন হয়। ছাত্রগণ ফল ও মিষ্টান্নে পরিতৃপ্ত হইয়াছিল।

৩ টার সময় কাঙ্গালি ভোজন। ১২০০ কাঙ্গালী। চিঁড়েমুড়ি প্রভৃতি এবং নগদ ৵৹ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্য হইতে বৃদ্ধ ও আতুর ২ শত কাঙ্গালীকে শ্রীধরপুরের বাবু ভুবনমোহন বসু বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন, তিনি ধন্যবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই।

সন্ধ্যার সময় আপিষ, আদালত, বাজার ও গৃহস্থের গৃহসমূহ আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়াছিল এবং সন্ধ্যার পর আতসবাজী পোড়ান হইয়াছিল। অনুষ্ঠানের সকল অঙ্গই সুন্দর হইয়াছিল।

আনন্দ। আমাদের অনেক হিতৈষী বন্ধু, সুহৃদয় স্বজন ও মাননীয় পূজনীয় মহাত্মা এবার রাজকৃপালাভ করিয়াছেন, আমাদের হৃদয়ে ইহাতে আনন্দের সীমা নাই। এজন্য আমরা বিশেষভাবে সম্রাট্ মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ। মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, মাননীয় শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল গোস্বামী মহোদয়, পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, তথা পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় প্রভৃতির রাজসম্মানলাভে আমরা শুধু আনন্দিত নই, উপকৃতও হইয়াছি।

শ্রীহরিঃ

(১৮৬৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্টারিকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।



১৮শ বর্ষ, ১৮শ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা। | মাঘ। | ১৩১৮ সাল, ১৮৩৩ শকাব্দাঃ।

নীলাম্বরের কথা।

বর্ত্তমান যুগে বিবিধ যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতির সহিত জ্যোতিঃশাস্ত্রের অভিনব এবং বিস্ময়-জনক আবিষ্ক্রিয়া জগতে প্রচারিত হইলেও সাধারণতঃ লোকের মন এদিকে আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়না; কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আকাশের অপূর্ব্ব এবং অনন্ত সৌন্দর্য্য, নগরবাসী সভ্যতাভিমানী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অপেক্ষা, পল্লিবাসী জনগণের নিকট অধিক-তর আদরণীয়; কারণ তাঁহারা দৈনন্দিন কার্য্যাবসানে সন্ধ্যার পর নক্ষত্রখচিত নির্ম্মল আকাশতলে প্রশান্ত হৃদয়ে উপবেশন পূর্ব্বক শ্রান্তি-অপনোদনের অবসর পান। কর্ম্ম-কোলাহলময় নগরে ঘনসন্নিবিষ্ট অট্টালিকার অধিবাসীগণের ভাগ্যে এরূপ সুযোগ প্রায়ই ঘটেনা। বিশেষতঃ আজকালকার নগরের আকাশ, সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই এরূপ ধূম-সমাকীর্ণ হইয়া পড়ে, যে, আকাশের নির্ম্মলতা, বিনা মেঘেও প্রচ্ছন্ন থাকে। এতদ্ব্যতীত অত্যুজ্জ্বল আলোকের জ্যোতিতে আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ ও গ্রহগণ—এমন কি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নক্ষত্র লুব্ধক, এবং শুকতারাও নিষ্প্রভ বলিয়া বোধ হয়। কলিকাতা মহানগরীর "হ্যারিসন রোড" নামক রাজপথে যখন বৈদ্যু-তিক আলোক ছিল, সেই সময়ে একদা ভ্রমণ করিতে করিতে পূর্ব্বগগন প্রান্তে উদিত চন্দ্রকে দেখিয়া বৈদ্যুতিক আলোক বলিয়া আমার ভ্রম হইয়াছিল। "ষ্টার থিয়ে-টারের" আলোক সম্ভারের মিটিমিটি প্রজ্জ্বলন্, নভোমণ্ডলের নক্ষত্ররাজির উজ্জ্বলতা এবং বিচিত্র ছায়াপথের রমণীয়তা হইতেও যেন আমাদের মনকে অধিকতর বিমোহিত করে। ইহাও সত্য যে, নাট্যশালার অভিনয় দর্শন, প্রণয়িনীর প্রেমসম্ভাষণ অথবা দুগ্ধফেন-নিভ শয্যায় শয়ন এবং সন্তাপনাশিনী নিদ্রাদেবীর ক্রোড় হইতে বঞ্চিত হইয়া, কঠোর এবং দুর্ব্বোধ্য জ্যোতিঃ শাস্ত্রের আলো-চনার জন্য উন্মুক্ত আকাশতলে ঊর্দ্ধমুখে বসিয়া থাকিতে কে চায়? কিন্তু যাঁহারা অনন্ত

আকাশে অনন্তদেবের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাইয়াছেন, বিশ্বপতির বিশ্বরচনার বিচিত্র কৌশল দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়াছেন, যাঁহারা মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহে পৃথিবীর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর জীবের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য, মঙ্গল গ্রহ হইতে মানুষ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া প্রচার করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, * যাঁহারা বিচিত্র মূর্ত্তি শনৈশ্চরের নদ-নদীতে চন্দ্রমার স্রোত প্রবাহিত দেখিতে পান এবং সেদেশের অধিবাসীগণকে অমর বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ক্ষণস্থায়ী আমোদ এবং সাময়িক সুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া, নৈশাকাশতলে উর্দ্ধমুখে উপবেশন করিয়া শনৈশ্চর ও মঙ্গলের বক্রগতি দর্শন করিতে ভাল বাসেন। তাঁহারা নাটকাভিনয়-দর্শন পরিত্যাগ করিয়া, বৃহস্পতির উপগ্রহগুলির 'লুকোচুরি' খেলা দেখিয়া অধিকতর আমোদ অনুভব করেন এবং নীহারিকার অন্তস্থলে নূতন জগতের সংগঠন ও ধ্বংশ দেখিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হন। বাস্তবিক অগণিত জন-সমাজের উপেক্ষিত নীলাম্বর এই শ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোকের নিকট বিচিত্র সৌন্দর্য্য ও অনন্ত প্রেমের আকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

সম্প্রতি বৃহৎ দুরবীক্ষণ যন্ত্রযোগে চন্দ্রবিম্বে—প্রস্তরে, বালুকায়, আগ্নেয়গিরির গভীর গহ্বরে, স্বর্ণকিরীট-শীর্ষ গিরিবরের পাদদেশে রৌদ্র ও ছায়ার যে রমণীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছি, লেখনী, তাহা বর্ণনা করিতে অসমর্থ। যে শুকতারা কস্তারাশিতে অতি বৃহৎ এবং অত্যুজ্জ্বল হইলেও জ্যোতিঃস্ফুলিঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় নাই, দুরবীক্ষণে উহাকে পঞ্চমীর চন্দ্রকলার ন্যায় দেখিতে পাওয়া যাইত। দুরবীক্ষণে শুকতারার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতে 'চন্দ্র' বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। *

আচার্য্য বিকর্ষন (A. W.Bickerton) বলিয়াছেন "যদি আমরা সময়কে এত অতিক্রুত অতিক্রম করাইতে পারিতাম যে, আমাদের মনশ্চক্ষে শতাব্দীগুলি 'সেকেণ্ডের' ন্যায় প্রতীয়মান হইত, তাহা হইলে আমরা সুপ্রসারিত ছায়াপথকে ক্ষুদ্র জ্যোতিশ্চক্রের সদৃশ এবং অগণিত নক্ষত্রপরিপূর্ণ নভোমণ্ডলকে মধুমক্ষিকার 'ঝাঁকের' ন্যায় দেখিতে পাইতাম।" আমাদের সূর্য্য, সচন্দ্র পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ এবং উপগ্রহগণকে লইয়া কোন এক অলক্ষ্য শক্তির দিকে নিয়ত ছুটিয়া চলিয়াছে, এবং কতকগুলি নক্ষত্রপুঞ্জ আমাদের নিকট হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে, তাহাই লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য বিকর্ষন এই কথা বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দূরবর্ত্তী নক্ষত্র-পুঞ্জ-গুলি দুরবীক্ষণে দেখিলে এবং তাহাদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, বেশ বুঝা যায় যে, তাহারা কালবশে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। মৃগশিরা, কৃত্তিকা, পুষ্যা, শতভিষা, ধনিষ্ঠা প্রভৃতি অনেকগুলি নক্ষত্র এইরূপে আমাদের দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া যাইতেছে।

* সম্প্রতি আমেরিকায় এইরূপ একটী অভিনব সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল।

* বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাধ্যাপক সুযোগ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় দুরবীক্ষণে আকাশ পর্য্যবেক্ষণ জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে আমাদের সহিত সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

বৈদিক যুগের ঋষিগণ যখন শতভিষা নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখন উহাতে একশত নক্ষত্র দিব্য-দৃষ্টিগোচর হইত, এবং বর্ত্তমান কৃত্তিকা নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল দেখাইত, কিন্তু এক্ষণে শতভিষা নক্ষত্র এতদূরে চলিয়া গিয়াছে যে, অতিক্ষুদ্র এবং অস্পষ্ট দৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে। শক্তিশালী দূরবীক্ষণে উহাতে এখনও অনেক গুলি নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পুষ্যা-নক্ষত্রের অবস্থাও ঠিক্ এইরূপ। আধুনিক জ্যোতির্বিদগণ বলেন—কৃত্তিকা ও মৃগশিরা-নক্ষত্রের অবস্থাও কালে পুষ্যা ও শতভিষার ন্যায় হইবে।

নক্ষত্রপুঞ্জের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য।

চন্দ্রালোকহীন নীলাম্বরের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলে অত্যুজ্জ্বল হীরক খণ্ডের ন্যায় যে সকল নক্ষত্ররাজি আমাদের নয়ন-পথে পতিত হয়, একটু মনোযোগের সহিত দেখিলে উহাদের বর্ণের পার্থক্য স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। উহাদের কোনটী নীলমণির ন্যায় আভাবিশিষ্ট, কোনটী গাঢ় সবুজ বর্ণের, কোনটী রক্তিমাভ এবং কোনটী বা ধূসর বর্ণের, কিন্তু অধিকাংশই কুন্দকুসুমের ন্যায় শুভ্রবর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণমেরুকে—ধ্রুবকে—কেন্দ্র করিয়া ত্রিশঙ্কু (creek or southern cross) নামে যে নক্ষত্ররাশি ভ্রমণ করিতেছে, তাহার চারিটী তারাই বিভিন্ন-বর্ণের। একটী শ্বেত, একটী রক্তবর্ণের, একটী নীল ও অপরটী সবুজবর্ণের। আবার উহাদের বিপরীত দিকে অবস্থিত চঞ্চুভৃৎ (Toucan) রাশির প্রধান তারা তিনটীই দিব্য গোলাপী আভা-বিশিষ্ট।

ত্রিশঙ্কু রাশি—বৈশাখ মাসে সন্ধ্যার পর দক্ষিণ-ধ্রুবের সহিত লম্বভাবে অবস্থিত হয়। চারিটী প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্রে ত্রিশঙ্কুমণ্ডল রচিত। বৈশাখ মাসে সন্ধ্যার পর সুবিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে দক্ষিণ মুখে দণ্ডায়মান হইলে ক্ষিতিজের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে দর্শক উহাকে ⁂ এইরূপ আকারে দেখিতে পাইবেন। ত্রিশঙ্কুর নয়ন মনোরঞ্জন দৃশ্য সকলকেই বিমোহিত করে। অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে এবং পৌষ মাসের প্রথমভাগে ত্রিশঙ্কু রাশি সূর্য্যোদয়ের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায়। চঞ্চুভৃৎ রাশি ত্রিশঙ্কুর ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত। যখন ত্রিশঙ্কু ক্ষিতিজের নিম্নে থাকে, সেই সময়ে চঞ্চুভৃৎ দর্শকের নয়ন পথে পতিত হইবে। আশ্বিন মাসে সন্ধ্যার পর এবং আষাঢ় মাসে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে চঞ্চুভৃৎ রাশি দেখিবার সুযোগ ঘটে।

বিবিধ বর্ণের নক্ষত্র।

আজকাল নভোমণ্ডলের 'ফটো' চিত্র গ্রহণ করিয়া, এক একটী নক্ষত্রপুঞ্জে কত নক্ষত্র আছে, তাহাও গণনা করা হইতেছে। এক একটী নক্ষত্রপুঞ্জে শত সহস্র নক্ষত্র বিদ্যমান আছে। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রের প্রত্যেকেই এক একটী সূর্য্য-স্বরূপ। সম্ভবতঃ আমাদের সূর্য্যের ন্যায় উহাদেরও নিজ নিজ পরিবার আছে। বিশ্বরচয়িতা এই অগণিত সৌর পরিবার-গুলিকে কি অপূর্ব্ব কৌশলে নভোমণ্ডলে সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহার বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়।

উহাদের একটী উপগ্রহের রমণীয়তা ও বিধি-বৈচিত্রের সহিত আমাদের পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের তুলনাই হয় না। তার পর বিভিন্ন বর্ণের নক্ষত্রের মধ্যবর্ত্তী আকাশেরই বা কি কমনীয় শোভা! একদিকে মরকত-দ্যুতি এবং পদ্মরাগ জ্যোতিঃ উহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করে; অপরদিকে পীতবর্ণের আভা ও নীলাভা পরস্পরের জ্যোতিকে ম্লান করে! কোন পৃথিবীর অধিবাসীগণ মরকত এবং পীতবর্ণের যুগল সূর্য্যের কিরণ-সম্পাতে উদ্ভাসিত হয়, তাহাদের চারিদিকের দৃশ্যাবলী ও বস্তুর ছায়া সর্ব্বদাই দুই বর্ণে রঞ্জিত থাকে। এই সকল অত্যাশ্চর্য্য বিষয়ের বর্ণনা করা আমাদের অসাধ্য। এমন কি আছে, যাহা বিশ্ব-রচয়িতার সৃষ্টিরহস্য উদ্ভেদ করিতে পারে? এমন কে আছেন, যিনি মহিমময়ের মহিমা বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন? পাঠকগণ! আপনারা এই সকল অপার্থিব ব্যাপারের কল্পনা করিয়া বিশ্বরূপের মহিমা-কীর্ত্তনে জীবন ধন্য করুন।

আমরা আকাশে যে সকল বর্ণবিশিষ্ট নক্ষত্র দেখিতে পাই, উহাদের আকাশ এক প্রকার বাষ্পে আচ্ছন্ন থাকে। ঐ বাষ্প নক্ষত্র হইতে বিক্ষিপ্ত আলোকের কোন কোন বর্ণ অপহরণ করিয়া লয়, সুতরাং ঐ নক্ষত্রের যে আলোক আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে সপ্ত বর্ণের মধ্যে কোন কোন বর্ণের অভাব থাকায় আমাদের নয়নে শ্বেতবর্ণের পরিবর্ত্তে কোন বিশেষ বর্ণে প্রতিভাত হয়। প্রত্যেক জ্যোতিষ্কের কিরণে লাল, নীল, ধূমল হরিত, পীত, রক্তিম, ও শ্যাম (Red, Indigo, Violet, Green, Yellow, Orange and Blue) এই সপ্তবর্ণ বিদ্যমান আছে। ইহাদের সংমিশ্রণে উৎপন্ন বর্ণ শুভ্র প্রত্যক্ষ-গোচর হয়। বর্ণচ্ছত্র-বিশ্লেষক যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে বকমুখ নামক যুগল তারাটীর প্রধান তারার বাস্পবর্ণে নীল ও ধূমল বর্ণের অভাব, তজ্জন্য ঐ তারাটী অপর পঞ্চবর্ণের সংমিশ্রণে উৎপন্ন বর্ণের অর্থাৎ রক্তিমের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। আর উহার সহচর টীর বর্ণচ্ছত্রে লোহিত ও রক্তিমের অভাব থাকায়, নীল বর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। যুগল নক্ষত্রগুলির মধ্যে উজ্জ্বলতম তারাটী সাধারণতঃ লোহিত, রক্তিম কিম্বা পীতবর্ণের এবং অপরটী হরিত, নীল কিম্বা ধূমল বর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়।

১। ভূতেশ-মণ্ডলের ১ম তারা নিষ্ঠ্য বা স্বাতি নক্ষত্র (Arcturus)।

শুনী মণ্ডলস্থ ১ম তারা প্রভাষ বা পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের দক্ষিণ তারা (Procyon)।

মিথুন-রাশিস্থ ১ম তারা সোমতারা বা পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের উত্তর তারা (Polux)।

ইহারা সকলেই হরিদ্বর্ণ।

২। বৃশ্চিক রাশিস্থ ১ম তারা পারিজাত বা জ্যেষ্ঠানক্ষত্র (Antares)।

বৃষরাশিস্থ ১ম তারা হলবীর্ণ বা রোহিণী-নক্ষত্র (Aldebaran)।

কালপুরুষ-মণ্ডলস্থ ২য় তারা বিশাখ বা আর্দ্রানক্ষত্র (Betelgeux)।

মেষ-রাশিস্থ প্রথম তারা অমল বা অশ্বিনী-নক্ষত্র (Hammal)।

হরকুলেশ মণ্ডলের ৩য় তারা (Ras-Algethi)।

পক্ষিরাজ মণ্ডলের ৩য় তারা পূর্ব্বভাদ্র-পদ নক্ষত্র (Scheat)।

তিমি-মণ্ডলের ১ম তারা মীর (Mira)।

ইহারা রক্তবর্ণ।

৩। বীণামণ্ডলস্থ ১ম তারা নীলমণি বা অভিজিৎ নক্ষত্র (Vega)।

গরুড়-মণ্ডলস্থ ১ম তারা বাসুদেব বা শ্রবণা নক্ষত্র (Altair)।

ইহারা ঈষৎ নীলবর্ণ।

৪। ব্রহ্ম মণ্ডলের ১ম তারা ব্রহ্মহৃদ্ (Capella)।

মৃগব্যাধ-মণ্ডলের প্রথম তারা লুব্ধক বা প্রাচীন আর্দ্রা নক্ষত্র (Sirius)।

ইহারা অত্যুজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের।

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র।

বিদেশে বাঙ্গালী।

ইতিহাস, জাতীয় উন্নতি ও অবনতির মুখপত্র, কিন্তু সেই মুখপত্র কলুষিত হইলে, কেবলমাত্র অপাস্তর, অতিরঞ্জিত বচনে পূর্ণ হইলে তাহা—মুখপত্র হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়ে। আমরা কষ্টসাধ্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ বলিয়া ঐতিহাসিক গবেষণার আস্বাদ গ্রহণে সমর্থ হই না। ঐতিহাসিক ঘটনা বিচিত্রতা-ময়ী। তাহার আলোচনা একান্ত কর্ত্তব্য। অদ্য আমরা পাঠক-গণের অবগতির জন্য একটি বাঙ্গালী-জীবনী প্রকটিত করিব।

গজনী-অধিপতি সুলতান মামুদ ১০২৬ খ্রীঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তদীয় সন্তানগণ রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। একথা ভারতের ইতিহাস-পাঠক পাত্রেই অবগত আছেন। মামুদ সুলতান মামুদের বংশধর, সে কথাও তাঁহারা অবিদিত নহেন। মামুদের রাজত্বকালে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তন্মধ্য হইতে কতি-পয় বিবরণ অদ্য আমরা এস্থলে লিপিবদ্ধ করিব। বাঙ্গালীদের তিলকের কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। ইঁনিই আমা-দের আলোচ্য বিষয়। নরসুন্দর কুল রবি তিলক জয়সেনের পুত্র ছিলেন। কোন সময়ে এবং কোনগ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। তিনি এতাদৃশ সুপুরুষ ছিলেন যে, তাঁহার সুঠাম আকৃতি ও বদনমণ্ডল দর্শন করিলে লোকে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িত। তিলকের বাগ্মিতায় সকলে স্তম্ভিত হইত। তাঁহার হস্তাক্ষর সুন্দর ছিল; ইহা হিন্দী ও পারশীতে। তাঁহাকে পশ্চিমদেশে থাকিতে হইত বলিয়া উহা যেন তাঁহার মাতৃভাষার ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। তিনি কি প্রকারে গজনীরাজের অধীনে ভারতীয় সৈন্যের জঙ্গীলাট Commander in chief of all the Indian troops in the service of the Ghazni Vide monarch) হইয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে প্রকাশ করিব।

তিলকের বাল্যকাল ও পাঠ্যাবস্থা—

বাল্যকাল হ'তে তিলক বহুদিন কাশ্মীরে বাস করেন। তাঁহার শিক্ষা তথায়ই পরি-সমাপ্ত হয়। সুতরাং তিনি যে হিন্দী ও পারশী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তিনি কাশ্মীর রাজ্যে

বহুদিন বাস করিয়া তথাকার দোষগুণ সকল আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তথায় আত্ম গোপন Dessimalation), অন্যায় ভালবাসা (Amours.) ও যাদুবিদ্যা শিক্ষা করিয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তথা হইতে তিনি কাজি সিরাজবুল হাসনের নিকট গমন করেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিলকের মোহিনীশক্তি যথেষ্টছিল। হাসন সাহেব তাঁহার জালে পড়িলেন। কেবল তিনিই নহেন, কি ধনী কি নির্ধন, কি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, যিনি একবার তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, তিনিই বিমুগ্ধ হইয়াছেন। কাজী তাঁহাকে উচ্চপদ প্রদান করিবেন বলিয়া আশ্বস্ত করিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই করিতেছেন না। তিলক দেখিলেন, ঐরূপভাবে জীবনযাপন করিলে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইবেনা। কাজীও বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি। হঠাৎ কোন কার্য্য করা সহজসাধ্য নহে। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

উন্নতির সূত্রপাত—

পরিশেষে তিলক বিবিধ কৌশলজাল বিস্তার করিয়া, কাজীর নামে খাজা আহাম্মদ হোসেনের নিকট নালিস করিলেন। খাজা আহাম্মদ ও কাজীর মধ্যে বহুদিন হইতে অসদ্ভাব ও দ্বেষাদেষী চলিতেছিল। খাজা কাজীর উপর বিরক্তি ভাব প্রকাশ করতঃ তিলকের নিকট তিনজন পিয়নকে রাজাদেশসহ প্রেরণ করিলেন। তাহারা তিলককে কোর্টে লইয়া আসিল। তাঁহার কি ব্যক্তব্য আছে, তাহা খাজা আহাম্মদ শ্রবণ করিয়া, তদুপায় স্থির করিলেন। তিনি তিলককে আমীর মামুদের নিকট এই বিষয় জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিলক খাজার সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত এইরূপ ভাব আমীর যেন জানিতে পারেন, তাহাও তাঁহাকে বলিয়া দিতে ত্রুটি করিলেন না। আমীর তিলকের অভিযোগ শ্রবণ করিয়া, খাজাকে তাহার বিচার করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। কাজী তখন মহাবিপদে পতিত হইলেন।

এই ঘটনার পরে তিলক, খাজা আহাম্মদের অত্যন্ত বিশ্বাসী হইয়া উঠিলেন খাজা তাঁহাকে সেক্রেটরী ও পারশী ভাষার অনুবাদক বা দোভাষী (Interpreter) নিযুক্ত করিলেন। তিলক হিন্দুগণের কথা শ্রবণ করিয়া, খাজাকে তাহার অনুবাদ করিয়া জ্ঞাপন করিতেন.—ইহাই হইল দোভাষীর কর্ম। আবুল ফজেল ('Bul Fazl) বলেন, "তিলকের এই প্রকারে কোর্টে বা বিচারালয়ে অসীম ক্ষমতা হইয়াছিল। গজনীতে তিনি তাঁহাকে সর্ব্বদা খাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান অবস্থায় দর্শন করিতেন।" "এইরূপে তিনি তথায় অবস্থান করিয়া যুগপৎ সেক্রেটরী ও দোভাষীর কর্ম্ম করিতেন। অপর সময়ে সংবাদাদি আদান-প্রদানের কার্য্য এবং দুরূহ বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়াদিতেন।"

সেই বিচারের ভার যখন খাজার উপর পতিত হইল, আমীর মামুদ তখন তাঁহার কর্ম্মচারী ও সেক্রেটরীগণকে তলব করিলেন। কোর্টের কার্য্য সুচারূপে অনেক সুদক্ষ কর্ম্মচারীর দ্বারা নিষ্পন্ন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সে বিচার শেষ হইয়া গেল। কাজী দোষী সাব্যস্ত হইলেন। তিলক, তখন আমীর

মামুদের কোর্টে সমুপস্থিত হইলেন। তিনি তিলককে বাইরামের সঙ্গে তাঁহার দোভাষীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তিলক অল্প-বয়স্ক সুচতুর বক্তা আমীর মামুদ এই প্রকার লোকই খুঁজিতেছিলেন। এইরূপে তিলকের ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তন হয়।

তিলকের ক্ষমতা—

একদা তিলক গুপ্তভাবে সুলতান্ মামুদের অত্যাবশ্যক ও মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। বাদসাহ যখন অবগত হইলেন, তিলক নামে জনৈক ভারতীয় হিন্দুযুবক তাঁহার এইরূপ মহোপকার সাধন করিয়াছে, তখন তাঁহার কৃপাদৃষ্টি তিলকের উপর পতিত হইল। তিলক সমগ্র হিন্দুকাত্তোর (Kotors) গণকে ও বহির্ভাগের প্রদেশ সমূহের বহু জনগণকে তদীয় করতলগত করিয়াদিলেন। এই সকল কারণে তিনি মামুদের ন্যায় মহৎ লোকের নিকটেও সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার সেনাপতিত্ব—

সুলতান সা মামুদের রাজত্বকালে সুন্দর নামে জনৈক ভারতীয় হিন্দুকে বাল্‌খ প্রদেশের জেনারল বা সেনাপতি পদে নিয়োজিত করা হয়। ইঁহার বিষয় আর অধিক কিছুই অবগত হওয়া যায়না। সাহ মাহমদের হিরাট হইতে বাল্‌খে (Balkh) প্রত্যাবর্ত্তন কালে তথাকার সেনাপতির পদ শূন্য ছিল। তখন সেনাপতি সুন্দর অপরস্থলের সেনাপতির পদে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব তিলককেই সেই-স্থানের সেনাপতি পদে বরণ করা হইল। তাঁহার সম্মানের জন্য সাহমাহমদ একটি স্বর্ণা-লঙ্কৃত পরিচ্ছদ প্রদান করেন। তাঁহার গল-দেশে মণি মুক্তা-খচিত সুবর্ণের হার প্রদত্ত হয় তাঁহার অধীনে একটী সৈন্যদল (Army) থাকিত। তাঁহার ব্যবহারোপযোগী একটি তাঁবু, একটি ছত্র, তাঁহাকে প্রদান করা হয়। তাঁহাকে যে বাসভবন প্রদত্ত হইয়াছিল, তথায় ভেরী (Kettle drums) নিনাদিত হইত। তথায় যাঁহারা হিন্দু-অধিনায়ক হইতেন, তাঁহাদের বাসভবনে ঐ প্রকার বাদ্যাদির ব্যবস্থাছিল। অচিরে তাঁহার বিশাল ভবন স্বর্ণচূড়াবিমণ্ডিত ধ্বজাপতাকাদি দ্বারা শোভিত হইল। এই প্রকারে ক্রমশঃ ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইলেন। তিনি রাজসভায় (privy Councils) সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দের সঙ্গে উপ-বেশন করিবার সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। ঐতি-হাসিক আবুল ফজল বলেন, "তাঁহাকে অধিক কর্ত্তব্যসাধন জন্য নিযুক্ত করা হয়।" তাহা আমরা নিম্নে বিজ্ঞাপন করিতেছি। তিনি নিয়াল্‌টিগিনের বিরুদ্ধে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষরূপে প্রেরিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এইকার্য্যে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী সকল সময়েই সুপ্রসন্না ছিলেন। কোন কার্য্যে তিনি অকৃতকার্য্য হইতেন না। এই প্রকারে তাঁহার জীবন কর্ত্তিত হইয়াছিল। আরবী-ভাষায় একটি প্রবাদ আছে—"প্রতিকার্য্যেরই একটি কারণ আছে, মানুষের তাহা অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য।" তাঁহার জীবনে তাহা পরি-স্ফুট হইয়াছিল। "তবকাত—ঈ—আকবরী" নামক পারশী-গ্রন্থে তিলকের নাম "মালিক-বিন্-জয়সেন" বলিয়া লিখিত আছে। উহাতে তিলকের নাম এবং বংশনাম সংযুক্ত করিয়া, তাহা পুনরায় 'মালিক-বিন' সংমিশ্রণে পারশী-ভাবাক্রান্ত করা হইয়াছে। পরন্তু ঐ উপাধি

গজনীরাজ্য তাঁহাকেই প্রদান করা হইয়াছিল। তিনি মুসলমান-রাজ্যের সেনানায়ক হইলেও হিন্দুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন।

তিনি পূর্ব্বোক্ত আরবী-প্রবাদ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতেন। উহার প্রমাণ তাঁহার জীবনে পরিদৃষ্ট হইত। কোন কার্য্যে হতাশ বা নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নহে। জ্ঞানীগণ সেই জন্য কৃতকার্য্যতা বা অকৃতকার্য্যতার জন্য বিস্মিত হয়েন না। তাঁহারা মনে করেন, কেহই মহৎ হইয়া জন্মপরিগ্রহ করেনা। মানুষকে সাধনায় মহৎ হইতে হয়। পরন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, প্রত্যেকেই যদ্দ্বারা ভবিষ্যতে অব্যাহতবস্থায় সুনাম পরিরক্ষণ করতঃ ধরাধাম ত্যাগ করিতে পারে, তদুপায়-বিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের আলোচ্য বিষয় তিলকও স্বল্পকাল মধ্যে প্রকৃত মনুষ্য পদবাচ্য হইয়া বিবিধগুণে বিভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি যাবৎ জীবিত ছিলেন, কখনও কোন প্রকারে আহত হন নাই। কারণ তিনি অতি সুচতুর ব্যক্তি এবং নরসুন্দর-পুত্র ছিলেন।

একদা সাধাবারা বাগান-বিহারে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি এক সপ্তাহকাল অবস্থিতি করিলেন। আবশ্যক দ্রব্যাদি সকলই সঙ্গে আছে। একদিন তিনি আমোদে মগ্ন আছেন এমন সময়ে আহম্মদ নিয়াল্‌টিগিনের বিরুদ্ধাচরণের সংবাদ আসিল। তাঁহার প্রজাগণ লিখিয়া পাঠাইল "নিয়ালটিগিন তুর্কীগণের সহিত লাহোরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার সহিত বহু দুর্দ্দান্ত লোক যোগ দিয়াছে। দিনে দিনে তাহার দল বাড়িয়া উঠিতেছে। যদ্যপি আপনি অচিরে ইহার প্রতিবিধান না করেন, তবে দেশের অবস্থা অতি ভীষণতর এবং শোচনীয় হইয়া পড়িবে। তাহার প্রতাপ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে।" পত্র-প্রাপ্তি-মাত্র আমীর একটি গুপ্ত পরামর্শসভা (Private Council) আহ্বান করিলেন। তাহাতে জঙ্গীলাট, সেনাপতিগণ, সৈন্যদলের কর্ম্মচারীগণকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। উজীর খাজা আহম্মদ দেশ-দর্শনে বহির্গত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার নাম এই তালিকায় উল্লিখিত হয় নাই। ব্যক্তিবৃন্দ সমবেত হইলে সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা নিয়ালটিগিনের বিদ্রোহাচরণের কথা শ্রবণ করিয়াছ কি?" তাঁহারা সকলে "খোদাবন্দ" বলিয়া স্বীকার করিলে, তিনি বলিলেন, উক্ত "বিপদের কি প্রকারে প্রতিবিধান করা যাইতে পারে, তোমাদের নিকট তদুপায় জিজ্ঞাসা করিতেছি যে প্রকারে হউক, নিয়ালটিগিনকে দমন করিতে হইবে।" তখন জঙ্গীলাট (Commander-in chief) বলিলেন, "আহম্মদের ভয়ে পলায়ন করিলে আমাদের দুর্নাম চারিদিকে ব্যাপৃত হইবে। তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে আর তাহার নিস্তার থাকিবে না। নিয়ালটিগিনের পক্ষে বহু সহস্র সৈন্য আছে। তথাপি সে যদি আমাদের ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে আর তাহার অপমানের শেষ থাকিবে না। যদ্যপি জাঁহাপনা আমাকে তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে গ্রীষ্মাধিক্য সত্ত্বেও আমি তথায় গমন করিতে প্রস্তুত আছি। আমি এক সপ্তাহ মধ্যে তথায় যাত্রা করিতে পারি।" আমীর

বলিলেন—"এক্ষণে আপনার তথায় যাওয়া হইতে পারেনা। বিশেষ খোরাসানে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। খাটলান ও তুর্কীস্থানে রাজবিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রীকে তথায় প্রেরণ করিয়াছি। তিনি বিলক্ষণ সুবন্দোবস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। শরৎকাল শেষ হইয়াগেল। আমাকে একবার বাস্ত (Bust) কিম্বা বালখে (Balkh) যাইতে হইবে। আপনাকে সেই সঙ্গে যাইতে হইবে। আমার মনে হয়, আমি অনতিবিলম্বে সিন্ধুদেশে একজন সেনাপতি পাঠাইতে পারিব।' তখন জঙ্গীলাট বলিলেন, 'সে হুকুম খোদাবন্দ প্রদান করিতে পারেন। আমরা এক্ষণে সকলেই হুজুরে হাজির আছি। যাহাকে তথায় যাইতে আদেশ করিবেন সেই তথায় গমন করিতে পারে। তবে সৈনিক-কর্ম্মচারীর মধ্যে ছ, চারিজন এইস্থানে অনুপস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কোর্টের কার্য্যে বিনিযুক্ত। আবশ্যক হইলে তাঁহাদিগকেও এইস্থানে তলব করা যাইতে পারে।" সেইস্থানে যে সকল লোক উপস্থিত ছিলেন, তাহার মধ্য হইতে উপযুক্ত লোকগুলি বিভিন্নদেশে প্রেরণ করা হইতেছে। সুতরাং নিয়ালটিগিণের বিদ্রোহ দমন করিবার লোক আর তথায় রহিল না। বাদসাহ হতাশ্বাস হইতেছিলেন। ইতোমধ্যে তিলক বলিয়া উঠিলেন, "প্রভু দীর্ঘজীবী হউন। প্রভুর আদেশ হইলে আমি তথায় যাইয়া নিয়ালটিগিণ ঘটিত বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করিয়া কৃতার্থ হই এবং খোদাবন্দের উদ্বেগ বিদূরিত করি। অপিচ, আমি হিন্দুস্থানবাসী, আমার পক্ষে ঐ দেশের জলবায়ু অবিরুদ্ধ হইবেনা। আমাদের উহা সহ্য করিবার ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অবস্থান করিতে আমাদের বিন্দুমাত্রও কষ্ট হয় না। আপনি পণ্ডিত, আপনি যদি উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তবে আমি উক্ত কার্য্যসাধনে তৎপর হইতে পারি।" তিনি তাঁহার প্রখর বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, সমবেত সভ্যমণ্ডলীর মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা সকলে একবাক্যে বলিলেন "ইঁনি বিলক্ষণ উপযুক্ত লোক। ইঁনি অনেক বিষয়ে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইঁহার তরবারী, পোষাক পরিচ্ছদ ও সৈন্যাদি সকলই আছে। ইহাও ইঁহার গুণের পরিচায়ক। ইনি আপ্ত অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহার সাফল্য অনিবার্য্য।" আমীর সভা ভঙ্গ করিলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহার বিষয় চিন্তা করিবেন স্থির করিলেন। একদা আমীর তাঁহার গুপ্তসভার সভাগণকে (Private Councillors) বলিলেন, "আমার সভায় সমুপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে কেহই মৎকথিত কষ্টসাধ্য কার্য্য সম্পাদনে ইচ্ছুক নহে, বস্তুতঃ তাহারা কেহই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইতে চাহেনা। আমি পূর্ব্বোক্ত সভায় তাহা জ্ঞাত হইয়াছি। আমার বোধ হয়, তিলক সেই জন্য লজ্জিত হইয়া অসীমসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যুক্ত হইল।" ইহার পর আমীর জনৈক পারস্য ভাষাভিজ্ঞ সেক্রেটরীকে গুপ্তভাবে তিলকের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি তিলকের ব্যবহারে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। উক্ত সেক্রেটরী তিলকের নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন

করিয়া বাদসাহের নিকট আগমন করতঃ সকল সমাচার জ্ঞাপন করিলেন। আমীর সমগ্র বিষয় শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তদনন্তর তিলক বাদসাহের নিকট সমুপস্থিত হইলে বাদসাহ বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আমি তোমার বাক্যে এবং দুরূহ-কার্য্য-সম্পাদনের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছি। পরন্তু আমার পারিষদবর্গ তোমাকে কোন ক্রমেই পছন্দ করেনা। অপিচ, তুমি এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহাদিগের সকলকে বিশেষ অপদস্থ করিয়াছ। এক্ষণে তোমার বাক্য সফল হইলেই মঙ্গল। আমার মনে হয়, তোমার বচনানুরূপ কার্য্য নিশ্চয়ই সুফল প্রসব করিবে। আমি আগামী কল্য তোমার নাম উচ্চসৈনিক কর্ম্মচারীগণের তালিকাভুক্ত করিব। এই বিষয়ে যতদূর সম্ভব আমি সে সকলই সম্পাদন করিব। অর্থাৎ যদ্দ্বারা তুমি ধন, বিপুল সৈন্যাদি ও আবশ্যক দ্রব্য-সম্ভার প্রাপ্ত হইতে পার, আমি তদনুরূপ কার্য্য করিতে সচেষ্ট হইব। আমার উচ্চ-কর্ম্মচারীগণের ধন্যবাদ ব্যতীত তুমি নিশ্চয়ই বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হইবে। তোমাকে আমার ভারতের সমগ্র সৈন্যের জঙ্গীলাটরূপে নিযুক্ত করিলাম। এই উচ্চকার্য্যের অসদ্ব্যবহার করিওনা। আমার তোষামোদপ্রিয় লোক-জন তোমার বা অপর লোকের মঙ্গল দর্শন করিতে পারেনা। আমি অপর কাহারও ভাল করি, তাহাও তাহারা চাহেনা। তাহারা চাহে—আমি তাহাদের অধীন হইয়াই সকল কার্য্য করি। প্রকৃত পক্ষে তাহারা কোন আবশ্যক-কার্য্যই সুসম্পন্ন করিতে পারেনা। তোমার মঙ্গল-সংবাদ শ্রবণ করিলে তাহারা মরমে মরিয়া যাইবে।" এক্ষণে তুমি তোমার কথিত কার্য্য সম্পাদনে উদ্যুক্ত হও এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া কার্য্য কর। তাহারা যে দোষ করিয়াছে, সে কথা তাহাদের বাক্যদ্বারা পরিস্ফুট হইয়াছে।—'ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে' বচনটি প্রমাণিত হইয়াছে। যাহা হউক, যাহা হইয়াগিয়াছে তাহার জন্য আর অনুশোচনার আবশ্যক কি?" আমীর এই প্রকার বহুবিধ বাক্যে তাঁহাকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন। এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়া তিলক নতজানু হইয়া তাঁহার বাক্যের সম্মাননা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "যদ্যপি উক্ত কার্য্য সম্পাদন এ দাসের ক্ষমতাবহির্ভূত হইত, তাহা হইলে সে কখনও বাদসাহ এবং সমবেত সভ্যসজ্জের সম্মুখে এমত সাহসিকতার সহিত বাক্যোচ্চারণ করিত না। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করিব। বাদসাহের অবগতির জন্য আমি শীঘ্রই আমার যুদ্ধযাত্রার একটি নক্শা বাহির করিব। আমি সত্বরই বিদ্রোহী-দলের পরাজয়বার্ত্তা জ্ঞাপন করিব।" পরিশেষে তিলককে উচ্চকার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য যাহাতে লিখিত নামা প্রেরিত হয়, এমত আদেশ প্রদান করিলে, সেক্রেটরী তদনুযায়ী আদেশ সত্বর পালন করিলেন। অচিরে তিলক-প্রদত্ত নক্শার বিশদ বিবরণ বাদসার গোচরীভূত হইল। অতঃপর আমীর তিলকের পক্ষে যাহা যুক্তিযুক্ত হইবে, তদনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করিলেন। অধিকন্তু তিনি তিলকের উপর হিন্দুপ্রজাগণের নিকট হইতে কর-সংগ্রহের ভার ন্যস্ত করিলেন। উহাকে পারশীতে "বাজঘুরক" (Bazghurak) কহে।

তিলক বিপুল সৈন্যসামন্ত লইয়া ভারতবর্ষের

নবনিয়োজিত কার্য্যে চলিয়া আসিলেন। রাজ্যের কর্ম্মনির্ব্বাহক সভার সম্পাদক (Secretary of State) সেই পারসী সেক্রেটরীকে সত্বর তিলকের নিকট 'ফারমান্' ও পত্র প্রেরণ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। বু-নস্তুর সাধারণতঃ সুদীর্ঘ বাক্য-প্রয়োগ করিয়া এবং অলঙ্কারাদির অবতারণা করিয়া, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলিও পরিবর্দ্ধন করতঃ লিখিতে অভ্যস্ত ছিলেন। সকল কার্য্যের ভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় তিনি মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িতেন। যাহা লিখিত হইত, তাহার একটি "খসড়া" প্রস্তুত হইত। কোর্টের মন্ত্রীগণ এই প্রথাকে অত্যন্ত নিন্দা করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, উহা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় বলিতে হইবে। তাঁহারা আরবী-প্রবাদ-বচন উল্লেখ করিয়া বলিতেন, 'লক্ষ্যবিদ্ধকারী ব্যতীত লক্ষ্যবেধ-চেষ্টা, বৃথা-প্রয়াস ভিন্ন অপর কিছুই নহে।" (ইহার সমান একটি সুন্দর প্রবাদ-বচন প্রচলিত আছে, "যার কাজ তার সাজে, অন্য পিঠে লাঠী বাজে।" ইংরাজীতেও আছে "A shot without a shooter.") বাদসাহ তোষামোদ-প্রিয় ছিলেন না। সেই জন্য তিনি কতিপয় কর্ম্মচারীর 'বিষ নজরে' পড়িয়াছিলেন। তিলকের বুদ্ধিগুণে নিয়ালটিগিন নিহত হইয়াছিল। সে সকল কথা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

তিলকের কৃতিত্ব—

এই মাসের মধ্যভাগে অর্থাৎ রমজান হিজীরা ৪২৫ বা জুলাই ১০৩৩ সালে লাহুর (একণে লাহোর, পারসীতে ঐ প্রকার উচ্চারিত হয়) হইতে পত্র আসিল, আহম্মদ নিয়ালটিগিন কতিপয় সৈন্য সহযোগে তথায় পৌঁছিয়াছে। কাজী সিরাজ, সমগ্র লোকজন লইয়া মান্দকাকুর দুর্গে প্রবেশ করিলেন। তখন উভয়দলে ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি সেই যুদ্ধের কোলাহলে ও অস্ত্রশস্ত্রাদির শব্দে কম্পিত এবং বিচলিত হইয়া উঠিল। ইরাক, বা তুর্কীস্থান খোয়ারিজাম এবং লাহোরে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। মঙ্গলবারে ঈদ উৎসব সম্পন্ন হইয়াগেল। আমীর সঙ্গীগণ লইয়া মদ্যপান করিতেছেন। তিনি আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছেন। ইত্যবসরে লাহোর হইতে সংবাদ আসিল, "নিয়ালটিগিন তত্রত্য দুর্গ অধিকার করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে একথা উক্ত আছে যে, তিলক নামে জনৈক হিন্দু কমাণ্ডার চতুর্দ্দিক হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া একটি মহতী সেনার সমাবেশ করিয়াছেন। তিনিও সেই দিকে (লাহোরের দিকে) অগ্রসর হইতেছেন। ইহাতে নিয়ালটিগিনের অন্তর প্রদগ্ধ হইতেছে। এই দুই সৈন্যদলের ব্যবধান দুইক্রোশ মাত্র।" আমীর মত্তাবস্থায় এই জরুরী পত্র পাঠ করিয়া তিলকের নিকট একখানি পত্র লিখিয়া মন্ত্রীকে উহা 'কেসের' মধ্যে রাখিয়া দিতে আদেশ করিলেন। তিনি উক্ত পত্রে লিখিয়া দিলেন "তিলক যেন তাঁহার সমগ্র বল প্রয়োগ পূর্ব্বক আহম্মদকে আক্রমণ করেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি স্বয়ং তাহাতে 'পুনশ্চ' লিখিয়া দিয়া পত্রখানি নিজহস্তে শিলমোহরাঙ্কিত করিলেন। সেই লেখায় ব্যক্তিগত তীব্রতা এবং আদেশ-আমিনের উপকারিতা জ্ঞাপন করিলেন। সুলতান, পূর্ব্বোক্ত পত্রের ভাব

কিন্তু অতি বিশ্বস্ত দেওয়ান্‌কেও জানাইলেন না। পত্রখানি অতি সত্বর প্রেরণ করিলেন। ১৮ই শেওয়াল বৃহস্পতিবার গারগেজ (gurdez) হইতে সংবাদ আসিল, জেনারল গাজীর তথায় মৃত্যু হইয়াছে।

আমীর মামুদ আহাম্মদ নিয়াল্‌টিগীনকে লাহোর হইতে বিতাড়িত করিবার জন্যই তিলককে পুনর্ব্বার পত্রে লিখিয়াছিলেন। কাজী তাহার সৈন্য লইয়া যাহাতে দুর্গ ত্যাগ করিয়া যায়, তাহাও তিনি লিখিয়াছিলেন। এইরূপ করিলে আমীরের অন্তঃকরণ কিঞ্চিৎ চিন্তাশূন্য হইবে, তাহাও বিবৃত করিয়াছিলেন। কিরমাণে যে যুদ্ধ হয় তথায় ২০০০ সহস্র হিন্দু, ১০০০ সহস্র তুর্কী, এবং ১০০০ কার্দ ও আরব সৈন্য ছিল। এইস্থানের হিন্দুগণ চারি মাস ধরিয়া বার্লীর রুটি খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছিল, সেই জন্য তাহার ফল আদৌ সন্তোষজনক হয় নাই। জ্বি—লকা'দার ৭ই তারিখের (হিজীরা ৪২৫, সেপ্টেম্বর ১০৩৪ খ্রীঃ) আমীর টকীনাবাদে পৌঁছিলেন। তিনি বারংবার চিন্তাগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সেই দিন মদ্যপান করিয়া সারাদিন যাপন করিলেন। তথায় তিনি ৭ দিন অবস্থান করেন। তিনি উক্ত মাসের ১৭ই তারিখে বৃহস্পতিবারে তিন দিনের জন্য বাস্তে গমন করেন। তিনি তথায় ডাস্ত-লঙ্গান (Dashtlangan) নামক প্রাসাদে বাস করিতে আরম্ভ করেন। সেই স্থানের উদ্যান, প্রাসাদ এবং সরাইখানার জন্য তিনি বিস্তর অর্থ ব্যয় করেন।

উক্ত মাসের শেষ দিনে যখন তিনি বাস্ত (Bust) হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে তিলকের নিকট হইতে দূতগণ আসিয়া হুজুরে হাজির হইল। তৎ-সংবাদ আমীরের নিকট শুভ। সংবাদটি এইঃ—মদগর্ব্বী, বিদ্রোহী আহম্মদ নিয়াল্‌টিগীনকে হত্যা করা হইয়াছে। তাহার পুত্র ধৃত হইয়াছে। তাহার অনুচর তুর্কীগণ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।" এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমীর উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এখন তিনি কিয়ৎকাল শান্তিতে কালযাপন করিতে পারিবেন। সংবাদ শ্রবণমাত্র তিনি জয়ডঙ্কা ও ক্লেরিফা বাদনের অনুমতি প্রচার করিলেন। দূতগণকে সম্মান-সূচক পরিচ্ছদে বিভূষিত করা হইল। তাহাদিগকে বহু অর্থ প্রদান করিয়া 'কাওরাজ তাঁবু'তে গমন করিতে আদেশ প্রদান করা হইল। অতঃপর তিলক ও কাজী—সিরাজের নিকট হইতে পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। তিলকের পত্রের মর্ম্মানুবাদ আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম।—তিলক লাহোরে উপস্থিত হইয়া কতিপয় মুসলমান্‌কে কারারুদ্ধ করেন। তাহারা মহম্মদের অনুচর। তিনি তাহাদের এমত কঠোর শাস্তি প্রদান করেন যে, আহম্মদের অনুচরবর্গ তদ্দর্শনে অত্যন্ত ভীত এবং সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত দেখিয়া, তাহারা আহম্মদের দল পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইতে লাগিল। তাহার পর হইতে তথায় রাজস্ব আদায় (যাহা পূর্ব্বে সুচারুরূপে হইতেছিল না) বিধিপূর্ব্বক সম্পন্ন হইতে

আরম্ভ হইল। যখন তিলক দেখিলেন, উক্ত দুইটি কার্য্য সুন্দররূপে পরিচালিত হইতে লাগিল, তখন তিনি হিন্দু-সৈন্যগণকেই সর্ব্বস্ব জানিয়া বিপুল অনীকিনী লইয়া নিরাপদে আহম্মদের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। তাঁহার সৈন্যমধ্যে হিন্দুসৈন্যই অধিক ছিল, সে কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

কিয়ৎকাল পর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উহার প্রত্যেকটিতেই ভগবৎ-পরিত্যক্ত আহম্মদ পলায়ন করিতে লাগিল। তিলক পশ্চাদনুসরণে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। অবশেষে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরব্ধ হইল। তাহাতে আহম্মদ স্থির থাকিতে না পারিয়া ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। তাহার তুর্কীসৈন্য একযোগে তাহার পক্ষ ত্যাগ করতঃ তিলকের নিকট আগমন করিয়া আশ্রয়প্রার্থী হইল। তাহাদের অচিরে স্থাননির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইল। এদিকে আহম্মদ সবেমাত্র অনুচরবর্গ সহিত তিনশত অশ্বারোহী লইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। তিলক বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া, বিদ্রোহী জাঠ সৈন্যগণকে লিখিয়া পাঠাইলেন, যদ্যপি তাহারা মঙ্গল প্রার্থনা করে তাহা হইলে, তাহারা যেন বিনাপত্তিতে ভগবদনুগ্রহশূন্য আহম্মদের পক্ষ ত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়। অপিচ, তিনি দেশমধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন, যদ্যপি কেহ আহম্মদ অথবা তাহার পুত্রের মস্তক প্রদান করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে ৫০০,০০০ লক্ষ 'ডারহাম' নামক রৌপ্যমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করা হইবে। 'ডারহাম' (Dirhams) গ্রীশদেশীয় মুদ্রাবিশেষ। উক্ত মুদ্রা তখন গ্রীশ ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে প্রচলিত ছিল। উহার এক একটির মূল্য ৯॥ পেন্সের বা ॥/১০ আনার কিঞ্চিৎ অধিক। উক্ত মুদ্রা প্রাচীন গ্রীশে, তুর্কীস্থানে, আরব ও পারস্য দেশে ব্যবহৃত হয়। এই কথা প্রচারিত হইবামাত্র চারিদিকে লোক ছুটিতে লাগিল। তখন আহম্মদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। জাঠ ও অপরাপর বিদ্রোহীগণ তাহাকে ধরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িল।

একদিন যেমন সে দুইশত অশ্বারোহী লইয়া হস্তী-আরোহণে নদী উত্তীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় দুই, তিন সহস্র অশ্বারোহী জাঠ তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। সে তৎক্ষণাৎ নদীগর্ভে লম্ফ প্রদান করিল। তখন দুই, তিন দিক হইতে জাঠেরা আক্রমণ করিল। তাহাদের (জাঠগণের) এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা মহম্মদের সমগ্র ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া, অবশেষে তাহাকে ধৃত করিবে। কার্য্যতঃ তাহাই হইল। তাহারা যখন তাহার নিকট উপস্থিত হইল, সে তখন তাহার নিজ-হস্তে পুত্রকে হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা করিল। কিন্তু জাঠেরা তাহাকে বাধা প্রদান করিয়া তাহার পুত্রকে ধরিয়া ফেলিল। তাহার পুত্র অপর একটি হস্তিপৃষ্ঠে ছিল। ইত্যবসরে আহম্মদ পলায়ন করিতেছিল, কিন্তু একজন জাঠ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তরবারি চালাইল, অচিরাৎ তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড

হইয়া পড়িল। তাহারা আহম্মদের অনুচরগণের কতিপয় ব্যক্তিকে হত্যা করিল এবং অবশিষ্ট লোকগুলিকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিল। এইস্থানে জাঠেরা বহুধন প্রাপ্ত হইল। জাঠদলপতি তিলকের নিকট আহম্মদ নিয়াল্‌টিগীনের শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদ প্রেরণ করিল। তিনিই তাহাদের নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ প্রভু। তিনি তখন অধিক দূরে ছিলেন না। তিনি উক্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইবার জন্য বাগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সংবাদে তিনি অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। আহম্মদের পুত্র ও তদীয় মস্তক আনয়ন করিবার জন্য তিনি তখন কতিপয় সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর জাঠেরা তাঁহার নিকট পুরস্কারপ্রার্থী হইল। তখন তিলক তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, "তাহারা সেই প্রতিশ্রুত অর্থ প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহারা যে নিয়াল্‌টিগীনের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা তাহাদিগকে রাজকোষ দান করিতে হইবে। যদ্যপি তাহারা সেই অর্থগুলি আইনতঃ রাজকোষে প্রদান করে, তবে তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করিবেন।" জাঠেরা যখন দেখিল, নিয়াল্‌টিগীনের নিকট হইতে যে অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার পরিমাণ যথেষ্ট হইবে। তখন তাহারা পরামর্শ করিয়া বলিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া যাহা প্রদান করিবেন তাহারা তাহাই লইবে। কিন্তু তাহারা লুণ্ঠিত অর্থ প্রত্যর্পণ করিবেনা। তিনি তখন ১০০,০০০ লক্ষ ভারহাম প্রদান করিলেন। তাহারা নিয়াল্‌টিগীন ও তাহার পুত্রের মস্তক তিলকের নিকট প্রদান করিল। তিলক উহা লইয়া লাহোরে গমন করিলেন। তথায় শান্তিরক্ষার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। বন্দোবস্ত শেষ হইলে, তিনি আমীর মামুদের কোর্ট অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আমীর উৎফুল্ল হইয়া তিলককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্ব্বক এক পত্র লিখিলেন। তিনি যে তিলকের পারিষদবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞ, সে কথাও বিজ্ঞাপিত করিলেন। তিলক তখনও কোর্টে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তিনি তিলককে সত্বর আহম্মদ ও তাহার পুত্রের মস্তক লইয়া কোর্টে আসিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। অবাধ্যতার ফল এইরূপই হইয়া থাকে। এই কথা আমীর তাঁহার পারিষদবর্গকে বুঝাইয়া দিলেন। আমীর তখন রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ও উচ্চকর্ম্মচারিগণের নিকট এই মহাবিজয়োৎসব জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিলেন, তথায় বিজয়োৎসব চলিতে লাগিল। তদনন্তর জিলহিয়্যার মধ্যভাগে বৃহস্পতিবারে তিনি হিরাটে পৌঁছিলেন।

শ্রীগণপতি রায়।

প্রাণতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এই বিজ্ঞান হইতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, যখন ঈশ্বরে জগজ্জননরূপ সঙ্কল্পের আবির্ভাব হয়, তখন তিনি তপ করেন। এই তপ নরলোকসাধারণ তপ নয়। এই তপ, পূর্ব্বকল্পকৃত সৃষ্টিস্থিতিসংহার-জ্ঞানময়

তপ। "যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথ স্বঃ" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা পূর্ব্বকল্পীয় জ্ঞান প্রমাণিত হয়। এই তপের বলেই ব্যাচিকীর্ষিতাবস্থ অব্যাকৃত প্রকৃতির বিকাশ হয়। এই অব্যাকৃত প্রকৃতিতে সৃষ্টির উল্লেখ মাত্র থাকে। তৎপরে সেই উল্লেখাবস্থাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সমষ্টিপ্রাণের বিকাশ হয়। এই সমষ্টিপ্রাণ ব্রহ্মার সূক্ষ্মশরীর। যেমন ব্যষ্টিজীবের কারণশরীর, তদনুরূপই সূক্ষ্মশরীর উৎপাদন করত সূক্ষ্মশরীর-গত সংস্কারসমূহের ভোগানুকূল স্থূলশরীর উৎপাদন করে এবং এই উৎপত্তি বিষয়ে সূক্ষ্মশরীরান্তর্গতা স্পন্দনাত্মিকা প্রাণশক্তিই কার্য্যকারিণী হয় ও উহার স্পন্দন, জীব-চিত্তগত সংস্কারেরই অনুকূল হইয়া থাকে, সেইরূপ সমষ্টিজীবের প্রারব্ধানুসারে ঈশ্বরের মধ্যে উদিত প্রথমভাবরূপ ব্রহ্মার কারণশরীরের বিকাশানন্তর ব্রহ্মাণ্ড-প্রাণরূপ সূক্ষ্মশরীর আবির্ভূত হইয়া থাকে এবং রজোগুণবহুলা স্পন্দনশালিনী উক্ত শক্তির দ্বারাই আকাশাদিক্রমে ভৌতিক সৃষ্টি হয়। জ্ঞান যখন 'যথাপূর্ব্বকল্প' তখন ভাবও 'যথাপূর্ব্বকল্প' হয়, সুতরাং প্রাণস্পন্দও যথাপূর্ব্বকল্প হয় এবং সৃষ্টিও যথাপূর্ব্বকল্প হইয়া থাকে। অতএব ইহা সিদ্ধ হইল যে, প্রলয়কালে বিলোমবিধি অনুসারে মহাপ্রকৃতিগর্ভে লীন ভূতনিচয়ের আকাশাদি ক্রমে আবির্ভাব স্পন্দনাত্মিকা প্রাণশক্তি দ্বারাই হয়। প্রাণই যেন একের মধ্যে এক, একের মধ্যে এক এইরূপে লীন সমুদয় ভূতকে ধাক্কা দিতে দিতে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করে। প্রাণের বিকাশ হইলে ব্যাচিকীর্ষিতাবস্থা প্রকৃতি চঞ্চলা হইয়া অব্যাকৃত হইতে ব্যাকৃত অবস্থায় পরিণত হয়। সৃষ্টি রজোগুণ-প্রাধান্যে হইয়া থাকে। প্রাণস্পন্দন রজোগুণাত্মক; অতএব সৃষ্টিক্রিয়ার বিস্তার যে প্রাণশক্তির বলেই হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রাণাধিষ্ঠিত-চৈতন্য ব্রহ্মা, যখন উক্ত শক্তিকে সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করেন, তখনই অপঞ্চীকৃত মহাভূতের ক্রমবিকাশ; পঞ্চীকৃত অণুসমূহের পরস্পর সন্নিবেশ, সংহত পরমাণু হইতে স্থূলবস্তুর সৃষ্টি, ইত্যাদি সমস্ত সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই প্রাণশক্তিই জড় পরমাণুসমূহের মধ্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া পরমাণুর সংঘাতে স্থূল বস্তু সমূহকে স্ব স্ব আয়তনে স্থাপিত করে। এই শক্তিই ব্রহ্মাণ্ড-অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডান্তঃকরণ বিজৃম্ভিত ব্রহ্মাণ্ডকে যথাপূর্ব্বকল্প ব্যবস্থাপিত করে। প্রলয়দশায় যখন ব্রহ্মা ব্রহ্মে লীন হইয়া যান, তখন সূক্ষ্মশরীররূপী প্রাণও স্বকারণে লীন হইয়া যাওয়ায়—ব্রহ্মাণ্ডের ক্রিয়াকারিণী স্পন্দনাত্মিকা শক্তির অভাব হওয়ায় ব্রহ্মাণ্ডক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃতিক-প্রলয় উপস্থিত হয়। প্রাণশক্তির অভাব হইতেই এই প্রলয় সংঘটিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মদিবার অবসানে ব্রহ্মরাত্রে যখন ব্রহ্মা নিদ্রিত হন, তখন প্রাণও নিদ্রিত হওয়াতে নৈমিত্তিক প্রলয় উপস্থিত হয়, এবং এইজন্যই এ সময় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সুষুপ্তি-অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রাণশক্তির পরমাত্মাতে বিলীনতা হেতুই বিদেহমুক্তি বা আত্যন্তিক প্রলয় অবস্থায় জীবের স্থূল

ও সূক্ষ্মশরীর বিচ্ছিন্ন হইয়া স্ব স্ব কারণে লয় প্রাপ্ত হয়। যথা মুণ্ডকে—"গতাঃ কলাঃ পঞ্চাদশ প্রতিষ্ঠাঃ দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতি-দেবতাসু, কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা, পরেহ-ব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি।" এই প্রাণশক্তির নিত্যস্পন্দন জন্যই অণুপরমাণুর মধ্যে প্রাণশক্তির বিকাশ ও প্রাণক্রিয়ার তার-তম্য জন্যই জাগতিক সমস্ত বস্তুর মধ্যে নিত্য প্রলয় হইয়া থাকে। দিবাকর যে শক্তি দ্বারা সবিতা নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং যে শক্তি দ্বারা জগৎকে সদৈব উদ্ভা-সিত করিতেছেন, তাহা এই প্রাণশক্তি। অগ্নিদেব যে শক্তির সাহায্যে বিশ্বসংসার দগ্ধ করেন, সৌদামিনী যে শক্তি প্রাপ্ত হইয়া পার্থিব পদার্থসমূহকে নিয়ত পরি-বর্ত্তিত করিতেছেন, তাহা এই প্রাণশক্তি। এই সমষ্টিপ্রাণশক্তির বলেই সৌরজগতের অন্তর্গত যাবতীয় গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র স্ব স্ব কেন্দ্রে আবর্ত্তন করত বিশ্বজগতের সমতা বিধান করিতেছে। এই সমষ্টিপ্রাণের সাম্যভাব হেতুই সমষ্টিসৃষ্টিতে বিরাট্-ধাতুর বিকার উৎপন্ন হয় না। এই সমষ্টি প্রাণের মধ্যে বৈষম্য হইলেই বিরাট্ ধাতু বিকৃত হইয়া সৃষ্টির মধ্যে প্রবল বাত্যা, অকাল—জলদজাল-সমাচ্ছন্নতা, অশনি-নির্ঘোষ, প্রবল প্লাবন, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি জগদ্ধ্বংসকারী দুর্লক্ষণ সমূহের আবির্ভাব সম্পাদন করিয়া থাকে। শ্রুতি-শাস্ত্রে যে প্রাণের মহিমা সর্ব্বত্র বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায় এবং অখিল শাস্ত্র যে এইরূপে প্রাণের প্রশংসা করে এবং প্রাণশক্তির ধরাধারকত্ব-বিষয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করে, উল্লিখিত বিজ্ঞানই ইহার কারণ। ঋগ্বেদসংহিতায় লিখিত হইয়াছে—"অগ্নে যত্তে দিবি সর্ব্ব পৃথিব্যাং যদোষধী-ষপস্বু যদত্র যেনান্তরীক্ষ সূর্য্য ততস্থতেষ সভা-নুর্য্ণবোনূচক্ষা" অর্থাৎ লোকে যে বর্চ্চ আছে, পৃথিবীতে দাহপাকাদিজন্য যে তেজ বিদ্যমান আছে, ওষধিসমূহে আর অরণীকাষ্ঠে যে তেজ আছে, জলে যে ঔর্ব্ব নামক তেজ আছে, বায়ুর মধ্যে যে তেজ আছে, হে সর্ব্বশক্তিমন্ পরমেশ্বর! সে সমস্ত শক্তিই তোমার, তুমিই সমস্ত দ্যুলোক ও ভূলোকে তেজ বিতরণ করি-তেছ। উপনিষদে এই প্রাণশক্তির পর-মাত্মা হইতে প্রকাশ, পরমাত্মার অধিষ্ঠান জন্য ব্রহ্মাণ্ডে উহার কার্য্যকারিত্ব, এবং ঐ কার্য্যদশায় প্রাণের বিবিধরূপে বিকাশের তত্ত্ব দেখিয়া তত্ত্বজ্ঞানী অবশ্যই বিস্ময়ান্বিত হইবেন। কেনোপনিষদে বর্ণিত "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যৎ বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ" "যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" ইত্যাদি বচন দ্বারা ব্রহ্ম হইতেই প্রাণের উৎপত্তি এবং ব্রহ্মসত্তা হইতেই উহার কার্য্যকারিত্ব সম্পাদিত হয়। এই-রূপে প্রশ্নোপনিষদে "ভগবন্ কুতঃ এষ প্রাণো জায়তে, আত্মত এষ প্রাণো জায়তে" ইত্যাদি বচন দ্বারা ব্রহ্ম হইতে প্রাণের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড-প্রাণের বর্ণন করিতে যাইয়া এই উপনিষদেই উক্ত হইয়াছে "আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণ উদয়তি এষ হ্যেনং চাক্ষুষং প্রাণমনুগৃহ্ণানে" "আদিত্যঃ সর্ব্বাণি ভূতানি প্রণয়তি তস্মাদেব

প্রাণ ইত্যাচক্ষতে” “আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা রয়ির্বা এতৎ সর্ব্বং যন্মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ তস্মান্মূর্ত্তিরেব রয়িঃ” “অথাদিত্য উদয়ন্ যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি তেন প্রাচ্যান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে। যদ্দক্ষিণাং যৎ প্রতীচীং যদুদীচীং যদধো যদূর্দ্ধং যদন্তরা দিশো যৎ সর্ব্বং প্রকাশয়তি তেন সর্ব্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে। স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোঽগ্নিরুদয়তে। তদেতদৃচাভ্যুক্তম্। বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদম্। পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্। সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্ত্তমানঃ, প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ।” এই সকল শ্রুতি হইতে স্পষ্ট উপলব্ধ হয় যে, সূর্য্যই যেন প্রাণশক্তি ধারণ করিয়া জগজ্জীবের অন্তরে উক্ত শক্তি বিতরণ করিয়া জীবকে উদ্বুদ্ধ করেন। আর এ কথা সত্যও বটে। কারণ, জগৎসবিতা সূর্য্যাত্মাই ভগবানের অধিদৈবপ্রকাশ স্বরূপ। “চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যোঽজায়ত” “তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি” ইত্যাদি শ্রুতিবচন দ্বারা বিরাট্পুরুষের চক্ষু হইতে সূর্য্যের উৎপত্তি এবং প্রকাশরূপ ভগবানের প্রকাশ হইতেই সূর্য্যের জ্যোতিষ্মত্তা প্রতিপাদিত হইতেছে। পূর্ব্বলিখিত শ্রুতি দ্বারা আত্মা হইতে নিক্রান্ত প্রাণশক্তিকে গ্রহণ করিয়া সূর্য্যাত্মার উদয় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়, সুতরাং সূর্য্যের শক্তি এবং প্রকাশ সকলই যে ঐ এক প্রাণশক্তিরই বিকাশ মাত্র, ইহাতে আর সন্দেহ কি? “প্রাণাদ্বা সূর্য্য উদেতি প্রাণেঽস্তমেতি” ইত্যাদি বৃহদারণ্যক উপনিষদুক্ত বচনসমূহ এই সিদ্ধান্তেরই প্রমাণক। এবং এই সিদ্ধান্তকে অধিদৈব সূর্য্য হইতে অধিভূত চক্ষুতে আরোপ করিলে, ইহাও প্রতিপন্ন হইবে যে, যে শক্তির দ্বারা নেত্রে দর্শনেন্দ্রিয়তা সিদ্ধ হয় “চাক্ষুষং প্রাণমনুগৃহ্ণাণ” এই শ্রুতির দ্বারা ঐ শক্তির প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় শক্তি যে প্রাণশক্তি-মূলক, তাহা প্রতিপন্ন হইল। এই প্রাণশক্তিরই বহুধা বিকাশ বর্ণন করিতে যাইয়া শ্রুতিতে এ পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে যে, যাবতীয় মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত বস্তু সকলই প্রাণের রূপান্তর মাত্র। পঞ্চভূতের আকাশ ও বায়বীয়রূপে পরিণতি এবং তদনন্তর তৈজস, জলীয় ও পার্থিবরূপে পরিণতি, প্রাণেরই মহিমা দ্যোতন করে।” “অন্নে দেহাকারে পরিণতে প্রাণস্তিষ্ঠতি, তদনুসারিণশ্চ বাগাদয়ঃ স্থিতিভাজঃ। অগ্নেঃ পার্থিবস্যাঽপ্যস্য ধাতুমনাশ্রিত্য ইতরভূতবৎ স্বাতন্ত্র্যেণ আত্মলাভো নাস্তি” “তেজসা বাহ্যাস্তঃ পচ্যমানো যোঽপাংসরঃ স সমহন্যত সা পৃথিব্যভবৎ।” ইত্যাদি ভাষ্য-বচনও এই সিদ্ধান্তের প্রমাণক। বিচার করিলেও ইহা প্রতিপন্ন হইবে যে, পূর্ব্বে যে শক্তির ঘনীভবন হইতে স্থূল জগতের উৎপত্তি বিষয়ে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার এই শ্রৌত বিজ্ঞানের সহিত কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। অতএব ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী প্রাণশক্তিই ব্রহ্মাণ্ডের ধারিণী। আর এই জন্যই প্রশ্নোপনিষৎ বলিয়াছেন যে “অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্” “প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্”

এই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী প্রাণশক্তির সমতা হইতে সৃষ্টির সুরক্ষা এবং উহার বৈষম্য হইতে বিবিধ উৎপাত উপস্থিত হয়। এই বিষয়ে শ্রীভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—

বিরাড়্ ধাতু বিকারেণ বিষম স্পন্দনাদিনা।
জলদাবয়বস্যাস্য জলজন্তাস্য বৈষমম্॥

সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপে ব্রহ্মাণ্ড এবং পিণ্ডশরীর একই। সুতরাং পিণ্ডদেহস্থ বায়ু পিত্ত ও কফে বিকার উৎপন্ন হইলে, অথবা পিণ্ডদেহান্তর্গত ধাতুতে বিকার উপস্থিত হইলে, যেরূপ স্থূলশরীরে তাহা উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডশরীরান্তর্গত ব্রহ্মাণ্ড-প্রাণশক্তির বৈষম্য হইলে বিরাট্ধাতুর বিকার উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মাণ্ড-শরীরকে পীড়িত করে। এই পীড়াসম্বন্ধে বশিষ্ঠদেব বলেন যে "দুর্ভিক্ষোপগ্রহোৎপাতমায়াস্তি" অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডশরীরে রোগ হইলে দুর্ভিক্ষ, দুষ্টগ্রহের উৎপাত, প্লেগ আদি উপস্থিত হয়। অতএব সিদ্ধ হইল যে, প্রাণশক্তিই ধরাধারিকা।

এইরূপে পিণ্ডশরীর-ধারণার্থ যে প্রাণশক্তি বিদ্যমানা আছে, তাহার নাম আধ্যাত্মিক বায়ু। স্থূলশরীরের মধ্যে যতদিন এই বায়ু আছে, ততদিন মনুষ্য থাকে, যথা শ্রুতি "প্রাণএব হি মনুষ্যাণামায়ুঃ।" পূর্ব্বে যদিও স্থূলবায়ুর সঞ্চার থাকে না, তথাপি অধ্যাত্মবায়ুরূপিণী প্রাণশক্তির সঞ্চার অবশ্যই থাকে, অন্যথা পূতিভাব-প্রসঙ্গ হয়। শরীরে যত ইন্দ্রিয় আছে, সকলেই প্রাণশক্তির প্রেরণায় নিজ নিজ কার্য্যে রত থাকে। প্রাণ না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয়ই কাজ করিতে পারে না। প্রাণশক্তির সমতা হইতেই স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। প্রাণ বিকৃত হইলেই শরীর অসুস্থ হয়। এইজন্যই উপনিষদ্ বলিয়াছেন "প্রাণো বা আশায়া ভূয়ান্ যথা বা অরা নাভৌ সমর্পিতা এবমস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বং সমর্পিতং প্রাণঃ প্রাণেন যাতি প্রাণঃ প্রাণং দদাতি প্রাণো হ পিতা প্রাণো মাতা প্রাণো ভ্রাতা প্রাণঃ স্বসা প্রাণ আচার্য্যঃ প্রাণো ব্রাহ্মণঃ" (ছান্দোগ্য)। প্রাণশক্তিই হৃদি-প্রবহণশীল প্রাণবায়ু, অধোঽঙ্গ প্রবহণশীল অপান-বায়ু, নাভিমণ্ডলে বিচরণশীল সমানবায়ু, কণ্ঠদেশে বিরাজমান উদানবায়ু, এবং সর্ব্ব-শরীরগ ব্যানবায়ুর চালক। এই প্রাণশক্তির সহিত একাদশ ইন্দ্রিয় ও মনের এরূপ সম্বন্ধ আছে যে, প্রাণের চাঞ্চল্য হইতে মনের চাঞ্চল্য এবং প্রাণের সমতা হইতে মন স্থির হয়। এই জন্যই প্রাণায়ামশীল যোগিগণ প্রাণকে সংযত করিয়া মনঃসংযম করেন। যে যে অঙ্গ হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হয়, সেই সব অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায়। প্রাণশক্তি আছে বলিয়াই আমরা সবল এবং প্রাণের দুর্ব্বলতা হইলেই আমরা হীনবল হই। এইজন্যই উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে "যস্মাৎ কস্মাদঙ্গাৎ প্রাণ উৎক্রামতি তদেব তচ্ছুষ্যতি তেন যদশ্নাতি যৎ পিবতি তেনৈতান্ প্রাণানবতি"। প্রাণশক্তিই নিজেকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া পঞ্চপ্রাণের স্থানে অবস্থিত হইয়া পঞ্চ স্থূল বায়ুর চালনা করে। এইজন্যই উপনিষৎ বলেন—"তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ মা মোহমাপদ্যথা অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামি।" শ্রেষ্ঠ

প্রাণ বাগাদি ইন্দ্রিয়দিগকে বলিতেছেন "তোমরা মোহপ্রাপ্ত হইও না আমিই প্রাণ-অপান সমান উদান ও ব্যান নামক পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া শরীরের সকল স্থলে অবস্থিত হইয়া ইহাকে ধারণ করিতেছি। শ্রুত্যন্তরে বর্ণিত হইয়াছে যে "প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ং" অর্থাৎ নিকৃষ্ট দেহ নামক গৃহকে প্রাণদ্বারা রক্ষা করিয়া জীব সুপ্ত হয়। সুষুপ্তিকালে সমস্ত ইন্দ্রিয় যখন মনে এবং মন আত্মাতে লীন হইয়া যায় (যথা প্রশ্নোপনিষদে "তৎসর্ব্বং পরেদেবে মনস্যেকীভবতি তেন তর্হি এষ পুরুষোন শৃণোতি ন পশ্যতি ন জিঘ্রতি ন রসয়তে ন স্পৃশতে নাভিবদতে নাদত্তে নানন্দয়তি ন বিসৃজতে স্বপিতীত্যাচক্ষতে") ঐ সময় "প্রাণাগ্নিরেবৈতস্মিন্ পুরে জাগর্ত্তি" অর্থাৎ একা প্রাণই জাগ্রত থাকে এবং প্রাণ জাগ্রত থাকে বলিয়াই নিদ্রাবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতে পারে। এই সব প্রাণেরই মহত্ব। এই প্রাণের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। কোন এক সময় প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ববিষয়ে মতদ্বৈধ হয়। প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ প্রজাপতির নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ভগবন্ আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? "প্রজাপতি উত্তর দিলেন যে যাহার উৎক্রান্তি হইলে শরীর মৃত হয় তোমাদের মধ্যে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" এরূপ বলিলে প্রথমতঃ বাগিন্দ্রিয় বাহির হইল এবং এক বৎসর পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিল যে, শরীর জীবিত রহিয়াছে। বাগিন্দ্রিয় বিস্মিত হইয়া শরীরকে জিজ্ঞাসা করিল "আমার অভাবে তুমি কিরূপে জীবিত আছ?" ইহার এই উত্তর পাইল, 'যেমন মূক মনুষ্য বলিতে পারেনা, তথাপি প্রাণদ্বারা প্রাণনক্রিয়া, চক্ষুদ্বারা দর্শন ইত্যাদি করিয়া জীবিত থাকে, সেইরূপ আমিও জীবিত আছি।' ইহা দ্বারা নিশ্চয় হইল যে বাগিন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ নহে। তদনন্তর চক্ষু উৎক্রান্ত হইল এবং এক বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, শরীর জীবিত আছে। জিজ্ঞাসা করায় উত্তর মিলিল 'যেমন অন্ধলোক দেখিতে পায় না, তথাপি প্রাণ দ্বারা প্রাণন ইত্যাদি করিয়া জীবিত থাকে, সেইরূপ আমিও জীবিত আছি" ইহাতে নিশ্চিত হইল যে চক্ষু শ্রেষ্ঠ নয়। এই প্রকারে শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রান্ত হইয়া এক এক বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, কাহারই অভাবে জীব মরে নাই। তদনন্তর মন নিষ্ক্রান্ত হইয়া এক বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, তাহাতেও শরীর নষ্ট হয় নাই। জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পাইল "যেমন অমনস্ক বালক প্রাণ দ্বারা প্রাণন, চক্ষু দ্বারা দর্শন এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্যান্য কার্য্য করিয়া জীবিত থাকে, সেইরূপ আমিও জীবিত আছি।" ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে, মনও শ্রেষ্ঠ নহে। তদনন্তর প্রাণ বহির্গত হইতে ইচ্ছা করিল। ইহার ইচ্ছামাত্রেই সকল ইন্দ্রিয় শিথিল হইতে লাগিল এবং শরীর নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা উপস্থিত হইল। তখন সকল ইন্দ্রিয় মিলিত হইয়া বলিতে লাগিল "হে প্রাণ! আপনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

আপনি বহির্গত হইবেন না।” এই বিষয়ে মন্ত্র যথা—“তে শ্রদ্ধধানা বভূবুঃ সোঽভিমানাদূর্দ্ধমুৎক্রামতীব তস্মিন্নুৎক্রামত্যথেতরে সর্ব্ব এবোৎক্রামন্তে তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্ব এব প্রাতিষ্ঠন্তে। তদ্ যথা মক্ষিকা মধুকররাজানমুৎক্রামন্তং সর্ব্বেরেবোৎক্রামন্তে এবমস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠানে সর্ব্ব এব প্রাতিষ্ঠন্ত। এবং বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রাণি তে প্রীতাঃ প্রাণং স্তুবন্তি।” এই আখ্যায়িকা হইতে এবং শ্রৌত প্রমাণ হইতে দেহমধ্যগত প্রাণের শরীরস্থ সংগঠিত হইয়া থাকে। কেবল ইহাই নয়, শব্দোচ্চারণ, স্থূলজগতে শব্দের প্রকাশ এ সকল প্রাণেরই কার্য্য যথা—

আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্ মনো যুঙ্ক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্।
মারুতস্তূরসি চরন্ মন্ত্রং জনয়তে স্বয়ম্॥

এই শ্লোকের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, কায়াগ্নি অর্থাৎ প্রাণই বায়ুকে বক্ষঃস্থলে বিচরণ করাইয়া শব্দের উৎপত্তি করে। মন্ত্রের স্পষ্ট উচ্চারণ, বৈদিক স্বরের বিবিধ ভেদানুসার বেদপঠন, উদাত্তাদি ত্রিবিধভেদ জ্ঞান পূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ, সস্বর সামগান, এই সকলই প্রাণশক্তি দ্বারা হইয়া থাকে। এজন্যই বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে—

“এষ বা উদ্গীথঃ প্রাণো বা উৎপ্রাণেন হীদং সর্ব্বমুত্তব্ধং বাগেব গীথোচ্চ গীথো বেতি স উদ্গীথ” “স প্রাণেন চোদগায়ৎ” এবং এই জন্যই প্রশ্নোপনিষদে লিখিত হইয়াছে “প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং ঋচোযজুংষি সামানি।” মৃত্যুসময় জীব যখন স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে যথাসংকল্পিত লোকে যায়, ঐ সময় প্রাণের বলেই উহার ভিন্ন ভিন্ন লোকে গমনক্রিয়া সম্পাদিত হয়। “যদিতস্তেনৈব প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ সহাত্মনা যথাসংকল্পিতং লোকং নয়তি” ইত্যাদি শ্রুতি-বচন দ্বারা উল্লিখিত বিজ্ঞান পরিপুষ্ট হয়।

প্রাণের মহিমা অপার!!

শ্রীদয়ানন্দ স্বামী।

ন্যায়দর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সূত্র। “প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি। ৩

ব্যাখ্যা। “প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ” (বক্ষ্যমাণলক্ষণাস্তত্তৎপদার্থাঃ), প্রমাণানি’ যথার্থানুভবসাধনানি।)—

তাৎপর্য্যানুবাদ। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, (যাহাদিগের লক্ষণ পরে বলিবেন) এই চারিটী যথার্থ অনুভূতির সাধন।

সুতরাং প্রমাণ পদ-বাচ্য।—

মন্তব্য। মহর্ষি গোতম, উদ্দেশ, লক্ষণ, ও পরীক্ষার দ্বারা তাঁহার প্রমাণাদি ষোড়শপদার্থকে বুঝাইবেন। পদার্থের নামনির্দ্দেশের নাম উদ্দেশ। তাহা সামান্যতঃ প্রথম সূত্রেই হইয়াছে। এখন বিশেষ উদ্দেশ, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ নামের নির্দ্দেশ, এবং ঐ পদার্থ গুলির সামান্য লক্ষণ, ও

বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দেশের সময় উপস্থিত। আমি যাহা সমালোচনা করিয়া বুঝাইতে চাই, তাহার নামটী আমাকে আগেই বলিতে হয়, পরে তাহার লক্ষণ, অর্থাৎ স্বরূপটী বলিতে হয়। স্বরূপ না জানিলে তাহার পরীক্ষা অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তবোধিনী সমালোচনা কেহই বুঝেনা। আমি দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ,—অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ, প্রভৃতির নাম শুনিয়াছি, কিন্তু ঐগুলি কাহাকে বলে তাহা জানিনা। এখন আমার পক্ষে ঐ গুলির প্রকৃত সমালোচনা বুঝা কি কখন সম্ভব হইতে পারে?

আবার পদার্থের লক্ষণ না জানিলে তাহাদের ভেদ বুঝা যায়না। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, গুল্ম, প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ আছে, তাহার জ্ঞানেই তাহাদের ভেদ জ্ঞান হয়। এই যে— চিকিৎসকগণ রোগ পরীক্ষা করিতেছেন, রোগের লক্ষণজ্ঞানই কি তাঁহাদের উহাতে প্রধান সহায় নহে? যে পদার্থের জ্ঞান আবশ্যক, তাহার লক্ষণ-জ্ঞানও আবশ্যক; লক্ষণ-জ্ঞানের জন্য নৈয়ায়িকগণের বিলক্ষণ পরিশ্রম পণ্ডশ্রম-কারিতার লক্ষণ নহে।

অনির্ব্বাচ্যবাদী বলিবেন, "লক্ষণ নিরূপণ অসম্ভব। শ্রীহর্ষমিশ্র তাঁহার "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য"গ্রন্থে নৈয়ায়িক প্রভৃতির লক্ষণাভিমান চূর্ণ করিয়াছিলেন। বিশেষ বিচার করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, 'কোন পদার্থই নির্দ্দোষ লক্ষণ করিয়া কেহ বুঝাইয়া দিতে পারেনা। উহা অসম্ভব। সুতরাং জগৎ অনির্ব্বাচ্য। শ্রুতি প্রমাণে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য।"

এখন কথা হইতেছে যে, যিনি কোন পদার্থই লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায় না বলেন, তিনি তাহার ঐ অনির্ব্বাচ্য পদার্থগুলিতে কি কিছুমাত্র ধারণা রাখেন না? তবে তিনি অনির্ব্বাচ্য বলেন কাহাকে? আমি যাহা একেবারেই জানিনা, তাহার উপরে কি একটা মত প্রকাশ করিতে পারি? অনির্ব্বাচ্য কাহাকে বলে, তাহাও কি তাঁহার লক্ষণ দ্বারাই বুঝাইয়া দিতে হইবে না? বেদান্তাচার্য্য মধুসূদনের "অদ্বৈতসিদ্ধি" ঐ সমস্ত লক্ষণ-প্রদর্শনের জন্য নৈয়ায়িকগণের অপেক্ষাও বেশী ব্যতিব্যস্ত। জগৎ সৎ ও বলা যায়না, অসৎ ও বলা যায়না, সদসৎ ও বলা যায়না, সুতরাং উহা অনির্ব্বাচ্য। ইহা বুঝিতে কি সৎ ও অসতের লক্ষণ জ্ঞান প্রয়োজন নহে? জগৎকে অনির্ব্বাচ্য, বলিয়া বুঝিলেও ত তাহার একটা স্বরূপ বুঝা হইল, তবে আর কিছুই বুঝা গেলনা কিসে? ফলতঃ কিছু বুঝা যায় না বলিব, আবার বুঝাইবার জন্য আদা-জল খাইয়া লাগিব, এ রহস্য রহস্যই বটে।

যদি বলেন, আমরা একেবারে অজ্ঞেয়বাদী নহি। জগতের যথাসম্ভব ব্যবহারিক জ্ঞান, আমাদের আছেই। নচেৎ কথা বলিতেই পারিনা। কিন্তু ঐ জাগতিক পদার্থের কাহারও বাস্তব কোন লক্ষণ নাই। তাই উহা অবাস্তব। কল্পিত লক্ষণের দ্বারাই জগতের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। বাস্তবলক্ষণ থাকিলেই তাহাকে নির্ব্বাচ্য বলে। বাস্তবলক্ষণ না থাকিলেই তাহাকে অনির্ব্বাচ্য বলা যায়। অনির্ব্বাচ্য অবাস্তব মিথ্যা, এসব একই কথা।

ইহাতে বক্তব্য এই যে, যখন পদার্থের ব্যবহার চলিতেছে, তখন তাহার লক্ষণও আছে। ঐ লক্ষণ-জ্ঞানের প্রয়োজনও আছে। ঐ লক্ষণ বাস্তব কি অবাস্তব, তাহা বুঝিবার আমাদিগের অধিকার নাই। যতদিন আমার ব্যবহার আছে, ততদিন আমি লক্ষণ-জ্ঞান-বশতঃই বস্তুর ব্যবহার করিতেছি ও করিব। এবং যথাসম্ভব লক্ষণের দ্বারা পদার্থের ভেদ নির্ণয় করিয়াই আমি সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিব। পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র রাজা, প্রজা, স্ত্রী, পুরুষ, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, উচ্চ, অবচ, উন্নত, অবনত, ছোট, বড়, কুলীন, অকুলীন এই সব ভেদ আমি লক্ষণজ্ঞান থাকিলেই বুঝিব, এবং বুঝিতে বাধ্য হইব।

একমাত্র বক্তৃতা ভিন্ন জগতের আর কোন বিভাগে সাম্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী কার্য্যতঃ সমুড্ডীন হইতে দেখা যায় না। ভেদজ্ঞান আছেই, সুতরাং ঐ ভেদবোধক লক্ষণ-জ্ঞানও আছে। ভেদজ্ঞানের প্রয়োজন আছে বলিয়া ঐ লক্ষণ-জ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে। যেদিন কাহারও কোন পদার্থে ভেদজ্ঞান থাকিবে না, হয়ত সেদিন আসিবে আসিবে করিয়া আর আসিবেই না। মানুষ যতটুকু বুঝিতে পারে, ততটুকুই তাহার ব্যবহার ও অধিকারের ক্ষেত্র। ততটুকু পরোক্ষজ্ঞান লইয়াই তাহার চলিতে হয়। ক্রমে উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতে হয়। লক্ষণের দ্বারাই সকল পদার্থের অপরোক্ষ-জ্ঞান-লাভ করিয়া মানুষ, সর্ব্বজ্ঞ হইয়া যাইবে, ইহা কেহ বলে না। আবার লক্ষণ না থাকিলে এবং ঐ লক্ষণের কিছুমাত্র জ্ঞান না থাকিলে মানুষের একদণ্ডও চলিতে পারে, ইহাও কেহ বলিতে পারেন না। যিনি 'কিছুই বুঝা যায় না' বলিবেন, তাঁহাকেও কিন্তু ঐ কথাটা বলিতে অনেক বুঝিতে হইয়াছে। মহর্ষি, যথাক্রমে তাঁহার প্রতিপাদ্য ষোড়শ-পদার্থের সামান্য লক্ষণ ও বিশেষ লক্ষণ বলিবেন, তাই প্রথম পদার্থ "প্রমাণের" বিভাগ ও লক্ষণের জন্যই তাহার এই তৃতীয় সূত্রারম্ভ।

অবশ্য, পরবর্ত্তী প্রত্যক্ষাদি চারিটী প্রমাণের লক্ষণ দেখিয়া, মহর্ষির মতে ঐ চারিটীই প্রমাণ, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু যাহাদের লক্ষণ বলিতে হইবে, তাহাদের উদ্দেশ (নামনির্দ্দেশ) পূর্ব্বেই করিতে হইবে। পরবর্ত্তী সূত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলিয়াছেন, কি প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরই বলিয়াছেন, তাহা কি করিয়া বুঝিব? সূত্র পড়িয়া ত নির্ব্বিবাদে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের লক্ষণ বলিয়াই বুঝা যায়। তাই মহর্ষি এই সূত্রে 'প্রমাণ' গুলির বিশেষ উদ্দেশ করিয়াছেন। ঐ বিশেষ উদ্দেশের নামই বিভাগ।

ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরাচার্য্য বলেন, পরবর্ত্তী চতুর্ব্বিধ প্রমাণের লক্ষণ দেখিয়াও মহর্ষির প্রমাণ-বিভাগ-বিষয়ে সংশয় হওয়া বিচিত্র নহে। লক্ষণ, বিভাগের কার্য্য করেনা। মহর্ষি অন্য প্রমাণ মানিয়াও গ্রন্থ-গৌরব-ভয়ে, বা অন্য যে কোন কারণে তাহাদের লক্ষণ না বলিতে পারেন, কেবল প্রধান প্রমাণ কএকটীরই লক্ষণ বলিতে পারেন। "তস্মাৎ সংশয়-নিবৃত্ত্যর্থং যুক্তোবিভাগোদ্দেশ ইতি।" অর্থাৎ ঐ

সংশয়নিবৃত্তির জন্যই সূত্রে দ্বারা প্রমাণ-বিভাগ করিয়াছেন। উহা যুক্তিযুক্ত।

বার্ত্তিককারের সংশয়নিবৃত্তির জন্য বলিতে পারি যে, মহর্ষি, প্রত্যক্ষাদি ভিন্ন অন্য প্রমাণ মানিলে তাহার লক্ষণ বলাও যুক্তিযুক্ত। যে দর্শনকার, যতটী প্রমাণ মানিয়াছেন, তাহাদিগের সবগুলিরই তাঁহারা লক্ষণ বলিয়াছেন। নচেৎ তাহাদের প্রমেয়-সিদ্ধিই হয় না। মহর্ষি গোতম, অন্য প্রমাণ মানিবেন, অথচ তাহাদের লক্ষণ বলিবেন না, ইহা সম্ভব নহে। পরন্তু মহর্ষি প্রমাণ-পরীক্ষা-প্রকরণে প্রত্যক্ষাদি চতুর্ব্বিধ প্রমাণ ভিন্ন আর প্রমাণ নাই ; অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণ, উহারই অন্তর্ভূত,—ইহা বিশেষ বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরের কথা না দেখিয়া সংশয় করিলে, এই তৃতীয় সূত্রের বিভাগও তাহা নিবৃত্ত করিতে পারেনা। আমি বুঝিলাম, তিনি প্রধান প্রমাণ ক একটীরই নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "চত্বার্য্যেব প্রমাণানি" এই ভাবে প্রমাণের সংখ্যা-নিয়ম-বোধক কোন শব্দ ত এই সূত্রে নাই ! ফলতঃ সরলভাবে সব দিক্ দেখিলে, এই সূত্রটী না থাকিলেও মহর্ষি-সম্মত প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে কাহারও সংশয়ই হয় না।

সূক্ষ্মদর্শী বলিবেন, তাহা না হইল, মহর্ষির প্রমাণ বিভাগ স্পষ্টরূপেই বুঝিলাম। কিন্তু এই সূত্রে তাঁহার প্রমাণের সামান্য-লক্ষণটী কোথায় ? আমি বলিব, সূত্রের "প্রমাণানি" এইস্থলের প্রমাণ শব্দটীর মধ্যেই আছে খুঁজিয়া দেখুন। প্রমাণ শব্দটী প্র-পূর্ব্বক মা—ধাতুর উত্তর 'অনট্' প্রত্যয়ে সিদ্ধ। প্র পূর্ব্বক মা ধাতুর অর্থ প্রকৃষ্ট জ্ঞান। "অনট্" প্রত্যয়ের অর্থ করণ। তাহা হইলে বুঝিলাম, প্রকৃষ্ট জ্ঞানের করণ। যে জ্ঞান যথার্থ, অর্থাৎ যে জ্ঞান ভ্রম নহে, তাহাই প্রকৃষ্ট জ্ঞান। যে জ্ঞান ভ্রম, তাহাই নিকৃষ্ট জ্ঞান। যাহার দ্বারা কার্য্য হয়, তাহাকে করণ বলে। তাহা হইলে দাঁড়াইল, যাহার দ্বারা যথার্থ জ্ঞান জন্মে, তাহারই নাম প্রমাণ। আমি যখন চক্ষুর দ্বারা রজ্জুকে, রজ্জু বলিয়াই বুঝিলাম, তখন আমার ঐ জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান। ঐ যথার্থজ্ঞান, চক্ষুর দ্বারাই হইল বলিয়া, তখন ঐ চক্ষুঃ আমার ঐ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে প্রমাণ। আবার যখন চক্ষুর দ্বারা রজ্জুকে সর্প বলিয়া বুঝিলাম, তখন ঐ জ্ঞান ভ্রম-জ্ঞান। ঐ ভ্রমজ্ঞানের করণ চক্ষুঃ তখন আর প্রমাণ নহে, তখন উহা অপ্রমাণ। সাংখ্য-বেদান্তের মতে ইন্দ্রিয়গুলি প্রমাণ নহে, কারণ যাহা প্রমাণ, তাহা চিরদিনই প্রমাণ; তাহা কখন প্রমাণ এবং কখনও অপ্রমাণ হইতে পারেনা। সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন। উহার একটী প্রমাণ হইলেও অপরটী অপ্রমাণ হইতে পারে। অবশ্য সকল বুদ্ধিবৃত্তিই প্রমাণ নহে। মহর্ষি গোতমের অভিপ্রায় বুঝা যায় যে, সকলেই যথার্থজ্ঞানের করণকে প্রমাণ এবং ভ্রমজ্ঞানের করণকে অপ্রমাণ বলেন। এখন ঐ "করণ" ও "জ্ঞান" লইয়াই যাহা বিবাদ। যে চক্ষুর দ্বারা যথার্থ জ্ঞান হইল, পরক্ষণে সেই চক্ষুর দ্বারাই ভ্রমজ্ঞান হই-তেছে, এখন ঐ চক্ষুকে ঐ উভয় জ্ঞানের করণ না বলিয়া পারি কৈ ? ঐ উভয়স্থলেই

লোকে "চক্ষুষা পশ্যামি" এইরূপই প্রয়োগ করিতেছে, "চক্ষুর দ্বারা দেখিলাম" এইরূপই ব্যবহার করিতেছে। যে চক্ষুর দ্বারা যথার্থ জ্ঞান হইল, ভ্রমের বিশেষ কারণ থাকিলে তাহার দ্বারাই আবার ভ্রম জ্ঞান হইবে, তাহাতে বাধা কি? যাহা সর্ব্বলোকসিদ্ধ, তাহা উড়াইয়া দিয়া 'বাহ্যপ্রত্যক্ষে অন্তঃকরণ বাহিরে যাইয়া বিষয়াকারে পরিণত হয়। অন্তঃকরণের ঐ ব্যাপারেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় করণ। এবং ঐ ব্যাপারের সহিত পুরুষের অব্যান্তর সম্বন্ধই যোগ,—'ইত্যাদি দুরূহ বাক্যাবলী বলিলে সকল লোকে তাহা বুঝিবেই বা কেন? প্রত্যক্ষের অন্যান্য কারণ থাকিলে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধের পরেই প্রত্যক্ষ হয়; ঐ ইন্দ্রিয়সম্বন্ধের পরে প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে আর কিছু হয় বলিয়া কেহ বুঝে না, সুতরাং ঐ ইন্দ্রিয়সম্বন্ধই প্রত্যক্ষের চরম কারণ। ঐ চরম-কারণরূপ ব্যাপার দ্বারা ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষে করণ-কারণ, তাই "চক্ষুষা পশ্যতি" "শ্রোত্রেণ শৃণোতি" ইত্যাদি প্রয়োগ সর্ব্বসিদ্ধ। এখন যে সিদ্ধান্ত সহজে বুঝা যাইতেছে, তাহা ছাড়িয়া, নূতন সিদ্ধান্ত করিলে, অনেক চিন্তা বাড়িয়া যায়, অনেক তর্ক বাড়িয়া যায়, তাই মহর্ষি গোতম সে পথে যান নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে, যাহার দ্বারা যথার্থ জ্ঞান জন্মে তাহাই প্রমাণ, ইহা বলিলে যাহার দ্বারা পূর্ণভ্রম জ্ঞান জন্মিল, তাহা প্রমাণ হইতে পারিল না বটে, কিন্তু যে জ্ঞানটী আংশিক ভ্রম, যাহার এক অংশে যথার্থতা আছে, তাহার করণকে প্রমাণ বলিতে পারি কি? রজ্জুতে "অয়ংসর্পঃ" এইরূপ জ্ঞান হইলে ঐ যে "অয়ং" বলিয়া একটা কিছু বুঝিলাম, তাহাত ঠিকই বুঝিয়াছি। সর্পবোধটাই আমার ভুল। "এই" বলিয়া যে জ্ঞান তাহা, তাহাতে ত কিছু ভুল নাই? ইহাতে বক্তব্য এই যে, এক বস্তুকে অন্য প্রকারে বুঝিলে তাহাকে অন্যথাখ্যাতি বলে। ন্যায়সিদ্ধ ঐ অন্যথাখ্যাতি নামক ভ্রমজ্ঞান একই। যেমন রজ্জুতে "অয়ংসর্পঃ" ইত্যাদি জ্ঞান। ঐ একই জ্ঞানের কোন অংশ যথার্থ, কোন অংশ ভ্রম।

জ্ঞানের অংশ নাই। তাহার বিষয় ধরিয়াই অংশ কল্পনা। এখন যদি রজ্জুতে "অয়ংসর্পঃ" এইরূপ একটী জ্ঞান হইল, তবে ঐ এক জ্ঞানেই ভ্রমত্ব ও যথার্থত্ব কেন স্বীকার করিব না? এক বিষয় লইয়া উহাতে ভ্রমত্ব, অন্য বিষয় লইয়া উহাতে যথার্থত্ব থাকিতেই পারে। বিষয়ভেদ থাকিলে ভ্রমত্ব যথার্থত্ব বিরুদ্ধ পদার্থ নহে। যদি তাহা হইল, তবে ঐ আংশিক ভ্রমজ্ঞানের করণ চক্ষুঃ ওখানে প্রমাণও বটে অপ্রমাণও বটে। যথার্থ জ্ঞানের করণত্ব ও ভ্রমজ্ঞানের করণত্ব দুই-ই উহাতে আছে। কারণ ঐ একই জ্ঞান যথার্থ, এবং ভ্রম। ফলতঃ ভ্রমত্ব, ও যথার্থত্ব, এবং প্রমাণত্ব, ও অপ্রমাণত্ব, বিরুদ্ধ নহে; একাধারে থাকিতে পারে। বেদান্তমতে যেমন একই জ্ঞানে প্রত্যক্ষত্ব, ও শাব্দবোধত্ব দুইই থাকিতে পারে। জাতিসঙ্কর দোষ তাঁহারা মানেন না, তদ্রূপ ন্যায়মতেও ভ্রমত্ব, প্রমাত্ব প্রভৃতি একাধারে থাকিতে

পারে। ঐ সমস্ত পদার্থ জাতি নহে। উহাদের লক্ষণ, এবং এবিষয়ের অন্যান্য কথা পরে বলিব।

এখন আর একটী কথা এই যে, আমি যাহা পূর্ব্বে যথার্থরূপে অনুভব করিয়াছি। সংস্কার বশতঃ এখন তাহার অনেকগুলিই আমি যথার্থরূপে স্মরণ করিয়া থাকি। আমার ঐ স্মরণ যথার্থজ্ঞান। উহার করণ আমার সেই পূর্ব্বানুভব। কারণ, অজ্ঞাত বিষয় কিছুতেই স্মরণ করা যায়না। পূর্ব্বানুভব, এখন বিদ্যমান না থাকিলেও তজ্জন্য সংস্কারটী আছে। সুতরাং কালে আমি সেই পূর্ব্বানুভব দ্বারাই স্মরণ করিয়া থাকি। তাহা হইলে আমার সেই পূর্ব্বানুভব গুলি সবই প্রমাণ হইয়া পড়িল। স্মৃতির করণ পূর্ব্বানুভব মাত্রেই প্রমাণের লক্ষণ চলিয়াগেল। প্রমাণের সংখ্যা বাড়িয়াগেল। কিন্তু কোন দার্শনিকই স্মরণের জন্য পৃথক্ প্রমাণ মানেন নাই। কারণ তাহাতে প্রয়োজন নাই। আমি যাহা স্মরণ করিব, তাহা নিশ্চয়ই আমার পূর্ব্বজ্ঞাত। আমার সেই পূর্ব্বানুভব, যে প্রমাণের দ্বারা হইয়াছে, তাহার দ্বারাই আমার স্মরণীয় বিষয়টী পূর্ব্বসিদ্ধই আছে। আমি স্মরণ করিতেছি বলিয়াই ঐ বিষয়টী আছে এমন নহে। আমার স্মরণের পূর্ব্বেই তাহা প্রমাণসিদ্ধ।

ইহার উত্তর এই যে, প্রমাণের লক্ষণে যে যথার্থজ্ঞানের কথা আছে, উহাতে স্মরণ ভিন্ন যথার্থ জ্ঞানই বুঝিতে হইবে। স্মরণভিন্ন জ্ঞানের নামই অনুভব। যাহার দ্বারা যথার্থ অনুভব জন্মে, তাহাই প্রমাণ। তাহা হইলে সংস্কার সাহায্যে পূর্ব্বানুভবের দ্বারা যে সমস্ত স্মরণরূপ যথার্থ জ্ঞান হইতেছে, সেগুলি আর প্রমাণ হইতে পারিলনা। এইরূপ সকল দার্শনিকই প্রমাণের লক্ষণে স্মরণ ধরিয়া দোষ-বারণের জন্য নানারূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং অনেকেই সংশয় ও বিপরীতজ্ঞান গুলি অংশতঃ যথার্থ হইলেও তাহার করণকে প্রমাণের মধ্যে গণ্য করেন নাই। অবশ্য ন্যায়-শাস্ত্রেও ইহা লইয়া মতভেদ আছে। যাঁহারা এরূপ বলেন, তাঁহারা এ যথার্থ-জ্ঞানকে একেবারে "ভ্রমভিন্ন" জ্ঞান বলিয়াই ব্যাখ্যা করেন। প্রথমতঃ আমিও তাহাই করিয়াছি। সকল প্রমাণই প্রত্যক্ষ-মূলক। তাই প্রত্যক্ষের প্রাধান্য বশতঃ তাহারই প্রথম নির্দ্দেশ। অক্ষশব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। প্রতিগতং বিষয়সন্নিকৃষ্টং অক্ষং প্রত্যক্ষং—অর্থাৎ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। উপমান অপেক্ষায় অনুমান প্রমাণ বহুসম্মত। তাই উপমানের পূর্ব্বে অনুমানের নির্দ্দেশ। শব্দ-প্রমাণের অপেক্ষায় উপমান-প্রমাণের বিষয় অতিঅল্প। বিচারের সময়ে অল্প কথাতেই চলিবে। তাই শব্দপ্রমাণের পূর্ব্বেই উপমানের নির্দ্দেশ।

সকলের শেষে মহাবিষয় শব্দপ্রমাণের নির্দ্দেশ। প্রমাণ ব্যতীত কোন পদার্থই সিদ্ধ হয় না। এইজন্য সর্ব্বপ্রথমে প্রমাণেরই উদ্দেশ ও লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রমাণতত্ত্ব—ক্রমে পরিস্ফুট হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক-পদাবলী।

(৩)

আত্মলাভ।

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতং।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং॥
নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥
যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ। কঠ-দ্বিতীয়বঃ। ২২-২৫

জীবের শরীর সদা চঞ্চল অস্থির।
তাতে বাসী পরমাত্মা নাহিক শরীর॥
নিরাময় ব্যোমকল্প স্বরূপ আপন।
আত্মবুদ্ধি দিতে জীবে লইলা আসন॥
আত্মকামী সাধুধীর শান্তচিত্ত জন।
আত্মপদে করে সেই আত্মার বরণ॥
আত্মভাবে সেই মুখ্য আত্মার গ্রহণে।
তরে জীব ভয়-শোক জনন মরণে॥ ২২
লভ্য নন এই আত্মা বহু প্রবচনে।
মেধাবলে কিম্বা নানা শাস্ত্রের শ্রবণে॥
আত্মকামী হোয়ে তাঁরে যে সাধক চা'ন।
তাঁহারই প্রাপ্তব্য তিনি ইথে নাহি আন॥
পরমাত্মা সেই আত্মপ্রেমীর অন্তরে।
পরমার্থ তনু স্বীয় দেখান আদরে॥
স্বয়ং-প্রকাশ যেন সবিতৃ-মণ্ডল।
আত্মরাজ্যে সমুজ্জ্বল আত্ম-আপণ্ডল॥ ২৩
ন লভ্য সে আত্মপদ পাপীর সকাশে।
অবিরত দুশ্চরিত অশান্ত মানসে॥
অথবা অসমাহিত অনেকাগ্র মনে।
কিম্বা যথা ব্যস্তচিত্ত সংসার-চিন্তনে॥
পরন্তু যে সাধু সদা পাপেতে বিরত।
ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য হোতে চিত্ত সমাহিত॥
উপশান্ত মন যাঁর ত্যজি কর্ম্মফল।
আচার্য্যের সহবাসে অন্তর নির্ম্মল॥
তিনিই লভেন তাঁরে কেবল প্রজ্ঞানে।
মানবের জ্ঞান তথা পরাভব মানে॥ ২৪
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যাঁর হয় অন্নরূপ।
সর্ব্বহর মৃত্যু উপসেচন স্বরূপ॥
সে আত্ম মহাপ্রলয়ের চরাচর হরি।
ব্রহ্ম ক্ষত্র মৃত্যু আদি কবলিত করি॥
আপনি বর্ত্তেন সর্ব্ব সদ্ভাব সমান।
নরবুদ্ধি তাঁর কভু না পায় সন্ধান॥
কিম্বা ইহা নিশ্চয় সে পরমাত্ম-জ্ঞান।
সংস্কারে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্র-বর্ণ অভিমান॥
মৃত্যুকে নাশিয়া খুলে মোক্ষের আগার।
তাঁহাকে বিদিত হোলে মৃত্যু নাহি আর॥
তরিবারে মৃত্যুভয় সংসার-বন্ধন।
অন্য পন্থা নাহি ইহা বেদের বচন॥ ২৫

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১২। এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ।

এতদ্দ্বারা শিষ্টব্যক্তিগণের অগ্রাহ্য মত-সমূহও নিরস্ত হইল।

এই একটী সূত্রে একটী অধিকরণ রচিত।

যাঁহারা যুক্তিদ্বারা প্রধানকে জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, পূর্ব্বোক্ত সূত্র-সমূহ দ্বারা তাঁহাদের মত নিরস্ত হইয়াছে। বেদান্ত-বিরুদ্ধবাদিগণের মধ্যে এই মতই প্রধান, সুতরাং তাহারই বিশেষ রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। পরমাণুবাদী ও অন্যান্য যুক্তিবাদিগণের মতও সাঙ্খ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত যুক্তিজাল দ্বারা বিশেষরূপে খণ্ডিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যদি বল, সাঙ্খ্যবাদিগণের মত উল্লিখিত হইল কেন, তদুত্তরে বলিব,—সাঙ্খ্যমতের সহিত বেদান্তমতের সাদৃশ্য থাকায় উহার উল্লেখ প্রয়োজনীয়, বিশেষতঃ সাঙ্খ্যবাদীই যুক্তিবাদিগণের শীর্ষস্থানীয়। সাঙ্খ্যবাদ নিরস্ত হওয়ায় সকল যুক্তিমূলক মতবাদই নিরস্ত হইয়া যায়।

১৩। ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ।

যদি বলা যায় যে, ভোক্তা যদি ভোগ্য হন এবং ভোগ্য যদি ভোক্তা হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে কোনও বিভাগ থাকেনা। তদুত্তরে বলা যায় যে, এরূপ বিভাগ থাকিতেও পারে। যেহেতু আমরা সংসারে এরূপ দেখিয়া থাকি।

এই এক সূত্রদ্বারা এক অধিকরণ রচিত।

বর্ত্তমান সূত্রে বেদান্তবাদী যুক্তিমূলক অন্য একটী তর্কের নিরসন করিতেছেন। যুক্তিবাদী বলেন, কোনও কোনও সময় শ্রুতি-উক্ত মন্ত্র ও অর্থবাদের মুখ্য অর্থ না লইয়া, উহার গৌণ অর্থ গৃহীত হয় এবং সেই সকল স্থানে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং শ্রুতি যে অন্য প্রমাণের বাধা দেয়, তাহা বলা যায়না। মনে কর, শ্রুতি বলিতেছেন "স আদিত্যো যূপঃ" অর্থাৎ সেই যূপই সূর্য্য। এস্থলে বস্তুতঃ যূপ সূর্য্য নহে, তবে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী মনে করিয়া সূর্য্য বলা হইয়াছে। এখানে পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে যদি বেদান্তবাদী বলেন যে, যে বিষয় প্রমাণান্তর দ্বারা প্রসিদ্ধ, শ্রুতি কোনস্থলে তাহাতে বাধা দেয়? প্রত্যুত্তরে যুক্তিবাদী বলিতে পারেন, যে, ভোক্তা এবং ভোগ্যের মধ্যে যে প্রভেদ সেটী লোক-প্রসিদ্ধ। ভোক্তা চেতন ও শরীরবিশিষ্ট, কিন্তু ভোগ্য শব্দাদি অচেতন এবং ভোগের বিষয়। দেবদত্ত চেতন ভোক্তা, তাহার আহার্য্য দ্রব্য অচেতন ভোগ্য। এতদুভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা চিরপ্রসিদ্ধ। যদি ভোক্তা ভোগ্য হন এবং ভোগ্য ভোক্তা হয়, তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ থাকিবেনা। সুতরাং বেদান্তমতে যে ব্রহ্ম ও জগৎকে অবিলক্ষণ বলা হইতেছে, তাহা স্বীকার করিয়া লইলে, ভোক্তৃভোগ্যের প্রভেদ আর থাকেনা। ভোক্তৃভোগ্যের যে প্রভেদ, তাহা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালে থাকা দৃষ্ট হয়। সুতরাং ব্রহ্ম এবং জগতের অভেদ স্বীকার করিলে চিরপ্রসিদ্ধ ভেদের বাধা জন্মে।

এই তর্কের উত্তরে বেদান্তবাদী বলেন যে, এ আপত্তি অকার্য্যকরী। আমরা সর্ব্বদাই এ জগতে প্রত্যক্ষ করি যে, ভোক্তা ভোগ্য হইলে এবং ভোগ্য ভোক্তা হইয়া-গেলেও তাহাদের মধ্যে ভেদ থাকে। উদাহরণ স্বরূপে সমুদ্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সমুদ্রের ফেন, বীচি ও তরঙ্গ, সমুদ্র হইতে বিভিন্ন নয়। সকলেই সমুদ্রের বিকার মাত্র। কিন্তু তাহারা কোন সময় অভিন্নভাবে, কোনও সময় বা ভিন্নভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সমুদ্রবারি হইতে তাহারা অভিন্ন হইলেও একথা বলা যায় না যে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। তাহাদের পরস্পরের ভেদ না থাকা সত্ত্বেও একথা বলা যায়না যে, তাহারা পরস্পর অবিভিন্ন। ইহারা ভেদাভেদ-ভাববিশিষ্ট—অর্থাৎ ভেদ আছে, আবার নাইও। সমুদ্র ও তরঙ্গাদির মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, ভোক্তা ও ভোগ্যের মধ্যেও তদ্রূপ সম্বন্ধ। আর ভোক্তাকে ব্রহ্মের কার্য্যস্বরূপ বলা যায় না। কেননা, স্বয়ং ব্রহ্মই ভোক্তা। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ (২। ৬) বলেন, তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ তিনি সৃষ্টি করিয়া তিনিই ইহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আকাশ যেরূপ ঘটাদি উপাধিদ্বারা বিভক্ত প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মও কার্য্যানুপ্রবেশের পরে বিভক্তবৎ প্রতীয়মান হন। 'সমুদ্রতরঙ্গন্যায়' দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ভোক্তা ও ভোগ্য ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও তাহাদের মধ্যে বিভাগ থাকিতে পারে।

১৪। তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।

১৫। ভাবে চোপলব্ধেঃ।

১৬। সত্ত্বাচ্চাবরস্য।

১৭। অসদ্ব্যপদেশান্নেতিচেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ।

১৮। যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ।

১৯। পটবচ্চ।

২০। যথাচ প্রাণাদিঃ।

১৪—কার্য্য কারণের অভেদ, আরম্ভণাদি শব্দদ্বারা স্থিরীকৃত হয়।

১৫—কারণের ভাব বা সত্তা হইতেই কার্য্যের উপলব্ধি হয় বলিয়াও কার্য্যকারণের অভেদ সিদ্ধান্তিত হয়।

১৬—অবরের বা কার্য্যের সত্তা হইতেও কার্য্যকারণের অভেদ নির্ণীত হয়।

১৭—যদি বলা হয় যে, অসদ্ব্যপদেশহেতু উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অস্তিত্ব নাই, তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এরূপ বলা যায় না, কেননা, শেষবাক্য হইতে ধর্ম্মান্তর মাত্র সূচিত হয়।

১৮—যুক্তি এবং অন্য শ্রুতিবাক্য হইতে কার্য্য যে উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান এবং কারণের সহিত অভিন্ন ইহা নিরূপিত হয়।

১৯—কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বস্ত্রের ন্যায়।

২০—কার্য্যকারণ সম্বন্ধ প্রাণাদির ন্যায়।

১৪ হইতে ২০ সূত্র পর্য্যন্ত একটী অধিকরণ।

১৪ সূত্র। ব্যবহারিক জগতে ভোক্তৃ-ভোগ্যের মধ্যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়, তাহাই ভিত্তি করিয়া পূর্ব্ব সূত্রে বলা হইয়াছে, পরমার্থতঃ কার্য্যকারণের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। এই জগৎ প্রপঞ্চে আকাশাদি কার্য্য এবং ব্রহ্মই কারণ। কারণের বাহিরে কার্য্যের যথার্থতঃ কোনও অস্তিত্ব নাই। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় 'কেন নাই?' তদুত্তরে বলা হইবে যে, শ্রুতিতে 'আরম্ভণ' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা কার্য্যকারণের অভেদ-সিদ্ধান্ত নিষ্পন্ন হয়। ছান্দোগ্য উপনিষৎ (৬। ১। ৪) বলেন 'যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।

হে সৌম্য!

জানিলে মৃত্তিকা যথা মৃণ্ময় পদার্থ জাত।
জানিলে ব্রহ্মকে তথা জানা যায় ভূতজাত,
মৃত্তিকা কেবল সত্য নহে কভু মৃদ্বিকার।
বিকার ত নামমাত্র বাক্যে আরম্ভণ তার।

এই শ্রুতির অর্থ এই—যদি একটী মৃৎপিণ্ড জানা যায়, তাহা হইলে মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘটশরবাদি সবই জানা যায়, কিন্তু এই যে মৃদুৎপন্ন বস্তু, ইহারা যথার্থ স্বতন্ত্র কোনও বস্তু নয়, সকলেই মৃত্তিকা। ব্যবহারিক জগতে বস্তু নির্দ্দেশ করার জন্যই ইহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নামের প্রয়োজন হয়। সুতরাং তাহাদের আরম্ভণ বাক্যেই—অর্থাৎ বাগ্ব্যবহারেই। এই বিভিন্ন নামরূপে তাহাদের ব্যক্তিগত যে সত্তা, তাহা অসত্য। কিন্তু মৃত্তিকাগত সত্তাই সত্য। ঐ প্রকার এই বিশেষ মূল কারণ ব্রহ্মই সত্য। আর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন যে ভূতজাত, তাহারা সকলেই অসত্য। তাহাদের বস্তুগত্যা কারণসত্তা বা ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত অন্য কোনও সত্তা নাই। সুতরাং পরমার্থতঃ জগতের কোনও সত্তা নাই। ইহার সত্তা কেবলমাত্র ব্যবহারিকী সত্তা। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (৪।৪।১৯) বলেন—নেহনানাস্তি কিঞ্চন এখানে কিছুই নানা নাই। ছান্দোগ্য বলেন (৭।২৫।২) আত্মৈবেদং সর্ব্বম্। আত্মাই এই সকল। মুণ্ডক (২।২।১১) বলেন, ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং ব্রহ্মই এই সকল। বৃহদারণ্যকউপনিষৎ (২ ৪ ৬) বলেন, ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা। এই সমস্তই আত্মা। ছান্দোগ্য (৬।৮।৭) বলেন ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং সআত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো! এই সমুদয়েরই আত্মাই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম সত্য। তিনিই আত্মা, হে শ্বেতকেতো! তুমিই সেই আত্মস্বরূপ। মহাকাশ যেরূপ ঘটাদির দ্বারা ঘটাকাশাদিরূপ ক্ষুদ্রাকাশে পরিণত হয়। কিন্তু মহাকাশের সহিত তাহাদের কোনও সত্তার বিভিন্নতা থাকেনা। ঘট ভগ্ন হইলে যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে লীন হয়। তদ্রূপ এই নামরূপাত্মক জগতের ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র সত্তা নাই। যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণ স্বতন্ত্রভাবোধ, উপাধির বিনাশে জগতের ব্রহ্ম ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, তাহা হইলে ব্রহ্ম অনেকাত্মক হইয়া পড়েন। কেননা একটী বৃক্ষে যেরূপ অনেক শাখা আছে, সেইরূপ ব্রহ্মে অনেক শক্তি এবং প্রবৃত্তি আছে বলিতে হইবে। তাহা হইলে ব্রহ্মে একত্বের ন্যায় নানাত্ব আছে স্বীকার করিতে হইবে। বৃক্ষের সকল ডাল একত্র করিয়া সমষ্টি লইয়া বলিতে গেলে 'একবৃক্ষ' বলা যায়, আবার শাখা পত্র কাণ্ড মূলাদি ব্যষ্টি লইয়া বলিলে 'বহু'ও বলা যায়। সমুদ্র সমষ্টিভাবে 'এক,' ব্যষ্টিভাবে তরঙ্গ ফেন বুদ্বুদাদি ভেদে, 'বহু',—মৃত্তিকা সমষ্টিরূপে 'এক,' আবার ঘট শরাব ইত্যাদি ব্যষ্টিরূপে 'বহু—ইহা স্বীকার করা প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। ব্রহ্মের একত্ব ও বহুত্ব স্বীকার করিলে সুন্দর সামঞ্জস্য হয়। একত্বজ্ঞানে মোক্ষ লাভ হয়, আবার বহুত্বজ্ঞানে লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হয়, মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্তও সমঞ্জস হয়। এই উভয়-সামঞ্জস্য রক্ষার অনুকূল পক্ষ গ্রহণ করাই সুসঙ্গত। এতদুত্তরে একত্ববাদী বলেন যে, এমত গ্রাহ্য নহে। কারণ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতেই বলা হইয়াছে, যে, ঘটাদি মৃত্তিকারূপেই সৎ, সুতরাং এতদ্দ্বারা নির্ণীত হইল যে, কারণই একমাত্র সৎ। 'বাচারম্ভণ'শব্দ (বাক্যের অবলম্বনমাত্র). দ্বারা কার্য্যের মিথ্যাত্ব অবধারিত হইল। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যম্

ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা একমাত্র পরমকারণই যে সত্য, তাহাই ঘোষিত হইতেছে। স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো! শ্বেতকেতু তুমিই সেই আত্মা এই বাক্যেরদ্বারা জীবাত্মা যে পরমার্থতঃ ব্রহ্ম, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। রজ্জুতে সর্পভ্রম-সম্পন্ন পুরুষের যেমন রজ্জুজ্ঞানের উদয় হইলে আর ভ্রমজ্ঞান-কল্পিত সর্পের অস্তিত্ব থাকেনা, সম্যগ্‌জ্ঞানে রজ্জুই ভাসমান হওয়ায় সর্পের মিথ্যাত্ব স্থিরীকৃত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মে ভ্রমবশতঃ জীববুদ্ধি সম্পন্ন পুরুষের যখন সম্যগজ্ঞানের উদয় হয়, প্রকৃত ব্রহ্মরূপ জ্ঞানগোচর হয়, তখন বস্তুতঃ জীবের অস্তিত্ব থাকেনা। কল্পিত সর্প যেমন রজ্জুমাত্রে পরিণত হয়, কল্পিত জীব সেইরূপ ব্রহ্মে পরিণত হয়। জীবের স্বতন্ত্র সত্তা জীবের স্বতন্ত্রতাজ্ঞানের উপরই নির্ভর করে। জগতের স্বতন্ত্রসত্তা স্থাপন করিতে গেলেই ব্রহ্মে একত্ব ও বহুত্ব দুই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শ্রুতি বাক্য দ্বারা একত্বই স্থির হয়। বৃহদারণ্যক। ২। ৪। ১৩। বলেন যত্রত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎকেন কং পশ্যেৎ। যখন সকলেই এই আত্মা, তখন কে কাহাকে দেখে? এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বলা হইতেছে যে, ব্রহ্মবিদের নিকট ব্যবহারিক জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ব্রহ্ম জগতের অভিন্নতা যে কোনও অবস্থাবিশেষের (সুষুপ্তি বা তুরীয়দশার) জন্য, তাহা নয়। কারণ তত্ত্বমসি মহাবাক্য অবস্থাবিশেষ লক্ষ্য না করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক ৪। ৪। ১৯ বলেন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি যইহ নানেব পশ্যতি, ব্রহ্মে যে নানাত্ব দর্শন করে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মে যদি একত্ব ও বহুত্ব দুইই সত্য হয়, তবে সে একত্বজ্ঞানে বহুত্বজ্ঞান বিনষ্ট হইবে কিরূপে? এরূপক্ষেত্রে মোক্ষপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? কারণ একত্বজ্ঞান না হইলে যে মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই, তাহা শ্রুতিতে স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষ আর একটী তর্ক উপস্থিত করেন যে, ব্রহ্মের একত্বই যদি কেবল স্বীকার করিতে হয়, নানাত্বসত্তা না থাকে, তবে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় থাকেনা, কারণ নানাত্ব না থাকিলে আমরা দেখি বা কি, শুনিবা কি? লৌকিক ও বৈদিক বিধিনিষেধ প্রভৃতিও ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভেদ না থাকিলে বিধি-নিষেধাত্মক শাস্ত্রও নিষ্প্রয়োজন, সুতরাং নিরর্থক হইয়া পড়ে। এরূপ মোক্ষশাস্ত্রও নিরর্থক হয়। কারণ উহাও গুরুশিষ্য-ভেদের উপর স্থাপিত। গুরুশিষ্য-ভেদ না থাকিলে, কে কাহাকে শিক্ষাদেয়। মোক্ষশাস্ত্র যদি অনর্থক হয়, তবে তদ্দ্বারা আত্মার একত্বজ্ঞানই বা কিরূপে সিদ্ধান্তিত হইবে! অতএব নানাত্ব প্রয়োজন। প্রত্যুত্তরে বেদান্তবাদী বলেন, এ সকল তর্কে আমাদের মত দূষিত হয় না। কারণ, যে পর্য্যন্ত ব্যবহারিক জগতের ব্রহ্মাত্মতা-জ্ঞানের উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত উহা সত্য বলিয়া বিবেচিত হয়। পুরুষ জাগরিত না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন স্বপ্ন তাহার নিকট সত্য, ব্রহ্মজ্ঞ না হওয়া পর্য্যন্তও জগৎ সেইরূপ সত্য। সুতরাং যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান না হইবে, সে পর্য্যন্ত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারাদি না থাকার কোনও কারণ নাই। যদি এই কথা বলা যায় যে, সর্পবৎ প্রতীয়মান রজ্জুদ্বারা

দষ্ট হইলে লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। আমরা বলিব, ইহা সত্য নয়। অনেক সময় সর্পদষ্ট না হইয়াও সর্পদষ্ট হইয়াছি এই জ্ঞানে লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সত্যই রজ্জু সর্প নয়, কিন্তু সর্পজ্ঞান মিথ্যা নয়। স্বপ্নাবস্থার দ্রব্যগুলি জাগরিত অবস্থায় সত্য নয়, কিন্তু জাগরণকালে স্বপ্নজ্ঞান অসত্য বলা যায় না। এতাবতা স্থিরীকৃত হইল যে, একত্ববাদেও বৈদিক ও লৌকিক ব্যবহারাদির অনুপপত্তি হয় না

লৌকিক বা বৈদিক ব্যবহারে সর্ব্বদাই আকাঙ্ক্ষার বস্তু থাকে। 'যজেত' যাগ করিবে এইকথা বলিলে কি উপায়ে করিবে, কিরূপ ফলার্থে করিবে ইত্যাদি নানারূপ আকাঙ্ক্ষা থাকে। কিন্তু 'তত্ত্বমসি' এই কথা বলিলে কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকিল না। পূর্ণত্বজ্ঞানেই তাহার পরিসমাপ্তি হইল। পূর্ণত্বজ্ঞানের উদয় হইলে কিছুর আকাঙ্ক্ষা থাকেনা। অবিদ্যার বিনাশ ঘটিলে পূর্ণত্বজ্ঞান প্রকাশ পায়, কিন্তু যতক্ষণ এই পূর্ণত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত এই সত্যাসত্য লৌকিক বৈদিক ব্যবহার থাকিয়াই যাইবে। ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। অতএব অন্তিম-প্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদিত হইলে পূর্ব্ব-ভেদজ্ঞান-জনিত সমস্ত ব্যবহারের নিবৃত্তি হয়, তখন ব্রহ্মের নানত্ব কল্পনার অবকাশ থাকেনা।

কিন্তু একথা বলা যাইতে পারে, যে, মৃদাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মের পরিণামিত্বের আশঙ্কা হইতে পারে। কারণ আমরা জানি, মৃদাদির পরিণাম দৃষ্ট হয়, কিন্তু এ আশঙ্কার কোনও কারণ নাই, যেহেতু শ্রুতি বহুস্থলে স্পষ্টই বলিয়াছেন, ব্রহ্মের পরিণামিত্ব সম্ভব নয়। বৃহদারণ্যক (৪ ৪ ২৫) বলেন, স এবা এষ মহানজঃ আত্মা অজর অমর অমৃত অভয়ং ব্রহ্ম। বৃহদারণ্যক ৩ ৯ ২৬) বলেন, সবা এষ নেতি নেতি। বৃহদারণ্যক। ৩ ৮। ৮। বলেন, অস্থূলমনণু, সেই ব্রহ্ম মহান্ অজ অজর অমৃত অভয় অর্থাৎ জন্মজরা-মরণভয়াদিবিহীন, তাঁহাকে 'নেতি' এই শব্দদ্বারা ব্যক্ত করিতে হইবে। তিনি স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, সুতরাং একব্রহ্মে কূটস্থভাব ও পরিণামভাব দুই থাকিতে পারেনা বিধায় তাঁহাকে অপরিণামী বলিতে হয়। যদি বলা যায় যে, ব্রহ্মে দুই ভাবই থাকিতে পারে। যেমন একই বস্তুতে গতি ও স্থিতি দুইই থাকিতে পারে, ব্রহ্মেও তেমনি কূটস্থত্ব ও পরিণামিত্ব দুই থাকায় দোষ কি? প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে ইহা অসম্ভব। কারণ সর্ব্বশাস্ত্রেই ঘোষিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মের কূটস্থ-ভাব নিত্য, উহার বিনাশ নাই। অতএব নিত্য কূটস্থ ব্রহ্মে কোনও বিকার থাকিতে পারেনা বলিয়া পরিণামও থাকিতে পারিবে না। ব্রহ্মের একত্বজ্ঞানে মুক্তি হয় সত্য, কিন্তু তিনি যে জগদাকারে পরিণত হইয়া কোনও ফল সাধন করেন, তাহার প্রমাণ নাই। শ্রুতি কূটস্থ ব্রহ্মের জ্ঞানের ফলের কথা বলিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে। ৪। ২। ৪। দেখা যায় 'নেতিনেতি' এইরূপ উপক্রম করিয়া শেষে বলা হইতেছে। অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোষি, জনক! তুমি অভয় প্রাপ্ত হইয়াছ। এরূপ বলায় একত্ব-জ্ঞানের দ্বারা অভয় মোক্ষপ্রাপ্তিই সমর্থিত হইতেছে। মীমাংসাশাস্ত্রে আছে—ফলবৎ-সন্নিধাবফলং তদঙ্গম্। ফলবানের সন্নিকটে

বিদ্যমান অফল পদার্থ ফলবানের অঙ্গরূপে স্বীকৃত হয়। এই ন্যায় অনুসারে বিচার করিলে দেখা যাইবে, এখানে ব্রহ্মের একত্ব-জ্ঞান বা কূটস্থত্বজ্ঞানের ফল অভয়প্রাপ্তি বা মুক্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্বাদিজ্ঞানের কোনও ফল উক্ত হয় নাই, সুতরাং একত্বজ্ঞান ফলবৎ আর কর্তৃত্বাদি-বহুত্বজ্ঞান অফল। এবং ঐ একত্বজ্ঞানের অঙ্গমাত্র। অতএব ইহার কোনও স্বতন্ত্রতা নাই। এখানে বিরুদ্ধবাদীরা আপত্তি করেন যে, যদি ব্রহ্মের পরিণামিত্ব না থাকে, তবে ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করেন কিরূপে? আর শাস্তা এবং শাসিতব্যের পার্থক্যই বা ঘটে কিরূপে? তদুত্তরে বেদান্তবাদী বলেন, যাহা সংসার-প্রপঞ্চের বীজভূত, শ্রুতি স্মৃতি যাহাকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরের মায়াশক্তি প্রকৃতি বলিয়াছেন, যাহা অনির্ব্বচনীয় বলিয়া কথিত হয়, সেই অবিদ্যা এই জগৎ প্রপঞ্চের কারণ। ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। এই বিশ্ব অনাদি এবং অনন্ত। কেহ একথা বলিতে পারেনা, যে, অমুক্ দিনে অমুক্‌ক্ষণে এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, আবার ইহাও কেহ বলিতে পারেনা যে, অমুকদিন বিশ্ব বিনষ্ট হইবে। যাহা আছে তাহার ধ্বংস নাই, যাহা নাই, তাহার কখনও অস্তিত্ব নাই। গীতায় আছে, নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। বিশ্ব চিরকাল আছে এবং চিরকালই থাকিবে। আছে কেবল পরিবর্ত্তন। জল বাষ্পে পরিণত হইতেছে, বাষ্প মেঘে পরিণত হইতেছে, মেঘ জলে পরিণত হইতেছে। এই জগৎ কেবল পরিবর্ত্তনের লীলাক্ষেত্র, কাহারও ধ্বংস নাই। কেবল অবস্থান্তরপ্রাপ্তিমাত্র। প্রলয়কালে এই বিশ্ব অব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং ব্রহ্মে এই অব্যক্ত অবস্থায় লীন হয়। পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম হেতু ইহাদের অব্যক্ত অবস্থা চিরস্থায়ী হয় না। ইহাই আবার নূতন সৃষ্টির কারণ হয়। পুরুষের যেরূপ কামোদ্দীপন হইলে জীবোৎপত্তির কারণ হয়, ব্রহ্মেও তদ্রূপ বিশ্বের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম 'রেতঃ' স্বরূপ হইয়া তাঁহার মধ্যে কামনা উদ্দীপ্ত করিলে, তিনি ঈশ্বররূপে নূতন বিশ্বের সৃষ্টি করেন। এই মায়াশক্তি সদসদাত্মিকা। তাহার অস্তিত্ব নাই অথচ আছে। যখন ব্রহ্মে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, তখন তাহার অস্তিত্ব নাই। যখন ইহা নূতন সৃষ্টিতে পরিণত হয়, তখন ইহার অস্তিত্ব আছে। ইহার অস্তিত্ব অনি-র্ব্বচনীয়। সকল দর্শনশাস্ত্রেই এমন একটী অবস্থা আছে, যে সময় কিছু না কিছু স্বীকার করিয়া লইতে হয় এবং আমি যদি তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া সকল দিক্ সামঞ্জস্য করিতে পারি, তাহা হইলে আমার ঐ অঙ্গী-কার সঙ্গত বলিয়া মানিতে হইবে। বেদান্ত এই মায়াবাদ—স্বীকার করিয়াছেন এবং এই অঙ্গীকার দ্বারাই এ বিশ্বের একত্বে উপনীত হইতে পারিয়াছেন।

ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, যে, ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বকর্তৃত্ব ধর্ম্ম অবিদ্যাত্মক নামরূপবীজের বিকাশাপেক্ষ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২। ১। বলেন তস্মাদ্ বা এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। অর্থাৎ সেই আত্মা হইতে আকাশের বিকাশ হইয়াছে। ইহাদ্বারা নিত্য শুদ্ধবুদ্ধ মুক্তস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ঈশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয় হইতেছে,

অচেতন প্রধান হইতে হয় নাই, ইহাই সাব্যস্ত হয়। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বিতীয় সূত্রে (জন্মাদ্যস্য যতঃ এই সূত্রে) ইহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে এবং সেই কথাই স্থির আছে। অবিদ্যাকল্পিত নামরূপ যাহা অনির্ব্বচনীয়, যাহা আছে অথচ নাই, তাহা ঈশ্বরের প্রায় আত্মভূত। উহাই মায়াশক্তি বা প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঈশ্বর সেই মায়া ও ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৮। ১৪। ১ বলেন, 'আকাশোবৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম।' যিনি নামরূপ হইতে ভিন্ন অথচ নামরূপের নির্ব্বাহক, তিনিই ব্রহ্ম ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬। ৩ ২ বলেন, 'নামরূপে ব্যাকরবাণীতি,' ব্রহ্ম আলোচনা করিলেন, আমি নামরূপ বিকাশ করিব। তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৩। ১২। ৭ বলেন, 'সর্ব্বানি রূপাণি বিবিচ্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে' সেই ধীর অর্থাৎ ব্রহ্ম, সকল রূপের কল্পনা করিয়া, তাহাদের নামপ্রদান পূর্ব্বক সে সকল নাম ধারণ করতঃ বিদ্যমান হইলেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৬। ১২ বলেন, 'একং বীজং বহুধা যঃ করোতি' তিনি একমাত্র বীজকে বহুপ্রকার করিয়াছেন। ঈশ্বর সেই অবিদ্যাত্মক নামরূপ উপাধির উপহিত। আকাশ যেরূপ ঘটাদির দ্বারা অবরুদ্ধ, সেইরূপ ঈশ্বর আপনার আত্মভূত ঘটাদিস্থানীয় অবিদ্যা কর্ত্তৃক উপস্থাপিত নামরূপ দ্বারা নির্ম্মিত কার্য্যকারণ-সমষ্টিরূপ উপাধিতে অবরুদ্ধ জীবনামক বিজ্ঞানাত্মদিগকে ব্যবহারবিষয়ে পরিচালিত করিতেছেন। এই উপাধিহেতুই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্ব, কিন্তু পরমার্থতঃ তিনি এক ও অদ্বয়। ছান্দোগ্য শ্রুতি (৭। ৪। ১) বলেন—'যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা।' জীব যখন অন্যকিছু দেখেনা শুনেনা বা, জানেনা, তখনই সে ভূমা। বৃহদারণ্যকশ্রুতি ২। ৪। ১৩ বলেন 'যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ কেন কং পশ্যেৎ।' যখন আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু থাকেনা, তখন আর কে কি দিয়া দেখিবে? বেদান্তীরা বলেন, এইরূপ পরব্রহ্মাবস্থায় সর্ব্বব্যবহারের অভাব হয়। গীতায় শ্রীভগবান্ বলেন—

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং নচৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।

ঈশ্বর জীবের সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব সৃজন করেন না। কর্ম্মফলসংযোগ স্বভাবতঃ হয় অর্থাৎ প্রকৃতি সবই করেন। ঈশ্বর কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত, তাহাতেই জীবগণ মোহিত হয়। পারমার্থিক অবস্থায় শাস্তা এবং শাসিতব্য থাকেনা। ব্যবহারিক দশায়ই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। তখনই ইনি সমুদয়ের ঈশ্বর, ভূতগ্রামের অধিপতি, ভূতসঙ্ঘের পালক ও সেতুর ন্যায় লোকমর্য্যাদারক্ষক এবং আশ্রয়স্থল। শ্রুতি বলেন, 'এষ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ লোকপাল এষ ভূতাধিপতি এষঃ সেতুর্বিধরণঃ এষাং লোকানামসম্ভেদায়।' গীতাও বলেন, 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।' ঈশ্বর সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়দেশে বিরাজমান আছেন, তিনি মায়াদ্বারা সমস্তভূতকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় পরিচালিত করেন। সূত্রকারের অভিপ্রায়

এই যে, পরমার্থতঃ কার্য্যকারণের কোনও ভেদ নাই। কিন্তু ব্যবহারিক-জগতে ভেদ আছে। [ক্রমশঃ]



বৃথাহি জনম তা'র।

(১)
বৃথাহি জনম তার
বৃথাহি জনম—
পরমের পূজা যেই
না করে কখন
হায়! না করে কখন।

(২)
বৃথাহি জনম তার
বৃথাহি জনম—
পিতৃ-মাতৃ-সেবা যেই
না করে কখন
হায়! না করে কখন।

(৩)
বৃথাহি জনম তার
বৃথাহি জনম—
পরার্থে জীবনে যার
নাহিক করম্
হায়! নাহিক করম্।

(৪)
বৃথাহি জনম তার
বৃথাহি জনম—
ধনী হ'য়ে নাহি যার
ধন-বিতরণ
হায়! ধন-বিতরণ।

(৫)
বৃথাহি জনম তার
বৃথাহি জনম—
জ্ঞানী হ'য়ে নাহি যার
জ্ঞানবিতরণ
হায়! জ্ঞানবিতরণ।

(৬)
বৃথাহি জনম তার
বৃথাহি জনম—
পরদুঃখে নাহি যার
অশ্রুবিসর্জ্জন
হায়! অশ্রুবিসর্জ্জন।

(৭)
বৃথাহি জনম তার
বৃথাহি জনম—
পরসুখে হৃষ্ট কভু
নহে যার মন
হায়! নহে যার মন।

(৮)
বৃথাহি জনম তার
বৃথাহি জনম—
যেই কভু নাহি করে
রিপুর সংযম
হায়! রিপুর সংযম।

(৯)
বৃথাহি জনম তার
বৃথাহি জনম—
স্বদার-রমণে প্রীত
নহে যেই জন
হায়! নহে যেই জন।

(১০)
বৃথাহি জনম তার
বৃথাহি জনম—

প্রকৃতি-সৌন্দর্য্যে যার
মুগ্ধ নহে মন
হায়! মুগ্ধ নহে মন।
(১১)
বৃথাহি জনম তার
বৃথাহি জনম—
উদয়াস্ত নাহি যার
সবিতৃদর্শন
হায়! সবিতৃদর্শন।
(১২)
বৃথাহি জনম তার
বৃথাহি জনম—
সত্যের সম্ভোগ যেই
না করে কখন
হায়! না করে কখন।

কলিকাতায় সামাজিক-সমিতিতে (সোসিয়াল্ কন্‌ফারেন্সে)

মিস্ টেনাণ্টের বক্তৃতা।

(মর্ম্মানুবাদ।)

মাননীয় সভাপতি, উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী ও ভদ্রমহিলাগণ! লাহোর ও এলাহাবাদ কন্‌ফারেন্সে, স্থির হয়, ১৬ ও ২৫ বৎসর, যথাক্রমে বালিকা ও বালকদের বিবাহযোগ্য বয়স। সভায় এ বিষয়ে অনেক প্রকার গবেষণা হইয়াছিল। উক্ত সভায় এই সিদ্ধান্ত হয় যে, বাল্যবিবাহ-প্রথা ভয়ানক অনিষ্টকরী। ভারতের বিবাহ-প্রথা পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রথার সহিত যদি পরিবর্ত্তিত হয় এবং প্রথম বালিকাগণের মানসিক শারীরিক ইত্যাদি শক্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে বিকাশ পাইতে দেওয়া যায় ও তাহাদের শিক্ষা-বিষয়ে বিশেষ সময়ের সুযোগ প্রদান করা হয়, তবে শীঘ্রই তাহাদের নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক অবস্থা, উন্নতি প্রাপ্ত হইবে। তাহারা অপ্রাপ্তবয়সে সন্তানোৎপাদনের বিষময় ফল হইতে উদ্ধার পাইবে। ভবিষ্যতে সুস্থ ও বলবান্ সন্তান উৎপাদিত হইবে। চিকিৎসাব্যবসায়, সমগ্র ভারতে পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত আনয়ন করিয়াছে যে, এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাল্যবিবাহ অত্যন্ত অনুচিত। উত্তরভারতের অনেক প্রদেশে যেখানে বালিকাগণের ১৫। ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষার জন্য সময় নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, সেখানে শারীরিক পূর্ণতা প্রাপ্তি তত শীঘ্র হয় না। ডাঃ নবীনকৃষ্ণ বসু এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমাদের দেশ-প্রথানুসারে বাল্য-বিবাহে মত দিয়া আসিয়াছি, কিন্তু ইহা বুদ্ধি-বিষয়ক উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষরূপ প্রতিবন্ধক হয়। মাননীয় মহেন্দ্রলাল সরকার M. D. মহোদয় বলেন, তিনি ত্রিশ বৎসরকাল ডাক্তারি করিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন যে, শতকরা ২৫ টী হিন্দু-স্ত্রীলোক অসময়ে মারা গিয়াছেন। (যদিও বাল্য-বিবাহ ঐ অনুপাতের অনেক বেশী হইয়াছে) এবং অধিকাংশই (যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহারা) অস্বাস্থ্যকর জীবন বহন করিতেছেন।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল ডাঃ ডেবিড বি, স্মিথ বলেন, বাল্য-বিবাহ অত্যন্ত অনিষ্টকারক এবং ইহা জাতীয় বলবীর্য্যের শিথিলতা সম্পাদন করে। তজ্জন্য এ দেশের বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আমি ঘোর আপত্তি করি। ইহা শারীরিক এবং মানসিক উন্নতিতে অত্যন্ত বাধা প্রদান করে।

আমি দেখিতে পাই, প্রায় সমুদায় চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এবং শিক্ষিত পিতামাতাগণ বর্ত্তমান প্রথাকে অনাদর করিয়া বিবাহ দেন। সম্প্রতি দক্ষিণ-ভারতে যে সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে, ২ জন ডাক্তার বাল্য-বিবাহের ফল সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার ফলে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, "১২ কিম্বা ১৩ বৎসর বয়সের যে সব বালিকা, সন্তানের মাতা হইয়াছেন, তাঁহাদের সন্তানের মধ্যে অনেকে অকালে কাল-কবলিত হইয়াছে, অনেকস্থলে মাতা ও সন্তান উভয়েই গতাসু হইয়াছে।" দক্ষিণভারতে বালিকাগণের ছয় বৎসর হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহ দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে, ইহা আমার অত্যুক্তি নহে। একজন হাইকোর্টের উকীল, (যিনি উক্ত প্রদেশের রেলপথে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনি) গাড়ীর মধ্যে প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছিলেন যে, (সেইদিন সন্ধ্যাকালে তিনি মিটিং সান্ধ্যসম্মিলনে যোগ দিয়াছিলেন) গত যে মাসে তাঁহার ষষ্ঠবর্ষীয়া কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি নিজেকে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করেন।" কিন্তু তাঁহাকে অপরাধী বলা যাইতে পারেনা, কারণ, তিনি নিজেকে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, অন্যান্য কন্যাগণকে রীতিমত বয়ঃপ্রাপ্তা ও শিক্ষিতা না হওয়া পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রাখিবেন; কারণ প্রধান চিকিৎসা-শাস্ত্র "সুশ্রুত" বলেন—"যে পর্য্যন্ত কন্যা ষোল বৎসরে পদার্পণ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত সন্তানের মাতা হইবার উপযুক্ত হয় না। শেষ ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত যৌবন বিকাশ পায়। যে মাতার বয়স ১৬ বৎসর হয় নাই, এবং যে পিতার বয়স ২৫ বৎসর হয় নাই, যদি তাঁহাদের সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সে সন্তান চিররুগ্ন এবং স্বল্পায়ু হওয়া অবশ্যম্ভাবী।" আপনাদের অনেকের বাড়ীতে এইরূপ সুসন্তান নাই কি? কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ বাল্যবিবাহ-প্রথা নিবারণ করিতে বিবাহিত বালকগণকে শিক্ষা দেন, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হয়? সম্প্রতি দক্ষিণ-ভারতে আমার এই অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, প্রিন্সিপাল ও হেড-মাষ্টারগণ, যেখানে বালকের ১৩ হইতে ১৬ বৎসর বয়সের মধ্যে বিবাহ হয়, তাহার বিষময় ফলসম্বন্ধে এবং তাহাদের জীবনের ক্ষণস্থায়িতা সম্বন্ধে ছাত্রগণের মধ্যে স্বাধীনভাবে বুঝাইতেছেন। বিবাহে বালকদের নানাপ্রকার উৎসব সম্পাদন করিতে হয়, বিশেষতঃ তাহাদের বিবাহের এক বৎসর পরে, তাহাদের মন আর একদিকেই ধাবিত হয়, পাঠের দিকে তত মনঃসংযোগ হয় না তখন তাহাদের উপর সংসারের এমন অনেক কর্ত্তব্য আসিয়া পড়ে, যাহা তাহারা বিদ্যাভ্যাস স্থগিত করিয়া সম্পন্ন করিতেও যত্নপর হয়। তাহারা যদি ঐসব না করিত, তবে জীবনের উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইত। এটা আশা করা যায় যে, বালিকারা যদি শিক্ষিতা হয়, তবে তাহাদের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইলে, বালকেরা তাহাদের অপেক্ষা শিক্ষিত হইতে বাধ্য হইবে।

যদি বালিকাগণকে তাহাদের শিক্ষা-বিষয়ক উচ্চ সংকল্প হইতে বিবাহ দ্বারা বাধা দেওয়া না হয়, তাহা হইলে এরূপ অনেক বালিকা পাওয়া যায় যে, তাহাদের

ভবিষ্যত উন্নতির আশা, হৃদয়ে বিশেষরূপে জাগরূক আছে।

পঞ্জাব (অর্থাৎ যেখানে বালিকাদের ১৫ ও ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতে দেওয়া হয়,) ভিন্ন ভারতের প্রায় সকল স্থানই স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উদাসীন। বাংলায় গত লোকগণনায় দেখা গিয়াছে যে, ১১৪০০০০ জন বালিকার মধ্যে প্রায় তিন শতে একজন এক বৎসরে কাহারও স্ত্রী হইয়াছে, এবং প্রতি হাজারে ২০০ বিধবা হইয়াছে। আমি বরাবর দেখিয়া আসিতেছি যে, প্রায় প্রত্যহই সম্বাদপত্রে অল্পবয়স্কা বিবাহিতা রমণীর আত্মহত্যা-সংবাদ থাকে।

সম্প্রতি "এম্পায়ার" সংবাদপত্রে দেখা গিয়াছে যে, ১০ হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির আত্মহত্যাঘটনা ১৫ টা সংঘটিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ১১ টি স্ত্রীলোকের। ২০ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির আত্মহত্যা-ঘটনা ১৯ টি, তন্মধ্যে একটি স্ত্রীলোকের। পুলিশ সার্জ্জন এ সম্বন্ধে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, অল্পবয়স্কা বালিকা শাশুড়ীর নিকট তাহার পিত্রালয় যাইবার জন্য অনুমতি চাহিয়াছে, কিন্তু শাশুড়ীর নিকট অনুমতি না পাইয়া মনঃকষ্টে আত্মহত্যা করিয়াছে। যদি বর্ত্তমান বাল্যবিবাহপ্রথা নিবারিত হয়, তাহা হইলে এ সমস্ত জীবগুলি বাঁচিতে পারে। এই বিষয়ে ১০ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রায়ই আন্দোলন হয়।

৭ই নবেম্বর 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকা দুঃখ প্রকাশ করেন যে, অল্পবয়স্কা স্ত্রীর আত্মহত্যার পরিমাণ একবেশী হইতেছে যে, আমি হিন্দুবিবাহপ্রথা পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করি। এই বিবাহপ্রথা প্রায় ২ বৎসর হইল সংস্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই বিশেষরূপে উপকার সংসাধিত হইয়াছে। এই সমিতি গত ১৯১১ সালের জুলাই মাসে এই সমস্ত সংস্কারের সাধক এবং সভাপতি রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে হারাইয়া বিশেষরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। যদিও স্যার আশুতোষ মুখার্জি সেইপদে বরিত হইয়াছেন এবং তাঁহার মানসিক ও নৈতিক বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য আছে, তবুও আমি এখানে মহারাজ প্রদ্যোৎ-কুমার ঠাকুরের কথিত এই কয়েকটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছিনা যে, মিঃ সেনের চরিত্র ও জীবন কালিমাশূন্য ও নির্ম্মল ছিল, এবং তিনি দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার-সাধক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নৈতিক সাহস ও কর্ম্মবিষয়ে উৎসাহ বিশেষ-রূপে বিদ্যমান ছিল। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তাঁহার দেশস্থ লোক সকলেই তাঁহার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ, এবং তাহার পথানুসরণ করিয়া সকলেই উৎসাহিত হইবেন। মৃত মিঃ ভিঃ কৃষ্ণস্বামী এই সমিতির একজন প্রধান সদস্য ছিলেন, তাহার অকাল মৃত্যুতে দক্ষিণ-ভারতে সমূহ ক্ষতি সংসাধিত হইয়াছে। একবৎসর গত হইল, আমি এলাহাবাদের সমাজসংস্কার-সমিতি হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভারতের কতকগুলি সমাজসংস্কারক নেতা-কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া, ভারতের বড় বড় সহর পরিদর্শন করিয়াছি, তাহাতে দেখিয়াছি যে, পুরুষদিগের জন্য ২০টি ও স্ত্রীলোকদিগের জন্য ১৪ টি সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে।

দক্ষিণভারতে কর্ম্মবীর আয়ার প্রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়া সমাজসংস্কার সম্বন্ধে আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন. এইজন্য ভারতের অনেক-স্থানে অনেকে, বালক ও বালিকাদের বাল্যবিবাহ প্রথা রহিত করিতে এবং উপযুক্ত বয়সে বিবাহ দিতে চেষ্টিত হইতেছেন।

উপরোক্ত বিষয়ে বুদ্ধিসম্বন্ধীয় ও শরীর-সম্বন্ধীয় উন্নতিসাধন করিতে হইলে, এই দেশবাসী লোকদিগের এই ধারণা করা উচিত যে, অন্ততঃ পুরুষের ২৫ বৎসর এবং স্ত্রীলোকের ১৬ বৎসর বয়স হইলে বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে।

নারীচর্য্যা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

স্নানঞ্চ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষণং।
প্রাদক্ষিণ্যং পৃথিব্যাশ্চ সর্ব্বাণি চ তপাংসি চ ॥ ১০৩

সর্ব্বাণ্যেব ব্রতানীতি মহাদানানি যানি চ।
উপাসনানি পুণ্যানি যান্যন্যানি চ বিশ্বতঃ ॥১০৪

গুরুসেবা বিপ্রসেবা দেবসেবাদিকঞ্চ যৎ।
স্বামিনঃ পদসেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥ ১০৫ (ক)

সকল তীর্থে স্নান, সকল যজ্ঞে দীক্ষা, পৃথিবী প্রদক্ষিণ, সমুদায় তপস্যা, সমুদায় ব্রত, যাহা কিছু মহাদান, উপাসনা সকল, এই বিশ্বসংসারে যাহা কিছু পুণ্যকার্য্য আছে, গুরু-সেবা, ব্রাহ্মণসেবা, দেবসেবা—এই সকল পুণ্যকর্ম্ম পতিপদ-সেবার ষোড়শাংশের এক অংশেরও তুল্য নহে। ১০৩—১০৫

(ক) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে।

স্ত্রীগর্ব্বঃ পতিসৌভাগ্যাদ্বর্দ্ধতে চ দিনে দিনে।
সুস্ত্রী তদ্বিভবাযস্মাৎ তং তদ্ধেদ্ধর্ম্মতঃ সদা ॥ ০৬

পতির সৌভাগ্য বশতঃ স্ত্রীলোকের গর্ব্ব দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; ধর্ম্মপরায়ণা রমণী পতির সৌভাগ্য বশতঃ ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া থাকেন, তজ্জন্য তিনি ধর্ম্ম-বশতঃ সর্ব্বদা পতিসেবা করিবেন। ১০৬

পতির্ব্বন্ধুঃ কুলস্ত্রীণামধিদেবঃ সদাগতিঃ।
পরং সম্পৎ স্বরূপশ্চ সুখরূপশ্চ মূর্ত্তিমান্ ॥১০৭

সদ্বংশজা রমণীগণের সর্ব্বদা পতিই বন্ধু, অধিদেবতা ও গতি; তিনি পরমৈশ্বর্য্য-স্বরূপ ও মূর্ত্তিমান্ সুখ-স্বরূপ। ১০৭

ধর্ম্মদঃ সুখদঃ শশ্বৎ প্রীতিদঃ শক্তিদঃ সদা।
সম্মানদো মানদশ্চ মান্যশ্চ মানখণ্ডনঃ।
ন চ ভর্ত্তুঃ সমোবন্ধুর্বন্ধুবর্গেষু দৃশ্যতে ॥১০৮

তিনি ধর্ম্মদাতা, সুখদাতা, সর্ব্বদা প্রীতিদাতা ও শক্তিদাতা, সম্মানদাতা, মানদাতা মানখণ্ডনকর্ত্তা, তজ্জন্য তিনি মান্য; বন্ধুবর্গের মধ্যে পতির তুল্য বন্ধু দৃষ্ট হয় না ১০৮

ভরণাদেব ভর্ত্তায়ং পালনাৎ পতিরুচ্যতে।
শরীরেশাচ্চ স স্বামী কামদাৎ কান্ত এব চ ॥১০৯

তিনি ভরণ করেন বলিয়া 'ভর্ত্তা' ও পালন করেন বলিয়া 'পতি' নামে কথিত হইয়া থাকেন; তিনি স্ত্রীলোকের শরীরের ঈশ্বর বলিয়া 'স্বামী' ও পত্নীর কামনা পূর্ণ করেন বলিয়া 'কান্ত'। ১০৯

বন্ধুশ্চ সুখবন্ধাচ্চ প্রীতিদানাৎ প্রিয়ঃ পরঃ।
ঐশ্বর্য্যদানাদীশ্বরশ্চ প্রাণেশাৎ প্রাণনায়কঃ ॥১১০

সুখ-সম্বন্ধ হেতু তিনি বন্ধু ও প্রীতি দান করেন বলিয়া প্রিয়; তিনি ঐশ্বর্য্য দান করেন বলিয়া ঈশ্বর ও প্রাণের ঈশ্বর বলিয়া তিনি প্রাণনায়ক। ১১০

রতিদানাচ্চ রমণঃ প্রিয়োনাস্তি প্রিয়াৎ পরঃ।
পুত্রস্তু স্বামিনঃ শুক্রাজ্জায়তে তেন স প্রিয়ঃ
১১১

তিনি রতি দান করেন বলিয়া রমণ। রমণীগণের পতি অপেক্ষা অপর প্রিয় কেহ নাই; পতির শুক্র হইতে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, এই জন্য রমণীগণের পুত্র প্রিয় হয়। ১১১

শতপুত্রাৎ পরঃ স্বামী কুলজানাং প্রিয়ঃ সদা।
অসৎকুলপ্রসূতা তু কান্তং বিজ্ঞাতুমক্ষমা॥
১১২ (খ)

কুলাঙ্গনাগণের শত পুত্র হইতেও পতি শ্রেষ্ঠ এবং প্রিয়, কিন্তু অসদ্বংশোদ্ভবা নারী, পতি যে কি বস্তু, তাহা জানিতে সক্ষম হয় না। ১১২

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

সংবাদ ও মন্তব্য।

শ্রীতুলসীর জয়। এতদিন নিতান্ত ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তসন্তানগণই শ্রীতুলসীর আদর করিতেন। সমৃদ্ধের উদ্যানে, রাজারাজড়ার প্রমোদ-বনে, আর সর্ব্বোপরি শিক্ষাগর্ব্বিত ব্যক্তিবর্গের মনে শ্রীতুলসীর স্থান আদৌ ছিল না। ক্রোটন ভায়লেট্ প্রভৃতির কাছে শ্রীতুলসীর পরাজয় হইয়াছিল। কাল-চক্রের আবর্ত্তনে আবার ভগবানের বুকের ধন শ্রীতুলসীর দিন ফিরিতেছে। বিলাতের "ষ্টাণ্ডার্ড" শ্রীতুলসীর মহিমাগানে রত হইয়াছেন। তুলসী নানা রোগ নাশ করেন, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া নাশ করিতে তুলসী না কি কুইনাইন্‌কেও পরাস্ত করিয়াছেন! আবার কি কমলার কৃপাপাত্রকুলের প্রমোদকাননে ও প্রাসাদভবনে শ্রীতুলসী বিরাজমানা হইবেন না কি? হইলে ত তুলসীরই জয় হইল! যা করেন ভগবান্!

(খ) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে।

পত্রবার্ত্তা। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ২২৪৩৫ খানি সংবাদপত্র আছে, ইহার মধ্যে ২৫০০ খানির উপর দৈনিক কাগজ। কানাডারাজ্যে ১২০০ সংবাদপত্র আছে। ইহার মধ্যে দৈনিকের সংখ্যা ১০০ খানি। জর্ম্মাণিতে দশ সহস্র সংবাদপত্র আছে, ইহার মধ্যে ১৫০০ দৈনিক পত্র। ফ্রান্স ও আফ্রিকায় সংবাদপত্র সংখ্যা ৫৬০০ মাত্র। ইংলণ্ডে ৪৪০০ সংবাদপত্র আছে, ইহার মধ্যে ২৩০ দৈনিক। জাপানে দুই হাজার সংবাদপত্র আছে, তন্মধ্যে ৪০০ দৈনিক পত্র। ভারতবর্ষের সংবাদপত্র সংখ্যা ১৮০০ শত, ইহার মধ্যে দৈনিক কাগজ অতি অল্প। এ সংবাদে যাঁহারা লজ্জিত হইবেন, তাঁহারা মাননীয় গোখেলের শিক্ষা বিল সমর্থন করুন, নচেৎ রোগের জড় মিটিবেনা।

শুভচেষ্টা। নববর্ষের প্রথমে (২রা জানুয়ারী ১৯১২) বেলিয়াঘাটার পূর্ব্ববঙ্গ-বৈশ্য-সাহা-সমিতির চেষ্টায় বৈশ্যসাহাসমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সাহা-জাতির মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য এই সমিতি বিশেষ চেষ্টা করিবেন শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ভিক্ষালব্ধ মিষ্টান্নে বীতস্পৃহ হইয়া, যেদিন মানুষ, স্বোপার্জ্জিত শাকান্নে পরিতুষ্ট হওয়াই গৌরবকর মনে করে, সেইদিনই শুভদিন!

নরপশু। 'হেরল্ড'পত্রে প্রকাশ, কালি-কোট থানার বাঁসদপুর গ্রামনিবাসী কাইখা ও অপর কতিপয় ব্যক্তি এক যুবতীর গৃহে সবলে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে বনে লইয়া গিয়া, তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সংবাদ সত্য হইলে বলিতে ইচ্ছা হয়, এই সকল নরপশুকে 'জগৎপতি বসুধে কথং বহসি?'

মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থা। এবার চুঁচ-ড়ায় বঙ্গীয়-সাহিত্যসম্মিলনে কে নেতৃত্ব করিবেন, ইহা লইয়া আন্দোলন-স্রোত চলিয়া ছিল। একপক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই,

মহাশয়কে, অপরপক্ষ স্বনামধন্যা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়াকে সম্মিলনের নেতৃত্ব দিতে চাহিতে ছিলেন। দলাদলির প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে স্থলে স্থলে, শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করিয়াও পুরুষত্ব দেখান হইয়াছিল। শেষে তৃতীয় পন্থার সংবাদ পাওয়া গেল। বঙ্গসাহিত্যের সুহৃৎ মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরই সম্মিলনের সভাপতি হইবেন—স্থিরীকৃত হইয়াছে। এ সংবাদে আমরা সুখী। মহারাজ সম্মিলনের কর্ণধার, তাঁহার সভাপতিত্বে সকলেরই আনন্দ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ভারতভিক্ষা। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রমোহন ঘোষ প্রণীত ৪২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত কবিতাপুস্তক মাননীয় সম্রাট্ মহোদয়ের শুভাগমন উপলক্ষে রচিত। মূল্য তিন আনা। পুস্তকের আয় হিন্দু ও মুসলমান্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ধন-ভাণ্ডারে অর্পিত হইবে। ফণীন্দ্র বাবুর কবিতায় ভাব আছে, ঝঙ্কার আছে, প্রাণ আছে, তবে ভাষা সর্ব্বত্র তাঁহার ভাবপ্রকাশ করিতে পারে নাই। লেখক ব্যাকরণ মানেন না বা জানেন না, কিম্বা ভাষাদোষ মুদ্রাকর-প্রমাদেই পর্য্যবসিত, তাহা বুঝা কঠিন। তথাপি এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিলে কালে লেখক সম্মান পাইবেন।

অবকাশ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ প্রণীত দার্শনিক গ্রন্থ। মূল্য আট আনা। ছাপা ভাল নয়, ভুলও আছে। ৫০ পৃষ্ঠায় ১৬ পংক্তিতে শ্লোকের কয়টী অক্ষরই বাদ পড়িয়াছে। তত্ত্বমসি, প্রতিমাপূজা, আত্রেয়ীর দীক্ষা, মৈত্রেয়ীর আত্মপ্রদান প্রভৃতি প্রবন্ধের বিষয় সুন্দর, লিখিবার প্রণালীও ভাল, সকল স্থানে ভাব ফুটে নাই। লেখক দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু হজম করিতে পারেন নাই। জাতিকে গভীর চিন্তারাজ্যে লইতে যাঁহারা ইচ্ছুক, তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র, লেখককে ধন্যবাদ দেই। আশা করি, কালে ইনি সুলেখক বলিয়া গণ্য হইবেন।

অশোক। সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রণীত বৌদ্ধসম্রাট প্রিয়দর্শী অশোকের সচিত্র জীবনচরিত। মনোরম মুদ্রণ, চ'কচ'কে বাঁধাই, বড় গ্রন্থ। মূল্য ১॥০ টাকা, খুবই সস্তা। চারু বাবু বৌদ্ধসাহিত্যে বিশেষজ্ঞ, বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার প্রতিপত্তি প্রচুর। তিনি বহুশ্রমে নানা দুষ্প্রাপ্য বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া, অশোকের জীবন চরিত এবং অশোকযুগের ধারাবাহিক ইতিহাস লিপীবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থে ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, পুরাণকথা, নীতিধর্ম্ম প্রভৃতি জটিলবিষয় থাকিলেও লিপিচাতুর্য্যে গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। কতিপয় বিষয়ে আমরা চারু বাবুর মত গ্রহণ করিতে পারি নাই। তিনি কলিঙ্গমণিপুরকে বভ্রুবাহনের মণিপুর হইতে পৃথক্ বলিয়াছেন। পৌষের হিন্দুপত্রিকায় আমরা তাহার অযুক্ততা দেখাইয়াছি। আরও কতিপয় বিষয়ে মতভেদ আছে। গ্রন্থকার অশোকের পূর্ব্বজীবনে আরোপিত কলঙ্কলেপ মুছাইতে চেষ্টা করিয়া, আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থে গবেষণার প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগের বিবরণ, ভারতবর্ষের ইতিহাস সঙ্কলনের প্রধান উপকরণ। ইহার প্রসার যত অধিক হয়, ততই সুখের কথা। গ্রন্থখানি সুধীসমাজে আদৃত হইলে আমরা আনন্দিত হইব। পুস্তকের চিত্রগুলি মনোরম হইয়াছে।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।



১৮শ বর্ষ, ১৮শ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা। ফাল্গুন। ১৩১৮ সাল, ১৮৩৩ শকাব্দাঃ।

পতিতোদ্ধার।

যদাযদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধুনাং। বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। গীতা॥

শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের অন্যান্য উদ্দেশ্য থাকিলেও পতিতোদ্ধার যে তাঁহার অন্যতম, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাহাই যথাসাধ্য প্রদর্শিত হইবে।

মধুমাখা হরিনাম সঙ্গে লইয়া মহাপ্রভু ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি গ্রহণের দিনে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময়ে চতুর্দ্দিকে মৃদঙ্গ-ধ্বনিসমন্বিত তুমুল হরিসংকীর্ত্তন হইতেছিল। আর আজীবনও সেই নামকীর্ত্তনে সমগ্র বঙ্গে প্রেম-হিল্লোল বহাইয়া শত শত পতিত প্রাণীর উদ্ধারসাধন করিয়া তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন।

স্বীয় জন্মভূমি নবদ্বীপে যখন তিনি ভক্তগণ সঙ্গে হরিনামকীর্ত্তনে কালাতিপাত করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ একদিন নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে আদেশ করিলেন "আজ তোমরা নগরে যাও, প্রতি গৃহবাসীর পায়ে ধরিয়া সাধিবে, বলিবে "ভাই হরি বল"
"প্রতি ঘরে ঘরে এই কর গিয়া ভিক্ষা
কৃষ্ণভজ কৃষ্ণবল কর কৃষ্ণশিক্ষা"

তাঁহারাও সানন্দে মহাপ্রভুর আজ্ঞা শিরোধারণ করিয়া নগরমধ্যে হরিনাম-সুধা-বিতরণে গমন করিলেন। প্রতি-গৃহবাসীকে বলিতে লাগিলেন "ভাই আর কেন, আর কতদিন মোহান্ধকারে পতিত থাকিবে? আজিও কি এই বিরাট বিশ্ব-রাজ্যের সম্রাটকে চিনিবে না? আজিও কি তাঁহার চরণে প্রণত হইবেনা? আজিও কি তাঁহার সুধাসিক্ত নামগানে উন্মত্ত হইয়া পার্থিব শোকজ্বালা বিসর্জ্জন দিবেনা?

এই মধুরবাণী শ্রবণ করিয়া, যে সুজন, সে বড় পুলকিত হইল। মহানন্দে সে মধুর হরিনামকীর্ত্তন আরম্ভ করিল। আর অন্যলোকে নানা কথা বলিতে লাগিল। কেহ তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে আসিল। কিন্তু তাঁহারা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হরিনামগানে মত্ত রহিলেন। কেহ তাঁহাদিগকে কটুভাষায় গালি দিল। তাঁহারা তাহাদের পায়ে ধরিয়া সাধিলেন "ভাই হরি বল"

আহা! যে জন হরিনামকীর্ত্তন জীবনের ব্রত করিতে পারিয়াছে, পার্থিব সুখ কিংবা দুঃখ, সম্পদ কিংবা বিপদ্ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা। যেমন তুঙ্গশৈলশিখর সতত তপনকিরণে সমুজ্জ্বল থাকে, নীল-নীরদমালা তথায় গমন করিতে পারেনা। তিনিও তদ্রূপ পার্থিব শোকজ্বালার অত্যূর্দ্ধে বর্ত্তমান থাকিয়া সর্ব্বদা শান্তি-বিধায়িনী হরিনামসুধা-পানে রত থাকেন। পার্থিব বিষয়ের চিন্তা, হৃদয়ে চিতার ন্যায় বর্ত্তমান থাকিয়া, তাঁহার সুখশান্তি ভস্মীভূত করিতে পারেনা। সে মধুর নাম-কীর্ত্তনে যে সুখ, সে সুখের সহিত তিনি সসাগরা ধরার আধিপত্যেরও বিনিময় করিতে চাহেন না। আহা! যে জন হরি বলিতে শিখিয়াছে, সেই জনই চতুর-চূড়ামণি।

এইরূপে তাঁহাদের দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। প্রতিদিন হরিনাম-বিতরণের পর সন্ধ্যায় তাঁহারা তাঁহাদের দৈনিক কার্য্য প্রভুর নিকটে বিবৃত করিতেন। তারপর সমস্তরজনী হরিনাম-কীর্ত্তনে রত থাকিতেন।

একদিন পথে, তাঁহাদের দুই দস্যুর সহিত দেখা হইল। ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়াও উহারা ঘোর মদ্যপায়ী ছিল। তাহারা কত শত নিরীহ পথিকের প্রাণ হনন করিয়া, তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিল। তাহারা ভগবানের রাজ্যের বিদ্রোহী প্রজা। সেই নিরপেক্ষ বিশ্বনিয়ন্তার শাসন-দণ্ড যে তাহাদের মস্তকের উপর উত্তোলিত থাকিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাদের পার্থিব সুখের কাল্পনিক-কনক-সিংহাসন চূর্ণিত করিতেছিল, ইহা তাহারা ক্ষণতরেও ভাবিত না। পাপের আপাতমধুর সৌন্দর্য্যে প্রতারিত হইয়া যে তাহারা স্বহস্তে আপনাদের সুখতরুর মূলোচ্ছেদ করিতেছিল, মূর্খেরা ইহা তখনও বুঝিতে পারে নাই। তখনও তাহারা বুঝিতে পারে নাই যে, পার্থিবশাসন তাহাদের জন্য নির্ব্বিকৃ থাকিলেও ব্রহ্মাণ্ডসম্রাটের পক্ষপাত-হীন শাসন তদ্রূপ থাকিবেনা। তাহারা তখনও জানে নাই যে, রাজার উপরও রাজা আছেন, মৃত্যুর পরেও জীবন আছে। এই-রূপে অধর্ম্মাচরণ করিয়া তাহারা ক্রমশঃ গভীরতর পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছিল।

তাহাদের অবস্থা দেখিয়া নিত্যানন্দ, বড়ই মনোবেদনা প্রাপ্ত হইলেন। সখেদে যুক্ত-করে বলিলেন "ভগবন্! তোমার রাজ্যে কেন অত্যাচারীর স্থান হয়? তোমার স্বহস্তে রচিত পৃথিবীতে কেন এ দৃশ্যের অবতারণা? তোমার সৃষ্ট মানবহৃদয়ে কেন এ পশুভাব? ভগবন্, প্রেমময়! তুমি ইহাদের সুমতি দাও" আবার ক্ষণপরেই

ভাবিলেন "পাতকী উদ্ধারের জন্তই ভগবান্ গৌরাঙ্গের আবির্ভাব। তিনি ইহাদের ন্তায় পাতকী আর কোথায় পাইবেন? অজামিল উদ্ধার পৌরাণিক কথা। অধুনা সমগ্রজগৎ ইহাদের উদ্ধার বিস্মিত-নেত্রে দেখুক।" মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, তিনি তাহাদিগকে হরিনাম করিতে বলিলেন। ক্রোধোদ্দীপ্ত জগাই মাধাই তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে ছুটিয়া আসিল। তাঁহারা ত্বরিতপদে গমন করিয়া প্রভুর পদে শরণ লইলেন। দস্যুদ্বয় ফিরিয়া গেল।

বৈষ্ণবগণবেষ্টিত মহাপ্রভু বসিয়া আছেন। সর্ব্বাঙ্গে স্বর্গীয়জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইতেছে। পুলকিত নেত্রে ভক্তমণ্ডলী সে অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন। এমন সময়ে নিত্যানন্দ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন "আজ পথিমধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিলাম। দুই ব্রাহ্মণ, সুরা-সেবন করিয়া পথে বিচরণ করিতেছে। হরিনাম করিতে বলিলে তাহারা রোষারক্ত নয়নে আমাদের প্রহার করিতে ছুটিল। তাই দ্রুতপদে আসিয়া তোমার চরণে শরণ লইলাম।" শ্রীগৌরাঙ্গ তখন অনৈক ভক্তপ্রমুখাৎ অবগত হইলেন যে, ব্রাহ্মণ দস্যুদ্বয়ের নাম জগাই মাধাই। ইহারা ঘোর সুরাসক্ত ও পাপাচারী। তখন নিত্যানন্দ পুনরপি কহিলেন "প্রভো! তুমি কেন বৃথা পতিত-পাবন নাম ধারণ করিয়াছ? কোন্ অজ্ঞের কারণে তুমি এখনও ইহাদের উদ্ধারে হস্তক্ষেপ কর নাই? আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া তোমার যে মহিমা বিকাশ হইয়াছে, এই দুই পাপী উদ্ধার করিলে তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক মহিমা প্রকাশ হইবে।" তখন প্রভু স্মিতাননে কহিলেন "অচিরাৎ" তাহাদের উদ্ধার সাধন হইবে।" শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ আশ্বস্ত হইলেন। কীর্ত্তন আরব্ধ হইল।

এইরূপে কয়েকদিন চলিয়া গেল। অকস্মাৎ একদিন জগাই মাধাই প্রভুর গৃহের নিকট এক গৃহে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। প্রভুর গৃহে তখন ভক্তগণ কীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা। প্রিয়তম ভগবানের নাম গান করিতে করিতে তাহাদের হৃদয়ে অসীম অনুরাগের উদয় হইতেছে, চিত্ত তন্ময় হইতেছে। ভাবাবেশে ভক্তগণ কখন কাঁদিতেছেন, কখনও হাসিতেছেন, কখন বা উদ্দামতাণ্ডবে মত্ত হইতেছেন, প্রেমে আত্মহারা হইয়া কখন বা ঢলিয়া পড়িতেছেন।

ক্রোধ ও অভিমান প্রেমের সহচর। ভক্তগণ যেমন একবার হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে প্রীতির কথা কহিতেছেন, আবার ভাবিতেছেন "না তাঁহাকে ডাকা হইবেনা তিনি বড় নির্দ্দয়, বড় নিষ্ঠুর" আবার পরক্ষণেই হয়ত কৃষ্ণপ্রেমে আত্মবিস্মৃত হইয়া কি এক অপূর্ব্বরসে নিমগ্ন হইতেছেন। কখন প্রেম, কখন অভিমান, কখন বা বিরহবিধুরা সতীর ন্যায় উন্মত্ততা।

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।

[একাদশস্কন্ধ।]

মহাপ্রভুর অঙ্গনে প্রকৃতই সেদিন ঐরূপ দৃশ্যের অবতারণা হইতেছিল।

আবার জগাই মাধাইয়ের গৃহেও ঠিক ঐরূপ দৃশ্য। মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া কখন তাহারা অট্ট অট্ট হাসিতেছে, কখন তীব্র চীৎকার করিতেছে, কখন বা নাচিতেছে। উভয়স্থানেই একদৃশ্য, কিন্তু এ দুয়ে যে প্রভেদ, তাহার নিকট দেবতা ও পশুতে, স্বর্গে ও নরকে, ত্যাগজনিত সুখে ও ভোগজনিত সুখে যে পার্থক্য, তাহাও মাথা হেট করে।

এইরূপে আরও কয়েক দিন চলিয়া গেল। দস্যুদ্বয়ের ভয়ে অধিবাসিগণ সশঙ্ক। মহাপ্রভুর গৃহে ভিন্ন আর তেমন হরিনাম শ্রুত হয় না। লোকে আর পূর্ব্বের ন্যায় মনপ্রাণ খুলিয়া হরিনামে মত্ত হয় না। যেন কোন এক তীব্র তিমিররাশি আসিয়া প্রোজ্জ্বলজ্যোতিঃ আলোককে হীনপ্রভ করিতে চেষ্টা করিতেছে। যেন কোন এক দানবীয়শক্তি কুসুমসুবাসে ভরপুর শোভাসমন্বিত পুষ্পোদ্যানকে শ্রীহীন করিতেছে। যেন কোন এক আসুরিক প্রভাব পিককণ্ঠ হরিভক্তগণের কণ্ঠরোধ-চেষ্টায় নিরত।

এমন সময়ে একদিন নিশাযোগে নিত্যানন্দ গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, হঠাৎ পথে জগাই মাধাইর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার নাম "অবধূত নিত্যানন্দ" শ্রবণ করিয়া মাধাই ক্রোধসহকারে তাঁহার মস্তকে এক কলসীর কাঁধা নিক্ষেপ করিল। দস্যুকরনিক্ষিপ্ত সে কাঁধা ভীষণ বেগে নিত্যানন্দের মস্তকে লাগিল। দর দর বেগে রক্ত পড়িতে লাগিল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিত্যানন্দ বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে আলিঙ্গন দিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,

"মেরেছ মেরেছ কলসীর কাঁধা
তাই ব'লেকি প্রেম দেবনা ?"

সে কাঁধা তাঁহাকে বেদনা দিতে পারিলনা। তাঁহার মনে হইল, কেন কোন অজ্ঞাতশক্তি তাঁহাকে তাঁহার কর্ত্তব্য-সম্পাদনার্থ উৎসাহ প্রদান করিতেছে। রুধির-স্রোতের ন্যায় প্রেমবন্যা তাঁহার হৃদয় হইতে ছুটিতে লাগিল।

আহা সে কি দৃশ্য! রুধিরাক্তদেহে ক্ষমার প্রত্যক্ষ অবতারের ন্যায় তিনি তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন "ভাই, এখনও কি ভগবানকে ভুলিয়া থাকিবে? এখনও কি হরিনামকীর্ত্তনে মত্ত হইবেনা?" আবার তাহাদের পায়ে ধরিয়া সাধিতে লাগিলেন।

এরূপ দৃশ্য এই শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবভূমি ভিন্ন অন্যত্র প্রত্যক্ষ হইয়াছে কিনা জানিনা। বোধ হয়, তাহা হইলে স্বর্গ বর্ণনা করিতে আর কবিকে কল্পনার অঞ্চল আশ্রয় করিতে হইত না। এই স্থানেই প্রতি-হৃদয়ে নন্দন বন বিরচিত হইত। এই স্থানেই প্রতিহৃদয়ে প্রেমপারিজাত প্রস্ফুটিত হইত। এই স্থানেই প্রতি-মন্দাকিনী তর তর বেগে বহিত। সেরূপ দিন কি কখনও এই ভক্তপ্রসূ ভারতের বক্ষে আসিবে না? চিরকালই কি আমরা পাপ-তিমিরে পতিত থাকিব? সে উজ্জ্বল ভক্ত-রাজ্য কি কোনও দিন আমাদের দৃষ্টি-গোচর হইবে না?

নিত্যানন্দের হৃদয়-কন্দর-নিসৃত প্রেম-তরঙ্গিনী ঐ পাপিগণের কঠিন হৃদয়-ক্ষেত্রে পরিপ্লুত করিল। তাহারা ভাবিল "কই, এমনটীত আর দেখি নাই। মা'র খেয়ে প্রেম বিলায়, এমনজনের কথা কখন শ্রবণও করি নাই। এরূপ করিয়া মান অপমান, সুখ দুঃখ, এক চ'খে যে দেখে, সে কত বড় মহাপুরুষ," এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে উভয়ে যুগপৎ নিত্যানন্দের চরণে লুণ্ঠিত হইল। এমন সময়ে প্রভু তথায় উপস্থিত হইলেন। ভক্তিপূর্ণচিত্তে উভয়ে তখন প্রাণ ভরিয়া সে দিব্যকান্তি দর্শন করিতে লাগিল। গৌরচন্দ্রের প্রেমচন্দ্রিকায় তাহাদের আত্মার কল্যাণ-কুমুদ বিকশিত হইল। নববধূর ন্যায়, হৃদয়ে নির্জ্জন-কক্ষে লুক্কায়িত ঈশপ্রেম জাগিয়া উঠিল। মহোৎসবে কীর্ত্তনারম্ভ হইল। প্রেমোন্মত্ত জগাই-মাধাই হরিনাম গান করিল।

মুহূর্ত্তপূর্ব্বে যে মুখ হইতে কটুকথা ভিন্ন অন্য কিছু বহির্গত হয় নাই, নিমেষ-পূর্ব্বে যে কর পরনিপীড়ন ব্যতিরেকে অন্য কিছুতে ব্যবহৃত হয় নাই, অধুনা সে মুখ হইতে মধুর হরিনাম বহির্গত হইতে লাগিল, সে কর সাধু-আলিঙ্গনে রত হইল। সাধুসঙ্গের এমনি প্রভাব। এমনি করিয়াই লৌহ, স্পর্শমণি-সংস্পর্শে সুবর্ণে পরিণত হয়—কাচ কাঞ্চন-সংসর্গে মরকতদ্যুতি ধারণ করে। এমনি করিয়াই চন্দনতরুসংসর্গে বিষবৃক্ষও চন্দনত্ব প্রাপ্ত হয়। সঙ্গের গুণে পশু দেবতা হয়, সঙ্গদোষে দেবতাও পশু হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের কি পতিতপাবনী শক্তি। সেই শক্তিতে বলীয়ান্ হইয়াই আজ নিত্যানন্দ নরঘাতক নারকী দস্যুকে ভক্তরূপে পরিণত করিলেন। যে হরিভক্তের চরণসংস্পর্শে ধূলিকণা সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, মর্ত্ত্যে যাঁহার অসীম শক্তি, স্বর্গে যাঁহার অসীম সম্মান, যিনি বৃন্দারকবৃন্দেরও গৌরবাস্পদ যাঁহার নিকট ভগবানও পরাজয় স্বীকার করেন, যিনি ভক্তিগুণে ভগবানে হৃদয় বাঁধিয়া তাঁহাকে বশ করেন, আজ ঐ দস্যু সেই দেবতাজনবাঞ্ছনীয় পদ প্রাপ্ত হইল। বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে সমগ্র নদীয়া সে দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিল। সমগ্র বঙ্গ, লক্ষকণ্ঠে প্রভুর মহিমা কীর্ত্তিত হইতে লাগিল।

শ্রীরাখালচন্দ্র সেন।

গীতায় ভক্তিযোগ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সেই মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, অব্যক্ত-নিরাকার-ব্রহ্মোপাসককে সাকারোপাসক যোগী অপেক্ষা কদাচ নিকৃষ্ট কহেন নাই, কিন্তু দেহাভিমানী মানবের পক্ষে অব্যক্ত ও অক্ষর ব্রহ্মোপাসনা যে অতীব দুঃসাধ্য, তাহা তিনি পরবর্ত্তী শ্লোকে কহিয়াছেন—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ৫

অর্থাৎ অব্যক্ত ও অক্ষর ব্রহ্মে যাঁহাদের চিত্ত আসক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি-বিষয়ে অধিকতর ক্লেশ হয়। কারণ দেহাভিমানী মানবের পক্ষে অব্যক্তব্রহ্মপ্রাপ্তি নিতান্ত ক্লেশকর। যে কোন মনীষী যাবত

সমস্ত বৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক সমাহিত চিত্ত দ্বারা অনাত্মাকার তাবৎজ্ঞান পরিহার পূর্ব্বক একমাত্র "অহং ব্রহ্মাস্মি" জ্ঞান বা "তত্ত্বমসি" ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারেন, তাবৎ কখনই অব্যক্ত ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারেন না যদি কোন মোক্ষাভিলাষী কোন্‌টী নিত্য পদার্থ—কোন্‌টী অনিত্য পদার্থ— ইত্যাকার নিশ্চয় পূর্ব্বক ইহ পরলোকের ফলকামনাশূন্য হইয়া শমদমাদি সাধন করিতে পারেন এবং সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি-যুক্ত হইয়া স্বয়ং গুণ ও মায়া হইতে পৃথক্ হইতে পারেন, সেই মহাত্মাই নির্গুণ-ব্রহ্ম প্রাপ্তি বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন।

একমেবাদ্বিতীয়ং (ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়)— "আত্মা বা ইদম্ এক এবাগ্র আসীৎ" (আদিতে এক আত্মাই ছিলেন)—আত্মৈবেদং সর্ব্বম্ (আত্মাই এই সমস্ত —ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং (সকল বিশ্বই ব্রহ্মাত্মক) এবম্বিধ বেদান্তবাক্যাদি দ্বারা পূরব্রহ্মে তাৎপর্য্যাবধারণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ তাহার কীর্ত্তন, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি এই "ষড়্‌বিধ-লিঙ্গ" দ্বারা "শ্রবণ," তথা "মনন" অর্থাৎ বেদান্তের অবিরোধিনী যুক্তি দ্বারা শ্রুত অদ্বিতীয় ব্রহ্মের নিরন্তর চিন্তন, তথা "নিদিধ্যাসন" অর্থাৎ বিরোধী জড়-পদার্থ-জ্ঞানকে দূরীকরণ—পূর্ব্বক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অবিরোধ-জ্ঞান প্রবাহ অবলম্বন ইত্যাকার সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে নির্গুণ-ব্রহ্মলাভ হইতে পারে।

বেদান্তোক্ত "অয়মাত্মা," "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাকার ব্রহ্মজ্ঞানকে জ্ঞানযোগ কহে। সাংখ্যদর্শনোক্ত তত্ত্বজ্ঞানকেও জ্ঞানযোগ কহে। কিন্তু সাংখ্যদর্শনোক্ত জ্ঞান কেবল পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বের জ্ঞান, তাহার সহিত ঈশ্বর বা ব্রহ্মজ্ঞান সংযুক্ত নাই। তজ্জন্য সাংখ্যদর্শনকে নিরীশ্বর কহে। সাংখ্যদর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এই—

"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ অহঙ্কারাৎ তন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ। (সাংখ্যসূত্র)

এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের নিত্য অনুশীলনে যাবদীয় ভ্রম ও বিপর্য্যয়জ্ঞান বিদূরিত হয় এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং এই জ্ঞান লাভ হইলে নিঃশেষে মুক্তিলাভ হয়। "পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসেৎ। জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥"

অর্থাৎ যিনি পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি যে আশ্রমেই থাকুন না কেন—জটী, মুণ্ডী, শিখী যাহাই হউন্ না কেন, তিনি নিঃসংশয়ে মুক্তিলাভে সমর্থ হইবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে সাংখ্যদর্শনের আভাস—তথা, পুরুষ প্রকৃতিবিষয়ক তত্ত্ব অনেক স্থলে উল্লিখিত এবং সাংখ্যজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব অনেক স্থলে কীর্ত্তিত হইলেও গীতোক্ত সাংখ্যজ্ঞান সাংখ্যদর্শনোক্ত সাংখ্যজ্ঞানের ন্যায় নিরীশ্বর নহে।

শ্রীধরস্বামী কহিয়াছেন, "সাংখ্য-শব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাবাচিনা তদঙ্গং সন্ন্যাসং লক্ষয়তি—" (৫। ৪ শ্লোকের টীকা)

সংখ্যা হইতে সাংখ্য এইপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে যথাঃ—"সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে। তত্ত্বানি চ চতুর্বিংশৎ

তেন সংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" শ্লোকটী শুনিবামাত্র প্রতীত হয়, পদার্থসংখ্যা-নির্দ্ধারণপূর্ব্বক জ্ঞানোপদেশ থাকাতেই কপিলের দর্শন 'সাংখ্য' নামে বিখ্যাত। বস্তুতঃ তাহা নহে। সাংখ্য শব্দের অর্থ সম্যক্ জ্ঞান" (কালীবর বেদান্তবাগীশকৃত সাংখ্যদর্শন)

এই সম্যগ্‌জ্ঞান কি? ব্রহ্মজ্ঞান বা ঈশ্বরতত্বজ্ঞান। ইহা পরাবিদ্যা-সম্ভূত। পরাবিদ্যা কাহাকে বলে? তাহার পরিচয় এইরূপ।

শৌনক অঙ্গিরাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।" অর্থাৎ ভগবন্, কি জানিলে সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়? তদুত্তরে অঙ্গিরা কহিয়াছিলেন—

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরাচ॥ ৪॥

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥ ৫॥ (মুণ্ডকোপনিষৎ, প্রথম মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ)।

"ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, দুইটী বিদ্যা পরিজ্ঞেয়, এক পরা বিদ্যা, দ্বিতীয় অপরা বিদ্যা॥ ৪॥ তন্মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, ও অথর্ব্ববেদ, এবং শিক্ষাশাস্ত্র, কল্পশাস্ত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই সকল শাস্ত্র অপরাবিদ্যা, আর যে বিদ্যা দ্বারা সেই অবিনাশী ব্রহ্মবস্তু অধিগত হওয়া যায়, তাহার নাম পরাবিদ্যা।৫

"যদপরবিদ্যাবিষয়ং কর্ম্মফললক্ষণং সত্যং তদাপেক্ষিকম্। ইদন্তুপরবিদ্যাবিষয়ং পরমার্থসলক্ষণত্বাৎ।"

অর্থাৎ অপরাবিদ্যার বিষয়ীভূত কর্ম্মফল ইত্যাদি যাহা সত্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়, তাহা আপেক্ষিক সত্য, এবং পরাবিদ্যার বিষয়ীভূত যাহা তাহা পরমার্থতঃ সত্য।

গীতোক্ত সাংখ্যজ্ঞান অব্যক্ত ও অক্ষরব্রহ্মজ্ঞান। এই জ্ঞান নিষ্কাম কর্ম্মযোগ হইতে সমুদ্ভূত হয়। এই অব্যক্ত ও অক্ষরজ্ঞান, পূর্ণ পরমার্থ-ভক্তিমূলক এবং ইহা ভক্তিযোগের অন্যতম পন্থা।

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—

"সাংখ্যমতাবলম্বী মানবগণ সাংখ্যশাস্ত্রের প্রশংসা করিয়া থাকেন; যোগশাস্ত্রাবলম্বী দ্বিজাতি মনীষিগণ যোগশাস্ত্রের প্রশংসা করতঃ স্বপক্ষোদ্ভাবন জন্য যোগশাস্ত্রকে প্রধান বলিয়া থাকেন এবং অনীশ্বরবাদীরা কিরূপে মুক্ত হইবে, এই বলিয়া তদ্বিষয়ে মহতীযুক্তি (সম্যক্‌রূপে) নির্দ্দেশ করেন। সাংখ্যমতাবলম্বী দ্বিজাতিগণও এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন যে, যে ব্যক্তি ইহলোকে সমস্তগতি অবগত হইয়া বিষয়-ভোগে বিরত হন, তিনি নিশ্চয়ই স্বদেহবিনাশের পর বিস্পষ্টরূপে নিমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত মহাপ্রাজ্ঞ সাংখ্যমতানুসারী পণ্ডিতবর সাংখ্যকে মোক্ষদর্শন কহেন। হে যুধিষ্ঠির! উভয়পক্ষে বলবৎ যুক্তি বিদ্যমান থাকিলেও যে পক্ষ আপনার সম্মত, তদ্বিষয়েই যুক্তি গ্রাহ্য হয় এবং স্ব স্ব পক্ষে স্বীয় স্বীয় মতানুসারীর বাক্য হিতকর হয়, যেহেতু আপন আপন সম্প্রদায়ভুক্ত শিষ্টদিগের মত তবাদৃশ সাধু-লোকেরা গ্রহণ করিয়া থাকেন। হে তাত!

যোগ মতানুযায়ী ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষ প্রমাণকে কারণ বলেন এবং সাংখ্যেরা শাস্ত্রসিদ্ধ অর্থাৎ শ্রুতি প্রমাণকে কারণ কহেন. এই উভয় মতই যথার্থ বলিয়া আমার সম্মত হইতেছে। রাজন্! সাধুসম্মত এই উভয় মতই যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইলে পরমগতির হেতু হয়। হে অনঘ! শৌচাচার, সর্ব্বভূতে দয়া ও অহিংসা প্রভৃতি ব্রতসমূহের অনুষ্ঠান, এই সমস্ত উভয় মতেই আছে, পরন্তু উভয় দর্শন সমান নহে।

রাজন্! বন্ধন-ছেদনে সমর্থ—যোগী ব্যক্তি আপনার মুক্তি-বিষয়ে আপনিই প্রভু হইয়া থাকেন, ইহার আর সন্দেহ নাই। হে ভারত! আমি তোমার নিকট যোগপ্রাপ্ত এইরূপ সকল বলিলাম নিদর্শন জন্য পুনর্ব্বার সূক্ষ্মরূপে সমস্ত বলিব হে বিভো! আত্মার সমাধি ও ধারণা বিষয়ে আমি সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত সকল বলিতেছি শ্রবণ কর। যেমন অপ্রমত্ত সাবধান ধন্বী পক্ষীকে নিহত করে, তদ্রূপ যুক্তযোগী অর্থাৎ যোগসিদ্ধ পুরুষ নিশ্চয়ই সর্ব্বতোরূপে মুক্তিলাভ করেন। যেমন প্রশান্তচিত্ত কর্ম্মাসক্ত পুরুষ মস্তকস্থিত জলপূর্ণপাত্রে নিশ্চলরূপে মন সমাধান করিয়া সোপানে আরোহণ করে, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত যুক্তযোগী আত্মাকে নিশ্চল ও ভাস্করের ন্যায় নির্ম্মল করিয়া থাকেন। হে কুন্তীনন্দন! যেমন কর্ণধার, সমাহিত হইয়া মহার্ণবগত নৌকাকে সত্বর কূলে আনয়ন করে, তদ্রূপ তত্ত্ববিদ্‌ব্যক্তি যোগযুক্ত হইয়া আত্ম-সমাধান করতঃ এই দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্ল্লভ স্থান প্রাপ্ত হন।

হে নরপাল! মহাপ্রাজ্ঞ সাংখ্যমতাবলম্বীরা সাংখ্যসম্মত মহাব্যাপক জ্ঞান-যোগে গুণশত দ্বারা গুণ সকল, দোষশত দ্বারা দোষ সকল, ও বিবিধ হেতুশত দ্বারা নানাবিধ হেতুসকল যথাতথরূপে অবগত হইয়া সলিল-ফেন-সদৃশ, বিষ্ণুমায়ায় আবৃত বিচিত্র-ভিত্তি সদৃশ নলতৃণের ন্যায় অন্তঃসারবিহীন অন্ধকারাবৃত বিল সম, বর্ষবুদ্‌বুদতুল্য সুখহীন, বিনষ্ট প্রায়, বিনাশানন্তর অবশ, এই লোক সকল দর্শন করতঃ পঙ্কমার্গে অবশ মাতঙ্গের ন্যায় তমোনিমগ্ন রজ ও প্রজাকৃত স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহস্থিত রজঃ ও তমোগুণসম্ভূত তাদৃশ অশুভ গন্ধ ও সত্ত্বগুণ সম্ভূত স্পর্শজ পুণ্য গন্ধ সমস্ত জ্ঞানশস্ত্র দ্বারা সবলে ছেদন করিয়া, যাহার দুঃখরূপ সলিল, চিন্তা ও শোকরূপ ভয়ঙ্কর হ্রদ, ব্যাধি ও মৃত্যুরূপ মহাগ্রাহ, ভয়রূপ মহাসর্প, তমোরূপ কূর্ম্ম, রজোরূপ মকর, প্রজ্ঞারূপী তরী, স্নেহ-রূপ পঙ্ক, জ্ঞানরূপ দ্বীপ, সত্যরূপ তীর, হিংসারূপ প্রবলবেগ, রস সম আকর নানা প্রীতিরূপ মহারত্ন, দুঃখ ও জ্বররূপ সমীরণ, শোক ও তৃষ্ণারূপ মহা আবর্ত্ত, তীক্ষ্ণ ব্যাধিরূপ মহাহস্তী—* * * একাদৃশ বাড়বানল সমন্বিত সকল ভূতের দয়ারূপ সমুদ্র—জ্ঞান যোগ দ্বারা পার হইয়া থাকেন। হে কুন্তীনন্দন! সাংখ্যেরা এইরূপ আলোচনা দ্বারা দুস্তর জন্মযুক্ত স্থূলশরীর বিস্মৃত হইয়া হৃদয়রূপ বিমল আকাশ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তথায়, যেরূপ মুখসংযোগে অন্তশ্ছিদ্র মৃণালদণ্ড দ্বারা আকর্ষিত সলিল অন্তর মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ চতুর্দ্দশভুবনবিহারী—আত্মা প্রণিহিত মনোদ্বারা সেই সুকৃতিমান্ সাংখ্যগণের অন্তর মধ্যে

প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে চতুর্দ্দশ ভুবনগত বিষয় সকল প্রকৃষ্টরূপে অবগত করাইলে তাঁহারা সেই সকল বিষয় প্রাপ্ত হন।

রাজন্! মহাপ্রাজ্ঞ সাংখ্যগণ এই জ্ঞান দ্বারা পরমগতি প্রাপ্ত হন, অতএব কোন জ্ঞানই ইহার সমান নহে। হে কুন্তীনন্দন! আমার বিবেচনায় এই সাংখ্যজ্ঞানই অতি উৎকৃষ্ট ও অক্ষর অচঞ্চল সনাতন পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপ, অতএব ইহাতে তোমার আর সংশয় নাই। মনীষিগণ যাঁহাকে অদ্বৈত, উৎপত্তি-স্থিতি ও ধ্বংসরহিত, নিত্য অখণ্ড, জগৎকর্ত্তা কূটস্থ ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান, সাধু, বিপ্র ও দেবগণ সেই ব্রাহ্মণ-দিগের পরম হিতকারী অচ্যুত অনন্তদেবকে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। বিষয়জ্ঞান-সম্পন্ন যিনসকল মায়িক গুণ দ্বারা তাঁহাকে স্তব করেন এবং অমিত-দর্শন সাংখ্য ও যোগসিদ্ধ যোগীগণ তাঁহাকে জগৎকারণ বলিয়া স্তব করেন।" (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ।)

(ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ দে।

যোগ-দর্শন-ভাষ্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮

গুরূপদেশ অনুসারে ওঁকারের জপ এবং তদুৎপন্ন যে জ্ঞানময় ভাব তাহার সাধনা করিতে হইবে। এই সূত্রোক্ত ক্রিয়ার নিগূঢ়তত্ত্ব গুরুমুখে জানিতে হয়। তবে শিষ্য-বোধের জন্য কথঞ্চিৎ কথিত হইতেছে। পূর্ব্বে "ঈশ্বর-প্রণিধানাৎ বা" সূত্রে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ঈশ্বর-প্রণিধানের কথা বলা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য, আত্মসংস্থ যোগীর দৃঢ় ভাবে আত্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষানুভব করা। এই সাধনা সম্প্রজ্ঞাতসমাধির পরের অবস্থা। পরে "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ" সূত্রে ঈশ্বর-চৈতন্যের ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বৈশ্বানর এই অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, আর জীবের প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্ব এই তিন অবস্থার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। বিশ্ব অবস্থায় বৈশ্বানরের উপাসনা, তৈজস অবস্থায় হিরণ্য-গর্ভের উপাসনা এবং প্রাজ্ঞ অবস্থায় ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে।

নিষ্কামকর্ম্মযোগ ও প্রাণায়ামাদি—ক্রিয়া হইতে সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি পর্য্যন্ত বৈশ্বানরের উপাসনা, পরে সম্প্রজ্ঞাত-সমাধির পরে যোগজ-প্রজ্ঞা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ-উপলব্ধি, হিরণ্য-গর্ভের উপাসনা এবং নির্ব্বিকল্পসমাধির সময় মহাবাক্য-বিচার দ্বারা "সোঽহং" ভাবে ঈশ্বর-উপাসনা; ঐ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে যে ওঁকার-ক্রিয়া করিতে হয়, তাহাই "তজ্জপস্ত-দর্থভাবনম্।" কিন্তু জীবের বিশ্ব অবস্থায় যে 'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্' তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বিশ্ব অবস্থার এবং প্রাজ্ঞ অবস্থায় ওঁকার-ক্রিয়ার কথা বলা যাইতেছে।

প্রাজ্ঞ অবস্থায় ওঁকারক্রিয়া—

যোগবাশিষ্ঠ হইতে এই ওঁকার-ক্রিয়ার কথা কথঞ্চিৎ বর্ণিত হইতেছে—

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি নির্ণীয় মিতয়া ধিয়া ধবলয়া মুনিঃ
বদ্ধপদ্মাসনস্তস্থাবর্দ্ধোন্মীলিতলোচনঃ। ৭৮
ওঁকার-মকরোত্তার-স্বর-মূর্দ্ধগত ধ্বনিঃ।
সমাগাহতলাজ্জলঘণ্টাকুণ্ঠমিবারবং। ৭৯

ওমুচ্চারয়তস্তস্য সম্বিত্তত্ত্বে উদণ্ডমুখে।
যাবদোঙ্কারমূর্দ্ধন্তে বিততে বিমলাত্মনি। ৮০
সার্দ্ধত্রিংশাত্মমাত্রস্য প্রণবাংশ স্ফুটাবরে।
প্রণবস্য সমাক্ষুব্ধ-প্রাণাবলিত-দেহকে। ৮১
রেচকাখ্যোঽখিলং কায়ং প্রাণনিষ্ক্রমণক্রমঃ।
ব্যক্তীচকার পীতাম্বুরগস্ত্যইব সাগরং। ৮২
অতিষ্ঠৎ প্রাণসবনশ্চেতসা পূরিতেঽম্বরে।
হৃদয়াগ্নিজ্বলোজ্জ্বালো দদাহ মলিনং বপুঃ। ৮৩
যাবদিচ্ছমবষ্টেব্যা প্রণবস্যাপরে ক্রমে।
বভূব ন হঠাদেব হঠযোগোহি দুঃখদঃ। ৮৪
অপেতরাংশাবসরে প্রণবস্য সমস্থিতৌ।
নিস্পন্দঃ কুম্ভকোনাম প্রাণানামভবৎ ক্রমঃ। ৮৫
ন বহির্নান্তরোনাধো নোর্দ্ধং নাশস্ম তত্রতে।
সংক্ষোভমগমন্ প্রাণা অবসন্ স্তম্ভিতা ইব। ৮৫
দগ্ধদেহপুরোবহ্নিঃ শশামাশ্বনিবৎ ক্ষণাৎ।
অদৃশ্যাবসিতং ভস্ম শরীরং হিমপাণ্ডুরং। ৮৭
যত্র কর্পূরশয্যায়াং স্বপ্তানীব সুখোচিতং।
শরীরাস্থীনি লক্ষ্যন্তে নিস্পন্দানি সিতানি চ ৮৮
তত্তস্ম পবনাধীনং সাস্থিবায়ুরচিক্ষিপৎ। ৮৯
উদ্দণ্ডপবনোক্তমাবৃত্য গগনং ক্ষণাৎ।
শারদীবাত্র মিহিকা কাপি ভস্মাস্থিসংযযৌ। ৯০
যাবদিচ্ছমবষ্টেব্যা প্রণবস্যাপরে ক্রমে।
বভূব ন হঠাদেব হঠযোগোহি দুঃখদঃ। ৯১
ততস্তৃতীয়াবসরে প্রণবস্যোপশান্তিরে।
পূরণাৎ পূরকো নাম প্রাণানামভবৎ ক্রমঃ। ৯২
তস্মিন্নবসরে প্রাণাশ্চেতনামৃতমধ্যমাঃ।
ব্যোম্নি শীতলতামীয়ু র্হিমসংস্পর্শসুন্দরীং। ৯৩
ক্রমাদ্গগনমধ্যস্থাশ্চন্দ্রমণ্ডলতাং যযুঃ।
কলাকলাপসম্পূর্ণে তে তস্মিংশ্চন্দ্রমণ্ডলে। ৯৪
রসায়নময়া ধীরাঃ সম্পন্নাঃ প্রাণবায়বঃ।
সা পপাতাম্বরাদ্ধারা শেষে শারীর ভস্মনি। ৯৫
তদভূদিন্দুবিম্বাবং চতুর্বাহুধরং শুভং।
উদ্দালকশরীরং তৎ নারায়ণতয়োদিতং। ৯৬

বশিষ্ঠ কহিলেন—উদ্দালক মুনি এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া তীক্ষ্ণ শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা বদ্ধ হইয়া, অর্দ্ধনিমীলিতনেত্র হইয়া ধ্যান স্থিত হইলেন। ৭৮। তার-স্বরোচ্চারণ দ্বারা মধ্যগত ধ্বনিতে ওঁকার-শব্দ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, যেমত সমাগাহত ঘণ্টারব হয়, সেইরূপ। ৭৯। ওঁকার উচ্চারণ কালে ওঁকার-মস্তকে সম্বিৎ তত্ত্ব বিস্তৃত হইয়া স্থিত হইলে, সার্দ্ধত্রিংশৎ মাত্রার প্রথমাংশের স্ফুট প্রণব-শব্দ হইল, প্রণবোচ্চারণ দ্বারা শরীর ক্ষোভযুক্ত হইল, তদনন্তর রেচক প্রাণ-নিষ্ক্রমণ-বায়ু সমস্ত শরীরকে পূর্ব্বমত ব্যক্ত করিল। পীতসমুদ্র অগস্ত্য যেমন রেচন দ্বারা সাগর ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ। ৮০। ৮১। ৮২ যাবৎ পর্য্যন্ত চিত্ত দ্বারা পরিপূর্ণ আকাশে বায়ু স্থিত হইল, তাবৎ প্রদীপ্ত জ্ঞানযুক্ত হৃদয়স্থিত অগ্নি, মলিন দেহকে দগ্ধ করিল। ৮৩। যাবৎ পর্য্যন্ত ইচ্ছা থাকে, তাবৎ এইরূপ অবস্থায় থাকিবে। প্রণবের অন্য রূপাদি-ক্রমেতে হঠাৎ সিদ্ধি হয় না, এজন্য হঠযোগ দুঃখদ হয়। ৮৪। দ্বিতীয় প্রণবাংশের উচ্চারণ-কালে প্রণবের সমানস্থিতি হইলে স্পন্দ-রহিত কুম্ভক নামে প্রাণের ক্রম হয়। ৮৫। ব্যাহ্যে অন্তরে উর্দ্ধ অধঃস্থানে দশদিকে কোন রূপে কুম্ভকসময়ে প্রাণের ক্ষোভ হয় না, প্রাণ স্তম্ভিতের ন্যায় হইয়া থাকেন। ৮৬। অগ্নি দেহ দগ্ধ করিয়া বজ্রাগ্নির ন্যায় ক্ষণেতে শান্ত হন, শরীর তৎকালে অদৃশ্য হইয়া হিমের ন্যায় পাণ্ডরবর্ণ ভস্মময় হয়। ৮৭। যে কর্পূরবর্ণ ভস্ম শয্যাতে সুপ্তের ন্যায় এবং শরীরের শুক্লবর্ণ অস্থি সকল সুখেতে নিস্পন্দের ন্যায় বোধ হয়। ৮৮। সেই ভস্মাস্থি

প্রচণ্ড পবন দ্বারা উদ্ভূত হইয়া ক্ষণেতে গগনে গত হইল এবং শরৎকালের মেঘের ন্যায় কোন স্থানে গমন করিল। ৮৯। ৯০। যাবৎ ইচ্ছা তাবৎ এই অবস্থা হয়, প্রণবের অপর জপাদি-ক্রমে হঠাৎ সিদ্ধি হয় না, এজন্য হঠযোগ দুঃখদ হয়। ৯১। তদনন্তর প্রণবের শান্তিদ তৃতীয়াংশোচ্চারণ-কালেতে বায়ুর পূরণ দ্বারা প্রাণবায়ুর পূরক নামে ক্রম হয়। ৯২। সেই অবসরকালে প্রাণ-সকল চেতনা ও মৃত্যুর মধ্যস্থিত হইয়া হিম-স্পর্শ দ্বারা সুন্দর শীতল হন। ৯৩। সেই প্রাণবায়ু সকল গগনস্থ হইয়া চন্দ্রমণ্ডলস্থ প্রাপ্ত হন। ষোড়শ কলাতে পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল হইলে সেই প্রাণবায়ু স্থির হইয়া রসায়ন নাম প্রাপ্ত হন। পরে ধারারূপে তাঁহার শেষ, শরীরভস্মতে পতিত হন। ৯৪। ৯৫ পরে চন্দ্র হইতে বিস্তৃত চতুর্বাহুধারি সুন্দর উদ্দালকের শরীর নারায়ণ রূপে উদিত হইল। ৯৬

এই সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেন—

তস্মৈ সহোবাচ। এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চা-পরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারস্তস্মাদ্ বিদ্বানেতেনৈবায়-তনেনৈকতরমন্বেতি ॥ ২ ॥

স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত সতেনৈব সংবেদ-স্তূর্ণমেব জগত্যামভি সম্পদ্যতে। তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি ॥ ৩ ॥

অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভিরুন্নীয়তে স সোমলোকম্। স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে ॥ ৪

যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণোমিত্যেতেনৈ-বাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যত এবং হবৈ স পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ। ৫।

তিস্রোমাত্রা মৃত্যুমতীঃ প্রযুক্তা
অন্যোন্যসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ
ক্রিয়াসু বাহ্যান্তরমধ্যমাসু
সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ ॥ ৬

প্রশ্নোপনিষৎ।

তাঁহাকে তিনি বলিলেন, "হে সত্যকাম, এই সে ওঁকার, ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম, সুতরাং এই উপায় দ্বারাই জ্ঞানী ব্যক্তি এই দুয়ের একককে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২

যদি তিনি [কেবল] একমাত্র (অর্থাৎ অকার মাত্র) ধ্যান করেন, তবে তিনি তদ্দ্বারাই সম্বোধিত হইয়া শীঘ্রই পৃথিবীতে [পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। তাহাকে ঋঙ্মন্ত্রসমূহ মনুষ্যলোকে আনয়ন করে, তিনি সেখানে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া মহিমা অনুভব করেন ॥ ৩

যদি তিনি দ্বিতীয়মাত্র (অর্থাৎ উকার) মনে [অভিধ্যান করেন তবে] তিনি অন্ত-রীক্ষে গমন করেন, তিনি যজুর্মন্ত্র সমূহ দ্বারা সোমলোকে উন্নীত হয়েন। সোমলোকে মহিমা অনুভব করিয়া, তিনি [মনুষ্যলোকে] ফিরিয়া আইসেন ॥ ৪ ॥

পুনশ্চ, যিনি ওঁ এই ত্রিমাত্রযুক্ত অক্ষর দ্বারা এই পরম পুরুষের ধ্যান করেন, তিনি তেজোময় সূর্য্যে (অর্থাৎ সূর্য্যলোকে) উপনীত হয়েন। যেমন সর্প ত্বক্ হইতে মুক্ত হয়, তেমনি তিনি পাপ হইতে মুক্ত হয়েন।

তিনি সামমন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মলোকে (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের সত্যলোকে) উন্নীত হয়েন। সেই জীবঘন (অর্থাৎ সর্ব্বজীবাধার হিরণ্যগর্ভ) হইতে (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভপদ হইতে) তিনি পরাৎপর পুরিশয় (অর্থাৎ সর্ব্বশরীরানুপবিষ্ট, পুরুষকে দর্শন করেন। সেই [বিষয়] এই শ্লোকদ্বয় [উক্ত] হইতেছে। ৫

তিন মাত্রা (অর্থাৎ ওঁকারের অকার, উকার, মকার, এই মাত্রাত্রয়) [স্বতন্ত্ররূপে এবং ব্রহ্মদৃষ্টি ব্যতীত] মৃত্যুগোচর (অর্থাৎ তদুপাসকগণ তদ্দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারেন না।) [কিন্তু এই মাত্রাত্রয়] সম্যক্‌রূপে সম্পাদিত বাহ্য অভ্যন্তর ও মধ্যম (অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা পুরুষের অভিধ্যানরূপ ক্রিয়া সমূহে পরস্পর সম্বন্ধ ও সংশ্লিষ্ট হইয়া প্রযুক্ত হইলে, জ্ঞানী (অর্থাৎ ওঁকারতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তি) বিচলিত হয়েন না। * (৬) প্রশ্নোপনিষৎ

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ১২

মাত্রাশূন্য, চতুর্থ অব্যবহার্য্য পঞ্চবিষয়াতীত, মঙ্গলস্বরূপ ও অদ্বৈত—এরূপ ওঁকারই আত্মা। যিনি এরূপ জানেন তিনি আত্মাতে (অর্থাৎ পরমাত্মাতে) প্রবেশ করেন। ১২

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।

(সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত উপনিষদ্।)

বিশ্ব অবস্থায় ওঁকার-ক্রিয়ার কথা—

অনাহতপদ্মে ও আজ্ঞাচক্রের উপরে নিরালম্বপুরে ওঁকার আছেন। এখন দুইস্থলে একই ওঁকার কিরূপে আছেন। ইহার সামঞ্জস্য এইরূপ—অনাহতপদ্মে ধ্বনিরূপে ওঁকার বিরাজিত আছেন। ইহা অনাহতপদ্মে স্বতঃধ্বনিত হইতেছে। এই ওঁকার হইতেই হংস ও তদ্বিপরীত সোঽহং উচ্চারিত হয় এবং সোঽহং হইতে হ ও স লোপে ওঙ্কারই থাকে। স্বতঃ উত্থিত এই প্রণবধ্বনিকে 'নাদ' ও কহে। গুরূপদেশ অনুসারে ক্রিয়া করিলে এই স্বতঃ উত্থিত ওঙ্কার জপ নিজের মধ্যে শ্রুতিগোচর হয়। এই প্রকার ওঙ্কারজপকেই মহর্ষি পতঞ্জলি 'তজ্জপঃ' কহিয়াছেন। ইহার সাধনা গুরূপদেশগম্য। আজ্ঞাচক্রের উপর নিরালম্বপুরীতেই মহাজ্যোতি-রূপ ওঙ্কারদর্শন হয়। এই ওঙ্কারই সমস্ত দেবদেবীর বীজরূপ। অনাহতপদ্মে ওঙ্কার-ধ্বনি শ্রবণ এবং নিরালম্বপুরীতে ওঙ্কার দর্শন হয়। এই ওঙ্কারদর্শন লক্ষ্য করিয়া 'তদর্থভাবনম্' এই কথা বলিয়াছেন। গুরূপদেশানুসারে সাধনদ্বারা ওঙ্কার দর্শন হয়।

সংক্ষেপভাবে ওঙ্কারে কি আছে লেখা যাইতেছে—

ওঁ—অ—উ—ম (অ—ব্রহ্মা, উ—বিষ্ণু, ম—শিব।)

অ, উ, ম, এই তিনের প্রত্যেকের কলা—

অ—সৃষ্টি, ঋদ্ধি, স্মৃতি, মেধা, কান্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, স্থিরা, স্থিতি, সিদ্ধি এই দশ কলা অকারসম্ভূত।

উ—জরা, পালিনী, শান্তি, ঈশ্বরী, রতি, কলিমা, বরদা, আহ্লাদিনী, প্রীতি, দীর্ঘা—উকারসম্ভূত কলা।

ম—তীক্ষ্ণা, রৌদ্রী, ভয়া, নিদ্রা, তন্দ্রী, ক্ষুৎ, ক্রোধিনী, ক্রিয়া, উৎকারী, মৃত্যু—মকারসম্ভূত কলা।

---

* উপযুক্ত ধ্যান ক্রিয়ায়া অববোধার্থং মাণ্ডুক্যোপনিষদ্বিশেষেণ দ্রষ্টব্যা।

দেবতা—ওঙ্কারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রতিষ্ঠিত।
গুণ—সত্ব, রজ, তম।
শক্তি—ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তি

এই জন্য ওঙ্কারকে 'ত্রয়ী' কহে।

অ, উ, ম,—অকার নানারূপ, উকার বিন্দুরূপ, মকার কলারূপ এবং ওঙ্কার জ্যোতিরূপ। সাধক সাধনসময়ে প্রথমে নাদ শুনিয়া নাদলুব্ধ হন, পরে বিন্দুলুব্ধ, তৎপর কলালুব্ধ হইয়া সর্ব্বশেষে জ্যোতি দর্শন করিয়া থাকেন।

ওঁকারের পঞ্চ কলাঃ—যথা—
উর্ম্মী, ধূম্রী, জ্যোতিঃ, জ্বালা, এবং অতীতা

সদ্‌গুরুর উপদেশ-ক্রমে সাধন করিলে শরীর-মধ্যে ক্রমানুসারে এই পঞ্চকলার সাক্ষাৎকার হয়।

মোটামুটি ভাবে প্রণব-মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে ;—পঞ্চদেব, পঞ্চমাতৃকা, পঞ্চবাক্‌, পঞ্চঅবস্থা, পঞ্চমাত্রা, পঞ্চবেদ, পঞ্চভূত, পঞ্চক্রিয়া, পঞ্চদিক্‌, পঞ্চঋক্‌, পঞ্চকোণ, পঞ্চমুদ্রা, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চমার্গ, পঞ্চাঙ্গ পৃথক্‌বর্ণ পঞ্চগুপ্তিকা, পঞ্চঅভিমান; গায়ত্রীর পঞ্চপাদ, পঞ্চশক্তি, পঞ্চঅগ্নি, পঞ্চআনন্দ প্রভৃতি পঞ্চত্রিংশৎ পঞ্চক ওঁকারে আছে। কপিলগীতায় এই সমস্ত বিষয় সুন্দররূপে আলোচিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্যোতিষ।

(তুলনা)

বিজ্ঞানশাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতিষশাস্ত্র অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ হইলেও, প্রাচীন হিন্দুগণ এ বিষয়ে যে কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। আধুনিক পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া এবং পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতির সমবেত চেষ্টার ফলে জ্যোতিষশাস্ত্র যতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, প্রাচীন হিন্দু-জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণের জ্ঞান তাহা অপেক্ষা বিশেষ কম ছিল না। যখন মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, যখন বিদেশ-গমনাগমন করা অতিশয় ভয়াবহ ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইত, ইতিহাস যখন আরব্ধ হয় নাই, সেই নিবিড় তমসাচ্ছন্ন, জ্ঞানালোকবর্জ্জিত, সুদূর অতীত যুগের গৌরব-স্বরূপ আর্য্যঋষিগণ প্রণীত জ্যোতিষগ্রন্থগুলি আজিও তাঁহাদের অমানুষী প্রতিভার পরিচয় দিতেছে। এসম্বন্ধে Professor Brenand অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন যে—

"In our endeavour to become acquainted with the earliest periods in which Hindu Astronomy was extant, we are led into the Prehistoric age, which has to some extent been considered an age, comparable to early dawn, in which everything is still in a state of

obscurity, the feeble twilight of these far far distant times, enabling us only to perceive that there are objects aroud us which has a real existence, but the shadowy forms of which are extremely in distinct, and scarcely separable from the sorrounding gloom."

হিন্দু-জ্যোতিষের মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে, বাস্তবিকই ইতিহাসের উল্লিখিত সময়ের পূর্ব্বে যাইতে হয়।

সম্রাট আকবরের সভাপণ্ডিত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুলফজেল প্রধানতঃ ৯ টি জ্যোতিষসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের নাম যথাক্রমে—

ব্রহ্মসিদ্ধান্ত—	নারদসিদ্ধান্ত—
সূর্য্যসিদ্ধান্ত—	পরাশর সিদ্ধান্ত—
সোমসিদ্ধান্ত—	পুলস্ত্য সিদ্ধান্ত—
বৃহস্পতিসিদ্ধান্ত—	বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত—
গর্গসিদ্ধান্ত—	

ইহা ব্যতীত ব্যাসসিদ্ধান্ত, অত্রিসিদ্ধান্ত, কশ্যপসিদ্ধান্ত প্রভৃতি আরও ১১ টি সিদ্ধান্ত গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ভাস্করাচার্য্য প্রণীত সিদ্ধান্তশিরোমণি নামক গ্রন্থ ১১৫০ খৃঃ অঃ রচিত হয় এবং সিদ্ধান্ত পুস্তকের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দিনচন্দ্রিকা, গ্রহলাঘব প্রভৃতি গ্রন্থেও গণিত জ্যোতিষের সমধিক আলোচনা হইয়াছে। সমস্ত সিদ্ধান্তগ্রন্থের মধ্যে ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সোমসিদ্ধান্ত, বৃহস্পতি সিদ্ধান্ত এই ৪ খানি পুস্তক অপৌরুষেয় বলিয়া প্রচলিত। ব্রহ্মা, সূর্য্য, চন্দ্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবগণ পৃথিবীতে প্রচার করিবার জন্য এক একখানি পুস্তক রচনা করেন এইরূপ প্রবাদ আছে। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম ২ খানি পুস্তক আজিও আগ্রহসহকারে পঠিত হইয়া থাকে।

Colebrook কৃত অনুবাদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত গ্রন্থের দ্বাদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে বর্ত্তমান ত্রিকোণমিতি, পরিমিতি, ও বীজগণিতের কতকগুলি নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে। এক হইতে যে কোন সংখ্যা পর্য্যন্ত পরপর রাশিগুলির যোগফল বা তাহাদের প্রত্যেকের বর্গ বা ঘনফলের (sum of squares or cubes of natural numbers*) ধারাবাহিক যোগফল নির্ণয় করিবার নিয়মাবলী উহাতে উল্লিখিত আছে। ত্রিকোণমিতির উচ্চতা ও দূরতা (Heights and distance) সম্বন্ধীয় অনেক উদাহরণ উহাতে দৃষ্ট হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ গ্রন্থের অনেকগুলি অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত হইয়া গ্রন্থের গৌরবের লাঘব করিয়াছে, নতুবা ইহা একটী উৎকৃষ্ট গণিত-জ্যোতিষগ্রন্থ বলিয়া বিখ্যাত হইত, সন্দেহ নাই।

ইহার পরেই সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থ—বিশেষ আলোচনার যোগ্য। আজিও ঐ পুস্তক অনুসারে—পঞ্জিকার গণনা হইয়া থাকে। দেশভেদে কালভেদে যদিও ফলের কিছু তারতম্য হইয়াছে, কিন্তু ঐ গ্রন্থোক্ত নিয়মাবলী বহুপূর্ব্বে প্রস্তুত হইলেও আজিও পাশ্চাত্য-খগোল-বিজ্ঞানের সহিত সগৌরবে তুলনা করা যাইতে পারে। এই পুস্তকের বিশেষ আলোচনা দ্বারা, আকাশস্থিত গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি-সংক্রান্ত জটিল নিয়মাবলী প্রাচীন

হিন্দু পণ্ডিতগণের কতদূর আয়ত্তাধীন হইয়াছিল, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই হিন্দুজ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতদিগের লিখিত গ্রন্থগুলির বয়স নির্দ্ধারিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত-প্রণেতা ব্রহ্মগুপ্ত এবং অন্যান্য হিন্দুজ্যোতিষীগণ লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের রচনা-কালে রেবতী নক্ষত্রের কোন স্ফুট ছিলনা, অর্থাৎ রেবতী ইংরাজী (S Pisicame) নক্ষত্রের তখন Longitude or latitude ছিলনা, সুতরাং বিষুবরেখা ও রবিমার্গ সংযোগস্থলে অর্থাৎ (Equinoctial pointএ) তখন রেবতী নক্ষত্র অবস্থিত ছিল বুঝিতে হইবে। ইহা হইতে Colebrook সাহেব গণনা আরম্ভ করেন। তিনি ১৮০০ খৃঃ অঃ Star Atlas হইতে ঐ নক্ষত্রের কৌণিক অবস্থিতি বা Right Ascension স্থির করেন ১৫°—৪৯′—১৫″ এবং অয়নাংশ ৪৬′—৬০″ জানিতে পারেন, এবং ইহা হইতে ঐ নক্ষত্রের স্ফুট নির্ণয় করেন। * বার্ষিক অয়নাংশ পরিমাণ ৫০″, ৪ অর্থাৎ ৭২ বৎসরে প্রায় ১° ডিক্রি, ইহা হইতে ত্রৈরাশিক করিয়া স্থির করেন যে ১৮০০ খৃঃ অব্দের ১২২১ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৫৭৯ খৃঃ অঃ রেবতীনক্ষত্রের স্ফুট শূন্য ছিল। সুতরাং উহাই ব্রহ্মগুপ্তের রচনা কাল স্থির হইল।

এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রের কৌণিক অবস্থিতির হিসাবে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে, Bentley, সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুবাদক Bargers প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রাচীন সিদ্ধান্তগ্রন্থগুলির বয়স স্থির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। L Leonis Regulus অর্থাৎ মঘা নক্ষত্র হইতে এইরূপ গণনাদ্বারা ৫০৮ খৃঃ অঃ অশ্বিনীনক্ষত্রের স্ফুট শূন্য ছিল অর্থাৎ Equinoctial point এবং অশ্বিনী নক্ষত্র Arictis একত্রে ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এই সব আলোচনা করিলে, ইহাই বুঝিতে হয় যে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ঐ সকল জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত গ্রন্থগুলি প্রণীত হইয়াছে।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থের বয়স নির্ণয় করিতে অনেকে পরিশ্রম করিয়াছেন। Colebrook সাহেব ঐ পুস্তক লিখিত বিষয় হইতে লেখার সময় নির্দ্ধারিত করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন যে, যদিও ঐ পুস্তকের কতকগুলি খণ্ড (set of tables যাহা গ্রহাদির গতিবিধি বা অবস্থিতি পর্য্যালোচনা করিবার জন্য নিত্য ব্যবহৃত হইত) দেখিলে ৯২৮ খৃঃ অব্দে ঐ সকল প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বর্ত্তমান সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থ হয়ত বহু প্রাচীন ঐ নামীয় গ্রন্থের নূতন সংস্করণ না হইতে পারে এমন নহে। ভাল, যাহাই হউক গ্রন্থের মধ্যে এমন বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, যাহাতে রচয়িতার জীবনকালের সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে। গ্রন্থারম্ভেই সূর্য্যদেব, ময় নামক অসুরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ;—

বিদিতস্তে ময়া ভাবস্তোষিতস্তপসা হ্যহম্।
দদ্যাং কালাশ্রয়ং জ্ঞানং গ্রহাণাং চরিতং মহৎ ॥

১ ম অধ্যায় ৫ ম শ্লোক।

হে ময়, আমি তোমার মনের ভাবও অবগত হইয়াছি এবং তোমার তপস্যাদ্বারাও তুষ্ট হইয়াছি, অতএব গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি

* ইহার সম্পূর্ণ প্রমাণ উচ্চগণিত-সাপেক্ষ, Godfray প্রণীত Astronomy ১৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিষয়ক জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে তোমাকে উপদেশ দিতেছি॥

Professor Brenand সাহেব, এই ময় হয়ত কোন হিন্দুরাজার সভাপণ্ডিত বা কোন পণ্ডিতের শিষ্য হইতে পারে কিনা, সে সম্বন্ধে জানিতে চেষ্টা করিয়াও কিছু স্থির করিতে পারেন নাই। যাহাই যিনি ধারণা করুন, কিন্তু এই সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থ যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ, সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই।

সমুদায় গ্রন্থ খানি ১৪ টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহা কার্য্যে ব্যবহার করিবারই অধিক উপযোগী করিয়া রচিত। জ্যোতিষের মূল তত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা ইহাতে করা হয় নাই, বরং ঐ তত্ত্বগুলি কিরূপে প্রয়োগ করা যাইতে তাহা বুঝান হইয়াছে। একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এ সম্বন্ধে মত দিয়াছেন যে "It is however a work adapted not so much for the schools, as for the observer, and intended to instruct, not so much in the principles of the science as in the application of the rules."

প্রথম দ্বিতীয় অধ্যায়ে গ্রহগণের অবস্থান নির্ণয় করিবার নিয়মগুলি লিখিত আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সময় ও দিক্ সম্বন্ধে নিয়মগুলি লিখিত হইয়াছে।

৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। ৭ম হইতে ১১শ অধ্যায় সূর্য্য চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদির উদয়, অস্ত ও গ্রহযুতি (Conjunction) প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভূগোলাধ্যায়, ত্রয়োদশ অধ্যায় জ্যোতিষোপনিষদধ্যায় নামে খ্যাত। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে কালমান-বিভাগ বর্ণিত হইয়াছে। এই হইল ঐ গ্রন্থের মোটামুটি পরিচয়। ইহাতে আধুনিক জ্যোতিষতত্ত্বের অনেক সূক্ষ্ম বিষয় সুন্দর রূপে মীমাংসিত হইয়াছে,—বিস্তৃত আলোচনার দ্বারা বারান্তরে সে সব বিষয় দেখান হইবে। প্রথম অধ্যায়ের ২।১টী দৃষ্টান্ত দ্বারা পাশ্চাত্য জ্যোতিষ ও হিন্দুজ্যোতিষের যে ফলের ঐক্য আছে, তাহাই দেখাইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে লিখিত আছে:—

যোজনানি শতান্যষ্টৌ ভূকর্ণো দ্বিগুণানি তু।
তদ্বর্গতো দশগুণাৎ পদং ভূপরিধির্ভবেৎ॥
১ম অধ্যায় ৫৯ শ্লোক।

অর্থাৎ ৮০০ শত যোজনের দ্বিগুণ ১৬০০ যোজন, পৃথিবীর কর্ণ অর্থাৎ diameter, উহাকে বর্গ করিয়া, সেই বর্গকে ১০ গুণ করিয়া গুণফলের বর্গমূল লইলেই ভূ-পরিধি হইল।

$$\sqrt{(২ \times ব্যাসার্দ্ধ)^{২} \times ১০} = পরিধি$$

ইহাই বুঝাইতেছে। আরও সরল করিলে

২ ব্যাসার্দ্ধ × $\sqrt{১০}$ পরিধি ইংরাজীমতে ২ ব্যাসার্দ্ধ × $\frac{২২}{৭}$ পরিধি এই $\frac{২২}{৭}$ বা π (পাই) এর সঙ্গে $\sqrt{১০}$ এর বিশেষ সামঞ্জস্য আছে। যে Quadrature of circle লইয়া সমস্ত গ্রীক্ পণ্ডিতগণ মাথা ঘামাইয়াছেন, তাহা সূর্য্যসিদ্ধান্ত-গ্রন্থকার বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। শুধু তাহাই নহে। ইহা হইতে চন্দ্রের পরমলম্বন বা Horizontal

Parallal বাহির করিয়াছেন। সূর্য্য-সিদ্ধান্ত মতে ইহার পরিমাণ ৫৭'৬৮১ মিনিট, ইংরাজীমতে উহার. পরিমাণ ৫৭'—৬", Refraction (বলন) সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে, এরূপ ফলের ঐক্য করা কম কথা নয়।

চন্দ্রের রবি-যুতিকালের অর্থাৎ Synodic period এরও উহার ইংরাজীমতে গণনার সহিত বিশেষ ঐক্য আছে।

শীঘ্রগস্তাস্তপারেন কালেন মহতাল্পশঃ
তেষাং তু পরিবর্ত্তেন পৌষ্ণান্তে ভগণঃ স্মৃতঃ॥
১ ম অঃ ২৭ শ্লোক

অর্থাৎ গ্রহগণের একস্থান হইতে যাত্রা করিয়া পুনরায় সেইস্থানে ফিরিয়া আসার নাম—ভগণ।

ইন্দোরসাগ্নিত্রিত্রীষু সপ্তভূধরমার্গণাঃ॥
১ম অঃ ৩০ শ্লোক।

অর্থাৎ একমহাযুগে চন্দ্রের ভগণ ৫৭,৭৫৩,৩৩৬।

"বসুদ্ব্যষ্টাদ্রিরূপাশ্চ সপ্তাদ্রিতিথয়োযুগে॥"
১ম অঃ ৩৭ শ্লোক।

অর্থাৎ ১ যুগে সাবন-দিনসংখ্যা ১৫৭৭৯১৭৮২৮

"যুগে সূর্য্যজ্ঞ শুক্রাণাং খচতুষ্করদার্ণবাঃ॥"
১ম অঃ ২৯ শ্লোক

এক মহাযুগে সূর্য্যের ৪৩২০,০০০, ভগণ হয়।

ইহা হইতে চন্দ্রের রবিযুতি-কাল—
এক মহাযুগের সাবন দিন সংখ্যা—
গ্রহ-ভগণ—সূর্য্যভগণ—

$$= \frac{১৫৭৭৯১৭৮২৮}{৫৭৭৫৩৩৩৬ - ৪৩২০০০০} = ২৯.৫৩০৫৮৮৬$$

হয়।

ইংরাজীমতে Synodic period of the Moon = ২৯.৫৩০৮৮৭

Parker's Astronomy P. 152

৫৩।

ইহা অপেক্ষা গণনার ঐক্য আর কি হইতে পারে?

ইংরাজী Sine এর নাম "জ্যা"। বর্ত্তমান ইংরাজীমতের সহিত প্রাচীন ইংরাজী-মতের একটু পার্থক্য আছে। * প্রাচীন মতে কেবল লম্বকেই "জ্যা" বলিত; বর্ত্তমান মতে লম্ব ও কর্ণের অনুপাত বা Ratio কে ভূমিসংলগ্ন কোণের জ্যা বলে। দুয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে কর্ণ, যতই লম্বা হউক্ বর্ত্তমান মতের "জ্যা" একই থাকিবে, কিন্তু প্রাচীন মতে ঐ "জ্যা" পৃথক্ হইবে। সুতরাং প্রাচীন মতে ঐ "জ্যা" বলিলে, কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ণ বা ব্যাসার্দ্ধ ঘটিত "জ্যা" বুঝিতে হইবে। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই ব্যাসার্দ্ধ একটী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা স্থির করিয়াছিলেন। যদি কোন একটী বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধের সমান করিয়া পরিধির কোন অংশ কাটিয়া লইয়া, তাহার দুই প্রান্ত ঐ বৃত্তের কেন্দ্রের সহিত সংযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে কেন্দ্রস্থ ঐ কোণের পরিমাণ ৫৭°—.১৭'—৪৪" প্রায় হইবে, সূক্ষ্মরূপে ধরিলে ৫৭.°২৯৫৭৭৯৫১ হইবে। ইহাকে মিনিট করিলে ৩৪৩৭.৭৪৬ হইবে—ইহাকে মোটামুটি ৩৪৩৮ ধরা যাইতে পারে। হিন্দু-জ্যোতিষিগণ এই সংখ্যাকে "জ্যা" গণনার জন্য ব্যাসার্দ্ধ ধরিতেন। ইংরাজী Circular measur of angle ইহাই "মৌলিক একক" বা Unity। 'ব্যাসার্দ্ধ' বলিলেই হিন্দু-জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ—এই সংখ্যার কথা বলিতেছেন, বুঝিতে হইবে। এক্ষণে দেখা যাক্,

* Todhunter এর Trigonometry Page 47 কিম্বা Peacocks Algebra Vol. II Page 157 দ্রষ্টব্য।

কিরূপে উহাদ্বারা "জ্যা" নির্ণয় করা যাইতে পারে।

রাশিলিপ্তাষ্টমোভাগঃ প্রথমং জ্যার্দ্ধমুচ্যতে।
তত্তদ্বিভক্তলব্ধোন মিশ্রিতং তদ্দ্বিতীয়কম্॥

২ য় অঃ ১৫ শ্লোক।

আদ্যেনৈবং ক্রমাৎ পিণ্ডান্ ভক্ত্বালব্ধোন সংযুতাঃ।
খণ্ডকাঃস্যুঃ চতুর্ব্বিংশ জ্যার্দ্ধপিণ্ডাঃ ক্রমাদমী॥

২ য় অঃ ১৬ শ্লোক।

অর্থাৎ এক রাশিস্থ যত ডিগ্রী (৩০°) আছে, তাহার ৮ম ভাগের এক ভাগই প্রথম "জ্যা।" এই প্রথম জ্যাকে প্রথম 'জ্যা' দিয়া ভাগ কর এবং প্রথম 'জ্যা' প্রথম 'জ্যা' এর সহিত যোগ কর অর্থাৎ দ্বিগুণিত কর, এই যোগফল হইতে ঐ ভাগফল বিয়োগ কর, তাহা হইলে দ্বিতীয় 'জ্যা' হইবে।

(১৫ শ্লোক)

এরূপে পর পর যত জ্যা পাওয়া যাইবে, তাহাদের সমষ্টিকে প্রথম জ্যা দ্বারা ভাগ কর। এবং প্রথম 'জ্যা' হইতে এই ভাগফল বিয়োগ কর, এই বিয়োগফল শেষের লব্ধ 'জ্যা' ফলে যোগ কর, তাহা হইলে পরবর্ত্তী জ্যা পাইবে।

১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এই কল ত্রৈরাশিকেঃ অঙ্কে লিখিলে

$$\text{জ্যা}(\text{ম}+1)\text{ক}=\text{জ্যা}(\text{মক})+\text{জ্যা}(\text{ক})-\frac{\text{জ্যা}(\text{ক})+\text{জ্যা }২\text{ক}+\ldots\text{জ্যা}(\text{মক})}{\text{জ্যা}(\text{ক})}$$

জ্যা (ক) = ২২৫ ধরিলে

ম = ১ ধরিলে জ্যা (২ ক) = ২২৫ +

$$২২৫-\frac{২২৫}{২২৫}=৪৪৯ \text{ হইল।}$$

পঞ্চদশ শ্লোক অনুসারে—

$$\text{ক}=\frac{৩০°}{৮}=৩°-৪৫'$$ এইরূপে ২ক, ৩ক ইত্যাদি বাহির করা যাইতে পারে।

হিন্দুমতে—

জ্যা (ক) = ২২৫ ক = ৩° − ৪৫′
জ্যা (২ক) = ৪৪৯ ২ক = ৭° − ৩০′
জ্যা (৩ক) = ৬৭১ ইত্যাদি, ৩ক = ১১° − ১৫′ ইত্যাদি।

ইহাকে বর্ত্তমান ইংরাজীমতের জ্যা বা sine এর সহিত তুলনা করিতে হইলে, লব্ধ সংখ্যাগুলিকে ৩৪৩৮ দিয়া ভাগ করিতে হইবে।

$$\frac{২২৫}{৩৪৩৮}=\text{জ্যা}\ (৩°-৪৫')=.০৬৫৪৪৫$$

$$\frac{৪৪৯}{৩৪৩৮}=\text{জ্যা}\ (৭''-৩০')=.১৩০৫৯$$

$$\frac{৬৭১}{৩৪৩৮}=\text{জ্যা}\ (১১°-১৫')=.১৯৫১৮$$

Chambers' Lagarithm table এ ঐ সব কোণের জ্যা বা Natural sines যথাক্রমে .০৬৫৪০৬, .১৩০৫২৬২, .১৯৫০৯০৩ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সহিত প্রাচীন-মতে গণনায় যে মিল দেখা যাইতেছে, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়জনক। বারান্তরে অন্যান্য বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ, বি, ই।
যশোহর।

নীলাম্বরের কথা।

ঊনবিংশ শতাব্দী ধীরে ধীরে কাল-সাগরে—অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, বিংশ শতাব্দী বিবিধ জ্ঞান এবং উদ্ভাবনীশক্তির ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া, তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। তড়িৎ ও তৈল হইতে উৎপন্ন বাষ্পচালিত যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতিতে—মটরকার, এরোপ্লেন প্রভৃতির আবিষ্কারে—জগৎ চমকিত হইয়াছে। জগদীশের দ্বারা বস্তুতত্ত্ব এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারায় বহু প্রকার ধাতব পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। রেডিয়াম্ নামক পদার্থের আবিষ্কার হওয়ায় "সাত রাজার ধন মাণিকে'র সন্ধান মিলিয়াছে। তাম্র, লৌহ প্রভৃতি কতিপয় ধাতুকে বিজ্ঞানের সাহায্যে স্বর্ণে রূপান্তরিত করার সম্ভাবনা জানা গিয়াছে। এই সকল বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহিত জ্যোতিঃশাস্ত্রেরও নিতান্ত কম উন্নতি হয় নাই। গণিতের সাহায্যে লক্ষকোটিযোজন দূরে স্থিত জ্যোতিষ্কগুলির পরস্পরের দূরত্ব নির্ণীত হইতেছে, তাহাদের স্বরূপ—তাহারা কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, কি উপাদানে তাহারা গঠিত, তাহাদের বর্ণ, আলোকের অবস্থা, গতির বেগ প্রভৃতি স্থিরীকৃত হইয়াছে। এমন সময়ে উত্তরাকাশে পরশু নামক নক্ষত্ররাশির মধ্যে একটী নূতন নক্ষত্রের আকস্মিক আবির্ভাবে জগতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদগণের হৃদয় বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল। পরশু রাশিতে নূতন আবির্ভূত হওয়ায় ইহাকে জ্যোতির্বিদগণ নবপরশু নামে অভিহিত করেন।

নীলাম্বরে আমরা যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে বহু নক্ষত্র ঘন-সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, উহাদিগকে নক্ষত্রপুঞ্জ বলে. এইরূপ নক্ষত্রপুঞ্জের নক্ষত্রগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র দেখাইলেও উহাদের প্রত্যেকে এক একটী প্রকাণ্ড সূর্য্য-স্বরূপ, বহুলক্ষ-কোটিযোজন দূরে থাকায় আমাদের নিকট ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যাহা হউক্ ঐ সকল নক্ষত্র দৃশ্যতঃ স্থির বোধ হইলেও উহাদের গতি আছে। বহুদূরে স্থিত অদৃশ্য দুইটী নক্ষত্র এইরূপ গতি-ক্রমে পরস্পরের নিকট দিয়া যখন গমন করিতে থাকে, সেই সময়ে উহাদের মধ্যে স্পর্শ-সংঘাত সংঘটিত হয়। এই প্রকার সংঘর্ষণের ফলে নূতন নক্ষত্রের উৎপত্তি হয় বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।

এইরূপ সূর্য্য-সংঘাতোৎপন্ন নব নক্ষত্রের আকস্মিক আবির্ভাবের ন্যায় নভোমণ্ডলের আর কোন ঘটনাই মানুষের মনকে এরূপ বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিতে পারেনা, যাহাতে তাহারা নীলাম্বরের তত্ত্ব অবগত হইতে যত্ন করে। এইরূপ একটী ঘটনাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া হিপার্কাশ (Hipparchus) নক্ষত্রগণের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এইরূপ আর একটী ঘটনায় টাইকোব্রা (Tychobrahe) বীক্ষণাগারের বৈজ্ঞানিক আলোকাধার ও চুল্লি পরিত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত প্রান্তরে বসিয়া নীলাম্বরের তত্ত্ব উদ্ঘাটনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহারই

ফলে শূন্যমার্গে গ্রহ ও উপগ্রহগণের অবস্থানের বিবরণ জগতে প্রচারিত হইয়াছে। গ্যালিলিও (galileo) একটী সাময়িক নক্ষত্রের আবির্ভাব দর্শন করিয়া পৃথিবীর গতি-বিষয়ক কোপর্নিকশের মতবাদ প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান বৎসরে গোধা (Lacerta) নামক নক্ষত্র রাশিতে, এসপিন (Mr. Espin) সাহেব একটী নূতন নক্ষত্রের আবিষ্কার করিয়া, পৃথিবীর সর্ব্বদেশের শিক্ষিত জনমণ্ডলী এবং বৈজ্ঞানিক সংবাদ-পত্র-সম্পাদক সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। এই সকল সাময়িক নক্ষত্র সম্বন্ধে পরলোকগত পণ্ডিত নিউকম্ব (Prof. Newcomb) বলিয়াছিলেন "নূতন নক্ষত্রগুলি সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে চমৎকার-সম্বলিত বিস্ময়রসে নিমগ্ন করিয়া ফেলে; প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিতগণও ইহাদের স্বরূপ সহজে অবগত হইতে পারেননা।" পরলোকগত Miss Agnes clarke জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালিনী ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন, "এই সকল নবনক্ষত্র পূর্ব্বে কি ছিল, বর্ত্তমানেই বা ইহাদের স্বরূপ কি এবং ইহাদের পরিণতিই বা কোথায়, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। কিন্তু এই সকল তত্ত্বের প্রতিপাদ্যগুলির সম্বন্ধে নিবিড়ভাবে আলোচনা করিলে উহাদের উৎপত্তির প্রণালী সম্বন্ধে যে কিছু বিবরণ জানা যায় না তাহা নহে। একটী বস্তু যাহা চপকে নিষ্পন্দ ও অদৃশ্য ছিল, তাহা অকস্মাৎ রূপান্তরিত হইয়া প্রচণ্ড বেগে দীপ্তিমান্ হইয়া নক্ষত্ররূপে পরিজ্ঞাত হয়। এই পরিবর্ত্তন কিরূপে সংঘটিত হয়? কেই বা এই পরিবর্ত্তন ঘটায়? এই সমস্ত ব্যাপারের বিশালতা ধারণায় আনিতে মানুষের কল্পনা হা'র মানে। আমাদের নিকট পৃথিবী অতি প্রকাণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তথাপি আমরা কল্পনা বা গণিতের সাহায্যে ইহার ওজন অবগত হইতে পারি। আমাদের সূর্য্য আবার পৃথিবী হইতে লক্ষ গুণ বড়, কিন্তু ঐ সকল জ্বলন্ত অগ্নি-গোলকের কোন কোনটী আমাদের সূর্য্য হইতে০ লক্ষকেটিগুণ বড় হইয়া থাকে।" 'নব পরশু' তারাটী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে অদৃশ্য অবস্থা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতম অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, কিছুদিন এই অবস্থায় থাকিয়া, কয়েক মাস মধ্যেই পুনঃ অদৃশ্য হইয়া পড়ে।

গ্রহ-নক্ষত্র সকলেই বৃত্তাভাস (curved orbits) পথে ভ্রমণ করে, তজ্জন্য যখন উহাদের সংঘর্ষণ হয়, তখন পরস্পর সম্মুখীন অবস্থায় থাকা না দিয়া পাশাপাশি সংঘর্ষিত হইয়া, উভয়ে উভয়ের গন্তব্যপথে প্রধাবিত হয়। এই সংঘর্ষণ কালে অর্থাৎ যখন উভয়ে উভয়ের গাত্রসংলগ্ন হয়, তখন উভয় সূর্য্য হইতেই কতকটা অংশ জমাট বাধিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া একটী নূতন নক্ষত্র গঠন করে; এই নূতন নক্ষত্রটী জন্মগ্রহণ মাত্র এরূপ শক্তিশালী হইয়া পড়ে যে, সে তখন তাহার জনক-জননীর গমনপথ নিজের আয়ত্তাধীন করিয়া নিয়মিত করে, তাহার জনক-জননীও সন্তানবাৎসল্যপ্রযুক্ত

সেই নিয়মিত পথে ভ্রমণ করিতে থাকে। ইহারা অবস্থাভেদে যুগলনক্ষত্র, কামরূপ এবং বহুরূপ তারা, নীহারিকা, ধূমকেতু প্রভৃতির আকার পরিগ্রহ করিয়া নীলাম্বরে বিচরণ করিতে থাকে।

সূর্য্য-সংঘাতোৎপন্ন নূতন নক্ষত্র, যাহারা দুইটী সূর্য্যের স্পর্শসংঘর্ষে বিচ্ছিন্ন হইয়া জন্ম-লাভ করে, তাহারা, প্রজ্বলিত অগ্নিপিণ্ডের আকার গ্রহণ করিয়া স্বীয় উষ্ণতা-প্রভাবে ক্রমশই আয়তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, এইরূপে এক একটী নূতন নক্ষত্র এক ঘণ্টার মধ্যে আকাশের দশ লক্ষ মাইল স্থান অধিকার করিয়া বসে। নূতন নক্ষত্রটী যৎপরোনাস্তি উজ্জ্বল হইয়া থাকে, পরন্তু উহার আয়তন বৃদ্ধির সহিত উজ্জ্বলতা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; নূতন তারাটী যত শীঘ্র তাহার চরম উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়, উহার পরমাণুর সম্প্রসারণ তত সত্বর নিবারিত হয় না, উহা ক্রমশই অধিকতর প্রসারিত হইতে হইতে নীহারিকার ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। এদিকে এই সময়ের মধ্যে উহার উজ্জ্বলতা কমিতে কমিতে এমন অবস্থায় পরিণত হয় যে, উহার জ্যোতিঃ আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

পরমাণুর অন্তর্ব্বল, অর্থাৎ তাহার সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন-শক্তি, সমস্ত বস্তুতে সমান থাকেনা, পরন্তু পরমাণুর ইহা একটী ধর্ম্ম যে, একই প্রকার উত্তাপ প্রাপ্ত হইলে তাহাদের অন্তর্ব্বল সমান হয়। সীসকের একটী পরমাণু হাইড্রোজেনের একটী পরমাণু হইতে দুইশত সাতগুণ বেশী ভারী, কিন্তু সমান উত্তাপ প্রাপ্ত হইলে উভয়েরই অন্তর্ব্বল সমান হইয়া থাকে। উহাদের একের অর্থাৎ সীসকের বস্তু বা ভার বেশী, কিন্তু অপরের অর্থাৎ হাইড্রোজেনের বেগ বেশী। দুইটী নক্ষত্রের সংঘর্ষণ হওয়া মাত্রই তাহাদের সমস্ত উপাদান একই প্রকার গতিশক্তি-বিশিষ্ট হইয়া পড়ে অর্থাৎ নূতন নক্ষত্রটীর জন্ম মাত্রই তাহার ভারী বস্তু সীসক অসম্ভব উত্তপ্ত হয় এবং লঘু হাইড্রোজেন শীতল থাকে, কিন্তু যখন সীসকের সমান উষ্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন হাইড্রোজেন তাহার অপেক্ষা ভারী বস্তুর অন্তর্ব্বল নষ্ট করে এবং অস্বাভাবিক গতি-বেগ প্রাপ্ত হয়। নবপর্য্যু নামক নূতন নক্ষত্রটীর হাইড্রোজেন এর গতিবেগ অর্থাৎ সম্প্রসারিত হইবার শক্তি এক সেকেণ্ডে সহস্র মাইল পর্য্যন্ত জানা গিয়াছিল। এইরূপে লঘু এবং বায়বীয় পদার্থ অপেক্ষা-কৃত ভারী বস্তুকে পশ্চাতে রাখিয়া দূরে চলিয়া যায়, লঘু উপাদানগুলি মণ্ডলাকারে বাহিরের দিকে প্রসারিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে, আর ভারী পদার্থগুলি বায়বীয় আকার ধারণ করিলেও সঙ্কুচিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বিকিরণ-শক্তিহীন অত্যুজ্জ্বল পিণ্ডাকারে পরিণত হইতে চেষ্টা করে। এদিকে এই সময়ে লঘু উপাদানগুলিও তাহাদের বাহিরের দিকে সম্প্রসারিত হইবার শেষ সীমায় উপনীত হইয়া স্থির-ভাব অবলম্বন করে, কারণ বস্তুর সম্প্রসারিত হইবার একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, সেই সীমায় উপনীত হইলে কিছুক্ষণ স্থির-ভাবে থাকিয়া কেন্দ্রানুগ শক্তিবলে পুনরায়

কেন্দ্রাভিমুখে সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং সঙ্কুচিত হইতে হইতে তাহার পূর্ব্বের উজ্জ্বলতা—যাহা সে সম্প্রসারিত হইবার সময়ে হারাইয়া ফেলিয়াছিল তাহা, পুনঃ প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে আমরা উহাকে পুনরায় দেখিতে পাই। রূপ-পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্র-গুলির মধ্যে অধিকাংশেরই এবম্বিধ সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণের নির্দ্দিষ্ট সময় জানা গিয়াছে। আমরা নিম্নে এইরূপ কয়েকটী নক্ষত্রের বিবরণ দিলাম; কৌতূহলী পাঠকগণ তাহাদের বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। রূপ-পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্রগুলি সঙ্কুচিত হইতে হইতে যখন সর্ব্বশেষ সীমায় উপনীত হয়, তখন কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া আবার সম্প্রসারিত হইতে থাকে; ইহাদের এই অবস্থা অর্থাৎ হ্রাস ও বৃদ্ধি অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকে, তৎপরে এমন সময় আইসে, যখন তাহারা একটা সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়। এই সাম্য অবস্থাও স্থির নহে, কারণ জন্মকালে উভয় নক্ষত্রের বিভিন্নমুখী গতিশক্তিপ্রভাবে নূতন নক্ষত্রটী তাহার মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে অনবরতঃ ঘূর্ণিত হইতে থাকে এবং কোন এক অনির্দ্দিষ্ট পথে প্রধাবিত হয়।

কতিপয় রূপপরিবর্ত্তনশীল বা
বহুরূপ তারার বিবরণ।

১। তিমি মণ্ডলের প্রথম তারা মায় (Mira) একটী রক্তবর্ণ বহুরূপ তারা। তিনশত চৌত্রিশ দিনে উহার রূপের পরিবর্ত্তন হয়। ১৬৭২ খৃঃ অঃ অক্টোবর মাসে এবং ১৬৭৬ খৃঃ অঃ ডিসেম্বর মাসে, এই তারাটী লোকচক্ষুর অগোচর হইয়াছিল। ১৮৬৯ খৃঃ অঃ অক্টোবর মাসের পঞ্চম দিনে অর্দ্ধ উজ্জ্বল অবস্থার পরই পুনঃ অনুজ্জ্বল হইতে থাকে। মায় তারা, কামরূপতারা-জগতের শিরোমণি।

২। পরশুমণ্ডলের দ্বিতীয় তারা মায়াবতী বা দানবচক্ষু (Algol) একটী বিচিত্র কামরূপ তারা। ৬৯ ঘণ্টার মধ্যে ৬২ ঘণ্টা, এই তারাটী দ্বিতীয়শ্রেণীর তারার ন্যায় উজ্জ্বল থাকে, পরবর্ত্তী ৭ ঘণ্টায় মধ্যে ইহার রূপের পরিবর্ত্তন হয়, এই সময়ে ইহা ৪র্থ শ্রেণীতে পরিণত হয়, এবং ২০ মিনিট এই অবস্থায় থাকিয়া, পুনরায় দ্বিতীয়-শ্রেণীর ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

৩। বীণামণ্ডলস্থ ৩য় তারা শেলককে (Sheliak) ১২ দিন ২২ ঘণ্টার মধ্যে দুইবার হ্রাস ও বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়; একবার ৬ দিন ১১ ঘণ্টায় ৩য় শ্রেণীর এবং আর ৬ দিন ১১ ঘণ্টায় ৪র্থ শ্রেণীর ন্যায় দৃষ্ট হয়। শেলক আবার যুগল-নক্ষত্রও বটে।

৪। শেফালী মণ্ডলের একটী তারা (Scephei, ইহার কথা ভগোল-চিত্রে নাই) বহুরূপ যুগল নক্ষত্র—৫ দিন ৮ ঘণ্টা ৪৮ সেকেণ্ডের মধ্যে ৫ম হইতে ৩য় শ্রেণীতে রূপ পরিবর্ত্তন করে। ইহার মধ্যে ১ দিন ১৪ ঘণ্টায় ৫ম হইতে ৩য় শ্রেণীতে উপনীত হয় এবং ৩ দিন ১৮ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে ছোট হইয়া ৫ম শ্রেণীতে পরিণত হয়।

৫। অর্ণবযান মণ্ডলের ২য় তারা মারীচ (Argus) একটী বহুরূপ তারা। ১৬৭৭ খৃঃ অঃ জ্যোতিষী হ্যালী সাহেব ইহাকে ৪র্থ শ্রেণীর তারা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

১৭৫১ খৃঃ অঃ জ্যোতিষী ল্যাকেলী (Lacaille) ইহাকে ২য় শ্রেণীর বলিয়াছেন তৎপরে ইহার ইতিহাস যতদূর জানা যায়, তাহাতে ১৮১১ খৃঃ অঃ হইতে ১৮১৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ৪র্থ শ্রেণীর, ১৮২১ খৃঃ অঃ হইতে ১৮২৬ খৃঃ অঃ পর্যান্ত ২য় শ্রেণীর এবং ১৮২৭ খৃঃ অঃ ইহা প্রথম-শ্রেণীর উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়, পরে ১৮২৭ খৃঃ অঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর হইয়া, পুনঃ ১৮৩৮ খৃঃ অঃ প্রথম-শ্রেণীর আকারে দৃষ্ট হইয়া ছিল। ১৮৪৩ খৃঃ অঃ লুব্ধক ব্যতীত আকাশে ইহার সমান উজ্জ্বল তারা আর কেহই ছিল না। আজকাল ইহার এমনই দুরবস্থা যে, দূরবীক্ষণ ব্যতীত দেখিবার উপায় নাই। এই তারাটীর নিকটস্থ তারাস্তবক (H 2167) পরিবর্ত্তনশীল বা কামরূপ। (variable.)

১৫৭২ খৃঃ অঃ জ্যোতিষী টাইকোব্রা (Tychobrahe) কাশ্যপীর মণ্ডলে (cassiopeia) একটী নূতন তারা দেখিতে পান। অকস্মাৎ এই তারাটী শুক তারার স্থায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং তীব্রতর বেগে পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। উহার সংঘর্ষে পৃথিবীর ধ্বংস হইবে মনে করিয়া, সকলেই ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়েন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ১৬ মাসের মধ্যে তারাটী অদৃশ্য হইয়া পড়ে। এই তারাটী এরূপ উজ্জ্বল হইয়াছিল যে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্নব্যক্তি শুক তারার স্থায় ইহাকে দিবাভাগেও দেখিতে পাইতেন। টাইকোব্রা এই তারাটীর যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া-গিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, ইহার বর্ণ প্রথমে শুভ্র ছিল, পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া রক্তিম আভা প্রাপ্ত হয়, পরে ধূসর বর্ণের অবস্থায় অদৃশ্য হইয়া পড়ে। ১৬০৪ খৃ অঃ এইরূপ আর একটী তারা সর্পধারী মণ্ডলে (ophiuchus) আবির্ভূত হইয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত তারাটীর স্থায় ইহাকেও আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। জ্যোতিষী কেপলার এই তারাটী আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র।

বীণা।

(১)

শিরস অপান অলাবু মণ্ডিত
মেরু-দণ্ডে গড়া এ দেহ বীণ,
বসি' নিরজনে আপনার মনে
বাজাইছ মাগো! যামিনীদিন।
সে বীণা মাঝার বাঁধা তিনতার,
পিঙ্গলা, ইড়া, সুষুম্না নামে;
উদারা, মুদারা, সুধাময় তারা,
ছুটে সপ্তস্বর তিনটি গ্রামে।

(২)

হংস-গুঞ্জরণ ফুটে অনুক্ষণ,
ওঙ্কার ঝঙ্কার মুরধাবধি;
শ্রুতি-দ্বাবিংশতি বহে তত্ত্ব-পথি,
সুরে সুরে জাগে চৈতন্য-নদী;
অণু, অর্দ্ধ, ক্ষীণ, দীর্ঘ, প্লুত, পীন,
মাত্রা-ভঙ্গে ছুটে লহর তা'র;—
ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম,
পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ আর।

(৩)

ঠমকে ঠমকে গমকে গমকে
কাঁপে সুর বালা রাগিণীকুল ;
হারা'য়ে চেতনা মুরছে মূর্চ্ছনা,
শেষে হ'য়ে যায় সকলি ভুল ;
থামে বীণা-ধ্বনি ;—তুমি মা ! আপনি
বীণা কোলে ল'য়ে নীরব রও ;
আনন্দের ধারা বহে নিরধারা,
আপনা আপনি বিভোর হও।

(৪)

কোথা আর গান ? কোথা রহে তান ?
কোথা মন, প্রাণ ? কোথা বা দেহ ?
তৃষা যায় দুর, নেশা ভরপুর,
তুমি বিনা আর না রহে কেহ !

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

একলব্যের বংশ।

আশ্বিন মাসের হিন্দুপত্রিকায় "একলব্য" শীর্ষক প্রস্তাব পাঠে আমার এক বিষয় স্মরণ হইল অনেক কাল হইল বিষয়টি অনুসন্ধানে জ্ঞাত ছিলাম। উহা নিম্নে বিবৃত করিলাম। একলব্য, নিষাদ রাজবংশীয়, সুতরাং অনার্য্য বলিতে হইবে। নিষাদ বলিতে ব্যাধ-জাতি বুঝায়। একলব্যের বংশ বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও তাহার এক উজ্জ্বল রেখা দৃষ্টিগোচর হয়। সে বংশ "সান্তাল" জাতি। সান্তাল নাম ঠিক্ যেন চণ্ডাল নামের অপভ্রংশ। ইংরাজি লেখকগণ ছান্তাল, (Santhal) শব্দ ব্যবহার করেন। স্থানীয় লোকে এবং সান্তাল-গণ 'সাঁওতাল' বলে। হয়ত এ অনুমানও সত্য হইতে পারে যে, তাহারা পর্ব্বতের নিম্নস্থ সমতলভূমিতে বাস করে বলিয়া সাঁওতাল নাম হইয়াছে ; ফলতঃ সান্তালই প্রকৃত নাম। যাহা হউক, তাহারা চণ্ডাল বা ব্যাধ জাতীয়, ইহাই আমার বিশ্বাস।

২। ইহারা জঙ্গলে বাস করিতে ভালবাসে, সুতরাং ইহারা মৃগয়াপ্রিয়—শীকারে সর্ব্বদাই উদ্‌যোগী। ধনুর্ব্বাণ সঙ্গেই রাখে। কি পশুচারণ, কি কাষ্ঠাহরণ, কি কৃষিকার্য্যসাধন সব সময় উক্ত শস্ত্র সঙ্গেই রাখে,—আর রাখে বাঁশের বাঁশী। বাঁশী বাজান একটি বিশেষ অভ্যাস এবং একটি গুণও। ইহারা নৃত্যগীতও বড় ভালবাসে। স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া সংগীতামোদ করে। উহারা হাত ধরাধরি করিয়া চক্রাকারে দণ্ডায়মান হয়, আর তাহার মধ্যখানে (কেন্দ্রস্থানে) মাদল, মৃদঙ্গ ও বংশী-বাদকগণ দণ্ডায়মান হইয়া, ঠিক সুতানে সুতাল দিয়া একরূপ মনোরম ভাব সম্পাদন করে। এইরূপে হাতে হাতে শিকলি (linked) বাঁধিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে, গীত গায়, তালে তালে করতালি দেয় অথচ পরস্পর হাতের সংযোগ অতি নৈপুণ্যে রক্ষা করে। এই সময়ে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই তাহাদের গৃহ-প্রস্তুত (home brewed) মদ (যাহাকে ঝাঁড়ু বলে) পান করিয়া থাকে। অন্যান্য সময়েও উহা ব্যবহার করে। এটি পার্ব্বত্য লোকের প্রধান ব্যবহার্য্য।

৩। শিকারে যুবা—বৃদ্ধ উভয়ই তৎপর। বালকগণও যে শিকারে অনিচ্ছুক, তাহা নহে। শিকারের সময় ধনুকে অর্থাৎ জ্যাতে শর যোজনা করিয়া, যখন আকর্ষণ করিয়া টঙ্কার দেয়, তখন দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ব্যবহার করে না, কেবল অপর চারি অঙ্গুলি মাত্র ব্যবহার

করে। তীর এমত অবস্থায়ও ঠিক্ লক্ষ্যস্থান ভেদ করে। ইহাদের শরসন্ধান অব্যর্থ। দেখিতে অতীব আশ্চর্য্য, লক্ষ্যভ্রষ্ট প্রায়ই হয় না।

৪। তাহারা অঙ্গুষ্ঠ ব্যবহার করেনা কেন, জিজ্ঞাসা করিলে বলে, পূর্ব্বাপর তাহারা এইরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে তাহাদের পিতৃপুরুষগণ মধ্যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল, প্রবাদ আছে। অঙ্গুষ্ঠ ব্যবহার করিতে নিষেধ আছে মাত্র বলে, বিশেষ কোনও গুহ্য কথা বলিতে পারেনা।

৫। এখন পাঠক দেখুন, অনুমান ন্যূনাধিক ৫০০০ পাঁচ হাজার বৎসর গত হইয়া থাকিবে, দ্রোণাচার্য্য ও একলব্য গুরু শিষ্য-ভাবে ভারতে উদিত হইয়াছিলেন এবং একলব্য, নিজ অঙ্গুষ্ঠ গুরুর আদেশে (অতি-ভয়ানক লোমহর্ষণ আদেশ) ছেদন করিয়া, গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই দৃষ্টান্ত অবলম্বনে কত যুগ-যুগান্তর শেষ হইয়াছে। ব্যাধজাতি ধনুতে বাণ সংযোগ করিয়া নিক্ষেপ করিবার সময় অঙ্গুষ্ঠ ভিন্ন অপর চারি অঙ্গুলি দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করে। কি আশ্চর্য্য ঘটনা! হিন্দুদিগের কি সুন্দর প্রতিজ্ঞা ও কর্ত্তব্য-পালন। এইরূপ গুরুভক্তি কি আজকাল আছে? পিতৃপুরুষের ধর্ম্মানুসারে সাংসারিক কার্য্য করিলে, সেটা আ'জকা'ল জঘন্য ও ঘৃণার্হ ব্যবহার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৬। আমার বিবেচনায়—জাতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত (Ethnologists,) সান্তাল-জাতিকে "একলব্যের" বংশ বলিয়া সম্ভবতঃ স্বীকার করিতে পারেন।

৭। এখন সান্তালদিগের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতেছি। ইহাদিগের চেহারা ব্যাধ-জাতীয় লোকের ন্যায় সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ, তবে বর্ণে লাবণ্য আছে। ইহারা সবলকায়। ইহাদের মস্তক কিছু বড়, গণ্ডস্থল একটু উচ্চ, নাসা ওষ্ঠ একটু স্থূল। পূর্ব্বে ইহারা সরল ও সত্যপ্রিয় ছিল। এখন সেরূপ ব্যবহার করে কিনা জানিনা। ইহাদের লিখিত কোন ভাষা নাই।

৮। "দামনকো" (Damonika) নামক পর্ব্বতমালা—যাহা রাজমহলের নিকট তিন-পাহাড় হইতে নয়াদুমকা পর্য্যন্ত প্রায় উত্তর-দক্ষিণ প্রসারিত আছে, তাহার সমতল ভাগে, "সান্তাল" জাতি বাস করে। আর উহার পর্ব্বতোপরি সানুভাগে "পাহাড়িয়া" নামক আর এক জাতি বাস করে। ইহারা ঐ পর্ব্বতের উত্তরভাগেই বেশীর ভাগ বসতি করে। সান্তাল ও পাহাড়িয়া, অনেকেই খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে। খৃষ্টান মিশনারিগণ, স্থানে স্থানে আপন আপন মিশনালয় স্থাপন করিয়াছেন। তিন পাহাড়ের উপরে 'তালঝারিয়া' নামক স্থানই মিশনমধ্যে বড় আকারের আশ্রম।

৯। সান্তালদিগের উপাস্য দেবতা সূর্য্য-দেব, তাঁহাকে তাহারা "মারাংবুড়ো" বলে। আর দামোদর নদীকে গঙ্গাতুল্য পবিত্র মনে করে। মৃত ব্যক্তির অস্থি, দাহনান্তে উক্ত নদীতে সুবিধামত প্রক্ষেপ করে। প্রত্যেক সান্তাল আপন আপন বাসস্থানের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার পথে, কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড সিন্দুর ও তৈল দিয়া রঞ্জিত করিয়া, শালবৃক্ষের তলদেশে সজ্জিত রাখে, সময়ে সময়ে তথায় পূজা প্রদান করে। ইহারা শূকর, কুক্কুট

ইত্যাদি বলি প্রদান করে। আর ব্যাঘ্র-মাংস, ভল্লুকমাংস সর্পমাংস ও অন্যান্য শিকার-লব্ধ, মাংস ব্যবহার করে। জাতিভেদ দেখিতে পাই নাই। ব্যবসায় অনুসারে থাকিতেও পারে।

১০। আর এককথা—'দামানকো' পর্ব্বত-শ্রেণীর পূর্ব্বভাগের সাঙ্গালী স্ত্রীলোকগণ, বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় কাপড় পরিধান করে। স্ত্রীপুরুষ উভয়ে মুরশিদাবাদ জেলার পশ্চিমভাগের বাঙ্গালীর ন্যায় বাঙ্গলা কথা বলে, তবে তত স্পষ্ট নহে। পুরুষগণ নিজগৃহে সামান্য একটুকুরা কাপড় ব্যবহার করে, তবে বাহিরে অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী হাট-বাজারে কি জমিদারের কাছারিতে, কি গবর্ণমেণ্টকোর্টে গমন কালে অপেক্ষাকৃত ভাল কাপড়ই ব্যবহার করে। আর ঐ পর্ব্বতমালার পশ্চিমাংশের স্ত্রীলোকেরা ভাগলপুরীয়া স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় কাপড় পরিধান করে। স্ত্রীপুরুষ উভয়ই ঐ স্থানে হিন্দিকথা বলে, তবে ভাষা স্পষ্ট নহে। পুরুষগণ সাধারণতঃ মল্লের ন্যায় কাপড় ব্যবহার করে। এই মাত্র লিপিয়াই এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের উপসংহার করিলাম।

(রায়সাহেব) শ্রীহরিমোহন সান্ন্যাল।

বিবাহসংস্কারে বক্তব্য।

সময়ের দোষেই হউক্ গুণেই হউক্, আ'জকা'ল সর্ব্বত্র সংস্কারের চেষ্টা চলিতেছে। পথে ঘাটে, সভা—সমিতিতে, উদ্যানগোষ্ঠীতে, উৎসবে ব্যসনে, যেখানে দশজনে একত্রিত হইতেছে,—যেখানে পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদান চলিতেছে, সেই খানেই সংস্কারের চিন্তা, চর্চ্চা ও চেষ্টা। কোথাও সমাজসংস্কার, কোথাও ধর্ম্মসংস্কার, কোথাও বা শাসনরক্ষণ-সংস্কারের আলোচনাও চলিতেছে। সুশিক্ষিত অশিক্ষিত, বিজ্ঞ অজ্ঞ, প্রবীণ নবীন, জরা-জীর্ণ স্থবির ও অজাতশ্মশ্রু বালক, সুবিধা ও সম্ভাবনা অনুসারে 'সংস্কারের আন্দোলনে যোগদান করিতেছে। স্থলে স্থলে কুলকামিনীরাও ইহার গণ্ডীতে আসিয়া পড়িতেছেন। এদেশের অনেকেই কক্ষ-ভ্রষ্ট জ্যোতিষ্কের মত যেখানে সেখানে নিস্প্রভরশ্মি ছড়াইতেছেন। বোধ হয় ইহাদের অনেকেই লক্ষ্যভ্রষ্টও হইতেছেন।

এই বিপ্লবের দিনে সকলেই স্ব স্ব মত প্রচার করিতে ব্যস্ত। সমাজতরির কর্ণধার নাই। কে কোন্ কথায় অভিমত প্রকাশ করিতে যথার্থ অধিকারী, তাহার বিচার নাই, বিচারকর্ত্তাও নাই। লোকে যাঁহাদিগকে এতদিন এসব বিষয়ের বিশেষজ্ঞ মনে করিত, তাঁহাদের অধঃপতন এবং সমাজপতিকুলের অন্তর্দ্ধান ঘটায় এই সব ক্ষেত্র ফেনিল আবর্ত্তময় জলনিধির মত আশঙ্কাজনক হইয়া পড়িয়াছে। দিন দিন মাত্রা চড়িতেছে, জটিলতা বাড়িতেছে। এই সময়ে বিবাহসংস্কার সম্বন্ধে রক্ষণশীল হিন্দুর পক্ষের দুই একটী কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক নাও হইতে পারে। আর হইলেই বা কি? যে বিজ্ঞ চিকিৎসক বিকারগ্রস্ত রোগীর আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক প্রলাপ-পরম্পরা শুনিয়া ভীত হন নাই—নিরাশ হন নাই, তিনি কি এই দুই একটা প্রলাপে কাতর হইবেন?

যাঁহারা শাস্ত্রপ্রাণহিন্দু, তাঁহারা এতদিন জানিতেন, বিবাহ স্বয়ং একটা সংস্কার। এই সংস্কার হিন্দুজীবনের সমুন্নয়নে সহায়তা করে। বিবাহ হইতে গার্হস্থ্যদীক্ষার সুরু

হয়। কর্ম্মজীবনের এক দায়িত্বপূর্ণ অংশের অভিনয় আরব্ধ হয়, ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার হয়। পবিত্র পঞ্চমহাযজ্ঞের আরম্ভ হয়। বিশ্বপ্রেমের শিক্ষানবিশীর গোঁড়াপত্তন হয়। জীবনে এতগুলি নূতনভাব যে আনিয়া দেয়, সে 'বিবাহ' যে সংস্কার, তাহা বোধ হয় দুর্ব্বোধ্য নয়। এ সকল উদ্দেশ্য লইয়া সম্প্রতি বিবাহের বিচার করা হইতেছে না, হইবার সম্ভাবনাও দেখিনা। এখন 'বিবাহসংস্কার' বলিলে বুঝিতে হয়, বিবাহের বয়স বাড়াইবার কথা। বিবাহ ব্যাপার খানা যাহাই হউক্, তাহার আলোচনা কেহ শুনিতেও চায়না, করিতেও চায়না। মোটের উপর, অল্পবয়সে বিবাহ না দিয়া বেশী-বয়সে ছেলেমেয়ের বিবাহ দেওয়া উচিত, এই কথাটাই অনেকের মুখে শুনা যাইতেছে। 'বিবাহসংস্কার' শব্দের অর্থ যাহাই হউক্, বিবাহসংস্কার-প্রয়াসী দেশমান্য ব্যক্তিবর্গ যে, বিবাহ নামক পদার্থে অল্পবয়সের সম্বন্ধস্বরূপ কলঙ্ক রাখিতে চাহেন না, ইহাই 'বিবাহসংস্কার' বা 'বিবাহপ্রথাসংস্কার' কথায় আপাততঃ বুঝিয়া লইলাম। কারণ, ঐ কথাই তাঁহারা প্রকাশ করেন। ইহার পর যে টুকু আছে, তাহা এ প্রসঙ্গে না বলিয়া সময়ান্তরে বলিব।

এখন কথা এই যে, 'অল্পবয়সে বিবাহ দেওয়ায় বালকবালিকাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতিতে বাধা পড়ে, অতএব একার্য্য ভাল নয়।' এই বিষয়ে আমি সংস্কার প্রয়াসী মহাশয়গণের সহিত একমত হইতে পারি। আমি জানি, শিক্ষার সময়ে বালকের বিবাহ দেওয়ার কথা শাস্ত্রে নাই। শাস্ত্রে আছে,—শিক্ষাজীবনে বালক ব্রহ্মচারী হইয়া বিদ্যাভ্যাস ও নিয়ম-পালন করিবে, ব্রহ্মচর্য্য বা শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হইলে পরে 'সমাবর্ত্তন' বা 'স্নান' নামক ক্রিয়ায় অনুষ্ঠান করিবে, তৎপরে গুরু ও মাতা-পিতার অনুমতি লইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইবে। সংসারপ্রবেশের পথে 'সহধর্ম্মচারিণী' বা 'পত্নী' বা 'ধর্ম্মসঙ্গিনী' লাভ করিবে। এই ধর্ম্মসঙ্গিনীলাভ 'বিবাহ'। সুতরাং শাস্ত্র শিক্ষার সময় বিবাহ করিতে অনুমতি দেন নাই। মৎপ্রণীত 'হিন্দুজীবন' গ্রন্থে একথা বিশদরূপে বলিয়াছি। ব্রহ্মচর্য্য বা গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস, অধুনা সমাজে প্রচলিত নাই। সুতরাং এজন্য শাস্ত্র নিরপরাধ, কিন্তু সমাজের অপরাধ আছেই।

ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই দুর্ব্বল রুগ্ন অকর্ম্মণ্য পিতামাতার অকর্ম্মণ্য সন্তান জন্মিতেছে। পিতামাতার জ্ঞানবিজ্ঞান-বিজ্ঞতা কম হইয়াও যদি ব্রহ্মচর্য্য থাকে, তবে তাঁহাদের সন্তান অকর্ম্মণ্য হইতে পারেনা। যে সকল ব্যক্তি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া (এম, এ, পাশ করিয়া) পরে ত্রিশবৎসরের অধিক বয়সে বিবাহ করেন, তাঁহারাও যদি ব্রহ্মচর্য্যহীন হন, তবে তাঁহাদের সন্তানও রুগ্ন দুর্ব্বল অকর্ম্মণ্য হইবে, ইহা ধ্রুবসত্য। আর যদি প্রথম ভাগ না পড়িয়া ও ১৬ বৎসরে বিবাহ করিয়া যুবক ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ হইয়া চলে—শাস্ত্র মানিয়া চলে, তবে সে দুর্ব্বল-সন্তানের পিতা হইতে বাধ্য হইবেনা।

এখন কথা এই যে, বিবাহ করিয়া বালক ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে পারে কিনা? একথায় ভাবিবার বিষয় খুব বেশী; অবিবাহিত শিক্ষাভিমানী বিলাসী যুবক, অভিভাবকহীন অবস্থায় প্রলোভনপূর্ণ নগরে—কুরুচির রাজধানীতে বাস করিয়াও 'অল্পবয়সে বিবাহ

করিবনা' প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াই যদি ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে পারে, তবে বাড়ীতে তাহার দ্বাদশবর্ষবয়স্কা স্ত্রী আছে (বস্তুতঃ সে লজ্জায় স্বামীর সংস্পর্শেও আসেনা) এই একমাত্র কারণে ব্রহ্মচর্য্য হারাইয়া ফেলিবে, ইহার রহস্য রহস্যই বটে! বিবাহের পর বালকেরা সংসারে মিশিতে বাধ্য হয়, ও বালিকাপত্নীর প্রেমপত্রের তাড়নায় মন্দ হইয়া পড়ে,—একথাও একদিন শুনিয়াছি। ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, বিদেশাগত মূল্যহীন 'স্বাবলম্বন'-প্রসঙ্গ এবং নভেলের পঙ্কিল আদর্শ, সমাজকে এই বিপাকে ফেলিয়াছে, ইহার জন্য 'বিবাহ' দায়ী নহে। পতিপত্নীর পবিত্র সম্বন্ধ—এখন কেবল শারীরিক সম্বন্ধে পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে, ইহার কারণ 'বিবাহ' নয়, উদ্দেশ্য-বিপ্লব। বিবাহের উদ্দেশ্য না বদলাইলে, এই ঘৃণ্য প্রসঙ্গের আলোচনাও হইতনা। চরিত্র, মানুষের হৃদয়ের জিনিষ; দেশ কাল, পাত্র—ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি তাহার কিছুই বদলাইতে না পারি, শুধু বয়সটাই বদলাই, তবে যাহা হইবে, তাহার দৃষ্টান্তও এদেশে আছে, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি দেখিতে পাইতেছেন। খোলস পরিবর্ত্তনে ক্ষণকালের জন্য সর্প দুর্ব্বল হয়, কিন্তু শেষে নববল লাভ করে। খোলস বদলাইলে বিষবেগ কমিবেনা, মূলের সংস্কার চাই।

এখন শুনা যায়, অল্পবয়সে বিবাহ দিলে রুগ্ন সন্তান জন্মে। জানিনা, বিবাহের সহিত সন্তানোৎপাদনের কি অপরিহার্য্য সম্বন্ধ? অল্পবয়সে বিবাহ করিলেই কেহ অল্পবয়সে সন্তান উৎপাদন করিতে বাধ্য হয় না। যদি বলা যায়, "কার্য্যতঃ ঐরূপ হইয়া থাকে, দেখা যায়,' তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, যে তস্কর, ন্যায়ের বিধান না মানিয়া কার্য্য করে, তাহারই দণ্ডভোগ ঘটে, ঐরূপ যে শাস্ত্র মানে না, শাস্ত্রোক্ত গর্ভাধান সংস্কারের সম্মান রক্ষা করেনা সে এই ভগবৎপ্রদত্ত দণ্ড ভোগ করে। শাস্ত্র প্রশস্ত ঋতুতে গর্ভাধানের ব্যবস্থা লিখিয়াছেন। কিরূপ সময়ে আর্ত্তবের কিরূপ লক্ষণ দেখিয়া গর্ভাধান করিতে হইবে, তাহা চিকিৎসাশাস্ত্রে আছে। পুত্রকামনায় ঋতুকালে পত্নীসম্ভোগ ব্যতীত অপর সকল সময়ই ব্রহ্মচারী থাকিবার কথা শাস্ত্রে লেখে। বিবাহ করিলেই বালিকা পত্নীর উপর অত্যাচার করিবার অধিকার জন্মে, এ ধারণা হিন্দুর বিবেচনায় অসম্ভব। বিবাহে ধর্ম্মসঙ্গিনী গ্রহণ এবং গর্ভাধানে সন্তানোৎপাদন। দুইটি ভিন্ন সংস্কার, দুইটীর কালও ভিন্ন, অবস্থাও ভিন্ন। বেশী বয়সে বিবাহ দেওয়ার কথা যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে মনে হয়, কন্যাটিকে গ্রাম্যধর্ম্মের উপযুক্ত করিয়া বিবাহ দেওয়াই দরকার। উহাই যেন বিবাহের উদ্দেশ্য বস্তুতঃ ইহা ভ্রমাত্মক, বিবাহের মুখ্যলক্ষ্য অত সঙ্কীর্ণ নহে।

বিবাহ চরিত্রধ্বংসের কারণ নয়, বরঞ্চ অল্পবয়স্কা পত্নীর প্রতি প্রীতিমান্ পতি, তাহার কথা মনে করিয়াও আত্মরক্ষার সাহায্য পাইতে পারেন। পক্ষান্তরে যে সব ব্যক্তি, বয়স্কা স্ত্রী সত্ত্বেও অধঃপতনের নব পথ আবিষ্কার করিতে ব্যস্ত, তাঁহারা বয়সের দ্বারা বিশেষ উপকৃত হন না। এখন ভাবিয়া দেখা উচিত, অল্পবয়সে বিবাহ করিলেই মানুষ নিজের সর্ব্বনাশ করিবার বেশী সুবিধা পায়, না, দীর্ঘকাল অবিবাহিত থাকিলেই বেশী

সুযোগ পায় ? আমার ধারণা, যে পায় সে সর্ব্বত্র পায়, সে না পায় সে কোথায়ও পায় না। হিন্দুর প্রাচীন গৃহস্থলীর রীতি, বালিকাবধূর সহিত নবোঢ় স্বামীকে মিশিতে দিত না ; এখনও যেখানে আলোকের মাত্রা একটু কম প্রবেশ করিয়াছে সেখানে দেয় না। যাহারা বিদেশীয় কুশিক্ষাপ্রভাবে বিবাহের পরদিনই দশম বর্ষীয়া নববধূর জন্য স্বতন্ত্র শয়নাগারের ব্যবস্থা করে, তাহারা নিজের সর্ব্বনাশ নিজেরাই করিতেছে ! কুশিক্ষার প্রাবল্যে, যে বালক ২০। ২২ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকে, তাহাকে সহজে আয়ত্ত করিতে পারিবে ভাবিয়া, অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা ছাত্রাবাসে নিজকন্যার আলোকচিত্র পাঠাইয়া দিতেছে ! এক্ষেত্রে দোষ অবশ্য বালকের অল্পবয়সে বিবাহ করার নয়, বিবাহ না করার। অল্পবয়সে বিবাহ দেওয়ায় কতকগুলি সুবিধা আছে, অসুবিধাও আছে জগতে একেবারে নির্গোল কিছুই নাই, থাকিতেও পারে না ; তবে বাল্যবিবাহের ঘাড়ে দেশের যত দোষরাশি চাপাইয়া দেওয়া অন্যায়, এইটুকুই আমার কথা।

ভালমন্দের কথা এই পর্য্যন্ত বলা গেল, একথা বাড়াইলে লাভ নাই। ইহার পর শাস্ত্রের কথা, একদল শাস্ত্রের সংবাদ না রাখিয়াও শাস্ত্রের দোহাই দেন। শাস্ত্রে ৮ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সে কন্যার বিবাহ দিবার কথা আছে। ইহার মধ্যে নগ্নিকা অর্থাৎ আর্ত্তবোদয়হীনা কন্যার বিবাহ প্রশস্ত বলা হইয়াছে। ঋতুমতীর বিবাহের নিন্দা করা হইয়াছে, তবে প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক তাহাও করা যায়, বলা হইয়াছে। সে দিন একজন বলিয়াছেন, সুশ্রুতসংহিতায় নাকি ১৬ বৎসরের কমে কন্যার বিবাহ দেওয়া নিষেধ আছে। ইনি সুশ্রুত দর্শন করেন নাই, পাঠ ত করেনই নাই। সুশ্রুতে গর্ভাধান সম্বন্ধে একটা কথা আছে, তাহা এই—উনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তপঞ্চবিংশতিঃ। যদ্যাধত্তে পুমান গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে। জাতো বা ন চিরংজীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ। তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ। স্মৃতিসংগ্রহকারেরা এই বচনের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। বিরুদ্ধপক্ষ এইটী হইতেই সুশ্রুতের বিবাহকাল-বিষয়ক মত সংগ্রহ করেন। ফলতঃ ইহাতে বিবাহের কথা আদৌ নাই। শ্লোকের অর্থ এই যে, 'স্বামীর বয়স ২৫ হয় নাই, স্ত্রীর বয়স ১৬ হয় নাই, এ সময় যদি গর্ভ হয়, তবে গর্ভের বিপদাশঙ্কা। যদি নির্ব্বিঘ্নে সন্তান জন্মে, তবে সে বেশী দিন বাঁচিবেনা, বাঁচিলেও দুর্ব্বল হইয়া থাকিবে, অতএব অতিবালা স্ত্রীতে গর্ভাধান নিষিদ্ধ।' এটি গর্ভাধানের কথা। একথাও আর এখন ঠিক্ নাই, এখন আরও সকালে দেহাবয়ব পুষ্ট হয়, গ্রীষ্ম ক্রমে বাড়িতেছে। সে কথা এখানে বলিব না, কেবল বলিব যে সুশ্রুত নিজেই বলিয়াছেন—'১২ বৎসরে মেয়ের বিবাহ দিবে'। অথাস্মৈ পঞ্চবিংশতিবর্ষায় দ্বাদশবর্ষাং পত্নীমাবহেৎ পিত্র্যধর্ম্মার্থকামপ্রজাঃ প্রাপ্স্যতীতি। সুশ্রুত। মহর্ষি সুশ্রুত জানিতেন, বিবাহ ও গর্ভাধান দুটি ভিন্ন জিনিষ, উভয় ব্যাপারের উদ্দেশ্যও ভিন্ন। তাই তিনি ১২ বৎসরে বিবাহ ও ১৬ বৎসরের পর গর্ভাধানের পরামর্শ দিয়াছেন। আজকা'লকার ডাক্তারেরা একথা বুঝেন না, তাই দুটিকে মিলাইয়া ফেলিয়াছেন।

বিবাহ করিলেই ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট করিয়া, শিক্ষাদীক্ষা ফেলিয়া, 'ঘর লাগিবার' কোনও কথা নাই। বিবাহ না করিয়াও বহুলোক অধঃপতিত হইয়াছে। জানিনা, পতিতের সংখ্যা বিবাহিত বা অবিবাহিতের মধ্যে বেশী! বিবাহপ্রথার সংস্কার হউক, দোষ থাকে সংশোধন হউক, কিন্তু উপরোক্ত কারণে বয়স বাড়াইয়া দিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের উপর জনসাধারণের শ্রদ্ধা কমাইয়া দেওয়া ভাল মনে হয় না। শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া সৎপথে আনিতে চেষ্টা করা উচিত। আমরা অধঃপাতে যাইতেছি, তাহার সহায়তার জন্য অন্তঃপুরকে আহ্বান করা সঙ্গত কিনা বিবেচ্য। নিজেরা ভাল হইতে চেষ্টা করা ও অবলাদিগকে ভাল রাখিতে চেষ্টা করাই প্রকৃত হিতকর। তাহাই যথার্থ সংস্কার। শাস্ত্রে ত্রুটী নাই, শাস্ত্র বেশ যুক্তিপূর্ণ। শাস্ত্রে দুগ্ধপোষ্যা বালিকার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা নাই। প্রয়োজন হইলে এ বিষয় পরে আরও বলা যাইবে।

শ্রীকেদারনাথ ভারতী
স্মৃতি-সাঙ্খ্য-মীমাংসাতীর্থ।

আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক-পদাবলী।

(৪)

আত্মা সর্ব্ব-পরিণামের অতীত।

অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্ আত্মাস্য জন্তো-
নিহিতো গুহায়াং।
তমক্রতুঃপশ্যতি বীতশোকোধাতুঃ প্রসাদান্মহি-
মানমাত্মনঃ॥ কঠঃ ২।২০

অণু হোতে অণুতর যাঁর সূক্ষ্ম জ্ঞান।
যাঁর তত্ত্ব অতিবর্ত্তে মহৎ প্রমাণ॥
ভূলোকাদি বিশাল মণ্ডল, আছে যত।
আত্মা হন সর্ব্ব মহত্ত্বের অতীত॥
আত্মারূপে সর্ব্বজীবে তাঁহার আসন।
নিষ্কাম হইলে তাঁর পায় দরশন॥
শান্ত হয় মনোরাজ্য দূর হয় শোক।
শান্তির প্রসাদে দেখে আত্মার আলোক॥
শান্তহৃদে দেখ পান্থ হইয়া নিষ্কাম।
দেহ-দারা গৃহ-ক্ষেত্র নহে তব ধাম॥
আত্মজ্ঞান পুরীতব নিত্য বাসস্থান।
চলহ লভিবে যদি তাহার সন্ধান॥
জন্ম-মৃত্যু কর্ম্মপাশ রহিত হইবে।
ব্রহ্মানন্দ নিত্যপ্রেম অমৃত পাইবে॥

(৫)

আত্মহিংসা।

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাং স্তেপ্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যেকেচাত্মহনোজনাঃ॥
ঈশ ৩

সমংসর্ব্বেষুভূতেষুতিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি সপশ্যতি॥
সমংপশ্যন্‌হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং।
নহিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততোযাতি পরাংগতিং॥
গীঃ ১৩।

অসূর্য্য নামক অন্ধ তমোলোক যথা।
ত্যজি দেহ 'আত্মহনো' জন যায় তথা॥
আত্মজ্ঞানে করি হেয় বিচরে সংসারে।
কর্ম্মফলে রত আত্মঘাতী বলি তারে॥
পরমাত্মভাব-শূন্য যত দেবলোক।
অসূর্য্য-নামেতে খ্যাত বর্জিত আলোক॥

* অসূর্য্য লোক অর্থাৎ অসুর-ভাবাপন্ন লোক।

মরণান্তে কামী ভ্রমে সেই সব স্থানে।
অন্ধকারাবৃত সব বিনা তত্ত্বজ্ঞানে ॥
আত্মারে যে দৃষ্টি করে সর্ব্ব জীব মাঝে।
না হিংসে স্বীয় আত্মার আত্মাতে বিরাজে
আস্বাদে পরমানন্দ শান্তির জীবন।
তুচ্ছ করে জ্ঞান-বলে স্বর্গাদি ভুবন ॥
তাহার জীবাত্মা নাহি করে উৎক্রমণ।
এই খানে লভে সেই ব্রহ্ম-দরশন ॥
সর্ব্বজীবে সমভাবে তিষ্ঠেন ঈশ্বর।
নাশে অবিনাশী দেখে, দেখে সেই নর ॥
সম দেখি সর্ব্বত্রে তাঁহার সমস্থিতি।
না হিংসে স্বীয় আত্মায় লভে পরাগতি ॥

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

নারীচর্য্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

গুরু-বিপ্রেষ্ট-দেবেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যশ্চ পতির্গুরুঃ।
বিদ্যাদাতা যথা পুংসাং কুলজানাং তথা প্রিয়ঃ ॥
১১৩

গুরু, বিপ্র ও ইষ্টদেবতা এই সকল হইতেও রমণীগণের পতিই গুরু; যেরূপ পুরুষদিগের বিদ্যাদাতা সর্ব্বাপেক্ষা গুরু, সেইরূপ কুলাঙ্গনাদিগের পক্ষে পতিই সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয়। ১১৩

যয়া প্রিয়ঃ পূজিতশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ পূজিতস্তয়া।
পতিব্রতাব্রতার্থঞ্চ পতিরূপী হরিঃ স্বয়ং ॥১১৪
(গ)

পতিব্রতাদিগের ব্রতের নিমিত্ত স্বয়ং হরি পতিরূপী হন; যে নারী পতিকে পূজা করিয়াছেন, সেই নারী শ্রীকৃষ্ণকেই পূজা করিয়াছেন। ১১৪

বিপ্রিয়ং কুরুতে ভর্ত্তুর্বিপ্রিয়ং বদতি প্রিয়ং।
অসৎকুল-প্রসূতা যা তৎ ফলং শ্রূয়তাং সতি ॥
১১৫

কুম্ভীপাকং ব্রজেৎ সা চ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।
ততো ভবতি চাণ্ডালী পতিপুত্র-বিবর্জ্জিতা ॥
১১৬ (ঘ)

হে সতি! যে রমণী পতির বিরুদ্ধাচরণ করে ও অপ্রিয় বাক্য বলে, তাহার ফল কহিতেছি শ্রবণ কর। সেই অসৎকুল-প্রসূতা নারী যতকাল চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নামক নরকে গমন করে; সেই নরকযন্ত্রণার পর চণ্ডাল-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া পতি-পুত্রবিবর্জ্জিতা হইয়া থাকে। ১১৫, ১১৬

প্রকোপ-বদনা কোপাৎ স্বামিনং যা চ পশ্যতি।
কটূক্তিং তঞ্চ যা বক্তি যাতি চোল্কামুখঞ্চ সা ॥
১১৭

উল্কং দদাতি তদ্বক্ত্রে সততং যমকিঙ্করাঃ।
দণ্ডেন তাড়য়েন্মূর্দ্ধ্নি তল্লোমাব্দ-প্রমাণকং ॥
১১৮

যম সাবিত্রীকে কহিয়াছিলেন যে, যে রমণী কোপান্বিতা হইয়া কোপযুক্ত-মুখে স্বামীর প্রতি নিরীক্ষণ করে ও তাঁহাকে কটূক্তি বলে, সে উল্কামুখ নামে নরকে গমন করে। যমদূতগণ সর্ব্বদা তাহার মুখে অগ্নিশিখা প্রদান করে ও তাহার শরীরে যতগুলি লোম আছে, তত বৎসর দণ্ডের দ্বারা তাহার মস্তকে তাড়না করিয়া থাকে। ১১৭, ১১৮

ততো ভবেন্মানবী চ বিধবা সপ্ত জন্মসু।
ভুক্ত্বা দুঃখঞ্চ বৈধব্যং ব্যাধিযুক্তং ততঃ শুচিঃ ॥
১১৯

নরকভোগের অবসানে সেই পাপাত্মিকা

(গ) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে।

(ঘ) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে।

নারী সপ্ত জন্ম মানবী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া, নানাবিধ ব্যাধিযুক্তা ও বিধবা হয়; তৎপরে পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১১৯

যা ব্রাহ্মণী শূদ্র-ভোগ্যা চান্ধকূপং প্রযাতি সা।
তপ্ত-শৌচোদকে ধ্বান্তে অনাহারা দিবানিশং॥ ১২০
নিবসেদতিসন্তপ্তা যমদূতেন তাড়িতা।
শৌচোদকে নিমগ্না চ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ১২১

যে ব্রাহ্মণী শূদ্রের ভোগ্যা হয়, সে অন্ধকূপ নামে নরকে গমন করে; সে নিবিড় অন্ধকার-যুক্ত তপ্ত ক্ষারোদকে দিবানিশি যমদূত কর্ত্তৃক তাড়িতা অনাহারা ও অত্যন্ত সন্তপ্তা হইয়া বাস করে এবং চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের পতনকাল পর্য্যন্ত সেই তপ্ত-ক্ষারোদকে নিমগ্না থাকে। ১২০, ১২১

কাকী জন্মসহস্রাণি শতজন্মানি শূকরী।
কুক্কুরী সপ্তজন্মানি শৃগালী সপ্ত জন্মসু॥ ১২২

নরকভোগের পর সে সহস্র জন্ম কাকী, শত জন্ম শূকরী, সপ্ত জন্ম কুক্কুরী ও শৃগালী হয়। ১২২

পারাবতী সপ্ত জন্ম বানরী সপ্ত এবহু।
ততো ভবেৎ সা চাণ্ডালী সর্ব্বভোগ্যা চ ভারতে॥ ১২৩
ততো ভবেৎ সা রজকী যক্ষ্মগ্রস্তা চ পুংশ্চলী।
ততঃ কুষ্ঠযুতা তৈলকারী শুদ্ধা ভবেৎ ততঃ॥ ১২৪ (ঙ)

অনন্তর সপ্ত জন্ম পারাবতী ও বানরী হইয়া থাকে; তাহার পর ভারতবর্ষে চণ্ডালী হইয়া থাকে। তাহার পর সে রজকী হইয়া জন্ম গ্রহণ করতঃ বেশ্যা হইয়া যক্ষ্মরোগগ্রস্তা হয়; তাহার পর কলুর স্ত্রী হইয়া জন্ম গ্রহণ করতঃ কুষ্ঠরোগযুক্তা হয়; তাহার পর সে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১২৩, ১২৪

সাধ্ব্যাঃ সদ্বংসজাতায়াঃ শতপুত্রাধিকঃ পতিঃ
অসদ্বংশপ্রসূতা যা দুঃশীলা জ্ঞানবর্জ্জিতা।
স্বামিনং মন্যতে নাসৌ পিত্রোর্দোষেণ কুৎসিতা॥ ১২৫

সদ্বংশজাতা সাধ্বী রমণীর এক শত পুত্র হইতেও পতিই অধিক অর্থাৎ স্নেহের পাত্র; যে স্ত্রী অসদ্বংশোদ্ভবা সে পিতা-মাতার দোষে দূষিতা ও দুঃশীলা এবং জ্ঞান-বর্জ্জিতা হইয়া পতিকে মান্য করে না। ১২৫

কুৎসিতং পতিতং মূঢ়ং দরিদ্রং রোগিণং জড়ং।
কুলজাঃ বিষ্ণুতুল্যঞ্চ কান্তং পশ্যন্তি সন্ততং॥ ১২৬ (চ)

পতি যদি কুৎসিত বা পতিত, মূঢ়, দরিদ্র, রোগী ও জড় অর্থাৎ হিতাহিত-বোধ-রহিত হয়েন, তথাপি সৎ কুলোদ্ভবা রমণীগণ পতিকে সর্ব্বদা বিষ্ণুতুল্য দর্শন করেন। ১২৬

সতীস্ত্রী প্রাতরুত্থায় ত্যক্তা চ রাত্রিবাসসং।
ভর্ত্তারঞ্চ নমস্কৃত্য করোতি স্তবনং মুদা॥ ১২৭

সতী স্ত্রী প্রাতঃকালে উঠিয়া রাত্রিবস্ত্র ত্যাগ করতঃ পতিকে প্রণাম করিয়া, স্তব করিবেন। ১২৭

গৃহকার্য্যং ততঃ কৃত্বা স্নাত্বা ধৌতে চ বাসসী।
গৃহীত্বা শুক্লপুষ্পঞ্চ ভক্তিতঃ পূজয়েৎ পতিং॥ ১২৮

তৎপরে গৃহকার্য্য সমাধান করিয়া স্নান করিয়া, ধৌত বস্ত্র পরিধান করতঃ

(ঙ) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে প্রকৃতি-খণ্ডে।

(চ) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে গণপতি-খণ্ডে

শুক্ল পুষ্পদ্বারা ভক্তিভাবে পতিকে পূজা করিবেন। ১২৮

স্নাপয়িত্বা সুপূতেন জলেন নির্ম্মলেন চ
তস্মৈ দত্ত্বা ধৌতবস্ত্রং তৎপাদৌ ক্ষালয়েন্মুদা ॥ ১২৯

সুপবিত্র নির্ম্মলজলে পতিকে স্নান করাইয়া, তাঁহাকে ধৌতবস্ত্র দিয়া তাঁহার পদদ্বয় প্রক্ষালন করিবেন। ১২৯

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

THE FEARLESS MAN.*

ओं सत्यं वदिष्यामि ओं ब्रह्म वदिष्यामि ओं सहनाववतु।

The subject of the present discourse will be "The Fearless Man."

आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन।

The man who has realised the bliss of Brahman has nothing to fear from.

True religion dates from the time when man asked himself: "Whence am I and whither shall I go"

It is impossible to imagine even the most primitive stage of man's evolution, when he did not attempt to solve the mystery of life, though the problem must have pressed more strongly upon him the more he advanced in the scale of civilisation. The desire to know his self made man poet, philosopher, sage and prophet, and to the ancients, they were all Kavis, the seers. It is a mistake to suppose that the savage never thinks of his self. Man in all countries has put his hand to the solution of the mystery of "I", before he has dreamt of natural sciences.

Brief is life, mysterious at both the ends. To what end shall man live, if to live is to die and be no more? Who cares for what is so transient? Man thus seeks for the changeless in the midst of changes.

The external world, helpful though it is often, does not take him too far in his search for the Permanent. He turns inwards and then the light slowly dawns upon him, that he is not a mere body, that the body is his. "Never do I think that I am not", he thinks, as Sankara puts it in his Bhasya.

As long as man is ignorant, he fancies, that there is nothing permanent, and therefore he struggles for the fleeting only. Though everything eludes his grasp, yet knowing nothing better, he madly pursues after honour, riches and pleasure. True knowledge comes to him now and then like flashes of lightning, and he cries in despair: "Is this life a mere sham;

* This article was read by the Editor at the annivarsary of the Brahma Samsad held in the Calcutta University Institution under the Presidency of the Mr. Justice Ashutosh Chaudhuri.

a declusion, a mockery. Is it all death before and behind me."

To the earnest enquirer thus troubled with grief, the Indian Brahmavadi holds out hope.

"Grieve not, my child, thou art the offspring of immortality, I shall declare to you Brahman and thy doubts will be removed, thy ties severed and thy vision cleared, when you have realised the Brahman."

भिद्यते हृदयग्रन्थिः
छिद्यन्ते सर्व्वसंशयाः
क्षीयन्ते चास्य कर्म्माणि
तस्मिन् दृष्टे परावरे।

When one realises self, his life becomes a reality to him. The world then appears to him in a new light. He considers himself a mere divine instrument sent here to cary out some divine task. When one has realised the union of self with Self, there is no fear, no grief, no delusion.

को मोहः कः शोकः
एकत्वमनुपश्यतः।

The man who has realised the Real, is indeed a mighty ruler सम्राट, ruler of his self. स्वराट, whose dominion knows no bounds and who owes no allegiance except to his own self.

Such a man can never be satisfied with what is little. He must have the infinite within his grasp.

नाल्पे सुखमस्ति,
यद्भूमा तत् सुखं।

Being आत्मतृप्त, self satisfied, he has nothing to fear from, be it on the battle field or in the council chamber, be it on the throne or the pulpit, be it in humble or lofty walks of life. He does his duty for the sake of duty only.

In vain liveth the man, sinful in life and delighting in senses, who does not lend a helping hand to the wheel of the Universe set in motion by the Lord.

एवं प्रवर्त्तितं चक्रं नानुवर्त्तयतीह यः
अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति।

Work he must, but he must eschew selfish motives.

कर्म्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्म्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्म्मणि॥

Is not this an impossible ideal to aim at? Not at all; but one must rise step by step and must laboriously climb to the top of the mountain.

The only man who can do duty for the sake of duty is the man who has realised self. If it is not impossible to realise Brahman, it is neither impossible to do duty for the sake of duty.

As in other paths, so in the path of ब्रह्मविद्या, Brahmavidya, there are various stages which one must pass through. He who wants to illumine his self with

the light of self science आत्मविद्या, must control senses, must give up selfish desires, discontinue all practices that offer impediments to the full manifestation of the inner man, though they be ceremonies prescribed by any religion, and last of all, he must seek the help of those who have himself seen the Light. A wake, arise and learn of those who have realised him, for strewn is the path with sharp razor, and Brahmavadis call it a difficult path.

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत,
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गमृपथस्तत्
कवय: वदन्ति ॥

Till you have got a glimpse of the life eternal, your life is a dreary desert, a vast desolation. Life is real to him who has got a glimpse of the eternal.

ईह चेदवेदीत् अथ सत्यमस्ति
नो चेदिहावेदीत् महती विनष्टि:
भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा:
प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ।

But mind, the blind cannot lead the blind, and *atman* does not become intelligible, if explained by inferior men.

न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेय: ।

But how to distinguish Brahmavadis from pretenders? Brahmavadis are to be found in all countries, and they are not the monopoly of any particular race, creed or colour.

But know this that the man who has attuned himself to Universal Harmony lives for others and him neither victory elates nor defeat depresses. He will never swerve from the right path through praise or blame, fear or favour. He is fearless and cheerful.

The man who cannot cheer himself cannot cheer others. The man who is himself smitten with grief cannot take you to the other side of grief.

If one cannot find out a Brahmavadi in flesh and blood, let him look up to the Brahmavadis of old. They are not dead. They are living in their works, which are as inspiring to day as they were in ages gone by.

Masters are to be found in all countries, but India is preeminently the land of Brahmavadis.

'The rest and peace', as Max Muller says, "which were required for deep thonght and accurate observations of the movements of the soul, were more easily found in the silent forests of India than in the noisy streets of the so-called centres of civilisation."

The sublime teachings of Upanishads charmed Schopenhauer so much that he exclaimed: "In the whole world there is no study so beneficial as that of the Upanishads. It has been the solace of my life and it shall the solace of my death."

Maxmuller adds to the above :—

'If these words required any endorsement, I shall willingly give it as the result of my experience during a life devoted to the study of many philosophies and religions.'

Frederick Schlegel says : The early Indians possessed a knowledge of the true God, all their writings are replete with sentiments and expressions, noble clear and severely grand, as deeply conceived and reverentially expressed. as in any human language in which men have spoken of God." And again "Even in the loftiest philosophy of the Europeans, the idealism of reason as it is set forth by such philosophers appears in comparison with the abundant light and vigour of oriental idealism like a feeble Promethean spark in the full flood of heavenly glory of the noonday snn, faltering and feeble and ever ready to be extinguished."

More testimony would be superfluous.

Turn therefore to the sages of India, who for the benefit of humanity were the divine instruments for bringing out those divine writings.

Even here you require some teachers to correctly interpret those sacred writings, but if you are earnest, yon will never feel the want of teachers.

This Samsad can do no better work than to popularise those ancient writings.

India, in fact this modern word of ours, is in need of fearless men, who having realised Brahman have nothing to yearn for and therefore nothing to fear from, men who can do their duty, fearlessly, be it on the battle field or in the council chamber.

Who can be fearless ?

आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन ।

The man who has realised the bliss of Brahman has nothing to fear from. And what is Brahman.

यल्लाभान्नापरो लाभः
यत्सुखान्नापरं सुखं
यज्ज्ञानान्नापरं ज्ञानं
तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् ॥

Than whom there is no greater gain, no greater happiness, no greater knowledge, know that to be Brahman.

সংবাদ ও মন্তব্য।

শোকসংবাদ। যশোহর সত্রাইলের ভূস্বামিগণের সভাপণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় গত ১৪ই মাঘ লোকান্তরিত হইয়াছেন। এতদ্দেশে অধুনা তাঁহার ন্যায় প্রবীণ প্রতিষ্ঠিত স্মার্ত্ত আর কেহই ছিলেননা। স্মৃতিরত্ন মহোদয়ের প্রগাঢ় ধর্ম্মবিশ্বাস, অনুষ্ঠান-পরায়ণতা,

পরোপকার-প্রবৃত্তি, সহৃদয়তা সর্ব্বোপরি অসাধারণ পাণ্ডিত্য স্মরণ করিলে হৃদয় কাতর হইয়া পড়ে। তাঁহার অভাবে এতৎ-প্রদেশের যে অনিষ্ট হইল, সহজে তাহার পূরণ হইবে কি? ভগবান্ তাঁহার শোক-তপ্ত পরিবারে করুণাধারা বর্ষণ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

শোকের পর শোক। বঙ্গ-সাহিত্যের দুর্ভাগ্যে বঙ্গের সেই প্রবীণ কবি সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার মনোমোহন বসু মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতার বাটীতে তনু-ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি নাট্যসাহিত্যের অন্যতম অভিভাবক ছিলেন। শান্তিরস-রচনায় সিদ্ধহস্ত মনোমোহন নাট্যসাহিত্যে ধর্ম্মোন্মাদের যে আদর্শ দিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালার সাহিত্যভাণ্ডারে অতুলনীয় রত্ন। মনোমোহনের কথা আলোচনা করিতে করিতেই বঙ্গের নাট্যসার কুল-তিলক গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের তনু-ত্যাগের সংবাদ পাওয়া গেল। গিরিশচন্দ্র, নাটক-রচনায় যে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। মনোমোহনবাবু গিরিশবাবু—এই উভয়ের দেহত্যাগে বঙ্গীয় নাট্যকলার যে সমূহ ক্ষতি হইল, বঙ্গবাণীর যে শোকোচ্ছ্বাস উপ-স্থিত হইল, তাহা কবে বিদূরিত হইবে, আর হইবে কিনা, তাহা শ্রীভগবান্ই জানেন!

আশার কথা। মাঝে কথা উঠি-য়াছিল, "সাহেবেরা বলেন যে, উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীরা সম্মান অপেক্ষা ধনকে অধিক ভাল বাসেন। এ বিষয়ে তাঁহারা পাশ্চাত্য-মনীষিগণের সমকক্ষতা লাভ করিতে অসমর্থ।" কথাটা সত্য কিনা সে বিচার করিবনা, তবে বলিব, সম্প্রতি একটী দৃষ্টান্তে কথাটার গুরুত্ব বুঝিবার অবসর পাইয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার দেশমান্য শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় মাসিক পঞ্চাদশসহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি-পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন জানিয়া, আমরা বস্তুতঃই আশান্বিত হইয়াছি। কেবল ধনপিপাসু লোকের দ্বারা জাতীয় গৌরব বর্দ্ধিত হয়না, স্বার্থত্যাগী লোক দ্বারাই জাতির মহত্ত্ব প্রকটিত হয়, শ্রীযুক্ত আশুতোষ, এই ব্যাপারে তাহাই দেখাই-লেন। যাঁহারা 'দেশহিতৈষী' বলিয়া পরি-চয় দেন, তাঁহারা সর্ব্বকার্য্যে মাননীয় আশুতোষের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে, কার্য্যতঃ প্রকৃত দেশহিতৈষিতার পরিচয় দিতে পারিবেন। জানিনা সে দিনের ক'দিন বাকী?

সভ্যতার নমুনা। সুসভ্য মার্কিণের এক সুন্দরী অভিনেত্রী ক্রমে চারিবার বিবাহ করিয়া, ৪টী স্বামিকেই পরিত্যাগ করিয়া, সম্প্রতি পঞ্চম পতির অঙ্কগতা হইবার চেষ্টায় আছেন। এই ক্ষণভঙ্গুর বিবাহের সংবাদে শ্রীমতীর মনোবৃত্তির পরিচয় পাইতে বেশী বিলম্ব হয় কি? যে শিক্ষাদীক্ষা মানুষকে নিজের উপর ক্ষমতাবিস্তারের অধিকারও দেয় না, তাহা কি হিন্দুর দেশে আদৃত হইবে?

সম্মান। বিশ্বকোষসম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়কে সাহিত্যপরিষৎ, বিশ্বকোষসমাপ্তি উপলক্ষে

অভ্যর্থনা করিবেন—শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। সাহিত্যসেবিগণের অন্নকষ্ট ত চিরপ্রসিদ্ধ, যদি একটু সম্মানদানে তাঁহারা তুষ্ট হন, তবে তাহা যে অবশ্য অনুষ্ঠেয়, তাহাতে বোধ হয় কেহ প্রতিবন্দী নাই। নগেন্দ্রবাবু বহু গবেষণা করিয়াছেন, বহু শ্রম করিয়াছেন, তাহার তুলনায়, অভ্যর্থনাই কি পর্য্যাপ্ত ?

বাঙ্গালীর জয়। যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, রচনা পুরস্কারের প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে! শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্র সেন কেম্ব্রিজে মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন, সম্প্রতি তিনি "জীবনচরিত-রচনার কৌশল' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া, বিলাতী ছাত্রবর্গের গ্রাস হইতে আকর্ষণ করিয়া ৩০ পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। আনন্দের কথা।

সম্পাদকের সম্মানলাভ। বিগত ২৮ মাঘ তারিখে কলিকাতা-সংস্কৃত-কলেজ-মন্দিরে সমাজের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত হইয়া, হিন্দু পত্রিকা সম্পাদক দেশ-প্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুরকে গৌরবকর 'বেদান্ত-বাচস্পতি' উপাধি প্রদান করিয়াছেন। উল্লিখিত বিদ্বৎসমবায়ে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহতাব্ বাহাদুর সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। দিক্‌পালতুল্য সভাপতিমহাশয়ের আগ্রহে ও অভিপ্রায়ানুসারে বৃহস্পতিকল্প পণ্ডিত-বর্গ এই মানপত্র প্রদান করিয়া শাস্ত্রচর্চ্চার মর্য্যাদারক্ষার ও গুণগ্রাহিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। সুবর্ণমণ্ডিত সুদৃশ্য রেশমী বস্ত্রে মুদ্রিত ঐ মানপত্রের একটী প্রতিলিপি এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে যথা,—

'হিন্দু-পত্রিকাসম্পাদক বেদান্তাদি-নানা-শাস্ত্র-বিচারপ্রবীণ রায় বাহাদুরেত্যুপাধি-মণ্ডিত শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার।

মহোদয়!

বেদান্তাদিষু তে নিরীক্ষ্য মতিমন্ নৈপুণ্যমত্যুজ্জ্বলম্—
চারিত্রং বিমলঞ্চ সজ্জন সুহৃদ্ দেশানুরাগং পরম্—
তদ্ বাগ্মিত্বমনাকুলং চ মধুরং তে দীয়তে সাম্প্রতম্—
প্রীত্যাস্মাভিরুপাধিরেষ মুদিতৈর্বেদান্ত-বাচস্পতিঃ।

ইতি ত্রয়স্ত্রিংশদধিকাষ্টাদশ শকাব্দীয় সৌর-মাঘস্য অষ্টাবিংশদিবসে—কলিকাতারাজকীয়-সংস্কৃতবিদ্যালয়স্থিত সংসদি।"

অর্থাৎ হে মহোদয়! হে মতিমন্, হে সজ্জনসুহৃৎ, বেদান্তাদিশাস্ত্রে আপনার অত্যুজ্জ্বল নৈপুণ্য, আপনার বিমল চরিত্র, অনুপম স্বদেশানুরাগ ও নির্দোষ মধুর বাগ্মিত্ব নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দিত আমরা প্রীতি-সহকারে আপনাকে 'বেদান্তবাচস্পতি' উপাধি প্রদান করিতেছি।

নিম্নলিখিত দেশমান্য পণ্ডিতমণ্ডলী ঐ উপাধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া গুণমুগ্ধতার পরিচয় দিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সার্ব্বভৌম, নবদ্বীপ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, কলিকাতা, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম ভট্টপল্লী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চিত্রধর মিশ্র মিথিলা, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত

বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন বর্দ্ধমান, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত কলেজ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ সংস্কৃত কলেজ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য কলিকাতা, শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র তর্করত্ন নবদ্বীপ, শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন নবদ্বীপ, শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি সংস্কৃতকলেজ, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সংস্কৃতকলেজ, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণশাস্ত্রী সংস্কৃতকলেজ ও দ্রাবিড়, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ কলিকাতা, শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন স্মৃতিভূষণ বিল্বপুষ্করিণী, শ্রীযুক্ত ঠাকুরপ্রসাদ শর্ম্মা সংস্কৃতকলেজ ও কাশী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার তর্কনিধি সংস্কৃতকলেজ, শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মিশ্র উড়িষ্যা, রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর কলিকাতা, শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ শিরোমণি কলিকাতা, শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ কলিকাতা, শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ স্মৃতিতীর্থ কলিকাতা, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ কলিকাতা, শ্রীযুক্ত নীলকান্ত তর্কবাগীশ কলিকাতা, শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি শান্তিপুর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ বহরমপুর, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বেদান্ততীর্থ ভবানীপুর, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন খিদিরপুর, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সংস্কৃতকলেজ, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ ভট্টপল্লী, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বিদ্যাবিনোদ সংস্কৃতকলেজ, শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় স্মৃতিরত্ন মূলাযোড় সংস্কৃতকলেজ, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ কলিকাতা, শ্রীযুক্ত হরিপদ স্মৃতিতীর্থ মূলাযোড় সংস্কৃতকলেজ, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর তর্কভূষণ ভট্টপল্লী, শ্রীযুক্ত দাশরথি স্মৃতিরত্ন ব্যাণ্ডেল, এবং অন্যান্য বহু পণ্ডিত।

উপাধি-প্রদানের সময় মহারাজ বাহাদুর বলেন যে হিন্দুপত্রিকার সুপসিদ্ধ সম্পাদক এবং বেদান্তাদি নানাশাস্ত্রবিশারদ রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার মহোদয়কে পণ্ডিতমণ্ডলী 'বেদান্তবাচস্পতি' উপাধি প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহাদের আদেশ ক্রমে আমি তাঁহাকে তাঁহাদের দত্ত এই মানপত্র প্রদান করিলাম।

এই কথা বলিয়া, তিনি, রায় বাহাদুর যদুনাথের হস্তে উক্ত মানপত্র প্রদান করেন। মানপত্র গ্রহণ করিয়া রায় বাহাদুর বলেন যে, তিনি বিগত ৩১ একত্রিশ বৎসর ধরিয়া যে হিন্দুশাস্ত্রের সেবা করিয়াছেন, তাহা যে পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রীতিকর হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়া, তিনি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। তিনি আরও বলেন যে, তিনি রাজকীয় সম্মান অপেক্ষাও এই সম্মানে আপনাকে অধিক গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন। যদিও তিনি নিজেকে এই সম্মানের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করেন না, তথাপি অদ্য হইতে এই সম্মানের উপযুক্ত হওয়া তাঁহার জীবনের একটি প্রধান ব্রত হইবে। রায় বাহাদুর মানপত্র গ্রহণ করিলে পর সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলী এবং অন্যান্য উপস্থিত মহোদয়গণ আনন্দ প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ ব্যতীত সভাস্থলে দিনাজপুরের মহারাজা, মুক্তাগাছের মহারাজা, জষ্টিস্ আশুতোষ চৌধুরী এবং অন্যান্য বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদক মহাশয়ের উপাধিলাভে আমরা বুঝিলাম, তিনি যে আজীবন বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া, বিশেষতঃ বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা রচনা ও প্রকাশ করিয়া, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, এবং 'আমিত্বের প্রসার' প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থ রচনার দ্বারা পরোক্ষে, বেদান্ত শাস্ত্রের সারতত্ত্ব প্রচার করিয়া বঙ্গভাষার গৌরববর্দ্ধন ও বেদান্তাদি শাস্ত্রের মর্ম্মোদ্ঘাটন দ্বারা, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মঙ্গলসাধনে প্রচুর পরিশ্রম করিতেছেন, দেশপূজ্য পণ্ডিতমণ্ডলী এবং দেশনায়ক বর্দ্ধমানাধিপতি প্রভৃতির নিকট তাহা উপেক্ষিত হয় নাই, পরন্তু সমধিক সমাদৃতই হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়ের এই উপাধিলাভে শুধু যে তাঁহার ব্যক্তিগত গৌরব বর্দ্ধিত হইল, তাহা নয়, ইহা দ্বারা প্রকারান্তরে যোগ্যতার সমাদর সমর্থিত হইল এবং মানাস্পদ পণ্ডিতমণ্ডলীর মহত্ত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল, সুতরাং পরোক্ষে শাস্ত্র ও শাস্ত্রচর্চ্চার প্রতিই সম্মান প্রদর্শিত হইল।

আমরা আশাকরি, সম্পাদক মহাশয় দীর্ঘজীবী হইয়া শাস্ত্রচর্চ্চা ও শাস্ত্রপ্রচার দ্বারা উপাধির মর্য্যাদা রক্ষা করুন এবং সর্ব্বদা নিজ নামের সহিত এই 'বেদান্তবাচস্পতি' উপাধি ব্যবহার করিয়া, ইহার সার্থক্য সম্পাদন করুন।

সম্পাদক মহাশয়ের রাজসম্মান-(রায় বাহাদুর উপাধি-) লাভে আমরা যত প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম, ইহাতে ততোধিক আনন্দলাভ করিলাম। রাজসম্মান বুঝাইয়া দিয়াছে, তিনি রাজানুগ্রহ আকর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু এবারকার এই সম্মান হইতে আমরা বুঝিলাম—এদেশের ধর্ম্মরক্ষক শাস্ত্রসেবক মনীষিগণ, সম্পাদক মহাশয়কে কিরূপ প্রীতির চক্ষে দর্শন করেন! দেশে শিক্ষিত ও পদশালি-সমাজে রাজসম্মানে তাঁহার সমকক্ষ লোক আছেন, কিন্তু 'বেদান্তবাচস্পতি' বোধ হয় কেহই নাই। সম্মান সৎকর্ম্মের পুরস্কার, এইজন্যই আমরা এত আনন্দিত! শ্রীকঃ—

সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা।

প্রথমশিক্ষা ভারতবর্ষের ইতিহাস। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ প্রণীত। ছাত্রপাঠ্য ইতিহাস অপ্রচুর নহে, কিন্তু লিখিবার কৌশল সর্ব্বত্র সমান না হওয়ায়, সবগুলি পড়িতেই যে ছাত্রেরা আনন্দ পায়, এমন মনে হয় না। ইতিহাস নীরসই প্রায়, ছাত্রগণের রুচিকর পাঠ্য কদাচিৎ। এই পুস্তকখানি শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ যে ভাবে যে ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহাতে ছাত্রেরা ইতিহাসের নীরস-কঠোরতা ভুলিয়া যাইয়া সুখকর পাঠ্য মনে করিতে প্রস্তুত হইবে। পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি-আকর্ষণ করিবে, আশা করা যায়। মানচিত্র ও চিত্রগুলি বেশ সুন্দর হইয়াছে। যবদ্বীপযাত্রি-হিন্দুজাহাজের চিত্রখানি আর কোথাও যেন দেখি নাই! সুখদ নূতনত্ব বটে! অশোকের রাজ্যের মানচিত্র এবং আকবরের রাজ্যের মানচিত্র প্রভৃতি দ্বারা ছাত্রগণ যথেষ্ট উপকার পাইবে, ঐ বিষয়ে অনেকের পরিস্ফুট ধারণাই নাই। পুস্তকখানি সর্ব্বত্র সমাদৃত হইলে আমরা আনন্দিত হইব। কুন্তলীন-প্রেসের মুদ্রণ, সুতরাংই ভাল, কাগজ ও বেশ। মূল্য লেখা নাই।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।



১৮শ বর্ষ, ১৮শ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা। | চৈত্র। | ১৩১৮ সাল, ১৮৩৩ শকাব্দাঃ।

শ্রাবস্তি।

('সি য়ুউ কি'র ইংরাজী অনুবাদ হইতে)

এই সাম্রাজ্য * শ্রাদ্ধের পুত্র, যুবনাশ্বের পৌত্র শ্রাবস্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। রাজ্যের পরিধি ছয় সহস্র লি (১) বা দুই সহস্র মাইল। প্রধান নগরী বিধ্বস্তপ্রায় এবং মরুভূমি সদৃশ বিদ্যমান। প্রকৃত সীমার নির্দ্দেশ পাওয়া যায়না। রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর প্রায় ২০ লি বা ৬৫ মাইল হইবে। সমস্তই নষ্টপ্রায় হইলেও তথায় কতিপয় অধিবাসী দৃষ্ট হয়। শস্যাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। জলবায়ু প্রীতিপ্রদ ও মনোরম। লোকজনের আচার ব্যবহার পবিত্র ও সরল। তাহারা জ্ঞানচর্চ্চায় নিরত এবং ধর্ম্মভীরু। তথায় বহু শত সংঘারাম ধ্বস্তাবস্থায় বিদ্যমান, কিন্তু তদবলম্বী উপাসক অত্যন্ত বিরল। তাহারা সম্মতিয়া স্কুলে অধ্যয়ন করে। শতাধিক দেবমন্দির আছে, তন্মতের উপাসকসংখ্যাও যথেষ্ট। যখন তথাগত এই পৃথিবীতে ছিলেন, তখন এই স্থানে প্রসেনজিৎ রাজার রাজধানী ছিল। রাজনগরীর প্রাচীন সীমামধ্যে কতকগুলি পুরাতন ভিত্তি, দর্শকের নয়নপথে পতিত হয়। ঐ সমস্তই রাজা প্রসেনজিতের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ। এইস্থানের অনতিদূর পূর্ব্বে একটী ধ্বস্ত স্তূপ পরিলক্ষিত হয়। ঐ ধ্বংসস্থানে সদ্ধর্ম্মমহাশালা ছিল, রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধদেবের জন্য উহা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই মহাশালার অনতিদূরে একটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধদেবের মাতুলানী প্রজাপতি ভিক্ষুণীর জন্য তদুপরি একটী বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই স্তূপের পূর্ব্বদিকে সুদত্তের গৃহ। সুদত্তের অপর নাম অনাথপিণ্ডিক। সুদত্তের গৃহের সন্নিকটে একটী বৃহৎ স্তূপ বিদ্যমান। এইস্থলে অঙ্গুলীমাল

* হরিবংশ ৬৭০ পৃঃ, বিষ্ণুপুরাণ ৩য় খণ্ড, ২৬৩ পৃঃ।

(১) লি — একমাইলের একতৃতীয়াংশ।

বিধর্ম্মসেবা ত্যাগ করিয়াছিল। অঙ্গুলী-মাল্যগণ শ্রাবস্তির মধ্যে অতিশয় ঘৃণিত এবং হতভাগ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হইত। তাহারা জীবিত প্রাণী মাত্রকেই হত্যা করিত। এইরূপে হত মনুষ্যের অঙ্গুলীগুলি কাটিয়া মাল্যরূপে ধারণ করায় তাহাদের অঙ্গুলীমাল্য নাম হইয়াছিল। পূর্ব্বকথিত অঙ্গুলীমাল্য একদা তাহার মাতাকে হত্যা করিয়া অঙ্গুলী-সংখ্যা পূর্ণ করিবার প্রয়াস পাওয়াতে, বুদ্ধদেব, করুণাপরবশ হইয়া তাহাকে সদ্ধর্ম্মে আনয়ন করিবার জন্য তথায় গমন করিলেন। অঙ্গুলী-মাল্য দূর হইতে বুদ্ধদেবকে দর্শন করিয়া উৎফুল্লচিত্তে বলিতে লাগিল 'এক্ষণে আমি স্বর্গলাভ করিব, কারণ আমাদের পূর্ব্বগুরু বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ বুদ্ধদেবের অনিষ্ট করে কিম্বা স্বকীয় মাতাকে হত্যা করে, তাহা হইলে তাহার ব্রহ্মলোক লাভ হয়।' তখন সে তাহার মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'বৃদ্ধা, কিছুকাল আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি। প্রথমতঃ আমি ঐ প্রধান শ্রমনকে হত্যা করিব, তারপর তোমার পালা।' এই বলিয়া এক খানি ছুরিকা হস্তে সে বুদ্ধদেবকে আক্রমণ করিতে গমন করিল। এই অবস্থাতেও তথাগত ধীরপদবিক্ষেপে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু অঙ্গুলীমাল্য দ্রুতগতিতে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল। বুদ্ধদেব তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'অঙ্গুলীমাল্য, তুমি তোমার অসদভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য অনবরত যত্ন করিতেছ কেন? তোমার স্বভাবোচিত সদ্গুণ গুলিকে বিসর্জ্জন দিয়া, মন্দবুদ্ধিকে কেন প্রশ্রয় দিয়া পোষণ করিতেছ?' অঙ্গুলীমাল্য ইহা শ্রবণ করিয়া নিজের ঘৃণিত আচরণ বুঝিতে পারিয়া বুদ্ধদেবকে সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার পদাশ্রয় প্রার্থনা করিল, তখন তিনি তাহাকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করিলেন। অঙ্গুলীমাল্য একাগ্র-মনে ধর্ম্মের সাধনা করিয়া অর্হত রূপে মহাফল প্রাপ্ত হইয়াছিল। সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, অতিবড় পাষণ্ডও সামান্য কারণে অতি আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া সাধুজনগণের মধ্যে স্থানলাভের যোগ্য হয়।

নগরের দক্ষিণ দিকে প্রায় দুই মাইল দূরে জিতবন নামে একটী সুরম্য উদ্যান। এই স্থানে রাজা প্রসেনজিতের প্রধান মন্ত্রী অনাথপিণ্ডিক বা সুদত্ত, বুদ্ধদেবের জন্য একটী বিহার প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তথায় একটী সঙ্ঘারাম ছিল, উহা এক্ষণে ধ্বংসমুখে পতিত। পূর্ব্বদিকের প্রবেশদ্বারের বাম ও দক্ষিণে ৭০ ফিট উচ্চ এক একটী স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বামদিকের স্তম্ভগাত্রে একটী চক্র এবং দক্ষিণ দিকের স্তম্ভের উপর একটী বৃষমূর্ত্তি খোদিত। উভয় স্তম্ভই রাজা অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। পুরোহিতগণের বাসভবন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কেবলমাত্র ভিত্তিস্থল বিদ্যমান। একটী ইষ্টকনির্ম্মিত হর্ম্ম্য ধ্বংসমধ্যে দণ্ডায়মান পরিদৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে একটী বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত। পূর্ব্বে যখন তথাগত তাঁহার মাতৃদেবীর উপকারার্থে সদুপদেশ প্রদানার্থ ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন করেন, তখন উদয়নরাজ চন্দন-কাষ্ঠ দ্বারা বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। রাজা প্রসেনজিৎ ইহা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্ব কথিত বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সুদত্ত অতিশয় দয়াশীল এবং

বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া দানে মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। দীন-দুঃখীকে সর্ব্বদাই সাহায্য করিতেন। তাঁহার জীবিতকালে লোকে তাঁহাকে অনাথপিণ্ডিক (পিতৃ-মাতৃহীনের অন্নদাতা) বলিত; ইহা হইতেই তাঁহার দানশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মকথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিসমন্বিত হইয়া, তিনি তাঁহার (বুদ্ধদেবের) জন্য একটী বিহার নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করতঃ বুদ্ধদেবকে উক্ত বিহার গ্রহণ করিবার জন্য সসম্মানে আহ্বান করিলেন। বুদ্ধদেব শারীপুত্রকে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করেন। রাজপুত্র জিতের উদ্যান অতিশয় মনোরম এবং সুরম্য স্থানে অবস্থিত বিধায়, তাঁহারা রাজপুত্রের অভিপ্রায় জানিবার জন্য সুদত্তকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সমীপে যাইতে সম্মত হইলেন। রাজপুত্র বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, 'যদি আপনি সুবর্ণ দ্বারা উক্ত স্থান আচ্ছাদিত করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট উহা বিক্রয় করিব।' সুদত্ত ইহা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার কোষাগার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। কাঞ্চন দ্বারা উক্ত স্থান পূর্ণ হইবার অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে রাজপুত্র তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে বলিয়া বলিলেন 'বুদ্ধদেবের কার্য্যক্ষেত্রই যথার্থ। আমি ইহাতে উত্তম বীজ বপন করিব।' পরে তিনি উক্ত শূন্যস্থানে একটী বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব তখন আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'সুদত্ত জমি ক্রয় করিয়াছে। পাদপ সকল জিত কর্ত্তৃক প্রদত্ত। অতএব উভয়েরই কার্য্য প্রশংসাই আজ হইতে ঐ স্থান জিতের কুঞ্জবন, এবং উদ্যান অনাথপিণ্ডিকের নামে অভিহিত হইবে।' অনাথপিণ্ডিকের উদ্যানের উত্তরপূর্ব্বে একটী স্তূপ বিদ্যমান। এই স্থানে তথাগত পীড়িত ভিক্ষুকে সলিল দ্বারা স্নান করাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে যখন বুদ্ধদেব এই পৃথিবীতে ছিলেন, তখন একটী পীড়িত ভিক্ষু বিষাদে ম্রিয়মাণ হইয়া নির্জ্জনস্থানে একাকী বাস করিতেন। বুদ্ধদেব তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি দুঃখে তুমি একাকী নির্জ্জনস্থানে কালযাপন কর?' ভিক্ষু উত্তর করিল 'আমি স্বাভাবতঃ অলস এবং উদাসীন বিধায় কোন পীড়িত ব্যক্তির শুশ্রূষা কিম্বা তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতামনা। এক্ষণে আমি নিজে পীড়িত হওয়ায় কেহ আমাকে শুশ্রূষা করে না।' তথাগত এতচ্ছ্রবণে করুণা-পরবশ হইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'হে বৎস! আমি তোমার শুশ্রূষা করিব।' তৎপর তাহাকে অবনত হইতে বলিয়া তিনি তাহাকে স্পর্শ করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, পীড়া তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হইয়া গেল। পরিশেষে বুদ্ধদেব তাহাকে গৃহের বাহিরে আনিয়া একখানি মাদুর বিছাইয়া তদুপরি উপবেশন করাইয়া, তাহার দেহ ধৌত করাইয়া দিলেন, এবং পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করাইলেন। অনন্তর বুদ্ধদেব উক্ত ভিক্ষুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'বৎস এখন হইতে পরিশ্রম সহকারে কার্য্য কর।' এই কথা শুনিয়া ভিক্ষু নিজের অলসতার জন্য অনেক অনুতাপ করিল এবং আনন্দপূর্ণ কৃতজ্ঞহৃদয়ে বুদ্ধদেবের অনুসরণ করিল।

অনাথপিণ্ডিকের উদ্যানের উত্তর-পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্র স্তূপ বিদ্যমান। এই স্থানে মুদ্গলপুত্র স্বকীয় পারমার্থিক ক্ষমতা দ্বারা শারীপুত্রের কটিবন্ধ উত্তোলন করিতে বৃথা প্রয়াস পাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে যখন বুদ্ধদেব উ-ন্তে নো (অন্তরাতপ্ত বা অনোতপ্ত) হ্রদের নিকট দেব-মানবমণ্ডলী মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন, একমাত্র শারীপুত্রই কোন কার্য্য বশতঃ তথায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই দেখিয়া, বুদ্ধদেব মুদ্গলপুত্রকে তাহার আনয়নের জন্য আদেশ করিলেন। মুদ্গলপুত্র গিয়া দেখিলেন, শারীপুত্র, বস্ত্রের কিয়দংশের সংস্কারে নিযুক্ত রহিয়াছেন। মুদ্গলপুত্র তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'আমাদের প্রভু হিমালয়-প্রদেশস্থ অনবতপ্ত হ্রদের ধারে অধুনা অবস্থিতি করিতেছেন। তোমাকে তৎসকাশে লইয়া যাওয়ার জন্য তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন।' শারীপুত্র বলিলেন 'ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। আমি আমার কাজটুকু সমাধা করিয়াই তোমার সহিত যাইতেছি।' মুদ্গলপুত্র বলিলেন 'যদি তুমি এখনই না আইস, তবে আমার যৌগিক ক্ষমতা বলে তোমাকে তোমার বাসগৃহ সহিত মণ্ডলী মধ্যে লইয়া যাইব।' তচ্ছ্রবণে শারীপুত্র স্বকীয় কটিবন্ধ খুলিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'যদি তুমি এই কটিবন্ধ উঠাইতে পার, তবেই আমাকে মন্ত্রবলে লইয়া যাইতে পারিবে, নতুবা নহে।' মুদ্গলপুত্র তাঁহার সমুদয় অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু কটিবন্ধ উত্তোলন করিতে সমর্থ হইলেন না, পরন্তু ইহা অণুমাত্র স্থানচ্যুতও হইল না। তখন ধরিত্রী দেবী কম্পিতা হইতে লাগিলেন। মুদ্গলপুত্র অনন্যোপায় হইয়া যোগবলে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, শারীপুত্র সভামধ্যে উপবিষ্ট আছেন। তদ্দর্শনে মুদ্গলপুত্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন 'এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম—বুদ্ধি-কৌশলের নিকট অদ্ভুত কর্ম্মের ক্ষমতা কিছুই নহে' *

উল্লিখিত স্তূপের অনতিদূরে একটী কূপ বিদ্যমান তথাগত এই পৃথিবীতে অবস্থান কালীন ঐ কূপ হইতে নিজ ব্যবহারের জন্য উদক গ্রহণ করিতেন। ইহার সন্নিকটে অশোক রাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী স্তূপ। ইহার মধ্যে তথাগতের শরীরাংশ বিদ্যমান আছে। স্থানে স্থানে তাঁহার ইতস্ততঃ ভ্রমণের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানের চতুর্দ্দিক যেন ভক্তের ভীতি-প্রদ ভক্তি আনিয়া দেয়। অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষীভূত হয়। কখন কখন স্বর্গীয় গীতি শ্রবণ-গোচর হয়, এবং কখন বা স্বর্গীয় সুরভিগন্ধে দিক্ সকল আমোদিত হয়। এই সমস্ত অনির্ব্বচনীয় নিদর্শনাদির বর্ণনা করা অসম্ভব।

শ্রীআশুতোষ রায়।

হরিদাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সাধুসঙ্গের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! স্পর্শমণি-সংযোগে লৌহ সুবর্ণে পরিণত হয় কিনা জানিনা, কিন্তু সজ্জন-সহবাসে যে পাপ-তিমিরময় হৃদয় ও পুণ্য প্রভায় প্রোজ্জ্বল হইতে

* কথিত আছে শারীপুত্র অদ্বিতীয় জ্ঞানী ছিলেন এবং মুদ্গলপুত্র অলৌকিক কার্য্যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

পারে, ইহাতেই তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হই-তেছে। ভক্তপ্রবর হরিদাসের সঙ্গ-হেতু বাজারের বেশ্যাও ভক্তিমতী "মহন্তী"তে পরিণত হইল। এই কাহিনীতে তাঁহার যশঃসৌরভ দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

অতঃপর তিনি চাঁদপুর গমন করেন। তত্রত্য সপ্তগ্রামনামক বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান বন্দরে, হোসেন সাহের প্রতিনিধি কার্য্যাধ্যক্ষ হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাস নামক দুই ধনী কায়স্থ ভূম্যধিকারীর পুরোহিত বলরামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি হরিদাসের বাসের নিমিত্ত একখানি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেন; হরিদাসও তথায় থাকিয়া প্রাণারাম হরিনাম-কীর্ত্তনে ব্যাপৃত থাকেন।

এই সময়ে সপ্তগ্রামে এক বুধসভা আহূত হয়। হরিদাসও তথায় গমন করেন। তথায় তিনি মধুর ভাষায় হরিগুণ-কীর্ত্তনে সভাস্থ জনমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। তদীয় ভক্তি-সমুজ্জ্বল দিব্যকান্তি দর্শনে বহুপণ্ডিতও তন্নিকটে প্রণত হইয়াছিলেন।

কিন্তু এসুখ সকলের প্রাণে সহে নাই। ঐ সভায় গোপাল নামে জনৈক শাস্ত্রানভিজ্ঞ পণ্ডিতন্মন্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। হরিদাসের সহিত তর্কে না পারিয়া, সে তাঁহাকে অতি কদর্য্য ভাষায় গালি দিল। তাহার ঐরূপ অসভ্যোচিত ব্যবহারে পণ্ডিতমণ্ডলী অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েন। ঐ ব্যক্তি হিরণ্যদাসের কর্ম্মচারী ছিল, তিনি তাহাকে কর্ম্মচ্যুত ও বিবিধ প্রকারে লাঞ্ছিত করিয়া হরিদাসের সম্মাননা বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইলেন। তখন হরিদাস মৃদুহাস্যে তদীয় হৃদয়বাহিনী স্বর্গীয় শান্তির পরিচয় দিয়া ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন—

"যাওথর কৃষ্ণ করুন কুশল সবাকার
আমার সম্বন্ধে দুঃখ না হউক্ কাহার "

এইরূপ করুণা কি নরহৃদয়ে সম্ভবে? সমানভাবে শত্রু-মিত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে জগতে কয়জনে পারে?

অতঃপর একটী মহামিলন সংঘটিত হয়। হরিদাস ও অদ্বৈতাচার্য্য কেহ কাহাকেও দেখেন নাই। অথচ দুই জনের মধ্যে বিনাপরিচয়ে বিশিষ্ট পরিচয়--বিনা সন্দর্শনেও বিশিষ্ট প্রণয় ছিল। এইরূপ অচাক্ষুস প্রেম পৃথিবীর অনেক স্থলেই মানবের মধ্যে বেশী আদরের বস্তু হইয়া পড়ে। পশু পশুকে ঘ্রাণে চিনে; মনুষ্য মনুষ্যকে চিনে আত্মার অলক্ষিত দৃষ্টিতে—প্রাণে প্রাণে। যাহারা একপথের পথিক, একভাবের ভাবুক, এক-রসের রসিক, তাহাদিগের পরস্পরের প্রাণের মধ্যে প্রীতির এইরূপ ফল্গুধারা সর্ব্বদাই প্রবাহিত হইয়া থাকে। লোকে দেখেনা, অথচ প্রীতির অন্তঃসলিলা গঙ্গায় সর্ব্বদাই স্রোত বহে।

হরিদাস চাঁদপুর হইতে শান্তিপুর আগমন করেন। এইস্থানে মহাপুরুষ অদ্বৈতের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। একবার সাক্ষাতেই উভয়ে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। অদ্বৈতপ্রভু হরিদাসের জন্য গঙ্গাতীরে এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ভিক্ষার জন্য সময়ে সময়ে হরিদাস অদ্বৈতগৃহে আসিতেন, তখন উভয়ে সেই চিত্তসন্তাপহারিণী কৃষ্ণ-কথায় সুখে কালাতিপাত করিতেন।

হরিদাসের কুটীর অতি মনোরম স্থানে অবস্থিত ছিল। তাহার আশ্রমের পার্শ্বদিয়া প্রসন্নসলিলা জাহ্নবী কুলকুলরবে প্রধাবিতা ছিলেন। তীরস্থিত উচ্চশীর্ষ পাদপরাজিতে বিহঙ্গকুল কলরব করিয়া স্থানটিকে নিরন্তর শব্দায়মান করিয়া তুলিত। জ্যোৎস্নাময়ী ধরণীতে পূতসলিলা পূর্ণদেহা তটিনীর অপূর্ব্ব তরঙ্গভঙ্গ ও তদুপরি সুধাংশুর মধুর কিরণ-সম্পাতদর্শনে পুলকিতচিত্ত হইয়া হরিদাস, এই সুন্দর দৃশ্যের স্রষ্টা যে কত সুন্দর, তাহাই ভাবিতেন। আর দিবাভাগে কূজনশীল পক্ষিগণের কলরব তাহার কর্ণে কোন এক অজ্ঞাত দেশের বার্ত্তা আনিয়া দিত।

"সমে শুচৌ শর্করবহ্নিবালুকা-
বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ
মনোহনুকূলে ন তু চক্ষুঃপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ"

হরিদাস অনেকাংশে এই ঋষিবাক্য পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত অদ্বৈতপ্রভুর অকৃত্রিম ও অপার্থিব সৌজন্যের ফলে যদি তিনি স্বসমাজে অপদস্থ হয়েন—এই ভয়ে হরিদাস তাঁহার গঙ্গাজীবনবিধৌত রমণীয় কুটীর পরিত্যাগ করিয়া ফুলিয়া যাত্রা করেন। এই স্থানেই তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় পরীক্ষা-স্থল।

চন্দনবৃক্ষের পারিপার্শ্বিক পাদপরাজি যেমন তৎসৌরভে সুবাসময় হইয়া উঠে, ফুলিয়ায় হরিদাসেরও পারিপার্শ্বিক জনগণগুলী সত্বরই পূতচেতা হইয়া উঠিল। এ স্থানেও তিনি স্বীয় অসামান্য চরিত্রগুণে জনগণের নিকট হইতে অযাচিতভাবে অনুরাগ-চন্দনচর্চ্চিত ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু ফুলিয়ার গোড়াই কাজির প্রাণে ইহা সহিল না। তিনি স্বধর্ম্মত্যাগী ও ইসলামধর্ম্ম-বিদ্রোহী বলিয়া হরিদাসের নামে রাজদ্বারে অভিযোগ আনয়ন করিলেন। তাহার প্ররোচনায় যবনাধিপতি, হরিদাসকে ধরিতে পাঠাইলেন বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি পাইকগণের সহিত রাজধানীতে গমন করিলেন।

তারপর যখন হোসেনসাহ তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন—তখন বীরের ন্যায়—"বীররসের প্রত্যক্ষ অবতারের ন্যায়"—হরিদাস বলিলেন –

"খণ্ড খণ্ড যদি হই—যায় দেহ প্রাণ
তবু আমি বদনে ছাড়ি না হরিনাম"

হরিদাসের কর্ণে বোধ হয় তখন কোন অচেনা দেশ হইতে তাড়িতবলবিধারিণী কোন অভয়বাণী পৌঁছিয়াছিল—তাহাতেই উৎসাহিত হইয়া বোধ হয় পুলকিততনু হরিদাস শাণিত-কৃপাণতলে স্বেচ্ছায় মস্তক পাতিয়াছিলেন!

তখন কাজী বলিলেন "ইহাকে পাইকেরা বান্ধিয়া লইয়া বাইশবাজারে বেড়াইয়া বেড়াইবে, এবং প্রত্যেক বাজারে ইহাকে বেত্রাঘাত করিবে" বঙ্গাধিপতি এ আজ্ঞা অনুমোদন করিলেন! কলিযুগের প্রহ্লাদ ভক্তির প্রতিমূর্ত্তি হরিদাসকে তখন হস্ত-পদ বদ্ধ করা হইল। ভীষণাকার প্রস্তর-কঠিন-হৃদয় রাজানুচরগণ তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল!

অহো! সে কি ভয়ানক দৃশ্য? কোমল-হৃদয় নরনারীগণ সে দৃশ্যদর্শনে স্থির থাকিতে পারিল না। তাহাদের রোদনধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "ভাই আমাকে মার; এই মহাপুরুষকে

ছাড়িয়া দেও ” হায়! সে দৃশ্য কি হৃদয়-বিদারক ?

আর হরিদাস—তখনও তাঁহার হৃদয় শান্তিরসসিক্ত! তিনি সহাস্যবদনে সেই কঠিন আঘাত সহ্য করিতেছিলেন। তাঁহার ক্ষতোপরি তিনি যেন কোন স্নেহশীতল হস্তের স্পর্শানুভব করিতেছিলেন। তাই যে সময়ে কঠিন বেত্রাঘাতে তাঁহার সেই পবিত্র দেহ শোণিতাক্ত হইতেছিল, তখন তিনি সেই বেত্রধারিগণেরই মঙ্গলকামনা করিতেছিলেন। তিনি তখন বলিলেন—

"এসব জীবের প্রভু করহ প্রসাদ
মোর দ্রোহে নহে এ সবার অপরাধ।”

এশিয়ার পশ্চিমপ্রান্তে ক্রুশবিদ্ধ যিশুও একদিন এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন। আর ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যগণের লীলানিকেতন ভারতভূমিতেও একদিন সেই প্রাণে ভক্তবীর হরিদাস তাঁহার চিরজীবনের লক্ষ্য জগজ্জীবন হরির নিকট উক্তরূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

হরিদাসের ঐরূপ প্রার্থনা শুনিয়াও তখনও তাঁহার প্রাণান্ত হয় নাই দেখিয়া, পাইকগণ স্তম্ভিত হইল ও বলিল "ঠাকুর— তুমি দেবতা। আমরা বুঝিয়াছি তুমি মরিবে না, এবং তুমি না মরিলেও কাজীর হস্তে আমাদের মরিতে হইবে—এখন উপায় ?”

হরিদাস স্মিতমুখে তাহাদিগকে বলিলেন, "আমার মরণে যদি একটী প্রাণীরও কল্যাণ সাধিত হয়, তবে আমি হৃষ্টান্তঃকরণে প্রাণ দিব।” এই বলিয়া ধ্যানযোগে হরিদাস শ্বাস-প্রশ্বাসাদি-ক্রিয়া নিরুদ্ধ করিলেন। যখন পাইকেরা তাঁহাকে মৃত স্থির করিয়া, কাজীর আদেশে তাঁহাকে নদীতে ভাসাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে জনরব হইল যে, হরিদাস জীবিত আছেন ও নদীতীরে বসিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া যবনাধিপতি তাঁহাকে বলিলেন—

"সত্য সত্য জানিলাম তুমি মহাবীর
একজ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির।
যোগীজ্ঞানী সব যত মুখে মাত্র বলে,
তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহাকুতূহলে।
তোমারে দেখিতে মুই আইনু হেথারে,
সবদোষ মহাশয় ক্ষমিবে আমারে।
সকল তোমার সম শত্রু-মিত্র নাই
তোমা চিনে হেনজন ত্রিভুবনে নাই।
চল তুমি শুভকর আপন ইচ্ছায়
গঙ্গাতীরে থাক গিয়া নির্জ্জন গোফায়।
আপন ইচ্ছায় তুমি থাক যথাতথা
যে তোমার ইচ্ছা তাই করহ সর্ব্বথা।”

আর তারপর—নদীর সাগরসঙ্গম! তারপর হরিদাসের সহিত পূর্ণব্রহ্মসনাতন গৌরচন্দ্রের সহিত আলিঙ্গন! হরিদাসের এতকালের প্রবল পিপাসা তখন মিটিল।

তারপর মহাপ্রভুর সঙ্গে হরিদাস কীর্ত্তনানন্দে বঙ্গদেশ মাতোয়ারা করিয়াছিলেন। প্রেমে বিহ্বল হইয়া কত পাপীকে প্রেমবিহ্বল করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার শেষজীবন নীলাচলে অতিবাহিত করেন। এই পুণ্যক্ষেত্রে তিনি তাঁহার পার্থিব আবরণ ত্যাগ করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে নিত্যধামে গমন করেন। ঐ স্থানে অদ্যাপি তাঁহার সমাধি আছে। প্রতিবৎসর বহু বৈষ্ণবভক্তের পূত অাঁখিজলে তাহা অধিকতর মহিমময় হইয়া ঈশভক্তির অত্যুজ্জ্বল নিদর্শনরূপে বিদ্যমান রহে।

এই মহাপুরুষের মহাদৃষ্টান্ত কি আমাদের উপেক্ষার বিষয় হইবে? আমরা কি ইহাতে কিছুই শিক্ষালাভ করিব না? যাঁহার হৃদয় সতত পুণ্যপ্রভায় সমুজ্জ্বল ছিল, তাঁহার পবিত্র স্মৃতি কি আমাদের আঁধারভরা হৃদয়ে আলোকদান করিবে না? আশা হয়, এই মহাপ্রাণ ভক্তবরের দৃষ্টান্তে দেশে ভক্তি-প্রবাহের আবির্ভাব হইবে। আবার এই দেশের প্রতিহৃদয়ে ভক্তিতরঙ্গিণী বহিবে—আবার বৈষ্ণবগণগুলী এই মহাপুরুষের প্রবর্ত্তিত পথানুসরণে লোকনেত্রে দেবতা বলিয়া প্রতীয়মান হইবেন।

শ্রীরাখালচন্দ্র সেন।

পরাশর ও সধবার বিবাহ।

আজকাল বিধবার বিবাহ লইয়া খুব আন্দোলন হয় শুনিয়া থাকি, কিন্তু সধবার বিবাহের কথা আদৌ শুনিনা। সধবার দুঃখে দুঃখিত হওয়া যে একেবারেই অন্যায়, একথা অবশ্য যাঁহারা বিধবার দুঃখে কাতর, তাঁহারা বলিবেন না; তবে কিনা, তাঁহারা সে কথাটা বলিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা নির্ব্বাক্ থাকিতে পারেন, কিন্তু পরাশর ত নীরব নহেন! কাজেই বাধ্য হইয়া আমরা অদ্য এবিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি।

যাঁহারা বিধবার বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বনামধন্য স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর মহাশয় বোধ হয় প্রথম পরাশরসংহিতার "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি শ্লোক বিধবাবিবাহের অনুকূল প্রমাণ রূপে উপস্থিত করেন। তৎপরে যাঁহারা "স্বনামে" "বিনামে" প্রবন্ধ লিখিয়া বা পুস্তক প্রকাশ করিয়া বিধবাবিবাহ সমর্থন করেন, তাঁহারাও 'নষ্টে মৃতে' বচনটীর উপর বেশী পরিমাণে ঝোঁক দিয়া থাকেন। সুতরাং এই শ্লোকটীর একটু আলোচনা হইয়াছে, মনে করা যাইতে পারে। অথচ আলোচনা সত্বেও সধবার বিবাহের প্রস্তাব শুনা যাইতেছে না কেন, বুঝিতেছি না। কথাটা শুনিয়া অনেকে হয়ত মনে করিবেন, "এ আবার কি?" তাঁহাদের অবগতির জন্য আমরা ঘোষণা করিয়াই বলিতেছি, ঐ 'নষ্টে মৃতে' শ্লোকে সধবার বিবাহের কথাও আছে। ক্রমে আমরা সে সব কথা বলিব।

হিন্দুশাস্ত্রের মূল বেদ। বেদের আবার ষড়ঙ্গ আছে। সেই ষড়ঙ্গ এই যথা,—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ। ইহার মধ্যে কল্প বা কল্পসূত্র তিনভাগে বিভক্ত। (১) শ্রৌতসূত্র, (২) গৃহ্যসূত্র (৩) ধর্ম্মসূত্র। শ্রৌতসূত্রে বৈদিক যজ্ঞাদির কথা, গৃহ্যসূত্র এবং ধর্ম্মসূত্রে স্মার্ত্তধর্ম্মের কথা। কাত্যায়ন প্রভৃতির শ্রৌতসূত্র পাওয়া যায়। গৃহ্যসূত্রের মধ্যে আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব, গোভিল, সাংখ্যায়ন প্রভৃতির সূত্রগ্রন্থ পাওয়া যায়। ধর্ম্মসূত্রের মধ্যে আপস্তম্ব প্রভৃতির রচিত কতিপয় সূত্রগ্রন্থ পাওয়া যায়। আর তা'র পর পাওয়া যায়, মনু প্রভৃতি প্রণীত কতিপয় 'স্মৃতিসংহিতা' গ্রন্থ। এই গৃহ্যসূত্র, ধর্ম্মসূত্র ও স্মৃতিসংহিতাই আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র।

এই সকল গ্রন্থ এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতগণ যে "স্মৃতিসংগ্রহ" গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিয়াছেন, যথা রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্ব প্রভৃতি, তাহাই হইতেছে আমাদের নবীন স্মৃতিগ্রন্থ। প্রধানতঃ আমরা এই পণ্ডিতদের গ্রন্থের প্রতিই নির্ভর করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া থাকি। এখানে স্মৃতিতত্ত্ব, ওখানে নির্ণয়সিন্ধু, সেখানে ময়ূখ, ও প্রদেশে গদাধরপদ্ধতি, ঐ প্রদেশে পরাশরমাধব, আর এক প্রদেশে মিতাক্ষরা এই সকল গ্রন্থই হইল এখনকার স্মৃতিশাস্ত্র। ইহা পড়িয়াই স্মার্ত্তপণ্ডিত হওয়া যায়। সংগ্রহগ্রন্থের ভিত্তি কিন্তু স্মৃতিসংহিতা এবং পুরাণ উপপুরাণ প্রভৃতি। এই স্মৃতিসংহিতাগুলির কথা বেদের ষড়ঙ্গে পাওয়া যায় না, এজন্য অনেকে বলেন, 'সংহিতাগুলি ধর্ম্মসূত্রের সন্ততি। ঋষিরা ধর্ম্মসূত্র প্রণয়ন করিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা দেন, উত্তরকালে শিষ্যেরা সূত্রসকলের মর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া 'সংহিতা' নামে সেই উপদেশসমূহ গ্রথিত করেন, তাহাই স্মৃতিশাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" সেরূপেই আবির্ভূত হউক্ না কেন 'সংহিতা' আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মের অন্যতম মূল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই।

সংহিতা অনেকগুলি, তন্মধ্যে মনু অত্রি প্রভৃতি কুড়ি জনের কুড়িখানি সংহিতা বিশেষ প্রসিদ্ধ মনু অত্রি প্রভৃতিরও আবার "নবীন" 'প্রবীণ' ভেদ আছে। 'বৃদ্ধ মনু' 'মধ্যমাঙ্গিরা', 'বৃদ্ধহারীত' 'বৃদ্ধ বশিষ্ঠ' প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রায়ই দেখা যায়, সুতরাং অনেক মনু অনেক হারীত যে ধর্ম্মশাস্ত্র লেখেন, তাহা বুঝা যায়। আবার গ্রন্থেরও 'লঘু' 'বৃহৎ' ভেদ আছে। অত্রিসংহিতা ৩খানি পাওয়া যায়, লঘ্বত্রিসংহিতা, অত্রিসংহিতা বৃদ্ধাত্রিসংহিতা। ঐরূপ হারীত গৌতম বশিষ্ঠাদিরও 'লঘু' ও 'বৃদ্ধ' সংহিতা দেখা যায়। পরাশরের 'বৃহৎ' ও 'লঘু' সংহিতা আছে। কুড়ি জন ব্যতীত বুধ, কশ্যপ, ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতির সংহিতার অনেকাংশ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে পরাশরের যে "লঘু পরাশরসংহিতা" আছে, তাহা ১২ অধ্যায়ে সমাপ্ত; তাহাতেই এই 'নষ্টে মৃতে' বচন দেখা যায়। বৃহৎপরাশরসংহিতাও ১২ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, তবে ইহার অধ্যায়গুলি অবশ্য 'বৃহৎ'ই আছে। কাজেই পুস্তকখানি লঘুসংহিতা হইতে বড় হইয়াছে। যে হউক্, আমরা লঘুসংহিতার বচনটীরই একটু আলোচনা করিব।

পরাশরের লঘুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে একটী শ্লোক আছে—"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যোবিধীয়তে।" সরলার্থে শ্লোকটীর ভাব এই যে, যাহার পতি নষ্ট মৃত, প্রব্রজিত, ক্লীব এবং পতিত, সেই বিপন্না রমণীর অন্যপতি বিহিত হইবে। বস্তুতই হৃদয়গ্রাহী বচন! পতি নষ্ট অর্থাৎ নিরুদ্দিষ্ট হইল, মরিয়া গেল, সন্ন্যাসী হইল, ক্লীব হইল, এবং পতিত হইল, এখন রমণীর জীবনে আর সুখশান্তি থাকিল কি? কাজেই তাহার জন্য অন্য একটী পতির ব্যবস্থা করা সঙ্গত। অনেক সময় বালবিধবাদের অবস্থা দেখিয়া বচনটীর

সরল অর্থ করিতে ইচ্ছা হয় না কি? এখন কথা এই যে, যে সব অধুনাতম পণ্ডিতের মত আমরা মানিয়া চলি, তাঁহারা এই বচনের এমন সুন্দর অর্থ গ্রহণ করেন নাই। বরঞ্চ 'পতি' শব্দে 'বাগ্দত্তপতি' বুঝিয়াছেন, এবং বচনটী বাগ্দানের প্রসঙ্গের বলিয়াছেন। অধুনাতন পণ্ডিতগণ 'পতৌ' রূপ হয় না দেখিয়া, ব্যাকরণ-দোষ এড়াইবার জন্য ওখানে একটা লুপ্ত অকার মানিয়া লন, 'অপতৌ' পাঠ করেন। নঞ্ পদের সাদৃশ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া, পতিসদৃশ অপতি অর্থাৎ যাহাকে বাক্যের দ্বারা কন্যা দেওয়া স্থির করা হইয়াছে, সেই 'বাগ্দত্তপতিকে'ই 'অপতি' বলেন। তাহা হইলে বাগ্দত্তপতির নিরুদ্দেশ, মরণ, সন্ন্যাস, ক্লীবত্ব, পাতিত্য, প্রভৃতি ঘটিলে সে কন্যাকে ঐ বরের অপেক্ষায় না রাখিয়া অন্য বরে বিবাহ দিতে হইবে, ইহাই অভিপ্রায়। কলিতে বাগ্দান নাই, এজন্য মাধবাচার্য্য যে পরাশরের ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'অয়ন্তু পুনরুদ্বাহো যুগান্তর-বিষয়ঃ" লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বাগ্দত্তপতি-পক্ষেই বচনের তাৎপর্য্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন মনে হয় না কি? সে যাহা হউক, বিধবাবিবাহ এ প্রবন্ধের আলোচ্য নয়, আমরা শুধু পণ্ডিতদের ব্যাখ্যার আভাস দিয়াই সুতরাং এ বিষয় পরিত্যাগ করিতেছি।

যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বারা বিবাহিতা রমণীর পতি-মরণাদি বিপদে পুনরায় বিবাহ দেওয়ার কথা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা শ্লোকটীর অন্য অংশ উপেক্ষা করেন কেন, বুঝি না। পরাশর বলিতেছেন, পতি নষ্ট হইলে নারীকে পুনরায় বিবাহ দেও। যে দেশান্তরস্থ, অথচ দীর্ঘকাল যাহার সংবাদ পাওয়া যায় না, এরূপ ব্যক্তিকেই পণ্ডিতেরা 'নষ্ট' বলিয়াছেন। "নষ্ট দ্রব্য" বলিলে আমরা 'হারাণ জিনিষ' বুঝিয়া থাকি। 'মৃত' কথা স্বতন্ত্র থাকায় 'নষ্ট' অর্থে ইহার বেশী কিছু বুঝা সঙ্গত হয় কি? এখন কথা এই যে, যদি 'হারাণ পুরুষে'র স্ত্রী আবার বিবাহ করিতে পারে, তবে বড় গোল! কারণ, কতদিন বিদেশে থাকিয়া সংবাদ না দিলে যে 'নষ্টে'র মধ্যে গণ্য হওয়া যায়, তাহা পণ্ডিতেরা বলেন নাই। যদি কোনও বিরক্তা পত্নী ১০।১৫ দিন বিদেশস্থ পতির পত্র না পাইয়া একটা কিছু করিতে উদ্যত হয়, তখন? যদি স্বামী সন্ন্যাসী হইলে পত্নীর বিবাহ করায় অধিকার জন্মে, তবেও ত বিপদ্ কম নয়! কারণ বর্ত্তমান কালে ২।৪টী যুবক যে পত্নী-সত্ত্বেও সন্ন্যাস গ্রহণ না করিতেছে, এমন নয়! যদি বল, এ সন্ন্যাস বৈধ নয়, ইহা অনধিকারীর সন্ন্যাস-গ্রহণ, ইহাতে কিছু আসে যায় না। তাহার উত্তরে বলিতে পারি, যথার্থ অধিকারী বিচার করিতে গেলে, অনেকেরই বিবাহের অধিকারও নাই। অধিকারতত্ত্ব ঘাঁটিলে যে 'ঠগ্ বাছিতে গাঁ উজাড়' হয়, তাহা কে না বলিবে? অতএব ও কথা মুখে আনিতে নাই! তার পর ক্লীবের কথা। ক্লীব বহুবিধ, শাস্ত্রে রুগ্ন, বাতরেতা ইত্যাদি বহুশ্রেণীর ক্লীবের কথা পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকের পুংস্ত্ব পুনরার্জিত হইতেও পারে।

তীব্র সমালোচনা করিতে হইলে; দেখান যায়, সমাজের অনেক স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য-পীড়িত লোক একশ্রেণীর ক্লীব। সুরুচির অনুরোধে সে কথা বলা হইল না। এই সব ক্লীবের পত্নীরা পুনর্ব্বিবাহের অধিকারিণী হইলে ব্যাপার কি হয়, "বুঝ, ধীর, যে জান সন্ধান!" শেষ কথা পতিতের স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ। কথাটা মনে হইলেই কেমন কেমন বোধ হয়! বলি কি না বলি! মহাপাতক অতিপাতক প্রভৃতি গুরুতর পাপে কলুষিত ব্যক্তিরা 'পতিত' তাহাতে বোধ হয় সন্দেহ নাও থাকিতে পারে! ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, সুবর্ণহরণ গুরুপত্নীগমন, মাতৃগমন, দুহিতৃগমন, পুত্রবধূগমন প্রভৃতির নামই যে এই সব বড় বড় পাপ, তাহা শাস্ত্রে দেখা যায়। কতকগুলির কথা অল্প শুনা যায়, কিন্তু ২।১টার কথা সর্ব্বদাই শুনিতে হয়। পাপের পরিচয় বাড়াইব না, সংক্ষেপে বলি, যে সব কথা শুনিলেও কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়, তাহাও সমাজে নাই—এমন নহে! সমাজের অধিকাংশ লোকই যে শাস্ত্রের দৃষ্টিতে 'পতিত', ইহা না বলিলে সত্যের অবমাননা করা হয়। সমাজ শত সহস্র পতিত ব্যক্তিকে আপনার বিশাল জঠরে স্থান দিতেছে, কিন্তু শাস্ত্রের কাছে তাহারা 'পতিত'ই রহিয়াছে, উপরন্তু নূতন পতিত সৃষ্টি করিয়া সমাজের পাপস্রোত বাড়াইতেছে। এই সব লোকের পত্নীগণ পুনর্ব্বার পতি গ্রহণ করিতে পারে—এমন কথা যদি সত্যই পরাশর বলিয়া থাকেন, তবে আর তাঁহাকে বেশী কিছু বলিতে চাহিনা, কেবল বলি, তিনি একবার আসিয়া সমাজটা দেখিয়া গেলে ভ্রম-সংশোধন করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। যদি কেহ বলেন যে, সমাজ যে অধঃপাতে যাইবে, ইহা পরাশর ভাবেন নাই। তাঁহাকে বলিতে চাই, পরাশর যে নিজকে নিজেই কলি-ধর্ম্মশাস্ত্রকার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন! এই লঘুসংহিতাতেই আছে, "সত্যযুগে মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র প্রধান, ত্রেতায় গৌতমের, দ্বাপরে শঙ্খ লিখিতের, কলিতে পরাশরের।" পরাশরের বচন যাঁহারা মানেন, তাঁহারা ইহার সম্পূর্ণ টুকুই আলোচনা করিবেন, আশা করি। মোট কথা, পরাশর 'পতি' সম্বন্ধে বলিয়াছেন বলিয়া মনে করা কঠিন, কারণ তাহা হইলে তিনি সধবার বিবাহের কথা বেশী পরিমাণে বলিয়াছেন বুঝিতে হয়। সেরূপ ইচ্ছা হইলে খুব সম্ভবতঃ তিনি কলিযুগের জন্য 'ডাইভোর্স' প্রথার উপদেশ দিয়া যাইতেন! পরাশর বেদব্যাসের পিতা, তিনি একটা প্রথা চালাইতে পারিতেন না কি?

আমাদের মনে হয়, পরাশরের শ্লোকের ওরূপ তাৎপর্য্য নয়। অনেকে বলেন, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি ঐ বচনটাকে ঐ ভাবে লিখিয়াছেন, কিন্তু একখানি অল্প প্রাচীন পুঁথিতে "পতিরন্যোন বিদ্যতে' পাঠ আছে। ১৮০৫ শকাব্দে অর্থাৎ ২৮ বৎসর পূর্ব্বে বোম্বের জ্ঞানদর্পণযন্ত্রে মুদ্রিত "অষ্টাবিংশতি-স্মৃতয়ঃ" পুস্তকে যে লঘু-পরাশরসংহিতা সন্নিবিষ্ট, তাহাতে এই পাঠই দৃষ্ট হয়। "ন বিদ্যতে" পাঠের অর্থ যদি এইরূপ হয় যে, এই সকল বিপদেও রমণীরা অন্যপতি

পাইবেনা, তাহা হইলে কি মন্দ হয়? ইহার অনুকূল প্রমাণ এই—"নষ্টে মৃতে' বচনের পরের শ্লোক হইতেছে "মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা সদ্‌ব্রহ্মচারিণঃ। অর্থাৎ স্বামীর মরণের পর যে নারী ব্রহ্মচর্য্য করে, সে ব্রহ্মচারিদের ন্যায় স্বর্গে যায়।' ইহার পরের শ্লোকের অর্থ 'যে নারী অনুমৃতা হয়, সে, মানুষের গায়ে যত লোম, ততকাল স্বর্গে বাস করে।' তাহার পরের শ্লোকের অর্থ—"সাপুড়িয়া, যেমন সাপকে গর্ত্ত হইতে টানিয়া তোলে, পতিব্রতাও তেমনি স্বামীকে উদ্ধার করিয়া তাহার সহিত আনন্দলাভ করে।' এখানেই অধ্যায়ের শেষ। এখন বুঝুন, 'নষ্টে মৃতে'র পরের কথা পাতিব্রত্যের প্রশংসাবাদ। উহাই অধ্যায়ের উপসংহার। যদি পরাশর, স্বামী ব্রহ্মহত্যা করিলে তাহার স্ত্রী আর একটী স্বামী পাইতে পারে—এই-ই 'নষ্টে মৃতে" শ্লোকে বলিয়া থাকেন, তবে তাহারই পরবর্ত্তি তিনটী শ্লোকে (যাহাতে অধ্যায়ের সমাপ্তি হইয়াছে) তিনি কোন্ মুখে পতিহীনার ব্রহ্মচর্য্য ও অনুগমন লিপীবদ্ধ করিলেন? পূর্ব্বের কথার উপসংহার কি এই প্রকারে করাই দরকার হইয়াছিল? তা'ই একবার পণ্ডিতমণ্ডলীকে অনুরোধ করি, তাঁহারা এই বচনটীর আলোচনা করুন্।

বিধবাবিবাহসমর্থনকারিগণের মাত্র এই বচনটীই উপজীব্য নয়, তাঁহাদের অনেক কথা আছে, আমি তাহার আলোচনা এখানে করিতে চাইনা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিধবাবিবাহ এ প্রবন্ধের আলোচ্য নয়; তবে ঐ পরাশরের বচনটী বিধবাবিবাহের মূল বলিয়া মনে করিলে, তাহা দ্বারা সধবাবিবাহই বেশী সমর্থিত হইবে, ইহাই দেখাইয়া, বচনটীর গূঢ়তথ্য আলোচনা করিতে অনুরোধ করিয়া, অদ্যকার মত বিদায় গ্রহণ করিতেছি। প্রয়োজন হইলে আবার আসিব ও বলিব।

শ্রীকেঃ——স্মৃতিতীর্থঃ।

ন্যায়দর্শন।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

সূত্র। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষং। ৪।

ব্যাখ্যা। "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং" (বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধরূপব্যাপারজন্যং) "অব্যপদেশ্যং" (অশাব্দং) "অব্যভিচারি" (যথার্থং) "ব্যবসায়াত্মকং" (নিশ্চয়াত্মকং) "জ্ঞানং" (বুদ্ধিঃ) "প্রত্যক্ষং" (প্রত্যক্ষপ্রমাণলক্ষণঘটকীভূতং প্রত্যক্ষং) যত্তাদৃশং প্রত্যক্ষং ভবতি, তৎ প্রত্যক্ষপ্রমাণমিত্যাশয়ঃ॥

অথবা "অব্যপদেশ্যম্ ইতি "ব্যবসায়াত্মকম্" ইতিচ ন লক্ষণঘটকং, অপিতু প্রত্যক্ষবিভাগ-প্রদর্শকং। তথাচ লক্ষিতং প্রত্যক্ষং দ্বিবিধং। "অব্যপদেশ্যং" (নির্ব্বিকল্পকং) "ব্যবসায়াত্মকং" (সবিকল্পকং) ইতি॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

চক্ষুরাদি যে কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত তদ্‌গ্রাহ্য বিষয়ের সংযোগাদি সম্বন্ধ হলে,

যে অশাব্দ, যথার্থ, নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ। যাহার দ্বারা ঐরূপ প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

অথবা "অব্যপদেশ্য" এবং 'ব্যবসায়াত্মক', এই দুইটী কথা—প্রত্যক্ষের বিভাগ-প্রদর্শনের জন্য। অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষ দুই প্রকার। "অব্যপদেশ্য" অর্থাৎ নির্বিকল্পক ও "ব্যবসায়াত্মক" অর্থাৎ সবিকল্পক॥

মন্তব্য পূর্ব্বসূত্রে মহর্ষি গোতম, প্রত্যক্ষাদি চারিটী প্রমাণের উদ্দেশের সহিত ("প্রমাণ" শব্দের দ্বারাই) প্রমাণের সামান্য-লক্ষণের সূচনা করিয়াছেন। সূচনার জন্যই সূত্র। সূত্রে সকল কথার বিস্তৃত প্রকাশ অসম্ভব। তাই ভাষ্যটীকাদির সৃষ্টি।

এখন প্রথম উদ্দিষ্ট প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণই মহর্ষির বক্তব্য। মহর্ষি মনে করিলেন, প্রত্যক্ষ-প্রমাণের ফল যে প্রত্যক্ষ-নামক বিশেষ-জ্ঞান, তাহার লক্ষণ বলিলেই শিষ্যগণ প্রত্যক্ষ-প্রমাণের লক্ষণ সহজেই বুঝিতে পারিবে। কারণ, ঐ প্রত্যক্ষ-নামক বিশেষজ্ঞান যাহার দ্বারা হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ। ইহা এ প্রস্তাবে দুজ্ঞেয় নহে। কেহ কেহ বলেন, এই সূত্রের "প্রত্যক্ষ" শব্দটী প্রত্যক্ষ-প্রমাণেরই বোধক। সূত্রে "যতঃ" (অর্থাৎ যাহার দ্বারা) পদের অধ্যাহার করিয়া অন্বয় করাই অভিপ্রায়। অর্থাৎ যাহার দ্বারা ঐরূপ বিশেষজ্ঞান জন্মে তাহাই "প্রত্যক্ষ-" প্রমাণ, ইহাই মহর্ষির মনের কথা। কিন্তু মহর্ষির সূত্র পাঠ করিয়া সরলভাবে বুঝিলে মনে হয় প্রত্যক্ষজ্ঞানের লক্ষণই ইহাতে বিবৃত হইয়াছে।

মহর্ষি গোতমের মতে নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষুঃ, ত্বক্‌, কর্ণ, মনঃ, এই ছয়টী ইন্দ্রিয়। ঐ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় মাত্রই এখানে 'অর্থ' শব্দের অর্থ। ঐ ইন্দ্রিয়ের যে কোন একটীর সহিত তদ্‌-গ্রাহ্য বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইলে অর্থাৎ সম্বন্ধ বিশেষ ঘটিলে, যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ। অনুমান রূপ জ্ঞান, ঐ ইন্দ্রিয়-বিষয় সম্বন্ধ জন্য নহে, তাই উহা প্রত্যক্ষ হইতে পারিলনা।

সিদ্ধান্তবেদী আপত্তি করিবেন, ঈশ্বর-প্রত্যক্ষে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি হইতেছে। যাহার লক্ষণ বলিতে হইবে, তাহাকে লক্ষণের 'লক্ষ্য' বলে। তদ্ভিন্ন সমস্তই ঐ লক্ষণের 'অলক্ষ্য'। লক্ষ্যে লক্ষণ না থাকিলে তাহাকে ঐ লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ বলে। আবার লক্ষণ তাহার অলক্ষ্যে থাকিলে, তাহাকে ঐ লক্ষণের 'অতিব্যাপ্তি' দোষ বলে। দোষযুক্ত লক্ষণ অলক্ষণ। ঘটের লক্ষণ বলিতে হইলে, ঘট মাত্রই সেই লক্ষণের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এখন যদি বলা যায় যে, যাহার শুক্লরূপ আছে তাহাই ঘট, তাহা হইলে নীলঘটে ঐ লক্ষণ থাকিল না, অথচ শুক্লবস্ত্রে ঐ লক্ষণ থাকিল; সুতরাং ঐ ঘটলক্ষণের নীলঘটে অব্যাপ্তি ও শুক্লবস্ত্রে অতিব্যাপ্তি-দোষ হইয়া পড়িল; সুতরাং ঘটের ঐরূপ লক্ষণ বলা চলিলনা। এখানে মহর্ষি প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিতেছেন। ঈশ্বর-প্রত্যক্ষও প্রত্যক্ষ, সুতরাং উহাও এই লক্ষণের লক্ষ্য। কিন্তু, ঈশ্বর-প্রত্যক্ষ নিত্য, উহা কোন প্রমাণজন্য নহে। ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন নহে। শ্রুতি গাহিয়াছেন "পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।" সুতরাং মহর্ষির "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং" এই প্রত্যক্ষ-লক্ষণ ঈশ্বর-প্রত্যক্ষে না থাকায় ঐ প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ অপরিহার্য্য। আবার জ্ঞান-মাত্রেই

ঐ লক্ষণের অতিব্যাপ্তিও হইতেছে, কারণ অনুমানাদি জ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে। সেগুলি এই প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অলক্ষ্য। অথচ সকল জ্ঞানই ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন। কারণ, মনঃ ইন্দ্রিয়, আত্মা ঐ মনের বিষয়, মনোরূপ ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার সংযোগ-সম্বন্ধই 'আত্মমনঃ সংযোগ' নামে অভিহিত ; ঐ আত্মমনঃ সংযোগ জ্ঞানমাত্রেরই কারণ, ইহা মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত। সুতরাং আত্মমনঃসংযোগ-রূপ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন জ্ঞান মাত্রেই এই প্রত্যক্ষ লক্ষণ চলিয়া গেল। কাজেই অলক্ষ্যে লক্ষণ যাওয়ায় অতিব্যাপ্তিদোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়িল।

এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, মহর্ষি এই সূত্রটির দ্বারা নিত্য অনিত্য সমস্ত প্রত্যক্ষেরই লক্ষণ বলেন নাই। কারণ, তাহা এখানে মহর্ষির বক্তব্য নহে। প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণ বুঝিতে প্রত্যক্ষ-বিশেষ বুঝিতে হয়, তাহাই এখানে তাঁহার বক্তব্য। ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ নিত্য, তাহা প্রমাণজন্য নহে, সুতরাং সে প্রত্যক্ষে লক্ষণ-সমন্বয় নিষ্প্রয়োজন। মহর্ষির "ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং" এই প্রথম কথাটী পড়িলেই বুঝা যায়, তিনি জন্য-প্রত্যক্ষেরই লক্ষণ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রস্তাবানুসারে তাহাই তাঁহার প্রয়োজন। সুতরাং ঈশ্বর প্রত্যক্ষে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয় নাই। ঈশ্বর প্রত্যক্ষ এই লক্ষণের লক্ষ্যই নহে। লক্ষ্যে লক্ষণ না থাকিলেই লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইয়া থাকে। অলক্ষ্যে লক্ষণ না যাওয়ায় কোনও দোষই হয় না। বৃত্তিকার এই অব্যাপ্তি-দোষবারণের জন্য কষ্টাশ্রয়ে সূত্রের অর্থান্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু সূত্রের সরল অর্থ ও সরল তাৎপর্য্য উপেক্ষা করিয়া অর্থান্তর ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না। এখন জ্ঞানমাত্রে প্রত্যক্ষ লক্ষণের অতিব্যাপ্তির কথা। সকল জ্ঞানই আত্মমনঃ-সংযোগ জন্য, সুতরাং ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু মহর্ষির "ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং" এই কথায় বুঝিতে হইবে যে, যে জ্ঞানের প্রতি বহিরিন্দ্রিয় করণ এবং বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ে সংযোগাদি সম্বন্ধ যে জ্ঞানোৎপাদনে ঐ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার, তাহাই প্রত্যক্ষ। যাহার দ্বারা কার্য্য হয়, তাহাকে করণ বলে। ঐ করণ, একটী ব্যাপার উৎপন্ন করিয়াই কার্য্য জন্মাইয়া থাকে। যেমন কুঠারের দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন করিতে হইলে ঐ কুঠারের সহিত কাষ্ঠের বিলক্ষণ সংযোগ আবশ্যক হয় ; কুঠার, ঐ বিলক্ষণ-সংযোগ উৎপন্ন করিয়াই কাষ্ঠ-ছেদনের কারণ হয়। সুতরাং কাষ্ঠ ছেদনকার্য্যে ঐ কুঠার করণ, কাষ্ঠের সহিত বিলক্ষণ সংযোগ—কাষ্ঠছেদনে ঐ কুঠারের ব্যাপার, তদ্রূপ জন্য প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় করণ, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সহিত সংযোগাদি সম্বন্ধ ঐ প্রত্যক্ষে ব্যাপার এবং ঐ ব্যাপার দ্বারা ইন্দ্রিয়—ঐ প্রত্যক্ষের কারণ বলিয়া ইন্দ্রিয় "করণ"। অনুমানাদিজ্ঞানে ইন্দ্রিয় করণ নহে, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়সম্বন্ধও ব্যাপার নহে। সুতরাং "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং" এই মহর্ষিবাক্যের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হয়, জ্ঞানমাত্রে তাঁহার প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানমাত্রে আত্মমনঃসংযোগের কারণত্ব থাকিলেও ইন্দ্রিয়ত্বরূপে অথবা ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষত্বরূপে কারণত্ব নাই।

ধূমদর্শনে বহ্নির অনুমানস্থলে ধূমে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ থাকিলেও অনুমানের বিষয় বহ্নির সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ নাই। কদাচিৎ থাকিলেও অনুমানে বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধের কারণত্ব নাই। কারণ, উহা না থাকিলেও অনুমান হইয়া থাকে। জ্ঞানমাত্রে মনঃ কারণ। কোন কোন প্রাচীন সম্প্রদায় অনুমানাদি জ্ঞানে মনকেই করণ বলিয়াগিয়াছেন। কিন্তু, জ্ঞানমাত্রে মনঃ কারণ হইলেও অথবা মতান্তরে অনুমানাদি-জ্ঞানে মনঃ করণ হইলেও সেখানে ইন্দ্রিয়ত্ব-রূপে কারণ নহে, মনস্ত্বরূপে কারণ। যে ইন্দ্রিয় থাকিলে যে কার্য্য হয় সেই কার্য্যে ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ত্বরূপে কারণ। যেখানে অন্য ইন্দ্রিয়ের কোন কার্য্য নাই, কিন্তু মনের কার্য্য আছেই, (কারণ মনঃ না হইলে কোন জ্ঞানই হয় না।) সেখানে মনঃ মনস্ত্বরূপে কারণ। মনের অসাধারণ ধর্ম্ম মনস্ত্ব। প্রত্যক্ষে কেবল মনঃ কারণ নহে, যেহেতু, প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ প্রভৃতি ষড়্‌বিধ। মানস-প্রত্যক্ষও একটা আছে। কিন্তু সামান্যতঃ জন্যপ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ত্বরূপে ইন্দ্রিয় কারণ, এইরূপ কল্পনাই করিতে হইবে। মহর্ষি এই সিদ্ধান্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং" এইরূপ প্রত্যক্ষ-লক্ষণ করিয়াছেন এবং তাহার প্রকৃত-তাৎপর্য্য জ্ঞাপনের জন্য "জ্ঞানং" এই বিশেষ্য-পদের উল্লেখ করিয়াছেন। জ্ঞানমাত্রই আত্মমনঃসংযোগজন্য। "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎ-পন্নং" ইহার দ্বারা কেবল "আত্মমনঃসংযোগ-জন্য" এইরূপ তাৎপর্য্য মহর্ষির অভিমত হইতে পারেনা। কারণ তিনি ঐ বাক্যের দ্বারা একটী জ্ঞানকে বিশেষ করিয়া লইতেছেন।

"ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং" এইটী 'জ্ঞানং' এই পদ-প্রতিপাদ্য জ্ঞানের বিশেষণ-বোধক। যাহাতে উহার প্রতিপাদ্য অর্থ বিশেষণ হয়, সেইরূপ ব্যাখ্যাই করিতে হইবে। সে ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। ন্যায়-বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরাচার্য্য বলেন, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইলে যেমন জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ সময়বিশেষে সুখ দুঃখও উৎপন্ন হয়; এখন "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন" এইটুকু মাত্র বলিলে ঐ সুখদুঃখ প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় অর্থাৎ সুখ দুঃখ ও মহর্ষির মতে প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে, তাই মহর্ষি "জ্ঞান" পদের উল্লেখ করিয়াছেন। সুখ দুঃখ, জ্ঞানপদার্থ নহে, তাই ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন হইলেও প্রত্যক্ষ হইতে পারিল না। বার্ত্তিককারের কথাটী খুব ভাল, কিন্তু সুখ ও দুঃখের প্রতি ইন্দ্রিয়ত্বরূপে ইন্দ্রিয় কারণ কিনা, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ঐ সুখ-দুঃখের উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার কিনা, তাহা সুধীগণের বিচার্য্য। যে জ্ঞানে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগাদি সম্বন্ধ দ্বারা ইন্দ্রিয়ত্বরূপে ইন্দ্রিয় কারণ, তাহাই প্রত্যক্ষ, ইহাই মহর্ষিবচনের তাৎপর্য্য,—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

অবশ্য মহর্ষি "ইন্দ্রিয়জন্যং জ্ঞানং" এইরূপ বলিয়া, যে জ্ঞানে ইন্দ্রিয়ত্বরূপে ইন্দ্রিয় কারণ তাহাই প্রত্যক্ষ, এই অভি-মত প্রকাশ করিতে পারিতেন, জ্ঞানমাত্রে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা তাহাতে থাকিতনা। কারণ, জ্ঞানমাত্রে ইন্দ্রিয়ত্বরূপে ইন্দ্রিয় কারণ নহে। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনঃ, জ্ঞান-মাত্রে কারণ হইলেও মনস্ত্বরূপে কারণ।

জ্ঞানমাত্রে ইন্দ্রিয়ত্বরূপে ইন্দ্রিয় কারণ বলিলে, মনঃসংযোগ ব্যতীতও জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারিত। কারণ, অন্ত ইন্দ্রিয় তখন আছেই। বস্তুতঃ মনঃসংযোগ ব্যতীত কোন জ্ঞানই উৎপন্ন হয় না। অনুমানাদির বিষয়ে বহিরিন্দ্রিয়ের কোন ব্যাপার আবশ্যক হয় না, সুতরাং জ্ঞানমাত্রে ইন্দ্রিয়ত্বরূপে ইন্দ্রিয় কারণ নহে। সুতরাং "ইন্দ্রিয়জন্যং জ্ঞানং" এইরূপ বলিলেও প্রত্যক্ষ-লক্ষণের কোন দোষ হইতনা। কিন্তু দেখিতে হইবে যে, মহর্ষি প্রত্যক্ষের কারণের দ্বারাই প্রত্যক্ষ-লক্ষণ বলিতেছেন। প্রত্যক্ষের কারণ অনেক থাকিলেও যেটী অসাধারণ কারণ, তাহার দ্বারাই মহর্ষি লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন, একথা মহর্ষির সূত্রে পরেও পাওয়া যাইবে। প্রত্যক্ষে কেবল ইন্দ্রিয়ই কারণ নহে। ঐ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ না হইলে, ইন্দ্রিয় থাকিলেও প্রত্যক্ষ হয় না। ইন্দ্রিয়, প্রত্যক্ষরূপ যথার্থ অনুভবের করণ বলিয়া প্রত্যক্ষ-প্রমাণ। করণ হইলে তাহার ব্যাপার চাই। যাহা করণ-কারক হইতে উৎপন্ন হইয়া ঐ করণ-কারকের কার্য্য সম্পাদন করে, তাহাকেই করণকারকের ব্যাপার বলে। যেমন কুঠারের সহিত কাষ্ঠের বিলক্ষণ-সংযোগ। ঐ সংযোগ কুঠাররূপ করণ-কারক হইতে উৎপন্ন হইয়া, কুঠারের কার্য্য (কাষ্ঠছেদন) সম্পাদন করিয়া থাকে। তাই ঐ বিলক্ষণ-সংযোগরূপ ব্যাপার দ্বারা কুঠার, কাষ্ঠচ্ছেদন কার্য্যে কারণ হওয়ায় কাষ্ঠছেদনে 'করণ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। "কুঠারেণ কাষ্ঠং ছিনত্তি" এইরূপ প্রয়োগে কুঠারের করণত্ব শব্দশাস্ত্রসিদ্ধ। এইরূপ 'চক্ষুষা পশ্যতি, 'শ্রোত্রেণ শৃণোতি' ইত্যাদি শিষ্টপ্রয়োগে প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের করণত্ব সর্ব্বসিদ্ধ। ইন্দ্রিয়ই এজন্য প্রত্যক্ষে করণ। সুতরাং কাষ্ঠচ্ছেদনে কুঠারের ন্যায় জন্যপ্রত্যক্ষেও ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার চাই। ব্যাপার না থাকিলে করণই হয় না, তাই সেস্থানে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগাদি সম্বন্ধই ব্যাপার রূপে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ ব্যাপারই প্রত্যক্ষে সাক্ষাৎকারণ অর্থাৎ চরমকারণ। ঐ বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধের পরেই প্রত্যক্ষ হয়,—ইহা মহর্ষির সিদ্ধান্ত। মহর্ষি ঐ চরমকারণ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের দ্বারাই প্রত্যক্ষ-লক্ষণ বলিয়াছেন। কারণ, উহাই প্রত্যক্ষে প্রধান কারণ। প্রধান কারণের দ্বারাই প্রত্যক্ষলক্ষণ বলা উচিত, একথা মহর্ষিসূত্রে পরেও বিবৃত আছে। আবার "ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ" পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়া, মহর্ষি, জন্যপ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ই করণ, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ, জন্যপ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইবে। ঐ ব্যাপার দ্বারা ইন্দ্রিয়, জন্যপ্রত্যক্ষে কারণ হওয়ায় ইন্দ্রিয়ের করণত্ব-বিষয়ে কোন শঙ্কা থাকিবে না। সুতরাং ইন্দ্রিয়ই মহর্ষির মতে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ,—ইহা মহর্ষিবচনের দ্বারাই সূচিত হইতেছে। যাঁহারা চরমকারণকেই করণ বলেন, অর্থাৎ যাঁহাদের মতে কাষ্ঠছেদন-কার্য্যে কুঠার ও কাষ্ঠের বিলক্ষণ-সংযোগই করণ-পদার্থ, কুঠার প্রভৃতিতে করণ-শব্দ-প্রয়োগ গৌণ; তাঁহারা এখানেও ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষে

করণ বলেন, সুতরাং তাঁহাদের মতে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগাদি সম্বন্ধই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ। ইন্দ্রিয় প্রমাণ নহে। কারণ, করণই প্রমাণ হইবে। চরম-কারণ অর্থাৎ বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধই প্রত্যক্ষে করণ হইলে তাহাই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ। মহর্ষি এই জন্যই "ইন্দ্রিয়-জন্যং" না বলিয়া "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং" এইরূপ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ নবীনগণ প্রাচীন মতে বীতশ্রদ্ধ। যে পদার্থ একটী ব্যাপার দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করে, তাহাই 'করণ' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। "কুঠারেণ কাষ্ঠং ছিনত্তি" ইত্যাদি শিষ্ট-প্রয়োগে যেমন কুঠার প্রভৃতিই করণরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তদ্রূপ "চক্ষুষা পশ্যতি" "ঘ্রাণেন জিঘ্রতি" ইত্যাদি শিষ্ট-প্রয়োগেও প্রত্যক্ষে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ই করণরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আমাদের মহর্ষি লোকসিদ্ধ মার্গ ত্যাগ করেন নাই। তিনি লোকসিদ্ধ সংস্কার উড়াইয়া দিয়া কাহাকেও বুঝাইতে ব্রতী নহেন। সুতরাং মহর্ষিসূত্রের তাৎপর্য্য-বর্ণনায় আমরাও লোকসিদ্ধ পথ ত্যাগ করিতে সাহসী নহি।

এখন সূত্রের অন্য ভাগের কথা। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগাদি সম্বন্ধই ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ। ঐ ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন জ্ঞানকে লোকে বিষয়বোধক নামের দ্বারা ব্যপদেশ করিয়া থাকে। অর্থাৎ রূপদর্শনকালে "আমি রূপ দেখিতেছি" ঘট-দর্শনকালে "আমি ঘট দেখিতেছি," ইত্যাদি রূপে উল্লেখ করিয়া থাকে। সুতরাং তখন তাহার ঐ প্রত্যক্ষ-বিষয়-বোধক 'রূপ' 'ঘট' প্রভৃতি শব্দের অর্থস্মরণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ রূপ-দর্শনাদিকে শাব্দবোধ বলিনা কেন? শব্দ ও অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ-জ্ঞানবশতঃ শব্দার্থস্মরণসম্ভূত জ্ঞান শাব্দবোধ হইলে ঐ প্রত্যক্ষও শাব্দবোধ হইয়া পড়িতেছে। উহাকে শাব্দবোধ বলিয়া স্বীকার করিলেও ঐ শাব্দবোধে প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ অপরিহার্য্য। কারণ, শাব্দবোধ প্রত্যক্ষ-লক্ষণের লক্ষ্য নহে। মহর্ষি এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য সূত্রে বলিয়াছেন "অব্যপদেশ্যং।" "ব্যপদেশ" শব্দের অর্থ শব্দ। "ব্যপদেশ্য" অর্থাৎ শব্দমূলক। "অব্যপদেশ্য" অর্থাৎ যাহা শব্দমূলক নহে। শাব্দবোধ মাত্রই শব্দমূলক। শব্দজ্ঞান শাব্দবোধের করণ প্রত্যক্ষ শব্দমূলক নহে। প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে শব্দজ্ঞান থাকার নিয়ম নাই। প্রত্যক্ষকালে অনেক সময়ে শব্দার্থ-স্মরণ হইলেও তাহা প্রত্যক্ষের পরক্ষণেই একটা শাব্দবোধ জন্মাইবে। তাহাতে প্রত্যক্ষ, কখনই শাব্দবোধ হইয়া পড়িতে পারেনা। ফলতঃ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন-জ্ঞানের যেটী অশাব্দ অর্থাৎ শব্দমূলক নহে, তাহাই প্রত্যক্ষ,—মহর্ষির ইহাই বক্তব্য। প্রত্যক্ষকে বিষয়বোধক নামের দ্বারা ব্যপদেশ করিলেই তাহা শাব্দবোধ হইতে পারেনা। শাব্দবোধ ও প্রত্যক্ষের কারণ স্বতন্ত্র। প্রত্যক্ষকালে শাব্দবোধের সমস্ত কারণ সর্ব্বদা উপস্থিত হইতেও পারেনা। কখনও উপস্থিত হইলে, সেখানে শাব্দবোধ না হইয়া প্রত্যক্ষই পূর্ব্বে হইবে। কারণ, সমান বিষয়ে প্রত্যক্ষের সামগ্রীই বলবতী।

আবার যখন আমি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা রজ্জুকে সর্প বলিয়া বুঝিয়া থাকি, তখন আমার ঐ জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইলেও ভ্রম। উহার করণ প্রত্যক্ষ-প্রমাণ নহে। প্রত্যক্ষ-প্রমাণের ফল যে বিশেষ প্রত্যক্ষ, তাহাই মহর্ষির বক্তব্য। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন, "অব্যভিচারি" অর্থাৎ যথার্থ। যে প্রত্যক্ষ আংশিক ভ্রম, তাহার করণ ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিলে ঐ 'যথার্থ' বলিতে 'যে কোনও ভাগে যথার্থ' এইরূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যাহা সর্ব্বাংশে ভ্রম, তাহা ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন ও অশাব্দ হইলেও, প্রত্যক্ষ-প্রমাণের মধ্যগত প্রত্যক্ষ-মধ্যে গণ্য নহে।

আবার আমি দূর হইতে কোন বস্তু দেখিয়া কিছু অবধারণ করিতে পারিলাম না, আমার একটা সংশয় হইল; উহাকে অব্যভিচারি জ্ঞানও বলিতে পারি। কারণ আমার কোন বিপরীতজ্ঞান ত হয় নাই! আমি অবধারণ করিতে পারি নাই মাত্র। এস্থলে ঐ সংশয়জ্ঞানের করণ, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ নহে। প্রমাণ কোনদিন সংশয় জন্মাইবে না। তাহার দ্বারা চিরদিন নিশ্চয়ই হইবে। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন "ব্যবসায়াত্মকং।" অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক। "ব্যবসায়" শব্দের নিশ্চয় অর্থ সুপ্রসিদ্ধ। যথা—"ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিঃ" (গীতা।) এখন বুঝা গেল, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন অশাব্দ যথার্থ নিশ্চয়াত্মক যে জ্ঞান, তাহাই প্রত্যক্ষ-প্রমাণের মধ্যগত প্রত্যক্ষ—অর্থাৎ তাহার করণই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ। মহর্ষির মতে বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষপ্রমাণ, কিন্তু প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণ বলিতে ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ বলিলে চলেনা, কারণ ইন্দ্রিয় হইলেই প্রমাণ হয় না। যে ইন্দ্রিয় বিষয়সম্বদ্ধ হইয়া যথার্থ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মাইবে, তাহাই প্রত্যক্ষপ্রমাণ। তাই মহর্ষি প্রত্যক্ষ-প্রমাণের ফলের উল্লেখ করিয়াই প্রত্যক্ষ-প্রমাণের লক্ষণ বলিয়াছেন।

তাৎপর্য্যটীকাকার সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র—শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্র, বৃত্তিকার বিশ্বনাথ, এবং "দিনকরী"কার মহাদেব ভট্ট বলেন—"অব্যপদেশ্যং" এবং "ব্যবসায়াত্মকং" এই দুইটী কথা—প্রত্যক্ষের লক্ষণের কোন কথা নহে। কারণ "অব্যভিচারি" শব্দের দ্বারাই সংশয় বারিত হইবে। শাব্দবোধ, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নই নহে। সুতরাং তাহার বারণের জন্য "অব্যপদেশ্যং" কথাটীও নিষ্প্রয়োজন। তবে ঐ দুইটী কথা প্রত্যক্ষের বিভাগবোধক। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ; অব্যপদেশ্য ও ব্যবসায়াত্মক—অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক। যে প্রত্যক্ষে কোন বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব থাকেনা, তাহাই নির্ব্বিকল্পক। (নির্গতঃ বিকল্পঃ বিশেষ্যবিশেষণভাবোযস্মাৎ) প্রথমতঃ ঘটে চক্ষুঃসংযোগের পরেই ঘট ও ঘটের অসাধারণ ধর্ম্ম ঘটত্বের একটা প্রত্যক্ষ হয়। ঐ জ্ঞানে—"ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট" এভাবে কোন বোধ হয় না। অথচ প্রথমতঃ ঐরূপ একটা স্বতন্ত্র জ্ঞান না হইলে "ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট" এই ভাবে একটা বিশিষ্টবুদ্ধি হইতে পারেনা। কারণ, বিশেষণজ্ঞান না থাকিলে বিশিষ্ট-জ্ঞান হইতেই পারেনা। পাণ্ডিত্য কাহাকে

বলে তাহা না জানিলে, এই ব্যক্তি "পাণ্ডিত্যবিশিষ্ট" এইরূপ বিশিষ্টজ্ঞান হইবে কি রূপে? অর্থ কাহ'কে বলে তাহা না জানিলে, এইব্যক্তি অর্থশালী, ইহা বুঝা যায় না। সেইরূপ ঘটের অসাধারণধর্ম্ম যে ঘটত্ব, যাহা ঘটত্ববিশিষ্টঘট—এইরূপ জ্ঞানে বিশেষণ, তাহা না জানিলে, ঐ বিশিষ্টজ্ঞান কখনই হইতে পারেনা। সুতরাং "ঘটত্ব-বিশিষ্টঘট" এইরূপ বিশিষ্টজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, পূর্ব্বে ঘটত্বের একটা সামান্যতঃ জ্ঞান চাই। যাহা কারণ, তাহা পূর্ব্বেই চাই। এইভাবে বিশিষ্টজ্ঞানের পূর্ব্বে যে অবিশিষ্ট জ্ঞান হয়, তাহাই নির্ব্বিকল্পক নামে অভিহিত। তাহার পরবর্ত্তী বিশিষ্ট-জ্ঞানই সবিকল্পক নামে অভিহিত। প্রত্যক্ষ এই দুইভাগে বিভক্ত, তাই মহর্ষি ঐ দুই শব্দ দ্বারা জানাইয়া গিয়াছেন।

ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারের এ ভাবের চিন্তার কোনও সাক্ষ্য নাই। তাঁহারা সূত্রের সবগুলি কথাই লক্ষণের মধ্যে গণ্য করিয়াগিয়াছেন। "অব্যপদেশ্যং" এইটী স্বরূপ-বিশেষণ হইলেও উহা লক্ষণেরই মধ্যগত। বার্ত্তিককার স্পষ্ট লিখিয়াছেন—"যস্মাদেকশোঽনুমানসুখশাব্দবিপর্য্যয়সংশয়জ্ঞানানি নিবর্ত্তান্ত ইতি।" অর্থাৎ উহার সবগুলি কথাই ঐ প্রত্যক্ষ-লক্ষণের ঘটক।

এখন এই মত-ভেদের মধ্যে চিন্তা করিবার বিষয় এই যে, মহর্ষি অক্ষপাদের সূত্র-রচনার প্রণালী দেখিলে, এই সূত্রের সবগুলি কথাই লক্ষণ-ঘটক বলিয়া বুঝিতে ইচ্ছা হয়। সূত্রের "অব্যভিচারি" এই পদটী প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-ঘটক ইহা সর্ব্ব-সম্মত। কিন্তু ঐ পদটীর পূর্ব্বেই রহিয়াছে "অব্যপদেশ্যং।" উহার পরে রহিয়াছে "ব্যবসায়াত্মকং"। এখন ঐ দুইটী কথা লক্ষিত প্রত্যক্ষের বিভাগ বোধক হইলে লক্ষণ-কথনের পরেই উহা প্রযুক্ত হইত। মহর্ষি উল্টা-পাল্টা করিয়া পদবিন্যাস করিবেন কেন?

পরন্তু মহর্ষি, ইহার পরবর্ত্তী অনুমানের সূত্রে স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন "ত্রিবিধং", এবং শব্দ প্রমাণ যে দ্বিবিধ, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য স্বতন্ত্র একটী সূত্রই করিয়াছেন। উপমানের প্রকার-ভেদ কিছু বলেন নাই। প্রত্যক্ষের প্রকারভেদ তাঁহার বিবক্ষিত হইলে, ঐরূপ স্পষ্ট কথাতেই তিনি তাহা প্রকাশ করিতেন। অনুমানাদিস্থলে প্রকারভেদ স্পষ্ট ভাষাতে উল্লেখ করিয়াছেন, ইহার দ্বারা প্রত্যক্ষে কোন প্রকারভেদ তাঁহার বিবক্ষিত নহে, ইহা বুঝিতে পারিনা কি? ফলতঃ প্রত্যক্ষ, নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক ভেদে দ্বিবিধ; ইহা মহর্ষির সিদ্ধান্ত। তিনি বৌদ্ধদিগের ন্যায় কেবল নির্ব্বিকল্পকের প্রত্যক্ষত্ববাদী নহেন। তবে তাঁহার সূত্রে তাহা প্রকাশিত কিনা, তাহা সুধীগণ বিচার করুন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

যোগ-দর্শন-ভাষ্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥ ২৯

পূর্ব্বোক্ত ওঁকারের ক্রিয়া (অর্থাৎ তজ্জপ-তদর্থভাবন রূপ ক্রিয়া, যাহা যোগি-গুরু-বক্ত্রগম্য) হইতে সহস্রদলস্থিত পরমাত্মা (বা আত্মা যাহাই বল) সাধকের জ্ঞানের গোচরীভূত হন। আর উহা হইবার পূর্ব্বে যে সমস্ত (তৎপ্রাপ্তির) অন্তরায় আছে, তাহাও দূরীভূত হয়।

পর সূত্রে মোটামুটি ভাবে যোগ-বিঘ্নের বিষয় বর্ণিত হইতেছে—

ব্যাধি স্ত্যান-সংশয়-প্রমাদালস্যাবিরতি-ভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ ॥ ৩০

নিম্নলিখিত গুলি যোগবিঘ্ন যথা—

১। ব্যাধি—দেহের ধাতুবৈষম্যাদি কারণে উৎপন্ন রোগ।

২। স্ত্যান—চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা অর্থাৎ গুরুর নিকট হইতে আসনপ্রাণায়ামাদি শিক্ষা করিয়াও তাহার অভ্যাসে অকর্ম্মণ্যতা।

৩। সংশয়—যোগ সাধন করা উচিত বা অনুচিত এরূপ সংশয়। (আ'জকা'লকার দিনে যোগ হইতে পারেনা—এইরূপ বিপর্য্যয় নিশ্চয়)

৪। প্রমাদ—সাধনে উদ্যম-রাহিত্য।

৫। আলস্য—তমোগুণের আধিক্যবশতঃ চিত্তের গুরুত্ব এবং কফাদির আধিক্যবশতঃ শরীর ভারবোধ হওয়ায় যে প্রযত্নের অভাব (যদ্দ্বারা যোগে অপ্রবৃত্তি জন্মে) তাহাই আলস্য।

৬। অবিরতি—বিষয় বিশেষে চিত্তের একান্ত অভিলাষ; আরও ইহা হউক, উহা হউক, ইত্যাকার আকাঙ্ক্ষা।

৭। ভ্রান্তিদর্শন—যাহা যোগের উপকরণ, তাহাকে অনুপকরণ মনে করা এবং যাহা অনুপকরণ তাহাকে উপকরণ মনে করা। আরও যোগ-সাধন না করিয়াও যোগ-সাধনত্ব বুদ্ধি এবং সাধন করিয়াও অসাধনত্ব-বুদ্ধি।

৮। অলব্ধভূমিকত্ব—সাধন-সময়ে কোনরূপ সিদ্ধি না দেখিয়া বোধ হয় যে, বৃথা পণ্ডশ্রম হইতেছে; আরও ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত ও মূঢ় ভূমিকাতে যাওয়া।

৯। অনবস্থিতত্ব—কোন এক যোগাবস্থা পাইয়াও তাহাতে সন্তুষ্ট বা স্থির না থাকা।

দুঃখদৌর্ম্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্ব-শ্বাস প্রশ্বাসাবিক্ষেপসহভুবঃ ॥ ৩১

আরও যোগবিঘ্নের কথা বলা যাইতেছে;—

দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য (ইচ্ছার ব্যাঘাত জনিত মনঃক্ষোভ) অঙ্গকম্পন (শারীরিক অস্থিরতা) শ্বাস, প্রশ্বাস (অর্থাৎ ইহাদের অনিয়মিত বহন) এইগুলি বিক্ষেপের সহচর অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এ সমস্তগুলিই বর্ত্তমান থাকে।

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২

পূর্ব্বোক্ত বিঘ্ন সকল দূর করিয়া 'সমাধি' অবস্থায় যাইতে হইলে "একতত্ত্বাভ্যাস" সাধন আবশ্যক। একতত্ত্বাভ্যাসের নিগূঢ়তত্ত্ব যোগিগুরু-বক্ত্রগম্য।

মোটামুটি ভাবে এই বলা যাইতে পারে যে, গুরু, শিষ্যের আধ্যাত্মিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া যে ক্রিয়ার উপদেশ দিবেন, তাহাতেই থাকা (অন্য কিছুতে না থাকা) ইহারই নাম একতত্ত্বাভ্যাস। নিগূঢ়তত্ত্ব গুরূপদেশলভ্য।

সাধক গুরূপদেশ অনুসারে একতত্ত্বাভ্যাসে থাকিবেন; ইহাতে ক্রমে ক্রমে তিনি সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। তবে সেই সাধকের যদি লৌকিক ব্যবহারে (যে কোন কারণেই হউক) আসিতে হয়, তাহা হইলে তিনি কিরূপ ভাবে চলিবেন, পরসূত্রে তাহাই বলা যাইতেছে—

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্॥ ৩৩

সুখ, দুঃখ পুণ্য ও পাপ বিষয়ে যথা ক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা করিবে। ইহা দ্বারা চিত্ত প্রসন্ন বা নির্ম্মল হইবে অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করিবে। মৈত্রী-করুণাদির ভাবনা কিরূপে করিতে হইবে, তাহা কথিত হইতেছে।

পরের সুখে (আন্তরিক ভাবে) সুখী হইবে, পরের দুঃখে দুঃখী হইবে (অর্থাৎ যেমন সর্ব্বদা আত্মদুঃখ-নিবারণের ইচ্ছা কর পরের দুঃখ দেখিলেও তন্নিবারণে সেইরূপ আন্তরিক ইচ্ছা করিবে।) আপনার পুণ্যে যেমন হৃষ্ট হও, পরের পুণ্যে (ও শুভানুষ্ঠানে) সেইরূপ হৃষ্ট হইও। পরের পাপে উপেক্ষা করিবে অর্থাৎ পরের পাপে বিদ্বেষ, ঘৃণা, ভালমন্দ-বিচার, এমন কি, ও সম্বন্ধে কিছুই আন্দোলন করিবেনা; সর্ব্বদা উদাসীন থাকিবে।

লৌকিক ব্যবহারে আসিতে হইলে, সাধক পূর্ব্বমত চলিবেন। পূর্ব্বসূত্রে যে একতত্ত্বাভ্যাসের কথা বলা হইয়াছে, তাহার কথা পর সূত্রে বলিতেছেন,—

প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং প্রাণস্য॥ ৩৪

প্রাণের (অর্থাৎ প্রাণবায়ুর) প্রচ্ছর্দ্দন ও বিধারণ এই দুই প্রক্রিয়া দ্বারা (যোগবিঘ্ন দূরীভূত হইয়া) চিত্ত, ধ্যান অবস্থার উপযোগী হয়। [অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা] [প্রচ্ছর্দ্দন রেচক, বিধারণ কুম্ভক।]

পূর্ব্বোক্ত একতত্ত্বাভ্যাসসম্বন্ধে এই বলা হইয়াছে যে, গুরু, সাধকের আধ্যাত্মিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া যে ক্রিয়া দিবেন, তাহাতে লাগিয়া থাকা দরকার। এখন সাধারণ ভাবে প্রথম হইতে কোন্ কোন্ ক্রিয়ায় থাকিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন। (ইহাও এখানে বলা আবশ্যক যে, একেবারে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সাধনের কথা বলেন নাই; প্রধান প্রধান কয়েকটার কথা বলিয়াছেন। ইহার সবিশেষ তত্ত্ব গুরুবক্তৃগম্য।)

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনী॥ ৩৫

পূর্ব্বোক্ত প্রাণায়াম সাধন করিতে করিতে, তৎফলস্বরূপ বিষয়বতী প্রবৃত্তি জন্মিবে। তখন তাহাতে থাকিলে (যোগবিঘ্ন দূর হইয়া) চিত্ত, ধ্যান অবস্থার উপযোগী হইবে। বিষয়বতী প্রবৃত্তি কি? তাহা গুরুবক্তৃগম্য। তবে মোটামুটি উহার সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে, দিব্য অনুভবাত্মক প্রজ্ঞা (ইহা দ্বারা চিত্ত সূক্ষ্মবস্তু গ্রহণে সক্ষম হইবে, কাজেই উহা ধ্যানের অনেক উপযোগী হইবে।

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী॥ ৩৬

প্রাণায়াম সাধনে প্রথমে (উহার ফলস্বরূপ।) বিষয়বতী প্রবৃত্তির উদয় হয়, যখন ঐ প্রবৃত্তির উদয় হইবে, তখন তাহাতেই থাকা। পরে আরও সাধনে (উহার ফলস্বরূপ) বিশোকা-রূপ জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইবে, তখন তাহাতে থাকা।

জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি কি? তাহা গুরু-বক্ত্রগম্য, তবে সংক্ষেপতঃ বলা যাইতেছে;—

প্রাণায়াম সাধন করিতে করিতে (বিষয়বতী প্রজ্ঞার পরে) এক প্রকার জ্যোতিঃ বা আলোক অনুভূত হয়। তাহার তুলনা নাই। তাহা নিস্তরঙ্গ ক্ষীরোদসমুদ্রের ন্যায় প্রশান্ত ও মনোরম। এ আলোক অনুভূত হইলে আর কোন প্রকার শোক থাকে না।

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্॥ ৩৭

উক্ত প্রকার সাধন করিতে করিতে (জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির অনুভূতির পর) সাধকের বিষয়ানুরাগ দূরীভূত হয়। তখন সাধকের চিত্ত সম্যক্ ধ্যানের উপযোগী হয়।

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা॥ ৩৮

তখন (অর্থাৎ) পূর্ব্বোক্ত প্রকার সাধন শেষ হইলে, যখন চিত্ত সম্যক্ ধ্যানের উপযোগী হয় তখন) সাধকের জ্ঞান অবলম্বন পূর্ব্বক নিদ্রাবস্থা হয়। কিরূপ? সাধারণ লোক যেমন স্বপ্ন দেখে তদ্রূপ। এরূপ সাধকের নিদ্রাকে যোগনিদ্রা কহে। সাধারণের নিদ্রার অবস্থায় কেবল অজ্ঞান মাত্রই অবলম্বন থাকে, সেই জন্য নিদ্রাবস্থায় কোন প্রকার জ্ঞান থাকে না, সে সময় দেখা শুনা কিছুই হয় না। কিন্তু যোগনিদ্রা অবস্থাপন্ন সাধকের যে অবস্থা, তাহাতে অজ্ঞান থাকে না; তখন তিনি জ্ঞানেতেই থাকেন। এ নিদ্রায় কেবল শরীর পড়িয়া থাকে, কিন্তু মন সজাগ থাকে। সমস্ত শব্দ কর্ণে যায়, অথচ নিদ্রাও হয়। আরও দ্রষ্টব্য,—নিয়মমত সাধন দ্বারা উচ্চ অবস্থায় পৌছিলে আর নিদ্রার আবশ্যকই হয় না। এ অবস্থায় যাঁহারা পৌছিতে না পারিয়াছেন, তাঁহাদের কিছু কিছু নিদ্রা আবশ্যক হয়। কিন্তু তাহা যোগনিদ্রা।

যথাভিমত-ধ্যানাদ্বা॥ ৩৯

প্রাণায়ামের সমস্ত ক্রিয়া শেষ হইলে অর্থাৎ প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে, সাধকের যথামত ধ্যানশক্তি জন্মে (কিন্তু প্রাণায়াম-সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে নহে) তাহা হইতে অর্থাৎ ধ্যানশক্তি হইতে চিত্ত সমাধির উপযোগী হয়। যথাভিমতধ্যান কাহাকে কহে, তাহা সংক্ষেপতঃ বলা যাইতেছে—

প্রাণায়ামসিদ্ধ হইলেই ধ্যানশক্তি জন্মে। কিন্তু ধ্যান এক প্রকার নহে, উহার বহুপ্রকার ভেদ আছে। গুরু, শিষ্যের আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুসারে যে ধ্যানের ক্রিয়া দেন, তাহাই যথাভিমত ধ্যান। তখন সাধক তাহাতে থাকিবেন। তাহা হইলেই শীঘ্র সাধকের চিত্ত, সমাধি লাভের উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। (নিগূঢ়তত্ত্ব গুরুপদেশগম্য)

পরমাণুপরমমহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ॥ ৪০

ধ্যানশক্তি জন্মিলেই সাধকের চিত্ত পরমাণু পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয় এবং আকাশাদি পরম মহৎ পর্য্যন্ত স্থূল বিষয় ধারণের যোগ্য হয়। ভাবার্থ এই যে তখন সাধক অতি সূক্ষ্ম হইতে অতি স্থূল সমস্ত বিষয়েতেই ধ্যানশক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন; কাজেকাজেই ঐ সমস্ত তাঁহার বশ্য হয়।

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতাসমাপত্তিঃ॥ ৪১

ধ্যানশক্তি জন্মিলে চিত্তের রজ তম মল দূরীভূত হইয়া, উহার নানা বিষয়ে পরিণতি বন্ধ হয়। এমন অবস্থাপন্ন চিত্ত, গ্রহীতৃ, গ্রহণ এবং গ্রাহ্য বিষয়ে নিশ্চল ভাবে স্থিত

হইয়া তন্ময় ভাব ধারণ করে অর্থাৎ গ্রহীতৃ, গ্রহণ এবং গ্রাহ্য বিষয়ে শক্তি-তত্ত্বে স্থিত হইয়া অপূর্ব্ব জ্ঞানভাব প্রাপ্ত হয়। চিত্তের রজ তম মল দূরীভূত হইলে উহা নির্ম্মল হয়। কিরূপ নির্ম্মল? যেমন স্বচ্ছ নির্ম্মল মণি।

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা ॥ ৪২

চিত্ত পূর্ব্বোক্তরূপ নির্ম্মল হইয়া গ্রহীতৃ, গ্রাহ্য বিষয়ের শক্তি-তত্ত্বে পৌছিয়া স্থিত হইলে ও তাহার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পাইলে, চিত্ত সমাধির যোগ্য হয়। এই সূত্রে সবিতর্ক সমাধির কথা বলা হইল। ইহার কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। [সমাধির বিষয় দেখ।]

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্ব্বিতর্কা ॥ ৪২

এই সূত্রে নির্ব্বিতর্ক সমাধি কথা বলা হইল। ইহার কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। [সমাধির বিষয় দেখ।]

এতয়ৈব সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা ॥ ৪৪

এই সূত্রে সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাধির কথা বলা হইল। ইহার বিষয়ও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। [সমাধির বিষয় দেখ]

সূক্ষ্মবিষয়ত্বঞ্চালিঙ্গপর্য্যবসানম্ ॥ ৪৫

সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাধির বিষয় সূক্ষ্ম এবং তাহার সীমা প্রকৃতি।

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥ ৪৬

উক্ত চতুর্ব্বিধ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে সবীজ সমাধি কহে, কারণ উহারা আলম্বনযুক্ত এবং উহারা বীজের ন্যায়ে অঙ্কুরজনক; সমাধি ভঙ্গের পর পুনশ্চ তাহা হইতে সংসারাঙ্কুর উৎপন্ন হয়।

নির্ব্বিচার-বৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥ ৪৭

পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিধ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির মধ্যে নির্ব্বিচার-সমাধি সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উক্ত সমাধি অভ্যস্ত হইলে, চিত্তের সমস্ত প্রকার ক্লেশ ও মালিন্য দূরীভূত হইয়া, উহা নিতান্ত নির্ম্মল হয়। ইহারই প্রসাদে সাধক তখন আত্মার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করেন। ইহারই নাম অধ্যাত্মবিজ্ঞান।

ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা ॥ ৪৮

নির্ব্বিচার সমাধির দ্বারা চিত্তের স্বচ্ছ-স্থিতি-প্রবাহ দৃঢ় হইলে, এক প্রকার উৎকৃষ্ট ও নির্ম্মল প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞানালোক আবির্ভূত হয়। এই সমাধি-প্রজ্ঞার নাম ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা। ইহা সমস্ত অসত্য প্রমাদ দূরীভূত করিয়া, কেবল ঋত অর্থাৎ সত্য'কে প্রকাশ করে এবং যোগীগণ ইহার দ্বারা সমুদয় বস্তু যথাবৎ সাক্ষাৎকার করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভের উপযুক্ত হন।

শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষত্বাৎ ॥ ৪৯

কি ইন্দ্রিয়জনিত প্রজ্ঞা, কি অনুমানজনিত প্রজ্ঞা, কি শাস্ত্রজ্ঞানজনিত প্রজ্ঞা কিছুই এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার সমান নহে। কেননা, উল্লিখিত প্রজ্ঞা বস্তুর এক দেশ বা সামান্যাকার মাত্র গ্রহণ করে। বিশেষ তত্ত্ব গ্রহণ করে না। সূক্ষ্ম, ব্যবহিত কিম্বা বিপ্রকৃষ্ট (দূরস্থ) বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু যোগজপ্রজ্ঞা কি সূক্ষ্ম, কি বিপ্রকৃষ্ট, কি ব্যবহিত সমস্তই গ্রহণ করে—প্রকাশ করে।

তজ্জঃসংস্কারোঽন্যসংস্কার-প্রতিবন্ধী ॥ ৫০

নির্ব্বিচার-সমাধি অভ্যাস-জনিত সংস্কার

অযোগী অবস্থায় অভ্যস্ত সমুদয় সংস্কারকে বিনাশ করে।

তৎকালে কেবল নির্ব্বিচারসমাধি-প্রজ্ঞাই বিদ্যমান থাকে।

তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ॥ ৫১

যখন নির্ব্বিচারসমাধি-প্রজ্ঞাও নিরুদ্ধ হয়, তখন সর্ব্ববৃত্তি-নিরোধ হয়, ইহারই নাম অসম্প্রজ্ঞাতসমাধি। ইহা নির্বীজ, কেননা, তখন কোন্ অবলম্বন থাকে না এবং ইহার দ্বারা সংসারাঙ্কুর সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। [ক্রমশঃ]

শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী।

বজ্রসূচিকোপনিষৎ।

ওঁ বজ্রসূচীং প্রবক্ষ্যামি শাস্ত্রমজ্ঞানভেদনম্। দূষণং জ্ঞানহীনানাং ভূষণং জ্ঞানচক্ষুষাম্। ১

ব্রহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাইতি চত্বারো বর্ণাস্তেষাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণএব প্রধান ইতি বেদবচনানুরূপং স্মৃতিভিরপ্যুক্তম্। তত্র চোদ্যমস্তি কোবা ব্রাহ্মণোনাম? কিং জীবঃ? কিং জাতিঃ? কিং জ্ঞানম্? কিং কর্ম্ম? কিং ধার্ম্মিক ইতি। ২

তত্র প্রথমো জীবো ব্রাহ্মণইতিচেৎ তন্ন, অতীতানাগতানেকদেহানাং জীবস্যৈকরূপত্বাৎ একস্যাপি কর্ম্মবশাদনেকদেহসম্ভবাৎ সর্ব্বশরীরাণাং জীবস্যৈকরূপত্বাচ্চ। তস্মাৎ ন জীবঃ ব্রাহ্মণইতি। ৩

তর্হি দেহো ব্রাহ্মণঃ ইতিচেৎ তন্ন, আচণ্ডালপর্য্যন্তানাং মনুষ্যানাং পাঞ্চভৌতিকত্বেন দেহস্য একরূপত্বাৎ জরামরণধর্ম্মাধর্ম্মাদি সাম্যদর্শনাৎ। ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণঃ বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণঃ ইতি নিয়মাভাবাৎ। পিত্রাদিশরীরদহনে পুত্রাদীনাং ব্রহ্মহত্যাদিদোষসম্ভবাচ্চ। তস্মাৎ ন দেহো ব্রাহ্মণইতি। ৪

তর্হি জাতির্ব্রাহ্মণইতিচেৎ তন্ন, তত্র জাত্যন্তরজন্তুষু অনেকজাতিসম্ভবাঃ মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি। ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যাঃ, কৌশিকঃ কুশাৎ। জাম্বুকো জম্বুকাৎ, বাল্মীকো বল্মীকাৎ, ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যায়াম্। শশপৃষ্ঠাদ্ গৌতমঃ। বশিষ্ঠ উর্ব্বশ্যাম্। অগস্ত্যঃ কলশে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাং জাত্যা বিনাপি অগ্রে জ্ঞানপ্রতিপাদিতা ঋষয়ো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জাতিঃ ব্রাহ্মণ ইতি। ৫

তর্হি জ্ঞানং ব্রাহ্মণইতিচেৎ তন্ন, ক্ষত্রিয়াদয়োঽপি পরমার্থদর্শিনোঽভিজ্ঞাঃ বহবঃ সন্তি, তস্মাৎ ন জ্ঞানং ব্রাহ্মণইতি। ৬

তর্হি কর্ম্ম ব্রাহ্মণইতিচেৎ তন্ন, সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রারব্ধসঞ্চিতাগামিকর্ম্মসাধর্ম্ম্যদর্শনাৎ কর্ম্মাভিপ্রেরিতাঃ সন্তঃ জনাঃ ক্রিয়াঃ কুর্ব্বন্তীতি তস্মান্ন কর্ম্ম ব্রাহ্মণইতি। ৭

তর্হি ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণইতিচেৎ তন্ন, ক্ষত্রিয়াদয়ো হিরণ্যদাতারঃ বহবঃ সন্তি তস্মান্ন ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণইতি ৮

তর্হি কোবাব্রাহ্মণো নাম? যঃ কশ্চিদাত্মানমদ্বিতীয়ং জাতিগুণক্রিয়াহীনং ষড়ূর্ম্মিষড়্ভাবেত্যাদিসর্ব্বদোষরহিতং সত্যজ্ঞানানন্দানন্তস্বরূপং স্বয়ং নির্ব্বিকল্পমাধারমশেষভূতান্তর্যামিত্বেন বর্ত্তমানং অন্তর্ব্বহিশ্চাকাশবদনুস্যূতমখণ্ডানন্দস্বভাবং অপ্রমেয়ম্ অনুভবৈকবেদ্যমপরোক্ষতয়া ভাসমানং করতলামলকবৎ সাক্ষাদপরোক্ষীকৃত্য কৃতার্থতয়া কামরাগাদি দোষরহিত

শমদমাদিসম্পন্নঃ ভাবমাৎসর্যতৃষ্ণাশামোহাদি-রহিতঃ দম্ভাহঙ্কারাদিভিরসংস্পৃষ্টচেতা বর্ত্ততে। এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিঃ-স্মৃতিপুরাণেতিহাসানাম্ অভিপ্রায়ঃ। সচ্চিদানন্দমাত্মানমদ্বিতীয়ং, ব্রহ্ম ভাবয়েদাত্মানং সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম ভাবয়েৎ ইত্যুপনিষৎ। ৯

• ইতি বজ্রসূচিকোপনিষৎ সমাপ্তা।

বজ্রসূচিকোপনিষদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

প্রথমেই উপনিষদের ঋষি বলিতেছেন যে, "অজ্ঞাননাশক 'বজ্রসূচী'নামক উপনিষৎ-শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিব। এই শাস্ত্র জ্ঞানহীন-জনগণের দূষণ ও জ্ঞানশালি জনসমূহের ভূষণস্বরূপ।" .

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, উপনিষদের নাম বজ্রসূচী বা বজ্রসূচিকা। বজ্র অর্থ হীরক, বজ্রসূচী অর্থ বজ্রনির্ম্মিত সূচী বা ছুঁচ্। হীরক সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় বস্তু। হীরকের দ্বারা যদি ছুঁচ্ প্রস্তুত করা যায়, তবে সেই ছুঁচ যেমন জগতের সকল কঠিন জিনিষকেই ভেদ করিতে পারে, সেইরূপ এই উপনিষৎশাস্ত্রও ইহার আলোচ্য বিষয়-সম্বন্ধীয় সকল প্রকার কঠোর সংশয় দূর করিতে সমর্থ। নাম নির্ব্বাচনে ঋষির আধ্যাত্মিক জ্ঞানগাম্ভীর্য্যের পরিচয় যেরূপ প্রকট, পদার্থতত্ত্বজ্ঞানের গৌরবও তেমনি স্বতঃ পরিস্ফুট। বস্তুতই এই উপনিষদের সিদ্ধান্ত অজ্ঞের কাছে ভীষণ ও বিজ্ঞের কাছে মোহন। আলোচনায় পরে ইহা প্রকটিত হইবে। ১

অতঃপর উপনিষদের আলোচ্য বিষয় উত্থাপিত হইতেছে যথা,—"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রধান, ইহা বেদে এবং বেদানুসারি স্মৃতি-শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, এই ব্রাহ্মণ কে?" 'জীব'ই কি ব্রাহ্মণ? না, 'দেহ'ই ব্রাহ্মণ? অথবা 'জাতি'ই ব্রাহ্মণ? কিম্বা 'জ্ঞান'ই ব্রাহ্মণ? না 'কর্ম্ম'ই ব্রাহ্মণ? না 'ধার্ম্মিক'ই ব্রাহ্মণ?" এখানে 'জাতি' 'জ্ঞান' ও 'কর্ম্ম' এই তিনটী ব্রাহ্মণ কিনা—এই সন্দেহের মর্ম্ম এই যে, মাত্র জাতি, জ্ঞান বা কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব নির্ণীত হয় কিনা? তাৎপর্য্যতঃ জাতি বা জন্মবিশেষসম্পন্ন বা জ্ঞানী কিংবা কর্ম্মী কেহই ব্রাহ্মণ কিনা; ইহাই এখানকার সন্দেহের স্বরূপ। ২

অতঃপর প্রদর্শিত হইবে যে, জীব, দেহ, জাতিসম্পন্ন, জ্ঞানী, কর্ম্মী ও ধার্ম্মিক কেহই ব্রাহ্মণ নহেন।

প্রথমে বলিতেছেন যে, "জীবকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না, কারণ একই জীব ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে নানা কর্ম্মবশে নানা দেহ ধারণ করিয়া থাকে; সুতরাং জীব ব্রাহ্মণ নহে।' এখানে বুঝা উচিত যে, একই জীব কর্ম্মফলে কখনও ব্রাহ্মণ-দেহ লাভ করে, আবার কখনও বা শূদ্রদেহ প্রাপ্ত হয়। ইহা শাস্ত্রপূত সত্য। যদি জীব ব্রাহ্মণ হইত, তবে সে আবার কর্ম্মবশতঃ ক্ষত্রিয়-শরীর বৈশ্যশরীর বা শূদ্রশরীর লাভ করিবে কিরূপে? বস্তুতঃ জীব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কিছুই নহে। দেহে তাদাত্ম্যজ্ঞান-সম্পন্ন হওয়া জীব ভ্রমবশতঃ নিজে ব্রাহ্মণত্বাদির অভিমান বহন করে, কিন্তু পরমার্থতঃ সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইহার কিছুরই অন্তর্ভুত নয়। ৩

এখানে দেহ ব্রাহ্মণ নয়, ইহা বলা হইতেছে—যথা—

'তবে দেহই ব্রাহ্মণ এরূপ বলিলে তাহাও অসঙ্গত, কেননা, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেরই দেহ পঞ্চভূতে গঠিত। সকল দেহেরই জরা মরণ-ব্যাধি প্রভৃতি সংঘটিত হইতে দেখা যায়, এসব বিষয়ে ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির কোনও ভেদ দেখা যায় না। আবার ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ এরূপ নিয়মও সংসারে দৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে দেহ যদি ব্রাহ্মণ হয়, তবে মৃত পিতার দেহ দাহ করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাপ হওয়া উচিত। বস্তুতঃ তাহা হইতে পারেনা, সুতরাং দেহ ব্রাহ্মণ নয়।" এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, মহাভারতাদি গ্রন্থে "ব্রাহ্মণানাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়ানাস্তু লোহিতঃ। বৈশ্যানাং পীতকোবর্ণঃ শূদ্রাণামসিতস্তথা।" ইত্যাদি যে বর্ণনা আছে, তাহা কেবল কথার কথা। সমাজে সকল ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ নহেন, পরন্তু শ্বেতকায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রও দুর্ল্লভ নয়। ঐরূপ রক্তবর্ণ মানব জগতে দেখা যায় না, ঈষদ্রক্তবর্ণ মানুষ সকল জাতির মধ্যেই দেখা যায়। পীতবর্ণ বৈশ্যের একচেটিয়া নহে। আবার শূদ্রগণ—অর্থাৎ যাহারা সমাজে শূদ্র নামে পরিচিত তাহারা সকলেই যে, মসীবর্ণ তাহা নয়। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যসমাজেও কৃষ্ণবর্ণ মানবের অভাব নাই; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। যদি দেহ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পার্থক্য-সাধন ঐশ সত্য হইত, তবে একজাতির সকলের দেহবর্ণ একরূপই হইত, দুঃখের বিষয় তাহা হয় নাই। ব্রাহ্মণের ও শূদ্রের দেহের কোনও পার্থক্য নাই। একরূপ উপকরণ, একরূপ গঠন, একরূপ বাল্য যৌবন জরা প্রভৃতি সকলেরই দেহে অনুভূত হইয়া থাকে। এই সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম, ভাব বা ধর্ম্ম—ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার করে না। ব্রাহ্মণ-দেহ দগ্ধ করিতে অগ্নি ইতস্তত করে না, আবার চণ্ডাল দেহের বেলায়ও তাহার ইতস্তত নাই। যখন এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সবই সমান, তখন দেহ ব্রাহ্মণ হইতেই পারে না। ৪

অতঃপর জাতি বা জন্ম ব্রাহ্মণত্বের কারণ নয় বলা হইতেছে;—যথা—

যদি বল 'তবে জাতি দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব স্থিরীকৃত হউক্, একথাও বলিতে পার না। যেহেতু জাতি বা জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব নির্ণীত হইতে পারে না। কেননা, বিভিন্ন জাতিতে উৎপন্ন মহর্ষি অনেকই ছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ পিতামাতার সংযোগে জন্মগ্রহণ না করিয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। যেমন মৃগীর গর্ভজাত সন্তান ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি, ব্রাহ্মণ। কুশজাত কৌশিক মুনি ব্রাহ্মণ। শৃগালী হইতে জাত জাম্বুক মুনি, ব্রাহ্মণ। উঁই ঢিপি হইতে আবির্ভূত বাল্মীকি মুনি ব্রাহ্মণ। কৈবর্ত্তকন্যা গন্ধগন্ধার গর্ভজাত বেদব্যাস ব্রাহ্মণ। শশপৃষ্ঠ হইতে জাত মহর্ষি গৌতম ব্রাহ্মণ। উর্ব্বশী স্বর্গবেশ্যা, তাহার সন্তান বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। মহর্ষি অগস্ত্য কলশে অপ্সরোবীর্য্যে জাত হইয়াও ব্রাহ্মণ ইঁহারা কেহই জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন না, কিন্তু হইয়াছিলেন। আবার ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ না করিয়াই অনেকে জ্ঞান ও তপস্যাবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (যেমন বিশ্বামিত্র

প্রভৃতি) অতএব জাতি বা জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না।

এখানে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য যে, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, এই যে পণ্ডিতসমাজপ্রসিদ্ধ-সিদ্ধান্ত ইহার উপর স্বয়ং উপনিষৎই আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন। উপনিষদ্ বলেন "তোমরা যে ব্রাহ্মণী-ভূতমাতাপিত্রোরুৎপন্নস্যানন্ত ব্রাহ্মণত্ব" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতার সন্তান ব্রাহ্মণ এই বলিতেছ, ইহা অন্যায়; কেননা, কৈবর্ত্তকন্যার পুত্র, বেশ্যার পুত্র এমন কি, তীর্য্যগজীবের গর্ভজাত পুত্র প্রভৃতিও ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে শাস্ত্রে আছে। তাহাদের কাহারও মাতা ব্রাহ্মণী ছিলেন না, অথচ সন্তান ব্রাহ্মণ হইয়াছিল। আর যাহারা অন্য জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারাও তপোবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছে শাস্ত্রে দেখা যায়। যেমন ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র, বৈশ্য নাভাগারিষ্ট-পুত্রদ্বয়, এবং শূদ্র কবষ প্রভৃতি ব্রাহ্মণকুলে না জন্মিয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিল। ইতিহাস পুরাণ এবং বেদ ইহা ঘোষণা করেন। অতএব জন্মানুসারে ব্রাহ্মণত্ব নির্ণীত হইতে পারে না। এখানে তির্য্যগ্‌জীবের গর্ভে ঋষির জন্ম পুরাণ প্রসিদ্ধ হইলেও অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। মানবের সহিত মৃগ ও শৃগালের যৌন-সংস্রব ঘটিলে তাহার ফলে যে অপত্য উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা বর্ত্তমান যুগে বিশ্বাস করা সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই যুক্তির বলে জন্মগত-জাতি উড়াইয়া দেওয়া যায় না বটে, কিন্তু জন্মগত জাতি গুণকর্ম্মানুগত না হইলে যে উহা "কাঁঠালের আমসত্ব" হইয়া দাঁড়ায়, তাহা বলাই বাহুল্য। উপনিষদ্ উচ্চতম ব্রাহ্মণত্বের মূলতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে জন্ম কেন, গুণ-কর্ম্ম পর্য্যন্ত উপেক্ষা করাও দোষাবহ হইতেছে না; পরে ইহা পরিস্ফুট হইবে। ৫

এখানে জ্ঞানী যে ব্রাহ্মণ নহেন, তাহা দেখান হইতেছে;—

যদি বল জ্ঞানই ব্রাহ্মণের অসাধারণ লক্ষণ, জ্ঞানীই যথার্থ ব্রাহ্মণ, তাহাও সঙ্গত নয়। কেননা, ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতির মধ্যেও জ্ঞানী দেখা যায়। ক্ষত্রিয় জনক রাজা প্রগাঢ় জ্ঞানী ছিলেন, দাসীপুত্র বিদুর মহান্ জ্ঞানী ছিলেন, ধর্ম্মব্যাধ ব্যাধ হইয়াও জ্ঞান সম্পদের অধিকারী ছিলেন। সুতরাং জ্ঞান যখন ব্রাহ্মণদেরই নিজস্ব নয়, তখন জ্ঞান দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব অবধারিত হইবার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। ৬

কর্ম্মই ব্রাহ্মণত্বের নিদান নয় দেখান হইতেছে, যথা—

যদি কর্ম্ম দ্বারাই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় একথা বল, তবে তাহাও অন্যায়, যেহেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেরই প্রারব্ধ কর্ম্ম, সঞ্চিত কর্ম্ম ও আগামি কর্ম্ম লইয়া সাধর্ম্ম্য আছে। কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া চারিবর্ণই নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকে। কর্ম্ম ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদির পৃথক্ নয়। ব্রাহ্মণ বলিয়া যে তিনি ফুৎকারে প্রারব্ধ কর্ম্মরাশি উড়াইয়া দিবেন, তাহা নহে। সে কর্ম্মের ভোগ দ্বারাই ক্ষয় হইবে, অন্যথা নয়। এবিষয়ে ব্রাহ্মণ যেমন ক্ষত্রিয়াদিও তেমনি। বলিতে পার, "ব্রাহ্মণের এবং ক্ষত্রিয়াদির জন্য শাস্ত্র বিভিন্ন অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের ব্যবস্থা

করিয়াছেন, সুতরাং ব্রাহ্মণ ও অন্যজাতির কর্ম্ম এক নয় পৃথক্।” প্রত্যুত্তরে উপনিষৎ বলিবেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সকলেই অদৃষ্টরূপ পূর্ব্বকর্ম্ম দ্বারা পরিচালিত হইয়া ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। শাস্ত্র ব্রাহ্মণকে তপস্যা করিতে বলিয়াছেন, কুকর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু সকল ব্রাহ্মণই শাস্ত্রের আদেশ মত তপস্যা করিতে পারিতেছে না। জন্মান্তরীণ কর্ম্মানুগত প্রকৃতি দ্বারা প্রেরিত হইয়া পূর্ব্ব কর্ম্মানুরূপ যথাসম্ভব সৎকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্ম করিতেছে; সুতরাং কোনও নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের দ্বারা কোনও জাতিব্যবস্থা হইতে পারেনা। সুবিধানুসারে সকলেই সকল কর্ম্ম করিতে পারে, তবে প্রকৃতির বিরুদ্ধে কেহ দাঁড়াইতে পারে না। কর্ম্মের বাঁধাবাঁধি থাকিতে পারে না, ফলতঃ উহা হইতে ব্রাহ্মণত্বও নির্ণীত হয় না। ৭

এখানে বলা হইতেছে ধার্ম্মিক মাত্রেই ব্রাহ্মণ নহেন, যথা;—

যদি বল, যে ধার্ম্মিক সেই ব্রাহ্মণ ইহাও অসঙ্গত। কেননা, ক্ষত্রিয়াদির মধ্যেও ধার্ম্মিকের অভাব নাই। দান, দয়া, যজ্ঞ, তপস্যা প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরের অধিকার নাই একথা বলা যায় না। ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে যে সকল প্রসিদ্ধ দাতা, দয়াশীল ও যজ্ঞরত মহাত্মা ছিলেন, ইতিহাস পুরাণে তাঁহাদের কাহিনী বিবৃত আছে, অতএব যে ধার্ম্মিক সে ব্রাহ্মণ না হইয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রও হইতে পারে। ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের অসাধারণ সম্পত্তি নয়। ৮

অবশেষে উপনিষৎ স্বয়ংই ব্রাহ্মণ নির্ব্বাচন করিতেছেন, বলিতেছেন—

এখন যদি বল যে, তবে ব্রাহ্মণ কে? তাহার উত্তরে বলিব যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তিনিই ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ যিনি জাতিগুণক্রিয়াহীন ষড়দশাশূন্য ষড়বিকারবিহীন সর্ব্বদোষশূন্য সত্য জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দস্বরূপ স্বয়ং নির্লিপ্ত হইয়া সর্ব্বভূতে অন্তর্যামীরূপে বর্ত্তমান, আকাশের অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র অনুস্যূত, অখণ্ডানন্দস্বরূপ অপ্রমেয় একমাত্র অনুভববেদ্য অপরোক্ষরূপে ভাসমান অদ্বিতীয় আত্মাকে করামলক আমলক ফলের ন্যায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন এবং আত্মজ্ঞান প্রভাবে কামক্রোধাদিশূন্য শমদমসম্পন্ন, মাৎসর্য্য, তৃষ্ণা, আশা, ও মোহ পরিশূন্য এবং অহঙ্কারাদির সহিত সম্পূর্ণ অসংস্পৃষ্ট হইয়া স্বপ্রতিষ্ঠভাবে কালাতিপাত করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। ইহাই শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণ সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। যিনি ব্রাহ্মণ হইতে চাহেন, তিনি নিজেকে অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মভাবে ভাবিত করুন, ইহাই একমাত্র উপদেশ।

উপসংহারে উপনিষদের ঋষি বলিতেছেন, জন্ম কর্ম্ম ধর্ম্ম পরোক্ষশাস্ত্রাদি-জ্ঞান এ সকল দ্বারা ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না, কেবল ব্রহ্মজ্ঞানী যে সেই ব্রাহ্মণ। যে মহাত্মা প্রপঞ্চাতীত শান্ত শিব অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, কেবল তিনিই ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রহ্ম হইতে পারিয়াছেন। এখানে ভাবিতে গেলে মনে হয়, উপনিষদের ঋষি ‘মুক্ত’ পুরুষকেই ‘ব্রাহ্মণ’ বলিতেছেন। লৌকিক ব্রাহ্মণত্ব

বা জাতিগত কি গুণকর্ম্মগত ব্রাহ্মণত্ব এখানকার লক্ষ্য নয়। ব্রাহ্মণনামক সম্প্রদায় বিশেষ এখানকার লক্ষ্য নয় বলিয়াই জন্ম, গুণকর্ম্ম সবই ত্যাগ করা হইয়াছে। ভারতে প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ নামে যে বিদ্যাধর্ম্মরক্ষক এক সম্প্রদায় ছিলেন, যাঁহাদের বংশধরগণ এখনও নিজেদের 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহারা সামাজিকব্রাহ্মণ। শাস্ত্রে এই সামাজিক ব্রাহ্মণের কথাও আছে। আবার গুণকর্ম্মানুসারি ব্রাহ্মণের বিবরণও শাস্ত্রে আছে। আর এখানে এই মুক্ত ব্যক্তিরূপ ব্রাহ্মণের কথাও বলা হইতেছে। কেবল মাত্র জাতিব্রাহ্মণ জন্মগুণকর্ম্মসম্পন্ন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন, আবার জন্মগুণকর্ম্মসম্পন্ন ব্রাহ্মণ এই ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের কাছে হীন, এই তত্ত্ব অনুধাবন যোগ্য। জাতিব্রাহ্মণ জাতিগত অধিকার লাভ করিতে পারেন, যেমন যাজনকর্ম্মাধিকার। জাতিগুণকর্ম্মসম্পন্ন ব্রাহ্মণ জন্মগত, কর্ম্মগত ও গুণগত বিশিষ্ট অধিকার লাভ করেন, যেমন সংসারী ঋষিদের বিধান পরিচালনাদির অধিকার। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ মুক্তপুরুষ, তিনি নিজে ব্রহ্মভাব লাভের অধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি যে অধিকার লাভ করেন, তাহা ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি শ্রুতির প্রতিপাদ্য। এই ত্রিবিধ ব্রাহ্মণত্ব ভিন্ন জিনিষ। পুরোহিত-ব্রাহ্মণের স্কন্ধে অখণ্ড অদ্বৈতজ্ঞানের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া অন্যায়। অনেকে শাস্ত্রমর্ম্ম অনুধাবন না করিয়া জাতিব্রাহ্মণ, গুণকর্ম্মানুসারী ব্রাহ্মণ এবং ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ এক করিয়া ফেলেন, শেষে স্থির করেন যে, প্রাচীনভারতে সবই ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন, এখন তাহা নাই, অতএব 'বামুন বেটারা অধঃপাতে গিয়াছে।' তাঁহারা ভাবুন, সেকালে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু জাতিব্রাহ্মণ ও গুণকর্ম্মানুসারী ব্রাহ্মণও ছিলেন। বরঞ্চ এই দুই শ্রেণীই অধিক ছিলেন। তবে ইহারা কেহই উচ্চতম ব্রাহ্মণ নহেন, ব্রহ্মজ্ঞই যথার্থ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ।

ওঁ তৎসত্ সমাপ্ত।

বিষম সমস্যা।

অর্থাৎ

ধর্ম্ম বিপ্লব লইয়া, জগতে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মূল কারণ নির্ণয় ও তৎপ্রতিকারের তত্ত্বজিজ্ঞাসা।

সূচনা

মনোমহেশের পথে মানস সরোবর হইতে আগত কয়েকজন মহাপুরুষের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বেশ, ভূষা বা আকারে তাঁহাদিগকে চিনিতে না পারিলেও, তাঁহারা যে ভারতবর্ষীয়, কথা-প্রসঙ্গে তাহা জানিতে আর বাকি রহিল না। তাঁহাদিগকে "মহাপুরুষ" কেন বলিলাম তাহার অনেক কারণ এস্থলে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। "তীর্থযাত্রা" প্রসঙ্গে ইতপূর্ব্বে এডুকেশন গেজেটে তাহার অনেক উল্লেখ হইয়াছে। তবে ভারতীয় বর্ত্তমান কালের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত আমাদের যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার

কোন কোন অংশ এস্থলে 'বিষম সমস্যা' নাম দিয়া প্রকাশ করা হইল। প্রস্তাবটী ভাল করিয়া পড়িলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, তাঁহাদিগের চিন্তা কতদূর প্রশস্ত এবং তাঁহারা কত উর্দ্ধাঙ্গের মহাপুরুষ, তথা প্রস্তাবিত বিষয়টী কত গুরুতর। সম্যক্ বিদ্যাবুদ্ধির অভাবে আমরা প্রস্তাবটী যে সুসঙ্গত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলাম না, তাহার জন্য বড়ই দুঃখিত রহিলাম।

প্রায় অশীতি বৎসর অতীত হইল, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, হিন্দু-সমাজের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বেদ, উপনিষদ, পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্র হইতে যে সকল সত্য উদ্ধার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী আচার্য্য, মহর্ষি শ্রীযৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা সম্পূর্ণ করিতে ধন-প্রাণ অকাতরে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই; কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী প্রচারকেরা সেই জাতীয় ধর্মভাব রক্ষা করিতে না পারিয়া গোপনে গোপনে খ্রীষ্টের পদাশ্রয় গ্রহণ করতঃ হিতে বিপরীত করিয়া তুলিয়াছেন। সুখের সংবাদ এই যে, তাঁহারা তাহা করিয়া হিন্দুসংশ্রব পরিত্যাগ করতঃ ক্রমে খ্রীষ্টসমাজের অন্তর্ভূক্ত হইতে প্রয়াস পাইতেছেন। সুতরাং হিন্দুসমাজ তাঁহাদের দ্বারায় আর কোন আশা করিতে পারেন না।

সেদিন ডালহাউসী শৈলে অবস্থিতি-কালে, উন্নতিশীল খ্রীষ্টসমাজের নেতা, কাউন্ট টলষ্টয় প্রমুখ ভারতীয় উচ্চপদস্থ ইংরাজদিগের মধ্যে মহানুভব মিং র্কিলিনের (Superintending Engineer) সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, "জাতীয় ধর্ম প্রসঙ্গে কথা উঠিলে, তিনি কহিলেন"—ধর্ম্মের মর্য্যাদা বহুকালে, বহুযত্নে এবং বহু আত্মত্যাগে, সমাজে, জাতিগত শক্তির অন্তর্ভূক্ত হইয়া থাকে। সেই ধর্ম্মসঙ্গত-জাতিগত শক্তি যত বদ্ধমূল হইতে থাকে, তত সেই জাতির মধ্যে মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। এরূপ দৃষ্টান্ত সকল জাতির মধ্যে সতত দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাঁচ হাজার বৎসরের মধ্যে আব্রাহাম হইতে খ্রীষ্ট পর্য্যন্ত—খ্রীষ্ট-সমাজে কত মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া যে, কত উন্নতির স্রোত সেই সমাজে আনিয়া দিয়াছেন, তাহার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে; ইহার তথ্য সহজে বুঝিতে পারা যায়।

এই তত্ত্বকথা সমীচীন বলিয়া সমর্থন করতঃ আমরা কহিলাম যে, ঘোর অন্ধকারের মধ্যে পূর্ব্বগগনে সূর্য্যদেব যখন প্রথম উদয় হইয়াছিলেন, তখন সেই নবোদিত আলোক সর্ব্বাগ্রে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরাই জগতে "আর্য্য" বলিয়া পরিচিত, সেই আর্য্যেরা যখন সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া "আর্য্য-জাতি" বলিয়া চিহ্নিত হইলেন, তখন হইতে তাঁহাদের বেদ, উপনিষদ, পুরাণ এবং তন্ত্র, দেশ-কাল-পাত্রভেদে—সময়ে সময়ে তাঁহাদের প্রবক্তা দেব, ঋষি, আচার্য্য এবং তন্ত্রধার বলিয়া প্রতিষ্ঠিত। সে কথা ২।৪।১০ হাজার বৎসরের কাহিনী নহে তাহা "যাবৎ চন্দ্র দিবাকরঃ" এই চন্দ্র-সূর্য্য যত কালের তত কালের, তাই তাঁহাদের শাস্ত্রে তেত্রিশকোটী দেবতার মহিমা-কীর্ত্তন

করিয়া থাকে। এই আর্য্যজাতি সেই সকল দেব-ঋষির সন্ততি হইয়া পূর্ব্বপুরুষের দেবত্ব, ঋষিত্ব হারাইয়া বসিয়াছেন। তাই ভারতীয় আর্য্য সন্তান "হিন্দু" এখন নিরয়-বাসী নিগার" লোকের বেগারে নিযুক্ত হইয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া গিয়াছেন, নচেৎ যাঁহা-দিগের প্রণীত গ্রন্থ পড়িয়া জোন্‌স্ কোল-ব্রুক, ল্যাসেন, কাউএল, ম্যাক্সমুলর প্রভৃতি পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ প্রমুগ্ধ—তাঁহাদের বংশ ধরেরা কি এত হীন হইতে পারে?"

"আর্য্য-হিন্দুশক্তি সমস্ত জগতে সঞ্চা-রিত। কি রূপে, কি ভাবে, কোথা হইতে সে শক্তি সকল জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হইল, তাহার প্রকৃষ্ট ইতিহাস বর্ত্তমান না থাকিলেও সেই শক্তির প্রভাব সর্ব্বত্র সঞ্চারিত দেখিয়া সেই আদিস্রোতের গতি স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে, তখন সেই মাতৃশক্তির পূজা করিতে সভ্যজগৎ এত কুণ্ঠিত কেন? এবং সেই জ্যেষ্ঠ সহোদর-দিগের সম্মান রক্ষা করিতে এত লজ্জা-বোধ হইতেছে কেন? খ্রীষ্ট মিশনরীগণ যদি স্বার্থশূন্য হইয়া, হিন্দুর জাতীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র আলোচনা করেন, এবং পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া গত পাঁচ হাজার বৎ-সরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে এত আত্মবিস্মৃত হইতে হয় না। হিন্দু মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন, বাইবেলের একটী কথাও তাঁহাদিগের অমাননীয় নহে। প্রত্যুত: পিতা কি পুত্রের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষা করিতে পারেন? সরল মনে ইহা স্বীকার করিলে, বাণবিদ্ধ কৃষ্ণ এবং ক্রশবিদ্ধ খ্রীষ্ট এক হইয়া যান।"

এই সকল কথা শুনিয়া মিং ক্লিলিন হিন্দু-শাস্ত্র আলোচনা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, আমরা তাহাতেই আহ্লাদিত।

আজিকালি সমস্ত সভ্যজগতে একটা "ধর্ম্মবিপ্লব" উপস্থিত হইয়াছে। তাই দেখিতে পাই, সকলেই নিজ নিজ অবলম্বিত ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে যত্নবান। 'ধর্ম্ম' যে সমাজের রীতি, নীতি, ধ্যান, জ্ঞানের প্রসূতি, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না, অথচ, দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্ম বিষয়ে আমাদের যে অধঃপতন হইয়াছে, তাহার কারণ চিন্তায় কেহই অগ্রসর নহেন। যিনি যে অবস্থায়, যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, তিনি সেই ধর্ম্মের সেই অবস্থাটীর উন্নতি-সাধন করিতে পারি-লেই কৃতার্থ হন, কিন্তু তাহার মূলে যে কত ভুল রহিয়াছে, কেহই তাহা অবধারণ করিতে প্রস্তুত নহেন। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোকে পীড়িত হইলেই ডাক্তার ডাকাইয়া চিকিৎসা করিতে অনু-রোধ করেন। ডাক্তার—টাকা পাইলেই হইল, উপস্থিত হইয়া রোগীর মুখে দুই একটী কথা শুনিয়া জিহ্বা দেখিয়া প্রীসক্রীপশন লিখিতে বসেন। রোগী যদি "শিরঃপীড়ার" যন্ত্রণার কথা বলে, অমনি তাহার ঔষধের ব্যবস্থা হয়; কিন্তু কি কারণে শিরঃপীড়া হই-য়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করেন না। সুতরাং পীড়া ক্রমে শঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে, তখন পীড়া স্থির করিবার জন্য "মেডিকেল বোর্ড" বসিয়া যায়, তাহাতে কিছু নিরা-করণ হউক বা না হউক, বোর্ডের ফির জন্য গৃহস্থকে বিপদস্থ হইয়া পড়িতে হয়।

রোগীও তাহার পর প্রায় পঞ্চত্ব পায়। এইরূপ ব্যাপার ঘন ঘন ঘটিতে দেখিয়া, এখন আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেই বা কি ফল হইতেছে? "এলো" "অয়ুর্ব্বেদের" স্থলে, চিকিৎসা কার্য্যকরি হইতেছে না দেখিয়া সূক্ষ্ম হোমীয়প্যাথি বাহির হইয়াছে। সকল বিষয়ের ত প্রতিযোগীতা চাই—তাই দেখিতে পাই, কোথা হইতে সপ্তাপ্যাথি, ইলেকট্রোপ্যাথি, হাইড্রোপ্যাথি, পথে পথে দাঁড়াইয়া পীড়িত সমাজকে নিষ্পীড়িত করিতেছে, কৈ কিছুতে ত তাহার কিছুই হইতেছে না, বরং গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে প্রকাশ—দিন দিন নানাজাতীয় ব্যাধি সংক্রমিত হইয়া দেশ ছার-খার করিয়া ফেলিতেছে। এখন আবার কোন প্যাথি পথ আগলাইয়া দাঁড়াইবে তাহাই ভাবিতেছি।

এইরূপ ধর্ম্মজগতেও পীড়ার আধিক্য যারপরনাই প্রসারিত। শরীরের রোগ মুক্ত করিবার জন্য, ডাক্তার, কবিরাজ, হাকীম, যেমন ঔষধালয় খুলিয়া অভয়দান করিতেছেন—পাপরূপ পীড়া হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য তেমনি, শত শত ভজনালয়, মন্দির, মস্জীদ, সভা, সমাজ, সমিতি উন্মুক্ত হইয়া পাপী তাপীকে আশ্রয় দিবার জন্য প্রেমপ্যাথি প্রচার করিতেছেন। অথচ দেখিতে পাই পাপ পিশাচিনীর তাড়না কোথা হইতেও নিবৃত্ত হইতেছে না। হইবে কোথা হইতে? রোগ-শোক-পাপ-তাপের মূল কারণ কি? কেহ কি তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন? তাহা হইতেছেনা বলিয়াই ত সংসারে এত হাহাকার।

নিম্নে মূল প্রবন্ধে সর্ব্ববিধ রোগের কারণ কথঞ্চিত নিরাকৃত হইতেছে, এখন ভরসা এই যে, সুযোগ্য হিন্দু-সমাজপতিগণ তাহা যুক্তিযুক্ত বোধ করিলেই শ্রম স্বার্থক বোধ করিব, এবং অবহিত হইয়া তাহা পাঠ করতঃ তাহার সদুপায় উদ্ভাবন করিলে সকল মনোরথ বোধ করিব।

যিনি উৎপত্তি, স্থিতি ভঙ্গের হেতু, অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান থাকিয়া অনন্ত সৃষ্টির অনন্ত লীলা সংবৃত করিতেছেন, তাঁহার মর্ম্ম বুঝিয়া কর্ম্ম করিতে পারিলে তৎসাধনে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

মহাপুরুষের বাক্য।

বেদাদি শাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে কহিতেছে যে, সেই অনাদি পুরুষ পরমেশ্বর এই সমস্ত বিশ্বের ধাতা, পাতা, বিধাতা—

(ক) ধাতা—পিতা, ধারণকর্ত্তা, নির্ম্মাণকর্ত্তা।

(খ) পাতা—রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা।

(গ) বিধাতা—সৃষ্টিকর্ত্তা, বিধানকর্ত্তা।

এবং তিনি ত্রিগুণাতীত অজর, অমর, অক্ষয়, অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, তাই শাস্ত্রে বলে তাঁহার সহিত কাহারও উপমা হয় না, এই অনুপমেয় অনন্ত পুরুষের অস্তিত্ব সর্ব্বত্র আমাদের অনুমেয় নহে বলিয়া আমরা ইতি কর্ত্তব্য বিমূঢ় হওত স্বার্থ সাধনে যত্নবান হইয়া থাকি, এবং তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে হতজ্ঞান হইয়া পড়ি।

প্রাচীনকালে প্রাচীন ঋষিগণ এই ভাব

অবলম্বন করিয়া বাহ্যিকের দৃষ্টি বাহিরে রাখিয়া ধ্যানস্থ হওতঃ অন্তর্দৃষ্টিতে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে যত্ন পাইয়া তাই কহিয়া গিয়াছেন—

ধ্যানাবস্থিত তদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি
যং যোগিনো, যস্যান্তং ন বিদুঃ
সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥

তখন আমাদের বলিবার বা করিবার কি আছে, যাহা বলিয়া বা করিয়া আমরা আত্মহিত সাধন করিতে পারি? পারি কেবল তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিতে, আর তাঁহার নিয়মস্রোতে ভাসিয়া যাইতে! এই "তাকান" আর "ভাসন" যোগশাস্ত্রের অনুমোদিত। সৃষ্টির প্রকরণ দেখিয়া যখন স্রষ্টার সৃজনীশক্তির মহিমা বুঝিতে পারা যায় যে, কেমন এক সুশৃঙ্খলে সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি, স্থিতি, এবং লয় হইতেছে, এবং তাহার মধ্যে কেমন বিরাম বিশ্রাম ক্রমাদিক্রমে বিসর্পিত হইতেছে, তখন আমাদের কল্পনা, জল্পনা, তাহার রক্ষণাবেক্ষণ যে কি সহায়তা করিবে, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে না। তবু আমাদের কি আন্দোলন? কিমাশ্চর্য্য মতঃ পরং?

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের সর্ব্বাবিষ্কৃত বিষয় সকল দেখিয়া, আমরা চমকিত স্তম্ভিত। অথচ নিউটনের ন্যায় তাঁহারা সমস্বরে কহিতেছেন—সেই অবাঙ্‌মনসগোচরের অনন্ত সৃষ্টির এক বালুকাকণারও তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যাইতেছে না। উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তোমরা ত উদ্ভিদ্ জাতিকে শত শত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া, তাহাদের রূপ, রস, গন্ধের রমণীয়তা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছ, কিন্তু বল দেখি একজাতীয় মৃত্তিকায়, এক প্রকার তাপ-বাতে প্রবর্দ্ধিত বৃক্ষ, গুল্ম লতায় বিভিন্নতর, কটু, তিক্ত, কষায়, স্বাদ কোথা হইতে সস্তুত হইতেছে? তাহার উত্তরে সকলেই মুক্তকণ্ঠে কহিবে, "তাহা আমরা অবগত নহি, অবগত হইবার উপায়ও দেখিতেছি না।" ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা কর "তোমরা যে ভূমধ্যে প্রবেশ করিয়া খনিজ পদার্থ উদ্ধার করিতেছ, এবং তাহাদের জাতি নির্ণয় করতঃ ধাতু নির্ব্বিশেষেই তাহাদের নামকরণ করিতেছ। বল দেখি এক ভূমিস্তরে এক তাপবাতে, এক গর্ভে, এত বর্ণের বিবিধ ধাতু কি প্রকারে সঞ্জাত হইতেছে?" ইহার উত্তরে তাঁহারাও ঐরূপ মুক্তকণ্ঠে বলিবেন, "তাহা আমরা অবগত নহি, অবগত হইবারও উপায় কিছু দেখিতেছি না।" জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা কর; "তোমরা যে, জগতের জীবশ্রেণীকে চারিভাগে (জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিদ, এবং স্বেদজ) বিভক্ত করিয়া তাহাদের জাতি, বর্ণ, ব্যবহার নির্ণয় করিতেছ, বলদেখি তাহারা এক জাতীয় আহার, ব্যবহারে, এক ধাতু-শোণিত-শুক্রে সঞ্জাত হইয়া, কিরূপে বিভিন্নাকার ধারণ করিতেছে? আবার কেনই বা তাহাদের মধ্যে লিঙ্গভেদ হইতেছে? তাহার উত্তরে পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহারাও কহিবেন, "এ বিচিকিৎসায় আমরা কিছুই অবগত নহি, অবগত হইবারও কোন উপায়

দেখিতেছি না।” ভিষক্ কবিরত্নদিগকে জিজ্ঞাসা কর, “তোমরা যে রোগের উৎপত্তি, স্থিতি এবং উপশমের কাল নির্ণয় করিয়া ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিতেছ, বল দেখি, কি কারণে এক সংসারের একজাতি বিভিন্নরোগে আক্রান্ত হইতেছে, এবং কেনই বা শত বিধানে চিকিৎসিত হইয়াও তাহা হইতে তাহারা উপশম লাভ করিতে পারিতেছে না? কোটী কোটী জীব এই ভাবে কেন প্রতিদিন কালকবলে নিপতিত হইতেছে?” তাহার উত্তরে পূর্ব্বোক্তরূপে ভিষক্ মহাশয় কহিবেন—“তাহা আমরা অবগত নহি, অবগত হইবার উপায়ও কিছু দেখিতেছি না।” জ্যোতির্ব্বিদ সুধী-গণকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা কর, “তোমরা যে জ্যোতিশ্চক্র অঙ্কিত করিয়া আকাশপথ আবিষ্কার করতঃ কহিতেছ—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যে অংশে আমরা অবস্থিত, অন্যান্য গ্রহ, তারা, হইতে তাহা এত ক্ষুদ্র যে সমুদ্রকূলের স্তূপাকর বালুকা-রাশির মধ্যগত একটী সামান্য রেণু মাত্র, সেই রেণুমধ্যগত হইয়া উপরে আমরা যে অসীম বিস্তৃত অপার নভোমণ্ডল দেখিতে পাইতেছি, এপর্য্যন্ত তাহার পরোপরি পঞ্চোবিংশতি স্তবক দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—তাহার প্রত্যেক স্তবকের পরি-মাণ করা মনুষ্যের অসাধ্য। তাহা হইতে কখন কখন উল্কাপাত হইয়া থাকে। এরূপ অসংখ্য উল্কা আকাশপথে নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কোন কোন উল্কা এত দূর আকাশ হইতে পতিত হইয়াছে যে, আমাদের এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র রেণু পৃথিবী জলপূর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাহারা স্থানভ্রষ্ট হওতঃ পতিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু প্রতি পলে শত শত যোজনে দূরপথ অতিক্রম করিয়াও অদ্যাপি তাহারা আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়া উপ-নীত হইতে পারে নাই; দূরস্থ তারকা-বলীর রশ্মিপাত ও এইরূপ রহস্যে রসাপ্লুত, তখন বল দেখি, তুমি তাহা দেখিয়া, তাহা ভাবিয়া, কতদূর স্তম্ভিত!” তাহার উত্তরে জ্যোতির্ব্বিৎ সুধী কহিবেন, “এত যত্ন করিয়াও আমরা অনন্ত সৃষ্টির অত্য-ন্তরস্থ তত্ত্বের অনুমাত্রও উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, বরং প্রতিপদে স্তম্ভিত হইয়া পড়িতেছি, আজি যাহা কেশ-পাতের রেখা দেখিয়া কেবল স্থা থাল ভাবিলাম, কালি তাহা অকূল সমুদ্র বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। আজি যাহার ক্ষত রেখা দেখিয়া কঙ্কালাবশিষ্ট মরুভূমি বলিয়া বুঝিতে পারিলাম, কালি তাহা প্রজ্বলিত আগ্নেয়-গিরিমালা হইতে উৎক্ষিপ্ত অগ্নিরাশি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই ত আমাদের সুপরিষ্কৃত দূরবীক্ষণের অবস্থা। ইহা দ্বারায় অসংখ্য সৌরজগতের দুরন্ত অগণ্য গ্রহনিচয়ের নির্দ্দিষ্ট রেখা কিরূপে নির্ণয় করিব?” অসাধ্য বলিয়াই জ্যোতিষিক মণ্ডলী অবাক্ হইয়া রহিয়াছেন। এত গেল স্থাবর-জঙ্গমের কথা—আধিভৌতিকের কথা, এখন অধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক জগতের কথার আলোচনা করা যাউক।

এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জগতের মনুষ্যেরা, এই দৃশ্যজগত হইতে জ্ঞানের—অভিজ্ঞতার

ক্ষণমাত্র প্রাপ্ত হইয়া আকাশ, পাতাল পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইতেছে, তাহাতে তাহারা কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছে, তাহার তুলনার সমালোচনা করিতে পারিলেই, মহাপুরুষদিগের তাহা হইতে নিরস্ত হইবার কারণ অনুমিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

হিমারণ্যবাসী—
জনৈক পরিব্রাজক।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্যোতিষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতাংশের পর)

প্রাচীন হিন্দু জ্যোর্তির্ব্বিদগণ অয়নাংশ-তত্ত্ব অবগত ছিলেন কিনা এসম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। বিখ্যাত ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত Sir William Jones এবং তাঁহার পরে অধ্যাপক Bentley এ বিষয় সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। অত্যাশ্চর্য্য যুক্তিবলে ইঁহারা দেখাইয়াছেন যে খৃঃ পূঃ ৯৪৫ অব্দেও হিন্দুগণ ঐ সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা তৎকালিক প্রথা অনুসারে ঐ জ্ঞান সাধারণের নিকট প্রচার না করিয়া অতিশয় যত্নসহকারে প্রচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মী কাল বিভাগ হইতে উহার স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে কাল বিভাগ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"তদ্দ্বাদশ সহস্রাণি চতুর্যুগমুদাহৃতম্।
সূর্য্যাব্দসংখ্যয়া দ্বিত্রি সাগরৈরযুতাহতৈঃ॥ ১৫
সন্ধ্যা-সন্ধ্যাংশ-সহিতং বিজ্ঞেয়ং তচ্চতুর্যুগম্।
কৃতাদীনাং ব্যবস্থেয়ং ধর্ম্মপাদ ব্যবস্থয়া॥ ১৬
যুগস্য দশমো ভাগশ্চতুস্ত্রিদ্ব্যেক সংগুণঃ।
ক্রমাৎ কৃত যুগাদীনাং ষষ্ঠাংশঃ সন্ধ্যয়োঃ স্বকঃ॥ ১৭
যুগানাং সপ্ততিঃ সৈকা মন্বন্তরমিহোচ্যতে।
কৃতাব্দো সংখ্যা তস্যান্তে সন্ধিঃ প্রোক্তো জলপ্লবঃ॥ ১৮
সসন্ধয়স্তে মনবঃ কল্পে জ্ঞেয়াশ্চতুর্দ্দশ।
কৃত-প্রমাণঃ কল্পাদৌ সন্ধি পঞ্চদশঃ স্মৃতঃ॥ ১৯
ইতি যুগ সহস্রেণ ভূতসংহার কারকঃ।
কল্পো ব্রাহ্মমহঃ প্রোক্তং শার্ব্বরী তস্য-তাবতী॥ ২০

(সূঃ সিঃ ১ম খঃ)

বঙ্গানুবাদ—

দেবতাদিগের বার হাজার বৎসরে এক মহাযুগ হয়, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সমেত এই চারিযুগের বা এক মহাযুগের পরিমাণ ৪৩২০,০০০ বৎসর। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলি প্রভৃতি যুগের বৎসরের সংখ্যা ধর্ম্মের পাদ সংখ্যানুযায়ী ॥ ১৫। ১৬

এক মহাযুগের বৎসর সংখ্যাকে ১০ দিয়া ভাগ করিলে, সেই দশম ভাগকে যথাক্রমে ৪, ৩, ২, ১ দিয়া গুণ করিলে চারিটী লঘু যুগের বৎসরের সংখ্যা জানিতে পারা যায়।

প্রত্যেকের ষষ্ঠাংশ তাহাদের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ ধরা হয়। ১৭

এক মনুর প্রারম্ভ হইতে উহার শেষ পর্য্যন্ত সময়কে এক মন্বন্তর কহে। ৭১ যুগে এক মন্বন্তর হইয়া থাকে। সত্য-যুগের বৎসরের সংখ্যানুসারে মন্বন্তরের সন্ধি হইয়া থাকে। ১৮

সন্ধি সমেত চতুর্দ্দশ মন্বন্তরকে এক কল্প কহে। কল্পের আদিতে কৃত যুগ পরিমিত একটী সন্ধি। ১৯

এইরূপ সহস্র যুগে এক কল্প হইয়া থাকে, ইত্যাদি। ২০

ইহাদ্বারা দেখা যাইতেছে যে—

এক কল্প = ১৪ মন্বন্তর + সত্যযুগ

এক মন্বন্তর = ৭১ যুগ + সত্যযুগ

$$\text{সত্যযুগ} = \frac{৪৩২০,০০০}{১০} \times ৪ = ৪ \times ৪৩২০০০ \text{ বৎসর}$$

মহাযুগ = ১০ × ৪৩২০০০ বৎসর

মন্বন্তর = ৭১০ × ৪৩২০০০ + ৪ × ৪৩২০০০
= ৭১৪ × ৪৩২০০০ বৎসর

অতএব

কল্প = ১৪ × ৭১৪ × ৪৩২০০০ + ৪ × ৪৩২০০০ বৎসর
= ৪৩২০০০ (১৪ × ৭১৪ + ৪) বৎসর
= ৪৩২০০০ × ১০০০০ বৎসর
= ৪৩২০০০০ × ১০০০ বৎসর।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে সহস্রযুগে এক-কল্প ইহা মানিয়া লইলে কাল বিভাগে ঐ রূপ হইল কেন। ১৪ × ৭১৪ + ৪ভিন্ন কি অন্য কোন উপায়ে দশ সহস্র বুঝান যাইত না?

ক × খ + গ = ১০০০০ এই অসীম সমীকরণের ন্যূনাধিক প্রায় ৯০ প্রকার সমাধান হইতে পারে, তাহার মধ্যে হিন্দুরা বাছিয়া একটী রাখিলেন কেন? মানিয়া লওয়া যাক যে, প্রাচীন পণ্ডিতগণ যখন "কল্প" প্রভৃতি কাল বিভাগ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা অয়নাংশ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। এই অয়নাংশ Precesion of the Equinoxes ৭১৪ বৎসরে ১০ ডিগ্রি স্থানান্তরিত হয়, অতএব ১০০০০ বৎসরে ১৪ ডিগ্রি স্থান অতিক্রম করে, অতএব ১০০০ বৎসরে ১৪০ ডিগ্রি হয়, সুতরাং বৎসরে $\frac{১৪০^{\circ}}{১০০০০}$ = ৫০.৪"।

ইংরাজীমতে ঐ সংখ্যার পরিমাণ ৫০.২৮ সুতরাং অতিশয় মিল আছে বলিতে হইবে। Sir W. Jones প্রথমেই স্থির করেন যে, এই বিষয় প্রাচীন হিন্দুদিগের অবিদিত ছিল না। তিনি বলেন—

"We may have reason to think that the old Indian astronomer had made a more accurate calculation, but concealed their knowledge under veil of 14 Mannantor মন্বন্তর 71 divine ages. etc."

অর্থাৎ আমাদের মনে করিবার কারণ আছে যে, প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদগণ অয়নাংশ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম গণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু চতুর্দ্দশ মন্বন্তর, মহাযুগ প্রভৃতি বড় বড় কথার আবরণে ঐ সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; বাস্তবিকই ৯০ প্রকার উপায়ের মধ্যে উপরোক্ত একটি উপায় যে ঘটনাক্রমে অবলম্বিত হইয়াছিল, ইহা কল্পনারও অতীত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারিক কার্য্যোপযোগী করিয়া রচিত। মাধ্যাহ্নিক রেখা (Meridian) নির্ণয় করিবার যে একটী অতি সহজ ও অতিশয় অনায়াসসাধ্য প্রক্রিয়া উহাতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে ঐ বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

শিলাতলেঽম্বু সংশুদ্ধে বজ্রলোপঽপিরা সমে,
তত্র শঙ্কঙ্গুলৈরিষ্টৈঃ সমং মণ্ডলমালিখেৎ ॥ ১
তন্মধ্যে স্থাপয়েচ্ছঙ্কুং কল্পনাদ্বাদশাঙ্গুলং।
তচ্ছায়াগ্রং স্পৃশেদ্ যত্রবৃত্তে পূর্ব্বাপরার্দ্ধয়ে ॥ ২
তত্র বিন্দু বিধায়োভৌ বৃত্তে পূর্ব্বাপরাভিধৌ।
তন্মধ্যে তিমিনা রেখা কর্ত্তব্যা দক্ষিণোত্তরা ॥ ৩
(সূঃ সিঃ, তৃতীয় খঃ।)

অর্থাৎ শিলাতলকে জলের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া ঠিক সমতল করিবে, কিম্বা সমতল পাকা মেজের উপর ইষ্ট অঙ্গুলি পরিমাণ ব্যাসার্দ্ধের একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিবে, তন্মধ্যে দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত একটী শঙ্কু (Guomon) ঠিক লম্বভাবে স্থাপিত করিবে। পূর্ব্বাহ্নে এবং অপরাহ্নে ঐ কীলকের ছায়ার অগ্রভাগ পূর্ব্বোক্ত বৃত্তকে যে যে স্থানে স্পর্শ করিবে সেই সেই স্থানে একটী একটী বিন্দু কল্পনা করিবে, পরে তিমি দ্বারা তন্মধ্যে দক্ষিণোত্তর রেখা অঙ্কিত করিবে। ইহাই ম্যাধ্যাহ্নিক রেখা। পৃথিবীর উভয় মেরুর ভিতর দিয়া এবং পৃথিবীস্থ যে কোন বিন্দুর বা স্থানের মধ্য দিয়া যে বৃহৎ বৃত্ত অঙ্কিত করা যায় তাহাই ঐ স্থানের Meridian নামে খ্যাত। আধুনিক Astronomyতেও ঠিক এই উপায়ে Meridian নির্ণয় করিতে উপদেশ দিয়াছে। Parkers' Astronomy ২০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কোন স্থানের অক্ষাংশ (Latitude) কত তাহা স্থির করিবারও একটী সুন্দর ও সহজ নিয়ম উহাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এবং বিষুবতিচ্ছায়া স্বদেশে যা দিনার্দ্ধজা।
দক্ষিণোত্তর রেখায়াং সা তত্র বিষুবৎ প্রভা ॥
তৃতীয় অঃ, ১২

শঙ্কুচ্ছায়াহতে ত্রিজ্যে বিষুবৎ কর্ণ ভাজিতে।
লম্বাক্ষজ্যে তয়োশ্চাপে লম্বাক্ষৌ দক্ষিণৌ সদা ॥ ১৬

অর্থাৎ বিষুব দিনের মধ্যাহ্নের ছায়া দক্ষিণোত্তর রেখাতে দৃষ্ট হয় ইহাই বিষুবচ্ছায়া বা পলভা।

শঙ্কু ও ছায়াকে ত্রিজ্যা (৩৪৩৮) দ্বারা পৃথক করিয়া গুণ করিয়া পল কর্ণ দ্বারা ভাগ করিলে লম্বজ্যা ও অক্ষজ্যা হইবে।

বিষুব দিনের (২১শে মার্চ্চ বা ২৩শে সেপ্টেম্বর) মধ্যাহ্নের সময় পূর্ব্বোক্ত শঙ্কুর ছায়া দক্ষিণোত্তর রেখাতে দৃষ্ট হয়। জ্যামিতি দ্বারা ইহা প্রমাণ করা যায় যে, ঐ দিনে ঐ সময়ে সূর্য্যের কিরণ রেখা ঐ শঙ্কুর সহিত যে কোন উৎপন্ন করে তাহা ঐ স্থানের অক্ষাংশ বা Latitudeএর সমান, অতএব ত্রিকোণমিতি অনুসারে—

$$\text{বিষুবচ্ছায়া} = \text{শঙ্কু} \times \frac{\text{অক্ষাংশ জ্যা}}{\text{অক্ষাংশ কোটি}}$$

ইংরাজীমতে

$$\text{Equinoctial shadow} = \text{Guomon} \times \tan(\lambda)^{*}$$

$$\text{সুতরাং } \tan\lambda = \frac{\text{Shadow}}{\text{Guomon}}$$

সুতরাং ঐ ছায়াকে শঙ্কু দ্বারা ভাগ করিলে অক্ষাংশের tangent পাওয়া গেল, ইহা হইতে অতি সহজেই তাহার পরিমাণ নির্ণীত হইতে পারে।

Chamber's Logarithm table দ্রষ্টব্য।

শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ, বি, ই,
ডিঃ, ইঃ, যশোহর।

এই বিন্দুদ্বয়ের প্রত্যেকটীকে কেন্দ্র করিয়া কোন ব্যাসার্দ্ধ পরিমাণ বৃত্ত অঙ্কিত করিলে "তিমি" (arcs of intersecting circle) হইবে।

* Greek alphabet λ Lamba দ্বারা Latitude বুঝায়। ইংরাজী alphabet 'L' এর অনুরূপ।

নারীচর্য্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আসনে বাসয়িত্বা চ দত্ত্বা ভালেচ চন্দনং।
সর্ব্বাঙ্গ লেপনং কৃত্বা দত্ত্বামাল্যং গলেঽপি চ॥ ১৩০

পতিকে আসনে বসাইয়া তাঁহার কপালে চন্দন, সর্ব্বাঙ্গে কুঙ্কুমাদি লেপন ও গলদেশে মাল্যদান করিবেন। ১৩০

সম্পূজ্য ভক্তিতঃ কান্তং স্তুত্বা চ প্রণমেৎসুধা।
নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় চ॥ ১৩১

ইত্যনেনৈব মন্ত্রেণ দত্ত্বা পুষ্পঞ্চ চন্দনং।
পাদ্যার্ঘ্য ধূপদীপাংশ্চ বস্ত্রং নৈবেদ্য মুত্তমম্॥ ১৩২

জলং সুবাসিতং শুদ্ধং তাম্বূলঞ্চ সুসংস্কৃতম্।
দত্ত্বা স্তোত্রঞ্চ প্রপঠেৎ যৎকৃতং পাঠ্যমেব চ॥ (ছ) ১৩৩

অমৃততুল্য ভোগদ্রব্য দ্বারা সামবেদোক্ত মন্ত্রে ভক্তিভাবে পতিকে পূজা করিবেন; অনন্তর স্তব পাঠ করিয়া প্রণাম করিবেন। "নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পুষ্প, চন্দন, পাদ্য, অর্ঘ্য, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, উত্তম নৈবেদ্য, পবিত্র সুবাসিত জল ও তাম্বুল প্রদান করিয়া স্তব পাঠ করিবেন। ১৩১-১৩২-১৩৩

পতিব্রতানাং যো ধর্ম্মস্তন্নিবোধ ব্রজেশ্বর।
নিত্যং ভর্ত্তুর্মুখং দৃষ্ট্বা তৎপাদোদকমীপ্সিতং।
ভক্তিভাবেন সততং ভোক্তব্যং তদনুজ্ঞয়া। ১৩৪

শ্রীকৃষ্ণ নন্দ মহারাজকে কহিয়াছিলেন, হে ব্রজেশ্বর, পতিব্রতা রমণীগণের যে ধর্ম্ম তাহা আপনি জ্ঞাত হউন। পতিব্রতা রমণী সর্ব্বদা পতিতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পতির অনুজ্ঞা লইয়া ভক্তিভাবে প্রত্যহ পতি-পাদোদক পান করিবেন। ১৩৪

ব্রতং তপস্যাং দেবার্চ্চাং পরিত্যজ্য প্রযত্নতঃ।
কুর্য্যাচ্চরণ সেবাঞ্চ স্তবনং পতিতোষণং॥ ১৩৫

তিনি ব্রত, তপস্যা ও দেবতা পূজা ত্যাগ করিয়া যত্ন পূর্ব্বক পতির চরণ সেবা ও পতির সন্তোষজনক স্তব করিবেন। ১৩৫

তদাজ্ঞা রহিতং কর্ম্ম ন কুর্য্যাদ্ বৈরতঃ সতী।
নারায়ণাৎ পরং কান্তং ধ্যায়তে সততং সতী॥ ১৩৬

তিনি বৈরিভাব বশতঃ পতির আজ্ঞা-রহিত কর্ম্ম করিবেন না; নারায়ণ হইতেও নিজ পতিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধ্যান করিবেন। ১৩৬

নরপুংসা পুরঞ্চৈব সুবেশং পুরুষং তথা।
যাত্রামহোৎসবং নিত্যং নর্ত্তকং গায়নং ব্রজ।
পরক্রীড়াঞ্চ সততং নহি পশ্যতি সুব্রতা॥ ১৩৭

তিনি অন্যের গৃহ, সুবেশ পুরুষ, যাত্রা-মহোৎসব, নর্ত্তনকারী পুরুষ ও গায়ককে দর্শন করিবেন না ও অন্যের ক্রীড়া দর্শন করিবেন না। ১৩৭

যত্তক্ষ্যং স্বামিনো নিত্যং তদেবনপি যোষিতঃ।
নহি ত্যজেৎ ক্ষণং তৎ সঙ্গং যাবৎ্যেব চ সুব্রতা॥ ১৩৮

পতির যে বস্তু ভক্ষ্য তাঁহার তাহাই ভক্ষ্য; সেই সুব্রতা নারী ক্ষণ কালের জন্যও পতিসঙ্গ ত্যাগ করিবেন না। ১৩৯

(ছ) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে।

উত্থায়ে নোত্তরং দদ্যাৎ স্বামিনশ্চ পতিব্রতা।
ন কোপং কুরুতে ক্রুদ্ধা তাড়নাচ্চাপি কোপতঃ॥ ১৩৯

পতিব্রতা রমণী পতির সহিত বাদানুবাদ করিবেন না; পতি যদি ক্রোধ বশতঃ পত্নীকে তাড়না করেন তথাপি তিনি পতির প্রতি কোপ করিবেন না। ১৩৯

ক্ষুধিতং ভোজয়েৎ কান্তং দদ্যাৎ পানঞ্চ তোষণে।
ন বোধয়েৎ তং নিদ্রালুং প্রেরয়ত্তোব কর্ম্মসু॥ ১৪০

তিনি ক্ষুধার্ত্ত পতিকে ভোজন করাইবেন; পতি যদি পিপাসা যুক্ত হন তাহা হইলে তাঁহার সন্তোষের জন্য পানীয় বস্তু প্রদান করিবেন; পতি নিদ্রাযুক্ত হইলে তাঁহাকে জাগ্রত করাইবেন না এবং কোন কর্ম্মে প্রেরণ করিবেন না। ১৪০

পুত্রাণাঞ্চ শতগুণং স্নেহং কুর্য্যাৎ পতিং সতী।
পতির্বন্ধুপতির্ভর্ত্তা দৈবতং কুলযোষিতঃ॥ ১৪১

পুত্রের প্রতি মাতার যে পরিমাণ স্নেহ হয়, পতিব্রতা সতী পতির প্রতি তাহার শতগুণ পরিমাণে স্নেহ করিবেন; কুলাঙ্গনার পতিই বন্ধু, পতি ভরণকর্ত্তা ও দেবতা। ১৪১

ভক্তং দৃষ্ট্বা সুধাতুল্যং কান্তং পশ্যতি সুন্দরী।
সস্মিতং বদনং কৃত্বা ভক্তিভাবেন যত্নতঃ॥ ১৪২

পতিব্রতা সুন্দরী সহাস্য বদনে যত্নপূর্ব্বক ভক্তিভাবে শুভ দৃষ্টিদ্বারা অমৃতময় কান্তকে দর্শন করিবেন। ১৪২

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

সংবাদ ও মন্তব্য।

নিশা ও উষা। অশেষ গুণাকর সামন্ত নৃপতি ময়ূরভঞ্জাধিপতি রামচন্দ্র ভঞ্জ-দেও বাহাদুর শীকার করিতে গিয়া আহত হইয়া সেই উপদ্রবেই লোকান্তরিত হইয়াছেন। দেশের দুর্ভাগ্য! তাই "একে একে নিভিছে দেউটি।" মহারাজ রামচন্দ্র যেমন লোকপ্রিয় ছিলেন, তেমনি সত্যপ্রিয় ও কর্ত্তব্যপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার পরলোকপ্রয়াণে আমরা বস্তুতই দুঃখিত হইয়াছি। আবার সঙ্গে সঙ্গেই আশা ও আনন্দের কথা এই যে মহারাজের শ্রেষ্ঠপুত্র যুবরাজ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেও ২৪শে ফেব্রুয়ারি পিতৃপরিত্যক্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সংসারের গতিই এই! একদিকে বিষাদ অন্যদিকে আশা ও আশ্বাস! ভগবান্ নবীন মহারাজের মস্তকে মঙ্গলাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন্।

শুভসংকল্প। খুলনায় জলকষ্ট হইয়াছে, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড কয়েকটি পুষ্করিণী খননের সংকল্প করিয়াছেন শুনিয়া প্রীত হইলাম। অনেকগুলি রাজনীতিকবক্তৃতা অপেক্ষা একটী প্রশস্ত জলাশয় দেশের লোকের বেশী উপকার করে। এ কথাটা হয়ত অনেকেই ভাবেন না!

হিন্দু-মুসলমান। মান্দ্রাজ বহরমপুরে হিন্দু মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করিয়াও "সমদুঃখসুখ" হিন্দুমুসলমান দুঃখী আত্মকলহ ভুলিতে পারিতেছেন না। ভাবিতে গেলে মনে হয়, ইহাই এদেশের সর্ব্বনাশ।

সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। আত্মদ্রোহ অকর্ম্মণ্যতার পরিচায়ক। জানিনা এই অভিশাপ আর কতদিন করিবে!

সম্পাদকের উপাধি। "আশীর্ব্বিজ্ঞাপনং, অদ্য হিন্দুপত্রিকায় সংস্কৃতকলেজে আপনার "বেদান্তবাচস্পতি" উপাধি লাভের বিশদবার্ত্তা পাঠ করিয়া আমি কতদূর আনন্দভোগ করিতেছি তাহা প্রকাশ করিবার ভাষাই নাই। দুঃখের বিষয় আমি ঐ তারিখে ঐ কার্য্যে যোগদান করিতে পারি নাই। পণ্ডিতমণ্ডলী যে উপযুক্ত গৌরব প্রদর্শন করিয়া নিজেরাই গৌরবিত হইয়াছেন আমি পূর্ব্বে অবগত হইলে নিশ্চয়ই ঐ গৌরবের একটা অংশ লইতে ছাড়িতাম না। আপনি দেশের গৌরব। আপনার গৌরবের জন্য আমি অসীম আনন্দের সহিত আপনাকে আজ ধন্যবাদ দিতেছি। এবং আপনার "বেদান্তবাচস্পতি" উপাধির সার্থক্যের ঘোষণা করিতেছি। আপনি শাস্ত্র প্রচারের দ্বারা দেশের যে উপকার সাধন করিয়াছেন, পাণ্ডিত্যপ্রভায় যে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন আজ তাহার জন্যও পুনরায় আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। ভগবান্ আপনার ন্যায় দেশহিতৈষী মনীষীর দীর্ঘজীবনের সহিত সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধান করুন। ইহাই প্রার্থনা। পরিশেষে আমি আবারও আপনার উপযুক্ত সম্মান লাভে অসীম আনন্দ জানাইয়া আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশশর্ম্মণঃ পাবনা দর্শনটোল।" এইরূপ বঙ্গের পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর্গ ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আনন্দ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় তাঁহাদের সকলের নিকটই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা।

বিধবাবিবাহ সমালোচনা।

শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর মিত্র প্রণীত। ডিমাই আট পেজী ৬৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত পুস্তক। ছাপা কাগজ চলনসই। মূল্য ৷৹ আনা। গ্রন্থকার বিশেষ যত্ন ও অভিনিবেশ সহকারে নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ পর্য্যালোচনা করিয়া, বিধবাবিবাহের অনুকূল ও প্রতিকূল পক্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক পরিশেষে হিন্দুবিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্র যুক্তি এবং বিজ্ঞানের অননুমোদিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। গ্রন্থকারের গবেষণা ও শ্রমের পরিচয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রকৃষ্টরূপে প্রকট। গ্রন্থকার পূর্ব্বতন ব্যাখ্যাকারদিগের মত আলোচনা করিতে গিয়া স্থলে স্থলে তাঁহাদের প্রতিকূল মত পোষণ করিয়াও তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটী করেন নাই। শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর বাবুর শাস্ত্রসেবাসংবাদে আমরা পরম পুলকিত। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে এই গ্রন্থের আদর হইবে। এ পর্য্যন্ত বিধবাবিবাহ বিষয় অনুকূল প্রতিকূল উভয় পক্ষই, বহু গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন। সংবাদপত্র সাময়িকপত্রেও এ বিষয় প্রচুর আলোচনা হইয়াছে, সুতরাং এ বিষয়ে নূতন কথা কমই শুনা যায়। শ্রীযুক্ত ভুবন বাবুর গ্রন্থখানি সারবানই হইয়াছে।

চিত্র নং ৫৩।

'অসমীয়া গ্রন্থবিবরণ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.